গোপাল হালদার রচনাসমগ্র /১

গোপাল হালদার রচনাসমগ্র / ১

গোপাল হালদার রচনাসমগ্র/১

গোপাল হালদার

এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম এ মুখার্জী
বইমেলা, জানুয়ারী ১৯৪৯

প্রকাশক
রাজীব নিয়োগী
এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

দিল্লী অফিস
কমিউনিকেশন সেন্টার
এম-৭০ গ্রেটার কৈলাশ ২
কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স
নিউ দিল্লী ১১০ ০৪৮

সম্পাদনা
অমিয় ধর
প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক
প্রবর্তক প্রিন্টিং এ্যাণ্ড হাফটোন লিঃ
৫২/৩ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১২

দাম : ৭০ টাকা

ত্রিদিবা

একদা—অন্যদিন—আর একদিন

প্রকাশকের কথা

ওপার এপার বাংলার সারস্বত সমাজে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার শ্রদ্ধেয় একটি নাম। বাঙালীর ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বস্তুবাদী বিশ্লেষক পণ্ডিত হিসাবেই তাঁর প্রসিদ্ধি ; তবে 'একদা', 'আড্ডা', 'বাজেলেখা' ও 'রূপনারাণের কূলে'-র স্রষ্টা হিসাবেও তিনি কীর্তিমান্।

শতাব্দীর প্রায় সমান বয়সী গোপাল হালদার আমাদের কালের একজন উল্লেখ-যোগ্য সংস্কৃতিবান্ পুরুষ। তাঁর সুভদ্ররুচি, প্রজ্ঞা ও মার্কসীয় জীবন-দৃষ্টির আলোকে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগৎ দ্যুতিময়। তাঁর সাহিত্য ও জীবন সাধনার সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের পরিচয় সাধনের জন্য আমরা তাঁর রচনাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি।

যিনি অর্ধ-শতাব্দীর অধিককাল ধরে লিখেছেন, এখনো লিখে চলেছেন, তাঁর সমগ্র রচনা প্রকাশ শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এই দুরূহ কার্য সুসম্পন্ন করার জন্য আমরা লেখকের আস্থাভাজন শ্রীঅমিয় ধরের উপর সম্পাদনার ভার ন্যস্ত করেছি। প্রথম পর্যায়ে লেখকের উপন্যাস, ছোটগল্প ও স্বগতনিবন্ধ নিয়ে পাঁচটি খণ্ড প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী 'গোপাল হালদার রচনাসমগ্র' প্রথম খণ্ডে থাকছে 'ত্রিদিবা' ট্রিলজির 'একদা—অন্যদিন—আর একদিন'।

রচনাসমগ্রের অন্তর্গত 'ত্রিদিবা' পূর্ববর্তী সংস্করণের নিছক পুনর্মুদ্রণ নয় ; লেখক কর্তৃক পরিমার্জিত 'প্রামান্য শেষ সংস্করণ'। এই সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে 'একদা—অন্যদিন—আর একদিন' রচনা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, এ সম্পর্কে লেখকের তিনখানি মূল্যবান্ পত্র, রসজ্ঞ-সমালোচকদের অভিমত এবং লেখকের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

রসজ্ঞ-সমালোচক শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম খণ্ডের একটি মূল্যবান্ ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর সুলিখিত ভূমিকাটি 'ত্রিদিবা'-র আলোচনায় নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

এই সঙ্গে পরিশিষ্ট অংশে যে সব বিশিষ্ট সমালোচকের মতামত উদ্ধৃত হয়েছে, তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁদের সবার কাছ থেকে অনুমতি সংগ্রহে যে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ঘটেছে, সেজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। গোপাল হালদার-অনুরাগী ধীমান্ আলোচকবৃন্দ, জানি এ ত্রুটি নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

পরিশেষে, মননশীল-কথাসাহিত্য-অনুরাগী পাঠকবৃন্দের সহৃদয়তা কামনা করে, তাঁদের হাতেই 'গোপাল হালদার রচনাসমগ্র'—প্রথম খণ্ডটি তুলে দিলাম।

বিনীত

রাজীব নিয়োগী

নিবেদন

গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, হয়তো এ খণ্ড দেখে যেতে পারি, কিন্তু পরবর্তী খণ্ড পারব না। আমার স্নেহভাজন অমিয় ধরের সহায়তায় প্রকাশকদের তা করবার কথা। যাই হোক এই খণ্ডের ও পরবর্তী খণ্ডের পাঠকদের উদ্দেশ্যে দু-একটি কথা জানাতে চাই। ভ্রম-প্রমাদ-বর্জন-সংযোজন যা আছে তাতে পাঠকদের বিরক্তি ঘটা সম্ভব, আর তা অকারণ নয়। তবে কারণটা আমার সহায়ক ও প্রকাশকেরা নন, কারণ আমি। সে জন্য ক্ষমা চাইতে গিয়ে কয়েকটি কথা এখানে জানাতে চাই।

আমার গ্রন্থাবলীর প্রবন্ধ-প্রধান লেখাগুলি ছাড়া, অনেক লেখাই আমি পূর্ব থেকে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করে, তা অচ্ছেদ্য ধারায় লিখে উঠতে পারি নি। নানা বাধা ও ব্যস্ততা এসে জুটে প্রারব্ধ লেখা বারবার ফেলে রাখতে বাধ্য করেছে—কখনো কখনো দীর্ঘদিনের মতো। তাতে লেখার মূল ভাব, প্রসঙ্গ ও পদ্ধতি বিচ্ছিন্ন না হলেও, স্মৃতির বিশ্বাসঘাতকতায় গাঁথুনি পাকা হতে বাধা পেয়েছে। পরে চেষ্টা করে সে ত্রুটি শোধরালেও কোথাও কোথাও কিছু ঢিলেমি রয়েই গেছে। দ্বিতীয় একটি কারণ, বিস্মৃতি ছাড়াও লেখা অনেক সময় কালগত দূরত্বে লেখকের মনের দৃষ্টি এড়িয়ে নিজের মতো গড়ে উঠতে চেয়েছে,—লেখকের শাসনের অপেক্ষা না রেখে। সব সময়ে সম্ভবত তাতে ক্ষতি হয় না, কিন্তু অভ্যন্তরীণ অসামঞ্জস্য তাতে থেকে যাওয়া সম্ভব।

আমার উপন্যাসধর্মী লেখায় অন্যান্য ত্রুটির সঙ্গে এসব ত্রুটিও ঘটবার কথা। সংস্করণে সংস্করণে আমি সে ভুল-ত্রুটি দূর করতে চেষ্টা করেছি—দু-চারটি শব্দ বা কথাগুচ্ছ বদলে বা দু-চার পঙ্‌ক্তি কেটে বা যোগ করে। বর্তমান গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত 'ত্রিদিবা'-র 'একদা-অন্যদিন-আর একদিন'-এর পূর্ববর্তী সংস্করণের পাঠকেরা সে সব পরিবর্তন দেখতে পাবেন। কারণও তার অনেক ছিল।

প্রথমত 'একদা' যখন আমি লিখতে আরম্ভ করি কোন বড় পরিকল্পনা তখন আমার ছিল না। বন্দীশালায় পীড়িত অবস্থায় ভাবছিলাম মারাত্মক কিছু ঘটবার আগে আমার অভিজ্ঞতার কিছু চিহ্ন রেখে যাই—অন্তত একটি দিনের কথা। সেই একটি দিনের কথাই ক্রমে, আমার পরিকল্পনা না থাকলেও, একটি নাতিবৃহৎ উপন্যাস হয়ে ওঠে; দ্বিতীয় গ্রন্থ 'অন্যদিন' ও তৃতীয় গ্রন্থ 'আর একদিন'-এর কথা আমার ভাবনায় তখনও ছিল না,—কারণ সে প্রসঙ্গ দুটি তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। প্রায় ছয় বৎসর ছিল 'একদা'-র সঙ্গে 'অন্যদিন'-এর ঘটনা কালের তফাৎ এবং আরো প্রায় দশ বৎসর ছিল 'অন্যদিন'-এর ঘটনা কালের সঙ্গে 'আর-একদিন'-এর ঘটনা কালের দূরত্ব। 'আর একদিন' রচনা করার আগেই তিনটির প্রসঙ্গ

সংযুক্ত ও সুসংবদ্ধ ট্রিলজিতে পরিণত করার আইডিয়া আমার মাথায় আসে। তার স্থির প্রকাশ ঘটে 'ত্রিদিবা' নামীয় গ্রন্থে। ফলে আলাদা আলাদাভাবে প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থ এবার পূর্বেকার ভেদরেখা মুছে ফেলে, কাহিনীর ধারাগত অসামঞ্জস্য অপসারিত ক'রে একত্রিত হয়ে উঠল। দুর্ভাগ্যক্রমে 'ত্রিদিবা' প্রকাশকালে আমি রোগশয্যায় বন্দী ছিলাম। একত্রিত আকারে 'ত্রিদিবা' কী হয়ে উঠল তা রোগমুক্তির মাসখানেক পরে মাত্র আমার দেখার সুযোগ হয়, আরো মাসখানেক পরে হয় পড়ার সুযোগ। তখন চোখে পড়ল 'ত্রিদিবা'র মধ্যে কত অনভিপ্রেত অসামঞ্জস্য রয়ে গেছে, এমন কি পাণ্ডুলিপির দু-এক পাতাও মুদ্রণকালে বাদ পড়ে গিয়েছে।

এবার নতুন মুদ্রণের জন্য প্রেসে যে বই তিনটি দেওয়া হলো তাতে যথাসম্ভব সে অসামঞ্জস্য, ভুল-ত্রুটি দূর করবার প্রয়াস পেয়েছি—কোথাও অল্প-স্বল্প বাদ দিয়ে, কোথাও বা দু-চার পঙ্‌ক্তি যোগ করে। এ ব্যাপারে আমার সহায়ক অমিয় ধর যাই করুন, আমার অভিপ্রায় অনুসারেই করেছেন। এখন পর্যন্ত বলতে পারি এই খণ্ডের পাঠ-ই আমার অভিপ্রেত ও প্রামাণিক। আশা করি পাঠক সাধারণ 'ত্রিদিবা'র গ্রন্থাবলী সংস্করণকে এভাবেই গ্রহণ করবেন। জ্ঞাতে অজ্ঞাতে আমার যা ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছে তা সহৃদয়তার সঙ্গে মার্জনা করবেন। ইতি —

বিনীত

গোপাল হালদার

গোপাল হালদার রচনাসমগ্রের ভূমিকা

● ত্রিদিবা ●

॥ এক ॥

আজকে এ কথাকে স্মৃতিতে যাঁরা ধরে রেখেছেন, একদিন গোপাল হালদার নামক এক যুবক কেমনভাবে বৃহত্তর অস্তিত্বের আহ্বানে একই সঙ্গে সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, সন্ত্রাসবাদ, জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সকল কিছুকে নিজ জীবনে একত্রে বরণ করে নিয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে। আচার্য সুনীতিকুমারের প্রিয় ছাত্র, নীরদ সি. চৌধুরীর প্রীতিবদ্ধ বন্ধু শ্রীগোপাল হালদার নিজেও আজ স্মৃতিধূসর। *Thy hand, Great anarch,* নামক গ্রন্থে নীরদ সি. চৌধুরী লিখেছেন—His name was Gopal Haldar. He was a contemporary of Sajani Das, who had introduced him to me. He was a student of Philology, had come to Calcutta to become a writer, and perhaps also with political ambition after giving up his lectureship in Feni College. At that time he was completing a thesis on a dialect of the Bengali language, and was also looking after a monthly magazine edited by Ashoke Babu. For our magazine he had written some witty articles, and I found him to be a very quiet and level headed young man But he was already involved in some way with the revolutionary movement. Later he was detained without trial. Finally he became a Communist and after independence a member of the Bengal legislature. He published some books and was respected as a writer in Bengal.

এত সংক্ষেপে, কিন্তু এত মনোজ্ঞভাবে নীরদবাবু শ্রীহালদারের জীবনী চিত্রটি নিষ্পাদিত করেছেন যে, এরপর আর কিছু বলার থাকে না। শুধু একটা কথাই বলার থাকে—'শান্ত' এই বিশেষণটিতে যেন শ্রীহালদারের চলিষ্ণু জীবন ধর্মের মূল কথাটি চাপা না পড়ে।

শ্রীগোপাল হালদারের রচনাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন বিশিষ্ট প্রকাশন সংস্থা এ. মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ। নিঃসংশয়ে বলা যায় এ উদ্যোগের মূলে রয়েছে প্রকাশন সংস্থার সংস্কৃতিক অবধানতা। নীরদ সি. চৌধুরীর কথা থেকেই বোঝা যায় শ্রীহালদার এক বিচিত্রপ্রভ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সংস্কৃতির

অকৃত্রিম বন্ধু, ভাষাতত্ত্বের অভিনিবিষ্ট গবেষক, ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে কীর্তিমান এবং সর্বোপরি বাংলা কথাসাহিত্যের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক শ্রীহালদার আজ জীবন সায়াহ্নে উপনীত। তিনি কতটা স্মৃতি বিহারী আমরা তা জানি না। কিন্তু তাঁকে ঘিরে আমাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা স্বতঃই গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। 'একদা'র গোপাল হালদার,' অথবা 'সংস্কৃতির রূপান্তর'-এর গোপাল হালদার'—চারের দশকের গোড়ার দিকে সকলের পরিচিত 'গোপালদা'-র এই ছিল প্রধান বৌদ্ধিক পরিচয়। 'বৌদ্ধিকতা' শব্দটি ব্যবহারে একটু সঙ্কোচ বোধ করছি—কেননা শব্দটির অনুষঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে উদ্দণ্ড শল্য সজারুর সন্ত্রাস। গোপাল হালদারের প্রীতিস্নিগ্ধ মানবিক হার্দ্য সংস্পর্শে একবারও যিনি এসেছেন, তিনি এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হবেন—মেধা, মন, বৈদগ্ধ্য সবই এখানে সার্থক হয়েছে গতিশীল সজীব মনের কারণে।

গদ্যে ব্যক্তির মনন জগতের প্রতিফলন। গোপাল হালদারের মতো মানুষ—যিনি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের তিন পর্যায়ের ভিতর দিয়ে ক্রমশ উন্মোচিত হয়েছেন, যিনি মুক্তি আন্দোলনের তিন যুগের সৈনিকদের সহযাত্রী, তিনি গদ্যে যা কিছু লিখেছেন, সবই এক হিসাবে তাঁর মুক্তি পথের রোজনামচা। তাই খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ্য এই রচনা সংকলনের প্রথম কয় খণ্ডে থাকবে তাঁর উপন্যাস ও গল্প। পরের খণ্ডগুলিতে গৃহীত হবে তার মননদ্যুতি সংবলিত প্রবন্ধ ও ব্যক্তিগত রচনা। লক্ষণীয় যে, উপন্যাসে তিনি যদিও 'একদা'র জন্যই বিখ্যাত, তথাপি 'একদা'—'অন্যদিন' বা 'আর একদিন' ছাড়াও উপন্যাসে তিনি নানা পরীক্ষায় রত হয়েছেন। তেরশ পঞ্চাশের দারুণ দিনগুলো নিয়েই হোক, অথবা দীর্ঘচ্ছন্দ সময়ের নিজস্ব ঘাতে প্রতিঘাতে ভূমিকা সৃজন ইতিবৃত্তই হোক, শ্রীহালদার তাঁর গল্পে উপন্যাসে সময়কে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। সময়ের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধপাত এবং সময় ও ব্যক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াই গোপাল হালদারের কথাসাহিত্যের মূল বিষয়। প্রকৃতি বা প্রেমকেও তিনি সময়ের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন। তাই তাঁর গল্প উপন্যাস অনন্য। বর্তমান খণ্ড যেহেতু ত্রিদিবাকে নিয়ে, সেহেতু আমরা এবার ত্রিদিবার মধ্যে প্রবেশ করবো।

॥ দুই ॥

ত্রিশের দশকে 'একদা' যখন লেখা হয়েছে তখন বাংলা উপন্যাস জগৎ পরিবর্তমান বাস্তবের রূপ ও স্বরূপ নিয়ে উৎকণ্ঠ। তিনের দশকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'চার অধ্যায়', তারাশঙ্কর লিখেছিলেন 'চৈতালী ঘূর্ণি'। প্রথমটিতে রাজনৈতিক কর্মীর অন্তরলোকের আত্মভিজ্ঞান-সঙ্কট প্রধান কথা। দ্বিতীয়টিতে রাজনৈতিক কর্মীর বহির্জগতের দ্বান্দ্বিক বস্তুরূপ মুখ্য বিষয়। প্রথমটিতে ব্যক্তির

অনন্বয়ের যন্ত্রণা, দ্বিতীয়টিতে ব্যক্তির সমষ্টিগত হবার তাগিদ। এবং সবশেষে উপলব্ধ হয় সবচেয়ে জরুরী কথাটি—প্রথমটিতে গুরুত্ব আধারের দুর্বলতায় ম্লান—দ্বিতীয়টিতে অসিদ্ধ আধেয় আধারের নির্মিতি কৌশলকে নিষ্প্রভ করেছিল। তিনের দশক—বাংলা কথাসাহিত্য কল্লোলী আবর্ত থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তারই প্রতিক্রিয়ায় দৈগন্তিক বিস্তারের দিকে ঝুঁকেছে। তিনের দশক—শরৎচন্দ্রের একটা উত্তরাধিকার প্রবলতর হয়েছে—লোকযাত্রার অভিজ্ঞতাকে কথাসাহিত্যে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রসঙ্গত মনে রাখি 'লোকযাত্রার অভিজ্ঞতা' শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত শব্দবন্ধ। তিনের দশক—লোকজীবনের অন্তরের পরিচয় খুঁজে পেতে গিয়েই বাঙালি ঔপন্যাসিক সযত্নে প্রকৃতিবাদের প্রলোভন থেকে আত্মরক্ষা করলেন। তিনের দশক—তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তন্ময় জগৎ ধীরে ধীরে আমাদের কাছে স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর হয়ে উঠছে। ঠিক এমন সময়ে প্রকাশিত হল গোপাল হালদারের 'একদা'। 'একদা' সর্বার্থে ও শ্রেষ্ঠার্থে অনন্য উপন্যাস। এরই অনুবর্তী রচনা—যদিও কালের দূরত্বে ব্যবহিত, 'অন্যদিন' 'আর একদিন'। তিনটি উপন্যাস মিলে 'ত্রিদিবা'। 'একদা'-র অনন্যতার কারণ তিনটি। প্রথম, এই উপন্যাসে তর্জনীসঙ্কেত করে বলা যাবে না, ঘটনা এখান থেকে শুরু হয়েছে, এইখানে তার সমাপ্তি ঘটেছে। দ্বিতীয়, তিনটি উপন্যাসেই ব্যবহৃত কালখণ্ড বাইরের বিচারে পৃথিবীর একটি একটি আহ্নিক আবর্তন মাত্র। তৃতীয়, এবং সেটাই আসল কথা, এই উপন্যাসে লেখক একবারও বলছেন না, 'দেখ আমি কত দেখেছি'। পক্ষান্তরে তাঁর চরিত্রের জানাবার কথা হল—আমি (উপন্যাস অর্থে অমিত) কত অনুভব করেছি। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা অপেক্ষা সংবেদিতা এখানের লেখকের প্রধান আশ্রয়। পূর্বগ শরৎচন্দ্র একটা ব্যাপারে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তাঁর রচনাসংক্রান্ত নানান আলোচনায় চিঠিপত্রে বারে বারে তিনি যে প্রত্যক্ষ দেখাশোনার বাইরে যান নি সে কথা বোঝাতে চাইতেন। এটা অবশ্যই তাঁর গুণ। উপন্যাসে তিনি জীবনকে জীবনেরই মতো প্রতীয়মান করাতে চাইতেন। আমরা শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যে যখনই অন্তরের প্রশস্তি ঢেলে দিয়েছি তখনই তার কারণ—অন্তত প্রধান কারণ তাঁর লেখায় আমরা নিজেদের ছবি দেখতে পেয়েছি। 'কাছের লোকের কলরব যখন দেয়াল হয়ে সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনে তাকে অবরুদ্ধ করে তখন সে খর্ব হয়ে অসত্য হয়ে যায়'—একথা রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে জানালেও রবীন্দ্রনাথই শরৎকীর্তি সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক পাঠকমণ্ডলীর কাছে বলেছিলেন—The latest of the leaders who through this path of liberation has guided Bengali novels nearer to the spirit of modern world literature is Sarat Chandra Chatterjee. নিঃসন্দেহে শরৎচন্দ্র এ কাজটা করতে পেরেছিলেন তাঁর লোকায়ত জ্ঞানের ও ধারণার সাহায্যে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের জীবৎকালেই শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গ প্রকরণ যে তাঁর নিজের কাছে ম্লান হয়ে যাচ্ছিল তার প্রমাণ 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১) অর্থাৎ উপন্যাস লেখকের অভিজ্ঞতার দর্পণ হিসাবে গড়ে

উঠতে উঠতেই তাকে এবার চিন্তার চলচ্ছবি হবার পথে পা বাড়াতে হবেই। নিশ্চয় শরৎচন্দ্র সে কাজ পারেননি। তাঁর পারার কথাও নয়। কিন্তু ত্রিশের দশকের শেষদিকে ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছিল চিন্তার সূত্র। উনচল্লিশ সালটাই বড়ো বিচিত্র। দু-এক বছর আগে থেকেই মনে হচ্ছিল সবই নিঃস্রোত। অথচ আপাত নির্মেঘ আকাশে চেম্বারলেনী অলীক শান্তিকে ব্যঙ্গ করেই দিগন্তে মেঘের চাপা আয়োজন দুর্লক্ষ্য ছিল না। স্বদেশে মুক্তি আন্দোলন তখন কিছুকালের জন্য দ্রুতছন্দ হারিয়ে আসন্নসম্ভবা জননীর অন্তর্মুখী প্রতীক্ষায় শান্ত কিন্তু সমুদ্যত। উইং-এর আড়ালে রয়েছে করুণ দুর্ভিক্ষ, বিক্ষুব্ধ বিয়াল্লিশ এবং আরো পরের ইতিহাস কুশীলবের করাল নানা ভয়াল মূর্তি। স্রোত নেই শুধু উপরে। ভিতরে ভিতরে একটা ভয়ঙ্কর গূঢ় চোরাটান আছে। এই সেই সময় যখন সচেতন ব্যক্তি মন্ময়তায় নিমজ্জিত হয়। তার চিন্তা নিজেকে নিয়ে নয়। তার চিন্তা চিন্তাকে নিয়ে। যে চিন্তা বাস্তবতার দান, আবার বাস্তবতার নিদান, যে চিন্তা সেন্‌সিবিলিটি বা সংবেদের অপর নাম, যে চিন্তায় ঢেউ ওঠে, ঘূর্ণি জাগে, যা শুশ্রূষা বা সান্ত্বনা আনে না, যে চিন্তা প্রতিনিয়ত জীবনের প্রবাহ ও প্রতিস্রোতকে অঙ্গীকার করে—সেই সঙ্কটারূঢ় চিন্তাই তখন প্রবল হয়ে ওঠে। তখন ধূর্জটিপ্রসাদের 'অন্তঃশীলা'-র মতো আপাতসত্যের ভিতরে ভিতরে বইতে থাকে এক নিরন্তর জিজ্ঞাসার ধারা। চিন্তার স্রোতে অবগাঢ় হতে হতে নিজেকে সনাক্ত করার প্রথম প্রমাণ আমাদের সাহিত্যে আমরা পেয়েছি 'রজনী'র অমরনাথে। উনবিংশ শতকীয় প্রসঙ্গে প্রকরণে এ অবশ্যই সার্থক সৃষ্টি। কিন্তু প্রশ্ন তো শুধু নিজেকে সনাক্ত করায় নয়। প্রশ্ন হল নিজেরই 'হয়ে ওঠা'। খগেনবাবু ও অমিত সেদিক দিয়েই সাধর্মযুক্ত চরিত্র। যদিও দুই ব্যক্তিত্বের ধাতুপ্রকৃতিতে অনেক অমিল।

।। তিন ।।

'একদা'-র প্রকাশ ১৯৩৯-এ, 'অন্যদিন'-এর প্রকাশ ১৯৫০-এ, 'আর একদিন' বেরিয়েছে ১৯৫১-তে। 'একদা'-র সঙ্গে অনুবর্তী দুটি বইয়ের প্রকাশকালের ব্যবধান এক দশকেরও বেশী। আটাশে অঘ্রাণ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের আহ্নিক আবর্তন প্রথম বইটিতে ধৃত হয়েছে। দ্বিতীয় বইটিতে যে কালখণ্ড ব্যবহৃত হয়েছে তা এর আট বছর পরের একদিন। তৃতীয় গ্রন্থে সময় আরো এগিয়েছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। তিনটি দিন ব্যক্তি অমিতের জীবনে যেন তিনটি মাইলস্টোন। 'অমিত' এই নামরূপটি আমাদের নাড়া দেয়। রবীন্দ্রনাথের নায়ক অমিত যেন প্রকারান্তরে একথাই বলে, কোনো ছকে তাকে মাপা চলবে না। বর্তমান ত্রয়ীরচনার অমিত নিশ্চয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সে জাতীয় অভিজ্ঞানের সন্ধানী নয়। সে জানে তার অনুভূতির অমেয়তা। অমিতের জন্যই এ উপন্যাস বিশিষ্ট হয়ে উঠল—উপন্যাসটি হল এ নভেল অফ্ সাব্‌জেক্‌টিভিটি, বা মন্ময়তার উপন্যাস।

মন্ময়তার উপন্যাস তখনই একজন ঔপন্যাসিকের কাছে অবধারিত মাধ্যম বলে

পরিগণিত হয় যখন চরিত্রপাত্রের মানসিক অভিজ্ঞতা আর লেখকের মানসিক অভিজ্ঞতার মধ্যে কোনো ভেদ থাকে না। লেখক নিজেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলেন নিজেরই তাগিদে। গোপাল হালদার নয়—অমিতের মানসিক অবধানতাকে পাঠক নিজের অবধানতায় বা awareness-এ রূপান্তরিত করেন। পাঠকই অমিতের চিন্তার-স্মৃতির-অনুভূতির ঢেউগুলিকে জোড়াতাড়া দিয়ে এক সম্পূর্ণ সমগ্রে পরিণতি দেন। অমিতের প্রতিটি চিন্তা তার ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র চিন্তার অংশ এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ। চিন্তাংশগুলি কোনোটাই স্থাণু নয়। তারা চলিষ্ণু সত্তার সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য অন্বয়ে জড়িত। 'অমিত-চরিত্র' বলতে এ উপন্যাসে আমরা যা পাব তা অন্য উপন্যাসের মতো এ্যারিস্টোটলীয় চরিত্রকল্পনা নয়। এখানে 'চরিত্র' কথাটারই কোনো মানে হয় না। ঘটনার কষ্টিপাথরে চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা বা চরিত্রের সক্রিয়তার মাধ্যম হিসাবে ঘটনাকে উদ্ভাবনও এ উপন্যাসের কাজ নয়। এ উপন্যাসে আমরা যেটা পাব সেটা হল অমিতের মানসিক বাতাবরণ। তাহলেও এই উপন্যাস লিখিত হয়েছে যদিও প্রথম পুরুষে—তথাপি বোঝা যায় 'অমিত' একটি উত্তমপুরুষেরই নাম। 'অমিত' নামকরণে লেখক নিজেকে বিযুক্ত করে নিতে চেয়েছেন। তাঁর চিন্তা, চেতনা, ভাবুকতার নামই অমিত। আমরা 'ত্রিদিবা' উপন্যাসে সেই অমিতের মানসিক বাতাবরণকেই অনুভব করব। অমিতের তিনটি দিন দেখতে দেখতে হয়ে ওঠে বাঙালি মধ্যবিত্তের দুই দশকের অন্তর্গত ইতিহাস। আমরা সে ইতিহাসের শ্রোতামাত্র বললে ভুল হবে; গূঢ়তর অর্থে আমরাও নয়, আমরাই সে ইতিহাসের রচয়িতা, আমরাই সেই চলিষ্ণু ইতিহাসের সহযাত্রী। অমিত আমাদেরই অন্য নাম।

এখন এ জিজ্ঞাসা অনিবার্য, 'ত্রিদিবা'-র নায়ক কি অন্তর্মুখী স্বভাবে বিশিষ্ট? উত্তর—কেউ কি নিরবলম্ব অন্তরাশ্রয়ী হতে পারে? অমিতের অনুষঙ্গসৃজনী অবচেতনে ছুটন্ত প্রবাহপ্রতিম বাস্তবের ছায়া পড়েছে প্রতি পদক্ষেপে। কোলরিজ কথিত 'ফ্লাক্স' এবং 'রি-ফ্লাক্স' চিন্তাজগতে নিয়ত পরিবর্তমানতার স্বীকৃতি। অমিতের মানসিক বাতাবরণে মেঘ-রৌদ্রের ক্রমান্বয় আলো-আঁধারি তাকে আমাদেরই একজন করে তোলে। স্মৃতি অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারী। স্মৃতি এখানে অমিতের আশ্রয় নয়। স্মৃতি প্রবাহ অমিতকে শিখিয়েছে এক নিখাদ সত্য। অভিজ্ঞতা আর অবধানতা পৃথক তাৎপর্য বহন করে। অভিজ্ঞতা ক্রমবর্ধমান সচেতনতার প্রধান উপাদান—প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এবং আমরা আরো লক্ষ্য করি, অমিত তার সঙ্গে কোন না কোনভাবে সম্পৃক্ত মানুষগুলির অন্তরপ্রকৃতিকে ধরতে চেয়েছে। অমিত মন্ময়তার সাহায্যেই অন্যের মন্ময়তায় অবহিত হতে চেয়েছে। এই শিল্পরীতির সার্থকতা বিচারে একথাটি অবশ্যস্মর্তব্য যে, সেদিক থেকে এ উপন্যাসের বিষয়বস্তুও স্বতন্ত্র। সবিতা, ইন্দ্রাণী, সাতকড়ি, শৈলেন, মোতাহের, কানাই হাজরা, বিজন, মঞ্জু—সময় কাকে কেমন ভাবে ভাবাল, দোলাল, পাল্টালো—অমিত নিজেও সে অভিজ্ঞতা থেকে কোন জীবনার্থ নিষ্কাশিত করে নিল—এ উপন্যাসের সেটাই হল বিষয়।

।। চার ।।

প্রায় বিশ বৎসর—ইতিহাসের বিচারে অত্যন্ত ঘটনাঘন ও সম্ভাবনাময় এই কালখণ্ড। প্রায় বিশ বৎসরের কালসীমা থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে তিনটি দিন। 'বেছে নেওয়া হয়েছে' এই ক্রিয়াপদের চেয়ে অধিকতর সুপ্রযোজ্য হবে 'তুলে নেওয়া হয়েছে' ক্রিয়াপদ। কেননা এই দিন তিনটির গলায় কোনো ঘটনাঘন রুদ্রাক্ষের মালা দোলানো নেই। নটরাজের নৃত্যের কোনো বিশিষ্ট মুদ্রা এই দিন তিনটির করপুটে ফুটে ওঠে নি। কিন্তু যে অর্থে প্রতিটি দিনই অনন্তের স্বাক্ষরে ধন্য—প্রতিটি দিনই রূপান্তরের ইতিহাসের এক এক পাতা, সেই অর্থে 'ত্রিদিবা'র দিন তিনটি একই সঙ্গে প্রাক্তনের ধারক, ঘটমানের দলিল, সমাসন্নের বার্তাবহ। অভিজ্ঞতার যে শেষ নেই, তার যে কোথায় আরম্ভ, কোথায় মধ্যপর্ব, কোথায় বা পর্বান্ত তা যেমন বলা যায় না, অমিতের হয়ে ওঠারও তো তেমনি শেষ নেই। 'চরৈবেতি' শুধু রোহিতাশ্বেরই দেবদত্ত মন্ত্র নয়, সচেতন মানুষেরও ইতিহাসদীক্ষিত আত্মজ্ঞান। অমিতের চলাটাই অমিত।

অমিতের রাজনৈতিক চেতনার বিবর্তন 'ত্রিদিবা'-র প্রধান কথা—বললে উপন্যাসটির গুরুত্ব অস্বীকার করা হয়। তার চেতনা গভীরের দিকে কেমনভাবে প্রবাহিত হয়েছে সেটা এ উপন্যাসের আসল কথা। এবং সেই আসল কথাটিকে মনে রেখেই বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের দুই দশকের রূপরূপান্তর ভাঙন গড়নের ইঙ্গিতটি এ উপন্যাসে ধরা পড়েছে। সুরবালার মেয়ের গল্প অনেক গল্পের মধ্যে তার একটা বড়ো প্রমাণ। বর্তমান ভূমিকা লেখক 'ত্রিদিবা'-র তিনখানি বইয়ের ভাবসত্তার দিকে তাকিয়ে অমিতের জীবনের তিনটি অধ্যায়ের কথা ভাবেন। সংশয়-সমীক্ষা, উপলব্ধি এবং উত্তরণ। সেদিক থেকে 'একদা'-অংশে অমিতের প্রধান পুরুষার্থ হল প্রস্তুতিঘন মানসিকতার দিকে যাত্রা। 'একদা'-র যেখানে শেষ সেখানে বিদেশী শাসকের পুলিশবাহিনীর সবুট পদধ্বনিতে অমিতের পর্বান্তরের আহ্বান। 'অন্যদিন' এ 'একদা'-র মর্মী মানুষ কর্মীজীবনে দীক্ষা পেতে চলেছে। উদাসীন নিরাসক্তি থেকে সে বেরিয়ে এসেছে। 'আর একদিন'-এ অমিত পুরোপুরি ইতিহাসের মানুষ। একথা কোনদিন কোনো মার্ক্সবাদী বলেনি যে, শ্রমিক শ্রমিকই থেকে যাবে আর ভদ্রলোকেরা তকমাতাবিজ ছিঁড়ে শ্রমিকদের জীবনে ভিড়ে যাবে। শ্রেণীবিভক্ত ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষ মাত্রেই সমাজপ্রদত্ত বিকারগুলির ফলে নানাদিক থেকে অনন্বিত। মার্ক্সবাদ শেখায় দূর করতে গেলে সেই অনন্বয়, কর্মিষ্ঠ আততিতে অর্জন করতে হবে সঠিক সংস্কার মনুষ্যত্ব। অমিত সেই ঠিকানা খুঁজে নিল। যখন সহযাত্রী বন্ধুদের সঙ্গে অমিত কারাগারের দিকে রওনা হল সেই মুহূর্তে সে স্পর্শ করতে চলল অনন্তকে। জীবনকে নিবিড়ভাবে আশ্লেষের ভিতর দিয়েই স্পৃষ্ট হবে অনন্তের অঞ্চল—'ত্রিদিবা'-র নায়ক ও 'ত্রিদিবা'-র লেখক এই প্রগাঢ় নৈতিক অবধানতা বা moral awareness-এর ক্ষেত্রে বুঝি অভিন্ন।

অমিতের বৌদ্ধিক বিবর্তন ও চেতনার দৈগন্তিক বিস্তারের আরেক সাক্ষী তার শেক্সপীয়র পাঠ। ট্রাজিক নায়ক যেমন বিষ্ণু দে-র অমর কবিতা 'এলসিনোরে'-তে হয়ে ওঠে কর্মে প্রেমে সমুদ্যত এক ব্যক্তিসত্তা, অমিতের শেক্সপীয়র পাঠে তেমনি অর্জিত হয় ইতিহাসের পথে বেরিয়ে পড়তে চাইছে এমন এক নায়কপ্রতিমা। একটা কথা তোলা যায়, অমিতের intense living-এর স্বরূপটা কী? এর উত্তর আমরা অমিতের কাছ থেকে পাওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করি। 'কোথায় তোমার পরিচয় অমিত? জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ব্রজেন্দ্র রায়। সে পরিচয় আর লেখায় ফুটিল না, কথায় ফুটিল না, ফুটিল না প্রেমমণ্ডিত গৃহরচনায়, ধ্যানসুন্দর প্রীতিসুন্দর গোষ্ঠী-রচনায়, একান্তে বসিয়া আত্মরচনায়। জ্ঞানে চিন্তায় ভাবনায় কাব্যে কলায় শিল্পে কোথাও আর কোনো পরিচয় নাই তোমার। পৃথিবীর চোখে তাই তুমি ব্যর্থ, বিক্ষিপ্ত। অথবা মানুষের এই মহদভিযানের সঙ্গে মিলাইয়া গিয়াই সার্থক তুমি।' এইভাবেই সে ছোট আমি থেকে বড়ো আমিতে পৌঁছে গেছে। এই অনুভূতির চূড়াতে দাঁড়িয়েই উপলব্ধ সত্যের গভীর উচ্চাবণ আরেকজনের কাছে আমরা শুনেছি—'আমারে তুমি অশেষ করেছ'। এই যে বেঁচে থাকা এতো সুতীব্রভাবে মানসিক অস্তিত্বযাপন। এ শৌখীন অন্তর্লীনতা নয়। নিজেকে অতিক্রম করার সতত প্রয়াসে আর আত্মসচেতনায় অর্জিত বিনয় সে অস্তিত্বের সারাৎসার। ঘটনা—বাইরের ঘটনা সেখানে যা কিছু আছে সবই সেই অস্তিত্বের গূঢ়তায় উন্মোচক হয়ে দেখা দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষের দেখাটি বিশেষ প্রণিধেয়। তিনি কবি বলেই এই অন্তশ্চারী ভাবনাতরঙ্গের কম্পন ও কল্লোলের স্রোত এবং প্রতিস্রোতের প্রকৃত রহস্য মনোজ্ঞভাবে ভেদ করেন। Only in intense living do we touch infinity অমিতের ব্যবহৃত এই উক্তিটিকে শঙ্খ ঘোষ ও অশ্রুকুমার সিকদার দুজনেই ব্যবহার করেন অমিতের জীবনার্থের ভাষ্যদীপ হিসাবে। শঙ্খ তাঁর বোধভূয়িষ্ঠ 'ত্রিদিবা' আলোচনায় একটি প্রয়োজনীয় কাজ করেছেন। তিনি প্রুস্ত ও গোপাল হালদারের পার্থক্যটি ঠিকভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। প্রভেদ নির্দেশ করেছেন জয়েসের সঙ্গেও। জয়েসের ক্ষেত্রে সময়ের চলা ছিল পিছনের দিকে। 'এখন' আর 'এখানে' গোপাল হালদারেরও অবলম্বন—'কিন্তু তাঁর রচনায় ভবিষ্যৎ অতীতের দিকে ঝাঁপিয়ে যায় না, অতীত ঝাঁপ দিয়ে চলতে চায় ভবিষ্যতের দিকে'—স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতের অন্যোন্যনির্ভর প্রবাহপ্রতিম অচ্ছেদ্যতায় 'ত্রিদিবা'-র অমিত জানে বর্তমানকে ঠেলে ফেলে সত্তার শুদ্ধ স্বরূপকে অঙ্গীকার সম্ভব নয়। প্রুস্ত চেয়েছিলেন সময়ের বিশুদ্ধ সত্তাকে ধরতে। অমিতও ঐরকমই একটা কিছু চেয়েছে, কিন্তু তার চাওয়ার প্রকৃতিটা আলাদা—অমিত জেনেছে সময়ের অবিকল সৎস্বরূপ তার প্রবহমানতায়। সময়ের স্রষ্টার কাছে একটা বিচ্ছিন্ন দিনের কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই। কিন্তু সময়ে আরূঢ় ব্যক্তিসত্তা জানে এক একটি দিন প্রত্যেকে তার নিজের মতো করে একই সঙ্গে স্মৃতিবহ ও বার্তাবহ। তাই প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর দিশাহারা বিষণ্ণ মন্থরতার জয়েসীয় জৃম্ভন ক্লান্তিকর। কিন্তু ইতিহাসেরই কঠিন নির্দেশে ভারতবর্ষে ইংরেজের কলোনির মধ্যবিত্ত

স্বপ্নে ও পুরুষার্থে নানা ভাঙচুর—'আগামীকাল ঝুঁকে তাকায়' সেখানে বাস্তবসত্য। সে জন্যই অমিতের তিনটি দিন অনন্তের নিজস্ব স্বাক্ষরে মুদ্রিত। সে যুবকের লক্ষ্য ছিল সামনে। ভাঙতে ভাঙতে গড়তে হয়—এ তো সমাজবিপ্লবের তত্ত্বে দীক্ষিত ব্যক্তির উপলব্ধ শাশ্বত ইতিহাসসত্য। ব্যক্তির জীবনে তার অভিব্যক্তি লক্ষণীয়। ব্যক্তিকেও এগিয়ে চলতে হয় ছোট আমির নানা আবরণ ছিঁড়তে ছিঁড়তে। এটা শুধু তার বৃহত্ত্বকে অর্জন করার ব্যাপার নয়। নিজ ভূমিকাকে নির্ভুল করে তোলার ক্লান্তিহীন প্রয়াস সেখানে আসল কথা। চিন্তাবিলাসী বিশ্ববিহার একপ্রকারের পলায়ন। এখানে সে প্রয়াসের মূল লক্ষ্য হল বিশ্বকে নিজের মধ্যে আহ্বান। যে অনন্বয়ের বিষণ্ণতা তখনকার য়ুরোপীয় সাহিত্যে ভারী হয়ে উঠছিল, যে অনন্বয়ের তাড়নায় যখন আমরা বলে ফেলতে চাইছিলাম—যা একান্ত ব্যক্তিগত তাই পবিত্র, সে সময়ে অমিত বলতে চেয়েছে উল্টো কথা। আমরা এখানে আবার শঙ্খের লেখাটি থেকে কিছুটা তুলে দিচ্ছি—'যখনই কোনো কাজের দায়ে এসে পৌঁছই আমরা, তখনই বুঝতে পারি যে, নিজেকে নিজের থেকে ছাড়িয়ে নেওয়াই হল আমাদের প্রধান এক সমস্যা, কেননা সকলের সঙ্গে মিলবার পথে আমাদের অহংই হয়ে দাঁড়ায় বড়ো বাধা। আত্মসচেতন মানুষ বুঝতে চায় সেই বাধার পরিমাণ, অতিক্রম করতে চায় তাকে, তার আত্মপরিচয় ক্রমে বিস্তারিত হয়ে দেখা দিতে থাকে তার দেশের পরিচয়ের মধ্যে, তার কালের পরিচয়ের মধ্যে।' সুতরাং ব্যক্তির লড়াই অহরহ চলে অহংরূপী বাধার সঙ্গে। আত্মাবগাহন ও আত্মমোচন চলে একই সঙ্গে।

।। পাঁচ ।।

সচেতন পাঠক 'ত্রিদিবা'-কে এখন সমগ্র উপন্যাস রূপেই দেখতে চাইবেন। কাজেই একক উপন্যাস হিসাবে 'একদা' 'অন্যদিন' ও 'আর একদিন'-এর তুলনামূলক বিচার অবশ্য করণীয় নয়। যদি এ প্রশ্ন ওঠেই—উঠতে তো পারেই, ড. অশ্রুকুমার সিকদার তাঁর 'রাজনৈতিক বাস্তবতা ও ত্রিদিবা' শীর্ষক বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় বলেছেন, 'একদায় বাস্তবতাগুণ তুলনায় কম।' বলেছেন 'নায়কের এই দ্বিধার ফলেই যেন একদা উপন্যাসে আমরা লক্ষ্য করি ঘনীভূত বাস্তবতার অনুপস্থিতি'। অশ্রুকুমারের যুক্তির সারবত্তা চ্যালেন্‌জ্ না করেও বর্তমান প্রবন্ধকার তাঁর ব্যক্তিগত পক্ষপাত মেলে ধরতে চান 'একদা'-র প্রতি। সে কারণটা ঐতিহাসিক নয়, প্রাতিস্বিক। সংশয়ে আন্দোলিত অমিত আমাদের বেশী স্পর্শ করে। Time is out of joint—এ বোধ যার থাকে তার হ্যামলেটীয় দোদুল্যমানতা স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা দুয়ের কাছেই অর্থগূঢ়, স্পর্শগম্য এবং ত্রিমাত্রিক তো বটেই, তার থেকেও বড় কথা সেই বোধের জন্যই 'একদা'-র অমিত হয়ে ওঠে একটা সময়ের প্রতীকী চরিত্র। 'ত্রিদিবা'-র টেক্‌নিক অমিতের মুখচ্ছদ নয়, তার মনোলোকের উন্মোচক। সত্তার অভঙ্গ দর্পণ

এবং বাস্তবের স্থিরীভূত রূপ দুইই যখন দুর্লভ তখনই এই টেক্‌নিকের অনিবার্যতা। একদা'-য় অমিতের যে দ্বিধা, দোদুল্যমানতা ও সংশয়ের কথা বলা হচ্ছে তা তার খণ্ডীভূত অস্তিত্বের ফল। তার লড়াইটা সেই খণ্ডীভবনের বিরুদ্ধে। অমিত—'একদা'-র অমিত কখনো ব্যক্তিগত চিন্তায় অভিভূত হয়ে যায় না—ডুবে যায় না নিভৃত ভাবনা অতল নীরবতায়। ভাবনার নানা তরঙ্গের অহরহ কাটাকুটি চলছে। সে দায়িত্ব স্বীকার করতে চায় বলেই রাজনৈতিক চরমপন্থীদের জন্য অর্থসংস্থানের চেষ্টায় বের হয়। যে সময়ে সে কলকাতার পথে পথে ধাবমান তখন ইংরেজের পুলিশের চণ্ড দমননীতির দৃশ্যে সে বিচলিত হয়। তার অপরাধবোধও এই সঙ্গে শেক্সপীয়রের অমর নায়কের ভাবনাপুঞ্জের সঙ্গে তুলনীয়। হ্যামলেটের বিশ্ববিখ্যাত স্বগতোক্তির মধ্যে মনস্বী সমালোচক পেয়েছেন শুধু অন্তর্গত একোক্তি নয়, তার সঙ্গে চেতনাপ্রবাহের পরিচয়। অনুষঙ্গের পর অনুষঙ্গে আপাত অগ্রথিত ভাসমান ভাবনাপুঞ্জ থেকে রূপ ধরে হ্যামলেটের দীর্ণ সত্তা ও ভগ্নমূর্তি বাস্তব। সে বিচারে 'একদা'-র অমিত তার সময়ের আন্তর্জাতিক মানের চরিত্র। যে-অর্থে জাঁ পল সার্ত্রে-র প্রখ্যাত ট্রিলোজির নায়ক দায়িত্বগম্ভীর বিষণ্ণতায় চলিষ্ণু, ভিন্ন পটে, ভিন্ন প্রসঙ্গে, ভিন্ন দেশে কিন্তু একই কালে অমিতও তাই। সময়কে সে অভিশপ্ত জ্ঞান করছে না। শুধু নিজের অশেষ দায়িত্বভার দেখে সে উদ্বিগ্ন হচ্ছে। এ জন্যই অমিত—'একদা-র অমিত আজও আধুনিক। তার অমীমাংসা আমারই, আমাদেরই অমীমাংসা। অথচ সে অমীমাংসা সত্ত্বেও সময় আমাদের ছাড়ে না। 'একদা'-র সমাপ্তি তার প্রমাণ।

কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমরা অনুবর্তী আর দুটি দিনের কথাকে তাদের প্রাপ্য মূল্য দিচ্ছিনা। 'অন্যদিন' এবং 'আর একদিন' এই দুই খণ্ডে আমরা অমিতের আত্ম মোচনের অনিবার্য দুই স্তরকে প্রত্যক্ষ করলাম। সে আত্মমোচনের প্রধান শর্ত সময়ের বিশুদ্ধ সত্তাকে অনুধাবন ও অবধারণ—সেই নিজের অবৈকল্যকে খুঁজে ফেরা। 'অন্যদিন' শেষ হচ্ছে অমিতের এই উপলব্ধিতে—'ইতিহাস ক্ষমাহীন, কারণ ইতিহাস সৃষ্টিশীল। আমি অমিত ইতিহাসের ছাত্র; ইতিহাসের অস্ত্রও। ক্ষমা করিলেও ক্ষমাহীন বন্ধুর পথের পদাতিক আমি, স্বাগত করি ইতিহাসের সৃষ্টি-শক্তিকে।' তখন রাত শেষ হয়ে আসছে। কারখানার দিকে চলেছে শ্রমিক জনতা। বুঝি অমিতের ইতিহাস চেতনা তাকে পৌঁছে দিল নতুন ভূমিকায়। সেই ইতিহাসের আহ্বান আরো বেশী মুখর হয়ে উঠল—'শ্রমিকের পথ, বুদ্ধিজীবীর পথ, কর্মজীবীর পথ; কবিতার পথ, বিজ্ঞানের পথ, স্বাধীনতার পথ, মানবতার পথ, জীবনের পথ, সৃষ্টির পথ, সকল যাত্রীর সকল পথ কোথায় মিলিতে চলিয়াছে আজ? না মানুক ইন্দ্রাণী, না বুঝুক আর কেহ অমিত তাহা দেখিতে পাইতেছে এই মুহূর্তে: নানা মানুষের বড় 'আমি'-র তপস্যা।' সেই বড় আমিকে পেতে হলে সব মানুষের মুখে খুঁজে নিতে হবে ভাবী মানুষের মুখচ্ছবি, সৃষ্টির সুমহৎ স্বাক্ষর: Man the Maker; লক্ষণীয় বার বার 'গতিমান' মানুষের কথা উঠেছে। সেটাই আসল কথা। সে গতিশীলতা যুগপৎ সামনের দিকে ও ভিতরের দিকে। পরিণতির

দিকে ও গভীরের দিকে। এইভাবে যে চলে সে মুক্তি পায় ছোট আমির বন্ধন থেকে। সেজন্যই কেন যে অশ্রুকুমার বলেন—'একদা' যেন পাতলা হাওয়ার বই, তা বুঝতে পারি না। তিনি কি 'একদা'র অবজেক্টিভ কোরিলেটিভের প্রসঙ্গে একথা বলেন? 'ঘনীভূত বাস্তবতা'র কথাও কি এ জাতীয় মানসিক বাতাবরণ-প্রধান উপন্যাস ক্ষেত্রে উঠবে? 'একদা'-র অমিতের বাস্তব পরিমণ্ডল নয়, তার মানস পরিমণ্ডলের চরিত্রই ছিল লেখকের লক্ষ্য। কোন্ অমিত 'অন্যদিন'-এ এবং 'আর একদিন' এ রূপান্তরিত হচ্ছে—'একদা'র সেই চারিত্র্যই ছিল আসল কথা। ভাবনার বহতা বাতাসকে ধরে নিয়ে তাকে মূর্তিদান অবশ্যই কঠিন। চলন্ত ট্রেনকে বুঝতে গেলে বাইরের দিকে তাকাতে হবে—একথায় কোনো ভুল নেই। কিন্তু গতিস্পন্দিত বস্তুকে বুঝে নেবার আরো উপায় আছে। 'একদা'র অমিত যত বেশী মন্ময় একদার অমিত শিল্প সৃষ্টি হিসাবে তত বেশী সার্থক। সে যখন ভিতর থেকে পরিবর্তিত হচ্ছিল, ধীরে ধীরে খসে যাচ্ছিল তার মন্থরতা শিল্পের বিচারে সেটাই বেশী উপভোগ্য।

'একদা' 'অন্যদিন' এবং 'আর একদিন'-এ অমিতের প্রতিটি চিন্তা-তরঙ্গই বিশেষ তাৎপর্যময়। প্রতিটি স্মৃতি খণ্ড, প্রতিটি অনুষঙ্গবাহিত ভাবনা যেন অভিজ্ঞতার পুনর্নবীকরণ। এই পুনর্নবীকৃত অভিজ্ঞতা প্রতি পদক্ষেপে প্রমাণ করছে অমিতের চলা কেবলই সামনের দিকে। মঞ্জুই শুধু নয়, কানাই হাজরাই শুধু নয় প্রত্যেকটি চরিত্রপাত্র সংস্পর্শে জ্বলে উঠেছে জীবনের এক একটা ছবি। সে ছবি মানুষের অপরাজেয়তার ছবি বললে বলা যায় বটে—বোধ হয় তার থেকে বলা ভাল সে ছবি মানুষের অন্তহীনতার ছবি। মানুষ নিজেই নিজের রচয়িতা। কিন্তু ইতিহাসের মত তারও স্বনির্মাণ কী ইতিহাসের কার্যে কারণে নিয়ন্ত্রিত নয়। ব্যক্তির স্বাধীনতার প্রশ্ন তার আত্মরচনার ক্ষেত্রে উঠতে বাধ্য। কিন্তু সে স্বাধীনতার আসল কথা হল বাস্তবতাকে স্বীকৃতি। বাস্তবতাবোধই ঠিক করে দেয় কী প্রয়োজনীয়, কী নয়, ঠিক করে দেয় পূর্ণতার পথে, অন্বয়ের পথে কী গ্রাহ্য, আর কী পরিহার্য। অমিত সেই নির্মাণের জন্য বারে বারে আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছে। এই জাগ্রত জিজ্ঞাসার কারণেই তার কখনো সংশ্লিষ্ট কারো সম্বন্ধে আগ্রহ হারিয়ে যায় না। ইন্দ্রাণী হোক, আর সবিতাই হোক, কী হোক, ক্লান্তিহীন ট্রাম শ্রমিক—মধ্যবিত্ত, শ্রমিক বা কৃষক যে যার জীবন ভাষ্য অর্জন করতে কেমন ভাবে চলছে, তারা সবাই অমিতকে স্পর্শ করেছে নানা দিক থেকে।

এ আঙ্গিক রীতিতে কেমনভাবে মূর্ত হয় 'ইনার ড্রামা' বা অন্তর্গূঢ় নাটক তার দুটি নিদর্শন, 'একদা' থেকে একটি আর 'অন্য দিন' থেকে একটি এখানে আমরা স্মরণ করবো। 'একদা' থেকে স্মরণ করছি সাতকড়ি এপিসোড।—

"শীতের রৌদ্র সাতকড়ির গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। পুরো গাল দুটিতে এখন চাতুর্যের আন্দোলন চেষ্টাটুকুও নাই—সমস্ত হারাইয়া স্থাণু মাংসপিণ্ডের মতো।

তাহা জড় হইয়াছে; চোখ তাহার দীপ্তিহীন; ফর্সা রঙ ঔজ্জ্বল্য হীন, লাবণ্যহীন—সেই সাতকড়ির মুখে একি কথা? মনে হইল, যেন শৈলেন ফিরিয়া আসিয়া বলিতেছে—I sing the great tragedy of this life—কিন্তু এ তো শৈলেন নয়, এ যে সাতকড়ি।' এখানে বাস্তব রসের কিছুমাত্র ঘাটতি হয়েছে বলে মনে হয় না। সাতকড়ির অমিতকে বাগানবাড়িতে নিমন্ত্রণ, সরকারী চাকুরির প্রলোভন, ল' পড়ার পরামর্শ এবং সব শেষে নিজেই ভেঙ্গে পড়া—কাহিনী রস হিসাবে তা যেমন টানে, ঠিক তেমনি শৈলেন-স্মৃতি সহসা অনিবার্য হয়ে সাতকড়ি এপিসোডকে দেয় একটা নতুন মাত্রা। সাতকড়ির আভ্যন্তর পরাজয়ের সহসা প্রকাশে যে সূক্ষ্ম নাটক তা মধ্যবিত্ত জীবনেরই চাকচিক্যময় দৈন্যদশার ছবিটিকে ধরিয়ে দেয়।

আবার 'অন্যদিন'-এ 'গৃহাঙ্গন' অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ জেল থেকে অমিতের বাড়ি ফেরার প্রত্যক্ষ ঘটনার বিবরণ। এখানেও যাকে বলা যায় অন্তর্গত একোক্তি, তার স্রোত কম। স্রোত বেশী সেদিনের বিশেষ কতকগুলি সরাসরি সাক্ষাতে ও সংলাপে। এই কম বেশীর মধ্যেও স্মৃতি ও প্রত্যক্ষের মধ্যে একটা ক্ষান্তিহীন টানাপোড়েন আছে। ওঘর—'ইহাই ছিল মায়ের ঘর'। ওই ঘরে বাবা এখনো বিশ্রাম করিতেছেন......'ওই ঈজি চেয়ার হইতে উঠিয়া পুলিশ পরিবৃত অমিতকে সেদিন তিনিই স্থির নিষ্কম্প কন্ঠে বলিয়াছিলেন, 'এসো'। সে তো কন্ঠস্বর নয়, যেন অভয়মন্ত্র—'অভীঃ অমিত, অভীঃ'। আজ সেই পিতাই গহাঙ্গনে পুনরায় আহ্বান করলেন 'এসো' বলে। কিন্তু সেদিনের পিতা ও আজকের পিতার মধ্যে কত প্রভেদ! এ যেন 'জীবনের শেষ পংক্তি দিয়া মৃত্যুর পাদপূরণ মাত্র'। বাবার সঙ্গে অমিতের এই পুনঃসাক্ষাতে অতীত ও বর্তমানে মেশামেশি, আর তার ভিতর দিয়ে অনুভূত হল অমিতের জীবনভাষা—জীবন আগাইয়া গিয়াছে, তুমি আগাইয়া গিয়াছ—Life Marches. কিন্তু তাহা মুছিয়া যায় নাই, ছয় বৎসর আগের সেই তুমিও এই পিতৃচেতনায় এইরূপ বাঁধা পড়িয়া আছ। তুমি তোমার চলমান জীবন লইয়া সেই বাঁধা পড়া তোমার পরিচয়কে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া আর পিতার মনে নতুন করিয়া তুলিতে পারিবে না। এই ক্ষীয়মান, বালুকালুপ্ত চৈতন্য প্রবাহে তুমি, অমিত, তোমার ধাবমান চিন্তা ভাবনা চেতনার ধারা আর মিশাইতে পারিবে না।'

এই অনন্ত অন্তর্গূঢ় নাটকেরই দান এই টেকনিক। 'চেতনার ধারা' 'চৈতন্য প্রবাহ' শব্দগুলি অমিত সচেতন ভাবেই ব্যবহার করেছে। তার কাছে, ব্রজেনবাবুর কাছেও ইতিহাসের ধারাই হয়েছে চেতনার ধারা। তা সে ব্যক্তি জীবনের ইতিহাসই হোক, আর মানব সমাজের ইতিহাসই হোক। সে ধারা আলোক অভিমুখী। অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে মানুষের নিরন্তর যাত্রা—চেতনার স্রোত আবর্তের মধ্যে পড়ে বটে, কিন্তু তা কখনো পিছু হটে না। অমিতের চৈতন্য প্রবাহের একটা বৈশিষ্ট্যের দিকে ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের তত্ত্বাবধানে গবেষণারত অধ্যাপক অশোক সিংহরায় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছেন। সেটি হল 'একদা' পর্যায়ে আলো অন্ধকারের ইমেজের ও প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্ত ব্যবহার। 'একদা'র শুরুতে কলকাতার শীতের ঘোলাটে ধোঁয়াশার উল্লেখ, তার পরে সকালের উজ্জ্বল রৌদ্র। 'একদা'-র শেষে, 'অমিতের চোখে পড়িল, ভোরের আলো আসিতেছে। অন্ধকার সরাইয়া নতুন দিনের বাতায়ন খুলিতেছে।' এবং প্রায়ই মাঝে মাঝে আছে আলো ঃ অন্ধকার ঃ রৌদ্র ঃ ছায়ার পরিভাষায় অমিতের আত্মকথন। 'বাড়িগুলির শিশির ভেজা গায়ে সকালবেলাকার সূর্যালোক', 'উপরে রৌদ্রময় তাম্রাভ আকাশ' 'শীতের রৌদ্রে দাঁড়াইয়া অমিত দেখিতেছে', 'সূর্যই প্রাণের আধার' 'অমিতের চোখে ফুটিল পূর্ব আকাশের পটে সেই মাতৃমূর্তি' 'ললিতা—অমিতের চোখে যেন এখনও সে স্পষ্ট...প্রভাতের একটি উজ্জ্বল কিরণ রেখা—', 'সম্মুখের আলমারির কাচে রৌদ্রের আঁচ আসিয়া পড়িয়াছে', 'শীতের রৌদ্র সাতকড়ির গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে'—এভাবে বারে বারে এসেছে আলোর প্রসঙ্গ। অমিত যতই শেক্‌সপীয়র অনুরাগী হোক, যতই সে হ্যামলেটীয় ভাবনা পুঞ্জের স্মৃতিধর হোক, আসলে সে রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষ। রবিকরোজ্জ্বল এই দেশের অবারিত আলোই অমিতের অধিষ্ঠাতা আবেগ। অন্ধকার নয়, আলোর দিকেই তার যাত্রা। আলো ঃ চেতনা ঃ বই ঃ মুক্তি তার কাছে সমার্থক। এ জন্যই তার মধ্যে এমনকি 'একদা' পর্যায়েও দোদুল্যমানতা নেই। যা আছে তাকে বলা চলে প্রস্তুতির ভূমিকা।

'একদা'-য় প্রত্যক্ষদিনটা শীতের, 'অন্যদিন'-এ শরৎ, 'আর একদিন'-এ বসন্ত। যে জাতীয় আঙ্গিকরীতিতে 'ত্রিদিবা' লেখা, তাতে প্রত্যক্ষ দিনের সীমা ছাড়িয়ে স্মৃতিলোকের দিকে বারবার সন্নিহিত হওয়া, সেখান থেকেই ধীরে অভিজ্ঞতার মাত্রাকে নতুন করে তোলাটাই আসল কথা। তথাপি শীত, শরৎ, বসন্তের তিনটি দিন যেন ইঙ্গিতে আমাদের ধরিয়ে দিচ্ছে অমিতের জীবনেরই তিনটি পর্যায়—পুরাতনের অবসান, যাত্রার উদ্যোগ, যাত্রারম্ভ। শেষ খণ্ডে প্রিজন ভ্যানের মধ্যে সকল সহযাত্রীর পুনর্মিলন—নবীন প্রাণের বসন্তের বার্তাবহ। পুরানো ঝরা পাতা পায়ে দলে পথিক বসন্ত, বাউল বসন্ত এগিয়ে চলে।

এবং সেই সূত্রেই আরেকটি কথা আমরা বলব। গোপাল হালদারের 'ত্রিদিবা'-র উপন্যাসত্রয়ীর আলোচনাকালে একাধিক সমালোচক একাধিকবার জয়েস, প্রুস্ত প্রমুখের উল্লেখ করেছেন। সে উল্লেখ অপরিহার্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে আন্তর্জাতিক মহাকালের জ্যোতিষ্ক নয়, স্বাদেশিক আকাশের সূর্যই তাঁর রচনায় আলো ফেলেছে বেশী। রবীন্দ্র-ঐতিহ্যপুষ্ট অমিত—তাই তার 'বড়ো আমি'র দিকে নিরন্তর যাত্রা। সেই ঐতিহ্য থেকেই অমিত সংগ্রহ করে নেয় পথের দীক্ষা, অভীঃ মন্ত্র। বের্গসঁয়ের গতিবাদ যেন অমিতেরও চলিষ্ণু জীবনের প্রাণশক্তি—টু এক্‌সিস্ট ইজ টু চেন্‌জ। নিজেকেই সৃষ্টি করতে থাকা। অন্তহীন সেই সিসৃক্ষায় প্রতিদণ্ড, প্রতি মুহূর্ত যেন একদিকে বলছে নিজেকে জানা ফুরোবে না, আরেকদিকে বলছে—আমারে তুমি অশেষ করেছ। সেজন্যই বলতে ইচ্ছা করে, জয়েস বা প্রুস্ত অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথেই অমিত ও অমিতের স্রষ্টাও প্রেরণা পেয়েছে বেশী।

৮৭, অরবিন্দ রোড
নৈহাটি
উত্তর চব্বিশ পরগণা

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

একদা

দূর—বহুদূর-প্রসারিত—জীবনের বিচিত্র দৃশ্যসম্ভার। আঁধারের পর্দা সরাইয়া প্রতি প্রভাত তাহার সম্মুখে খুলিয়া দেয় এক-একটি নূতন দিনের বাতায়ন: দিন-রজনীর পথে মানুষের প্রতিদিন চলিয়াছে সেই চির-নূতন চির-রহস্যের পরিচয় —জানায় ও অজানায়। এক-একটি দিন—তুচ্ছতায় ভরা সামান্যতম এক-একটি দিনও—এই রহস্যের ভারে সমৃদ্ধ—চিরদিনের সূর্যালোকে উজ্জ্বল ক্ষণিক বুদ্বুদ। আবার এমনই দিনের মধ্যেই সমকালের কোলাহল-আয়োজনও রাখিয়া যাইতেছে তাহার মুখর ধ্বনি। এক-একটি দিন যেন তীব্র, রূঢ়, ছন্দো-হীন খণ্ড খণ্ড ধ্বনির টুকরা। দিনে দিনে মিলাইলে তাহাই রূপ-পরিগ্রহ করিয়া ইতিহাসের মধ্যে বাণীমূর্তি লাভ করে—সমগ্রতার মধ্যে তখন চোখে পড়ে অর্থহীন এক-একটি সেই ছন্দোহীন দিনের ছন্দ ও অর্থ। মানুষের জীবনের এক-একটি দিনও যেন কালের এই যাত্রাপথের এক একটি মুক্ত বাতায়ন।

চিরকালের প্রাণলীলার, সমকালের আবর্ত-প্রবাহের আলোড়িত বুদ্বুদ এক-একটি দিন। এমনিই একটি দিনের কথা—

এক

আটাশে অগ্রহায়ণ, তেরোশো সাঁইত্রিশ সাল। মহাকালের পথের উপরে, সমকালের যাত্রাপথের ধারে, সে একটি দিনের বাতায়ন খুলিয়া গেল।

শীত বেশ পড়িয়াছে—কলিকাতাতেও তাহা টের পাওয়া যায়। দিনের বেলা শহরের উপরে কালো ধোঁয়ার ভার জমিয়া থাকে, সন্ধ্যা না হইতেই মাথার উপরকার ধোঁয়ার জটা শহরের বুকের উপর ছড়াইয়া পড়ে। পাতলা কুয়াশার বসন তখন মাথায় তুলিয়া দিয়া আজব শহর কলিকাতা পথ-ঘাট, পার্ক-ময়দান, গাড়ি-বাড়ি সকলের উপর সেই সাদা আঁচল বিছাইয়া দেয়। ট্রাম, বাস, পথের আলোর রূপ তাহার অন্তরালে মাতালের ঘোলাটে চোখের মতো হইয়া দাঁড়ায়। একটু রাত্রি হইতেই জনস্রোতে মন্দা পড়ে, যানবাহনের কোলাহল স্তব্ধ হইয়া আসে, রকের উপরের চিরদিনকার সভাগুলি ও চায়ের দোকানের জমাট আসর কয়টি ভাঙিয়া যায়—বোঝা যায় শীতের তাড়ায় তাহাদের তপ্ত পলিটিক্‌সও আর তাহাদের গরম করিয়া রাখিতে পারে না। অনেক পরে-পরে ট্রাম, বাস, মোটর গাড়ি এক-একবার শীতের জড়তা ও নিঃশব্দতা ভাঙিয়া বাহির হয়—মনে হয় যে, তাহারা হি-হি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে

ছুটিতেছে। জনবিরল ফুটপাথে পদধ্বনি তুলিয়া সিনেমা-থিয়েটারের ফেরতা পথিক চলিতেছে---কিন্তু তাহাদের উচ্ছ্বসিত আলোচনা আজ শীতের চাপে মুখ ফুটিয়া বাহির হইতেছে না। তাহাদের পায়ের শব্দের দ্রুত তালে বোঝা যায় যে, শীতের কুয়াশা তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছে। তাহারই আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে আবৃত করিয়া তাহারা ছুটিতেছে---সম্মুখের তরঙ্গায়িত কুয়াশা ভেদ করিয়া গৃহে না পৌঁছাইলে আর ভরসা নাই।

মোটের উপর শীত এবার কলিকাতায় বেশ জমাইয়া বসিয়াছে। সকালবেলা লেপ আর ছাড়িতে ইচ্ছা যায় না; রাত্রিতে আহারের পরে লেপ টানিয়া লইতেও দেরি সহে না। উপভোগ করিবার মতোই এ শীত---হিমেল, কনকনে বাতাস; পৃথিবী ও আকাশ-জোড়া কুয়াশা; দুপুরের রৌদ্রের গায়েও যেন একটা ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস লাগিয়াই থাকে।

কাঁধের কাছে লেপটা বোধহয় একটু সরিয়া গিয়াছিল, ওখানটায় যেন খানিকক্ষণ ধরিয়াই কেমন শীত-শীত ঠেকিতেছে---আধঘুমে অমিত লেপটা টানিয়া লইতে গেল। টানিয়া লইয়া বেশ আরামে একবার পাশ ফিরিয়াও শুইল। কিন্তু আধঘুমের আধখানাও এই আরামের প্রয়াসে নিঃশেষ হইয়া গেল। চোখ মেলিতেই অমিত দেখিল, সম্মুখের নীচু বাড়িখানার ওপারে তেতলা বাড়িটির উপরকার পূর্ব আকাশ বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অভ্যাসমতো সে বালিশের নীচে হাত বাড়াইয়া দিল---ঘড়িটি বাহির করিয়া বেলা দেখিবে। কিন্তু হাতে ঘড়ি ঠেকিল না। মনে পড়িয়া গেল, ঘড়ি এখানে নাই। চোখের কোণে যে ঘুমটুকু যাই-যাই করিয়াও যায় নাই, এবার তাহা ছুটিয়া পলাইল।

লেপটা খানিকটা সরাইয়া হাত দুইখানা বাহিরে টানিয়া লইয়া অমিত শুইয়া রহিল। ঘড়িটি কাল শেষ হইয়া গিয়াছে---তাহার মূল্য তেত্রিশ টাকা---নোটে ও টাকায় পাশের আলনায় পাঞ্জাবির পকেটে এখনও ঝুলিতেছে। সুনীলের একটা ব্যবস্থা হইবে---অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়াছে। ঘড়িটির নূতন দাম বেশিই ছিল; বোধহয় পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন, ঠিক জানা নাই। যেবার অমিত এম. এ. পরীক্ষায় বাড়ির সকলকার আশা ব্যর্থ করিয়া সত্যি-সত্যি ভালো পাস করিল, কিন্তু সোনার মেডেল পাইল না, সেবার তাহার সম্পর্কিতা বউদি ইন্দ্রাণী এই সোনার ঘড়িটা তাহাকে দিয়া নিজের ভালবাসা জানাইয়াছিলেন।

ঘড়িটার দাম সে কিছুতেই বলে নাই। অমিত জিজ্ঞাসা করিলেই চপল ইন্দ্রাণী বলিত, কেন? আপনার সোনার মেডেলটার থেকে এটাতে সোনা ওজনে কম আছে বুঝি?

অমিতের কৌতূহল নিরস্ত হইত না, বলিত নিশ্চয়ই।

তা হলে শিগ্‌গিরই বিয়ের আসরে বাটখারা নিয়ে তৈরি থাকবেন, সোনাটা ওজন করে তখন বুঝে নেবেন।

অমিত তথাপি হটিত না; মানুষটার অপেক্ষাও যে তাহার গায়ের গয়নার মূল্য বেশি, স্বজাতি সম্বন্ধে এমন সত্য-বিচার আপনি ছাড়া কে করতে পারত? যাক্, এখন কত পড়েছে বলুন তো?---সেকেণ্ডহ্যাণ্ড যখন, তখন আর কতই বা পড়বে? টাকা পনেরো, না?

সেকেণ্ডহ্যাণ্ড! চমৎকার! চোরাবাজারে বুঝি অমনই দাম পড়ে? নতুন জিনিস তো আপনি কখনও কেনেন নি! কিন্তু অমিতবাবু, তা হলে বড্ড ঠকেছি।

কতটা ঠকেছেন শুনি? কোন্ দোকানে গেছলেন?

ইন্দ্রাণী মাথা দোলাইয়া বলিল, তা হচ্ছে না, ওটি আর বলছি না। অচল ঘড়িটা আপনাকে দিয়ে যে কতটা আপনাকে ঠকালুম, সেটি আর আপনি জানতে পারছেন না।

বেশ, কত দিয়েছেন, তাই বলুন। দামটা কত শুনি না?

দাম নেইক, দাম নেই। আমার হাত থেকে ঘড়িটা যে পেয়েছেন, তাতেই যে ধন্য হলেন, আবার দাম?

অর্থাৎ ও অমূল্য---এই বলতে চান?

বলতে চাইব আবার কি? ও তাই, তাই।

কথাগুলি কালই অমিতের বার বার মনে পড়িতেছে। ঘড়িটা তুচ্ছ নয়।

বৎসর ছয় পূর্বে ইন্দ্রাণী তাহাকে সাদরে উপহার দিয়াছিল ঘড়িটা। তারপর সে চলিয়া গেল টাটানগরে তাহার ব্যারিস্টার স্বামীর নিকটে। তারপরে কত অধ্যায় তাহার জীবনেই না ঘটিল। বৎসর তিন পরে চৌধুরী অকস্মাৎ জীবিকা-অন্বেষণে চলিয়া গেলেন সিঙ্গাপুরে। লোকে বলে, সেখানে তাহার সহচরী তাহার সমান প্রবাসের সঙ্গিনী। ইন্দ্রাণী ফিরিল কলিকাতায় শিশুপুত্র লইয়া। সংসারে অভাব তাহার নাই,---সেদিকে মিস্টার চৌধুরী কার্পণ্য করেন নাই, বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে ইন্দ্রাণী রহিল স্বগৃহে। কিন্তু সংসারের চোখে ইন্দ্রাণী সম্মানের দৃষ্টি পাইল না। অর্ধেক সংসার তাহাকে কৃপা-মিশ্রিত দৃষ্টিতে সহানুভূতি জানাইতে-আসে---অসহ্য। তাহা ইন্দ্রাণীর। বাকী অর্ধেক ইন্দ্রাণীর দর্পিত, স্বাধীন জীবন-যাত্রার পিছনে দুই-একটা নিগূঢ় রহস্য কল্পনা করিয়া লইল---মিস্টার চৌধুরীর কার্যের কারণসূত্র তাহারা আবিষ্কার করিয়াছে, এই তাহাদের সগর্ব বিশ্বাস। ইন্দ্রাণীর উদ্দীপ্ত উপেক্ষায় তাহাদের আক্রোশ বাড়িয়া যায়। ইন্দ্রাণী এই অ-সহজ অবস্থাটাই সহজ বলিয়া প্রমাণ করিতে চায়---পৃথিবীকে সে জয় করিবেই, এই তাহার সঙ্কল্প। বরাবরই অমিতকে সে খুঁজিয়া লইত জোর করিয়া। টাটানগরে থাকিতেও অমিতকে সে নানা কাজে ডাকিত। কিন্তু অমিতের দেখা পাওয়া ভার,---তাহার ছিল ইতিহাসের গবেষণা, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের আড্ডা, তাহা ছাড়া নানা পলিটিক্যাল নেশা। এদিকে মেয়ে-ইস্কুলের আয়োজনে, সঙ্গীত-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায়, কলা-সমিতির পরিচালনায়, সবখানে ইন্দ্রাণী আপনার অর্থ ও শক্তি লইয়া উপস্থিত হয়। তাহার প্রাণাবেগ কোথাও স্থির

হইতে চায় না। সব সে ধরিল, সব সে ছাড়িল---ঝড়ের মতো আবেগ লইয়া ইন্দ্রাণী আসিয়া পড়িল এই যুগের বিপুল আলোড়নের মধ্যে। সেই উন্মাদনার পথে অমিতকে সে এক রকম জোর করিয়াই ধরিতেছে আপনার পথসহায়করূপে।

ইন্দ্রাণী রাষ্ট্রীয় আবর্তনের পথে পা বাড়াইয়া দিয়াছে। আজ আছে তাহার বে-আইনী শোভাযাত্রা। কাল অফিসে আসিয়া বলিয়া গিয়াছে, তোমাকে দেখতে যেতে হবে অমিত। যেতেই হবে।

অমিতের মনে পড়িল--যাইতেই হইবে, না হইলে ইন্দ্রাণীর ভয়ানক অভিমান হইবে। কিন্তু ঘড়িটার কথা যদি ইন্দ্রাণী জানে, কি কাণ্ডই না বাধাইবে--- "তুমি আমাকে কেন গোপন করলে?" ইন্দ্রাণী ভাবিবে, অমিত তাহার শক্তিকে অবিশ্বাস করে। তাহা ইন্দ্রাণীর অপমান। অথচ অমিত জানে, ইন্দ্রাণী ঐকান্তিক প্রয়াসে আপনার শক্তি, সামর্থ্য, দেহের স্বাস্থ্য সব বিলাইয়া দিতে চায় দেশের জন্য---ঘড়ি আর কি?

কিন্তু ইন্দ্রাণী যদি জানে, অমিত তাহাকে এ ভাবে গোপন করিয়াছে, তাহাকে সুনীলদের সহায়তা করিতে দিল না, তাহা হইলে অভিমান ও অপমানে সে এমন কাণ্ড করিয়া বসিবে যে, ভাবিতে অমিতের ভয় হয়। তবু উপায় কি? এক দিকে একটা বিপুল প্রয়াসে ইন্দ্রাণী তো আপনার সর্বস্বই প্রায় বিলাইয়া দিতেছে। তাহার উপরে বোঝা চাপানো সম্ভব কি? না, অমিত কিছুতেই ইন্দ্রাণীকে আর এ ভাবে ভারাক্রান্ত করিবে না। করুক ইন্দ্রাণী রাগ।

অমিত ভাবিতে লাগিল, তেত্রিশ টাকায় আপাতত সুনীলের কিছুদিন চলিবে। টাকাটার যা দরকার পড়িয়াছিল! ভাগ্যিস ঘড়িটা ছিল! যেমন করিয়াই হোক, আজ সকালে টাকা সুনীল পাইবে, এই কথা অমিত তাহাকে দিয়াছে। অমিত ছাড়া তো আজ আর তাহার কেহ নাই। অথচ তাহার কেই বা না আছে? বাবা, মা, দাদারা, ভ্রাতৃবধূরা---তাহাদের সকলকার হাতেই অমন সোনার ঘড়ি ঢের আছে। কিন্তু উপায় নাই, সেখানে তাহার ফিরিবার উপায় নাই, সেখানে তাহার কথা তুলিবারও পথ বন্ধ। না হইলে---

কিন্তু এবার উঠিতে হয়, টাকাটা সকালেই পৌঁছাইয়া দেওয়া ভালো। অন্তত চা আর টোস্টও তো সুনীল আজ চার দিন পরে খাইতে পাইবে।

অমিত উঠিতে যাইতেছিল, মনে পড়িল, এত সকালে বাড়ি হইতে বাহির হইবার পথে বাধা আছে। বাধা তাহার মা, বাধা তাহার পিসীমা, বাধা তাহার পুরাতন ঝি। ইহা ছাড়াও বাধা আছে---পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাভগ্নী। তাহাদের বাধাটা নির্বাক কিন্তু তেমনই সবল। তথাপি উহারা মুখ ফুটিয়া কথা বলে না বলিয়া এমন ভাব দেখানো চলে যে, যেন উহাদের মতামত ও ওই সব বাধার অস্তিত্বই অমিতের জানা নাই। কিন্তু মা ও পিসীমা বড়ই গোল বাধান---উহাদের উদ্বেগ-চিহ্ন এতই স্পষ্ট যে, তাহা 'দেখি নাই' বলা অসম্ভব। তাহার উপর যখন আবার সজল ও সবাক হইয়া দেখা দেয়, তখন অসম্ভবরূপে বিব্রত বোধ করিতে হয়---যে

ফাঁকিটুকু কোনরূপে পিতা ও ভ্রাতাভগ্নীদের সম্পর্কে বজায় রাখিবার চেষ্টা সম্ভব, তাহাও তখন যেন আর অক্ষুণ্ণ থাকে না। বড়ই বিপদ।

অমিত ফিরিয়াছেও কাল বেশ রাত্রিতে---প্রায় বারোটায়। তখনও মা জাগিয়াছিলেন; পিসীমা ও পুরাতন ঝিও উঠিয়া আসিয়াছে। খুব সন্তর্পণে তাড়াতাড়ি সে খাওয়া চুকাইয়া শুইয়া পড়িবার আয়োজন করিতেছিল। কিন্তু যে কারণে চুপে চুপে এই আয়োজন করিতেছিল, তাহা ব্যর্থ হইল---পাশের ঘর হইতে পিতা খাবার জল চাহিয়া জানাইয়া দিলেন, তিনি জাগিয়াছেন অথবা ঘুমাইতে পারেন নাই। শীতের রাত্রি যে কতটা হইয়াছে, তাহাও তাঁহার অবিদিত নাই। অবশ্য ইহা নূতন নয়---অনেকদিন এইরূপ হইয়াছে। তবে আজ কয়মাস যাবৎ এইরূপ দেরি অমিতের প্রায় নিয়মিত হইয়া দাঁড়াইতেছে বলিয়াই যত গোল। বোধ হয় আর কিছুদিন পরে ইহাও বাড়িতে সকলের গা-সহা হইয়া যাইবে। তবে এখনও মাঝে মাঝে ইহা লইয়া মা ও পিসীমা স্পষ্টত বাধা সৃষ্টি করিতে চাহেন। অনেক সময় অমিতকে নিজে অভিমান-করিয়া মা ও পিসীমাদের সেই নির্বাক অশ্রু-সজল বাধা ভাঙিতে হয়। এবারকার বাধাটা এখনও স্পষ্ট হয় নাই, হয়তো শীঘ্রই হইবে। এইবেলা উহা এড়াইবার চেষ্টা করা চলে।

অমিত এইবার লেপটা টানিয়া লইল---চা খাইয়াই বরং বাহির হইবে। অত তাড়াতাড়ি সুনীলের কাছে না পৌঁছাইলেও চলিবে। তাহা ছাড়া এই শীত,---লেপ যে ছাড়িতে ইচ্ছা যায় না। করুকই না সে একটু আরাম---সারাদিন তো এক নিমিষের জন্যও নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পায় না।

অমিতের মনে পড়িল, সুনীলের লেপ নাই---একটা 'রাগে'র উপর নিজের দামী কাশ্মীরী শালখানা বিছাইয়া সে গায়ে দেয়। 'রাগটা'ও জুটিয়াছে অল্পদিন, তাহাও ঘটনাক্রমে। কেমন করিয়া ইন্দ্রাণী শুনিল---সে ছেলেটির রাত্রিতে গায়ে দিবার মতো কিছু নাই। তৎক্ষণাৎ সে অস্থির হইয়া উঠিল, তাকে আমার বাড়ি নিয়ে এস অমিত। অনেক বলাতে যদি বা এ জিদ ছাড়িল, ছুটিল সুনীলের সঙ্গে দেখা করিতে রাত-দুপুরে সে পাড়ায়; গোপনে অমিতকে দিল এই 'রাগ' আর পঁচিশটা টাকা।

রাগটা ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই সুনীলের হাতে পৌঁছিল। সুনীল খুশি হইল না ---এই সময়ে এই খরচটা না করিলেও চলিত, ত্রিশ টাকা নিতান্ত কমই বা কি? অমিতদার বড় বাজে চিন্তা---সুনীলের শালখানাই যথেষ্ট। কাশ্মীরের শাল, ভালো শাল; মাত্র গত বৎসর তাহার বড় বউদি তাহাকে শখ করিয়া কিনিয়া দিয়াছেন। কলিকাতার শীতে ইহাই যথেষ্ট। বিশেষত এখানকার এই দর্জির দোকানের কাপড়ের গাদা পাতিয়া রাত্রিতে শুইতে পারা যায়, মোটেই শীত সহিতে হয় না।

অমিত স্বীকার করিল, ভুল হইয়াছে। তবে দাম তো দিতে হয় নাই। আর যদি ইতিমধ্যে সুনীল তেমন নিঃসহায় হইয়া পড়ে, তবে রাগটা বিক্রয় করিয়া দিলেও দুই-চার টাকা পাওয়া যাইবে তো---ক্ষতি কি?

অমিত জানিত, দর্জির দোকানে আর বেশি দিন সুনীলের থাকা চলিবে না।

দর্জি লোকটার সন্দেহ পূর্বেই হইয়াছিল; নিতান্ত বাধ্য লোক বলিয়াই অন্যায় কিছু করে নাই। কিন্তু এবার সে পীড়াপীড়ি করিতেছিল, সুনীল দর্জির কাজ যখন শিখিতেছে না, তখন অন্য কাজ দেখুক। তাহা ছাড়া দোকানে রাত্রিতে অন্য লোক রাখিতেও তাহার অমত। অতএব রাত্রিতে কাপড়ের গাদা পাতিয়া আরামে শয়ন সুনীলের পক্ষে আর বেশিদিন সম্ভব হইত না, কার্তিক মাসও শেষ হইতে চলিয়াছে। ইহার পরে সুনীলের অবস্থাটা কি হইবে? ইন্দ্রাণী জানিলে আবার এত ব্যস্ত হইত যে, তাহাতে সে সহায় না হইয়া সুনীলের পক্ষে নিজের অজ্ঞাতেও বিপদের কারণই হইয়া পড়িত। সুনীলও তাহা বেশ জানে, তাই ইন্দ্রাণীকে যতই শ্রদ্ধা করুক, তাহার নিকট সেও যাইতে চায় না, সে দর্জির এখানেই থাকিবে। অথচ দর্জিও আর তাহাকে স্থান দিবে না।---এই সব যুক্তি সুনীলকে শোনানো ভালো হইত না। সে বুঝিত না, মানিত না, আরও গোল বাধাইয়া বসিত।

তারপর অগ্রহায়ণ মাসেই সুনীলকে আসিতে হইয়াছে তাহার বর্তমান আশ্রয়ে। এখানেও সুনীলের মতে 'রাগ'ই যথেষ্ট, শালটার দরকার নাই। অমিত লোক পাইলেই যেন বিক্রয় করিয়া দেয়। যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে! অমিতও বলিত, লোক সে খুঁজিতেছে, কিন্তু পুরাতন শাল কাহার নিকট বিক্রয় করিবে? অসুবিধা ঢের, সকলেই নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। তবে সুযোগ অমিত ছাড়িবে না। দুই-একটি পরিচিত শালকরের সঙ্গে কথাও বলিতেছে।

অমিত জানে, কোন্ শয্যায়, কোন্ গৃহে, কি কি শীতবস্ত্রের আচ্ছাদনে সুনীল দত্তের এই উনিশ বছর পর্যন্ত জীবন বাড়িয়া উঠিয়াছে। সেই তুলনায় আজিকার 'রাগ'টা মোটেই বাহুল্য নয়, শালটাও নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় নয়। বরং ইহার সঙ্গে থাকা উচিত ওর ভায়েলা ফ্লানেলের পাঞ্জাবি, ডোরাকাটা পুলওভার, আর---

কিন্তু থাক, সুনীলকে ইহা বলা চলে না। বলিলে এখনই 'রাগ' শাল যার-তার কাছে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া খাঁটি হইয়া বসিবে; জানাইয়া দিবে, সে আর অনিল দত্তের ভাই নয়, বোসপুকুরের দত্তদেব কেহ নয়।

অমিত ভুলিতে পারে না যে, সুনীল সাত মাস পর্বেও দত্তদের ছেলে ছিল, অনিল দত্তের ভাই ছিল, শহরের ছেলেদের মধ্যে তাহার না ছিল অর্থের অভাব, না ছিল প্রতিষ্ঠার অভাব। আজ সুনীল বলিলেই কি সে পরিচয় মিথ্যা হইয়া যাইবে? না, তাহার মা আর তাহার মা থাকিবেন না? সরকারি চাকুরে মিস্টার অনিল দত্ত---সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অব এক্‌সাইজ, সুনীলের পর হইয়া উঠিবে? সুনীলের সঙ্গে তর্ক না করিলেও অমিতের এই সব কথা মনে গাঁথা রহিয়াছে। তাই এই শীতের ভোরে লেপ টানিয়া আরাম করিতে গিয়াই তাহার মনে পড়িল, সুনীলের লেপ নাই, আছে একটা রাগ ও পুরাতন শাল। এই শীতে তাহা যথেষ্ট নয়---মোটেই যথেষ্ট নয়। সুনীল শুনিবে না। ইহার অপেক্ষাও অনেক কম সুবিধায় তাহারই অনেক বন্ধু রহিয়াছে। সে বলিবে,---এতক্ষণে তাহাদের মোটা কম্বল গায়ে পরিয়া তাহারা সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাহিরে কনকনে হাওয়ায় প্রথম

গিয়াছে ল্যাট্রিন-প্যারেড---কুৎসিত, বীভৎস এ রকম গ্লানি মানব-জীবনের।—তারপর এখন লপ্‌সির অপেক্ষায় থালা-বাটি হাতে দাঁড়াইয়া আছে---লোহার থালা, লোহার বাটি---কালো মিশমিশে লোহা---কতদিনকার কে জানে! কতজনের ব্যবহৃত! বিজয় চৌধুরীর মতো বিলাসী, সৌন্দর্যপিপাসু, সুন্দর যুবকও সেখানে আছে...বিজয়... তারপর আসিবে লপ্‌সি। সার বাঁধিয়া আবার দাঁড়ানো, সার বাঁধিয়া চলা কারখানায়---গায়ে কম্বলের জামা, খালি পা। বুনিয়া চলে। তাঁত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিংবা পাকাও দড়ি। অসম্ভব, অসম্ভব এই গ্লানি। এই অবমাননা লাভের জন্য সুনীল বাড়ি ছাড়ে নাই। অন্তত যেন তাহার ভাগ্যে ইহা না মেলে—শুধু এই কষ্টটুকু, এই একঘেয়ে, প্রাণহীন জাঁতাকল যেন তাহাকে পেষণ করিতে না পায়।...

শুইয়া শুইয়া সুনীলের মুখের ছবি অমিতের মনে পড়িল। সত্যই এইরূপ চিন্তায় সুনীল ত্রস্ত, অস্থির হইয়া উঠে।...বিজয়...বিজয়..বিজয়কে অমিতও দেখিয়াছে। স্ফূর্তি ও আনন্দের ফোয়ারা সে ছেলে। কি করিয়া সে আজ সময় কাটাইতেছে ও রকম কম্বলের জামা পরিয়া, সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া?

অমিতেরই মনে হয়, না, লেপ একটা বিষম বাহুল্য, গঞ্জনা। তবু লেপ গায়ে রহিল। অমিত মনে মনে বলিল, লেপটাকে টানিয়া ফেলিয়া দিলেই কি চরম আত্মত্যাগ হইবে? কি সব ছেলেমানুষি ভাবনা! এ মেয়েদের শোভা পায়। ইন্দ্রাণীর নাকি এমনই অসহ্য হইয়াছিল দিনরাত্রি। কিন্তু এ ছেলেমানুষি। মনে কর, তুমি লেপ ফেলিয়াই দিলে। দিলে মন্দ হয় না, খানিকক্ষণ একটা দারুণ দুঃখভোগের ও আত্মত্যাগের নামে মনকে সান্ত্বনা দিতে পারিবে। তারপর, শীত আছে; যন্ত্রণা অসহ্য হইলেও এই শীত কি সুখভোগ্য হইবে? যদিই বা মনের আত্মমর্যাদায় আবার লেপ গায়ে তুলিতে ইচ্ছা না হয়, হয়তো মা, পিসীমা বা বুড়ী ঝি কানাইয়ের মা আসিয়া পড়িবে। আর তাহারা দেখিলে একটা ছোটখাট কাণ্ড বাধাইবেন। অমিত, তুমি নিজেও তখন লজ্জাবোধ করিবে! না, এই সব সেন্টি-মেন্টাল হাস্যকরতার ও চিন্তাবিলাসের প্রয়োজন নাই। যথেষ্ট কাজ আছে, অনন্ত কর্তব্য সম্মুখে পড়িয়া। তাহার ক্ষুদ্র এক কণা শেষ করিয়া তুলিতে পারিলেও, অমিত, মনে কম আত্মপ্রসাদ পাইবে না। কিন্তু সত্যই পাইবে কি? 'কাজ' 'কর্তব্য'...। কিন্তু এই শীতের সকালে, শীত কি, তাহা বুঝিবারও যাহারা সুযোগ পাইতেছে না, শীতের তীব্রতা যাহাদের ভুগিতে হইতেছে, অথচ সেই তীব্রতাকে স্থিররূপে বুঝিবার মতো অবকাশটুকুও যাহাদের নাই, সমস্ত বিলাস ছাড়িয়া ফেলিয়া অমিতের যে তাহাদের মতো একবার পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে; ওই মেঝের উপর—সিমেন্ট করা মেঝের উপর, বরফের মতো ঠাণ্ডা মেঝের উপর, অমিত সারারাত নিদ্রাহীন চোখে পড়িয়া থাকিতে পারিলে যেন খুশি হয়। অথচ তাহাতে লাভ নাই—অত্যন্ত অর্থহীন, নির্বোধ, ভাববিলাস---বিড়ম্বনাকর, হাস্যকর। লাভ কিছুই নাই। কিন্তু, অমিত, তবু বোধ হয় তুমি তাহাতে খুশি হইতে।...

*   *   *

সকালের রৌদ্রালোক চোখে আসিয়া পড়িল। অমিত শুনিতে পাইল, পাশের ঘরে চায়ের পেয়ালার টুংটাং শব্দ উঠিতেছে। পিতার চটির শব্দ কানে গেল। সাবধানে দৃঢ়ভাবে তিনি পা ফেলেন---চাঞ্চল্য নাই, অযত্ন বা বিশৃঙ্খলা নাই, সাবধান সতর্ক অথচ স্থির পদস্থাপনা। তাই চটি চটপট শব্দ করে না, মেঝে ঘষিয়া ঘষিয়া ঝরাৎ ঝরাৎ শব্দও সৃষ্টি করে না; বেশ স্থির অনুচ্চ ঠুকঠুক শব্দ। কি আশ্চর্য, শুধু পদশব্দের মধ্যদিয়াও একটি গোটা মানুষ প্রকাশিত হয়। ভাইবোনেরা কথা বলিতেছে ---অনু ও মনু; আর মাও সম্ভবত আছেন, চা ও খাবার বাঁটিয়া দিতেছেন। খানিক পরে মা নিজেই চা লইয়া আসিবেন। পূর্বে চাকরই লইয়া আসিত, তখনকার দিনে কে লইয়া আসিবে ঠিক ছিল না। অমিত নিজেই ওই ঘরে গিয়া বসিত। ঘরে মা না থাকিলে তাঁহাকে ডাকিয়া লইত, চা ও খাবার দিতে দেরি হইলে অমিতের তাহা সহ্য হইত না। কিন্তু এখন আর সে সব নাই। অমিতের আর চা লইয়া গোলমাল করিতে ইচ্ছা যায় না। কোনও রকমে হইলেই হইল, না হইলেও ক্ষতি নাই। চা এমনই বা কি একটা ভয়ানক জিনিস? তা ছাড়া এখন চা মা নিজেই লইয়া আসেন এই ঘরে, একেবারে বিছানার কাছে। তাহা দেখিতে কিন্তু এখন বড়ই বিশ্রী ঠেকে। মায়ের মুখ থাকে ঈষৎ বিষণ্ণ ও গম্ভীর ---কি যেন তাঁহার বলিবার ইচ্ছা, কিন্তু বলিতে পারিতেছেন না। না বলিলেও অমিত তাহা বুঝিতে পারে; তাই তাহার কেমন ভয়-ভয় করে, মা চা লইয়া না আসিলেই যেন সে স্বস্তি বোধ করে। আবার ভাবে---হয়তো মা শেষ পর্যন্ত আজ কিছু বলিয়া ফেলিবেন। একেবারে কিছু না বলিলেও এই স্তব্ধতা যেন ঘরের মধ্যে চাপিয়া বসিয়া থাকে। ভার নামাইবার জন্য অমিত নিজেই বলে, তুমি কেন? নিবারণ আনতে পারলে না? অথচ পূর্বে-পূর্বে শুধুমাত্র নিবারণ চা আনিলে সে মাকে ডাকাডাকি করিয়া অস্থির করিত; তখন এই দরদবোধের কোনও প্রমাণই অমিত দিত না। তাই এই প্রশ্নটা আজ তাহার নিজের কানেও নিশ্চয়ই খুব অদ্ভুত ঠেকে, সৃষ্টিছাড়া শোনায়। কিন্তু ইহাছাড়া সে আর কি বলিবে?

চা লইয়া অমিত তবু যাইয়া পিতার ঘরে তাঁহার সম্মুখে বসে। অনু-মনু সেখানে পূর্বেই জুটিয়া থাকে। কিন্তু এখন আর তাহাদের গল্প জমে না। পূর্বেকার মতো গরম, স্বচ্ছন্দ চা আর তাহারা পান করে না। বৃথাই অমিত সাধারণ কথা বলে, দুই-চারিটি খবরের কাগজের প্রশ্ন উত্থাপন করে---সেই পূর্বেকার পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য-বোধ তাহাদের মধ্যে আর ফিরিয়া আসে না। চা শেষ করিয়া খানিকটা অপেক্ষা করিয়া অমিত নিজের ঘরে পলাইয়া বাঁচে---পিতার ঘরে আর বসিয়া থাকিতে সাহস হয় না। কি জানি, আবার কি কথা উঠিয়া পড়িবে? ছোট বোন অনুর তো কিছুই ঠিক নাই। বিশেষতঃ পিতার হাতে রহিয়াছে খবরের কাগজ। খবরের কাগজ তাঁহার হাতে দেখিলেই অমিতের মন পালাইবার জন্য ছটফট করে---কি জানি, কি সংবাদ আছে, পাঠ করিয়া পিতা তাহার উদ্দেশ্যে কি কথা পাড়িবেন। অমিত জানে, তিনি রাগ করিবেন না, বিরক্তি প্রকাশ করিবেন

না; তাঁহার কথার সুরে কোনরূপ উত্তেজনা প্রকাশ পাইবে না। চিরজীবনের অভ্যস্ত সংযম ও শান্ত চিন্তাশীলতা তাঁহার কথায়, কাজে, চলাফেরায়, এখনও তেমনই সুন্দরভাবে ফুটিয়া বাহির হয়। কিন্তু এই সৌম্য মুখের গাম্ভীর্য যে কতটা উদ্বেগে ক্লিষ্ট, শান্ত স্বরের মধ্যে যে কতটা অশান্ত দুশ্চিন্তার প্রচ্ছন্ন সুর বাজিতেছে, সহজ সাধারণ কথাটিও তিনি পাড়িতেছেন অমিতের কি দুরূহ কাজকর্মের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া, তাহা অমিত বেশ বুঝিতে পারে; না বুঝিবার ভান করিলেও কেহই তাহা বিশ্বাস করিবে না---অনু হয়তো বলিয়াই ফেলিবে। তাই, অমিত চা শেষ করিয়া খানিকটা দেরি করে, কিংবা এ-কথা ও-কথা বলিয়া নিজ ঘরে পলাইয়া আসে।

পেয়ালার টুংটাং শব্দ হইতেছে, চা বুঝিবা আসিয়া পড়ে। মা আজ কিছু বলিতেও পারেন। কাল অমিত অনেক রাত্রিতে বাড়ি ফিরিয়াছে। আজ তাড়াতাড়ি চায়ের ঘরে যাইয়া আড্ডা জমাইবার চেষ্টা করাটাই ভালো হইবে।

অমিত বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। নীচে নামিয়া তাড়াতাড়ি দাঁতন সারিয়া মুখ ধুইয়া আসিল। তারপর বেশ সস্মিত মুখে ঘরে ঢুকিল।

দাও দিকিন। হয় নি বাপু তোমাদের?

হচ্ছে।---মা মুখ না তুলিয়া শুধু একটি কথা বলিলেন। অমিতের বহু চেষ্টার সৃষ্টি সেই স্ফূর্তি প্রায় নিবিয়া গেল। তবু বলিল, যে শীত, দাও না শিগ্‌গির।

শীত বেশিই। তুমি তো রাত্রিতেও বাইরে যেমন ঘুরছ, আমার ভয় হয়, আবার অসুখটা বাধিয়ে বসবে।

বাইরে কোথায়? সুহৃদের ঘরটা কি বাইরে? তোমাদের বাড়ির চেয়ে তাদের ঘরে হিমও ঢোকে কম, উত্তুরে হাওয়া ও ধোঁয়াও কম।

সুহৃদের বাড়ি তো ভালই।

অমিত বেশ বুঝিল, তাহার কথা কেহই বিশ্বাস করে নাই। না করিয়া তাঁহারা যে ভুল করিতেছেন, তাহাও নয়। 'সুহৃদের বাড়ি', 'সিনেমায় নটার অভিনয়', 'বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ধরিয়া বসিল একটা এডুকেশনাল স্কীম তৈয়ারি করিতে', 'বিকাশের ছবি লইয়া আলোচনা হইতেছিল, অনেক আর্টিস্ট ছিলেন'---এই সব কথা ইঁহাদের এতবার শোনা হইয়া গিয়াছে যে, উহাতে আর তাঁহারা আস্থা রাখিতে পারেন না। অমিত তাহা বেশ বুঝিয়াছে; তবু স্পষ্ট করিয়া যতক্ষণ কেহ বলিতেছেন না---'তোমার কথা মিথ্যা', ততক্ষণ সেইবা কেন তাঁহাদের অনাস্থা যে বুঝিতে পারিয়াছে, তাহা ভাবে দেখাইবে? দেখাইলেই তো বিপদ। অমিত কি করিবে? সত্যবাদী যুধিষ্ঠির হওয়া সম্ভব হইবে না; মিথ্যাকে ইহারা মানিয়া লইলেই হইল। এই শেষ ছলনাটুকুও এই পরিমণ্ডলে নিজেদের মধ্যে যদি রক্ষিত হয়, তাহাই ঢের। আর কথা বাড়ে না, গোলমাল চাপা পড়িয়া থাকে, এক রকমে দিনটা চলিয়া যায়। অনুর কথা সে হাসিয়াই উড়াইয়া দেয়---যেন কিছুই নয়। কিন্তু যখন মাঝে মাঝে এই ছলনা মা বা পিসীমা কেহ ভাঙিয়া ফেলেন, তখন

অমিতের একমাত্র উপায় থাকে হঠাৎ একটা ক্ষুব্ধ অভিমানের অভিনয় করা—যেন সে লাঞ্ছিত হইতেছে, অত্যন্ত অন্যায়রূপে তাহাকে সন্দেহ করা হইয়াছে, অন্যায় অত্যাচারে সে পীড়িত হইল। এমনই একটা ড্রামাটিক ভাব ও ভঙ্গি করিয়া অমিত অর্ধসমাপ্ত চা ফেলিয়া রাখে, জামা পরিয়া বাহির হইয়া যায় কিংবা রাত্রি হইলে শুইয়া পড়ে। ব্যাপারটা ছলনা---একটা গ্রানিকর ছলনা, ইহাতে সত্যই মনে তাহার কালিমা স্পর্শ করে। কিন্তু তাহা ছাড়া আর পথ কি আছে? এই ছলনার বলে কিছুদিনের মতো বাড়ির অভিযোগগুলিকে অমিত চাপা দিয়া দিতে পারে---তাহা অবশ্য বিনষ্ট হয় না, শুধু চাপা থাকে। কিছুদিনের মতো আর অবশ্য ঐরূপ কথা উঠে না। কিন্তু এইরূপ 'সীন' অভিনয় করিয়া অমিতও যথেষ্ট আত্মগ্লানি বোধ করে।

অমিত যেন বুঝিল না, মায়ের কথায় কোন ইঙ্গিত আছে, সে যেন সাদা মনে সাদাকথাই শুনিল। সে বলিয়া চলিল,---সুহৃদ একটা গ্যাস-স্টোভ এনেছে। এখন সুহৃদের ওখানে চমৎকার আড্ডা জমে। বাইরে হিম, ঘরের মধ্যে পেয়ালার পর পেয়ালা শেষ করলেও অসুবিধা নেই। দু-মিনিটেই চা গরম। আর শীতের রাত্রিতে চা যেমন জমে, এমন আর কিছু নয়। ক্ষিদেই পায় না---

অমিত আর থামিবার নাম করে না। কিন্তু কেহই তাহার কথার প্রতিবাদ করিল না। সবাই তাহার কথা যেন শুনিয়া মানিয়া লইল। অথচ নীচেকার ঘরের টেবিলের উপর তখনও সুহৃদের লেখার টুকরাটা পাথর চাপা রহিয়াছে---অমিত সাত দিনের মধ্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই; আজ যেন অতি অবশ্য একবার বিকালে আসে---সিনেমায় 'বিগ্ প্যারেড', টিকিট কেনা হইয়া গিয়াছে। ---কাল অমিত বেশি রাত্রিতে বাড়ি ফেরায় কেহই সুহৃদের কথা অমিতকে বলে নাই, অমিতও নীচেকার ঘরে আর প্রবেশ করে নাই। তাই এই খবরটা অমিত জানিত না---এখনও বুঝিল না। অবলীলাক্রমে বলিয়া চলিল, সুহৃদের বাড়ি কাল ব্রিজ কেমন জমিতেছিল! মা চা ঢালিয়া চলিলেন, অনু ও মনু মুখ নীচু করিয়া রহিল।

অমিত চা লইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহারাও সেখানে জুটিল। অমিত একটা বসিবার মোড়া খুঁজিতে লাগিল। বলিল, উত্তরের জানালাটা খোলা যে! বিশ্রী হাওয়া আসছে। বন্ধ করে দিই?

না। একটু হাওয়া দিনের বেলাতে ভালই। রাত্রে বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়াকেই ভয়, নইলে এমন কিছু নয়---পিতা ধীরভাবে বলিলেন।

কথা বলিতে গেলেই বিপদ। অমিত চুপ করিল। পরে নিজ হইতেই বলিয়া চলিল, যা শীত! আর পা বাড়াতে ইচ্ছে করে না। বিকাশ বসে থাকবে। যেতেই হবে। ওর সঙ্গে আজ আর্ট একজিবিশনে যাওয়ার সময়টা ঠিক করে আসতে হবে।

আজই যদি যাবে, তবে আবার এখন যাবে কেন?

একবার পাকাপাকি সময় স্থির না করলে কি বিকাশকে বিশ্বাস আছে? যে খেয়ালী লোক; হয়তো বলবে---ভুলে গেছলুম।

কিন্তু পিতা আর প্রশ্ন করিলেন না। অমিত খানিকটা স্বস্তি পাইল। তবু তাঁহার সহিত একটা কথা তো বলা হইল! এবার তাহা হইলে উঠিয়া পড়া যাক। এখন বাহির হইতে গেলেও আর কেহই বাধা দিবে না। ওদিকে সুনীল রহিয়াছে ---এই শীত---একটি আধলা তাহার পকেটে নাই---চা খাওয়ার পয়সাটা পর্যন্ত নাই ---ঘর-ভাড়াও এবার না দিলে আবার আজই কোথাও উধাও হইতে হইবে।---কোথায়? কোথায়? কোথায়?---টাকা আপাতত আছে। পাঞ্জাবির পকেটেই রহিয়াছে ঘড়ির দামটা। আর বেলা করা নয়।

*　　　　*　　　　*

অমিত পিতার ঘর হইতে নিজের ঘরে গেল। খানিক বই লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া এ-বই ও-বই নাড়াচাড়া করিল, খবরের কাগজটায় একবার তাড়াতাড়ি চোখ বুলাইয়া লইল। কাশী হইতে সুরোর দুইখানা চিঠি আসিয়া জমিয়াছে---সে আজকাল আর চিঠি লিখিয়াও কেন উত্তর পায় না। এবার অমিত উত্তর দিবে। আজই। না, আজ থাক। সুনীলের একটা ব্যবস্থা আজ শেষ করিতে হইবে। চিঠির উত্তর কাল দিলেও চলিবে।

আলনা হইতে জামা লইয়া অমিত পরিল। বুক-পকেটটা টিপিয়া দেখিল---নোট তিনখানা ভিতরে রহিয়াছে। জামা পরিতে পরিতে অমিতের ভয় হইতেছিল ---কেহ আবার জিজ্ঞাসা করে নাকি, কোথায় বাহির হইতেছ? মুখে যথাসম্ভব সেই ভাব গোপন করিয়া সে স্ফূর্তি ফুটাইয়া তুলিল---বিকাশের বাড়ি যাওয়া দরকার, একবার দ্বিপ্রহরের জন্য ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করিয়া আসিবে।

ঘর হইতে বাহির হইতেই দেখা হইল---মায়ের সঙ্গে। কোথায় আবার বেরুচ্ছো? এখনই---এত সকালে?

বিকাশের ওখানে একবার যেতে হবে---ওর সঙ্গে দুপুরে যেতে হবে আর্ট-এক্‌জিবিশনে। এবেলা বন্দোবস্ত না করলে তাকে পাওয়া যাবে না।

অমিত সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে নামিতে বলিয়া গেল। মা মুখ না ফিরাইয়া উপর হইতে একটু জোরে ডাকিয়া বলিলেন, নীচেকার ঘরে সুহৃদ কাল একটা চিঠি তোমাকে লিখে রেখে গেছে। অনেকক্ষণ কাল রাত্তিরে বসে ছিল তোমার জন্যে।

সুহৃদ! অমিত থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহা হইলে সুহৃদ কাল সন্ধ্যায় আসিয়াছিল নাকি? অমিত বুঝিল, এতক্ষণ সে যে গল্পটা মায়ের কাছে ফাঁদিয়াছিল, মা তাহার একবর্ণও বিশ্বাস করেন নাই। হাতেনাতে মিথ্যাটা ধরা পড়িয়া গেল। যাক্, সে এখন নীচের ঘরে আসিয়া গিয়াছে; এখন যে মায়ের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াইতে হইতেছে না, ইহাই যথেষ্ট। একবার বাহির হইতে পাইলেই বাঁচে।

নীচেকার ঘরে ঢুকিয়া অমিত সুহৃদের চিঠি দেখিল---'বিগ্ প্যারেড' দেখিতে যাইবার নিমন্ত্রণ। সিনেমায় নিমন্ত্রণ! অমিতের হাসি পাইল---সুহৃদ জানে, অমিত

যাইবে না, যাইবার সময় নাই; তবু তাহাকে কেন এমন বিব্রত করা? সিনেমা মন্দ নয়; এক সময়ে অমিতেরও অপছন্দ ছিল না। কিন্তু সব আমোদেরই সময় আছে। এখন তো আর সিনেমায় ঘুরিবার সময় নাই। এই সুখ, আমোদ, স্ফূর্তি---এই সব লইয়া তাহার জীবন গড়াইয়া চলিয়াছে। এতদিন এই সব নিশ্চিন্ত বিলাসিতাতেই ছিল তাহারও আনন্দ। কিন্তু বড়ই লঘু, বড়ই হাল্কা, বড়ই অসার---এই বিলাসিতা। ইহাই কি শুধু জীবন? এ-ই মানুষের প্রাণলীলা? এমন আয়াসহীন, প্রয়াসহীন দিন কাটাইয়া যাওয়া? চুরুট ফুঁকিয়া দিন শেষ করা, আড্ডায় সন্ধ্যা মাতাইয়া তোলা, সিনেমা দেখিয়া বা মোটরে হাওয়া খাইয়া দিনগুলিকে উড়াইয়া দেওয়া---এই কি শুধু জীবন? বড় জোর দুইখানি কবিতা পড়া, কিংবা ইতিহাসের দুইটি অধ্যায়; কিংবা শিল্পানুশীলনে মনকে হিল্লোলিত করিয়া দেওয়া---ইহাই দুর্লভ মানবজন্মের শেষ স্বপ্ন? ভাগ্যবান সুহৃদ। তাহার জীবনে ইহার বেশি কঠোর আদর্শ আসিয়া আঘাত করে না। তাহার মন প্রাণ আলোড়িত হয় না, মথিত হয় না। সে তীক্ষ্ণধী ও সৌন্দর্যবোধের সহজ আনন্দে দিনগুলিকে ভাসাইয়া দিতে পারে। তাহাতে তিক্ততা নাই, দ্বন্দ্ব নাই, কোলাহল নাই। ভাগ্যবান সুহৃদ। সুন্দর প্রভাতের সুন্দর আলোকের মতো তাহার মন। কিন্তু সুহৃদ বড় লঘুচিত্ত, বড় অ-গভীর তাহার আত্মা, বড় অসার তাহার ইনটেলেকচুয়ালিজম্! অসার নয় কি? তাহার স্ত্রী সুধীরাও ইহার অপেক্ষা সীরিয়াস। সুধীরার না আছে তাহার স্বামীর মতো ধীশক্তি, না আছে তেমন সৌন্দর্যবোধ। তবু তাহার জীবনে একটা গভীরতা আছে---খানিকটা গভীরতা। তাই সুধীরার স্বচ্ছ মন মাঝে মাঝে স্তব্ধ জিজ্ঞাসু হইয়া উঠে; তাহার প্রাণ কখনও কখনও দ্বিধায় খানিকটা থমকিয়া দাঁড়ায়।

* * *

অমিতবাবু, আমাদের কি কিছুই করার নেই? শুধুই এমনই ঘরে বন্ধ হয়ে থাকতে হবে? ---সুধীরা একদিন অমিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। সেদিন সন্ধ্যায় সুহৃদের বাড়িতে বসিয়াছিল গানের মজলিস। অমিতের আসিবার কথা, আসিতে পারে নাই। কিন্তু রাত্রিতে খাওয়ার কথাও ছিল বলিয়া তাহাকে আসিতে হইল। তখন রাত্রি দশটা মজলিস ভাঙিয়া গিয়াছে। শুধু বিরক্তিপূর্ণ চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল সুহৃদ---'অমিত এমন বেয়াড়া, কথা দিয়েও কথা রাখে না। এল না গান শুনতে।' সুধীরাও অমিতের আচরণে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিল। তাহার পরে অমিত আসিল। সুহৃদ খুব রাগ করিল। অমিত তাহাদের নিকট ক্ষমা চাহিল, বুঝাইতে চেষ্টা করিল---সমস্ত সন্ধ্যায় তাহার এক মিনিটও সময় ছিল না; হাওড়া স্টেশন হইতে বেলেঘাটা পর্যন্ত তাহার ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে।

তোমার কাজ?---সুহৃদ ক্ষুব্ধ অভিমানে কহিতে লাগিল, যে কাজ তোমার নয় ---তুমিও মানো, তোমার অভিপ্রেত নয়---তোমার মনপ্রাণ-আদর্শের বিরোধী, তাকেই ফের বলছ---তোমার কাজ! কোথাকার যত অর্থহীন, আয়ুহীন, ক্ষিপ্ততা,

—তাই হল তোমার কাজ? কেন তোমার এই আত্মদ্রোহ? নিজের আদর্শের এই অপমান কেন করছ তুমি অমিত?

অমিত সুহৃদকে থামাইতে চেষ্টা করিল, তুমি তো সব জানো সুহৃদ। অকাজের ডাক পড়লে আমি কোনো দিন স্থির থাকতে পারি না। এখন এস, কি খেতে দেবে? কি আয়োজন করেছ তোমরা? ঘুরে ঘুরে বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। তোমার সেই ফাউলকাটলেট চাই কিন্তু।

কিন্তু সুহৃদ খুব সহজে শান্ত হইল না। যাহা বলিয়া ফেলিল, তাহা অনেকটাই কাল্পনিক, কিন্তু একেবারেই ভুল বলে নাই। সুধীরার পক্ষে তাহা হইতেও অমিতের কাজগুলির সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করা অসম্ভব ছিল না। সে একটু গম্ভীর হইয়া উঠিয়া পড়িল---দুই বন্ধুর খাবার আয়োজন করিতে গেল।

তারপর আহার চলিল---একটু স্নিগ্ধ অথচ গম্ভীর আনন্দের মধ্যে। বিদায়ের পূর্বে সুহৃদ গেল গাড়ি বাহির করিতে---ড্রাইভার তখন বাড়ি চলিয়া গিয়াছে।

তখন দুই একটি কথার পর সুধীরা হঠাৎ বলিল, আমাদের কি কিছু করবার নেই? শুধুই বন্ধ হয়ে থাকতে হবে?

অমিত একটু চমৎকৃত হইল---তাহার পরেই সহাস্যে কহিল, একেও বলেন বন্ধ থাকা? একদিন তো মোটে হাওয়া খেতে বেরুতে পান নি, তাতেই এমন ফেমিনিজমের উত্তাপ?

কিন্তু কথাটা সুধীরা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহে না, অথচ অমিত হাসিয়াই উড়াইতে দৃঢ়সঙ্কল্প আর তাহা ছাড়া সময়ও তখন আর নাই। সুধীরার কথা আর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

অমিত অবশ্য ইন্দ্রাণীকে এই কথা বলিতে পারিত। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে সুধীরার সখ্যও ছিল। কিন্তু কি জানি কেন, ইন্দ্রাণী মনে করে, সুধীরা সত্তাবিবর্জিতা; আবার সুধীরা মনে করে, ইন্দ্রাণী আত্মপরায়ণা। অমিত জানে, দুইটিই ভুল ধারণা। কিন্তু উভয়ের এই ভুল সে দূর করিতে পারে না, পারিবে না। সুরোও পারে নাই। অমিতের খুড়তুতো বোন সুরো, দুইজনেরই বন্ধু---আজ সে বেনারসে ---দুইজনেই তাহাকে ভালবাসে। সুরো বলে, 'ইন্দ্রাণী'দির প্রাণের তুলনা নেই।' আবার---'কিন্তু সুধীরার প্রাণ যে কত গভীর, সুন্দর, তা কেউ বাইরে থেকে জানতেও পারে না।'

সে দিন অমিত তাহাই জানিয়া ফেলিল। বুঝিল, সুধীরার মনের গভীর তলদেশে জিজ্ঞাসা জমে, সুধীরা নিতান্ত লঘুচিত্তা নয়, রঙিন শাড়ি ও ব্লাউজের একটি আধার নয়।

কিন্তু ওই আবেগ যে খুব প্রকাণ্ড বড় কিছু নয়, তাহাও অমিত বুঝিতে পারে, সাধারণ মানুষের আন্তরিক বেদনা ও অনুভূতি যতটুকুই---তাহার বেশি নয়। এই সাধারণ-সুলভ সেন্টিমেন্টটুকুও সুহৃদের নাই। তাহার মন মোটেই ভাবাবেগে দোল খায় না---সে ইনটিলেকচুয়াল জীবনকে ভালবাসে, কালচার-এর কুড়েমি তাহার

মজ্জাগত। সে দ্বিধায় জড়াইয়া পড়ে না, জীবনকে উপভোগ করে। হাসি চায়, গল্প চায়, পান চায়; সিনেমা-থিয়েটার, বন্ধুবান্ধব, মার্জিত রুচি, ভাল বই, ভাল আড্ডা---এই সবই জীবনকে সৌন্দর্যে লালিত্যে শোভনতায় মণ্ডিত করে।

* * *

সুহৃদ সিনেমায় টিকিট কিনিয়া রাখিয়াছে। পয়সা নষ্ট করিবার ইচ্ছা থাকিলে কে রোধ করিতে পারে? অথচ পয়সা কি দুর্লভ! সুনীল এখন পর্যন্ত চা খাইতেও পায় নাই।

চিঠিটা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে অমিত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দেখা হইল কানাইয়ের মায়ের সঙ্গে।

এত সকালেই আবার বেরুনো? ফেরো বলছি, যেও না। রাত জেগে জেগে বাপ্ পিত্তি ধরে গেল। তোমার না হয় কোনো মহাকাজ হচ্ছে। আমরা যে আর পারি না বাপু।

অনেকদিন পরিবারে আছে কানাইয়ের মা; থামিতে চাহে না।

আবার ভাত কোলে করে বসে থাকতে হবে মা-ঠাকরুণকে। খেয়েই বেরিও, কাজ বয়ে যাবে না।

অমিতের মনে পড়িল।

হাঁ, দেখ কানাইয়ের মা, আমি বিকাশের ওখানে যাচ্ছি। জানই তো, সে যেমন লক্ষ্মীছাড়া---উঠতে উঠতেই করে দেবে বেলা একটা। বেশি বেলা হলে তার ওখানেই খেতে হবে। বারোটার মধ্যে না ফিরলে তোমরা দেরি করো না। আমি একেবারে সন্ধ্যায় ফিরব---মাকে বলো।

কানাইয়ের মায়ের উত্তর শুনিবার জন্য অমিত অপেক্ষা করিল না। বাহির হইয়া পড়িল। পথের উপর হইতে আর একবার কানাইয়ের মায়ের উদ্দেশে বলিল, বাড়িতে তুমি বলো। এখন সদর বন্ধ করো।

দুই

অমিত তাড়াতাড়ি পথ বাহিয়া চলিল। দেরি হইয়া গিয়াছে। কয়টা বাজিল? হাতঘড়ির দিকে চাহিতে মনে পড়িল---হাতে ঘড়িটা আজ নাই। দেরি হইয়াছে বোধ হয়। সুনীল তো অপেক্ষা করিয়া আছে---এখনও কিছুই খায় নাই, খাইতে পায় নাই। একটি পাইও তাহার নাই। অথচ সার্কুলার রোডের 'বাস' আসিবে যে কখন, তাহাও বলা যায় না। আসিলেও আসিবে বোঝাই----গয়লা, মজুর, নানা জাতীয় ইতর স্ত্রী-পুরুষের ভিড়, আরোহীর ভিড়, শিয়ালদহ ও হাবড়ার যাত্রীদের গাঁটরি বোঁচকা পেটরা তোরঙ্গ, টিনের সুটকেস্ বিছানা, মাছ, শাকসবজি, সব কিছু মিলিয়া গাড়ির ভিতরে প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। তারপর শেষ-

হীন এক-একটি স্টেশন---গাড়ি আর ছাড়িবে না। পিছন হইতে তাড়া খাইয়াও কেহ কেহ চলিবে না, সাধা গলায় চীৎকার করিবে---"মানিকতলা, শিয়ালদহ, হাবড়া"; কিংবা "মানিকতলা, শিয়ালদহ, মৌলালি, ধর্মতলা।" সেই বেলেঘাটা---কখন বাস পৌঁছাইবে? কয়টা বাজিল? সুনীল বোধহয় আজও হতাশ হইয়া উঠিতেছে।

শীতের সকাল---সার্কুলার রোডের পূর্ব দিককার বাড়িগুলির উপর দিয়া সূর্য উঠিয়া আসিতেছে, পশ্চিম দিককার বাড়িগুলির গায়ে, রোদের আভা ফুটিতেছে। শীতের সকালের রোদ---কচি, ভীরু, সশঙ্ক; তাহার স্পর্শ যেন ক্ষীণপ্রাণ শিশুর কোমল মোলায়েম স্পর্শ। কিন্তু বাজিল কয়টা? ঘড়ি নাই, আজ বেলা ঠিক পাওয়াই শক্ত।

অমিত বাসের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া মিনিট গুনিতে লাগিল।

দূরের একটা মোড়ের মাথা কাটাইয়া অবশেষে একখানা বাস আসিয়া পড়িল---পিছনে তাহার আর একখানা বাস তাড়া করিয়াছিল। অমিত উঠিয়া বসিল। বাসের জানালার মধ্য দিয়া সকালের রোদ তাহার গায়ে মুখে আসিয়া পড়িতেছে। বড় মোলায়েম শীতের এই রৌদ্রঝলক। কোলের উপর হইতে হাতখানা তুলিয়া অমিত জানালার রোদের উপর ধরিল---রোদে তাহার চামড়া একটু একটু করিয়া সাড়া দিয়া উঠিতেছে। এই মোলায়েম উষ্ণতা অনুভব করিয়া অমিত তাহার হাতের চামড়ার দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। মুখে একটু হাসির আভা ফুটিল---এই রক্তমাংসময় মানুষের ক্ষুদ্র কর, তাহার মধ্য দিয়া কি একটি সুকোমল স্নিগ্ধ অনুভূতি জাগিয়া উঠিতেছে অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে, দূর---বহু-দূরের সূর্যদেবতার স্নেহতাপময় করস্পর্শে। সত্য, সূর্যই প্রাণের আধার, সবিতাই মানুষের দেবতা। কিন্তু একটা অগ্নিপিণ্ডমাত্র এই সবিতা। হায়, নিশ্চেতন দেবতা!

বাড়িগুলির শিশির-ভেজা গায়ে সকালবেলাকার সূর্যালোক কি চমৎকারই না দেখাইতেছে। লাল বাড়িটার লাল আভা যেন গাঢ়তর হইয়াছে, সাদা বাড়িটার রূপ উজ্জ্বলতর হইয়াছে। সকালবেলাকার আলোতে না হইলে ইহাদের এই রূপটি খোলে না। অমিত দিনে কতবার এই বাড়িগুলির পাশ দিয়া যাতায়াত করে; ---পরিচিত, অতিপরিচিত, তাহার কাছে এই বাড়িগুলি। চোখ বুজিয়াও সে শিয়ালদহ হইতে শ্যামবাজারের মোড় পর্যন্ত প্রত্যেকটি বাড়ির হিসাব বলিয়া যাইতে পারিবে। কোন কোন বাড়ির অধিবাসীদের পর্যন্ত সে মুখ চেনে। ওই যে বাড়িটা ---এ বাড়িতে-- হ্যাঁ, ওই যে দাঁড়াইয়া আছে। এ পাড়ায় এমনতর মুখ সত্যই আশ্চর্যজনক। এ মুখ যদি পোলক স্ট্রীটে, ক্যানিং স্ট্রীটে দেখা যাইত, তাহা হইলে বিস্ময়ের কিছুই থাকিত না। বেশ সুশ্রী ভাটিয়া মুখ, মধ্যবয়স্ক কোনও গুজরাটী বেনে। কিন্তু এ পাড়ায় তাহারা আসিবে কেন? এই পার্শ্বে বাঙালী বাড়ি, ও পার্শ্বেও তাহাই---একজন বাঙালী ডাক্তারের বাস। অমিত কতবার ভাবিয়াছে, ইহারা কে---গুজরাটী, না বাঙালীই? বাসের জানালার ফাঁকে আজ

আর একবার ঝুঁকিয়া পড়িয়া অমিত দেখিয়া লইল। কিছুই বুঝা গেল না। হিন্দুস্থানী নয়, মাদ্রাজীও নয়; বাঙালীই বা কিরূপে হইবে?

বাস চলিয়াছে। পরিচিত বাড়ির সার---পরিচিত, খুবই তাহার পরিচিত, কিন্তু তবু কেন নূতন ঠেকিতেছে? না কোথায় যেন একটা মায়াময় ঔজ্জ্বল্য রহিয়াছে, না হইলে এই বাড়িগুলির আবার রূপ কি? সে তো কতদিন ইহাদের দেখিয়াছে। আর শুধু কি ইহাদের? সেই ম্যাট্রিকের পরীক্ষা-শেষে যখন সে প্রথম স্কটের জগৎ হইতে ডিকেন্স-থ্যাকারের জগতে ঢুকিতেছে, মনে পড়ে তখন ওই ওখানকার ছোট্ট বাড়িটার বাহিরের ঘরে শুইয়া শুইয়া পড়ার ফাঁকে ফাঁকে মধ্যাহ্নের দীপ্ত রৌদ্রে সে ওই ছোট্ট দেবদারু গাছগুলির রোপন দেখিয়াছে। আজ সেই দেবদারু গাছ-গুলিও যে বেশ সুন্দর দেখাইতেছে; অথচ শীতের প্রকোপে উহাদের পাতার সেই সতেজ প্রাণদীপ্তি নিবিয়া গিয়াছে কবে। তবু এখন ইহাদের ভাল লাগিল কেন? নিশ্চয়ই এই সূর্যের আলোকে। আচ্ছা, সূর্যালোকে এমন কি যাদু আছে? এই সব চেনা বাড়িঘর, চেনা গাছগুলো, এমন কি চেনা মুখগুলো পর্যন্ত কেন এমন তাজা নূতন দেখায়! ...বিকাশ থাকিলে বলিত, সে খবর জানিতে হইলে ইম্প্রেশনিস্টদের শিল্পসূত্র জানিয়া লও; মোনে, মাতিসের ছবি সামনে লইয়া ধ্যান করো।

কিন্তু থাক বিকাশ, থাক আজিকার আর্ট এক্জিবিশন, থাক মোনে, মাতিস, নন্দলাল, অবনীন্দ্র। এখন বাজিল কয়টা? সার্কুলার রোডের বাস হইতে ঘড়ি দেখিবার উপায় নাই। পথের উপর দোকান অল্প; যে কয়টা আছে, তাহারাও ঘড়ি-গুলি একেবারে ভিতরে লুকাইয়া রাখে---যেন পথের পথিক বা বাসের যাত্রীরা দেখিলে ঘড়িটা থমকিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে।

কটা বেজেছে বলতে পারেন?---অমিত বাস-কনডাকটর পাইজীকে জিজ্ঞাসা করিল।

পাইজী স্বকীয় হিন্দুস্থানীতে স্বকীয় পাঞ্জাবী সুর মিশাইয়া জিজ্ঞাসা করিল আপকো কোন্ টাইমমে যানে পড়তা?

অমিত বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। পাইজী বাংলা করিয়া দিল, আট-চব্বিশকা লোক্যাল মে যাবেন তো? সে মিলবে।

অমিত বলিল, কিন্তু এখন কটা? গাড়ির সম্মুখের একটা ঘড়ি দেখাইয়া পাইজী বলিল দেখিয়ে না ঘড়ি। কেয়া, ঘড়ি চিনতা নেই?

অমিত দেখিল, আটটা। তাহা হইলে বেশি দেরি হয় নাই। কিন্তু যে গতিতে গাড়ি চলিয়াছে, পৌঁছিতে পৌঁছিতে দেরি হইবে। সুকিয়া স্ট্রীটের মোড় রহিয়াছে; তারপর মেছুয়াবাজার, তারপর শিয়ালদহ; তারপরও অন্তত দশ মিনিটকাল হাঁটিতে হইবে। সুনীল না জানি কি ভাবিতেছে!

সুকিয়া স্ট্রীট।...শৈলেন না? কলিকাতা আসিল কবে? বাসেই তো উঠিতেছে। দেখা হইলে কথা বলিতে হইবে, মুশকিল। কতদিন দেখা নাই, সহজে ছাড়িবেও না। পুরানো দিনের গবেষণার কথা জিজ্ঞাসা করিবে। চুপ করিয়া থাকা যাক,

চোখে না পড়িতেও পারে; তাহা হইলে অনেক গোলমাল চুকিয়া যায়। মূকবধির বিদ্যালয়ের বাড়িটার এমন কি আকর্ষণ-শক্তি আছে? আরো গুটি দুই বাড়ি পার হইলেও না হয় বোঝা যাইত যে অমিতের চোখ কেন পূর্বের জানালা দিয়া বাহিরে নিবদ্ধ আছে? হঠাৎ কে তাহার পার্শ্বের স্থানটায় বসিল? অমিত মাথা না ফিরাইয়াও বুঝিল, কে; কিন্তু কোনরূপ ভাব প্রকাশ পাইল না—সেই মূকবধির বিদ্যালয়ের বাড়িটাই দেখিতে লাগিল। কিন্তু গাড়িও চলে না। অতিষ্ঠ হইলেও ড্রাইভারকে তাড়া দিতে তাহার ভয় হইল। কন্ঠস্বরে এক মুহূর্তেই চিনিয়া ফেলিবে, আর তারপর, শৈলেন যেরূপ—

আরে, অমিত না?

অমিত বুঝিল, তবু চমকাইয়া উঠিবার ভান করিয়া মুখ ফিরাইল। এক নিমেষ পার্শ্ববর্তীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া—

শৈলেন! তুমি এখানে এখন! ছুটি নিয়েছ নাকি? তারপর যেরূপ প্রত্যাশিত সেরূপ গতিতেই কথার ফোয়ারা খুলিয়া গেল। বাসের লোকের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, শৈলেনের কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই। দুই মিনিটে সে আসর জমাইয়া বসিতে পারে, যদিও আজ সে হইয়াছে মুন্সেফ।

শৈলেন ছুটি লইয়া আসিয়াছে—বড় দিনটা সস্ত্রীক এখানে কাটাইয়া যাইবে। উঠিয়াছে? উঠিয়াছে শ্বশুর-গৃহেই। শ্বশুরমহাশয় হাইকোর্টের উকিল অমিত জানে না কি? অমিত ভুলিয়া গিয়াছিল।

শৈলেনের বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন ইন্দ্রাণী আর সুরো। ইন্দ্রাণীর সম্পর্কিতা বোন, মেয়েটি সুন্দরী। উঁচু সম্পন্ন পদস্থ পরিবার; আর 'শৈলেনবাবুর মতো লোক' ইন্দ্রাণী সংসারে দেখে নাই। শৈলেনও ইন্দ্রাণীর গুণে, স্নেহে, আত্মীয়তায় একেবারে 'ইন্দ্রাণীদি'র নামে বিমুগ্ধ হইত। বলিত, 'অমিত, তোকে যে উনি কি চোখে দেখেন, তুই বুঝবি না।' ইন্দ্রাণীর কথা উঠিলে সে আর থামিবে না। এখনই হয়তো উঠিবে সে কথা। কিন্তু শৈলেন বলিল, শ্বশুরমশায় কোথায় থাকেন মনে আছে?

অমিত ভুলিয়া গিয়াছিল; এখন মনে পড়িতেছে—সেই গড়পাড়ে থাকেন তো এখনো?

না, বাদুড়বাগানে। শৈলেন বলিয়া চলিল, তারপর—খবর কি? বেরুচ্ছিস হাইকোর্টে? না, বেরুবি না? আর যা ক্রাউডেড ভাই, না বেরিয়ে ভালই করেছিস। কাল গেছলুম ভাই, একবার ওখানে। জাস্টিস দে'র সঙ্গে দেখা করেছিলুম পরশু —শ্বশুরমশায়ের বন্ধু কিনা, তাই। বললেন এস কাল, আমার কোর্টে। একটা ট্র্যান্সফার অব্ প্রপার্টির জটিল মামলা, আছে। বেশ ইন্টারেস্টিং। এক দিকে ডক্টর ব্যানার্জি, আর দিকে মিস্টার ঘোষ কৌসুলি। কাল ছিল ডক্টর ব্যানার্জির সওয়াল। বেশ সাট্‌ল, চমৎকার পয়েন্টটা তুলেছেন—ফার্স্ট মর্গেজ হোল্ডার হল একটা ব্যাঙ্ক; এদিকে পার্টনারশিপে আছে একজন উইডো—এখন বোধহয় ডক্টর

ব্যানার্জীই বেস্ট ল-ইয়ার, কি বলিস? শুনলুম কাল ঝাড়া তিনটি ঘণ্টা। আমার আবার এসব মকদ্দমাই বেশি করতে হয় কিনা। দু বছরের মুন্সেফদের তা সাধারণত দেয় না,—রেন্ট সুট করেই পাঁচ বছর কাটাতে হয়। আমাকে একটু স্পেশ্যাল পাওয়ার দিয়েছে। সাব জজ রেবতীবাবু আমার শ্বশুরমশায়ের বন্ধু। জজ টেইলরও মেরিট অ্যাপ্রিশিয়েট করেন।—তাতেই আমাকে এসব কঠিন মকদ্দমা করবার অধিকার তিনি দিলেন। কাল ডক্টর ব্যানার্জির এক্স্পোজিশন শুনে তাই মনে মনে তারিফ করছিলাম। আজও আবার যাব। শ্বশুরমশায় বলেন, ডক্টর ব্যানার্জি ওদের ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে ছিলেন বেস্ট স্টুডেন্ট। বরাবরই যেমন এক্যুমেন, তেমনই ব্রিলিয়েন্স। হ্যাঁ, তারপর যা বলছিলাম—পরে গেলাম বার-লাইব্রেরিতে, বেজা, হীরেন, যুগীন ওদের সঙ্গে দেখা। বেশ মুটিয়েছে সবগুলো। ভাবলুম মক্কেলের মুখ দেখেছে। খানিকক্ষণ গল্প হল—অ্যাদ্দিন পর দেখা, খুব গল্প। কি করি, কি না-করি, মফস্বলের লাইফ কেমন, উকিলেরা কেমন জানে-শোনে এমনই সব কথা। পরে বললে, ভাই, আছ ভাল। এখানকার হাল,—সত্যি ঘরটা কালো কোটে ও গাউনে গিজগিজ করছিল। শুনলাম সব—বেজা বলে, চলে যায়, বাড়ির গাড়ি আছে, ভাড়ার টাকা আসে। কিন্তু যুগীনের হয়েছে বিপদ, মক্কেল নেই, মুরুব্বি নেই ঘরের টাকাও বেশি নেই। বলে, এক-আধটা স্বদেশী কেস পেলেও বিনা পয়সায় একবার হাজিরা দেবার ফুরসত পেতাম। শ্বশুরমশায়কে বললুম ওর কথা। শনিবার আসবে ও দেখা করতে। তা শ্বশুরমশায় বলেন, তিন-তিনটে জুনিয়র তো এখনই পুষতে হয়। আর আজকালকার ছেলেরা কি খাটতে চায়? সবাই চায় জন্ম থেকে সিনিয়র হতে, দেখি কতটা পারি কি করতে।

শৈলেন কি 'বোর'? সাত বৎসর প্রতিদিনকার আলাপে যাহাকে মনে হইয়াছিল, সুন্দর চিন্তার, প্রাণময় স্বচ্ছন্দ আড্ডার একজন জন্ম-অধিকারী, দুই বছর অদর্শনের পরে আজ তাহাকে এইরূপ সন্দেহ হইল কেন? জাস্টিস দে...শ্বশুরমশায়...স্পেশ্যাল পাওয়ার...শ্বশুরমশায়...বার লাইব্রেরি...ল অব মর্গেজ...শ্বশুরমশায়...

কি কুৎসিত! ইহার কারণ কি?

* * *

এম. এ. পরীক্ষা শেষ হইয়াছিল। সেনেটের মোটা থামগুলির ভিতর দিয়া গলিয়া বাহির হইতে হইতে অমিত বুক ভরিয়া একবার গোলদীঘির হাওয়া লইল।

...এতদিনকার পরিচিত হাওয়া—কত রাত-জাগার সঙ্গে জড়িত, প্রত্যেকটি হিল্লোলে এক্জামিনের গন্ধ মেশানো—এই শেষ তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ। ইহার পরে এই হাওয়ার গায়ে অমিত আর এই ঘ্রাণ পাইবে না, তাহার রাত-জাগার মূলে আর এই মোটা-থামওয়ালা বাড়িটার বিভীষিকা থাকিবে না, সেই সব শেষ হইল। হঠাৎ একটা অদ্ভুত বিষাদে অমিতের মন ভরিয়া গিয়াছে। তাহার মনে পড়িল, 'ডিক্লাইন অব দি রোমান এম্পায়ার' লেখার শেষে গিবনের মনোভাব। তখনও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র অমিতের হাতে—যে পরীক্ষা চুকাইয়া দিতে তাহার এত আগ্রহ,

এত অধীরতা, সেই পরীক্ষা শেষ হইল। কেন মনে হইল—একটু ভাল করিয়া পড়িয়া পরীক্ষাটা দিলেও হইত; এই তো এই বাড়িটার সঙ্গে শেষ পরিচয়। ফিরিয়া অমিত শূন্য দৃষ্টিতে বাড়িটার দিকে তাকাইল—বহু পরিচিত সেই সিনেট—সু-উচ্চ, গম্ভীর, অচঞ্চল।

পিছন হইতে কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কে বলিল, কি ভাবছিস?

শৈলেন। তাহারও হাতে প্রশ্নপত্র। অমিত একটু বিষণ্ণ হাস্যে কহিল, ভাবছিলুম, অ্যাডিউ।

মিছে কথা, ভাবছিলি, অ-রিভোয়া।

অমিত হাসিল। কি করে জানলি?

শৈলেনও উত্তর দিল না। খানিকক্ষণ পরে বলিল, তবে ঠিক কর, এই উঁচু বাড়িটার উঁচু মাথাটা যেন আমরা হেঁট না করি।

অদ্ভুত কথা। এম. এ. পরীক্ষার শেষ দিনটাই অদ্ভুত যে। তাহা না হইলে এরূপ কথায় অমিত ও শৈলেন দুইজনের হাসি পাইত—এই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া এমন বিশ্ববিদ্যালয়-স্তোত্র। ভাবিতেও হাসিয়া ফেলিত।

তখন সুহৃদ অমিতকে খুঁজিয়া ফিরিতেছিল; এবার সে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে নানাবিধ খাবার তৈয়ারি করাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে। তাহা খাইয়াই তাহারা যাইবে সিনেমায়—সীট বুক করা আছে। তারপরে রাত্রির আহার যে সুহৃদের ঘরেই হইবে, তাহা না বলিলেও চলে।

শৈলেনকেও সুহৃদ বলিল, চল, চল।

কিন্তু শৈলেন আসিল না। সে এখন যাইবে উটরামঘাট হইতে জাহাজে শিবপুর। সেখান হইতে ফিরবে তাহার মাসীমার বাড়ি টালায়। তিনি শ্যামবাজার রেল-লাইনের একজন দরিদ্র কর্মচারীর স্ত্রী; অবস্থা সামান্য। কিন্তু তিনি আজ তাহাকে বার বার যাইবার জন্য বলিয়াছেন। শৈলেনের পক্ষে তাহা না যামা অসম্ভব।

একা অমিতকেই যাইতে হইল। কিন্তু যাইবার সময় মনে হইল যে, সুহৃদের নিমন্ত্রণের অপেক্ষা আজ শৈলেনের সঙ্গে গঙ্গায় বেড়ানো বোধহয় উপভোগ্য হইত।

শৈলেনই হইল পরীক্ষায় ফার্স্ট। তারপর শৈলেনের বিবাহ—যে বিবাহ ইন্দ্রাণী ও সুরো স্থির করিয়াছিল...শৈলেন ইন্দ্রাণীর নামও করিল না আজ! অমিতের হাসি পাইল।

...তখনো শৈলেন বলিত—সপ্তম শতাব্দী থেকে নবম, এই হল তোর,—পালযুগ; আর দশম থেকে ত্রয়োদশ, সেনদের যুগ, এই হল আমার ;—বাংলা দেশের এই সময়টার সামাজিক ইতিহাস লেখা আমরা শেষ করব। যে বাংলার ওপর বাঙালীর জীবন গড়া সেই বাংলা কি, আমরা তা জানব, বুঝব, পরীক্ষা করে দেখব। তারপর কত জল্পনা-কল্পনা, কত প্ল্যান আঁকা, বিভাগ ছকে ফেলা, রেফারেন্সের বই সন্ধান, তাম্রশাসনের সন্ধানে যশোহরের এক গাঁয়ে গিয়া বৃথা

ঘোরা, বিক্রমপুরের রামপালে ছোটা, এক পুরানো ধনী নেপালী পরিবারের কাগজপত্র দেখতে যাওয়া। শৈলেন তখনও অমিতকে কত শাসন করিত। অমিত চিরদিন কুড়ে, চিরদিন ভবঘুরে; গানে, গল্পে, শিল্পের নামে, সঙ্গীতের হিড়িকে সময় অপব্যয় করিয়া ঘোরে—একটুকুও দায়িত্ববোধ তাহার নাই।

তারপর শ্বশুরমশায়ের ও শ্বশুরকন্যার তাড়ায় শৈলেনের জীবনে মুন্সেফির সম্ভাবনার উদয়। ধীরে ধীরে সেই চাকুরি-সূর্যের আবির্ভাব। এক গাদা নোট ফেলিয়া শৈলেন চলিল হাকিমজগতের উদয়াচল আলো করিতে। তাহাদের গবেষণা শেষ করিবার দায়িত্ব পড়িল অমিতের স্কন্ধে। অমিত কখনও করে কলেজের চাকরি, কখনও করে জার্নালিজ্‌ম; আর ঘুরিয়া ফিরে অকাজের ভূত ঘাড়ে লইয়া। কোথায় গেল পাল ও সেন যুগের বাংলার ইতিহাস? পুরাতন অধ্যাপকেরা জিজ্ঞাসা করেন, 'কত দূর হল?' বন্ধুবান্ধব তাহার ভবঘুরে বৃত্তিতে হতাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করে, 'হবে না?' আত্মীয়গণ অজ্ঞতাবশে সগর্বে মনে করে—কাজের মতো কাজ তাই দেরি হইতেছে। অমিত ভাবিয়াছে—সময় পেলেই হয় একবার—হয়ে যাবে।

* * *

শৈলেনকে দেখিয়া অমিতের আজ মনে পড়িল সেই পুরাতন সঙ্কল্প। তাহার নিজের নিকট সে সঙ্কল্প আজ আর তেমন বড় নাই। উহার মূল্য হ্রাস হইয়া গিয়াছে—যশ-কাঙ্গাল পণ্ডিত-সমাজের হ্যাংলাপনা তাহাকে পীড়িত করিয়াছে। সে বোঝে, মনে-প্রাণে উপলব্ধি করে, এ নিতান্তই একটা ভ্যানিটি—অসার-অসার-অসার। কিন্তু, শৈলেনকে কি তাহা বলিবে? সে তো বুঝিবে না—পৃথিবীর অকাজগুলিই জীবনকে এখনও সার্থক করিবার অবসর দেয়। সে জিজ্ঞাসা করিবেই, আর তখন তাহাকে অমিত কি বলিবে?

শৈলেন জিজ্ঞাসা করিবে, ধরিয়া ফেলিবে যে, সে কিছু করে নাই। শুধু কি তাহাই? হয়তো তাহাকে ছাড়িবে না, নিজের সঙ্গে বাড়ি লইয়া যাইবে, আবার পুরাতন প্ল্যানের খুঁটিনাটি লইয়া প্রশ্ন করিয়া নাকাল করিবে—কিছুতেই বুঝিবে না, অমিতের সময় নাই। শৈলেনকে বাসে উঠিতে দেখিয়া তাই অমিতের ভয় হইয়াছিল—আনন্দও হইয়াছিল—কত দিন পরে দেখা। একবার ইচ্ছা হইতেছিল কথা বলে, পুরানো দিনের মতো মন খুলিয়া গল্প করিতে বসে। কিন্তু এখন তো সময় নাই, পরে বরং দেখা করিবে। কবে? এ কি অদ্ভুত অদৃষ্টের পরিহাস! অমিত, যে শৈলেন একদিন ছিল তোমার জগতের একজন নিত্যসহচর, আজ তাহাকেই তুমি ফাঁকি দিয়া পলাইয়া ফিরিতে চাও? বাহিরের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া অমিত নিজের এই কপটাচরণে একটু গ্লানি বোধও করিতেছিল। এমন সময়েই শৈলেন হঠাৎ বলিল—আরে, অমিত না?

অমিতের মন আনন্দ ও আশঙ্কায় সমভাবে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। পুরানো দিনের বন্ধুত্বের স্মৃতি মনে জাগিল। তাহার এই কর্মগ্রস্ত জীবনের উপরে সেই শান্ত

দিনের ছায়া একটি মুহূর্তের জন্য মোহ বিস্তার করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল---সেই পুরানো দিন, সে চলিয়া গিয়াছে; আজিকার কর্মপারাবারে তাহাকে টানিয়া আনা চলে না, টানিয়া আনিতে সে চাহেও না---হউক তাহা যত শান্ত, যত সুন্দর...সেই লঘু স্বচ্ছ অনায়াস দিনের সৌখিন কথা ও কল্পনার মধ্যে অমিত আর ফিরিতে চায় না, ফিরিবে না, ফিরিতে পারিবে না।

শৈলেন বলিয়া চলিল, শ্বশুরমশাই...ল অব মর্গেজ..হাইকোর্টের বন্ধুদের দেখলে পিটি হয়...

একই সঙ্গে অমিতের মনের আনন্দ ও আশঙ্কা নিবিয়া যাইতে লাগিল। সত্যই পুরানো দিন। পুরানো শুধু তাহার কাছে নয়, শৈলেনের কাছেও সে-দিন বিগত-আয়ু ---বিগত আলো। কেন? কেন এমন হইল?

মুন্সেফির নথিপত্রের চাপে? সরকারী চাকুরির যন্ত্রচাপে? ভাল মাহিনা, মফস্বলের প্রাণহীন জীবনযাত্রা, হাকিমির বর্বরতা, পরিণাম—সরকারী চাকুরের বৈকুণ্ঠলাভ—ডাইবিটিস ও ডিস্‌পেপ্‌সিয়া; জীবনের ক্রেডিট—মোটা পেনশন ও হাকিম-গিন্নী।...

অথবা এমনই জীবন—ইহাই নিয়ম।

* *

শিয়ালদহ আসিয়া গিয়াছে। অমিত উঠিয়া দাঁড়াইল। শৈলেন বলিল, আরে, উঠলি যে? নাববি? কোথায় যাচ্ছিস? কোনও কথাই জিজ্ঞাসা করা হল না। কি করছিস তাও তো বললি না? সেই সিটি কলেজের চাকরিটাতেই আছিস তো? তা কেমন লাগে পড়ানোর কাজ?

নামিতে নামিতে অমিত উত্তর দিতেছিল, কেটে যাচ্ছে।

তোর ভাল লাগবারই কথা। তা, কাল একবার আসবি আমাদের ওখানে? না, কাল নয়,। সেই শনিবার—মৃণীনও আস'ব। সব কথা হবে। দুপুরে কিন্তু, পরে ম্যাটিনিতে একবার 'কর্ণার্জুন' দেখতে যাব। ভুলিস না। ঠিকানা মনে আছে কি তোর? ১৩/১, হ্যাঁ। অনেক কথা আছে, ভুলিস না।

শিয়ালদহের মোড়ে দাঁড়াইয়া বাস-কণ্ডাক্‌টার হাঁকিতেছে 'মৌলালি, কালীঘাট'। তাহার সঙ্গে পাল্লা দিয়া শৈলেন বলিয়া চলিয়াছে। অমিত যাইতে যাইতে মাথা নাড়িয়া তাহাকে জানাইয়া গেল, হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে হবে।

দুই বৎসর পূর্বে সিটি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক-পদের জন্য অমিত ছিল প্রার্থী। তখনই শৈলেন চাকুরি পাইয়া যায় কুড়িগ্রামে। তাহার পরে শৈলেন আর অমিতের খোঁজই লয় নাই। লইলে আজ জিজ্ঞাসা করিত না 'পড়ানো কেমন লাগে?' সেই সিটি কলেজের চাকুরি তাহার ভাগ্যে জুটে নাই। কপালগুণে একটি সেকেণ্ড ক্লাস এম. এ. পাস ব্রাহ্ম ছোকরা প্রার্থী পাইয়া সে যাত্রার মতো কর্তৃপক্ষ অমিতকে বিদায় দিয়াছে। তাহার পরেও অধ্যাপক নামের গালভরা গুরু-গৌরব অমিতের আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছিল—যদি সে যাইত কল্টাইয়ের কলেজে বা

পাঞ্জাবের একটি সনাতন ইন্টারমিডিয়েট কলেজে। কিন্তু সে গেল না। প্রফেসার নামের উচ্চ মহিমা দুই-দুইবার সে নিজের দোষে হারাইল। ইহার পরে অনেক কিছু ঘটিয়া গেল—অনেক কিছু আসিয়া তাহার হাতে জুটিয়াছে। কলিকাতায় 'অধ্যাপক' নামও সে পাইয়াছে। তাহার জীবনের উপর দিয়া এখন দ্রুত শ্বাস-রোধকারী গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে একটা বিষম ঘূর্ণি।

শৈলেন জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন লাগে পড়ানোর কাজ?' কি বলিবে অমিত? সত্য বলিতে হইলে অনেকক্ষণ লাগিবে, আর তাহার দরকারই বা কি?...আশ্চর্য মানুষের জীবন! শৈলেন একবার জিজ্ঞাসাও করিল না, 'ইন্দ্রাণী কোথায়? সুরো কোথায়? নবম শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস কতদূর?' কি বলিত অমিত তাহাকে? বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর ইতিহাসের বিপ্লবাত্মক সম্ভাবনার কথা?

নবম শতাব্দীর বাংলা অতীতের চিতাধূমে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। আজ ১৯৩১-এর ডিসেম্বর। সেনেট হাউসের সম্মুখে ছয় বৎসর পূর্বে যে কাঁধে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে শৈলেন হারাইয়া গিয়াছে—সে অমিত নাই। এমনই জীবন...ইহাই নিয়ম।

কিন্তু ইহাই কি নিয়ম? অমিতের এখনও বিশ্বাস হয় না, ইহাই নিয়ম—এমনই জীবন।

জীবনের দিকে পিছন ফিরিয়াছে বলিয়াই আজ জীবন শৈলেনকে ফাঁকি দিয়াছে—যেমন ফাঁকি দেয় সংসার সকলকে। তুচ্ছ চাকরি, ক্ষুদ্র আরাম, মিথ্যা আত্মপ্রসাদ—জীবনের ডাক কানেই পৌঁছায় না। সে ডাক শুনিলে এ সব ভাসিয়া যাইত, কোন্ অতলে ডুবিয়া যাইত। নবম শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের মতো, খড়ের মতো, কুটার মতো, নদীস্রোতের শ্যাওলার মতো, ছিদ্রহীন, অবকাশহীন, অমিতের অনলস দিনরাতগুলির মতো, কোথায় ভাসিয়া, তলাইয়া, মিলাইয়া যাইত তাহাদের সুখদুঃখ, তাহাদের সাক্‌সেস, তাহাদের সংসার।

দশ মিনিট আপনার মনে ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া অমিত থমকিয়া দাঁড়াইল, তাই তো আসিয়া গিয়াছে যে! কেহই লক্ষ্য করে নাই তো? অপরিচিত দুই-চারিটি লোক সম্মুখে, পিছনে চলিয়াছে। মোড়ে পানওয়ালীর দোকানে কে দাঁড়াইল, একটা পান কিনিতে লাগিল—ময়লা রঙ, গায়ে লম্বা শার্ট।

অমিত কোন দিকেই দৃষ্টি রাখে নাই, আপনার মনেই ভাবিয়া চলিতেছিল! একটু অগ্রসর হইয়া সে একবার পানের দোকানের নিকট পৌঁছিল—এক বাণ্ডিল বিড়ি কিনিয়া ধরাইয়া লইল। সে আসিবার পূর্বেই লম্বা-শার্ট-পরা লোকটা একবার তাহার দিকে তাকাইয়া আবার পানওয়ালীকে কি একটা ইশারা করিয়া চলিয়া গেল।

অমিত বিড়িটা হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে খানিকটা ভাবিল, তারপর নিজের মনেই বলিল—না, বাজে ভাবনা।

দুই পদ অগ্রসর হইয়া সে পাশের গলিতে একটা বস্তিতে ঢুকিয়া পড়িল। আর একবার ফিরিয়া পিছনে দেখিল, না, কেহ কোথাও নাই।

তিন

সুনীল চা খাইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, দেরি হইবে না। নিকটেই একটা দোকান আছে, দুই পয়সা কাপ চা ও শুকনো টোস্ট মিলিবে, ডিমও পাওয়া যায়। বড় জোর দশ মিনিট লাগিবে। অমিত তাহার বিছানার উপর বসিয়া শূন্যমনে পুরাতন সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইতে লাগিল। সংবাদগুলি তাহার পড়া—যেগুলি কাজের কথা সবই জানা আছে; অতিরিক্ত সংবাদ জানিবার সময়ও নাই, ইচ্ছাও নাই। সামনের রবিবার ক্যালকাটা ক্রিকেট গ্রাউণ্ডে কে কে খেলিবে, কোথায় একটা হ্যাট্‌ট্রিক দেখাইয়া কোন্ খেলোয়াড় নাম করিয়াছে, নর্থ ক্লাব বা সাউথ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে এবার কাহার জিতিবার সম্ভাবনা—এই সব সংবাদ এখন আর পড়িতে মন যায় না। সংবাদপত্রগুলির পাতা তাই অনির্দেশ্যভাবে সে দেখিয়া যাইতে লাগিল—মন জুড়িয়া রহিয়াছে আপনার ভাবনা।

...টাকা, টাকা, টাকা। ত্রিশ টাকা হাতে পাইতেই সুনীল বলিয়া বসিল, যদি শতখানেক টাকা পেতে অমিদা! শতখানেক টাকা—কি অবুঝই সুনীল। ত্রিশ টাকার জন্য হাত ঘড়িটা বাঁধা দিতে হইয়াছে, তাহা সে জানে না। জানিলেই বা কি? চিরদিন আদরে লালিত পালিত, সম্পন্ন ঘরের ছেলে, খরচ করিতেই সে জানে। কোথা হইতে টাকা আসিবে না-আসিবে তাহা ভাবিতে শিখে নাই। কিন্তু টাকা দিয়া তাহার এখন আবার কি প্রয়োজন? সুনীল সেই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিল না। কথাটা এড়াইয়া গিয়াছে। একবার বলিল, ধার আছে। আবার বলিল, হাতে থাকলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়—যেরূপ অনিশ্চিত অবস্থা। কোন্ দিন কখন পাততাড়ি গুটিয়ে বেরুতে হবে ঠিক নেই। কিছু টাকা থাকলে তবু একটা ভরসা থাকে। সুনীলের এই কথাও খাঁটি উত্তর নয়। অমিত মনে মনে নানারূপ আশঙ্কা করিয়া জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিল। অমিতের উৎকণ্ঠা ও প্রশ্ন বাড়িয়া উঠিতেছে বুঝিয়া সুনীল বলিল, দাও দিকিন এখন আনা দু-চার পয়সা, চা-টা খেয়ে আসি। তুমি ততক্ষণ একটু বসো, কাগজগুলো উল্টাও।

অমিত কাগজ উল্টাইতে উল্টাইতে আপনার ভাবনায় ডুবিয়া গেল।

সুনীল খানিক পরে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তুমি আসবার সময় কোনও লোক দেখেছিলে—লম্বা শার্টপরা, ময়লা রঙ—?

কেন?

দেখেছিলে কি না? মনে হয়, লোকটা কদিন ধরেই এদিকে ঘুরছে। তাই বলছিলুম, বাড়িটা বদলাতে হবে, আর দেরি নয়।

বেশ, এখন তো টাকা আছেই। তোমার হোটেলের দেনা আর ঘরভাড়া চুকিয়ে দাও। আমি কাল তোমার অন্যত্র ব্যবস্থা করছি।

কোথায়?

বরানগরে। আমার এক বন্ধু, নিকুঞ্জ চক্রবর্তী, একটা ছোট্ট দেশী তেলসাবানের

কারবারের ম্যানেজার হয়েছে, থাকে সে কলকাতায়। কিন্তু বরানগরের ফ্যাক্টরিতেও থাকবার ব্যবস্থা আছে—সামনের মাসেই সেখানে যাচ্ছে। তোমাকে থাকতে দেওয়া শক্ত হবে না। নিকুঞ্জকে একবার বলতে হবে ; ওর স্ত্রী নিশ্চয়ই রাজি হবেন। তা হলে তাঁদের সঙ্গেই থাকবে—একটি ছেলে, মেয়েও আছে নিকুঞ্জের।

সুনীল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, বরানগর বড় দূর হবে। এখানে থাকা সম্ভব নয়—শহরের ওপর ?

শহরের ওপর থাকা কি দরকার ?

দরকার ? বলিয়া সুনীল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে বলিল, দরকার নয়, তবে থাকাই উচিত। তাই আপাতত থাকতে হবে।

অমিত একটু সময় নিস্তব্ধ রহিয়া হঠাৎ সংবাদপত্রের উপর দৃষ্টি ফিরাইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিয়া চলিল, তুমি কি ভাবছ সুনীল, জানি না। কিন্তু আমার কথা না শুনলে আমি কি করব !

সুনীল উত্তর দিল, তুমি কি বলেছ, যা শুনিনি ?

তোমার বর্তমান উদ্দেশ্যটা কি ? কি মতলব তোমার মনে আছে, তা স্পষ্ট করে বলছ না কেন ? বলছ, 'আরও টাকা চাই।' কেন, তা বলবে না। কলকাতা শহরে থাকা এখন তোমার দরকার। কেন, জানতে চাইলে বোধহয় সোজা উত্তর এড়িয়ে যাবে। কিন্তু তা জানলে বোধহয় আমার পক্ষে সুবিধে হয়।

সুনীল বলিল, তা জানা না-জানা তোমার পক্ষে সমান। তুমি জেনে বিড়ম্বিত হবে ; আরও তোমার প্রশ্ন বাড়বে, আবার তর্ক উঠবে। তাতে আমার একবিন্দুও মত বদলাবে না। কাজেই, না জেনেই তুমি ভাল আছ। আরও ভাল থাকতে পারো, যদি এবার থেকে তুমি আমার খোঁজ-খবর নেওয়া ছেড়ে দাও।

অমিত শান্তস্বরে কহিল, এতদিন পরে আবার এই উপদেশ তুমি না দিলেও পারতে।

পারতাম, যদি জানতাম তোমার সর্বনাশ হচ্ছে না। কিন্তু বেশ জানি, তুমি ডুবছ। অথচ সাধ করে মনের আনন্দে তুমি ঝাঁপিয়ে পড়নি—তুমি শুধু 'কম্বলির মায়া' কাটাতে পারছ না বলেই তলিয়ে যাচ্ছ। কম্বলি হলেও তোমাকে ছাড়তে আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা।

অমিত জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, রাখো ডেঁপোমি। খুব বাহাদুর হয়েছ। এখন বলো তো, কি তোমার মতলব ?

সুনীল হাসিয়া কহিল, সে জেনে তোমার কি হবে ?

তবে চল নিকুঞ্জের ওখানে। আমি আজ গিয়ে নিকুঞ্জের কাছে কথাটা পাড়ব। ওর স্ত্রী সুরমা শুনলে নিশ্চয়ই রাজি হবেন। তাঁর এক খুড়তুতো ভাই এরকম অবস্থায় ঘুরে ঘুরে শেষটা টাইফয়েডে পড়ে। বাড়িতে ফেরা তো দূরের কথা, বিধবা মা দেওর-ভাসুরের ভয়ে খোঁজও নিতে পারেন নি। ক্যাম্বেল হাসপাতালে শেষদশায় তার স্থান হল। মা খবর পেয়ে সুরমাকে নিয়ে গোপনে দেখতে গেলেন। কিন্তু তখন

তার হয়ে এসেছে। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বাড়ি ফিরলেন। কিন্তু কাঁদতেও তাঁর মানা। বাড়ির কর্তারা বলেন, তুমি তাকে দেখতে গেছলে জানলে আমাদের চাকরি যাবে। সাবধান! সে হতভাগার জন্যে অনেকই তো সইতে হয়েছে, এখন পরিবারসুদ্ধ ভাসিয়ে দিও না।

সুনীল শুনিতেছিল। গল্পটা শেষ হইলে বলিল, তাই বুঝি তুমি এবার এই বন্ধুটিকে সপরিবারে ভাসিয়ে শোধ তোলবার চেষ্টা করছ? কিন্তু তার দরকার হবে না, আমি ওখানে যাব না।

কেন?

বলেছি, আমায় শহরে থাকতে হবে এখন।

কিন্তু তার কারণটা বলো নি।

নাই বা শুনলে।

অমিত খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তা হলে দু-চার দিন আমাদের বাড়িতে থাকো; পরে অন্যত্র ব্যবস্থা করে ফেলবে।

তার চেয়ে বলো না কেন তোমাকে সুদ্ধ হেঁটে গিয়ে থানায় উঠি? তারও সুব্যবস্থা হবে।

এ কথার মানে?

সেই ময়লা-রঙ শার্ট-পরা লোকটা তোমাকেও লক্ষ্য করেছে। ইন্দ্রাণীদি যেদিন হঠাৎ এলেন, সেদিন থেকেই যেন কেমন ঠেকছে। ওঁকে সবাই চেনে, হয়তো খোঁজও রাখে। আমার এ পাড়ায়ও তাঁর আসা ওরা জেনেছে নিশ্চয়ই। তারপর বুঝছ! সব জানি না, কিন্তু এ সম্বন্ধে ভুল নেই যে, তিনিও সন্দেহভাজন হয়েছেন, আর তুমিও আমার সঙ্গ ক্রমেই জড়িয়ে পড়ছ। মেসোমশায় মাসীমার কথা ছেড়ে দিলাম; মনু-অনুর কথাও না ভাবলুম;—আমাকে দেখলে তাঁরা কি মনে করবেন, কত বিব্রত হবেন, সে সব দুর্ভাবনা না হয় আমার পক্ষ থেকে বাজে জিনিস; কিন্তু তোমার ওখানে যাওয়া মানে এখন বিপদকে জেনেশুনে বরণ করা। তুমি হয়তো তা বুঝছ না; কিন্তু জেনো, তুমি নিজেও ততটা নিরাপদ নও।

আমার ভাবনা তো আমার—

আমার ভাবনাও তেমনই আমার। তার তোমার ওখানে যাওয়া তাই অসম্ভব।

অমিত কহিল, ইন্দ্রাণীও তো তোমার ভার নেওয়ার জন্যে কতবার বলেছেন—

সুনীল বলিল, সে প্রায় কংগ্রেস-আপিসে গিয়ে ওঠার সামিল হবে—অত সভা-সমিতি, হৈ-চৈ দেশোদ্ধারের কাছে থাকলে ক'মিনিট আমার কথা কার না-জানা থাকবে?

অমিত খানিকক্ষণ নীরব রহিয়া কহিল, সুহৃদের কাছে কিছুদিনের মতো থাকতে তোমার আপত্তি আছে?

কোথাও থাকতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আপত্তি হবার কথা তাদের। সে সৌখিন লোক, গান-বাজনা নিয়ে থাকে, জেনেশুনে ঝক্কিটা ঘাড়ে নেবে কি?

আর না জেনেশুনে রাখলে অনেক সময় এমন ভুল করে বসবে, যাতে সেও ডুববে, আমিও ডুবব। তার সঙ্গে কথা বলেছ?

বলব না-হয় আজ সন্ধ্যায়।

কিন্তু আমার যে আজই যাওয়া দরকার।

আজই?

দেরি করা ভাল হবে না। কাল রাতেও আমি এখানে ছিলাম না; বোধহয় তাই এতক্ষণও নিরাপদ আছি। কাল রাতে হোটেলে যখন খাচ্ছি, তখন মনে হল হোটেলওয়ালা বিল্টুচরণ যেন কেমন আড়চোখে দেখছে। অন্য দিন খেতে বসবার আগে ও খাওয়ার শেষে তার তাগিদ শুনতে হয়—'পনেরো দিন আগাম দূরের কথা, মাস চলছে শেষ হতে, তেরো টাকার একটি পয়সাও দিলে না, জগৎ? চলবে কি করে? এনেছ কিছু আজ? আনো নি অথচ গিলতে এলে বেশ! লজ্জা করে না?' কাল বিল্টুর সে সব বচনামৃত নেই। বরং আমি খেয়ে উঠতে যে ভাবে টাকার কথাটা পাড়লে, শুনে ভুল হল আমিই বুঝি পাওনাদার আর বিল্টুচরণ দেনাদার। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত ঠেকল। ভাবলাম, না, কোথাও একটু গোল ঘটেছে। গলিতে খানিকক্ষণ না ঢুকে গেলাম শেয়ালদার দিকে দুপাক ঘুরে বুদ্ধি ঠিক করতে। রাত সাড়ে দশটায় ফিরে দেখলাম, কাঠের গোলার বারান্দায় একটা লোক বসে বসে সিগারেট টানছে। এ গলিতে এ মূর্তি নতুন। মনের সন্দেহ বাড়ল। ঘরটায় না ঢুকে সটান বেরিয়ে গেলাম —এগিয়ে একেবারে নেবুবাগান। পথে পথে ঘুরে আর রাত ফুরোয় না, পথই কেবল ফুরোয়। ফিরব কিনা ভাবছি, রাত আড়াইটে হয়ে গেছে, পা-টাও চলে না, শরীর এলিয়ে আসছে। এমন সময় বউবাজারের মোড়ে পাহারাওয়ালার কবলে পড়লাম। কিছুতেই ছেড়ে দেয় না। বাপ ডাকি, দাদা ডাকি, সেপাইজী অটল। অন্তত একটা সিকি চাই। তখন বুঝলুম, সিকি জিনিসটা কত প্রয়োজনীয়। 'লয়টারিং'-এর দায়ে মুচিপাড়ায় নিয়ে হাজির করে আর কি? জানো তো, বিজয়কে কি করে ধরলে? আস্তানাটায় পুলিশ আগেই গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছে। গলির মোড়ে বিজয় পৌঁছতেই একজন ধরে ফেললে। তারপর বিজয় শুরু করলে দরদস্তুর---পকেটে ওর তেরো আনা মাত্র; ওরা চায় পাঁচ টাকা। কিছুতেই যখন পেল না তখন নিয়ে গেল স্যার্‌চিং পার্টি-র কাছে; বাস্‌। কাল আমারও প্রায় সে দশা। সিপাইজী দেখলেন, সঙ্গে কিছু নেই। শেষটায় নজরে পড়ল গায়ের শালটা। বললে, 'শালা, এ শাল তোমার নয়।' প্রথমটা আপত্তি করলাম। তারপর বুদ্ধি করে মেনে নিলাম—এ শাল সিপাইজীর। তাকে তা তৎক্ষণাৎ ফেরৎ দিয়ে দিলাম। তখন সে বঝলে যে আমি সজ্জন। কানে ধরে পিঠে লাঠির গোড়াটা দিয়ে এক ঘা বসিয়ে ঠেলে দিয়ে বললে, 'যা শালা এবারকার মতো বাঁচলি।' আর বেশি ঘোরাফেরা না করে তখন বউবাজারের একটা বাড়ির বারান্দায় উঠলাম। জনচারেক পূর্বেই সেখানে আপাদ-মস্তক ঢেকে ঘুমুচ্ছিল; আমি তাদের পাশেই একটু জায়গা করে নিলাম। সকাল

হলে এই আটটার সময় বেশ বুঝেসুঝে, চেয়েচিন্তে এ-মুখো হয়েছি। তখন তো কেউ এ গলিতে ছিল না। এখন কিন্তু দেখলাম, একটা ময়লা-রঙের লম্বা শার্ট-পরা লোক বসে আছে ওদিককার দোকানটার বারান্দায়। কাজেই আর দেরি করা চলবে না। এখনই বেরুতে হবে—তুমি আগে যাবে গলির এ মোড় দিয়ে লোকটার সামনে দিয়ে। আমি যাব ওমোড় দিয়ে 'রাগ'টা কাঁধে ফেলে।

কিন্তু জিনিসপত্র, ঘরভাড়া, হোটেলের দেনাটা?

ওসব এবারকার মতো থাক। নইলে নিজেকেই থেকে যেতে হবে।

গরিব বেচারীরা ঠকবে যে!

তাতে কি? পাপ হবে? হল না হয় পাপ। ও পাপ আমার সইবে। যে ঘর আর যে খাওয়া হোটেলের, সেজন্যে ভাড়া চাইলে আর পয়সা চাইলে ওদেরই পাপ হওয়া উচিত।

অমিত একটু নীরব রহিল, পরে কহিল, কিন্তু যাবে কোথায়?

তোমার কোনও জানা জায়গা নেই, না? আচ্ছা, দিনের বেলা আর রাতটা আমি কাটাতে পারব---এক-আধদিন। তুমি বরং একটা খোঁজ দেখ।

কি করে কাটাবে?

সে চলে যাবে।

কিন্তু জায়গা ঠিক করতে পারলে আমাকে কোথায় খবর দেবে?

তোমার আপিসে ফোন করবো পাঁচটার সময়।

অমিত ভাবিল, বিকালে কথা আছে ইন্দ্রাণীদের জলুস দেখবার। তা না হয় একটু দেরি হবে, ইন্দ্রাণীকে বুঝিয়ে বলা যাবে।

সুনীল তাহাকে ভাবিতে দেখিয়া বলিল, আপিস যাবে না আজ? তবে?

দুইজনে একটু চিন্তা করিতে লাগিল। শেষে সুনীল বলিল, তোমার যাওয়া ভাল হবে না, কিন্তু নেহাত দরকার মনে করলে তেরো নম্বর হাজরা লেনে যাবে। বাড়িটা ভাল নয়, নানা জাতের মেয়েমানুষের বাস। সেখানে খোঁজ করতে হবে যমুনার। তাকে বলবে, চিন্তাহরণ চাটুজ্জেকে চাই। আর সেই চিন্তাহরণ চাটুজ্জে এলে—গৌরবণ, বছর আটাশ বয়স, বেশ মুগুরভাঁজা শরীর—বলবে, 'সুকুমার সেনকে এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন।' ঠিকানাটা, সময়টা ব'লো।

অমিত বলিল, কে তোমার চিন্তাহরণ জানি না, তোমার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক তাও জানি না। আর যেসব মেয়ের কথা বলছ, তাদের কারও সঙ্গে আমি কথা কইতে পারব না। তার চেয়ে তুমি চল ইন্দ্রাণীর ওখানে, না হয় সুহৃদের বাড়ি—সুহৃদের নীচেকার ঘরে বসবে। আমি ওপরে সুহৃদ ও সুধীরার সঙ্গে কথা ঠিক করে ফেলব। নিদেন দিনটা সেখানে অপেক্ষা করবে; আমি রাত্র নাগাদ সব ব্যবস্থা করব। আর এদিকে সুহৃদের মোটরে গেলে আমি মিনুকে নিয়ে আসতে পারব। তোমাকে সে একবার দেখতে চায়। অনেকবার আমাকে খবর পাঠিয়েছেও। আর সন্ধ্যের পরে সুহৃদের মোটরে তুমি যেখানে চাও তোমায় অতি সহজে পৌঁছে দেবে—একেবারে নিরাপদ হবে।

সুনীল একটু নীরবে ভাবিল, বলিল, সে হয় না। এখনই আমি বেরুব একটা কাজে—দুপুরেও কাজ চুকে যাবে কি না কে জানে? সন্ধ্যায় তো অবসর নেই—অন্তত দশটার পূর্বে আমি ফুরসুত পাব না। তুমি যা করতে হয় করে রাখো; আর দু-চারদিন সংবাদ না পেলে ভেবো না। অসুবিধা বুঝলে আমিই তোমার কাছে আবার লোক পাঠাব। সেই বিভূতি বলে যে ছোকরাকে পাঠিয়েছিলুম, তাকেই না হয় পাঠাব। ঠিকানা, সময় তাকে তখন বলে দিও। দু-চারদিনে কিছু হবে না। বরং ততদিনে তুমি দেখো, কিছু টাকা যোগাড় করতে পারো কি-না—শত-দেড়েক টাকা।

শতখানেক হইতে অঙ্কটা অর্ধ ঘণ্টায় শতদেড়েকে দাঁড়াইয়াছে—অমিত মনে মনে আবার শঙ্কিত হইল।

কিন্তু টাকা দিয়ে কি হবে, তা তো বলছ না? আর এ দু-চারদিনই বা কোথায় থাকবে?

সে হবে। জানোই তো, বার্ডস্ অব এ ফেদ্যার ফ্লক্ টুগেদ্যার।

অমিত তাহা জানে। কিন্তু এই নীড়হারা সমজাতীয় পাখীদের মিলিতে দেওয়া অপেক্ষা তাহাদের দূরে দূরে রাখাই তাহার মনের ইচ্ছা। সে জানে, মিলিলে ইহাদের আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না, উহারা উড়িয়া পুড়িয়া শূন্যে মিলাইয়া যায়। কিন্তু তাহার মনের ইচ্ছাটা গোপন করিয়া রাখিতে হয়, না হইলে সুনীলের কোন উদ্দেশই আর পাওয়া যাইবে না, সে এক মুহূর্তে সব ছাড়িয়া, সমস্ত ভুলিয়া পলাইবে।

আচ্ছা, পাঁচটার সময় আপিসেই না-হয় একবার ফোন করো, আমি থাকব। আর এক কথা, মিনু তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়—আজই দেখা হলে ভাল হয়। জানই তো তাদের বাড়ির চাল! পুরানো ঘর, তাদের বাড়ির বউদের এক পা নড়তে একশো বাধা। তোমার জামাইবাবুও তেমন শক্ত নয়। সাহেবী আপিসে বড় চাকরি করেন, অনেক টাকা জমিন আছে। তোমার দিদি তো ভয়ে কিছু বলতে পায় না। বাবা-মার নাম করে আমি সেদিন তার শ্বশুরমশায়কে তিন ঘণ্টা ভজিয়ে এসেছি। বুড়ো শেষে রাজি হয়েছে—আমরা গাড়ি পাঠালে একদিন মিনু তার ভায়ের মেয়ে বীণাকে নিয়ে আমাদের বাড়ি বেড়াতে আসবে—কিন্তু তাড়াতাড়ি ফেরা চাই। তুমি রাজি হলে আজ এখনই বেরিয়ে তাদের বলতে যেতে হয়—আজ গাড়ি পাঠাচ্ছি। বীণা মেয়েটা মন্দ নয়—ছোট কাকীকে বেশ ভালবাসে, গোলমাল হবে না। সে যে তোমাকে দেখবার জন্যে কি করছে, তুমি তা জানো না।

কিন্তু আজ যে হয় না, আজ কাজ আছে।

কবে? কাল? কোথায় আবার দেখা হবে? তার চেয়ে আজই চলো না—দুপুরে মিনুদের বাড়ি সুহৃদের গাড়ি পাঠাব'খন।

সুনীল মাথা নাড়িল অসম্মতি জানাইল।

অমিত ধীরে ধীরে বলিল, তোমার কথা আমরা বুঝি না। কিন্তু মায়ের

পেটের বোন মিনু, সে তোমাকে দেখতে চায়—একটিবার চোখে মাত্র দেখবে, সে তোমাকে ধরেও রাখবে না, ধরিয়েও দেবে না—তাতে যে তোমাদের কি আপত্তি, কি প্রিন্সিপ্‌লের বাধা ঘটতে পারে, সে আমার বোঝা অসম্ভব।

সুনীল হাসিয়া ফেলিল, প্রিন্সিপ্‌লও নেই, আপত্তিও নেই,—সময়ের আর সুযোগের অভাব। নইলে মায়ের পেটের বোন কেন, দুনিয়ার সকল আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গেই বসে আড্ডা জমাতে পারি। মণির কথা তো তোমাকে বলেছিই—তোমাদের কল্পনায় অমন মমতাহীন কঠিন লোক কম মেলে! কিন্তু কে জানে তার এই কাঠিন্যের পিছনকার সত্য? তার আপন-জনদেরও তা জানবার অবকাশ ঘট্‌লো না।

সুনীল গম্ভীর হইয়া উঠিতেছিল। একটু পরে বলিল, আপন জন, আপন জন, আপন জন! দেখেছি সবাইকে। তুমি ভাল ছেলে হও, পাস দাও, চাকরি করে টাকা জমাও, দশ গণ্ডা ছেলেপিলে জন্ম দিয়ে ক্লাব, থিয়েটার, বায়স্কোপে ভেসে বেড়াও—আপন জন তোমার পরম আপন থাকবে। তুমি পরম আদরে থাকবে। ছোড়দা তোমারই বন্ধু না, অমিদা? এক সঙ্গেই না দুজনে শিবাজী হবার কল্পনা করতে? প্রতাপসিংহের মতো বনে বনে বেড়াবার প্রতিজ্ঞা করেছিলে, ম্যাট্‌সিনি গ্যারিবল্‌ডী থেকে 'প্রস্‌পারাস ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' পর্যন্ত একসঙ্গেই পড়ে না তোমরা নিদ্রাহীন চোখে ইস্কুলে-কলেজে দিন কাটিয়েছ? পাহারাওয়ালা সার্জেন্ট দেখলেই হাত গুটিয়ে দাঁড়াতে? ছোড়দা থাক, বউদিদেরও দেখলুম। নব নব শাড়ী ব্লাউজ, কলকাতার ফ্যাশানের মফস্বলী অনুকরণ, হীরের গয়না, উঁচু খুরওয়ালা জুতো—বাস, ওখানেই শেষ। 'তুমি হীরের টুকরো ছেলে ঠাকুরপো।'---যখন তাদের কাছে হাত পাতলাম, ভয়ে তাদের প্রাণ শুকিয়ে গেল। কেউবা হেসে খুন—উপহাসের এমন জিনিস জীবনে ওরা পায়নি। কেউবা ভয়ে বিবর্ণ—'কি করব ভাই, তোমার দাদা যে শুনলে কেটে ফেলবেন'। এরাই স্বাধীনা, পর্দাহীনা, শিক্ষিতা, বাংলা দেশের মহিলা প্রগতির প্রবর্ত্তী।

অমিত মুখ তুলিল না, একবার কহিল, তবু তাদের স্নেহের অপমান করো না।

না না। তবে নি-খরচার ওই স্নেহ থেকে দু ঘা ঝাঁটা দিয়ে কিছু টাকা দিলেও বুঝতাম ,ওদের মন আছে, জোর আছে, ভেতরে মানুষ আছে।

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল। সুনীল উঠিয়া দাঁড়াইল বলিল, চল, এখন বেরুই, আর দেরি করা নয়। তুমি আগে যাও।

অমিত জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে মিনুর সঙ্গে দেখা হবে না?

সুনীল শান্তস্বরে কহিল, হবে, তবে দিনটা তোমাকে পরশু বলে পাঠাবো। দিদিকে ব্যস্ত হতে নিষেধ করো—বুঝিয়ে বলো, বেশ আছি।

পাঁচটার সময় ফোন করো—আপিসে। আমি ততক্ষণে একটা ব্যবস্থা করবোই।

অমিত ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল। সুনীলের ক্ষোভের কারণ অমিতের জানা ছিল, তাই অমিত সুনীলের উপর বিরক্ত হইতে পারিল না।

চার

অমিত পথে চলিতে লাগিল। আজ সুন্দর প্রভাত—শীতের রৌদ্রভরা পথ আজ; কিন্তু তখন...

*　　*　　*

গ্রীষ্মের ছুটিটা তখন প্রায় দুয়ারে আসিয়া গিয়াছে। উপরে রৌদ্রময় তাম্রাভ আকাশ; নীচেকার শুষ্ক, রুক্ষ, পিঙ্গল তরু-লতা-পাতার উপরে আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে। দেশের মনের আকাশ লালে লাল। সে কি দিন!

স্কুল ভাঙিয়া যাইতেছে, কলেজ টলিয়া পড়িতেছে—কিশোর ও যুবক প্রাণগুলি দিশেহারা, লক্ষ্যহারা; অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতে আপনাদের তুলিয়া দিবার জন্য তাহারা অস্থির। তাহাদের মনে সুদূর আদর্শের অস্পষ্ট আহ্বান পৌঁছিয়াছে—তাহার সকল রূপ, সকল দিক, কার্যকারণ বিচার করিবার মতো তাহাদের না আছে চিন্তার দৃঢ়তা, না আছে চিত্তের স্থিরতা—একটা কিছু করিতে হইবে, একটা ভাবময় গৌরবময়, আবেগময় অনুষ্ঠান, যাহাতে আত্মদানের মহিমা আছে, স্বার্থত্যাগের তীব্র মোহ আছে, জীবনের সচরাচরতা যাহাতে মুছিয়া যায়। অমিতের নিজের মন হইতেও সেদিনের তীব্র দ্যুতি মুছিয়া যায় নাই!

সকাল সন্ধ্যা শহরের পথে পথে, ছেলেদের মেসে মেসে, মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া রৌদ্রশুষ্ক সুনীল যখন 'একটা কিছুর' পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছিল, এমনই সময়ে কলেজ বন্ধ হইয়া গেল। যাহাদের সংস্পর্শে তাহার উত্তেজনা খোরাক পাইয়া বাঁচিয়া, বাড়িয়া উঠিতেছিল, সেই সতীর্থ ও সমবয়স্কদল একে একে বাড়ি গেল। সুনীলের মনের অগ্নিদীপ্তি চারিদিককার উত্তেজনা হইতে বিমুক্ত হইয়া তখন কয়েক দিন ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া আপনার মনেই জ্বলিতে লাগিল। তারপর সেও ফিরিল বাড়ি। প্রথম মনকে বুঝাইল, সেখানেই আসল কাজ,—দেশের নিজস্ব আঙিনা; —সেখানেই তো দেশের যজ্ঞানল প্রজ্জ্বলিত হইবে। সুনীল বলিত, অমিদা, দিন-দুই যজ্ঞানল জ্বলেছেও। বাড়ির সঙ্গেই মাইনর স্কুল; তাহাদেরই পরিবারের অর্থানুকূল্যে বিশেষভাবে প্রতিপালিত। সেই মাইনর স্কুলের মাইনরদের লইয়া তিন ক্রোশ দূরের নোনা জলের খাল হইতে জল ও মাটি আনিয়া মহাসমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ হইল—লবণ পাওয়া গেল না। তবু এক সপ্তাহ উৎসাহ নিবে না। শেষে একদিন লবণও পাওয়া গেল—সুনীলের কথায় 'সত্যকারের দেশী নুন'। সেদিন খুব উৎসব হইল। কিন্তু থানার দারোগা বিচক্ষণ লোক। বোসপুকুরের দত্তবাবুদের ছেলেদের ক্ষ্যাপামিটা তিনি চোখে দেখিয়াও দেখিলেন না। অন্যদিকে লবণ আহরণ ও লবণ প্রস্তুতের অনুষ্ঠানটিতেও ক্রমেই উৎসাহ কমিতে লাগিল। ধীরে ধীরে দুই-এক পসলা বৃষ্টি নামিল; লবণ-যজ্ঞ অবসান হইয়া আসিল। দুই-একদিন বিলাতী বয়কটে কোনরূপে সে আগুনকে রক্ষা করা গেল। তারপর তাহারও দরকার নাই—কলেজ খুলিয়াছে।

আবার কলেজ। সকলেরই মন টল-টল, কিন্তু কেহই আর উছলিয়া পড়িবে না।

সমুদ্র-মেখলা বিশাল ভূমি অগ্নি-মেখলা হইয়া উঠিয়াছে; চিতাদগ্ধ কৃষ্ণধূম তখনও দিক ছাইয়া আছে। ইহারই মধ্যে অধ্যয়ন অধ্যাপনা—তপস্যা বটে। সত্যই তপস্যা—গৌরীর তপশ্চর্যারই সমতুল্য।...

ভাবিতে আশ্চর্য মনে হয়—এ সময়ে মানুষ লজিক পড়িতে পারে কিংবা এথিক্‌স! তাহা সম্ভব হইলে লবণ-সমরই বা দোষের কি?

পূজার ছুটি আসিল। সুনীল বাড়িতে বসিয়া দিন কাটাইতেছে। শহর হইতে বাড়ি ফিরিলেই তাহার দিনগুলি একটু শান্ত হইয়া আসে।

অমিতের চোখে সুনীলদের বাড়ির ছবিটা ফুটিয়া উঠিল...

পূজার আকাশে সোনার রোদ, ভরা খালের জলের ছল-ছল ধ্বনি, রূপার মতো ঝিকমিককরা জলধারা, বর্ষাস্নাত বনজঙ্গল ঝোপঝাড়ের সজীব শ্রী, লোকের মুখে উৎসবের হাসি, কুশলবার্তা, সস্নেহ আশীর্বাদ—সুনীলের উদ্‌ভ্রান্ত মন যেন আজন্ম পরিচিত জীবন-কক্ষে আবার ফিরিয়া আসে।..পল্লীতে পা দিলে অমিতেরও তাই হয়। অমিত ভাবে, আচ্ছা কেন এমন হয়? এ কি পল্লীর মায়া, না আত্মীয়ের স্নেহ?

বাড়িতে লোকজন আত্মীয়-অতিথি প্রচুর। বড় ঘর, মানী পরিবার, দুই ছেলে ওকালতি করে—নিখিল জেলার শহরে ও অখিল পাটনায়। তৃতীয় ছেলে অনিল সরকারের চাকুরে, সর্বকনিষ্ঠ সুনীল। বাস্তবিক সুন্দর ওদের বাড়ি—মা আছেন, বউদিদেরও স্নেহ আছে—সুনীলের ভাবনা কি? তাহার বউদিরাও সুশিক্ষিতা, ভাল ঘরের মেয়ে—স্কুলে পড়িয়াছে, একটু আধটু ইংরেজী জানে—ছোট বউদি ললিতা আই. এ. ক্লাসেও ভর্তি হইয়াছিলেন। মেরি করেলি, হল কেনের নভেল পাঠে তাঁহার পরম পরিতৃপ্তি।—অমিতকে সে কতবার বলিয়াছে।

* * *

অনিলের স্ত্রী ললিতা...ললিতা...এই শীতের কলিকাতার পথে আলো যেন চৌদিকে হাসিয়া ঝলসিয়া পড়িতেছে। কি হাস্যমুখর আলো।

* * *

সুনীল তাহার জন্য লইয়া আসিয়াছে হলকেনের 'বারবড ওয়ার' ও শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন'। কিন্তু ছোড়দা ও বউদি এবার বাড়ি আসিতে পারিলেন না, তাঁহারা হাওয়া বদলাইতে দার্জিলিং গিয়াছেন। বই দুইটার খবর পাইয়া ললিতা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, সুনীলকে লিখিতেছে, পূজা শেষ হইতে না হইতেই বই চাই। আর শুধু বই নয়, বইয়ের মালিককেও চাই—'এই দার্জিলিঙে ক্যালকাটা রোডের ধারে, যেখানে কুয়াশার আব্রুতে মিশে বম্‌ব্রাওনের নবাবপুত্রী তোমাদের মতন ছেলেদের জন্য অপেক্ষা করছেন।' শাশুড়ী ও বড় ভাজকেও ভিন্ন চিঠিতে অনুরোধ আছে —তাঁহারা যেন একবার আসেন, অন্তত সুনীলকে পাঠাইয়া দেন।

* * *

ললিতার কাণ্ডই এইরূপ অমিতের মনে পড়ে ললিতাকে—তখন সদ্যঃ পরিণীতা সে, চঞ্চলা হরিণীর মতো তরুণী।

*   *   *

পূজা শেষ হইয়াছে। কিন্তু উৎসবের জের এখনো মিটে নাই, এমন সময় সুনীলের বাড়িতে হঠাৎ উদিত হইল মণীশ।

অমিত ওই ছেলেটিকে দেখে নাই। ভাবিতে লাগিল, কেমন সে? ময়লা রং দীর্ঘ মূর্তি, বড় বড় চোখের একটা ফোটো—এই কি সে?

*   *   *

একটা ছোট ছেলে সুনীলকে বলিল, সুনীলদা, খালের ওপরের পথে একজন ভদ্রলোক তোমায় ডাকছেন।

পুকুরের ঘাটে বসিয়া শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ দেখা আর হইল না। সুনীল বলিয়াছে—জানিলাম, লোকটি সেখানে আসিতে চায় না, ওখানে খালের ধারের বাঁধানো পোলটায় বসিয়াছে।

*   *   *

সেই পোলটা যেখানে সাত বছর আগে অনিলের সঙ্গে বসিয়া অমিত বাঁশী বাজাইত; পিছনের একখানা ইট খসিয়া গিয়াছে, নীচে কার্তিকের স্রোতোহীন নিশ্চল কালো জল।

সুনীল প্রশ্ন করিয়া জানিল, লোকটিকে উহারা কেহই পূর্বে দেখে নাই,—কেমন রুক্ষ মূর্তি, ময়লা জামা-কাপড়। বয়স? বৎসর কুড়ি-বাইশ হইবে।

*   *   *

...সেই ফোটোটা—আবক্ষ ফোটো...অমিতের চোখে এই গির্জার চূড়ার উপরে যেন সেই দীর্ঘ আবক্ষ মূর্তি রৌদ্রভরা আকাশের পটে ফুটিয়া উঠিতেছে।

*   *   *

ত্রয়োদশীর ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় একটু নিকটে আসিতেই সুপরিচিত বন্ধুমুখ সুনীলের চিনিতে দেরি হইল না।

সুনীল বলিয়াছে, প্রথম দর্শনের আবেগে মুখ দিয়া বাহির হইল, মণি? অমিতের মনে হইল, সুনীলের মুখ বলিতে বলিতে যেন জ্যোৎস্নাচ্ছটায় মণ্ডিত হইয়া উঠিল। কিন্তু, পরমুহূর্তে সমস্ত দীপ্তি নিবিয়া গেল—যেন ত্রয়োদশীর চাঁদ আকাশে নাই, শরতের শ্রী ঝরিয়া গিয়াছে।

ক্ষীণ হাস্যে মণীশ বলিল, হ্যাঁ। তারপর, আসবো? না এখান থেকেই বিদায় নেবো?

সুনীল এক মুহূর্তের জন্য উত্তর দিতে পারিল না। তারপর আত্মগ্লানিতে সঙ্কুচিত হইয়া গেল। অগ্রসর হইয়া সে মণীশের হাত চাপিয়া ধরিল বলিল, এ কথার মানে?

মানে আজ আছে—এক মাস পূর্বে ছিল না। সে তুই জানিস, বুঝে দেখ্।

আজই বা কেন থাকবে?---বলিয়া সুনীল তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে বাড়ির দিকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল।

থাকবে না? বেশ, তোর কাছেই বরং না থাকলো কিন্তু এ তো তোদের বাড়ি; দাদারা আছেন, তাঁদের কাছে বেশ ভয়ানক রকমই এর মানে।

সে দেখা যাবে। তাঁদের কথা তাঁদের থাক, আমার কথা আমার।

চলিতে চলিতে মণীশ আর একবার বলিল, কিন্তু ভেবে দেখ্।

অমিতের চোখে ভাসিতেছে---শারদ জ্যোৎস্নায় দুই বন্ধু হাত ধরিয়া আসিতেছে।

সুনীল কানে তুলিল না। বাড়ির বাহিরের ঘরের আঙিনায় দাদারা বসিয়া আছেন---পাড়ার আরও দুই-চারিজন ভদ্রলোক আছেন। জন তিন সুনীলের সমবয়সী গ্রাম্য বিজ্ঞ ছেলে ও শহরের কলেজের ছাত্র তাঁহাদের আলাপ-আলোচনা পান করিতেছে। জ্যোৎস্নায় তাহাদের অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে---কান পাতিলে তাহাদের কথা শোনা যায়। পুকুরের ঘাটে বসিতে বসিতে মণীশ শুনিল, তাঁহারা আলোচনা করিতেছেন স্বদেশীর ইকনমিক দিক। সুনীলের মেজদা অখিল পাটনার উকিল। তিনি বলিতেছেন যে, যাহা অর্থনীতির মূলসূত্রের বিরোধী, জোর করিয়া তাহার বিরুদ্ধে কতদিন স্বদেশী চালাইবে? লোকের ভাবাবেগ থাকিবে না, ট্যাঁকে হাত পড়িলে স্বদেশী ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। বড়দা নিখিল বলেন, উপায় নাই। এইরূপেই ক্ষতিকে স্বীকার করিতে হইবে; তবেই তো ইকনমিক পরমুখাপেক্ষিতা ঘুচিবে। অখিলের তাহা মনঃপুত নয়। পড়িয়া-পড়িয়া মার খাওয়া, ভেড়ার পালের মতো সার্জেন্টের গুতোয় ছুটিয়া পালানো, কিংবা এক টুকরা কাপড় উড়াইয়া জেলে পচিয়া মরা---এ সবই শেম্‌ফুল। এত চরকা-টকলি তৈরি করার অপেক্ষা গুটি-কয় এরোপ্লেন তৈরি করা ঢের ভাল; সার্জেন্টের লাঠি খাইয়া হাসা অপেক্ষা লাঠি দিয়া সার্জেন্টকে ঠেঙানো বেশি স্পিরিচুয়ালি ইফেকটিভ্। তাহাতে নিজের শক্তিতেও বিশ্বাস জন্মাইত, গোরাগুলিরও মনে ভয় ঢুকিত ইত্যাদি।

মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিয়া সুনীল কহিল, তারপর মণি, ২০শের পর কোথায় গেলি?

মণীশ উত্তর দিল না। একটু পরে কহিল, একটা ভাল জায়গায় বসা যায় না সুনীল? একটু নির্জন, যেখানে খানিকক্ষণ শোওয়া চলে। এখানে এই ঘাটে বোধ করি শুলে ভাল হবে না। না, কি বলিস?

তুই শুবি? ঘুম পাচ্ছে?

ঘুম পাবে কোথা থেকে? তবে শোবো যদি জায়গা পাই।

আমার ঘরে চল।

কোথায়? বাড়ীর ভেতরে?

হ্যাঁ, ওপর-তলায়।

এদের সামনে দিয়ে যেতে হবে যে!

তাতে কি?

না।—মণীশ দৃঢ়স্বরে কহিল। খানিকক্ষণ নীরবে অতিবাহিত হইল। সুনীল কহিল, আমার ঘরে যাবি না, আমাদের বাড়িতে উঠবি না, এই কি স্থির?

স্থির নয়, বোধ হয় তাই প্রুডেন্ট্—সুবুদ্ধির কাজ। ভেবে দেখ্। তোকে অবিশ্বাস নয়, কিন্তু সকলকে বিশ্বাস তো করা যায় না—মানিস তো?

অমিত দেখিতেছে—সুনীল একটুক্ষণ মাথা নীচু করিয়া রহিল, তারপর জিজ্ঞাসা করিল, যদি এই বুদ্ধিই মাথায় ছিল, তবে আমার এখানে আসবার মানে কি? এই অপমানটুকু করার উদ্দেশ্যেই কি এই দেখা?

* * *

মণীশ বুঝিল, সুনীলের অভিমানে লাগিয়াছে। ধীরভাবে কহিল, মেয়েদের মতো মান-অভিমান করিস না, বিচার করে দেখ্। মান-অপমানের অপেক্ষা প্রাণের দায় বড়; আর আমার মাথাটারও দাম আছে। প্রাণটাই বা অমন সহজে বিলিয়ে দেবো কেন—যদি একটু সামলে ধরে রাখতে পারি?

* * *

'মাথাটার দাম আছে'—যে মাথাটা ওই গির্জার উপর এখনও রৌদ্রে মণ্ডিত—অমিত দেখিতেছে।

* * *

বেশ, কিন্তু তোমার তো এখানে না এলেও চলতো।

হয়তো চলতো। কিন্তু মনে হল, এখানে কিছু সুবিধা হতে পারে।

কি সুবিধা, শুনি?

এক রাত্রির মতো আশ্রয়, কাল দিনের বেলাটারও—যদি সম্ভব হয়। সন্ধ্যায় আমি চলে যাবো ঠিক। আর—আর—আর—

আর কি?

মণীশ একটু কুণ্ঠিত হইল, তবু জোর দিয়া বলিল, কিছু টাকা। শত তিনেক টাকা যদি দিতে পারিস—শুধু এইটুকু।

আর কিছু প্রত্যাশা করো নি? আর কিছু চাই না?

আপাতত না।

'না'—ক্ষুব্ধ স্বরে সুনীল শব্দটা উচ্চারণ করিল। মণীশ হঠাৎ চকিত হইয়া বলিল, চাই না, জিজ্ঞাসা করছিলি? চাই বললেই কি আশা মিটবে? চাই, চাই, বিষম রকমে চাই। সে চাওয়া শুনলে যে তোরা মুখ ফেরাবি। নইলে চাই তোদের সবাইকে, তোদের সব-কিছু, সকল-ছাড়া, লক্ষ্মী-ছাড়া, গৃহ-ছাড়া করে তোদের চাই। কিন্তু সে চাওয়া কে শুনবে?

* * *

শরতের জ্যোৎস্না ঘাটের উপরে, পুকুরের জলে, অশ্রান্ত লুটাইতে লাগিল।

* * *

শীতের সকালে, কলিকাতার ফুটপাথের উপরেও যেন সেই জ্যোৎস্নার ধারা...

*　　　*　　　*

সুনীল উঠিল। মণীশ জিজ্ঞাসা করিল, উঠলি যে?

আসছি এখনই।---বলিয়া সে অগ্রসর হইতে গেল।

সাবধান সুনীল।---বলিয়া মণীশ খপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া একটানে তাহাকে বসাইতে গেল।

অমিত দেখিতেছে---ঘাটের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সেই দুই বন্ধু---যেন ওই লাল বাড়িটার কোণে সেই ঘাটটা...ওই যেন দুই বন্ধু..

*　　　*　　　*

ভাবিস না অত সহজ, অত নিরীহ আমি। প্রাণ বাঁচানোর সমস্ত আয়োজন আমার সম্পূর্ণ আছে---তোদের একটা মাজুল লোভার-এর ওপর অত ভরসা রাখিস না।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া সুনীল খানিকক্ষণ মণীশের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। তারপর হঠাৎ তিরস্কারের স্বরে দৃঢ়ভাবে বলিল, চুপ কর, মণি। বকিস না---শুনলে আমাদেরই লজ্জা হবে তোর জন্যে। এত ছোট তোর মন---ভাবতে পারলি, আমি তোকে ধরিয়ে দিতে যাচ্ছি!

মণীশ হাত ছাড়িয়া দিল। হাতটা পকেটে পুরিয়া সিধা বসিয়া কহিল, বেশ, তোদের থানায় কজন পুলিশ থাকে? দশজন? থাক, তাদের রুখতে পারবো। যা তুই।

সুনীল দাঁড়াইয়া রহিল, কহিল, মণি, ওঠ, আমার সঙ্গে আয়। এখনই ব্যবস্থা হবে, তারপর কথা বলিস।

বাইরের একটা কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া উপরের একটা ঘরে মণীশ উঠিয়া গেল। সুনীল বলিল, বোস, আমি আসছি।

কোথায়?---বলিয়া মণীশ পথ রোধ করিল।

তোর থাকবার জায়গা চাই, টাকা চাই, তা পেলেই তো হলো! তবে আর বার বার অমন করছিস কেন? আমি যা করবো, তাই হবে। এখন চুপ করে বোস।

আচ্ছা।---বলিয়া এক টানে জামাটা মণীশ খুলিয়া ফেলিল। বোতামগুলি পটপট ছিঁড়িয়া গেল---ভ্রূক্ষেপ নাই। কোমরের বেল্টে কি ঝকঝক করিতে লাগিল।

সুনীল চলিয়া গেল।

মণীশ দরজার সম্মুখে তৈরি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পার্শ্বের জানালা দিয়া তাকাইয়া দেখিল, সেখানে মুক্ত ছাদ। ছাদের শেষে একটা নারিকেল গাছ। না, এ খাঁচা নয়। তবুও তৈরি হইয়া থাকাই ভাল। ঘরের চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল, টেবিলে বইয়ের তাকে পরিচিত পাঠ্যপুস্তক, খাটের উপর একটি অর্ধপঠিত খোলা বই। সুনীলেরই ঘর হইবে।

কাগজের ঠোঙায় করিয়া সন্দেশ ও নাড়ু লইয়া সুনীল ফিরিয়া আসিল, বলিল, কুঁজোয় জল আছে। আগে হাতমুখ ধুয়ে নে---ওই ছাদে। মাথাটায় জল দে, সিঁথিটা আঁচড়ে নে। তারপর দুটো খা।

মণীশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুনীল কহিল, কি, নড়ছিস না যে? খা।

মণীশ পিছন ফিরিয়া জানালার কাছে গিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুনীল হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, খাবি না? রাত্রিতে আর কি আনতে পারবো জানি না। তবে মাকে বলে এসেছি, 'কাল সকালে দেবব্রত আসবে, শেষরাত্রে আমি যাবো স্টেশনে তাকে আনতে।' তার পূর্বেই তুই এ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবি, আর কাল আমার সঙ্গে ফিরবি ---তুই হবি দেবব্রত রায়। কেউ তাকেও চেনে না, তোকেও চেনে না। এখনকার মতো কিছু খেয়ে শুয়ে পড়। পরে আর একবার কিছু খাবার আনতে চেষ্টা করবো। এ ঘরে কেউ আর আসবে না। বড় বউদিকে বলে এসেছি, আমার মাথা ধরেছে আলো নিবিয়ে ঘুমিয়ে পড়বো। আয়।---বলিয়া সুনীল মণীশের হাত ধরিয়া টানিল।

ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সুনীল চমকিয়া গেল। তারপর ধীরে ধীরে মণীশকে ধরিয়া খাটের উপর বসাইয়া দিল। নীরবে জলের ধারা বহিয়া চলিল। কেহই কথা কহিল না।

মণীশ অশ্রুচাপা কন্ঠে কহিল, মাফ করিস, সুনীল। বড় অন্যায় করেছি, অন্যায় কথা বলেছি, অপমান করেছি---তবু মাফ করিস। ভাবছিস, একি দুর্বলতা! সত্যিই তাই। কিন্তু আজ এক মাস আমার চোখে ঘুম নেই। দিন সাত-আট মাত্র শুতে পেয়েছিলাম। শুতে পেলেই যে ঘুমুতে পারি, তা তো নয়---তবু শুতেই পাই না। তা ছাড়া রাত্রেই চলতে হয় পথ, দিনের বেলা পথে বেরুনো নিরাপদ নয়। এই সত্তর-আশি ক্রোশ পথ চলে এখানে এসেছি---পায়ের জুতো ছাড়তে হয়েছে অনেক পূর্বেই; গায়ের জামা দু-একবার নতুন কিনে নিয়েছি; ফোস্কা পড়ে আজ পা অচল হয়ে এসেছে। অথচ কোথাও তিষ্ঠোবার উপায় নেই---চল --চল---চল; এক ঘন্টা আগে যেখানে ছিলে, একঘন্টা পরে সেখানে আর যেন তোমার রেখাটি না থাকে। প্রতি মিনিটে পথ বদলাও, প্রতি মোড়ে পাল্টা চল যেন কোন চিহ্ন তোমার কোথাও কেউ খুঁজে না পায়। শিকারী কুকুরের পাল তোমার দেহের আঘ্রাণ শুঁকে শুঁকে তোমার পেছনে আসছে। নেকড়ের মতো জিব বার করে তারা তোমায় তাড়া করছে। দাঁড়ালে কি মরলে। ভুল করলে কি শেষ হলে। একটিবার অমনোযোগী হয়েছ তো আর নেই।...

* * *

শিকার ও শিকারী...দি হান্টেড ডিয়্যার...হন্টেড?---অমিত চোখের সম্মুখে দেখিতেছে যেন।...

মীরগঞ্জের একটা খালি গুদামে কাল রাতে শুয়েছিলাম। পা ফোস্কায় একেবারে

অচল। ভাবলুম, এই রাতটা জিরোই, যখন আশ্রয় মিলেছে। কেউ যেচে আশ্রয় দেয় নি। পুজোর শেষে গুদামগুলো অমনই খালি পড়ে থাকে, মালিকের দেখা নেই। একটাতে ঢুকে শুয়ে পড়ে থাকলেও কেউ খোঁজ নেয় না। মাথার নীচে দুখানা খালি চট দিয়ে শুয়ে পড়লাম। নিমেষ যায়, পল যায়, মিনিট-ঘন্টা যেন শুঁয়োপোকার মতো ধীরে ধীরে মনের ওপরে জ্বালা ফুটিয়ে চলে। ফুরোয় না, কেবলই জ্বালা বাড়ে। শেষে মন আর শাসন মানে না, উন্মাদের মতো দিগ্বিদিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলে। মনে পড়ে ২০শে—সেই সুতীব্র সর্বরোধরিক্ত উন্মত্ত উদ্দীপনা —অতি সহজে ঘটে গেল যে অসম সাহসের, বহু কল্পনার আয়োজন...

* * *

অমিত দেখিল, শীতের নিষ্প্রভ রৌদ্রে যেন একটা আগুনের তীব্র স্ফুরণ ফুটিল...

* * *

তারপর সেই পালাও পালাও—বাড়ি টপকে, শহর ছেড়ে, বন-জঙ্গল ভেদ করে অচেনা গাঁয়ের পথে, অজানা নদীর ধারে, পালাও পালাও—দিনকে রাতের মতো শূন্য করে, রাতকে দিনের মতো অশান্ত ব্যস্ততায় শতছিন্ন করে চল—চল—চল; কিন্তু কেন? কেন? কেন এই চলা? কেন এই নির্বোধ ছুটোছুটি? পালাবার ভরসা তো মনে নিয়ে ২০শে বেরোও নি; পালাবার আশা এখনও তো মনে মনে স্বীকার করো না। তবে কেন এই ভাবে ঘুরে বেড়ানো? শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, এইখানে এই ভাবে শুয়ে পড়ো। রাত ভোর হয়ে যাবে—সূর্য উঠবে, গঞ্জের লোক জাগবে, গুদামের দুয়ার খোলা হবে; তারা তোমাকে পেলে তাকিয়ে থাকবে বিস্ময়ে। ক্রমে বিস্ময় বাড়বে, তারপর আরও বিস্ময়, আরও—ক্রমে ভয়ে ভয়ে কানাকানি, শেষে হবে সব দুশ্চিন্তার শেষ—আর ছুটতে হবে না।—বিশ্রাম, বিশ্রাম, বিশ্রাম। চোখ মুদে পড়ে থাক। এই পড়ে থাকার আরাম থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে কি লাভ? শেষ পর্যন্ত যখন নিজেকে আগলে বেড়াবে না, ঠিকই করেছো; চোখ বুজে পড়ে থাক,—একবার এই রাত্রির নির্বাক জীবনগতির ছন্দ ও স্পন্দন তোমার চেতনার মধ্যে গ্রহণ কর,—চেতনাকে নিষিক্ত করে নাও তার ছন্দে।...

গা-মোড়া দিয়ে উঠলাম। বুঝলাম, অবসাদ দেহ-মনে চেপে বসছে। আবার পথে পথে হেঁটে হেঁটে চললাম। এমনই করে আজ কত রাত, কত দিন গেল—এই ত্রস্ত-দিগ্ধ দিন রাত,—দুঃস্বপ্নভরা দিন, দুশ্চর রাত, যাতনাময় অস্থিরতা। মানুষের সহজ প্রশ্নকে মনে হয় কুটিল; সোৎসুক দৃষ্টিকে মনে হয় সর্পিল। মাফ করিস সুনীল, অবস্থার চক্রান্তে আমার মন বেঁকে-চুরে যাচ্ছে, ভেঙে খান-খান হয়ে গেছে। আমাকে মাফ করিস।

* * *

অমিত মনে মনে বলিল, দি হান্টেড অ্যাণ্ড দি হন্টেড।

* * *

মণীশ চুপ করিল। খানিকক্ষণ পরে সুনীল মণীশকে প্রশ্ন করিয়াছিল, তোর সঙ্গে তো অন্য লোক ছিল, তারা কোথায় গেল?

জানি না, জানবার সময় নেই। তাদের দোষ দিও না সুনীল। তাদেরও সাধ্য নেই আমার খোঁজ রাখে। রাখলে আমি আজ বাইরে থাকতে পারতুম না। হয়তো তারাও বাইরে নেই। তাদেরও এমনই ছুটে ছিটকে পড়তে হয়েছে, নইলে সব চেষ্টাই শেষ হয়ে যাবে---কাজ আর এগুবে না।

আবার খানিকক্ষণ কথা নাই। তারপর মণীশ কহিল, বন্ধুত্বের সম্পর্ক তো আমাদের নয়—আমাদের কাজের সম্পর্ক, যমের দুয়ারে এগিয়ে দেবার সম্পর্ক। সেখানে যে বন্ধুত্ব জন্মে, তার নিয়মই এমন সৃষ্টিছাড়া; নইলে সবই যায় ভেঙ্গে। তাদের থেকে আমার পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় আমি পেয়েছি ২০শে পর্যন্ত। আবার তেমনিতর আয়োজন করতে পারলে আবার পাওনা দাবি করবো, কড়ায় গণ্ডায় তা বুঝে নেবো---তাদের পাওনাও অমনই করে বুঝিয়ে তাদের দেবো। আমাদের বন্ধুত্বের লেন-দেন এমনই চলে। তার বেশি যা, তার চিহ্ন নেই---সে কথায় ফুটবে না, চোখের জলে ধোয়া হবে না। সে থাকবে মনের কোঠায়, যেখানে থাকলেও লোকে তাকে দেখতে পায় না, না থাকলেও লোকে তা সন্দেহ করে না। বাইরের চোখে তা থাকা না-থাকা সমান। কিন্তু ঐ থাকাটাই তবু আমরা চাই।

* * *

বাসের জন্য অমিত অপেক্ষা করিতে করিতে অস্থির হইয়া উঠিল...মনে পড়িতেছিল মণীশের কথা

দিন পাঁচেক কাটিল। মণীশ একটু একটু করিয়া অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। সুনীলের মুখে কথা নাই---সে যেন কি একটা চিন্তায় নিমগ্ন। এদিকে সকালে সন্ধ্যায় সুনীলের দাদারা ডাকিয়া পাঠান, কোথা হে দেবব্রত, এসো, বসো; একটু গল্পসল্প করা যাক। করছিলে কি? বেড়াতে বেরিয়েছিলে? না, আজও পড়তে পড়তেই বিকেলটাকে শেষ করলে? কি পড়ছিলে? উপন্যাস? কার? কন্টিনেন্টাল? সেবেটনি? কি বললে, ফয়স্টবেঙ্গার? সে আবার কে? গল্পটা কি নিয়ে শুনি?

অমিত মনে মনে মানিল---আশ্চর্য ইঁহারা। সুহৃদ সেদিন বলিল, 'এখনও অমি, তুই "ডাউন ফল" পড়িস নি?' যেন পড়াটাই একমাত্র জীবন। চোখের সম্মুখে ইতিহাসের যে পতন-অভ্যুদয়ের পরিচ্ছেদ উদ্‌ঘাটিত হইতেছে, তাহাও দেখ না!

গল্পটা বলা শক্ত, বিশেষত মণীশ 'জু স্যুস" বা "আগ্‌লি ডাচেস" কোনটাই পড়ে নাই। বিজয়ের মুখে গল্পটা সে একদিন শুনিয়াছিল। এখন তাহারও কিছুই মনে পড়ে না। যদি বা সুনীলের দাদারা কোন দিন গল্পটা জিজ্ঞাসা না করেন, অন্য কথা উঠিয়া পড়ে। এখন কলেজে কে ভাল পড়ায়? ইকনমিক্‌সের উপর এ যুগের ছাত্রদের এত আকর্ষণ কেন? ফিলজফি কি এখন কেহ পড়ে না? কলেজ, পড়া, ফিলজফি, ইকনমিক্‌স---এই সব শব্দগুলি মণীশের পিছনকার অতীত জগতের লুপ্তচিহ্ন---যে জীবনকে সে সহিতে পারে নাই, মানিয়া লইতে পারে নাই। সেই গ্লানিময় দিন-রাতের স্রোতোহীন খাদে বইয়ের এই বুদ্‌বুদমালা ফুটিয়া উঠিত। দূরে---বহুদূরে---অনেক পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে মণীশ সেই মন্দগতি জলরাশিকে।

ক্ষুরধার খরস্রোতের মধ্যে সে আপনাকে সঁপিয়া দিয়াছে। কোথায় সেই পুরাতন বদ্ধ-বায়ু, রুদ্ধ-বেগ দিন-রাত? কলেজ, পরীক্ষা, প্রফেসর, ইকনমিক্স, ফিলজফি... সেই ডোবার জলের তলাকার পচা মাটির নিঃশ্বাসে যেন আবার বুদ্বুদ ফুটিতেছে।

না, মণীশ আর এই বুদ্বুদ দেখিতে চাহে না—চাহে না, চাহে না। এক লাফে এই বসিবার ঘর হইতে বাহিরের সামনেকার প্রাঙ্গণে পড়িয়া দাঁড়াইয়া সে বলিতে চায়,—গলা চিরিয়া চীৎকার করিয়া, শ্বাসযন্ত্র ফাটিয়া যাক, তবু একবার সমস্ত শক্তি ঢালিয়া সে বলিতে চায়—মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা,...এই সব মিথ্যা! তোমাদের আলাপ মিথ্যা, আলোচনা মিথ্যা, চিন্তা, কর্ম, ধর্ম সব মিথ্যা, তোমরা মিথ্যা, আমার নিকটে তোমরা মিথ্যা,—অস্তিত্বহীন, প্রাণহীন—যাতনাকর।

অমিত যেন সুহৃদকে এমনই বলিতে চায়—মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা, তোমরা মিথ্যা।

মণীশের অধীরতা বাড়িয়া গেল, কিন্তু সুনীল একেবারে নিশ্চল। এক সপ্তাহ শেষ হইতে চলিল, সে কোনো কথা বলে না, টাকার কথা আর পাড়ে না—যেন কথাটা সে ভুলিয়া গিয়াছে। কি ভাবিতেছে সুনীল রাত্রিদিন—কেন একা একা ঘুরিয়া বেড়ায়? কোথায় যায়? সুনীলের মা আবার মণীশকে ডাকিয়া পাঠান।

* * *

অমিতের চোখে ফুটিল পূর্ব-আকাশের পটে সেই মাতৃমূর্তি, অমিতকেও তিনি এমনই করিয়া খাওয়াইতেন।

* * *

নিকটে বসিয়া মণীশকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, নানা খাদ্য খাওয়াইলেন; কিছুতেই ছাড়েন না।

বাড়িতে কে আছে? মা নাই? তাই বুঝি খুব ঘুরিয়া বেড়াও—সুনীলের মতোই। বউদিরা আছেন? থাকিলে হইবে কি? পারিবেন কেন? আজকালকার বউরা খুব মিশুকে, খুব গল্প করিতে পারেন, গুণের কাজও নানারকমের জানেন; কিন্তু আদর-যত্ন তাঁহারা বুঝেন না, করিতেও জানেন না। তাঁহারা বই পড়েন, সেলাই করেন। তাঁহার ছোট বউমা ললিতা ..

* * *

ললিতা—অমিতের চোখে যেন এখনও সে স্পষ্ট প্রভাতের একটি উজ্জ্বল কিরণরেখা—স্বচ্ছ, সহাস্য, চপল,—জীবনের ছন্দ যেন উপচিয়া পড়িতে পড়িতে হঠাৎ একটি মানুষ হইয়া উঠিয়াছে...

* * *

ছোট বউমা কলেজে পড়িতেন। ইংরেজী খুব জানেন, ছবিও আঁকিতে পারেন। গলাও তাহার মিষ্টি—যেন মধু ঝরে। সর্বদা হাসিখুশি। মণীশ দেখিলে নিশ্চয় সুনীলের মতো তাঁহার বন্ধু হইয়া পড়িত। কিন্তু একেবারে ছেলেমানুষ ললিতা, ঠিক মণীশ সুনীলের মতোই। দুই হাতে টাকা ছড়াইয়া দেন পাড়ার মেয়েদের আমোদে উৎসবে, পরের ছেলেদের বই কিনিবার জন্য, লাইব্রেরির বই বাড়াইবার

জন্য। সময়ই পান না—শহরের মেয়েদের সভা ডাকিয়া খাওয়াইয়া, তাহাদের নিজের গাড়িতে বেড়াইতে লইয়া গিয়া। এমনই আরও কত খেয়াল। একেবারে পাগলী, একেবারে খেয়ালী। খেয়ালের আদি অন্ত নাই। সুনীলের তো তাহার সঙ্গ পাইলে আর কথা নাই; সেও সুনীল বলিতে অজ্ঞান। গিয়াছে দার্জিলিং, লিখিতেছে চিঠির পরে চিঠি—সুনীলকে একবার পাঠাইয়া দাও। সুনীল এতদিন যাইত্ও। মণীশ আসিল, তাই রহিয়া গেল। আর দার্জিলিং গেলে হইবে কি? যে পাগলী মেয়ে! দিনরাত রাঁধিবে—যত বিলাতি রান্না। বিলাতি পিঠা হইবে—সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়। রাত দুপুরেও বাদ যায় না। ওদের এক মুহূর্ত শান্তি নাই। খাওয়া-দাওয়ার সময় স্থির থাকে না। যতই খাক না, এরূপ চলিলে শরীর ভাল হইবে কেন? শরীরের যত্ন জানেন বুড়ীরা। মা থাকিলেই মণীশ দেখিতে পাইত, অমন বড় বড় চুল রাখিয়া, মাথায় তেল না ছোঁয়াইয়া, গায়ে তেল না মাখিয়া কেমন সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়! কতদিন হইল মা গিয়াছেন?

মা!...

মণীশের কণ্ঠে কথা রুদ্ধ হইয়া যায়। না, সে আর এইখানে থাকিতে পারে না—অসম্ভব, অসম্ভব।

*　　　*　　　*

অমিতের মনে হঠাৎ এবার নিজের মায়ের মূর্তি জাগিয়া উঠিল। আজ মা বড় বিমর্ষ...কিন্তু কি করা যায়?

*　　　*　　　*

কয়েকটি পিঠা ততক্ষণে আবার মণীশের থালায় পড়িল। আপত্তি করিবার জন্য মুখ তুলিতেই সুনীলের মা এমন একটা ভাব দেখান যেন এ একটা অতি সামান্য ব্যাপার এই সম্পর্কে কোনো কথা বলাই মণীশের পক্ষে বাড়াবাড়ি।

বেলা নয়টা বাজিতেই আবার দুধের বাটি হাতে লইয়া বৃদ্ধা বসিয়া থাকেন। 'ওবেলা খেতে দেরি হবে, সুনীলের তো খোঁজ নেই, তুমি বাবা খেয়ে নাও।'

...ঠিক এই কথাই এমনই করিয়াই পূজার ছুটিতে মণীশের মাও বলিতেন।

যাক, বাস আসিয়াছে, অমিত আশ্বস্ত হইল। সওয়া নয়টা—একবার পার্ক-সার্কাসে গেলে হয়। সাতকড়ি এখনও আছে বোধহয়, রাত্রি জাগিয়া ঘুমাইতেছে। এখনও কি? নয়টা তো সাতকড়ির রাত।

*　　　*　　　*

না, মণীশ আর তিষ্ঠিতে পারে না। এখান হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে—যেখানে মা নাই এমন স্থানে, তেমনতর একটা রাজ্যে যাইতে হইবে।...

বাংলা দেশ বড় অদ্ভুত, বড় বিশ্রী। এখানে পথে ঘাটে একটা বিমূঢ়, অন্ধ মানবশ্রেণীর সঙ্গে দেখা হয়। তাঁহারা কিছুই হইতে চাহেন না—মা হইয়াই তৃপ্ত। পদে পদে ইঁহাদের স্নেহের চোরাবালি মানুষকে বাঁধিয়া ফেলে। অসম্ভব এই জাত,

অসম্ভব এই দেশ। সত্যি-সত্যি অমিত মানে, বাংলা দেশের ছেলেরা স্নেহের ফাঁদে পড়িয়াছে, মানুষ হইতে পায় না।

*　　　*　　　*

সুনীল টাকার কি করিল? এইবার তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিলে চলে না। আর তো এখানে থাকাও উচিত হইবে না। মণীশ সুনীলকে বলিল।

সুনীল স্থির করিল, প্রথমে যাইবে বড় বউদির কাছে। স্নেহশীলা বউদির কাছে টাকা চাহিতে কোনো দিন তাহার দ্বিধা নাই, কোন দিন চাহিয়া সে নিরাশও হয় নাই। তবু, এবারকার টাকাটা একটু অদ্ভুত কারণে চাহিতে হইতেছে---পরিমাণেও বেশি। কোথায় যেন কুণ্ঠাবোধ করিতেছিল। তাহা ছাড়া বড় বউদির হাতে অত টাকা জমা থাকে না। তিনি খরচই করেন, জমাইতে জানেন না। বরং মেজ বউদি হিসাবি, তিনি সৌখিন মেয়ে। তাঁহার বাবা পেন্‌শনপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট; ভাইরা বিলাতফেরত। পাটনায় তাঁহার খরচ কম; নূতন নূতন জামা-কাপড় সুনীল কলিকাতা হইতে তাঁহাকে যোগায়, তাহাতেই তাঁহার যাহা কিছু বেশি খরচ। সুনীলের চোখ আছে, পছন্দ ভাল। পাটনাতে কলিকাতার ফ্যাশান-জগতের বার্তা তাঁহার কাছে নিয়মিত পৌঁছাইবার ভার এই রুচিশীল দেবরটির উপর দিয়া তিনি সন্তুষ্ট আছেন। পাটনায় তাহারই সময়মতো চেষ্টায় তিনি নূতন ফ্যাশান প্রচলিত করেন---সেই খোলা-হাতা ব্লাউজ, ঢোলা-কাটের ব্লাউজ, মণিবন্ধ পর্যন্ত বিলম্বিত ব্লাউজ, প্রকাণ্ড পদ্মাকৃতি কানের ফুল, সারনাথলোটাস-মটিফ চালানো; সিল্ক শাড়ির পাড়ে ভারতীয় চিত্রের অনুকৃত লতাপাতা, শোভাযাত্রা, ভেলভেটের লাল নাগরীর বদলে সুরুচিসম্মত স্যাণ্ডেল---পাটনার জগতে এসবের প্রথম প্রচলয়িত্রী মিসেস্ বনলত' দত্ত। সুনীলের প্রতি তাঁহারও যথেষ্ট স্নেহ আছে। তবু তিনি থাকেন দূরে; তাঁহার অপেক্ষা বড় বউদি সুনীলকে দেখিয়াছেন বেশি---একরূপ মানুষই করিয়াছেন; যতদিন সুনীল স্কুলে পড়িত, ততদিন তাঁহারই কাছে থাকিয়া সুনীল পড়াশুনা করিত। তিনি ভালমানুষ, কিছু বলিবেন না। কাজেই প্রথম বড় বউদির উপর সুনীলের দাবি, তারপর মেজ বউদি আছেন। তাঁহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, সব বুঝিবেন। তাঁহাদের দুইজনকেই দরকার হইলে সত্য কথা বলা চলিবে; তবে দরকার না হইলে বলিয়া কি হইবে? বরং না বলাই শ্রেয়ঃ। বলিবে, সুনীলের তিন শত টাকা চাই। তোমরা দাও। আর কাহাকেও বলিতে পাইবে না---এই সর্তে সে তোমাদের টাকাটা লইতে পারে। টাকা কেন চাই? জানিতে পাইবে না। তবে, তুমি যদি জানিতে চাও, একমাত্র তোমাকেই বলিতে পারি ---সাবধান, আবার দাদাদের কাহাকেও বলিও না। কিন্তু থাক, মেয়েদের পেটে কথা থাকিতে পারে না; এখনই দাদাদের সম্মুখে তাহা উদগীরণ না করিতে পারিলে তোমরা আজ আর দুপুরে ঘুমাইতে পারিবে না। তবে যদি কথা দাও। ---কথা দিলে! শোনো, কিন্তু সাবধান, বলিবে না তো? সুনীল একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড মোটরবাইক কিনিবে।

সমস্ত দৃশ্যটা অমিত মনে মনে আঁকিয়া ফেলিল। অমিতের মনে পড়িল এমনই সুনীলের ছলনার চেষ্টা। এতই ইনোসেন্ট ওর ছলনা পর্যন্ত।

* * *

তবু আরও একদিন সুনীলের এইভাবে গেল। তারপর আর চলে না—সুনীলকে এবার মণীশ শেষ জিজ্ঞাসা করিয়াছে।

সুনীল কথাটা পাড়িল। কথা সবই ঠিকমতো চলিল, কিন্তু ফলটা আশানুরূপ হইল না। বড় বউদি কহিলেন, হাতে তো ভাই, এই পুজোর বাজারে কিছু নেই। তোমার দাদাকে বলি—অফিস খুললেই হবে। এ কথা ওঁকে বলতে আর বাধা কি? তবে দেখো, তোমার হাতে মোটর-বাইক দিতে আমার বড় ভয় হয়, যে অসাবধান তুমি।

কিছুতেই বড় বউদি বুঝিতে চাহেন না। মোটর-বাইকে তাঁহার বড় ভয়। তাঁহার সর্বদাই সুনীলের জন্য ভয়! ইহার অপেক্ষা মেজ বউদির সঙ্গে সহজে কথা বলা চলে।

সুনীলের সেখানে কথা বলা সহজ হইল। তিনি বুদ্ধিমতী, শুনিয়াই বলিলেন, দূর! মোটর-বাইকে কি আবার মানুষে চড়ে! দেবু মিত্তির বিলেত থেকে ফিরে তিনমাস একটায় ঘুরতো; তাও সাইড-কার ছিল, আর তার প্রয়োজনও দেবুর ছিল,—ফিরিঙ্গী মেয়েরা সাইড-কারে চড়তে উৎসুক। কিন্তু আমার দাদা ভে তাকে ক্ষেপিয়ে পাগল করে দিলেন। শেষটা বাইকটা দেবু বিক্রি করে দিলে। তুমি আবার কিনছো সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড! আরে দূর দূর।

সুনীল ছাড়িতে চাহে না। ওর বাইকটায় সাইড-কার নাই—বউদির দুর্ভাবনার কারণ নাই। সুনীল কোনও ফিরিঙ্গিনীর মোহে তাঁহার বোন মনোলতাকে সাইড-শো করিয়া রাখিয়া পলাইয়া বেড়াইবে না, ইত্যাদি।

কিন্তু ফল হইল না। মেজ বউদি বুদ্ধিমতী, বাজে কথায় টাকা নষ্ট করেন না। হইত যদি বিলাতী 'ফার'-কোট, টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডারে সুনীলের নামে আসিত।

অনেক ভাবিয়া সুনীল পরদিন বড় বউদিকে খুব গোপনে কথাটা বলিল, বাইক নয়, অপর কিছু। দেশের কাজে চাই, চরকা ও তকলির জন্য নয়, অন্য কিছু। তোমরা তো দেখেছ বউদি, গোরাগুলো কেমন ঠ্যাঙাচ্ছে!

বউদি আঁতকাইয়া উঠিলেন, সর্বনাশ! তুমি এসব কি বলছো?

অনেকক্ষণ সুনীলের কথা শুনিয়া তিনি সুগভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, মেয়ে-জন্মে কি কিছু করার সাধ্যি আছে ভাই? তোমার দাদা শুনলে আমায় কেটেই ফেলবেন। জানো তো, তিনি চুরি-ডাকাতি খুন-জখম কত ঘৃণা করেন! সাবধান ভাই, তাঁকে এসব কথা বলো না।

সুনীলের বড় বউদির জন্য কৃপা হইল, রাগ হইল। একটা নির্বোধ জরদ্গব।

* * *

অমিত দেখিল, সেই গৃহিণীমূর্তি---সন্তানবৎসলা, আত্মীয়বৎসলা, বাঙালী মেয়ে।

মেজ বউদির বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। তাহা ছাড়া তিনি একটু আপ্‌টুডেট্। এই সব কথা তিনি বলিলেই বুঝিতেন।

তিনি বুঝিতেও পারিলেন, ও ঠাকুরপো! দেশোদ্ধারের কথা বলছো, তিনশো টাকায় হয়ে যাবে ভারতোদ্ধার? কে তোমায় এ বুদ্ধি দিলে?

*　　　　*　　　　*

অমিতের চোখের সম্মুখে ফুটিল সেই ফ্যাশান-উপাসিকা মূর্তি আর তাঁহার শ্রদ্ধাহীন অবজ্ঞার হাসি। ইহার অপেক্ষা অমিতের চোখে পল্লীগ্রামের মূর্খ-গৃহিণীও বড়।

*　　　　*　　　　*

হাসি থামিলে মেজ বউদি বলিলেন, আমার মেজদাদা কেম্‌ব্রিজে ইকনমিক্‌সে ট্রাইপস্। তিনি হিসেব কষে বলে দিয়েছিলেন---যদি একশো কোটি টাকা পাওয়া যায়, তা হলে ইংরেজ তাড়ানো সম্ভব হবে। ওঁর মতে---উনি অনেক ঘেঁটেছেন, সাদা ফৌজের কর্তাদের হবে প্রথম হাত করতে---জোর পঞ্চাশ কোটি টাকা ঘুষ। সাধ্যি নেই 'না' বলে। আর বাদ-বাকি চব্বিশ কোটি সব অমনই লাটবেলাটদের। সাদা মন্ত্রীদের জন্যে পঁচিশ কোটি রিজার্ভ---এক কোটি শুধু দরকার দেশের লোকদের অর্গ্যানিজেশনের জন্যে। দাদা বলেন---এক কোটি এমন বেশি কিছু নয়। সেদিনও তো চরকা-তকলির খেলনা কিনে তোমরা নষ্ট করলে এক কোটি। তার চেয়ে যদি সাইন্টিফিক লাইনে চলতে, মাথাওয়ালা লোকদের হাতে টাকাটা দিতে! কিন্তু আমার বড়দা আবার বলেন---একশো কোটি টাকা অমনই ঢেলে ইংরেজ তাড়ানোতে নাকি মোটের পর আমাদের লোকসান হবে,---ইংরেজ তাড়ানোর খরচ পোষাবে না। উনি বলেন---আন-ইকনমিক। মেজদার সঙ্গে এ নিয়ে তাঁর তুমুল তর্ক। মেজদা বলেন, ঠিক তা বলা যায় না, যা ওরা শুষছে---। কিন্তু বড়দা বলেন---

মেজদা...বড়দা...মেজদা...আন-ইকনমিক

সুনীল একটু অধীর হইয়া বলিল, আমার অত টাকা চাই না। তিনশো টাকা আন-ইকনমিক হবে না; তা তোমার বড়দাও বলবেন। তুমি তাঁকে পরে জিজ্ঞাসা করো, আপাতত টাকাটা আমায় দাও।

তিনশো টাকায় দেশোদ্ধার---কেমন? এ কি তুমি বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছ নাকি?---মেজ বউদি হাসিতে লাগিলেন।

সুনীল আর একদফা বলিল, দেখছো তো ফাটা মাথা, রক্তারক্তি, গুলিতে খুন ইত্যাদি যদি একটা বারও পাল্টা জবাব পেতো---।

তোমার দাদাও ঠিক তাই বলেন। দু-চারটে লালমুখকে শুইয়ে দিলে শর্মারা ঠাণ্ডা হয়ে যেতো। কিন্তু মেজদা আবার তা মানেন না। বলেন, তুমি দেখনি ব্রিটিশ কারেজ বা ব্রিটিশ ক্যারেক্টার। পাব্লিক স্কুলের টোন অনেক উঁচু। ভয়

তাদের নেই, আছে লোভ। সেই বোড়ে দিয়েই তাদের মাত করতে হবে। তোমার দাদার সঙ্গে মেজদার তাই তুমুল তর্ক। তখন ও-মাসের ঘটনাটা ঘটেছে, সবারই মুখে এক কথা। কিন্তু মেজদা বলেন, না। পকেটে একটা বড় মর্তমান কলা নিয়ে বেরুলেই যে চৌরঙ্গীর সাহেবরা সব ছুটে আউটরাম ঘাটে গিয়ে জাহাজে চড়ে বসবে, তা নয়।' মেজদা অনেক ভেবেছেন এ সম্বন্ধে, আর বলেনও বেশ ...হি-হি-হি।

* * *

সেই প্রাণহীন, মমতাহীন শ্রদ্ধাহীন হাসি...অমিতের চোখে এই হাসি অসহ্য।

* * *

সুনীল তবু একবার শেষ চেষ্টা দেখিল। কিন্তু মেজ বউদি হাসিয়াই খুন, ---ও'! তুমি কি তবে আনন্দমঠ খুলছো নাকি? বেশ বেশ। কিন্তু বাপু, জমবে না-- দু-একটা শান্তি-কল্যাণী না হলে 'সন্তানরা' টিকবেন না! নিদেন, তোমাদের এক-আধজন মেজ রানী চাই, যে লোকবিশেষকে ঘরের মোহরগুলো চুরি করে দেবে। কিংবা একজন সুমিত্রা, যিনি হঠাৎ বেফাঁসে পড়লে তোমাদের পথের দাবির কাউকে পথের স্বামী বলে দাবি করে বসবেন। সে সব দিকে কিছু করেছ কি, হে সন্দীপ-সব্যসাচী?

মেজ বউদির বুদ্ধি ও ব্যঙ্গ দুইই তীক্ষ্ণ। কিন্তু টাকাটা পাইলে সুনীলের আর চিন্তা থাকিত না।

* * *

সুনীল মাকে জানাইল যে, কাল সে দার্জিলিং যাইবে; দেবব্রত যাইবে তাহার বাড়ি। পথের জন্য সুনীলের গোটা পঞ্চাশ টাকা দরকার। দেবব্রত আরও দুই-চারিদিন থাকে, মা তাহা চাহেন। কিন্তু দেবব্রত আর থাকিতে পারে না। মা সুনীলের কথায় স্বীকৃত হইলেন। সন্ধ্যায় বড়দাদা সুনীলকে ডাকিলেন, জিজ্ঞাসাদি করিয়া পঞ্চাশটা টাকা দিয়া বলিলেন, কিন্তু দেখো 'ফগে' ঘুরে ঘুরে যেন নিউমোনিয়া করে বসো না। ছোট বউমাও এ বিষয়ে বড় অমনোযোগী। আর অনিল তো ক্লাব, টেনিস বা আউটিং পেলে নেচে ওঠে। সাবধান বাপু।

পঞ্চাশ টাকা হাতে লইয়া সুনীল ছুটিতে চাহিল দার্জিলিং। মণীশকে সে কিছুতেই ছাড়িবে না, বলিল, সেখানে টাকা যোগাড় করে তোকে দিয়ে তবে আমার মুক্তি।

মণীশ প্রথমে স্বীকৃত হইতে চাহে না। সেখানে এখন বাংলা-সরকার---সব হোমরা চোমরারা পাহাড়ে গিজগিজ করছে।

বেশ তো, আমার দাদার ওখানে ভয় নেই। একে সরকারী চাকুরে, কেউ সন্দেহ করবে না; তার ওপর, এককালে তাঁর তোরই মতো মাথা-গরম হয়েছিল, এখনও একেবারে হিম হয়ে যায় নি। আর আমার বউদিও রীতিমতো ব্রেভ এবং স্পিরিটেড।

তুই ডুববি, তাঁরাও ডুববেন, আমিও ডুবব।

কিন্তু টাকা যে নইলে দিতে পাচ্ছি না। অথচ ছোট বউদির কাছে চাইলেই পাবো। এমন কি সত্যি কথা বলে চাইলেও---

সাবধান!---মণীশ ধমক দিল, বলেছিস কি মরেছিস। মানে, আমাকে ফাঁসিয়েছিস---হোক সে তোর ছোট বউদি।

বেশ, না হয় বলব না। কিন্তু টাকা তোকে দোবো, কথা দিচ্ছি; আমার সঙ্গে চল। কেউ ওখানে তোকে চিনবে না---এক মাসের ছুটোছুটিতে চেহারা অনেক বদলে গেছে---মিলবে না।

মণীশ রাজি হইল।

* * *

বিদায়কালে বড় বউদি জিজ্ঞাসা করিলেন, একটা কথা জানতে চাই সুনীল। ত্রয়োদশীর রাত্রিতে তুমি মাথা ধরেছে বলে শুতে গেলে, খেলে না। মা আমাকে পাঠালেন দেখে আসতে, কেমন আছ। ঘরে আলো নেই---আমি ধীরে ধীরে গেছলাম। খাটের ওপর দেখলাম, দুজনে শুয়ে। চমকে গেলাম। জ্যোৎস্নায় যতটুকু চিনেছি---আর-জন এই দেবব্রত। অথচ, সে নাকি এল তার পরদিন সকালের গাড়িতে। আমি কি ভুল দেখেছি, সুনীল?

সুনীল কথা বলিল না, মুখ নত করিয়া রহিল। আবার প্রশ্ন হইল, কি যেন একটা তুমি গোপন করছো? কেন সুনীল?

সুনীল মুখ তুলিল: সে তুমি বুঝবে না। তবু আমার একটি মাত্র অনুরোধ, আমার ভাল চাইলে এই কথাটা আর কারও কানে তুলবে না। যদি তোলো, তা হলে আমার পরম অকল্যাণ।

মাকে প্রণাম করিয়া সুনীল যাত্রা করিল।

পাঁচ

শীতের রৌদ্রে দাঁড়াইয়া অমিত দেখিতেছে, কলিকাতার বুকের উপর তুষার-মণ্ডিত হিমালয়---দার্জিলিং।

টেরাইয়ের বন, ধোঁয়াটে পাহাড়, সাদা টুপারমৌলি, কুণ্ডলায়িত মেঘ, পাতলা কুয়াশা, পাগলা ক্ষ্যাপা মেয়ে ঝরনা, পথের ফুল, পাহাড়ীয়া নরনারীর রহস্যময় মুখাবয়ব, আর...ললিতার হাসি। প্রচুর হাসি, অকারণ হাসি। অকারণে ছুটাছুটি, হাতাহাতি, মারামারি। সময়ে অসময়ে 'চলো বেড়িয়ে আসি। ফগ আছে, চলো; ফগ নেই চলো।' অসম্ভব খাদ্যের আয়োজন, অপরিমিত চা ও কেক, চপ ও রোস্ট। গরম জল লইয়া ছুটাছুটি---হাতে ঠাণ্ডা জল! মা গো, মরবে যে! নাও, নাও।' 'বিছানাটা ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে।' 'বেশ ছেলে, পায়ে মোজা নেই, গেছ এবার।' 'আমার

শালটা জড়িয়ে নিন দেবব্রতবাবু। না না, দার্জিলিং ইজ এ হরিবল্ প্লেস—জানেন না।' ম্যাল, ক্যালকাটা রোড, কার্শিয়ং, লেবং, টাইগার হিল, সিঞ্চল—'যেতেই হবে। না, শুনছি না, যেতেই হবে।' 'আমার বই এনেছো? থাক, তোমরা যতদিন আছ দরকার নেই। পড়েছি 'শেষপ্রশ্ন', কচকচি ভাল লাগে না। থাক থাক। চলো ঘুরে আসি অব্‌জারভেটরি হিল। মিস মিত্র আসবেন---শী ইজ এ বিউটি, ইজ নট শী? 'ম্যাডোনা ইন দি স্লিপিং কার' পড়ি নি, ও বই তোমার দাদার। তোমাদের কন্টিনেন্টাল লেখকরা যে শক্ত! পরে পড়ব'খন। জান, একটা বই পড়েছি 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'। আঃ, সো ক্রুয়েল! সো ক্রুয়েল---তোমাদের পলিটিক্‌স আর যুদ্ধ আর পেট্রিয়টিজ্‌ম্।'

* * *

ললিতা যেন ঝরনার মতো...ইন্দ্রাণী এত কথা বলে না, এত হাসেও না---তাহাকে মানাইতও না বোধ হয়। তবু যেন ললিতার মতো---আবার ললিতার মতো না-ও। ইন্দ্রাণী সচেতন, ললিতা ইনোসেন্ট। বরং ললিতা যেন সুধীরার মতো।---কিন্তু না, ললিতা চঞ্চলা, প্রাণময়ী। প্রাণময়ী ইন্দ্রাণীও। না, ইন্দ্রাণীকেও অবিচার করিও না অমিত। ললিতার প্রতি তোমার পক্ষপাতিত্ব সত্যই হয়তো আছে, অন্তত অনেকের কাছেই তাহা জানা কথা। কিন্তু ইন্দ্রাণীও উদার, মহীয়সী। অমিত বিচার করিল---সুধীরার স্নিগ্ধতা...শান্ত মিতভাষিতা।...ললিতা যেন কথার ঝরনা, স্নেহের উচ্ছল ধারা।

* * *

তিন দিন উড়িয়া গেল।

স্টেশনের বড় কাগজে-আঁটা প্রতিলিপিটার দিকে দেখাইয়া মণীশ বলিল, সুনীল, টাইম ইজ আপ।

ললিতা বলিল, অ্যাণ্ড টাইম ইজ লাইফ।

মণীশ বলিল, অ্যাণ্ড টাইম ইজ মানি, না সুনীল?

সুনীল উত্তর দিতে পারিল না। মাথা নোয়াইয়া চলিল।

ললিতা বলিল, আপনারা সত্যি এত বাজে বকেন! টাইম ইজ মানি! শুনলে আমার গা জ্বলে যায়। মানি ইজ ট্র্যাশ, টাইম ইজ লাইফ।---ললিতা বকিয়া চলিল।

* * *

অমিত জানে, ললিতা এমনই বটে...যেন টেরাইয়ের চিন্তাহীন প্রজাপতি...রৌদ্রে খেলিয়া বেড়ায়।

* * *

কিন্তু পরদিনই ললিতাকে মানিতে হইল, টাকা ট্র্যাশ নয়।

তিন শো টাকা বললে না? দেখছি কত আছে—গুণে তো রাখি নি। ওমা! এ যে মাত্র এক শো চুরাশি টাকা। ছিল পাঁচ শো তেইশ অ্যাণ্ড আই হ্যাভ স্পেণ্ট

দি হোল লট। গুডনেস! তোমার তা হলে কি হবে? আচ্ছা, তিন শো টাকাই তোমার দরকার? কমে হবে না? তবে তো মুশকিল। এ যে এখানকার ভাড়া ও রেল-ফেয়ার দিতেই যাবে। আচ্ছা বেশ, অফিসে উনি হাজির হলে টেলিগ্রাম করে সেদিনই তোমাকে পাঠিয়ে দেবো।

সুনীল বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

শীতস্নিগ্ধ পাহাড়ের দেশে মেঘহীন আকাশের রৌদ্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। দূরে ঘুম ছাড়িয়া উঁচু পাহাড় বাহিয়া সাপের মতো রেলগাড়ি নামিয়া আসিতেছে।

চলো চলো, কাব্যি করতে হবে না। এখ্‌খুনি ছুটে গেলে অব্‌জার্‌ভেটরি হিল থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাবে। নাও, তোমার জামা-কাপড় নিয়ে এসেছি, পরে ফেল চটপট করে। না বাপু শুনছি না। ওঠো, ধরো এই দূরবীণটা।

সুনীল ও মণীশকে টানিয়া লইয়া ললিতা বাহির হইয়া পড়িল। সত্যই মানি ইজ ট্র্যাশ---ললিতার কাছে।

আরও একদিন চলিয়া গেল---সুনীলের মুখ মেঘাচ্ছন্ন দার্জিলিঙের ম্লান আকাশের মতো। ললিতার হাসিতেও সে মেঘ হালকা হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। মণীশ সব শুনিল।

তবে এবার সরে পড়ি?

আর একটা দিন সবুর করো, আমার একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে।

কিন্তু এখানে আর থাকতে আমার সাহস হচ্ছে না। মনে হয়, যেন টিকটিকিতে পাহাড় ছেয়ে ফেলেছে।

তা হোক, এ বাড়িতে তোর ভাবনা নেই। একটা দিন অপেক্ষা করতেই হবে।

অবশেষে সুনীল দাদাকেই লেখা স্থির করিল। সামান্য কয়টা টাকা, কথাটাও গোপন থাকিবে, কেহ জানিবেও না। সত্য কথা বলিলে দাদার নিকট হইতে তাহা পাওয়া অসম্ভব নয়। গোপনে তিনি এখনও ন্যাশনাল স্কুলে মাসে মাসে চাঁদা দেন, অমিতকে টাকা দেন শ্রমিকসংঘ গঠনের জন্য, সমবায়-সমিতি বাড়াইবার জন্য।

*　　　*　　　*

অমিত মনে মনে হিসাব করিতে লাগিল---এ পর্যন্ত অনিল, ইন্দ্রাণী ও সুধীরা তাহাকে কত টাকা দিয়াছে। পঁচাত্তর ও দেড়শো; সেবার পঁচিশ, না পঞ্চাশ? পঞ্চাশই। তারপর তিন বারে দেড় শো..প্রায় ছয় শত টাকা। অনিলের হাতও ছোট নয়, বছরে শ দেড়েক টাকা সেও দিত। সুনীল যতই রাগ করুক---অনিল ক্ষুদ্র নয়।

এককালে অমিত আর অনিল নাকি তাহাদের অঞ্চলে প্রসিদ্ধ স্বদেশী ছিল। তবে সে যুদ্ধ ও অসহযোগের যুগ। অল্পের জন্য সে সময় জেল হইতে অনিল বাঁচে। নিতান্তই বোসপুকুরের দত্তবাবুদের ছেলে বলিয়া সেবার দারোগাবাবু তাহাকে চালান দেন

নাই। না হইলে মীরগঞ্জের বাজারে দিনদুপুরে নিমু সাহার বিলাতি কাপড়ের বস্তা জোর করিয়া পোড়াইবার কাজে অনিলই ছিল পাণ্ডা। আজ সেই অনিল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অব একসাইজ হইলেও একেবারে লুপ্ত হয় নাই---দেশী সিল্কের স্থানে এখনও ললিতা তাহার বাড়িতে ইতালিয়ান সিল্ক আনে নাই,---ললিতা বনলতার মতো ফুজি সিল্কের ব্লাউজ পরিতে পায় না, যদিও ফুজি সিল্ক তাহার চোখে চমৎকার লাগে---'হাউ ফাইন'।

অনিলকে স্পষ্ট বলিলেই একটা ব্যবস্থা হইবে।

অনিল শুনিল। তাহার সমস্ত মুখ দুর্ভেদ্য চিন্তার মেঘে আচ্ছাদিত হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাহার মুখে কথা ফুটিল না।

সে ছেলেটা কোথায়? তার নাম না মণীশ মুখুজ্জে?---অনিল জিজ্ঞাসা করিল।

হ্যাঁ, সে এখন উত্তর-বাংলায় একটা গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তোর কাছে সে টাকা চাইলে কি করে?

একটা চিঠি লিখেছিল---হাতের লেখাও চিনি। সেদিককার একজন চেনা ক্লাসের ছেলের নামে টাকাটা পাঠালেই সে পাবে।

কি নাম সেই ছেলেটার?

বিজন চৌধুরী।

তোর খুব বন্ধু, না?

হ্যাঁ।

আবার খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া অনিল জিজ্ঞাসা করিল, মণীশের সঙ্গেও তোর বন্ধুত্ব ছিল?

ছিল।

খুব বেশি?

মন্দ নয়।

তোর পেছনে টিকটিকি লেগেছে নিশ্চয়---সাবধান।

অনিল আবার বাইরের দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

বাংলা দেশের বুকে নিজেদের সমস্ত স্নেহ উজাড় করিয়া দিয়া বর্ষণশেষ শুভ্র মেঘ পাহাড় বাহিয়া উঠিয়াছে---ফুটপাথের উপরে দাঁড়াইয়া অমিত তাহা দেখিতেছে।

প্রায় অর্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। নীচেকার ওই জন্তুর আকৃতি মেঘটা উপরে উঠিয়া ঘুমের দিকে অদৃশ্য হইতেছে---পিছনে দেখা যাইতেছে পুচ্ছটা। তাহাও রূপান্তরিত হইয়া ত্রিফলাকৃতি হইতেছে।

সুনীল ধীরে ধীরে কহিল, তা হলে টাকাটা আজই দেবে কি? আমি বরং অন্য নামে বিজনকে পাঠাবো।

অনিলের মুখে একটু প্রসন্ন হাসি ফুটিল; ক্ষেপেছিস! ও ফাঁদে পা দিয়েছিস কি শেষ হবি। ও কোনও 'স্পাই'-এর কাজ, তোকে ধরাবার মতলব।

সুনীল তর্ক করিতে লাগিল। অনিল প্রথমটা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিতে লাগিল যে, টাকা পাঠানো পরম মূঢ়তা হইবে। খানিকক্ষণ পরে একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, যা বুঝিস না, তা নিয়ে তর্ক করিস না। এসব ক্ষ্যাপামি ও বোকামিতে জড়িয়ে পড়তে পাবি না।

টেনিস-র‍্যাকেট হাতে লইয়া অনিল স্যানাটোরিয়মে চলিয়া গেল, কিন্তু মুখ তাহার চিন্তাক্লিষ্ট। আজ সে সেটের পর সেট হারিতে লাগিল! মিসেস ঘোষ ও মিস বোস তাহাকে পরিহাস করিতেছে।

* * *

লুই জুবিলি স্যানাটোরিয়মের সেই বেঞ্চগুলি যেন অমিতের চোখে ওই পার্কের বেঞ্চগুলি—এত কাছে। ওই যেন সেই অনিল।—মিস্টার দত্ত, মিসেস দত্ত নেই; আর আপনি একেবারেই আউট অব ফরম। তিনি বুঝি লেবং গেছেন? না, জলাপাহাড়?

না, আপনার ভাই ও তাঁর বন্ধুর সঙ্গে গেছেন বটানিকাল গার্ডেনে?

কিন্তু ললিতাও সেদিন কোথাও যাইতে পায় নাই। সুনীল মুখভার করিয়া বসিয়া আছে; ঘরের আর এক দিকে মেঝের দিকে তাকাইয়া শাল গায়ে বসিয়া আছে দেবব্রত। ললিতা বার বার পীড়াপীড়ি করিল, জামা-কাপড় লইয়া উহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল, হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। কিন্তু উহারা আজ বেড়াইতে বাহির হইবার নাম করে না। মিছামিছি ললিতা পোষাক পরিয়াছে আজ, সে উহাদের লইয়া সরকার সাহেবের বাড়ি বেড়াইতে যাইবে। সেখানে গান গাহিবে, গান শুনিবে—অনেক আশা করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু উহারা এমন কুঁড়ে! নড়েও না। মণীশের গায়ের শালটা এক টান দিয়া ফেলিয়া দিতে দিতে সে বলিল, আপনি উঠুন তো দেবব্রতবাবু।

'দেবব্রত'-মণীশ মৃদু হাসিয়া বলিতে গেল, থাক বউদি, আজ আমি ভাল নেই।

ভাল নেই আবার কি?—বলিয়া ললিতা তাহার কোলের উপরস্থ বালিশটা ধরিয়া টান দিল—হঠাৎ ওর কোমরের এক দিকে কি একটা জিনিস চকচক করিয়া উঠিল। ললিতা বলিল, ওটা কি? মাদুলি নাকি? অত বড়?

তড়িৎস্পৃষ্টবৎ মণীশ লাফাইয়া উঠিয়া ঘরের এক প্রান্তে চলিয়া গেল। ললিতা হাসিতে হাসিতে বলিল, দাঁড়ান, দেখি ওটা কি।

মণীশ ঘর ছাড়িয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। সুনীল হঠাৎ বিরক্তির স্বরে বলিল, কি করছ ছেলেমানুষি বউদি!

তাহার কথার ঝাঁজে ললিতা থমকিয়া তাকাইল।

মণীশ আবার ঘরে প্রবেশ করিল, বলিল, সুনীল, আমি ম্যালের দিকে গেলাম, সেই বেঞ্চটায় থাকবো। এক ঘন্টার মধ্যে আসা চাই। আর নইলে আসার দরকার নেই।—বলিয়া মণীশ ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

ললিতা বিস্মিত হইয়া কহিল, কি ব্যাপার ঠাকুরপো?

সুনীল কথা কহিল না।

ললিতা দাঁড়াইয়া রহিল। খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ তাঁহার চোখ ছাপাইয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ললিতা কহিল, আমি কি অন্যায় করেছি?

দেবব্রতই বা কেন অমন করে বেরিয়ে গেল, তুমিই বা কেন অমন চটলে? মাদুলি নিয়ে তো আমি ঠাট্টাও করি নি। আমার বাবারও তো হাতে বড় একটা মাদুলি আছে—এক সাধু দিয়েছিলেন।

চোখের জল নিঃশেষ হইল। কথার ঝরনা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল।

* * *

ললিতা এমনিই বটে—এমনিই ছেলেমানুষ। হাসিতে তাহার মোটেই দেরি হয় না। একটু চপল, একটু অগভীরচিত্ত। কিন্তু অমিত তাহাকে মন্দ বলিতে পারে না। তাহার সবই খেলা, সবই স্পোর্ট। সে কিছুই বুঝে না, বুঝিবার দরকারও দেখে না। গান, ছবি, স্ফূর্তি—ইহাই তাহার স্বভাব, স্বধর্ম। না, অমিতের চোখে ললিতা বেশ মেয়ে, তবে একটু সুপ্যারফিশ্‌ল্‌, আজ অমিত তাহা বুঝিতেছে। কিন্তু ললিতাকে তাহার ভাল লাগে—কাহারই বা ভাল না লাগে ললিতাকে?

* * *

সুনীল তখনও নিরুত্তর। সুনীল দেখিতেছিল, ললিতার হাতের দামী ঘড়িটি—হীরের ব্রেস্‌লেটের মধ্যে একখণ্ড ছোট্ট মহামূল্য পাথর। শ' পাঁচেক হইবে বোধ হয় এই ঘড়িটুকুর দাম।

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, কথা বলছ না যে?

আমায় প'চিশটা টাকা দাও তো। কাল একবার দেবব্রতকে নিয়ে কার্শিয়াং ঘুরে আসি। সেখানে একটি মেয়ের সঙ্গে ওর একটু বিশেষ চেনা। দুদিন ধরে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ছটফট করছে। দেখা না করতে পেয়ে অমন গম্ভীর হয়েছে। কাল একবার ওকে নিয়ে আমি কার্শিয়াং যাবো।

ললিতার মুখে কৌতুকের পরিহাসের হাসি ফুটিল। তৎক্ষণাৎ টাকা বাহির করিয়া দিল। সুনীল টাকা লইয়া জামা-কাপড় পরিল। বাহির হইতে যাইবে, এমন সময় ললিতা কহিল, বাঃ! বেশ লোক তো! আমি যাবো না! আমাকে যে এখন আর ডাকছওনা!

তুমি আজ থাকো বউদি, আমি দেবব্রতকে শান্ত করে নিই।

আমিও যাই না—ঘাট মানবো, বলবো, 'মশায়, আপনার পরিচিতা সেই অ-দেখা রূপসীকে না জেনে যে মর্মপীড়া দিয়েছি, তার জন্যে অনুতপ্ত, আই অ্যাপলজা ইজ আনকণ্ডিশনালি

* * *

হাস্যপ্রিয়া, লাস্যময়ী তরুণী—মন তাহার যেন শরতের হাল্কা মেঘ—রৌদ্রে রঙ ধরে, কখনও হঠাৎ একটু অশ্রু গলিয়া পড়ে, আবার চোখের জলের মধ্য দিয়াই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলে। ললিতা নয়—অমিত যেন দেখে—সম্মুখে দার্জিলিঙের সাদা লঘু মেঘখণ্ড।

রাত কাটিয়া গেল। মণীশকে অনেক বুঝাইয়া সুনীল বাড়ি লইয়া আসিয়াছিল। ললিতা কিছুই বুঝিতে পারে নাই, এই কথা মণীশ বিশ্বাস করে? সারারাত তৈয়ারি হইয়া সে বিছানার উপরে বসিয়া রহিল—কিছুতেই শুইবে না, ঘুমাইবে না। পাহাড়ের নিস্তব্ধতাই যেন চাপিয়া আসিতেছে।

সকালে ললিতা চায়ের জন্য ডাকিতে গেল। অনিল টেবিলে নাই। তাড়াতাড়ি চা শেষ করিয়া সে কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে। অবস্থাটা নতুন—ললিতারও মুখ একটু গম্ভীর। সুনীলের ভাল লাগিতেছে না। বলিল, দশটায় কিন্তু আমরা কার্শিয়াং যাচ্ছি, দাদাকে বলেছ তো? তার পূর্বে তিনি ফিরবেন বোধহয়?

ললিতা কহিল, বলেছি। কিন্তু ফিরবেন কিনা কিছুই বলেন নি।

কখন কার্শিয়াং থেকে ফিরবে তোমরা?—ললিতা জিজ্ঞাসা করিল।

রাতের গাড়িতে—না হয়, কাল। তোমরা ব্যস্ত হয়ো না।

ললিতা বিশেষ ব্যস্ততা প্রকাশ করিল না। অন্য দিন ললিতা এরূপ কথার উত্তরে রাত্রিতেই ফিরিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিত, প্রতিশ্রুতি আদায় করিত, শেষে ভয় দেখাইয়া শাসন করিত। আজ ললিতা একটু গম্ভীর ও অন্যমনস্কা।

ললিতাকে গম্ভীর হইলে কেমন মানায়?—অমিতের ভাবিতেও কৌতূহলের উদ্রেক হইল।...একটা রাঙা চঞ্চল পাখি—গাছের ফাঁকে ফাঁকে পলাইয়া বেড়ানোই তাহার স্বভাব—সবুজ পত্রান্তর হইতে ডাকিয়া ডাকিয়া লোককে পাগল করিয়া তোলে।... হঠাৎ সে ডাক ভুলিয়া গেল, নাচ ছাড়িয়া দিল, নিস্তব্ধ নির্বাক পরম বিজ্ঞ হইয়া বসিল গাছের ডালে...ললিতা গম্ভীর হইয়াছে।

এক ফাঁকে সুনীলকে ললিতা শান্তভাবে আসিয়া কহিল, আমাকে সঙ্গে নেবে? একবার দেখে আসতুম তোমার বন্ধুর বান্ধবীকে।

সুনীল কহিল, পাগল!

ললিতা তবু দুই-একবার অনুরোধটি জানাইল; তারপর আবার চলিয়া গেল, দেখে আসি, তোমাদের খাবার যেন আবার নষ্ট না হয়।

খাবার আবার কেন?

যাইতে যাইতে ললিতা বলিয়া গেল, শুধু রূপসুধায় না-হয় তোমার বন্ধুর পেট ভরবে, কিন্তু তোমারও কি তাতেই ক্ষুধা মিটবে? পুরানো হাসির একটু ঝলক খেলিয়া গেল।

এই তো ললিতা! কিন্তু সেই শুভ্র, পরিপূর্ণ হাসি কি?

* * *

হাসি যেন মানুষের মনের ছবি, মানুষের সত্তার দীপ্তি। অমিত নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল, শৈলেনের হাসি আজ দেখিলে তো? কেমন আত্মতৃপ্তির হাসি—যেন ক্ষুদ্র গর্ব ও ক্ষুদ্র সাক্‌সেস্ তাঁহার প্রত্যেকটি রেখায় রূঢ়ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। অথচ শৈলেনের হাসি একদিন ছিল গভীর আনন্দের, সেল্‌ফ-কম্‌প্লেইসন্‌স্-এর নয়। ইহার অপেক্ষা সুহৃদের হাসিতেও সৌন্দর্য বেশি। সহজ, জেনর‍্যাস্, শিল্পানুরাগী, স্বচ্ছন্দ, আরামপ্রিয় সুহৃদ; তাহার হাসিও তেমনই—তীক্ষ্ণ নয়, সহজ, ওয়ার্ম। সত্যি হাসিতে মানুষের পার্সোনালিটি আশ্চর্যরূপে ঠিকরাইয়া উঠে, চুইয়া বাহির হয়, শুভ্র শঙ্খধবল হইয়া দেখা দেয়, অপূর্ব আলোক বিকীর্ণ করে। শুধু হাসিতেই বা কেন? কথায়, চলায় ভ্রূভঙ্গে— মানুষের সত্তা এই সব বহিরাবরণের মধ্যেও তাহার ছাপ রাখিয়া দেয়। রাজনারায়ণ বসুর হাসি, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাসি...গোরার সেই উচ্চ হাসি...এই জন্যই কি হাসি

একমাত্র মানুষেরই বৈশিষ্ট্য? মানুষেরই বোধহয় নিজস্ব সত্তা আছে, অন্য জীবের সম্বন্ধে সে প্রশ্নই উঠে না। তাই, ম্যান ইজ অ্যা লাফিং অ্যানিমল্—মানুষই হাসিতে জানে।...এ কথা কোথায় আছে? লেভিয়াথন্-এ?...সব মানুষ কি হাসিতে জানে? পিউরিটান অধ্যাপকের হাসি মনে পড়ে? "দে ওয়ার ঈটিং ডেভিল্স"—বেবুনের মতো মুখবিকৃতি—এই তাঁহার হাসি। হাসিতে জানেন রবীন্দ্রনাথ—অপূর্ব-সুন্দর, জ্ঞান-তীক্ষ্ণ, মধুর উইটি কিন্তু বড় মাপা, বড় মার্জিত, নিক্তির ওজনে স্থিরীকৃত। নো ব্রড্ লাফ্ অব হিউম্যানিটি। তাহা বরং গান্ধীজীর মুখে আছে—হাফ্-এঞ্জেলিক, হাফ্-ইডিয়টিক লাফ্টার্। বের্গসঁ বলেন, জীবনের গতিবেগ যেখানে ব্যাহত হইতেছে, সেখানেই প্রাণধর্ম হাসিরূপে উথলিয়া উঠে।...কিন্তু কেহ কেহ কত অকারণে হাসে; তাহা কি নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ?...সুরো যখন হাসিত, তখন কি বোকামি ধরা পড়িত? আর ইন্দ্রাণীর হাসি? সেই অতি লোভনীয় কমনীয় হাসি, যাহাতে মনে হয়, যেন সে আত্মবিমুগ্ধ—তাই কি পৃথিবীও সে হাসিতে বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে? কিন্তু সত্যি, এ কি হাসি ইন্দ্রাণীর? আত্মজয়ের হাসি ইহা? 'কে বলিবে আমি আহত, এই দেখ আমি সুন্দর শোভন কমনীয়, মধুর!' এ কি আত্মজয়, না পৃথিবী-জয়? না, অমিত জানে, এ হাসি আত্মছলনার—পৃথিবী-ছলনার। অতি সচেতন ইন্দ্রাণীর এ হাসি, আত্মসচেতন। কিন্তু তথাপি তেমনই স্বাভাবিক, শোভন, মধুর; একটু লাস্যের আমেজ-মাখা, পরিমার্জিত; ইন্দ্রাণীর অন্তরের ভাষা—যে ভাষা তার নিজস্ব রূপ ওর অবস্থাচক্রে আর পাইয়াও পায় না।...

না, হাসি ইন্দ্রাণীর স্বভাব নয়—সে ললিতার নিজস্ব। হাসি ছাড়া ললিতা তো চলিতেই পারে না। ললিতার কথায় গতি ঠিকরাইয়া উঠে হাসিতে, কথা হাসিতে ঠেকিয়া বাধা পায়—না, বাধায় সে কথা হাসি হইয়া ঝরিয়া পড়ে—পুরাপুরি কথারূপেই আর ফুটিতে পায় না। ললিতার মুখে সেই সকালে হাসি ফুটিতে চাহিয়াও ফুটিতে পায় নাই—ক্ষীণ ঝলকে দেখা দিয়াছে। 'শুধু রূপসুধায় না-হয় তোমার বন্ধুর পেট ভরবে।' অতি স্বাভাবিক হাসি, ললিতার সত্তার ধর্মই হাসি—হঠাৎ বাধা দেখিয়া আপনার সহজ উচ্ছলিত রণন হারাইয়া ফেলিতে ফেলিতে যেন সে হাসি বাজিয়া উঠিতে চাহিতেছিল সেই সকালেরবলাকার একটি পরিহাসে।

পনেরো মিনিট পরে আবার ললিতা ফিরিয়া আসিল, শোনো ঠাকুরপো, কাল বিকেলে তোমার দাদার সঙ্গে তোমার কি কথা হয়েছে?

সুনীল কোনো কথাই হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করে না।

কে তাঁকে তোমাদের নামে লাগিয়েছে বলতে পারো? সেই মিসেস ঘোষের বাড়িতে যে মেডিকেল কলেজের বাঁদর ছোঁড়াটা থাকে, সে কি?

সুনীল একটু শঙ্কিত হইল, কি হইয়াছে?

কি করে জানবো? আমার তো ওঁর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল—তিনি চা না খেয়েই বেড়াতে বেড়িয়েছেন; দেখ না চণ্ড! বাড়িতে গেস্টও তো আছে।

তোমাদের কি নিয়ে ঝগড়া হল আমি কি করে বুঝবো?

উনি কি সব ভয়ের কথা বলেন।

খানিক পীড়াপীড়িতে জানা গেল, অনিলের কেমন সন্দেহ হইয়াছে, দেবব্রতবাবু ভাল লোক নহেন। প্রথম শুনিয়া ললিতা হাসিয়াই খুন। 'যেন তুমি বড় ভাল লোক! তবু যদি তোমার মিসেস সেনের প্রতি মনোভাবটা না জানা থাকত!'

* * *

মিসেস সেন—একদা তন্বী দীর্ঘাঙ্গী সুগৌরবর্ণা রমা—'এখন মুটিয়ে উঠেছে, হয়েছে মিসেস সেন,' অমিতদের দুই ক্লাস মাত্র নীচে পড়িত। কলেজের দিনে অমিত, অনিল তাহাকে লইয়া 'ডুয়েল' লড়িত; বেচারী রমা তাহার কি জানিত? অমিতের এখনও ভাবিলে হাসি পায়। ললিতাকে অমিতই এ কথাটা বানাইয়া রঙ ফলাইয়া সেই কবে বলিয়াছিল।

কিন্তু ব্যাপারটা চুকিয়া গেল না। অনিল ক্রমশই সীরিয়াস হইয়া উঠিল, বলিল, তুমি দেবব্রতকে চেনো না।

ললিতা চিনে না, আর চিনে অনিল? এই পাঁচ দিন ললিতাই দেবব্রতকে দেখিয়াছে, অনিল তো ঘুরিয়াই বেড়ায়। তবু কিনা অনিল বলে, 'তুমি তাকে চেনো না।'

কি খুঁতখুঁতে মন, কি স্যাস্‌পিশ্যাস্ মাইণ্ড! বলতে হয়, তুমি বলো না তাকে যেতে—। তাই বলবে? বেশ, আমিও বলে রাখছি—ভদ্রলোককে যদি অমন অপমান করো, তা হলে কালই আমি ঠাকুরপোর সঙ্গে মার কাছে যাচ্ছি।

অনিল তবু শুনিতে চায় না—নানারূপে রাগ দেখাইল।

ললিতা অনেক দুঃখে, সঙ্কুচিত মনে, সুনীলকে সব কথা বলিল।

দাদার সন্দেহটা কি বিষয়ে, তুমি কি তা জানো?

সে আমি বিশ্বাস করি না। বলেন—'ওরা ডাকাতি করতে পারে, হয়তো বা খুনও করবে।' সে কি করে হয়, বলো তো? ভদ্রলোকের ছেলে ডাকাতি করবে কেন? আর অমন যার চেহারা, সে খুন করতে যাবে? দেখ তো তোমার দাদার বুদ্ধি? মানুষটাকে দেখেও অমন ভুল করে—চোখ থাকলে।

সুনীল একবার বলিল, হয়তো নিজের জন্যে না করতে পারে—

তবে কি পরের জন্যে চুরি করবে, খুন করবে?—ললিতা হাসিয়া উঠিল,—তুমি যে বুদ্ধির দৌড়ে তোমার দাদাকেও ছাড়িয়ে যাও। চুরি আবার পরের জন্যে কে করে? এমন বোকা আবার কে আছে? চুরি করবে নিজে, টাকা দেবে পরকে?

কেন? তোমাদের রবিনহুড—সেদিনও তো ফিল্ম দেখে এলে।

বাঃ সে চোর হতে যাবে কেন? সে বীরপুরুষ—গরিব-দুঃখীর বন্ধু। তার মতো হ'লে তো সে আমাদের পুজোর যুগ্যি।

কিন্তু আইন বলবে, সে চোর।

আইন-ফাইন তোমরা জানো বাপু, আমি জানি না। তা তোমরা তো আর কেউ বনে গিয়ে রবিনহুড হও নি, তার জন্যে তর্ক করে লাভ কি?

সুনীল একটু নীরব থাকিয়া বলিল, আচ্ছা বউদি, কেউ যদি দেশের জন্যে এসব করে?

ললিতা জিজ্ঞাসু মুখে বলিল, কি করে? বুঝলাম না।

এই মনে করো খুন, ডাকাতি, চুরি। দেখেছ তো, যুদ্ধে কি না লাগে? টাকাকড়ি চাই, নইলে যুদ্ধ চলবে কেন?

ও! আই হেট, আই হেট তোমাদের যুদ্ধ। সেই বইটা তো পড়েছ—অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট?

কিন্তু শিবাজী, গুরুগোবিন্দ, প্রতাপসিংহ—এঁরা দেখ মানুষ খুন করেছেন, টাকাকড়ি কেড়ে নিয়েছেন; এঁরা কি?

মহাপুরুষ। তাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করেছেন।

*　　　*　　　*

অমিতের বাস পার্ক সার্কাসের মোড়ে ঘুরিতেছে—এ পাড়ার বাড়িগুলি সব নতুন—যত নবো রিশ। দেখা যাউক সাতকড়িকে। সুনীলটার কি হইবে?—অমিত ভাবিতেছিল।

*　　　*　　　*

সুনীল কহিল, কেউ যদি আবার দেশের জন্যে যুদ্ধ করতে চায়?

বেশ তো, করুক না।

টাকা চাই যে।

চেয়ে নাও। চাঁদা তোলো।

জানাজানি হবে, ধরে অমনই জেলে পুরবে।

বা, জেলেও যেতে ভয়! আবার হবেন শিবাজী!

সুনীল তথাপি বলিল, তুমি 'মাদার' পড়েছ গোর্কির। মনে আছে? কেউ যদি তেমনভাবে গরিবের জন্যে কাজ করে—

আনন্দে ললিতার চোখ নাচিয়া উঠিল, কেন করছে না ঠাকুরপো? করবে? এস তবে, আমরাই না হয় শপথ করি—আমি তোমার সঙ্গে থাকবো—পারবে তুমি?

সুনীল হাসিয়া ফেলিল, যদি বলি, ডাকাতি করো, খুন করো? তখন পেছপা হবে না তো?

বাঃ! সে তুমি বলবে কেন? 'মাদার' তো কই কিছু চুরি করতেন না। কেবল সবাইকে ভালবাসতেন, কাউকে হিংসা করতেন না। সবাইকে বলতেন—'তোমরা জাগো, এসো, বেঁচে ওঠো?' দুঃখকষ্ট তিনি বুক পেতে নিয়ে তাদের বুকে তুলে নিতে চান।

উৎসাহে ললিতার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল—কথা ফুটিল। সুনীল তাহা দেখিতে লাগিল। ললিতা প্রশ্ন করিল, আমিও কি তেমন কাজ করতে পারবো না ঠাকুরপো!

সুনীল মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, পারবে—যদি লোক পাও। আপাতত আমাকে তো তিন শো টাকাই দিতে পারলে না।

বলেছি তো, অফিস খুললেই টেলিগ্রাম পাঠাবো।

বেশ, মনে থাকে যেন, তখন যেন আবার অন্য কোনো আপত্তি মনে না পড়ে।

তুমি আমাকে তেমন ভাবো নাকি?—আবার ললিতার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

* * *

বাস থামিয়াছে। অমিত নামিয়া পড়িল। নতুন রাস্তায় মিনিট তিন-চার চলিলেই সাতকড়ির বাড়ি। জমিদারের ছেলে সাতকড়ি। ওকালতি ও অ্যাটর্নিশিপ পড়িয়া মানুষ হইয়াছে। খুব ভাল ছেলে ছিল না...কিন্তু চতুর সে বরাবরই।

সাতকড়ির নিকট ভরসা কম। বাজে ইয়ার্কি করিবে—টাকা দিবে না। তবে যদি অমিতের পিতার নামের সেই টাকাটা আদায় হইয়া থাকে—যদুবল্লভ চাটুজ্জের তো ডিক্রি অনুযায়ী টাকাটা মাসখানেক আগেই কোর্টে জমা দেওয়ার কথা। তাহা হইলে এতদিনে সাতকড়ি তাহা তুলিয়া লইয়াছে—আজ পাইলে ভাল হয়। শতখানেক আপাতত হইলে বাড়ির খরচটা চলিয়া যাইবে। কিছু সুনীলকেও দেওয়া যাইবে।...সুনীল গেল কোথায়? পথে পথে ভাসিয়া বেড়াইবে! কতদিন আর এভাবে দিন চলিবে,—সেই দার্জিলিঙ ছাড়া অবধি—

অমিতের চিন্তাস্রোতে আবার সেই পর্বটি জাগিয়া উঠিল।

দাদা তো এলেন না? টাইম?

সাড়ে-নটা। ঘড়ির দিকে তাকাইয়া ললিতা বলিল।

বেরুতে হয় তবে।...সুনীল জানাইল।

চলো, আমি স্টেশন পর্যন্ত যাবো—তুলে দিচ্ছি। দেখুন দেবব্রতবাবু, আসছে রোববার যেন মিস্টার মজুমদারও আসেন—আমার হয়ে তাঁকে নেমন্তন্ন জানিয়ো সুনীল! অবশ্য মিস মজুমদারকেও বলবে, তা হলে আর দেবব্রতবাবুকে কার্শিয়াং ছুটতে হবে না।

স্টেশনের ঘন্টা বাজিল। সুনীল বলিল এঃ! বউদি,—যাঃ! বড্ড ভুল হয়েছে। ঘড়িটা রয়েছে বাড়িতে তোমার টেবিলের ওপর। আজ তো ঘড়িও নেই। কিন্তু একটা ঘড়ি না থাকলে যে বড় অসুবিধে—

ললিতা তাড়াতাড়ি নিজের হাতঘড়ি খুলিয়া ফেলিল।

এ যে লেডিজ রিস্টওয়াচ!

তোমার মতো বীরপুরুষের রিস্টেও চলবে। দাও দেখি হাতখানা।—ললিতা ঘড়িটা সুনীলের হাতে দিয়া বলিল, ওঃ! যেন মর্কট-ভুজে মণির মালা।

বলিয়া নিজেই হাসিয়া উঠিল। গাড়ি ছাড়িল।

* * *

দার্জিলিঙের পাহাড় মিলাইয়া গেল—অমিতের সম্মুখে এই যে সাতকড়ির বাড়ি।

...সাত দিন পরে একটা গুণ্ডার মারফৎ সে ঘড়ির তিন শত টাকায় ব্যবস্থা হইয়া গেল—অমিত তাহাও জানে।

তখন হইতেই সুনীল ভাসিতেছে—অমিতের চোখের সম্মুখে...একটা আগুনের

ফুলকির মতো মণীশ নিবিয়া গেল।...বিজয় ছাইচাপা পড়িয়াছে। রহিয়াছে শুধু সুনীল...বাত্যান্দোলিত অগ্নিশিখার মতো লেলিহান।

ছয়

সাতকড়ির বসিবার ঘর এখনও খালি। সে নীচে নামে নাই। ঘুম হইতে উঠিয়াছে কি?

আবি আসবেন, বাবুজী। বৈঠিয়ে।—আচ্ছা খবর দেও, ব'ল অমিতবাবু।

...সুনীলকে আঁটিয়া উঠা অসম্ভব হইতেছে। উপায় নাই—একবার যদি সেই ভবঘুরেদের সঙ্গ সে পায়—কি করিয়া উহারা পরস্পরের খোঁজ রাখে? না, এ পণ্ডশ্রম। ইন্দ্রাণীকে অমিত সেদিন বলিয়াছিল, ইন্দ্রাণী, এ তোমার পথ নয়।

যা কারুর পথ নয়, সে পথই আমার অমিত।

ইন্দ্রাণী পা বাড়াইয়া দিয়াছে। কথা সে শুনিবে না; মনে করে, বুঝি অমিত তাহাকে বিশ্বাস করে না। এই দুর্গম পথে, চঞ্চল-গতি ইন্দ্রাণী, তুমি প্রাণের আবেগে, আদর্শের আগ্রহে, আত্মদানের অহংকারে কোথায় চলিয়াছ? দেখ, দেখ, চোরাবালু তোমার সম্মুখে।...চোরাবালুতে অবসান—সুনীলের সে অবসান, অমিত, ঠেকাইতে চাও তুমি? তুমি চাও—পথে উহারা অগ্রসর হউক, শেষ হউক—চোরাবালুতে কেন? কিন্তু বৃথা অমিত, বৃথা। পারিবে না, কিছুতেই পারিবে না ইহাদের গতিরোধ করিতে। ইহারা শেষ হইতেই চায়।...

কাচের 'ডুম'টার উপরে একটা বড় পতঙ্গ মাথা ঠুকিতেছে—সে আগুনকে চায়। লেলিহান অগ্নিশিখা তাহাকে ডাকিতেছে—আয়, আয়, আয়। মূঢ় 'ডুম' শুভ্রপ্রাণ 'ডুম', বলে—যাস নে, যাস নে।...মাথা খুঁড়িতেছে পতঙ্গটা...বার বার মাথা খুঁড়িতেছে। তারপর একবার সব বাধা ডিঙাইয়া একেবারে আগুনের মধ্যে পথ খুঁজিয়া লইল। অপূর্ব উন্মাদনা! নিমেষকাল ছটফট, ছটফট, ছটফট। শেষে পোড়া কুঁকড়াইয়া-যাওয়া পতঙ্গদেহ তেমনই পড়িয়া থাকে।

* * *

কে জানে, কেন এই অগ্নিদীক্ষা? এই ব্যাপ্‌টিজম্‌ অব ফায়ার?—কথাটা বোধহয় কার্লাইলের।...পতঙ্গের সূক্ষ্ম স্নায়ু-তন্ত্রীতে আলোর স্পন্দনেই এই মৃত্যু-তৃষ্ণার জন্ম? নিতান্তই একটা স্নায়বিক উত্তেজনা? মানুষও পতঙ্গেরই মতো? তাহাদের মনের পঙ্কতলে—দেহের নাড়ীতে—কি মৃত্যুর শিহরণ এমনই একটা স্নায়ুগত উন্মাদনা জাগায়? না হইলে কেন উহারা এইরূপে ছোটে সমস্ত জানিয়া, সমস্ত বুঝিয়া—এই অর্থহীন আহুতির ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়াও? হয়তো সমস্ত বায়ুমণ্ডলের মধ্য হইতে যে আঘাত উহাদের স্নায়ুমণ্ডলে পৌঁছায়, এই ক্ষিপ্ততা তাহারই প্রতিঘাত—পাভ্‌লোভের ব্যাখ্যাতে সেই কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্‌স। ইহার রূপ এই, ধর্ম এই, নড়চড় হইবার উপায় নাই। বৃথা উহাদের বাঁচাইবার চেষ্টা—কন্‌ডিশনড রিফ্লেক্‌স—পূর্বনির্ধারিত পরিণাম। মানুষ যেন একটি যন্ত্র মাত্র।

উল্টাপথের যাত্রী ফ্রয়েডিয়ানরা কিন্তু তাহা মানিবে না, অথচ তাহাদের বক্তব্যটাও প্রায় ইহারই কাছাকাছি—ডেথ-উইশ—মরণেচ্ছা, বাঁচিবার ইচ্ছারই ও-পিঠ, দুই বিরোধী বাসনার দ্বন্দ্ব আর জীবনেচ্ছার পরাজয়। কেন? ফ্রয়েড বলিবেন...মনের চিকিৎসা করো, উহাদের মৃত্যু-যজ্ঞ শেষ হইবে। উহাদের মনই বিকারগ্রস্ত। ধন্য ফ্রয়েড! বুঝিবার অবকাশ হয় নাই যে, মন জিনিসটারও সমাজের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ভাঙা-গড়া হয়; আর যেখানে সমাজই বিকারগ্রস্ত সেখানে ব্যক্তির মন, জাতির মনও বিকৃত হইবে।...

অমিত যত বলুক, সুনীলের ভাবিবার অবকাশ নাই—মানব-ইতিহাসের কোন্ পাতা হইতে কোন্ পাতার দিকে ইহারা অগ্রসর হইতে চায়, কঠিন সেই পথে চলিবার পক্ষে কোন্ পাথেয় প্রয়োজন।...

কিন্তু অপরাধ সুনীলদেরই বা কি? ইতিহাসের অধ্যাপক জানেন না, সমাজতত্ত্বের ছাত্ররা খুঁজিতে চাহেন না, অর্থনীতির পণ্ডিতেরা তলাইয়া দেখেন না—বর্তমান সমাজ কোন্ ভাঙা ভিত্তির উপর গড়া। ইহার পরে দোষ দিব এই শিশুদের? সমাজের দেহান্তরের সূত্রটি কেহই উহাদের চোখে ফুটাইয়া তুলিল না, তাই-না শিশুর হতো ইহাদের এই বিদ্রোহ।...

'মাপ করিস, অবস্থার চক্রান্তে আমার মন বেঁকে-চুরে যাচ্ছে।' মণীশের কথা। পাভ্‌লোভও তাহাই বলিবেন। তবে তাঁহার ব্যাখ্যা মনের অস্তিত্বও মানে না। একেবারেই জড়বাদী।...ফ্রয়েড বলিবেন—'অবস্থার চক্রান্তে' নয় সেক্‌স রিপ্রেশনে।

হইবেও বা। কিন্তু অমিতেরই তো এই দেবাদিদেবের সম্বন্ধে ভাবিবার সময় নাই। আর উহাদের? উহাদের মনে সেক্‌স-জল্পনা পথ পাইবে কি করিয়া? অমিত মনে মনে হাসিল—'তথাপি, ভাবি না বলে আমিও আর শুকদেব হচ্ছি না। ওরাও হয় না। অতএব সেক্‌স-জল্পনাই আমার ও ওদের মনকে বিকৃত করছে।'...

বেশ চমৎকার যুক্তি। সেক্‌স, সেক্‌স, সেক্‌স—এ যেন লিঙ্গপূজার স্তব।...

* * *

সাতকড়ির বইয়ের আলমারিগুলি কি সুন্দর! অথচ ও হয়তো জন্মেও বই পড়ে না—আইনের বইগুলি বাদে। সাতকড়ির আসিতে দেরি আছে কি? একবার বইগুলিই দেখা যাউক।

অমিত বইয়ের কেসের সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল।

ইতিহাস। ও, নতুন ইউনিভার্স্যাল হিস্টরির আট ভল্যুম। তোমারও যে সে বইয়ের ইন্‌স্টল্‌মেন্ট বাকি পড়িতেছে অমিত! এবার টাকা পাইলেই দুই মাসের টাকা দিও, —আর লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের টাকাও, ফাইন সুদ্ধ। কোথায় টাকা পাইবে? —গুচ-এর যুদ্ধেতিহাসের নতুন খণ্ড কেনা হয় নাই, আর টয়েন্‌বি'র সার্ভে অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স, ১৯২৯-এর দাম এখনও বাকি। দোকানে বই আসিয়া পড়িয়া আছে। দোকানী তাগিদ দেয়; তুমি তাই পলাইয়া পলাইয়া ফিরিতেছ; কারণ

টাকা নাই।...কিনিয়াই বা লাভ কি? এমন ঝকঝকে তকতকে বুক-কেসে না রাখিতে পারিলে বইগুলি ধিক্কার দেয়, অপমানে বাঁকিয়া উঠে। না, আর বই কেনা নয়। মার্শ্যালের হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো তবু...কবে...কখন? কি উপায়ে? এই সাতকড়ির টাকাটা পাইলে। মোট আট শো টাকা। কিছুটা যাইবে বাড়ির খরচ, কিছুটা না হয় মার্শ্যালের বইয়ের জন্য—কিন্তু কিছুটা সুনীলকে দিতেই হইবে তো।...

কেন সুনীল টাকা চায়? জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে, 'দিও না।' কিন্তু না দিলে চলিবে কেন? অনিলের মতো তো অমিত বলিতে পারিবে না—'না'। পারিবেই বা না কেন? অনিল কি সুনীলকে কম ভালবাসে? সুনীলের বড়দাদা, মা, বড় বউদি, ললিতা, ইঁহারা সকলেই অমিতের অপেক্ষা সুনীলের বেশি শুভানুধ্যায়ী; তাহাকে বেশি স্নেহ করেন; তাহার জন্য টাকাও তাঁহারা অজস্র ঢালিবেন—যদি সুনীল তাঁহাদের কথা শোনে। তবে কেন অমিত মনে করে সুনীলকে টাকা দেওয়া উচিত? কথা সে না শুনিলেও দেওয়া উচিত?

অমিত আবার সুনীলের কথা ভাবিয়া চলিল, সে তো বাড়ির দিকে আর ফিরিবে না। কারণ অনিল তাহার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। অনিল তাহা করিতে পারে? অমিত কিছুতেই এ কথা মানিতে চাহে না।

দার্জিলিং ছাড়ার এক মাস পরে ছোট শহরে দুপুরে ললিতাকে একটি ছেলে ডাকিতেছে। ঘুম ছাড়িয়া ললিতা উঠিল, জানালা দিয়া একবার বারান্দায় দাঁড়ানো লোকটিকে দেখিল। অপরিচিত, তবে বালক।

আর বিচারের প্রয়োজন নাই, ললিতা তাহাকে ঘরে ডাকিল।

কাঁচা মুখ, একটু ভীতু দৃষ্টি। সসঙ্কোচে ইতস্তত তাকাইয়া ছেলেটি একটি নমস্কার করিল। তারপর কুণ্ঠিতভাবে কহিল, এই চিঠিটা—পড়ে আবার আমাকে ফেরত দেবেন।

সুপরিচিত হস্তাক্ষর—ললিতার মুখে আনন্দজ্যোতি ফুটিয়াই নিবিয়া গেল! পরক্ষণে হাত কাঁপিতে লাগিল। বুক দুড়দুড় করিতেছে। সে বুঝিল না, পড়িয়া চলিল—'অফিস তো খুলেছে; টাকা কোথা? টেলিগ্রামে না হয় না পাঠালে; এই ছেলেটির হাতে টাকাটা দিলেই হবে। আর ঘড়িটার জন্য দুঃখ করো না—তুমি তা করবেও না জানি। তবে শুনে খুশি হবে, জিনিসটা খুব ভাল কাজে গেছে।'

ছেলেটি আর কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নাই। চিঠিটা ফেরত লইয়া তৎক্ষণাৎ টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

ললিতা বাধা দিতে গেল, ছিঁড়লেন যে?

তা-ই আদেশ আছে।

কার?

আবার উত্তর নাই। সুনীলের বাঁকা-বাঁকা হস্তাক্ষর,—সেই সুন্দর সম্ভাষণ,

কৌতুকপ্রিয়তা, সবই ওই অক্ষরের ছাঁদে বাঁধা ছিল—ছিন্ন হইয়া গেল। ললিতার ইচ্ছা হইল, চিঠির ছিন্ন টুকরাগুলি কাড়িয়া লইয়া যত্নে তুলিয়া রাখে।

অমিত মনে মনে হাসিল—এই কি সেক্‌স কম্‌প্লেক্‌স? কাহার? ললিতার, না সুনীলের?...গ্লোরি টু ফ্রয়েড। যাক, সাতকড়ির আলমারিতেও তিনি আসিয়াছেন। ফ্রয়েড নহেন, হ্যাভেলক এলিস। সাতকড়ির বিজ্ঞাননিষ্ঠা অপূর্ব। ভূগোল পড়ে না, জানেও না, মাথাব্যথাও নাই, কিন্তু যৌনবিজ্ঞানের প্রতি গভীর আকর্ষণ। শুধু এলিস নন, আরও অনেকে আছেন।

সেক্‌স...সেক্‌স...সেক্‌স।—অমিত মনে মনে হাসিয়া আবার ভাবিয়া চলিল।

দুপুরের রৌদ্রে নিষ্প্রভ-নয়না ললিতা ভাবিয়া চলিয়াছে সুনীলের কথা। ঘড়িটা সে অমন করিয়া না লইলেই পারিত। 'তবু নিয়েছে নিক, সুনীল—সে নিয়েছে,—সুনীল—সুনীল।' ললিতার পক্ষে নামটিই যথেষ্ট।

তুমি কাল এস দুপুরে। আজ আমার হাতে টাকা নেই, যোগাড় করে রাখবো।—দণ্ডায়মান ছেলেটির কথা মনে পড়িতেই ললিতা তাহাকে বলিল।

আবার সুনীলের খবর মিলিল। মনে কথাটা চাপিয়া রাখা অসম্ভব হইতেছে। ললিতার মন আনন্দে ও বেদনায় শিহরিত হইতেছে। হাজার হউক, সুনীল তাহাকে ভুলে নাই। অনিলকে ললিতা বলিতে চায়—এক্ষুনি, এই মুহূর্তে। এমন আনন্দের বার্তাটা কাহারও কাছে না বলিলে আনন্দ যেন অপূর্ণ থাকিয়া যায়। কিন্তু অনিল তখনও অফিসে।

পরদিন তেমনই দুপুরের রোদ। মিসেস দত্ত এই সময়ে পথে বাহির হইলেন। একবার মহিলা-সমিতির গৃহে যাইবেন। দূরে পথের মাথায় একটি ছোট ছেলেকে দেখিয়া কি কথা বলিলেন, পরক্ষণেই ভয়ে ত্রস্তপদে ছুটিয়া চলিলেন।

সুনীল অমিতকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছে, তোমার বন্ধু অমিদা, শোনো তাঁর কীর্তি। বউদি বললেন—টাকা তিনি দিতে পারবেন না—দাদার নাকি অমনই অনেক ঝক্কি পোয়াতে হচ্ছে। চাকরি নিয়ে টানাটানি। যে ছেলেটা গিয়েছিল, তাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে পাকা ব্যবস্থা করে ঘরে দাদা বসেছিলেন। বউদি পথেই ছেলেটাকে সে খবর দিয়ে দেন—ফাঁদে আর শিকার পড়লো না। দাদা আর তাঁর পুলিশ বন্ধুরা বড্ড হতাশ হয়েছেন।

* * *

সুনীল হাসিতে লাগিল, এর পরেও নিশ্চয়ই ভ্রাতৃত্বের বাঁধনেই, তুমি বলবে, আমাকে ধরা দিতে, না?

* * *

অমিত জানে—সুনীলের এ বিচার যথার্থ নয়। অনিল দত্ত বড় জোর ছেলেটাকে ধরিয়া ধমকাইয়া দিত—পুলিসের হাতে কিছুতেই দিত না। কিন্তু সুনীলকে সে কথা বুঝাইতে চেষ্টা করা বৃথা। সে বুঝিবে না, মানিবে না, তাহার নিজের আত্মীয়দের সে অনাত্মীয় করিয়া না তুলিলে নিজেই স্বস্তি পায় না। এমনই দ্বিধাবিভক্ত মন ইহাদের...ইহাদের কেন, মানুষের।

* * *

সাতকড়ি রীতিমতো সেক্স-সাইকলজির ছাত্র। সে হয়তো বলিবে, সুনীলের মনের গোড়ায়ও সেক্স। অমিতের হাসি পায়.. সেক্স...সেক্স...সেক্স। বিজ্ঞানের নামেও সেক্স। সাতকড়িও রীতিমতো বৈজ্ঞানিক; হয়তো ফ্রয়েডের বুলিও জানে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই জানে। আজকাল কে না জানে? না জানিলে, সে মূর্খ; না জানিলে বিকৃতমনা—যেমন তুমি অমিত।

জুতার শব্দ হইল। সাতকড়ি আসিতেছে কি?

সাতকড়ি প্রবেশ করিল। গোল আলুর মতো গোল গাল দুটি হাসিতে একটু কাঁপিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ বেশিক্ষণ হয় নাই। মাংসের স্থূলতা ও নিদ্রার জড়তায় মিলিয়া সে হাসি চাপা পড়িয়া গেল। সত্যই হাসি ব্যক্তিসত্তার জ্যোতিঃরেখা—এক নিমেষের জন্য কথাটি অমিতের মনে আবার খেলিয়া গেল। কিন্তু ততক্ষণ দুইজনের কুশলপ্রশ্ন চলিতেছে। খাঁটি বিলাতী ক্রিকেট ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবির উপরে দামী শাল, তাহারই ফাঁকে দেখা যায় হীরার বোতাম। সোনার সিগারেট-কেস খুলিতে খুলিতে সাতকড়ি জিজ্ঞাসা করিল সকালেই যে! কি মনে ক'রে?

মনে আর কি করবো, বলো? অন্নচিন্তা, ব্রেড-প্রব্লেম। যদুবল্লভের সেই ডিক্রির টাকাটা তো জমা হয়ে গিয়েছে। তা তুলেছ বোধ হয়। টাকাটা তা হ'লে দাও—কোনরূপে গেল মাসের বাড়িভাড়াটা দিয়ে বাড়িওয়ালার কাছে মুখরক্ষা করি নইলে বড় জ্বালাতন করছে।

যদুবল্লভ চাটুজ্জে? হ্যাঁ, সে টাকাটা জমা হওয়ার কথা। তুমি যেও দেখি একবার অফিসে—দেখতে হবে কাগজপত্র।

তা হলে এখন দিতে পারবে না?

এখন?—সাতকড়ি হাসিয়া বলিল, না, তোমাদের কাণ্ডজ্ঞানই নেই। সে টাকা জমা হবে, সে টাকা তুলতে হবে; তারপরে তোমাদের দেওয়া—এ কি চাট্টিখানি কথা হল হে অমিতবাবু?

তা হলে কি আজ হবে না? কাল—কাল হবে?

গরজ বড় বালাই। কাল কি, হপ্তাখানেক বাদে খোঁজ ক'রো। ইতিমধ্যে অফিসে একবার যেওনা। আমি না থাকি বুড়ো হরিবাবুকে একবার তাগিদ দিও। বরং তাঁকে পাঁচটা টাকা কবুল করো—তেমন তাড়া থাকলে। দেখবে, দুদিনেই টাকা বের করে আনবে। বুড়ো একটি আস্ত ঘুঘু। হাইকোর্টে অনেক টুনি-কৌঁসুলি চরিয়ে খেয়েছে। হাইকোর্টে টাকা দাখিল করা যেমন সহজ, বের করা তেমনই শক্ত হে ভাই। সে খবর তো জীবনে নিলে না। ভাবো, বুঝি মাস শেষ হলেই কলেজের মাইনে যেমন পকেটে এসে যায়, তেমনই পাওনার দিন এলেই টাকা লাফিয়ে মানুষের হাতে এসে পড়ে। বেড়ে আছ ভাই। তোমাদের দেখলে হিংসা হয়। পৃথিবীটার কোন তোয়াক্কাই রাখো না।

কর্ক-টিপ সিগারেটটি ধরাইবার জন্য সাতকড়ি একবার কথা বন্ধ করিল। দিয়াশলাই জ্বালাইতে গেল।

অমিত কৌতূহলভরা মনে ভাবিতে লাগিল—'হিংসা হয়'—সাতকড়ির হিংসা হয় অমিতকে! ওই নধর সুপুষ্ট দেহ, গোল মাংসল গাল দুটি, সারা গায়ে যাহার চিন্তাহীনতার স্থাণু আয়েস আঁকা, সে তোমাকে হিংসা করে—তোমাকে,—ময়লা, রোগা, রেখাঙ্কিত মুখ ও ললাট, চোখে যাহার অস্থির বিক্ষুব্ধ চিন্তা, সেই তোমাকে—অমিত!

সম্মুখের আলমারির কাচে রৌদ্রের আঁচ আসিয়া পড়িয়াছে—বইগুলিও যেন হাসিতেছে। চমৎকার বাঁধাই, চমৎকার সাজানো, অক্ষুণ্ণ পরিচ্ছন্নতা। মোটা মোটা ভল্যুমগুলি—ঝকঝক করিতেছে। শৌখিন সংস্করণ স্ট্যাণ্ডার্ড লিটারেচার কোম্পানির বইগুলি, ওরাও বোধহয় হিংসা করে অমিতের ভাঙা আলমারির সস্তা ধূলিভরা বই-গুলিকে!—সেই জীর্ণ-জর্জর অক্সফোর্ড কীট্‌সকে, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড-কেনা কেরির দান্তেকে! ..

কিন্তু কিছু টাকা না হলে যে ভাই চলে না। হিংসাই যদি করো, দয়া করে ওই বস্তুটির যোগাড় করে দাও না!

কেন? টাকা দিয়ে কি করবে? বই কিনবে, না বেড়াতে বেরুবে?

কোথায় যেন—ওর কি নাম?—খেজুরদহ না কি—সেই ছত্তিস গড়ে?—সেই যে গেছলে—কি একটা পুরানো মন্দির দেখতে। নামটা কি, বলোই না হে!

না হে, বেড়ানো নয়, ওসব অনেকদিন ঘুচেছে। এখন বাড়িভাড়াই না দিতে পারলে বেরিয়ে পড়তে হবে।

কেন? বাড়িভাড়ার অসুবিধাটা কি?

কিছুই না। বাড়িতে আছি, ভাড়া চায়, এই হল বাড়িওয়ালার অপরাধ।

ক'মাস বাকি পড়েছে?

এক মাস তো হয়ে গেল। দু দিন দারোয়ান এসেছিল—আজ আবার আসবে, তাই সরে পড়েছি।

মোটে এক মাস! গ্যাঁট হয়ে বসে থাকো, কোর্টে-যাক, ঘুরিয়ে নাও। নাজেহাল হবে। দেখবে, আর অত তাগিদ সইতে হবে না।

লাভ কি? টাকাটা তো দিতেই হবে?

দেবে বই কি। তবে দারোয়ানের তাড়া খাবে না, তখন সে বেটাই হবে তোমার তাঁবেদার।

সত্যিই, অমিত পৃথিবীকে চেনে না। এই তো সহজ, সাধারণ পৃথিবীর কথা। কিন্তু অমিত মুষড়িয়া যায়। কেন মনে করে, ইহার মধ্যে একটা গ্লানি আছে, একটা হীনতা আছে। ..আচ্ছা, কেউ যদি বস্তির ঘরওয়ালার ভাড়া ফাঁকি দেয়. . হোটেলওয়ালাকে ছলনা করে,—হ্যাঁ, বউদির ঘড়িটা ঠকাইয়া লইয়া পালায়—তাহাতে বুঝি গ্লানি থাকে না? অমিতের ভাবিতে হাসি পায়। কিন্তু সত্যই এই সব সত্ত্বেও সুনীলের জীবনে সে গ্লানির দাগ দেখে না—দেখে না বলিয়া বিস্মিত হয়! নিজের পক্ষপাতিত্বে নিজেকে উপহাস করে, ঠোঁটে হাসি ফুটিয়া উঠে।

কি হাসছো যে? অসম্ভব মনে হচ্ছে কি?

না, ভাবছি, কাজটা তো সহজ। কিন্তু বুদ্ধিতে তো কুলোয় না, সাহসও হয় না। হয় না কেতাবী বিদ্যার জন্যে ও প্রফেসরি মূর্খতার জন্যে।

অমিত ভাবিতেছিল, বসিয়া থাকিয়া লাভ কি? টাকা পাওয়া না যাউক, সুনীলের জন্য একটা বাড়ি খোঁজা তো দরকার। এখানে বসিয়া তাহা সম্ভব নয়। কোথায় সুনীলের জন্য স্থান করিবে?

অমিত নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া বলিল, কিন্তু সে তো অনেকদূর। এখন চাই কিছু টাকা। দেখি, আবার বেলা হচ্ছে।—বলিয়া সে উঠিতে গেল।

ক্লাস কটায়?

সাতকড়ি কেবলই ভুলিয়া যায় যে, অমিতের প্রফেসারি চাকুরি নাই। সে বর্তমানে একটা সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক। হয়তো কাল আবার প্রফেসরি চাকুরি লইবে, পরশু ছাড়িবে, পরদিন ফ্রী ল্যান্স,—আবার কোন বড়লোকের বক্তৃতা লিখিয়া দিয়া মাসিক উপার্জন বাড়াইয়া ফেলিবে তিন শত টাকায়; সাতকড়ি তাহা পূর্বেও দুই-একবার শুনিয়াছে,

কিন্তু ভুলিয়া যায়। কিছুতেই এই তুচ্ছকথাগুলি তাহার মনে থাকে না। মনে রাখিবার মতো কোন ইন্টারেস্ট তাহার জন্মায় না বলিয়াই কথাগুলি তাহার মনের ফাঁক দিয়া গলিয়া বাহির হইয়া যায়। সাতকড়িকে তাহা বলিলে, সে বলিবে, ওঃ, আমার মেমরি এত খারাপ! অমিত জানে, মেমরি সাধারণত সকলকার প্রায় একই থাকে, যাহার সম্পর্কে ঔৎসুক্য-বোধ জাগে, মেমরি তাহার কথা গাঁথিয়া লয়, স্মৃতিস্তরের মধ্যে তাহার আসনটি আপনা হইতেই পাকা হইয়া যায়। আর যাহাতে ঔৎসুক্য নাই, সে কথা যেন স্মৃতির পদ্মপত্রের উপর উছলিয়া গড়াইয়া গেল—স্মৃতির পাতায় পরক্ষণেও কোন দাগই তাহার আর রহে না। সাতকড়িরও মনে থাকে না—কিছুতেই মনে থাকে না, অমিত এখন প্রফেসর নাই।

অমিত মুখে বলিল, সে দেরি আছে। তবু উঠতে হবে তো। কিন্তু তাহার মনে জাগিয়া উঠিল শৈলেনের কথা 'কেমন লাগে পড়ানোর কাজ?' শৈলেন শোনেই নাই যে অমিত অধ্যাপক নয়—সাতকড়ি যেমন শুনিয়াও শোনে নাই। শৈলেন শুনিতেও চাহে নাই, সাতকড়িও মনে রাখিতে চাহে না। অমিতের সম্পর্কে তাহাদের ঔৎসুক্য নাই, ইন্টারেস্ট নাই। অথচ একদিন শৈলেনের সমস্ত ইন্টারেস্টই ছিল তাহাকে ঘিরিয়া। একদিন...এই সেইদিনের কথা মাত্র। এমনই জীবন! শুধুই ছাড়াইয়া যাওয়া। শৈলেন আর সাতকড়ি এক হইয়া যাইতেছে; অথচ দেহ-মনে এমন স্বতন্ত্র প্রকৃতির দুটা মানুষ খুঁজিয়া পাওয়া দুর্ঘট। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বড়লোক, দরিদ্র; চতুর, মেধাবী; আয়েসী, পরিশ্রমী; ওয়ার্লডলি টাইপ, আইডিয়ালিস্ট টাইপ একেবারে স্বতন্ত্র, দেহে পর্যন্ত ভিন্ন কাটিগ্যারি-র।

* * *

তোমাদের সঙ্গ তো ভাই পাওয়া যায় না।—সাতকড়ি হাসিয়া বলিল আধঘন্টা কথা বলে একটু বিদ্যাই না-হয় লাভ করি। ডোন্ট ইউ গ্রাজ্ দ্যাট্ টু অ্যান ওল্ড ফ্রেণ্ড।

সেই হাইকোর্টের উকিল-টুর্নিসুলভ ইংরেজী বুকনি! আবার শৈলেনকে মনে পড়িল। শৈলেন আর সাতকড়ি দুইজনের দেহ-মনের গড়নই আলাদা, স্বতন্ত্র।

সাতকড়ির গোল সুপুষ্ট মুখ পরিহাসে এবার দোলা খাইল। শৈলেনও যেন এইরূপ হইয়াছে দেখিতে, এমনই স্মাগ্, সেল্ফ কম্প্লেইসেন্ট্, ওয়ার্ল্ডলি। অথচ দুইজনে কত তফাত।

তফাত? কোথায় তফাত?

*   *   *

মুখে অমিত উত্তর দিল, নাও নাও, ও রকম বলে সবাই। একদিন, 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' করে ঘুরে বেড়াতে হলে দেখতে মজাটা। তাহার মন বিদ্যুৎবেগে ভরিয়া গেল, তফাত নাই, তফাত নাই, শৈলেন ও সাতকড়ি এক।

কি করিয়া তাহা সম্ভব হয়? বিবাহ? উওম্যান, উওম্যান, উওম্যান।

না না, সে নয়, সুরোর সহাস্য উজ্জ্বল মুখ মনে পড়িল; মনে পড়িল ললিতার চঞ্চল দৃষ্টি; মনে পড়িল সুধীরার চিন্তা-বিষণ্ণ শান্ত মুখ; ইন্দ্রাণীর মৃত্যুঞ্জয়ী বাণ-বিদীর্ণ উন্মাদনাদৃপ্ত মুখ .আর মায়ের স্নেহক্ষরা যাতনাবিদ্ধ গম্ভীর দৃষ্টি...না না, উওম্যান ইন্ অ্যাব্স্ট্রাক্ট তোমাকে দোষ দিই সকলে। কিন্তু ইন্ কন্‌ক্রিট, মা, বোন, বান্ধবী, তোমরাই জীবনকে বাঁচাও, হয়তো নিজেরাই মরিয়া বাঁচাও, এ সমাজে পুরুষেরা বাঁচে তোমাদের মরণে।

চা আসিয়া গেল। খাইতে খাইতে অমিত ভাবিতে লাগিল, তাহা হইলে সংসার। সংসারই শৈলেনকে সাতকড়িকে এক করিয়া ফেলে। সংসার! দুনিয়া-জোড়া একটা বিশাল চক্র—সুবৃহৎ, অতি সুবৃহৎ, কোনারকের রথচক্রের অপেক্ষাও বড়, অথচ ভয়াল হিংস্র কুটিল, তাহার নীচে পিষিয়া গিয়া শৈলেন হয় সাতকড়ি।

ইহাই জীবন—'ইহা এইরূপই হয়।' কেন? 'কেন'র উত্তর—'ইহা এইরূপই।'.. অমিত বহুদিন পূর্বে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পড়িয়াছে। মহর্ষি বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তর করিলেন, 'মহারাজ, ইহা এইরূপই হয়।'...ইহা এইরূপই হয়—শৈলেন সাতকড়ি হইবেই।—ইহাই জীবন।

*   *   *

অমিত ভাবিতে লাগিল—সেদিনকার সমাজে মানব-অদৃষ্টের প্রতি এই অবিশ্বাসের ও কর্মকুণ্ঠার বাণীই বিঘোষিত হইবার কথা। এই প্যাসিভ্ যোগবাশিষ্ঠ ফিলজফিই সে যুগের প্রকৃতি তাড়িত শ্রান্ত মানুষের ছিল সান্ত্বনা। কিন্তু যে সভ্যতা আকাশ-পাতাল জয় করিতেছে, মূলত অ্যাক্টিভিস্ট বিজ্ঞানের নতুন নতুন যন্ত্রের সহায়ে জীবনকে করিতেছে উদ্দাম, বিজয়ী, সে কেন এই ফিলজফি স্বীকার করিবে—কেন বলিবে, 'ইহা এইরূপই হয়?' বরং এ যুগের সভ্যতা বলিবে, বলিবার অধিকারী—"ইহা এইরূপ নয়; এইরূপ হইতে আমি দিব না।" কিন্তু সে বাণী তাহার মুখে নাই, সে সাহসও তাহার বুকে নাই। কারণ, বুকের তলায় তাহার আত্মবিরোধ; শক্তি তাহার স্ববিরোধী সমাজ-ব্যবস্থায় খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে, স্বার্থের দ্বন্দ্বে শুভবুদ্ধি পরাজিত হইতেছে। আজ

লোভের নিকটে বিজ্ঞানের দানও বলি পড়িতেছে। মানুষের দেহ-মন, বর্তমান ভবিষ্যৎ, সব গ্লানিতে ভরিয়া উঠে এই লোভান্ধ সমাজে, এই বিচ্-গডেস্ সক্সেস্-এর পূজায়; আর তাই সান্ত্বনা খোঁজে যোগবাশিষ্ঠের বচনে—'ইহা এইরূপই হয়'—এ ইরূপই জীবন।

* * *

ততক্ষণে সাতকড়ি কহিতেছে, এখনও গানবাজনা শোনো তো? ওঃ, সুহৃদের সঙ্গে বুঝি ঘুরে বেড়াও? সুহৃদ বেড়ে আছে। আমার সঙ্গে তো দেখা হয় না, নইলে দু-একটা ভাল গানের বৈঠকে তাকে নিমন্ত্রণ করতাম। তুমি যাবে? চলো না!

কোথায়? কবে?

বরানগরের একটা বাগান-বাড়িতে—আজ সন্ধ্যায়। ওই—বাগান-বাড়ি শুনেই তো মাথা নাড়ছো! ওহে, ভয় নেই, ভয় নেই, মেয়েমানুষ কাউকে গিলে খেতে পারে না। আর সত্যি সত্যি, খাবেই বা কেন? তারা তোমার মতো উপোসী ছারপোকাও নয় যে, রিপ্রেস্‌ড সেক্স হাঙ্গার নিয়ে বুভুক্ষু বসে থাকবে! ইচ্ছা থাকলে বেশ সশরীরে ফিরে আসতে পারবে, সুবোধ ছেলের মতোই ঘরে ফেরা চলবে; ওখানে ওদের আচরণেও এক চুল ভদ্রতার হানি হবে না। বিশেষত, আজ তো কথাই নেই। পার্টিটার টাকা দিচ্ছে দিল্লীওয়ালা সওদাগর খুদা বক্শ—আমারই ক্লায়েন্ট। একটা বড় রকমের ফ্যাসাদে পড়েছে। এখন নবাবজাদা উসমান খাঁকে ধরে সরকারের দু-একজন লোককে তুষ্ট করা দরকার। আমি করছি পার্টি অ্যারেঞ্জ, নাম নবাবজাদার, আসবেন সবাই। খুব সিলেক্ট মাত্র আধ ডজন লোক। গাইয়ে নাচিয়েও খুব বাছা---মমতাজ বেগম অব ইন্দোর ফেম, আর এখানকার নাচিয়ে চীনে পুতলী, আর শেষ গান সরস্বতীর। নো মিক্সিং, আন্‌লেস ইউ ওয়ান্ট ইট। তার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করেছি। আর বেস্ট শ্যাম্পেন। কাল রাত দুটো পর্যন্ত বাড়িটাকে সাজাতে গেছে, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজটা করিয়েছি। ট্রীটটা সাক্‌সেসফুল হওয়া চাই। অ্যাণ্ড ইট উইল বি এ ট্রীট।

* * *

অমিতের চোখের সম্মুখে সমস্ত দৃশ্যটা ফুটিল, সেই সাতকড়ি, চতুর, আয়েসী—হইয়াছে অ্যাটর্নি। ঠিকই হইয়াছে সংসার ওকে ওর জীবনকক্ষে পৌঁছাইয়া দিয়াছে! জীবন ভুল করে না; পাকা জহরীর মতো মানুষকে বাজাইয়া লয়।

* * *

সাতকড়ি বলিতেছে, তুমি চলোনা আজ! দেখবে, কোন অসুবিধা নেই। পরিচয়ও হবে সব বড় বড় লোকদের সঙ্গে, আর তাতে কত সুবিধা! তুমি সরকারী কলেজে যেতে পারো—চাইলেই। দ্বিধারও কারণ নেই—আই অ্যাম রানিং দি হোল শো; অ্যাণ্ড আই ইনভাইট ইউ।

অমিত হাসিয়া বলিল, তা তো বুঝলাম, কিন্তু আজ সন্ধ্যায় আমার জরুরী কাজ।

রাখো তোমার জরুরী কাজ।

চাকরিটাই খোয়াবো। জানিস তো সেই পিউরিটান প্রিন্সিপ্যালকে। তিনি আজ বিশেষ করে প্রফেসরদের ডাকিয়েছেন। সামনেকার পরীক্ষায় ক'বিষয়ে ফেল

থাকলেও ছেলেদের সেন্ট্-আপ করা যায়, আজ তাই স্থির হবে। জরুরী সভা, না গেলে চাকরিটিই যাবে।

ঢের ভাল চাকরি হবে।

আরে, যখন হবে, তখন না হয় ঝাঁটা মারবো এসব পিউরিটান কর্তাদের কপালে। কিন্তু এখন তো আর তা পারি না, হাতের একটা পাখিই তোমার বাগানে দুটো কেন, দুশো পাখির সমান।

সাতকড়ি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে কহিল, তুমি তো ল' পাস আছ। একবার চেম্বার পরীক্ষাটা দিয়ে অ্যাড্‌ভোকেট হও না! আমি বলছি, যাতে শ' চার টাকা পাও আমি তা দেখবো, গ্যারান্টী দিচ্ছি।

অমিত হাসিয়া কহিল, এ বয়সে আবার পরীক্ষা?

কেন? দেখ, কত দেরিতে এসেছে ডাক্তার মিত্র। সেও তো তোমাদের মতো দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত। কত নবেল লিখছে, শরৎবাবুর পরেই এখন ওর প্লেস। লইয়্যার হিসাবে অবিশ্যি ওঁর কয়েকটা ডিফেক্ট আছে। ধরো—

অমিত শুনিতে লাগিল, অ্যাডভোকেসি—লিগ্যাল অ্যাক্যুমেন—অ্যাড্রেস।...যেন বাসে বসিয়া শৈলেনের কথা অমিত শুনিতেছে, অথচ এ সাতকড়ি।

অমিত বলিল, এবার চলি ভাই, সাড়ে দশটা। টাকাটা তবে একবার তুমি দেখো যেন তোলা হয়। হরিবাবুকে না হয় দু-পাঁচ টাকা দেবো। আচ্ছা, আমিই বলবো। যাবো 'খন অফিসে। আজ না পারি, কাল পরশু তক।

সাতকড়ি তাহার ভারী দেহটি চেয়ার হইতে কষ্টে টানিয়া তুলিয়া দুয়ার পর্যন্ত সঙ্গে আসিল। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াইয়া কহিল, আসিস ভাই, মাঝে মাঝে আসিস। তোরা এলে তবু একটু ভাল লাগে। নইলে তো একেবারে সরস্বতীকে বয়কট করেছি।

অমিত দেখিল, বুককেসে বইগুলি সূর্যালোকে সমুজ্জ্বল। সত্যি, বই রাখিতে হয় এইরূপেই। আর অমিতের বই কিরূপে-না নষ্ট হইতেছে। এখন সে তাহাদের ছোঁয় না, ছুঁইবার অবকাশও পায় না। আর সাতকড়ির এই রৌদ্রাভিষিক্ত বইগুলি!

অমিতের দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

সাতকড়ির কথায় কান গেল, সত্যি বলতে কি, তোমাকে অ্যাড্‌ভোকেট হতে বলতেও আমি দুঃখ পাই। হাইকোর্টের ত্রিসীমানায় না আছে ভদ্রতা, না আছে ভাল কথা। হয় ওকালতির কচকচি, না হয় বসে নিন্দা।—অমুক নেতা কত টাকা মেরেছে, অমুকের স্ত্রী কার সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে কিংবা না বেরিয়ে আশনাই চালাচ্ছে, মিস্টার অমুক কত পেগ না হলে বিছানা ছাড়তে পারে না! এই দলেই আবার এককালের ভাল ভাল ছেলেরা বেশি—যারা নেতা হবে, নাম করবে, টাকা লুটবে বলে হাইকোর্টে এসেছিল। একটু একটু করে তারা পেছনে পড়ে গেল, শেষে রইল অতৃপ্ত রোষ—সুপ্যারিঅরিটি কমপ্লেক্স, নিষ্ফল দর্প, আর নৈরাশ্যের ফলে শূন্যগর্ভ ঈর্ষা; পরনিন্দা, কুৎসা হল এদের ফোকলা-অলস দিনের চাটনি। অথচ তারাই ছিল এককালে তোমার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের জুয়েল। তোকে কি বলবো ভাই, হাইকোর্টে মানুষ আর থাকে না। তার চেয়ে ছেলে ঠেঙিয়ে

খাচ্ছিস—খাচ্ছিসই বা কই, আধপেটা চলছে, তা মানলাম—তবু তাই অনারেব্‌ল। তাই তো বলি, আসিস ভাই—একটু-আধটু অন্য জগতের রস পাবো।

মুখে অমিত হাসিয়া কহিল রাখ রাখ তোর ঠাট্টা। কিন্তু অমিতের মন বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

শীতের রৌদ্র সাতকড়ির গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। পুরো গাল দুটিতে এখন চাতুর্যের আন্দোলন-চেষ্টাটুকুও নাই—সমস্ত হারাইয়া স্থাণু মাংসপিণ্ডের মতো তাহা জড় হইয়াছে; চোখ তাহার দীপ্তিহীন, ফর্সা রং ঔজ্জ্বল্যহীন, লাবণ্যহীন;—সেই সাতকড়ির মুখে এ কি কথা? মনে হইল, যেন শৈলেন ফিরিয়া আসিয়া বলিতেছে—"আই সিঙ্‌ দি গ্রেট ট্র্যাজিডি অফ্‌ দিস্‌ লাইফ"—কিন্তু এ তো শৈলেন নয়, এ যে সাতকড়ি।

এমনই সংসার, এমনই তার অক্ষম ছলনা—কাহারও বুঝিতে বাকি থাকে না।

সভ্যতার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে—লোভের বাঁধন, আরামের মোহ তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। দুঃস্বপ্নের মতো এই ব্যবস্থা চাপিয়া বসিয়া আছে বটে, এক-একবার তবু মানুষ সচেতন হয়, বিদ্রোহ করিতে চায়। সে এক-একটি অদ্ভুত নিমেষ। তখন সাতকড়িও বলে, 'আমি অন্য জগতের রস চাই।' কিন্তু আজ সন্ধ্যায়ই যখন ওদের পার্টি জমিবে, তখন অভ্যস্ত জগতের অভ্যস্ত বিলাস-লালসায় এই নিমেষের কথা সাতকড়ির আর মনেও থাকিবে না। তারপরে আবার একবার হঠাৎ কোন্‌ দিন, অমিত, তোমাকে দেখিবে, দেখিয়া মনে পড়িবে—কিংবা হয়তো বা আর ঐ কথা মনেও পড়িবে না। অলস পরাশ্রয়ীর সমাজে এইরূপ ভাববিলাসই হইয়া উঠে স্বাভাবিক। ইহাই ইহাদের জীবন—পরশ্রমভোগীর সমাজে ইহাই জীবন; এই জীবনবিমুখীনতাই ইহাদের জীবন—তাই, 'ইহা এইরূপই হয়—মহারাজ, ইহা এইরূপই।'

সাত

বেলা এগারোটা প্রায় বাজে। অমিত ভাবিতেছে, এখন কোথায় যাওয়া যায়! বাড়ি ফিরিলে দেরি হইবে। মা আছেন, বাবা আছেন; তাঁহারা তখনই বলিবেন, 'আবার বেরুবে কোথায়?' না, বাড়ি নয়। তাহা ছাড়া বাড়িতে বলিয়াই তো আসিয়াছে, আজ সে বিকাশের ওখানে খাইবে, তাহার সঙ্গেই আর্ট একজিবিশনে যাইবে। অতএব বাড়ি ফেরার তাড়া নাই, বরং না ফেরাই সুবুদ্ধির কাজ। তাহা ছাড়া বাড়ি ফেরা এখন সম্ভবও নয়। সুনীলের একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে—বেলা এগারোটা বাজে। সাতকড়ির কাছে তো টাকাও মিলিল না। মিলিবে না জানা কথাই, তবু দেখিল একবার। কিন্তু সমস্ত সকালটা নষ্ট হইয়া গেল—বাজে গল্পে। এমনি করিয়াই অমিত দিনগুলি খোয়াইয়া ফেলে। অথচ তাহার এত কাজ! এভাবে সময় লইয়া ছিনিমিনি খেলা তাহার এখন সাজে না। চোখ মেলিতেই সে দেখে দিনের আলো, আর সারাদিন অক্লান্ত ছুটাছুটি করিতে থাকে—কাজ হয়তো এক পাও অগ্রসর হয় না—চোখ তুলিতে আবার দেখে, নিশীথরাত্রির গভীর

স্তব্ধ অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। কাজ এগোয় না, কোন কাজই হয় না। সকালটা নষ্ট হইয়া গেল।

অমিত মোড়ে আসিয়া গিয়াছে যে—কোথায় যাইবে? ড্যালহৌসি? মন্দ নয়। এগারোটা; পৌঁছিতে পৌঁছিতে সাড়ে এগারোটা হইবে। নিশ্চয় যুগলকে পাওয়া যাইবে, সাড়ে দশটাতেই সে অফিসে আসিবে। দুপুরে টিফিনের পরে যুগল অন্য অফিসের হিসাব-পরীক্ষায় বাহির হইবে, ইন্‌কর্পোরেটেড অ্যাকাউন্টান্টের সে আর্টিকেল্‌ড ক্লার্ক। তাহাকেই এবার সুনীলের কথা বলিতে হয়। কিন্তু বলিবেই বা কি? দেখা যাউক, যদি কথাবার্তায় বুঝা যায়, সেই যুগলই আছে, দুই বৎসর পূর্বে যে সাইমন কমিশনের পাহারা-পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি করিয়া সায়েন্স ক্লাস হইতে বাহির হইয়া আসে, সেই সাহসী যুগল, তাহা হইলেই বলা উচিত।

অমিত বাসে চাপিল। বাস যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে: কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবে নিশ্চয়তা নাই।

সেই যুগলই আছে কি? কথাবার্তায় তো কতদিন মনে হইয়াছে, সে বদলায় নাই। ডক-কুলীদের ইউনিয়নের হিসাব বিনা-পয়সায় পরীক্ষা করা, তাহাদের নানারূপ তুলনামূলক স্ট্যাটিস্টিক্‌স তৈয়োরি করা, এখনও তো যুগল পরমোৎসাহে তাহা পালন করে। পালন করে কি? কার্টার-স্ট্রাইকের পরে সে গোপনে গোপনে কম কাজ তো করে নাই। কতবার তো অমিতকে বলিয়াছে, 'কাজের মতো কাজ দাও অমিদা। সংখ্যার টোটাল দেওয়া মানুষের সাজে না। এভাবে এসময়ে হিসাব পরীক্ষা করতে আমার গ্লানি বোধ হয়। চা-বাগানের কুলি মরে পিলে ও কালাজ্বরে, মুনাফা তবু শতকরা পঁচাশী পার্সেন্ট! নির্ভুল হিসাব। পরীক্ষা করে নাম সই করবার সময় রক্ত আমার মাথায় উঠে বসে। এই সই করেই কর্তব্য চুকে গেল আমার? শুধু হিসাবই করবো, আর কিছু নয়?'

সেই যুগলই আছে কি না কে জানে? সুনীলের নাম শুনিলে হয়তো আপত্তি তুলিবে—বাড়িতে ঘর নাই, বাবা আছেন, এই সব রক্তাক্ত নির্মমতায় আত্মার অকল্যাণ হয়; আন্দোলন সত্য পথ হারাইয়া ফেলে, এমনই সব কত কিছু। না, আপত্তির কারণ অনেক জুটিতে পারে—যদি যুগল সে-যুগল না থাকে।

তা থাকিবেই বা সে কিরূপে? মানুষ তো এক মানুষ থাকিতে পায় না।

সংসার মানুষকে টানিয়া সমভূমিতে আনিয়া লয়। সংসারে ঢুকিলে মানুষ প্রথমে যেন বেলাভূমির নাগাল পাইয়া হাঁপ ছাড়ে। একটা সেট্‌ল্‌ড্‌ লাইফ পাওয়া গেল; আর ডুবিয়া ভাসিয়া মরিতে হইবে না। তারপর দেহ চায় বিশ্রাম, মন চায় আরাম। তারপর পরিণাম—ইহাই নিয়ম, ইহাই জীবন—ধীরে, অতি ধীরে চোরাবালুতে আটকাইয়া যাওয়া—প্রথম পা ডুবিয়া যায়, পরে মন আবৃত হয়, চেতনা মূর্ছিত হইয়া থাকে, বালুর তলে চিরসমাহিত হইয়া পড়িয়া থাকে এককালের কোলাহল-মুখর, জীবন্ত, জাগ্রত মানবাত্মা— যেন স্যাণ্ড বেরিড্‌ সিটিজ অব খোটান! ইহাই জীবন...মরুশয্যায় ধীর-সমাধি।

একদিন হঠাৎ কোনো সন্ধানীর চোখে পড়ে সেই লুপ্ত জীবনের ভগ্নচিহ্ন—যেমন হঠাৎ আজ সাতকড়িকে অমিত দেখিল।...

তথাপি শেষ পর্যন্ত কেহই ভোলে না। কেহ বা নিজেকে ভুলাইয়া রাখে, কেহ বা সেই ভুলের জ্বালায় পুড়িয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যায়—হয়তো ভয়ে, দর্পে, নিতান্ত বলিবার শক্তির অভাবে তাহা বলিতে পারে না। দুই-একজন বুঝি ইন্দ্রাণীর মতো সংসার-জ্বালাকে অস্বীকার করিয়া আদর্শের আগুনে দেহে মনে আত্মায় জ্বলিয়া প্রমাণ করিতে চায়—'আমরা ভাস্বর, আমরা জ্যোতির্ময়।' তাই বলিয়া জ্বালার ক্ষত কি তাহাদের প্রাণে দগদগ করে না?...

সাতকড়ি এতক্ষণে নিশ্চয়ই স্নানের আয়োজন করিতেছে। খানিক পরেই যাইবে আফিসে—অমনই সলিসিটর সাতকড়ি ঘোষ। তাহার পর আজ সন্ধ্যায় সেই আপ্যায়নরত, প্রিয়ভাষী, হাস্যগলিত-কপোল সাতকড়ি; বরানগরের বাগানবাড়িতে সুচতুর সাতকড়ি!...সাতকড়ি বলে কিনা, 'আসিস ভাই, একটু অন্য জগতের বায়ু পাবো।' আর অমিত তাহা আবার মনে করিয়া রাখিয়াছে। এতক্ষণে সাতকড়ি নিশ্চয়ই প্রাক্স্নানীয় সিগারেটটা টানিতেছে। এখন যদি কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বলিয়াছিলে—'আসিস ভাই, একটু অন্য জগতের বায়ু পাবো, তাহা হইলে সাতকড়ি প্রথমটা কথাটার অর্থই বুঝিবে না। তাহার মনেই পড়িবে না—কখন তাহাকে কি সূত্রে এইরূপ কথা বলিয়াছে। এই কথা তাহার স্মৃতিতে জমে নাই—যেমন সেখানে জমে নাই অমিতের জীবন-যাত্রার কথা। দুই-ই তাহার নিকট সমান অর্থযুক্ত, অর্থাৎ কোন অর্থই নাই, মাত্র কথার কথা।...

আজই হয়তো নিশীথরাত্রের অন্ধকার চিরিয়া তারার আলো আসিয়া নিমীলিত-নয়ন শৈলেনকে জিজ্ঞাসা করিবে, 'অমিতকে দেখলে?' জিজ্ঞাসা করিবে আকাশ-পারের পরিচিত নক্ষত্র-লোক, 'তোমাদের ছয় শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস কতদূর?' হয়তো শৈলেনের অধ-জাগ্রত বক্ষে চকিতে একটা দুর্জার বেদনা জাগিবে। পরক্ষণেই চোখ সম্পূর্ণ উন্মীলিত হইবে। অমনই মুখ ঢাকিয়া পিছন ফিরিয়া, সেই তারার আলো আঁধার আকাশ-পটে ছুটিয়া পলাইবে!—আর শৈলেনের চোখে পড়িবে বুকের পাশে সুপ্তা, সালঙ্কারা রায়বাহাদুর-কন্যা। তারপর থাকিবে একবার সেই নিদ্রিত দেহপিণ্ডকে বাহুবন্ধনে আঁকড়াইবার সুনিবিড় চেষ্টা—আবার তৃপ্তিপূর্ণ সুষুপ্তি।...

ইহাই সংসারের ধর্ম—শৈলেনকে, সাতকড়িকে একই ছাঁচে ঢালিয়া এইরূপ রিস্পন্‌স্যাব্‌ল্‌ সিটিজন্‌ সে করিয়া তোলে...।

কে জানে, যুগলের আজ কি হইয়াছে—তেমনই রিস্পন্‌স্যাবল্‌ সিটিজন্‌ হইয়াছে কি না। অনিলের মতোও হইতে পারে। কে বলিবে?

তাহা হইলে সুনীলের ব্যবস্থা কি হইবে? পাঁচটায় সুনীল অমিতকে ফোন করিবে অফিসে? কিন্তু অমিত অফিসে আজ যাইতে পারিবে না। সুনীলের জন্য ব্যবস্থা করা দরকার। তবু একবার সাড়ে চারটায় যাইতে হইবে—ফোনে সুনীলকে বলিতে 'হইবে

কি হইল। যুগলের অফিস হইতেই ফোনে কাগজের অফিসের কর্তব্যও খানিকটা করা হইবে। তারপর আবার বিকালে আছে ইন্দ্রাণীদের শোভাযাত্রা।

যুগলের সঙ্গে বন্দোবস্ত না হইলে অমিতকে যাইতে হইবে—ডক-মজুরদের অফিসে। খিদিরপুরে একটা অন্ধকার ঘরে সেই অফিস। তিনটায় সেখানে অনেকে আসিবে—দীনু আর মোতাহেরও থাকিবে। উহাদের সঙ্গে একবার আলোচনা করা যাইতে পারে। উহাদের সঙ্গে সুনীলের পরিচয় হইলে মন্দ হয় না। হয়তো উহাদের সাহচর্যে সুনীল কাজের সত্যকার পথও মানিয়া লইবে। কিন্তু সুনীল উহাদের প্রথমটা পছন্দ করিবে না। হয়তো উহারাও সুনীলকে পছন্দ করিবে না—সুনীল উহাদের চোখে রোমান্টিক, ইম্পেশেন্ট, নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক কর্মী।

ড্যালহৌসি স্কোয়ার। লাফাইয়া লাফাইয়া যাত্রীরা নামিতেছে—যেন এক পা পরে নামিলে যে দেরিটা হইবে, পাছে তাহাতেই চাকরি হারাইতে হয়।

আশ্চর্য জনস্রোত। জীবনধারা ফেনাইয়া উঠিয়াছে—শত পথে, শত আয়োজনে, শত অনুষ্ঠানে, কত শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়ে সাগর-সন্নিকটস্থ গঙ্গার মধ্যে আপনার উদার পরিপূর্ণ আবেগকে মুক্তি দিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিতেছে। এখানে দাঁড়াইয়া যেমনই বিস্ময়ে মন ভরিয়া উঠে, বিপুল আয়োজনের ক্ষণিক কোলাহল চৈতন্যের উপর আসিয়া পড়ে, তেমনই মনে জাগে কৌতুক। মন দেখিতে পায়—বর্তমানকালের বুর্জোয়া ব্যবস্থা এই সনাতন দেশেও আসিয়া পড়িয়াছে। তারপর মন হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে, ইহার মানে কি? অর্গ্যানাইজেশন, ক্রেডিট, টেক্‌নিক।...সমস্ত দুনিয়াকে পাইয়াই বা কি হইবে যদি মানুষ আপনাকেই ফেলে হারাইয়া?

হারাইয়া ফেলিয়াছে, হারাইয়া ফেলিয়াছে—এই গুটি গুটি মানুষ-কীটের দল এক একটা উইঢিপির চূড়ায় বসিলে কি হইবে? ইহারা আপনাকেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। ইহাদের চোখে জীবনই নাই। জোর তাহা স্ত্রী-পুত্র-পরিবার। না, স্ত্রী-পুত্র পরিবারও নাই! আছে ক্রেডিট, ইন্টারেস্ট, ভাউচার, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স!..

জীবনের তাড়া আশ্চর্য ব্যাপার। জীবিকার যূপকাষ্ঠে সে মানুষকে বাঁধিয়া দেয়, মানুষ বলি যায়, জীবনেই পড়ে ফাঁক। জীবিকার শূন্যতা জীবনকেও ঢাকিয়া ফেলে।

ইহাই জীবন---যদি না জীবনের সত্য রূপ কেহ প্রত্যক্ষ করে।

কিন্তু কি সেই সত্য রূপ জীবনের? এই ফেনায়িত উদ্দাম প্রয়াস নয়। তবে কি চিন্তা, সাধনা? অর্থাৎ 'শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন'? অমিত নিজের মনে হাসিয়া উঠিল, অর্থাৎ ফাঁকি, আত্মছলনা---যা মূলত স্বার্থ-ছলনা। মনন, মনন কি? বিকৃত ঐশ্বর্যের চাপ হইতে পালাইয়া বিকৃত অবাস্তবতার মধ্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা। টেক্‌নিককে অবিশ্বাস কেন? তার পূর্ণস্ফূর্তি দেওয়ার শক্তি নাই বলিয়াই না সে ব্যাহত, বিসদৃশ। নহিলে টেক্‌নিক মানে—সৃষ্টি। আর সৃষ্টিই জীবনের পরম বাণী, চরম রহস্য।

ভাবিতে ভাবিতে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া অমিত দেখিল, সম্মুখে বেয়ারা। ভাবনা ছুটিয়া গেল, কাগজে নাম লিখিয়া যুগলকে পাঠাইল। কেদারায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে করিতে দেখিল, কোণে একটা লম্বা বেঞ্চে একটি বেয়ারা ঢুলিতেছে; ওদিকের চেম্বারে

একটি ভদ্র যুবক উপবিষ্ট, বোধহয় উমেদার; পার্শ্বের ঘর হইতে ভারতীয় কন্ঠে ইংরেজী উচ্চারিত হইতেছে। মোটা সবল কন্ঠ; শুনিয়াই মনে হয়, বক্তার অর্থাভাব নাই; সে এখানে বেশ সহজ, প্রতিষ্ঠিত, হয়তো অফিসের একজন কর্তা।

যুগল আসিয়া উপস্থিত।

এ সময়ে যে? অফিসে যাও নি কেন?

এমনিই। আজ একটু কাজ আছে। ডকের মজুরদের সঙ্গে খানিকটা কথা বলা দরকার। একটা ডিমন্‌স্ট্রেশন করতে হবে।

কি ব্যাপারে?

ক'দিন ধরে কংগ্রেসের সঙ্গে কথা চলছে, ওদের একটু সাহায্য করবো কন্‌ডিশনালি। ওরাও আমাদের 'ইউনিয়ন' চালাতে কিছু সাহায্য করবে।

কত? পেয়েছো টাকাটা? ওদের মন স্থির নেই। আগুন নিয়েই খেলা করবে, কিন্তু আগুনের আঁচ যেন ঠিক গায়ে না লাগে—এই হল ওদের প্ল্যান।

নো প্ল্যান, বলো।

যাকগে সে তর্ক। দেখ কি হয়। ডিমন্‌স্ট্রেশন কবে?

দিন পনরো পরে। বিলিতী জাহাজের মাল নাবাতে মজুরেরা অস্বীকার করবে। তাদের অভাব অনেক, দাবিও খাঁটি। অবশ্য এখনও কিছু ঠিক নেই। জানতো শরফুদ্দিনকে। সে আঁচছে, জেনেভায় যাবে। ওই জেনেভা সর্বনাশ করলে। কর্তাদের সে দুবেলা তোয়াজ করছে। একে তার বাড়ি বাঙাল-দেশে, তাতে মুসলমান। মজুর-মহলে ওর প্রতিপত্তি ভয়ানক। সে কিছুতেই ডিমন্‌স্ট্রেশন ঘটতে দেবে না। বলে, 'ওসব পলিটিক্স; ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক নেই।' এদিকে মোতাহের আছে। তবে সে আবার বিষম কম্যুনিস্ট; কংগ্রেসের বা স্বদেশীর নাম শুনলেই ক্ষেপে যায়। সে রাজি হলে খানিকটা কাজ হবে।

দেখা হল ওদের সঙ্গে?

না, ওরা দেড়টায় আসবে। তার আগে কেউ আসে না।

তাহলে ততক্ষণ এখানে বসবে?

আপত্তি নেই।

তবে চলো আমার ঘরে। আর কাজ নেই তো?

না, তবে অফিসে একটা ফোন করবো।

বেশ, এস, করে দাও।

অমিত ফোন তুলিয়া অফিসে বলিয়া দিল, আজ শরীর ভাল নাই। বিশেষ জরুরি কাজ যাহা থাকে যেন তৈয়ারি করিয়া রাখে। সাড়ে চারটায় সে একবার আসিবে।

তারপর যুগলকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কাজ নেই যুগল?

আছে বইকি। করবো এখনই, ভেবো না। এখানে সচরাচর থাকে একটি পার্সী শিক্ষানবিস—এখন বেরিয়ে গেছে। চা খাবে তো?

বেয়ারা চা লইয়া আসিয়াছিল, রাখিয়া গেল। চা খাইতে খাইতে অমিত কথা পাড়িল, তোমার কি মনে হয় যুগল, কিছু হবে?

কিসের কথা বলছো?

এই ডিমন্‌স্ট্রেশন।

না হবে কেন? শরফুদ্দিনগুলোর হাত থেকে তো মজুরদের বাঁচাতে হবে। ওরা হল আসল এক্সপ্লয়টার্স। আর ওদের সাহায্য করে এম্‌প্লয়ার্স ও সরকার দুইই। ওরা হল মজুরশক্তির বিরুদ্ধে পাকা দেয়াল। ওদের তাড়াতেই হবে।

অমিত কথায় মগ্ন হইল। আলোচনা চলিতে লাগিল।

কিন্তু বার বার মনে মনে অমিত অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল—কি বলিতেছ তুমি? মজুর নয়, তুমি সুনীলের কথা বলো। বলো, দেরি করিও না। বারোটা বাজিয়া গিয়াছে—দেরি হইতেছে, আর দেরি করিও না। যুগল বলিতেছে, তবে দেখ, লীডারশিপ যেন কংগ্রেসওয়ালাদেরও হাতে না পড়ে। তাদের না আছে ওটা চালাবার সাহস, না আছে তার মতো আয়োজন।...

অমিত নিজেকে তাড়া দিতেছে---সুনীলের কথা তুলিতে হইবে; দেরি করিয়া অন্যায় করিতেছ তুমি, অমিত।

যুগলকে সে বলিল, সবাই বোঝে না। যতগুলো শক্তিকেন্দ্র আছে সবগুলোকে যে একযোগে দাঁড় করিয়ে একটা বড় ফ্ল্যাংক্ গড়তে হবে, নইলে হবে না—এ কথাটা সবাই বুঝতে চায় না, তারা মানেও না। প্রত্যেকেই ভাবে, একমাত্র তার দলের কিংবা তার একান্ত বিচ্ছিন্ন চেষ্টাতেই কাজ হবে। অন্তত অন্যের চেষ্টাতে কিছুতেই হবে না —হওয়া উচিত নয়। এই নিয়ে তর্ক করেই ওরা নিজেদের শক্তি খুইয়ে ফেলছে।...

এক মুহূর্তের মধ্যে অমিত সুনীলের কথাও ভুলিয়া গেল। এই নানা মতের চেষ্টাকে একটা সম্মিলিত চেষ্টায় গড়া দরকার---ইহাদের মধ্যে যেখানে মিল আছে সেইটুকুকে অবলম্বন করিতে হইবে। কি তাহা? স্বাধীনতাসূত্র? আজ কত মাস যাবৎ কত ভাবে অমিত এই কথাটা এই বিভিন্ন মতবাদীদের বলিতে চাহিতেছে, কিছুতেই কেহ তাহা মানিতে চাহে না। মোতাহের তো তাহাকে 'পেটি বুর্জোয়ার বেইমানী' বলিয়া মারিতে বাদ রাখিয়াছে। সুনীলের কাছে তো কমুনিস্ট প্রায় 'স্পাই'-এর সমতুল্য। আর ট্রেড ইউনিয়নের অনেকেই এসব বিপদের পথে পা বাড়াইতেও অস্বীকৃত। তথাপি অমিত বুঝিতেছে, এই অগ্রগামী শক্তিগুলিকে একত্র করিয়া পরিচালিত না করিলে কাজই হইবে না। এ শুধু তাহার বিশ্বাস নয়, এ তাহার বাস্তব দৃষ্টির ফল। কিন্তু কে তাহা বুঝিবে? বরং উল্টা অমিতকেই সকলে সন্দেহের চোখে দেখে। অমিতের নিকট এই বিষয়টা তাই বড়ই দরকারী আলোচনা।

যুগল উত্তর করিল, একটা উগ্র বিরুদ্ধবাদী মনোভাব দেশবাসীর মধ্যে জন্মেছে। তুমি বলছো, 'তার শক্তিটা সংহত করা দরকার। একটা সমবেত প্রয়াসে তাকে গ্রথিত করে দাঁড় করাতে হবে। নইলে প্রতিকূল শক্তির সামনে দাঁড়াতে পারবে না।' বেশ! কিন্তু এই যে তোমাদের স্বদেশীরা, দেখছো তাদের মধ্যে এরূপ কোনো চেতনা?

যুগল কথা বলিতেছে। অমিতের মনে পড়িয়া গেল—ঠিক ইহার উল্টা কথা বলিবে সুনীল। সুনীল ওরা ইহা মানিবে না।

মনে পড়িল সুনীলের কথা।...ওঃ! সুনীল! দেরি করিও না, অমিত। এবার প্রথম সুনীলদের কথা তোলো, তারপরেই সুনীলের কথা, শেষে আসল কথা—কোথায় এখন তাকে রাখা যায়। দেরি করিও না, আর বাজে বকিয়া সময় নষ্ট করিও না। এবার সুনীলদের কথা তোলা খুব সহজ।

না, যুগল বদলায় নাই।

* * *

অমিত কহিল, কিন্তু কথা হচ্ছে, ছেলেটাকে এখন রাখি কোথায়? আজো তো এখন পথে ঘুরছে। এখন কি করি? আমার বাড়িতে থাকবে না—

থাকা উচিতও নয়।

কোথায় থাকা উচিত বল তো? কে সাহস করে রাখবে? কাকেই বা বিশ্বাস করা চলে?

যুগল বুঝিল। নিজে হইতে বলিল, ওঁর আপত্তি হবে কি না জানি না, নইলে আমাদের বাড়িতে থাকতে পারেন। আমাদেব ঘর আছে তিনখানা। আর একটা বাইরের ঘর। বাবা থাকেন একটাতে; বুলু আছে দ্বিতীয়টাতে; আরটাতে আমি। আমার সঙ্গে থাকলে কি অসুবিধা হবে?

থাকার পক্ষে তার ফুট্‌পাথেও অসুবিধা হয় না, সে তো জানোই। অন্য কোনো আপত্তি আছে কি না জিজ্ঞাসা করতে হয়। তা ছাড়া বুলুকে বা তোমার বাবাকে কি বলবে?

বুলু বুঝলেও ক্ষতি হবে না। বাবাকে বলবো, 'জলপাইগুড়ির যে চা-অফিসে আমি হিসাব পরীক্ষায় গেছলাম, তাদের অ্যাকাউন্ট্যান্ট। এখানে হিসাবপত্র নিয়ে এসেছেন। আমিও ছিলাম ওঁর বাড়িতে গেস্ট, কাজেই ইনিও আমার এখানেই থাকবেন।' আপাতত এই কথা। তারপর দেখা যেতে পারে।

অমিত সকৃতজ্ঞ চোখে যুগলের দিকে তাকাইল। বলিল, কিন্তু দায়িত্বটা বুঝেছ তো।

আমার যতটুকু, ততটুকু বুঝেছি। এখন সুনীলবাবু রাজি হন কি না দেখ। তাঁরও তো দায়িত্ব আছে।—

যুগল সেই যুগলই।...

কিন্তু অমিত তুমি কি কাজটা ভাল করিতেছ? উদার-প্রাণ যুবক—পিতা, বোন, সকলের নিকট তাহাকে ছলনা করিতে শিখাইতেছ; তাঁহাদের মাথার উপর কঠিন দুর্ভাগ্য চাপাইয়া দিতেছ—পিতার নিকট হইতে সরাইয়া আনিতেছ, কাড়িয়া লইতেছ তাহাকে।...

Woman, what have I to do with thee? মাতার নিকট হইতে সত্য কাড়িয়া লইল যিশুকে। আইডিয়াল যেন খড়্গ—জন্মের বাঁধন, নাড়ীর বাঁধন, সৌহার্দ্যের বাঁধন—সব কাটিয়া ফেলিয়া দেয়। পরকে মনে হইবে আপন, একান্ত আপন, সকলের চাইতে আপন, সর্বস্ব; আর আপন হইয়া যাইবে দূর, বিচ্ছিন্ন, পর হইতে পর।...

Who is my mother? and who are my brethren?

অমিত আজকাল চা খাইতে বসিয়া পিতার সঙ্গেও গল্প করিতে পারে না।

বাড়ি ফিরিয়া মায়ের সঙ্গে গোলমাল করিতে চাহে না। তাঁহারা আজ অমিতকে বুঝিতে পারেন না।...

যুগলের মা নাই, বাঁচিয়াছেন। 'মা বড় বাধা, বড় জঞ্জাল! মরেও না।' —মণীশের কথা। অমিতের মা বোধহয় এতক্ষণ ভাত কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। বলিলেও শুনিবেন না। 'মা বড় বাধা, বড় জঞ্জাল, মরেও না।'

* * *

যুগল জিজ্ঞাসা করিল, চুপ করে রইলে যে?

অমিত কহিল, সুনীলকে জিজ্ঞাসা করতে হয় তো। আর সম্ভব হলে কখন থেকে সে তোমার বাড়ি থাকবে?

কেন? আজ থেকেই।

তুমি আমাকে স-পাঁচটার সময় অফিসে ফোন করবে—আমি সুনীলের মতামত জানাবো।

তাই হবে।

আর তা নাহলে আজ সন্ধ্যাটা বাড়িতেই থেকো। এখন তাহলে চলি। সুনীলকে খুঁজতে যেতে হবে। একটা বাজছে।

প্রকাণ্ড অফিস হইতে বাহির হইয়া অমিত মুক্তবায়ুতে একবার নিশ্বাস টানিয়া লইল। মাথা যেন অনেকটা হালকা হইয়াছে। এখন যাইবে কোথায়? ডকের মজুরদের ইউনিয়ন অফিসে? মন্দ নয়। কিন্তু একবার মিনুর সঙ্গে দেখা করিবার কথা ছিল। এখন ভবানীপুরে মিনুদের বাড়ি ছুটিলে আর ইউনিয়ন-অফিসে ফিরিয়া আসা সম্ভব নয়। মিনুর সঙ্গে বরং কাল দেখা করিবে---তাহার সঙ্গে দেখা করার হাঙ্গামাও তো কম নয়।

* * *

বড়লোকের বাড়ি। সেকেলে চাল। দেউড়িতে দরোয়ান না থাক, বাহিরের মহলে একপাল পোষ্য আছে। তাহারা কেহ চাকরি খোয়াইয়াছে, কেহ চাকরি খোঁজ করিতেছে। কেহ কলেজে পড়ে, কেহ পড়িবার ইচ্ছায় টিউসনির খোঁজ করে---একটা বড় হোটেল। ঘরগুলিতে ইহাদের ময়লা ভিজা কাপড় শুকাইতেছে। দুই দিকে দুইটা মজলিস। একটায় বয়স্করা তামাক পোড়াইতেছেন, মেঝে তামাকের গুলে ও টিকায় কলঙ্কিত; আর একটায় ছোকরারা তাস সহযোগে বিড়ি টানিতেছেন বা বিড়ি সহযোগে তাস খেলিতেছেন। আধঘণ্টায় বাড়িতে খবর পৌঁছানো যায় না। ইহারা কথা কানেই তুলিবে না, চাকরেরা ঘুম ছাড়িয়া উঠিবে না। মিনু আবার বাড়ির বউ। তাহার সহিত দেখা করিতে চাহিলে শ্বশুর বা শাশুড়ীর নিকট প্রথম এত্তেলা পৌঁছে। তারপর বউমা অনুমতি পান। অনেক করিয়া বুড়াকে ভজাইয়া অমিত তবু এখন এই সুবিধাটুকু করিয়াছে যে, দুপুরে দেখা করিতে গেলে কর্ত্রী নিদ্রা ছাড়িয়া না উঠিয়া

খাস ঝির পাহারায় বউমাকে অন্দরের নীচের একটা ঘরের সম্মুখে কথা বলিতে দেন। ঝিটিকেও মিনু হাত করিয়াছে, কথাগুলি কাজেই অবাধে চলে। তবু আজ এখন তাহাদের বাড়ি গেলে আর এ পাড়ায় কোনও কাজ হয় না। মিনুরও এখন সুবিধা হইবে না। আর গিয়াই বা কি হইবে?—তাহার কথা রাখা অসম্ভব বরং সুনীলের সঙ্গে মিনুর দেখা হইলে সুনীল যাহা করিবার করিবে, অমিত পারিবে না।

সুনীলের জন্য শ্বশুরবাড়িতে মিনুর অনেক খোঁটা সহিতে হয়, ভাইয়ের নাম করিবার উপায় নাই। শ্বশুর-শাশুড়ী তো যাহা ইচ্ছা বলেনই, ভাসুর এবং ভাজ, ননদরাও টিটকারি দিতে ছাড়েন না। কেহ বলেন দেশোদ্ধারী ভাই 'জীবানন্দ' কেহ বা বলেন গ্যারিবল্ডি কিংবা ডি ভ্যালেরা; 'বোনকেও কি দাদা সঙ্গী করিবে নাকি? তাহারও যে খদ্দর ছাড়া শাড়ি পরা চলে না। কে জানে, শান্তি না কল্যাণী, না দেবী চৌধুরানী, কোন্ দেশপ্রেমিকা!'

মিনু নিরীহ মেয়ে—মনে মনে খানখান হইয়া যায়, মাথা তুলিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারে না। এই পরিবারের আবহাওয়াই এমন জমাট-বাঁধা নিশ্চল জড়পদার্থ যে কাহারও ইহার মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়ানো অসম্ভব কথা। এই বাড়ির ইতিহাসে তাহা নতুন ঘটনা হইত! কিন্তু মিনু সে প্রকৃতির মেয়ে নয়। তাহার ধাত অন্যরূপ। তাই তাহার সুন্দর মুখে বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া উঠিতেছে এবং শান্ত চোখে নিথর বেদনা জমিয়া রহিয়াছে। তাহার মনে পড়ে সেই ছোট ভাইয়ের সুকুমার মুখ।

...'ছোট বউদির ঘড়িটি সুনীল নিলে কেন?' কিছুতেই মিনু মনে শান্তি পায় না। সামান্য একটা ঘড়ির লোভ সে সামলাইতে পারিল না?

মিনু সুযোগ বুঝিয়া অমিতকে একদিন তাহা জিজ্ঞাসা করিল। অমিত সংক্ষেপে বলিল, জানো না যে, টাকার কত দরকার? না খেয়ে, আধপেটা খেয়ে, দিনের পর দিন কলের জল খেয়ে ওরা চলে। কেন? শুধু তো টাকা পায় না বলেই।

মিনুর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। ইহার পর যেদিন অমিত আসিল, সেদিন ঝিকে সে একবার দোকানে পাঠাইয়া দিল খাবার আনিতে। সেই অবসরে বস্ত্রাভ্যন্তরাল হইতে মিনু ছোট্ট একটি পুঁটলি বাহির করিল। অমিত জিজ্ঞাসা করিল, কি?

কিছু নয়, ওকে দিও। যেন না খেয়ে থাকে না। পারে তো যেন বউদির ঘড়িটা ফিরিয়ে দেয়।

অমিত বুঝিল খান কয় গহনা। সে হাত সরাইয়া লইল।

ভয় নেই দাদা, এ বাড়ির একখানাও নয়। এঁদের জিনিস দিয়ে আমি ওদের অপমান করবো না। এসব আমার মায়ের জিনিস—মায়েরও নয়, ঠাকুমার। পুরানো দিনের ভারি সোনার জিনিস। বউ-বয়সে ঠাকুমা পান, ঠাকুমা দেন মাকে, মা দিয়েছিলেন আমাকে। লক্ষ্মী জিনিস—কেউ পরে না তোলা থাকে। ও ওদের কাজে যাক—তাতেই সার্থক হবে।

অমিত কথা বলিল না। সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

শিগগির নিয়ে যাও দাদা, ঝি মাগী এসে যাবে এখনি।

অমিত কহিল, তুমি রাখো, আমি এ ছোঁবো না।

দেখো ক্ষ্যাপামি! এ সেকেলে জিনিস, এখনকার দিনে কেউ পরে না। মাথার সিঁথি, হাতের অনন্ত, বাউটি, এ আবার কেউ রাখে নাকি?

ইচ্ছা হয় সুনীল নেবে, তাকেই দিও। আমি ছোঁবো না। অমিত কিছুতেই গ্রহণ করিল না।

সেদিনকার এই কথাটা অমিত সুনীলের নিকটও গোপন রাখিয়াছে। কারণ সুনীল তাহার এই শুচিবায়ুর আদর্শকে বড় জ্ঞান করে না। সংবাদ পাইলে এখনই সে মিনুর সঙ্গে দেখা করিতে ছুটিবে।

* * *

অমিত ভাবিতে লাগিল, আজ মিনুর সঙ্গে আর দেখা করা চলে না; কালই দেখা করিবে। ততক্ষণ বরং এই মজুর অফিসে দীনু আর মোতাহেরের সঙ্গে কাজকর্মের ফাঁকে একবার সুনীলের কথাটা পাড়িয়া রাখিবে—ভবিষ্যতে এইরূপ তাড়াতাড়ি দরকার হইলে যেন সুনীলকে একটা স্থান দেওয়া যায়। দীনুর ও মোতাহেরের মনোভাবটাও এখনই বুঝিয়া রাখা উচিত।

আট

মজুর-অফিসে থাকিবার মধ্যে আছে কতকগুলি সস্তা হিন্দী, বাংলা ও ইংরেজী দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র। কয়েকখানা আবার বিভিন্ন মজুর-সমিতির মুখপত্র। ইহাদের পরস্পরের মধ্যেও তুমুল তর্ক, কথা কাটকাটি, গালাগালি চলিতেছে। প্রত্যেকে প্রত্যেককে বলিতেছে 'এক্সপ্লয়টার', 'দালাল'; প্রত্যেকে নিজেকে জাহির করে মজুরের একমাত্র স্বার্থরক্ষক বলিয়া। 'চটকল' কাগজের কর্তারা 'মজুরের' কর্তাদের সঙ্গে মাসী যুদ্ধ চালাইতেছেন। এই সংখ্যায় তাহার তেত্রিশ দফা তালিকা বাহির হইয়াছে, একেবারে মোক্ষম। 'মজুরে'র কর্তা মুকসুদ রিষড়ার কলের সাহেবদের থেকে কত দফায় কত টাকা পাইয়াছে, কম্‌রেড শ্যামসুন্দর ঠিকাদারি বা দালালি করিয়া টাকা পান কি না, কেশোপ্রসাদ বড়বাজারে মাড়োয়ারী স্পেকুলেটারের টাকায় পোষা নহে কি?— এই সব বসিয়া বসিয়া অমিত খানিকক্ষণ পাঠ করিল। কোথায় তাহার সম্মিলিত সংগ্রামশীল দল গড়িবার স্বপ্ন?

* * *

মোতাহের বলিল, 'মজুরে' এ সকলের একটা তেড়ে জবাব দিতে হবে। তুমিই না হয় লিখবে, কমরেড অমিত।

আমি? আমি যে এসব তর্কবিতর্কের কিছুই জানি না।

জানার দরকার নেই। জানোই তো, 'চটকলে'র কর্তা হল সেই সিঙ্গি সাহেব, যিনি সাহেব ও বেনে দরবারে লেবার লীডার সেজে খানা খেয়ে বেড়ান। কাউন্সিলে তিনি নমিনেশন পেয়ে মজুরের প্রতিনিধি হন। এসব লোকদের কিছুতেই আমরা

এই কর্মক্ষেত্রে থাকতে দিতে পারবো না। ওঁদের না তাড়াতে পারলে মজুরের দল মাথা খাড়া করে উঠতে পারছে না। . প্রথমেই ওঁদের সরাতে হবে।

কিন্তু সরাতে পারছো কই?

চেষ্টা না করলে পারবো কেন? চেষ্টা করছো? করে দেখই না, উঠে-পড়ে লাগো, দরকার হয় মার দিতে হবে। সেজন্যে লোকের অভাব হবে না।

সে কি মোতাহের, মার? অমিত বিস্ময় প্রকাশ করিল।

নিশ্চয়ই। দরকার হলে দু-দশটা খুন করে ফেলতে হয়; ইউনিয়নকে খাড়া রাখতে হলে ওসব ভয় করলে চলবে কেন? নইলে তো ইউনিয়নই গিয়ে পড়বে ধনিকদের আওতায়, তাদের ফ্ল্যাঙ্কিদের কর্তৃত্বে। পুঁজিওয়ালা সুতো টানবে, আর কলের পুতুলের মতো মজুরগুলো ঘুরবে, ভাববে নেতার কথায় সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। ইউনিয়ন সর্বাংশে মজুরদের হাতে আনতে হলে এসবে ভয় করলে চলবে কেন?

কিন্ত এ যে ভায়োলেন্স। মজুরদের কাজের সঙ্গে এসবের সম্পর্ক কি?—ট্রেড-ইউনিয়নিস্টই হও আর আমার মতো সোশ্যালিস্ট মজুর-সেবকই হও বা কম্যুনিস্টই হও, আমরা তো মারধর করতে পারি না। আমাদের টেক্‌নিক, ইডিয়লজি সবই যে স্বতন্ত্র।

মোতাহের তর্কের সূক্ষ্ম প্যাঁচ বোঝে না। তাহার মন উগ্র। মোটামুটি লক্ষ্য ও পদ্ধতি তাহার জানা আছে, তারপর পথ ও পাথেয়ের জাতিবিচার সে ঠিক রাখিতে পারে না।

* * *

ভাগ্যক্রমে কমরেড দাশ আসিয়া গেলেন; জার্মানি হইতে কেমিক্যাল ইন্‌ডাস্ট্রিতে অভিজ্ঞ হইয়া তিনি আসিয়াছেন। এখানেই কোথায় কাজ করেন। কিন্তু মনের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া আসিয়াছেন থার্ড-ইন্টারন্যাশনালের শিক্ষা। মজুর আন্দোলনের ইডিয়লজি তাঁহার সুস্থির জানা আছে, কিন্তু তাহার অপেক্ষাও ভাল জানা আছে টেক্‌নিক। মজুর বিপ্লবের টেক্‌নিক তাহার নখদর্পণে। তিনি বলিলেন, ওয়েল, কমরেড, আমরা প্যাসিফিস্ট বা সোশ্যালিস্ট নই, যখন দরকার দু-চারটেকে আমরা সরিয়ে পথ কেটে নেবো। বাট উই অ্যাবজিওর ইন্‌ডিভিডুয়াল টেররিজ্‌ম্।

অমিত বলিল, তারাও যে ঠিক এমনই কথাই বলে, 'আমরা অহিংস অসহযোগী নই। দরকার মতো দু'চারটেকে সরিয়ে দিলে দুশোটাই ভয়ে পালাবে। তখন আমাদের হাতে ক্ষমতা এলে সব ভেঙে গড়ে তুলবো, এক্সপ্লয়টেডকে মুক্তি দেবো।'

দাশ কৃপার হাসি হাসিয়া কহিলেন, নন্‌সেন্স, আইডিয়া একেবারেই ক্লিয়ার নয়, মেথডও ক্রুড। তাই ওদের সব খিচুড়ি পাকিয়ে যায়।—বলিয়া তিনি ইডিয়লজির ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, টেক্‌নিকের মাহাত্ম্য বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন! অমিত তাঁহার মতে নার্‌ডিক বা সোশ্যাল রেভল্যুশনারি।—'তাদের রোলটা কি ছিল জানেন তো?' দাশ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

অমিত ভাবিল, মন্দ নয়। দাশের কথা কহিবার উৎসাহ প্রচুর। কিন্তু দাশ

তো কথা কহিতে শুরু করিলে থামিবে না। সুনীলের কথাটা একবার মোতাহের দীনুর সঙ্গে বুঝিতে হইবে।

দাশ কি বলিতে বলিতে জিজ্ঞাসা করিল, সামনের সংখ্যা 'লস্করে' তুমি কি লিখবে?

আমি?—অমিত হঠাৎ উত্তর করিতে পারিল না, কিছুই মনে পড়ে না যে, কি লিখিবে?

কিন্তু তুমি অনেকদিন লিখছো না, প্রায় মাস তিন লেখোনি। এবার কিছু লিখতেই হবে।

ভাবছিলাম, এই প্রব্লেমই লিখবো—লেবার, ন্যাশনাল ও ইন্টার্ন্যাশনাল। আমার মনে হয়, এখনও সাধারণ মজুরের দেশগত চৈতন্য লুপ্ত হয়নি, আরও কিছুদিন থাকবে। আর এদেশে এখনও সত্যিকারের ক্যাপিট্যালিজ্‌ম পাকা হয়নি। এদেশের ধনিকতন্ত্র যুদ্ধের পরে সবে জন্ম নিয়েছে, তাকে বাধা দেয় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ—'লাস্ট স্টেজ অব ক্যাপিট্যালিজ্‌ম্।' সে বাধাকে দূর করে আগে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার গণতান্ত্রিক জাতীয় বিপ্লব। না না, কমরেড দাশ, কথাটা শেষ করে নিই। আপনারা বলবেন, চীন দেখে, অন্যত্র দেখে আপনারা বুঝেছেন, জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্রের শত্রু। বলুন। আমি বুঝছি—এদেশে মজুরদেরও এখন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের জন্যে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে একটা রফা করে চললে ভাল হয়। ইন্টার্ন্যাশনাল মজুরদের সঙ্গে এক হয়ে এক পংক্তিতে দাঁড়াবার জন্যে এও একটা দরকারী কাজ। কিন্তু আপনারা অস্বীকার করবেন?

নিশ্চয়ই। কোন দিনই আমরা মজুরকে জাতীয় বিপ্লবীদের হাতে পড়তে দেবো না। সে একটা বুর্জোয়া কুমতলব! তা ছাড়া, জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে মজুরদের জুটিয়ে লাভ নেই, এই হল আমাদের মত। আমরা অনেক ঠকে বুঝেছি, তাতে ক্ষতি হয়, বরং বুর্জোয়ার জোর বাড়ে।

অমিতও ছাড়িবে না। ধীরে ধীরে কহিল, তা হলে ডিমন্‌স্ট্রেশনের কি হবে? কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে একটা বিরোধিতায় যোগ দেওয়া যে আমরা ঠিক করেছি।

এক্ষেত্রে দাশ তাহাতে স্বীকৃত। কারণ এই উপলক্ষ্যে শরফুর সঙ্গে একটা শক্তি-পরীক্ষা হইবে। শরফুকে তাড়ানো সম্ভব হইতে পারে। 'এটা পিওর স্ট্র্যাটেজির প্রশ্ন-অ্যাণ্ড ট্যাক্‌টিক্‌সের—যেমন স্পেকুলেটারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে স্ট্রাইক চালাতেও আপত্তি নেই।' খানিকটা ব্যাখ্যা চলিল, তারপর—

তা হলে ডিমন্‌স্ট্রেশনের আয়োজন করো। তুমি একটা অ্যাপীল লিখে ফেলো। আগে বাংলায়, পরে হিন্দী ও উর্দু করে দেওয়া যাবে।

কথা ঠিক হইয়া গেল। ছাপার ভার লইল দীনু। অমিত কাগজ-কলম লইয়া বসিল, বলিল—দীনু, এক পেয়ালা চা ও একটা ডিম আনিয়ে দিস ভাই। আজ চান খাওয়া হয়নি!

দাশ চলিয়া গেলেন। অমিতের লেখা চলিল—'সর্বহারার দল, এবার তোমাদের দিন এসেছে। তোমাদেরই গায়ের রক্ত, শুষে এতদিন বয়লার চলেছে—তোমাদেরই

প্রাণের বায়ু জাহাজের চোঙা দিয়ে কালো ধোঁয়া হয়ে বেরুচ্ছে; তোমাদের আগুন-পোড়া কঠিন শবের উপর খাড়া হয়েছে ধনিকের গগনস্পর্শী লোভ।'...

কিন্তু সুনীলের কথাটা একবার আলোচনা করা দরকার। মোতাহের চলিয়া গেল না তো? না, কাটিং কাটিতেছে। দীনু একটা উর্দু মজুরের কাগজ পড়িবার অসাধ্য সাধন করিতেছে। এখনই বলিতে হয়—না হয় পরে আবার কেহ আসিয়া পড়িবে।

মোতাহের, তুমি খুন-খারাবিতে বিশ্বাস করো?

অবিশ্বাস করার কি আছে? মারলে মানুষ মরে, এবং না মরলে মানুষ নিজের স্বার্থ ছাড়ে না। এই তো সহজ কথা।

তা নয়। মানে এইটাতে মুক্তি সম্ভব হবে বলে মনে হয়?

কোন কোন বিষয়ে মোতাহেরের সুবিধা আছে—নিজের ভাবিয়া জবাব দিতে হয় না। এই সব জবাব অন্যের মুখে শুনিয়া শুনিয়া তাহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। পড়িতে পড়িতে পরের কথাকে সে নিজেরই সিদ্ধান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছে। 'পেটি বুর্জোয়ার রোমান্টিক আত্মোৎসর্গ দেখতে চমকপ্রদ—কিন্তু অকেজো। এরা বরং ভাবী কালে শ্রেণী-সংগ্রামের দিনে মজুরশ্রেণীর বিরুদ্ধে নিজ নিজ শ্রেণী-স্বার্থ সংরক্ষণে কোমর বেঁধে দাঁড়াবে।'

কেন?

নিজ নিজ শ্রেণীবুদ্ধিতে।

এখন সে শ্রেণীবুদ্ধি সত্ত্বেও তারা নিজ নিজ শ্রেণীস্বার্থের কথা তো বলে না। আর তখনই বা কেন বলবে?

মোতাহের শুনিয়াছে, বলে এবং বলিবে। অতএব তাহার দ্বিধা নাই যে, পেটি বুর্জোয়া নিঃস্ব মজুরের শত্রুরূপে দেখা দিবে।

অমিত ভাবিয়া চলিল—কেন? এই নিম্ন-মধ্যবিত্ত খাইতে পায় না, পরিতে পায় না; মজুরের অপেক্ষাও বাস্তবপক্ষে ইহারা বেশি দুরবস্থাপন্ন। শুধু মনে আছে একটা ভদ্রতার ছাপ। সেই মনের ছাপটাই কি বাস্তবের অপেক্ষাও বড় হইবে? এই তো আজ দেখিতেছে অমিত সুনীলদের—

মা-বাবা, দাদা-বন্ধু, সব পর হইয়া গেল, পরমাত্মীয় দূর হইল, সব ছাড়িতে পারিল—নিশ্চিন্ত দিনরাত্রি, তৈয়ারি আহার, অভ্যস্ত জীবন যাত্রা,—সবই চুকাইয়া দিল...পথে পথে ঘুরিতেছে, কলের জলে পেট ভরিতেছে, ফুটপাথ ঘুমাইতেছে...শেষে কি এর কাছে বড় হইবে পেটি বুর্জোয়ার ছোট চাকরি, মহাজনির পুঁজি বা সামান্য জমিজমার সামান্যতর আয়? শুধু দেশীয় বুর্জোয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই এই বিপ্লব এদের? জীবনের অপেক্ষাও তাহাই বড় হইবে? মায়ের কোলের অপেক্ষাও বড় হইবে?...

—কিন্তু না, নিবেদন লেখাটা শেষ করিতে হয়, 'মজুরের বন্ধু সেজে অনেকে তোমাদের শোষণ করছে। তারাও হচ্ছে ধনিকের চর। ধনিক তার শোষণ-কাজ

চালাবার জন্যে এদের পাঠায়। এরা নিজের স্বার্থের খাতিরে ধনিকের স্বার্থের কাছে তোমাদের বলি দেয়। এদের পকেট ভরে ওঠে ধনিকের ব্যাঙ্ক চেকে এবং ইউনিয়ন-ফাণ্ডের চুরি করা টাকায়। এরাই তোমাদের সর্বদা বলবে আপোষ-রফার কথা। এরা উপদেশ দেবে, ধনিকের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক—পিতা-পুত্রের-সম্পর্ক, সহশ্রমীর সম্পর্ক, বন্ধুত্বের সম্পর্ক, আর এরা নিজেরা সে বন্ধুত্বের মধ্যদূত। এই বিশ্বাসঘাতক বেইমানদের কথায় কান দিয়ে তোমরা তোমাদের প্রাণ ওদের হাতে তুলে দিচ্ছ, ধনিকের বুটের তলায় গুঁড়িয়ে যেতে দিচ্ছ। মনে রেখো, ধনিক আর শ্রমিক দু জাত। দু জাতের দুই স্বার্থ; তোমাদের না মারলে ওরা বাঁচে না; তোমরা বুক পেতে না দিলে ওরা মোটর-গাড়ি চালাবার পথ পাবে না।'

শেষ হয়ে আসছে। এবার শেষ আবেদনটুকু খুব জোর কলমে চালিয়ে দাও।

কলম চলিল। 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক'—! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অমিত মুখ তুলিল।

দীনু কহিল—শেষ হল?

হ্যাঁ, শোনো।

অমিত পড়িয়া গেল, দীনু-মোতাহের শুনিল। দুইজনেই কহিল, চমৎকার!

ঘড়িতে তিনটা বাজিতেছে। অমিত বড় ক্লান্ত বোধ করিল।

কিন্তু এবার একবার সুনীলের কথাটা ভাবিয়া দেখা যাউক। কি ভাবে তোলা যায়? প্রথমে আসিবে পদ্ধতির ভালমন্দের তর্ক, তারপর দলের বিচার, তারপর তাহাদের একজনের কথা—এই ভাবে আসল কথাটায় একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া পৌঁছিতে হইবে। ডিরেক্ট নয়, ফ্ল্যাঙ্ক ম্যুভ্‌মেন্ট।

ধীরে ধীরে অমিত অগ্রসর হইতে লাগিল। মোতাহের প্রথমটা গোঁড়ামি দেখাইল। তারপর কথা উঠিয়া পড়িলে ক্রমশঃ তাহার ডগমায় যেন সে নাগাল পাইল না, তাহার সুরও নরম হইল। শেষে সে বলিল—

ইহাদের দোষ নেই। ঠিকমতো কেউ পথ দেখিয়ে দিচ্ছে না। পথ ঠিক পেলে ওরা কী না করতে পারে? ওরাই আসল জিনিস, খাঁটি মাল। আমাদের সমস্যা গ্যায়ডেন্সের সমস্যা। এদের সত্য গ্যায়ডেন্স দিতেও চেষ্টা করতে হবে।

তা হলে তাদের বুঝতে চেষ্টা করো—কাছে আনো। অবশ্য সেও কম রিসক্ নয়?

হলই বা। তা বলে চুপ করে থাকবো? আমি তার জন্যে সব ঝক্কি নেবো। যদি দেখি, কেউ নিতান্ত পাগল নয়, ভেবে চিন্তে পড়ে-শুনে কাজ করতে তার ইচ্ছা আছে—আমি তাকে ছাড়বো না—হোক সে সন্ত্রাসবাদী।

অমিত ভাবিল—আর না, এবার ফিরিতে হইবে। আজ ইহার বেশি আলোচনা করিব না। মোতাহেরকে শুধু বোঝানো দরকার যে একক বা বিচ্ছিন্ন প্রয়াসে শক্তি নষ্ট হয়; সকলকার একত্রিত, সুনিয়ন্ত্রিত প্রয়াসেই কাজ সম্ভব। দূরে বসিয়া বড় বড় কর্তারা যত বড় থিসিস আর উপদেশ তৈয়ারি করুন, বাস্তব কাজে এমনই মিলিয়া মিশিয়া না চলিলে চলে না। সকল কেন্দ্র হইতে তাহাকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা

করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। পাথেয় নষ্ট হইতে দেওয়া কাজের কথা নয়।... আগুনকে যেভাবে পাই সেই ভাবেই সে প্রমিথিয়ুসের আশীর্বাদ—সেইরূপেই তাহা গ্রহণ করিব। স্থির প্রদীপশিখা, তীক্ষ্ণ প্রদীপ্ত বহ্নি, খড়কুটার দাউ-দাউ জ্বলা আগুন, দপ করিয়া জ্বলিয়া তেমনই খপ করিয়া যা নিবিয়া যায়, সামান্য স্ফুলিঙ্গ—সকলকে নমস্কার। আমাদের হোমানল জ্বালাইতে সকলকেই চাই।

এবার উঠি তবে, একবার অফিসে যেতে হবে।—বলিয়া অমিত গা-মোড়া দিয়া দাঁড়াইল।

দীনু বলিল, দাঁড়াও। কোন্ দিকে যাবে? কলেজ স্ট্রীট? চলো, আমিও যাবো, লেখাটা প্রেসে দেবো। কিন্তু অনেক টাকা প্রেসে বাকি পড়েছে, এবার আর ছাপতে চাইবে না। গুটি পনেরো টাকা না হলে যে ছাপার কাজও বন্ধ হতে চললো। শরফুদ্দিন তো ফাগু আগলে বসে আছে। কি যে করবো।

টাকা—টাকা—টাকা। সুনীলের টাকার দরকার—'শ দেড়েক টাকা চাই অমিদা।' অথচ, সে টাকায় কি হইবে কে জানে? হয়তো নিতান্ত অদ্ভুত একটা কিছু। কি হইবে তাহাতে?

জনগণের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন এসব প্রয়াসে অমিত বিশ্বাস হারাইয়াছে অনেকদিন—অথচ সে জানে, ইহার রোম্যান্টিক অ্যাপীল মধ্যবিত্তদের পাইয়া বসিয়াছে। প্রকাণ্ড পৃথিবীর ভিত্তি তাহাতে বিন্দুমাত্র নড়িবে না। ছেলেটাই শুধু পুড়িয়া শেষ হইয়া যাইবে। এই সব অমিতের ভাল লাগে না। তাহার বুদ্ধি, চেতনা, জীবন, অতীত অভিজ্ঞতা দিয়া সে বিচার করিয়া দেখিয়াছে, সুনীলের কোথাও সুযুক্তি নাই। আছে একটা দীপ্ত আকাঙ্ক্ষা—নিজেকে নিঃশেষে ডালি দিবার নেশা। অথচ সে বলি হাত তুলিয়া কে লইবে? 'সে দান কি নিবেন জননী প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে?'

দীনু ও অমিত বাসে চড়িয়া বসিল। অমিত ভাবিতেছিল, এ যেন হাউই—আঁধার চিরিয়া একটা আগুনের টান টানিয়া দিয়া যায়। ক্ষণকালের জন্য চোখ ধাঁধিয়া দেয়—পরক্ষণেই আবার গর্জমান তিমিরস্রোত পৃথিবীর চারিদিকে খলখল করিয়া হাসিয়া তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে।...

দীনুদের টাকা চাই। তাহাদের দাবিটা কম। কিন্তু সেই টাকার আগুন জ্বলিবে। না, খড়কুটার এ আগুন কবে জ্বলিবে, সে ভরসায় সুনীল বসিয়া থাকিবে না। এদের লক্ষ্য দূর—এখন যোগান তাই সামান্য। তাহার ফলও তেমনই অনিশ্চিত। আয়োজনটা এমনই তুচ্ছ যে ইন্দ্রাণী দেখিয়া বিশ্বাসই করে না। সুনীল এই সব কথা শুনিলে হাসিয়া গড়াগড়ি যায়। 'কাগজে বিপ্লব—ও আবার একটা বিপ্লব।' অথচ বিপ্লবের সত্যিকার মানে সুনীল ওরাই কি জানে?—বিপ্লব প্রকৃতিরই একটা ধর্ম?

অমিত জিজ্ঞাসা করিল, টাকাটা কবে পেলে চলে দীনু?

কাল পেলেও চলে।

কাল সন্ধ্যায় হলে হবে?

হতে পারে।

কাল সন্ধ্যায় আমি অফিসে দেবো।

অমিত হিসাব করিল—সাতকড়ির টাকাটা না পাওয়া যায়, 'রঞ্জন' পত্রিকার প্রবন্ধের টাকাটা পাওয়া যাইবে। তেইশ-চব্বিশ টাকার পনেরো টাকা গেল এইখানে, টাকা সাত দিতে হইবে পুরানো পুস্তকের দোকানে ইসাককে। লোকটা ভাল, অমিতের কাছে বোধহয় ত্রিশ-চল্লিশ টাকা পায়—একবারও তাগিদ দেয় না। এই পৃথিবীর সমস্ত পাওনাদারগুলি যদি এমনই ভদ্রলোক হইত। .

দীনু ধীরে ধীরে কহিল, অমিদা, সেই তাদের কারও সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে?

কাদের সঙ্গে?

যাদের কথা বলছিলে?

কেন? কি হবে?

দেখতাম।

কেন? জীবনে দেখিস নি নাকি?

দেখেছি। দেখে কেবলই হতাশ হয়েছি। ওদের কথায়, লেখায় যেন সস্তা সেণ্টিমেণ্ট—আসল জিনিস পাই নি। নিশ্চয় আসল জিনিস থাকলে এত কথা—এত বীরদম্ভ করে না। তাই, আসল লোক এক-আধটা দেখতে চাই।

আসল না নকল চিনবো কি করে? আর চিনলেই বা কি লাভ? যে আসল, সে হয়তো আরও গোঁড়া।

অমিত আবার প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করিল, চিনেই বা কি লাভ? দীনু উত্তর দিল না।

হঠাৎ সে কহিয়া চলিল, লাভ হবে কি জানি না। হয়তো হবে—একটা পথ দেখতে পাবো। দিনের পর দিন আর মনে হবে না—একটা উৎসাহহীন, উদ্যমহীন সুদূর স্বপ্নের জন্যে চলেছি। হয়তো দূরের স্বপ্নটা নিকট হয়ে উঠবে, বুকের মাঝখানে তার স্বরূপ দেখতে পাবো, চোখ বুজলে তার স্পন্দন অনুভব করতে পারবো। হয়তো আর চোখ বুজতেই পারবো না—চোখের ঘুম টুটে যাবে। কিন্তু চোখ জুড়োবে, প্রাণ এই ছটফটানি থেকে মুক্তি পাবে।

অমিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দীনুর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, কি বলছিস? অধীর হয়েছিস কেন?

কেন? সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলে দেখবো মায়ের মুখ কালো—অন্ধকার। বাবা তো কথাই বন্ধ করেছেন। দাদারা আমার খাওয়া-পরা দিতেও অনিচ্ছুক। তখন মনে পড়বে সমস্ত দিনের কাজের হিসেব, কি করেছি? সকালে পড়েছি একরাশ প্যাম্ফ্লিট। দুপুরে ঘুরেছি ডকে ডকে। এখন চলেছি ছাপাখানায়। এর কোন্ কাজটুকু নিয়ে তৃপ্তি পেতে পারি? কি দিয়ে মনকে বোঝাতে পারি, বাড়ির গঞ্জনা সার্থক—সব গ্লানি মিথ্যা!

...'মা, বাবা!'...অমিত নিমেষ মধ্যে একবার তাঁহাদের মূর্তি যেন দেখিতে

পাইল। আজ অমিত বাড়ি ফিরে নাই, তাঁহাদের দুঃখ-দুর্ভাবনার অন্ত নাই। এখনও কি তাহার মা বসিয়া আছেন? হয়তো আছেন—অমিতের ঘরে খাবার ঢাকিয়া রাখিয়া হয়তো নিকটেই খাটে শুইয়া পড়িয়াছেন—ঘুমে চোখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে...বড় অন্যায় অমিতের, কিন্তু অমিত করিবে কি?

বড় অন্যায় দীনুর। কিন্তু দীনুই বা করিবে কি? মা কাঁদিলে মেজাজ খারাপ হয়। বাবা কথা বলিলে মাথা নোয়াইয়া রাগে ফুলিতে থাকে। দাদারা উপদেশ দিলে যাহা-তাহা বলিয়া বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া আসে। আবার মা খোঁজ করিয়া বাড়ি আনেন।—এ সবই অমিত জানে, অমিতেরই সহ্য হয় না—দীনুর কি সহ্য হইবে? প্রাণ তাহার জ্বলিতেছে যে।.. সাবধান, সাবধান অমিত, এ আগুনকে ব্যর্থতার পথ হইতে ফিরাও তুমি।

অমিত সান্ত্বনা দিল—ওরকম হয় দীনু। ওঁরা সাংসারিক লোক, নিজ নিজ বোঝা ঠেলতেই ওঁদের জিব বেরিয়ে যাচ্ছে। তুমি আমি ভাবি, ওঁদের কেন সেইরূপ মনের প্রশস্ততা নেই? তা থাকলে সংসার একদিনেই অচল হত, দুনিয়াটা ক্ষ্যাপার কারখানা হয়ে যেত। ওঁদের হাঁড়িকুড়ি, ছোট স্বার্থচিন্তার মধ্যে বেঁধে রাখাই হল সমাজের কাজ, সংসারের কাজ। ওঁরা তো আছেন বলেই তুমি আমি এখনও ওঁদের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সংসারকে বুড়ো আঙুল দেখাই। এই ক্ষুদ্রচেতা মানুষগুলোর কাঁধে পা রেখে দাঁড়িয়ে নিজেদের উদার দৃষ্টির, প্রশস্ত মনের বড়াই করি। না হয় শুনি দুটো কড়া কথা, দেখি দু ফোঁটা চোখের জল,—তবু দিনটা তো চলে যাচ্ছে, নিজেদের সামনেকার লক্ষ্যে তো আমরা এগিয়ে চলেছি—

না, তাই চলছি না, দিনযাচ্ছে না—এই আমার আপত্তি। নইলে তাদের বিরুদ্ধে আমার নালিশ নেই। এখনও দু-তিন টাকা কাকীমা দেন; বাস খরচ চলে, না থাকলে হেঁটেই ঘুরি। বাড়ির ধোপায় কাপড় কাচে, জামা জুতো বাড়িতেই জোটে, চুল কাটাতেও পয়সা-খরচ নেই। সকালেও বাড়িতে চা খাই—দুবেলা ভাতও পাই। কিন্তু, কি জন্যে তাদের এই দুঃখ দেওয়া আর আমার এই লাঞ্ছনা পাওয়া? কাজের জন্যে?—সে কাজ এগুচ্ছে কোথায়? এই ভাবে দিনের পর দিন ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হওয়া যে ডিগ্রেইডিং, মর‍্যালি রুইনাস্।

দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। দীনু আবার বলিল, রাত্রে শুয়ে এক-একদিন ভাবি—ওই ট্রাম লাইনের ওপর মাথাটা পেতে শুয়ে পড়ি—সব চুকে যাক, মাথার ভেতরকার সুতীব্র জ্বালা শান্ত হোক।

অমিত সকরুণ হাস্যে কহিল—ক্ষ্যাপামি করিস না। কাজ ঢের আছে, কিন্তু লোক তত বেশি নেই। মনের তৃপ্তি পাবি, এই আশাই যদি করিস, তা হলে কাজের দিকে না যাওয়াই ভাল। কারণ যে কাজে তৃপ্তি, সে কাজ কিছুতেই তেমনটি হয়ে ওঠে না। উঠলে কাজটাই খেলো হয়ে যেত। আইডিয়ালের অভিশাপ জীবনে লাগলে সে জীবন চিরদিনই শরশয্যা হয়ে থাকে, কিছুতেই তাতে তৃপ্তি থাকে না, প্রাণ এমনই পুড়ে যায়। সংসারই মানুষকে দেয় তৃপ্তি, আইডিয়াল

দেয় তাড়না, যাতনা, আকুল বেদনা, আকণ্ঠ পিপাসা।...মনে মনে অমিত বলিল, দ্য ক্রাউন অব থর্‌ন্‌স্‌...

*   *   *

সংসারই দেয় তৃপ্তি। অমিত ভাবিল, যেমন শৈলেন পাইয়াছে তৃপ্তি। এখন আর নবম শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের কথা তাহার মনেই জাগে না। যদি মনে জাগিত, তাহা হইলে শৈলেনের মাথায় সে তাড়না চাপিয়া বসিত, তাহার দেহ এমন পুষ্ট হইতে পারিত না, মন এমন স্থির রূঢ় হইতে পারিত না। সংসার শৈলেনকে তৃপ্তি দিয়াছে, একমাত্র সংসারই মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারে। আইডিয়াল দেয় ক্রাউন অব থর্‌ন্‌স্‌...

সত্যই সংসার তৃপ্তি দিতে পারে কি? ইন্দ্রাণীকে, সুধীরাকে দিয়াছে তৃপ্তি? সাতকড়িকে, শৈলেনকে দিয়াছে কি? দুই-এক নিমিষে তাহার সে মায়া ভাঙিয়া পড়ে না? সংসার তোমাকে তৃপ্তি দিতে পারিত কি অমিত? তুমি পারিতে সকালে কাগজ পড়িয়া, চা টোস্ট খাইয়া, নীরোগ দেহ আরামে দুলাইয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে কলেজে যাইতে? অধ্যাপক সহযোগীদের সঙ্গে চোঁয়া ঢেকুর তুলিয়া নতুন কপি ও গলদা-চিংড়ির দর লইয়া গবেষণা করিতে? বাড়িতে ফিরিয়া টিফিন, শেষ সন্ধ্যায় হয় টিউশনি না হয় কালচারিস্ট মহলে আড্ডা দিয়া রাত্রির আহারে বসিতে? তারপর বড় জাজিম-পাতা নরম বিছানায় গৃহিণীর আলিঙ্গন-পাশ-বদ্ধ হইয়া শুনিতে, 'হ্যাঁগা, সেই লাল রঙের বেনারসী খোঁজ করেছিলে?' পারিতে তুমি অমিত? এই পরম তৃপ্তিকর নির্ঝঞ্ঝাট কাল্‌চার্ড সাংসারিক জীবনে তৃপ্তি পাইতে? ভাবিয়া দেখ অমিত, কি চমৎকার প্রস্পেক্‌ট্‌...

একটা গুমট দিনের অন্ধকার,—পৃথিবীর হাঁপ ধরিয়াছে, রাত্রির মুখও ছাইরঙের মেঘে ঢাকা, ইহাই সংসার। Interno! অমিতই খেলাচ্ছলে বন্ধুকে লিখিয়াছে—All hopes abandon ye who enter here।

দান্তের ইনফার্নো অমিতের মনে পড়িল।—না, সংসার তেমনতর বড় নরককুণ্ডও নয়। এ একটা পেইনলেস্‌ স্লটার্‌। উহার কবলে মানুষ আপন সত্তাকেও হারাইয়া ফেলে। উহার ভিতরে এক জারক রস আছে, যেন সেই জিঘাংসু বৃক্ষপত্র কীটপতঙ্গ যাহা হাত বাড়াইয়া টানিয়া লয়, আপনার বক্ষতলে চাপিয়া ধরে। সংসারও তেমনই—মানুষ যেন দমে সিদ্ধ হইতেছে।

অমিতের মনে পড়িল—সুনীলের প্রসন্ন হাস্য। সংসার ছাড়া উহাদের হাসি, চোখে অতৃপ্তির জ্বালা; কিন্তু সাংসারিকের জীবনের নিষ্প্রভতা নাই। মনে যেন উহাদের একটা কি রঙ ধরিয়াছে। প্রেমে পড়িলে মানুষের জীবনে যে অতৃপ্তি আসে, যে রঙিনতা আসে, আইডিয়ালের আলিঙ্গনে তেমনই অতৃপ্তি, তেমনই নেশা, তাই না অমিত? একদিন তুমিও ইহার স্বাদ পাইয়াছ। আজ? সুনীলদের দেখিলে তোমার তাহাই মনে হয় না? অতৃপ্তি। কিন্তু, কি তাহার নেশা। না হইলে তুমিই বা ঘুরিয়া মরিতেছ কোন্‌ আনন্দে?

এইবার অমিতের নামিতে হইবে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

দীনু কহিল, একটা কথা—একবার আমি তাঁদের একজনকার সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাঁদের বুঝে না দেখলে হয়তো আমি নিজেকেই বুঝতে পারছি না। কোন দরকার হলে আমাকে ডাক দিও অমিদা।

অমিত একটু বিস্মিত হইল, বলিল, তা হবে। এখন অতটা অধীর হ'স নে।

*　　　*　　　*

বাস হইতে নামিয়া মিনিট চার হাঁটিলেই অমিতের অফিস। অমিতের শরীরটা ক্লান্ত। ধীরপদে সে অগ্রসর হইল, মনে জাগিতে লাগিল দীনুর কথা।

দীনু প্রথমে ছিল অমিতের ছাত্র, এখন হইয়াছে বন্ধু। বছর খানেক পূর্বে আন্দোলনের মুখে এই ছিপছিপে তীক্ষ্ণধী ছেলে হঠাৎ কলেজ ছাড়িয়া দিল। স্রোতোমুখে ছয় মাস দমদমে কাটাইল। আর কলেজে ঢুকে নাই, কংগ্রেসের ছায়া মাড়ায় নাই। নানা কারখানায় ও অফিসের চারিপার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। সেখানেই সে অমিতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হইয়া উঠিল। কথা দীনু অল্প বলে। দেখিতে এখন পূর্বাপেক্ষা রোগা হইয়াছে—কপালের উপর শিরাটি জাগিয়া উঠিতেছে, চোখের দৃষ্টি স্থির উজ্জ্বল—কেবল মাঝে মাঝে তাহাতে কি জ্বালা জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু সে বড় চাপা ছেলে—মুখে কথা ফোটে না। ফুটিলে ভাল হইত। তাহা না হওয়াতে তাহার অন্তরের মধ্যে বিক্ষোভ ও ভাবাবেগ আবর্ত সৃষ্টি করে। বাঙালীর সর্বভোলা হৃদয়াবেগ উহাকে কি ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে? স্থির দীর্ঘদিনের কাজ ছাড়িয়া সেও কি চলিবে অস্থির বিক্ষুব্ধ আত্মাহুতির দিকে? এই কি বাঙালী-প্রকৃতি?

দীনু ছেলেটি ছেলেমানুষ; কিন্তু কোথায় গিয়া ঠেকিবে সে? তাহার চেহারা শীর্ণ হইয়াছে, মুখে কথা নাই; কিন্তু চোখে একটা অস্থিরতা অশান্ত বিদ্যুতের মতো চমকাইতেছে।

না, দীনুকে লইয়া দুর্ভাবনা আছে। মোতাহেরের মতো সে ডগমার কাছে নিজেকে সঁপিয়া দিতে পারে নাই; দাশের মতো আধা-শৌখিন, আধা-ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল ইডিয়লজি ও টেক্‌নিক লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না; মজুর কর্মীর উপযোগী স্থিরতা ও ধৈর্যও তাহার নাই। তাহার মনের গঠন স্বতন্ত্র; ইহাদের মন যেন বারুদের স্তূপ।...

বারুদের স্তূপ—বারুদের স্তূপ। বিজয়কে দেখিয়াও তাহাই মনে হইত, সুনীলকে দেখিয়াও তাহাই অমিত বুঝিয়াছে। একটা দুর্নিবার রুদ্ধ আবেগে যেন উহারা ফাটিয়া পড়িতে চায়—আপনার মধ্যে আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, ক্রুদ্ধ আক্রোশে গর্জিয়া গর্জিয়া আগুনের দীক্ষা মাগে—চাহে স্ফুলিঙ্গের প্রাণস্পর্শটুকু শুধু।

সমস্ত দেশে আজ আগুনের ফুলকি খেলিয়া বেড়াইতেছে। কোথা হইতে একটা ছুটিয়া একবার এই বারুদের স্তূপে পড়িলেই হইল, তারপর সুনীল ও দীনু এইরূপে জ্বলিয়া শেষ হইয়া যাইবে।

They also serve who only stand and wait. কিন্তু কেন এই সত্যটা

দীনু বুঝিয়াও বুঝে না? সে মূঢ় নয়, রোমান্টিকও নয়। তথাপি কেন তাহার এই অধীরতা?

ইহাই বুঝি বাঙালীর প্রকৃতি—উজ্জ্বল হৃদয়াবেগ কূল ছাপাইয়া উঠে, আপনাকে দিকে দিকে লুটাইয়া বিলাইয়া দিয়া শেষ হইতে চায়। আর, যদি প্রথম যৌবনের সেই কোটালের জোয়ার একবার কাটিয়া যায়, তাহার পরে আর তাহার ভয় নাই, তাড়া নাই, অধীরতা নাই—কেরানীগিরির বাঁধানো তীর ও ক্ষুদ্র পরিবারের কৃমবর্ধিষ্ণু বাঁধের মধ্যে জীবনের অগভীর স্রোত একটানা বহিয়া চলে।

প্রমাণ দেখ, আজিকার সুনীল আর তাহার ভাই অনিল।...অকস্মাৎ জ্বলিয়া শেষ না হইয়া গেলে সুনীল অমনই ধোঁয়াইতে ধোঁয়াইতে পোড়া অঙ্গারে পরিণত হইবে—সংসার হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে।...

কিন্তু জীবনের দেবতা? প্রাণসূর্য? তিনি হাসিবেন, না কাঁদিবেন?

অফিসে প্রবেশ করিতে করিতে অমিত আবার একবার দীনুর কথা ভাবিল।

দীনু পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না—কে তাহাকে পথ দেখাইবে?...পথ নিজেকেই খুঁজিয়া লইতে হয়। কাহার পথ কোন্‌টি, সে নিজে ছাড়া কে বলিতে পারে? সুধীরার পথ—ইন্দ্রাণীর পথ—কে দেখাইবে?

তোমার পথই কি তুমি চিনিয়াছ, খুঁজিয়া পাইয়াছ অমিত?

নয়

সিঁড়ি বাহিয়া অমিত উপরে উঠিতেছিল—নীচেকার মেসিন ঘরে মেসিন সশব্দে চলিতেছে। অন্ধকারে বিজলী বাতি জ্বলিতেছে—সেই ঘরটায়। তাহার পিঙ্গলাভা সিঁড়িতে আসিয়া পড়িয়াছে। কাজ চলিতেছে পূর্ণগতিতে—সময় নাই। অমিতেরও ভাবিবার সময় নাই; এখনই কলম লইয়া বসিতে হইবে। তবু চকিতের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত মনে প্রশ্নটা আবার খেলিয়া গেল—তোমার পথই কি তুমি চিনিয়াছ? ইতিহাসের গবেষণা, শিল্পের আরাধনা, গান, বই, সুন্দর আলোচনা? ভাল কবিতা, তারা ভরা আকাশ, দুকূলহারা নদী, তুষারমৌলি পাহাড়? সমাগত শ্রমিক-বিপ্লব, ইন্দ্রাণীর উন্মাদ গতি, সুনীলের ক্ষ্যাপামি?...

সিঁড়ি ফুরাইয়া গিয়াছে। দুইখানা লম্বা টেবিলের দুই দিকে চারিজন যুবক মাথা গুঁজিয়া লিখিতেছে, প্রুফ দেখিতেছে, কাগজের কাটিং কাটিতেছে—মুখে বিরক্তির রেখা।

অমিত প্রবেশ করিতেই একজন চোখ তুলিল।

ওঃ, এসে গেছো যা হোক। নাও তোমার কালকের প্রুফ। দেখে দাও, ভাই, চট করে। মেসিন এখনই উঠবে—চারটে বেজে গেছে।

তুমিই দেখে দাও না।

মাপ করো ভাই! তোমার 'উর' আর ক্যাল্‌ডিয়ান সভ্যতার সঙ্গে—সুমার-

কুমার কোন সভ্যতার সঙ্গেই—আমার পরিচয় নেই। আর মার্শ্যালের হরপ্পা বা মহেঞ্জোদড়োর ছবি আমি চোখেও দেখি নি। এক মার্শ্যালকে চিনতাম—কলেজে থাকতে, সে ইকনমিস্ট। ভুলে গিয়ে এখন বেঁচেছি।

অমিত প্রুফ লইয়া বসিল। পড়িতে পড়িতে তাহার মন বিরক্ত হইয়া উঠিল। উঃ, এত ভুলও হইতে পারে। বাংলা ভাষায় না হয় বানানের নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইংরেজীতে এখনও লেখক-মুদ্রাকরের সেই স্বরাজ বিঘোষিত হয় নাই।.. আর অমিতই বা কি লিখিয়াছে? বাসী খাদ্য, এঁটো পাতা। কিছুই নাই। সবই কোনো-না-কোনো গবেষকের লেখার চর্বিত চর্বণ।—মেসোপটেমিয়ার নদীতীরে ও সিন্ধুর নদীতীরে সুপ্রাচীন সমজাতীয় সভ্যতার নিদর্শন—মোহর, বৃষ ও অজ্ঞাত লিপি; এই অভিনব পৌর-সভ্যতার সঙ্গে দ্রাবিড় প্রাচীন সভ্যতার যোগাযোগ; ঐ দক্ষিণাপথের প্রাগৈতিহাসিক আবিষ্কার-মালা; জালায় সমাহিত শব, বালুচিস্তানের দ্রাবিড় গোষ্ঠির মুসলমান ব্রাহুই জাতের অস্তিত্ব;—এই সমুদয় তথ্যকে এক প্রশস্ত দৃষ্টিতে সুগ্রথিত করিবার চেস্টা করিয়াছে অমিত—ইহাই তাহার প্রবন্ধ। ভারতবর্ষের প্রাক্-আর্য যুগের ইতিহাসের যে পাতাটা খুলিয়া গিয়াছে, সেই পাতাটার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা—এই হইল প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। অতি সস্তা, অতি বাজে কাজ; শুধুই পরের কথাকে আবৃত্তি করা, পরের চিন্তার জাবর কাটা—ইহাতে মন বুদ্ধির কি সার্থকতা আছে? কিন্তু ইহাই জার্নালিজ্ম। অর্থাৎ চিন্তাশক্তিকে বিসর্জন দিয়া কথার পর কথা গাঁথিয়া যাওয়া।..

প্রুফ দেখিতে দেখিতে অমিত ভাবিতেছিল, কি গ্লানিকর এই কাজ! নিজের চিন্তা ও চেতনাকে কেবলই ফাঁকি দেওয়া। কিন্তু কোথায় পাইবে তাহার চিন্তা মুক্তি, চেতনা আত্ম-পরিচয়? এই পৃথিবীর জীবিকার হাটে তাহাদের সে সুযোগ জুটিতে পারে না। অমিতের মনে পড়িল, 'জীবিকার যূপকাষ্ঠে মানুষ আপনাকে বলি দেয়।' সত্যই তাহাই। মনে করো—কলেজের সেই দুই শত ছেলের মুখ—চারিটা বাজে—তাহাদের মুখে ক্লান্তি, চোখে হয় নিদ্রা, না হয় শ্রান্তি; শ্রান্ত, ভাব-লেশহীন, বুদ্ধিদ্যুতিহীন দুই শত মুখের সামনে দাঁড়াইয়া তুমি চেঁচাইতেছ—'ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপকরণ নাই, ট্রপিকের জলবায়ুতে তাহা নষ্ট হইয়াছে, বার বার আক্রমণকারীর হাতে তাহা ধ্বংস হইয়াছে। তাহা ছাড়া ভারতবাসীর ঐতিহাসিক বোধও ছিল না।'...১৯২৮-এ ইহা বলিবে, ১৯২৯-এ ইহাই বলিবে, ১৯৩০-এও আবার বলিবে ইহাই। ছাত্রের দল বদল হইতেছে, তথাপি বছরের পর বছর তেমনই নিষ্প্রভ মুখ, শ্রান্ত-নয়ন তোমার সম্মুখে থাকিয়া যাইতেছে; আর তেমনই একটু লজ্জা ও বেদনা মিশ্রিত স্বরে তুমি চেঁচাইতেছ—'ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপকরণ নাই, ট্রপিকের জলবায়ুতে তাহা নষ্ট হইয়াছে।' একই গল্প, একই প্রশ্ন, একই কৌতুক পর্যন্ত। বছরের পর বছর একই কথা আবৃত্তি করিবে, ইহারই নাম প্রফেসরি। একইভাবে মাথা নাড়িয়া, ঘাড় একটু কুঁচকাইয়া, চোখ একটু বাঁকা করিয়া, সেই ইংরেজী অধ্যাপকের মতো—যিনি তোমাদের দাদাদের সময়ে,

তোমাদের সময়ে ও এখনকার দিনেও, একইরূপে চসারের প্রোলোগ পড়াইয়া ছেলেদের একই বাঁধা রঙ্গ-কৌতুকে হাসাইতেছেন,—নিজের একই হিউমারে তুমিও নিজে হাসিবে। অথচ পৃথিবী চঞ্চল গতিতে উন্মাদপ্রায়, আর তুমি সেই ডায়েলেক্‌টিক্-এর ছাত্র—

কোথায় পাইবে চিন্তা মুক্তি, চেতনা পাইবে আত্মপরিচয়?

* * *

অপূর্ব মুখ তুলিয়া বলিল, অমিত চা-টা খাওয়াবে?

নিশ্চয়।

এই অফিসে অপূর্ব অমিতের সান্ত্বনা। দেখিতে সে কালো, মোটা; কিন্তু তাহার নিজের বিশ্বাস, সে একহারা, সুশ্রী, ঠাকুরমূর্তির মতো। গলা তাহার মন্দ নয়, কিন্তু সঙ্গীত সম্বন্ধে সে অজ্ঞ; তথাপি তাহার বিশ্বাস, সে গাহিলেই সকলে—বিশেষত মেয়েরা, বিমুগ্ধ হয়। সিম্ফনি, হার্‌মনি, মেলডি, ইহাদের বিশেষত্ব কি, তাহা তাহার জানা নাই, কিন্তু সে প্রাণপণে নোট টুকিতেছে, একটি উপন্যাসের বিলাতফেরত নায়কের মুখে বসাইয়া দিবে। ড্রইং-রুম ও বিলাতফেরত জীবন তাহার অচেনা, কিন্তু লোভের মাথায় সে উহাদের আজব চিত্র আঁকিয়া ফেলে। ঘর হইতে দুই পা বাহির হইতে সে ভয় পায়, কিন্তু, ভ্রমণকাহিনী তাহার প্রিয়, বিশেষত ইক্স্‌প্ল্যারার্‌দের গল্প। বিবাহ হইয়াছিল সাধারণভাবেই; কিন্তু বন্ধুদের মহলে বলিতে ছাড়ে না যে, উহার পিছনে একটা রোমান্স আছে। স্বগ্রামে বহু বালিকার সহিত একসঙ্গে সে বাড়িয়াছে—স্বচ্ছ সাধারণ সেই পেটি বুর্জোয়া বালকের জীবন। যৌবনের এপার হইতে এখন সে ভাবে, সেই সকল গ্রাম্যসঙ্গিনীদের সঙ্গেই তাহার একটি রোমান্টিক মধুর সম্পর্ক চিরস্থায়ী হইয়া আছে। সাধারণ জিনিসকে অসাধারণ করিয়া গল্প করিবার, বড়াই করিবার, নিজের কথা বাড়াইয়া বলিবার আর্ট তাহার জানা আছে। সকলেই জানে, তাহা মিথ্যা; সে নিজেও তাহা জানে; কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি নাই—সে বলিয়াই খুশি;—তথাপি তাহার বিশেষত্ব এইখানে নয়, অন্যখানে। সে দুঃখের হাতে ঘা খাইয়াছে, বহুবার ঘা খাইয়াছে। অনেক ছোট ছলনার, সামান্য ভীরুতার আশ্রয় লইয়া নিজেকে দুঃখের হাত হইতে অপূর্ব পরিত্রাণ করিয়াছে। টাকার মূল্য সে বাধ্য হইয়াই চিনিয়াছে। তাই আজ চা-টাও পরের পয়সায় খায়, বই পড়ার নেশা পরের উপর মিটায়। সবই সত্যি, কিন্তু তবু তাহার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে—তাহার জীবন-বোধ কাঁচা নয়—ক্ষুদ্রতাই জীবনের সত্য পরিচয়—মুহূর্তের দেখা, সামান্য হাসিগল্প, ক্ষণস্থায়ী মিলন, বহুলোকের যাওয়া-আসা, অর্থহীন কথাবার্তা, অকারণ ভয়, অনিচ্ছায় ছলনা—এই সকল লইয়াই জীবন। কিন্তু জীবনদেবী এই সকলের মধ্য দিয়াই ইহারই ফাঁকে ফাঁকে মধুভাণ্ড লইয়া দাঁড়াইতেছেন—তাহাও পান করিতেই হইবে। যুগের পর যুগ এমনই জীবন স্রোত একই রূপে বহিয়া চলিয়াছে—সকল দেশে, সকল কালে, সকল মানুষের চিত্তভূমিতে। অপূর্বর এই জীবনবোধ মিথ্যা নয়। আর সেই সূত্রেই অমিতের সঙ্গে তাহার সৌহার্দ্য।

অপূর্ব বলিল, চা-টা খাওয়াবে?

নিশ্চয়। কিন্তু 'টা'-টা কি হবে বলো তো? শরীর ভাল নেই, আজ খাইও নি কিছু।

অপূর্ব বলিল, চানও করোনি দেখছি।

ঠিকই দেখছো।

কি হয়েছিল?

শরীর ভাল নেই।

অথচ বাড়ি ছিলে না।

কে বললে?

তোমার খোঁজে এসেছিল।

কে?

আমি ছিলাম না তখন, চিঠি রেখে গেছে।

অমিত চিঠি লইল। ইন্দ্রাণী চৌধুরীর চিঠি। অমিতকে তাঁহার চাই —আজ বিকালের পূর্বেই। সর্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন ইন্দ্রাণী তাহাকে সকাল হইতে। 'কোথায় তুমি? শীঘ্র এস। বড় জরুরি।' অমিত ভাবিতে লাগিল, বিকালের পূর্বে সে কি করিয়া যায়? কোথায় বা পাওয়া যায় ইন্দ্রাণীকে? পাওয়া চাই-ই যে।···অন্তরের উৎসাহবশে কোথায় ইন্দ্রাণী ধাবিত হইতেছে, নিজেই সে জানে না। কিন্তু তাহার এই অনভিজ্ঞ যাত্রার পথে যতটা সম্ভব সে অমিতের পরামর্শ লাভ করিবে, ভুল হইতে থাকিলে অমিত তাহাকে রক্ষা করিবে—এ নৈতিক দায়িত্ব কখন হইতে দুইজনেই মনে মনে মানিয়া লইয়াছে।

ইন্দ্রাণীর এত কি দরকার? দরকার তাহার বড় ছোট নানা কারণে প্রায়ই, অমিত তাহা জানে। তবু দেখা করিতেই হইবে। তবে সুনীলের কাজ মিটাইয়া—সে দরকারের কাছে ইন্দ্রাণীর দরকারও বড় নয়। অমিত বলিল, আজ যে আমার সময় হবে, তা তো মনে হয় না।

অপূর্ব বলিল, আর এক ভদ্রলোক তোমার খোঁজ করতে এসেছিলেন অফিসে। তাই জানলাম।

অমিত বুঝিল, তাহার ছলনা টিকিতেছে না; বলিল, কে এল? নাম জানো?

নাম বললে না। বললে, 'আমার সঙ্গে দেখা হবে।'

কি রকম দেখতে?

ময়লা রং, গায়ে লম্বা শার্ট।

অমিতের মনে পড়িল সকালবেলার কথা। কিন্তু কত লোকই তো এরূপ থাকে—অমিত ভাবিতে লাগিল।

কি? তোমাদের মজুর-অফিসের নাকি?—অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল।

হবে। কিন্তু কে, বুঝতে পারছি না।

তা গেছলে কোথায়?

অমিত হাসিয়া বলিল, সে তোমার শুনে কি হবে?

শুনিই না।

মিস্টার বসুদের বাড়ি---মিস বসু ডেকেছিলেন। আবার এখানেও দেখছি চিঠি পাঠিয়েছেন তারপর।

মিছে কথা।

বেশ, তাই।

মিস বসু বিদুষী, সাহিত্যিকা। তাহার সহিত কি একটা মজলিসে অমিতের পরিচয় হইয়াছিল। কিন্তু অপূর্বের বিশ্বাস—মিস বসু ডাকিলে একমাত্র তাহাকেই ডাকিবে, তাহার লেখার প্রশংসা করিবার জন্য—'অপূর্ববাবু, কি চমৎকার আপনার লেখা! আমি যে কতদিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি।'...না, অপূর্ব বিশ্বাস করিতে চাহে না যে, মিস বসু অমিতকে ডাকিয়াছে। বিশ্বাস করিতে সে পারেও না।

অমিত তাহা বুঝিত। বুঝিয়াই অমিত একটু রঙ্গ করিতেছিল, দেখিতেছিল অপূর্বের কাণ্ড। ইতিপূর্বেই অপূর্ব অমিতের নামীয় চিঠিখানার খামের উপর স্ত্রী-অক্ষরের লেখা দেখিয়াছে; আগ্রহে তাই অধীর রহিয়াছে।

অপূর্ব এবার খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া গেল। তারপর কহিল, এখন কি খাবে? ওঁদের যা আদর, তা তো বুঝেছি, খেতেও বলেনি।

অমিতের সৌভাগ্যটা বিশেষ কিছু নয়, মিসেস বসু তাহাকে তেমন সমাদর করিতে পারে না, অপূর্ব এই কথা দ্বারা তাহাই ভাবিতে চেষ্টা করিল, নিজেকে অন্তত বুঝাইতে চাহিল। অমিত মনে মনে তাই হাসিল, কহিল, বলবে কি? আমি বললাম, এই মাত্র খেয়ে এসেছি।

এখন কি খাবে তা হলে?—অপূর্ব মিস বসুর কথাটা ভুলিতে চায়, অন্য কথা পাড়িতে চায়; অথচ কথাটাকে সে ভুলিতেও পারিতেছে না।

অমিত মনে মনে হাসিল। বেয়ারাকে ডাকিয়া অমিত খাবারের হুকুম দিল। অপূর্ব কহিল, জগু, আমার সে টাকাটার কত ফেরত আসবার কথা?

এগারো আনা।

যা, তা থেকে এই সব খাবার নিয়ে আয়।

অমিত বলিল, সে কি অপূর্ব? আমার টাকা আছে যে।

থাক। একদিন না হয় খেলে আমার ওপর। তোমার টাকায় তো অনেক ভূত পুষতে হয়।

অমিত জানে, অপূর্বের এইরূপ দুই-একটা খরচ মাঝে মাঝে করিতে হয়, না হইলে তাহার নিজের মনের কাছে সে নিজে ছোট হইয়া যায়। তাই অমিত আর আপত্তি করিল না।

কিন্তু কি লাভ?—অপূর্ব কহিল, এই তোমার অর্থহীন ঘোরা-ফেরায় কি লাভ? কি এসব? মেয়েদের পেছনে ঘোরা-ফেরায় তোমার লোভ আছে, অথচ তুমি বিবাহও করবে না। এর চেয়ে একটু দেখে-শুনে—

তাতেই বা কি? জানো তো ভাই, আমার চোখ নেই। দেখা-শোনা করতে হলেও তোমাকেই টানতে হবে।

চোখ থাকলে কেউ মিস বসুর ছায়া মাড়ায়?

আসিয়া গিয়াছে আবার মিস্ বসু—অপূর্ব ভুলিতে পারে নাই। অমিত মনে মনে হাসিল, বলিল, কেন? সে তো দেখতে বেশ।—কথাটা খুব সত্য নয়; কিন্তু অমিত এই মুহূর্তে তাহা স্বীকার করিবে না।

বেশ! শুনেছি ময়লা, রোগা—

ঠিক তা নয়, স্লিম, গ্রেইস্‌ফুল্; দেখলে বুঝতে।

অপূর্বের মুখ আবার খানিকক্ষণের জন্য অন্ধকার হইল। পরে সে বলিল, যাক ওসব। এখন জানতে চাই—তুমি এসব ছাড়বে কি না?

কোন্ সব?

মজুর আর মেয়ে-সমাজ—তোমার স্বদেশী আর সর্বনাশীদের।

কেন? তারা করেছে কি?

তোমার সঙ্গে তাদের কি সম্পর্ক? তুমি ঐতিহাসিক, কালচার্ড। তোমার মন দেশ-বিদেশের, যুগ-যুগান্তরের কথা নিয়ে আলোচনা করে। তুমি মানুষের সভ্যতার ইতিহাসকে ধ্যানের চক্ষে দেখে আমাদের গোচর করাবে। মানবশক্তির জয়-পরাজয়, উন্নতি-অবনতির চিত্র আমাদের সামনে ধরবে—ফিলসাফ্যার্ অব লাইফ, ইগ-জ্যামিন্যার অব এইজেজ্ তুমি হলে আলোকের পূজারী। তুমি আপনার মনবুদ্ধিসত্তা সব এভাবে ভাসিয়ে দেবে কেন? এই ইকনমিক্‌স, পলিটিক্‌স্, ফ্যানাটিক্‌স্, আরও কত ট্রিক্‌স আছে, কে জানে? জানোই তো এসব স্রোতের বুদ্বুদ। কিছু ওদের মানে নেই—ভুয়ো, ফাঁকি, হম্‌বগ। কেন এসব নিয়ে সময় নষ্ট করছো? শরীরও তো যাচ্ছে,—টাকার কথা না-ই বা বললাম।

অমিত হাসিয়া বাধা দিয়া কহিল, কি অফিসে চেঁচামেচি করছো! ক্ষ্যাপার মতো বলেই যাচ্ছ।

বাড়িতে তো পাওয়া যাবে না, তাই অফিসেই বলতে হয়।

দয়া করে বাড়ি গেলেই হয়।

বেশ, দেখা যাবে। অপূর্ব একটু নীরব রহিল; তারপর—কিন্তু ইউ আর ফ্যলস্ টু ইঅ্যার্ ওন্ ট্যাল্যান্টস্, অমিত।

অমিত বাধা দিয়া বলিল, আবার?

ইউ আর্ ফ্যলস্ টু ইঅ্যারসেল্‌ফ্। বেশ জোর দিয়াই অপূর্ব বলিল।

অমিত সজোরে হাসিয়া উঠিল, বাঃ! বাঃ! তারপর? অপূর্ব চুপ করিল।

খাবার আসিল; দুইজনে খাইতে শুরু করিল। ধীরে ধীরে অপূর্ব কহিল, সুহৃদ আমাকে বললে—কাল রাত্রিতে তোমাকে এগারোটা পর্যন্তও খুঁজে পায়নি। তাই আজ বলছিলুম। অমিত, যা তুমি নিজে বিশ্বাস করো না, যাতে তোমার বদ্ধি সায় দেয় না, তাতে তুমি নিজেকে এমন নষ্ট করছো কেন? আপত্তি করো না। আমি বেশ বুঝি, তুমি যা করছো, তা তোমার লেখাপড়ার, এমন কি, তোমার সমস্ত শুভবুদ্ধির বিরুদ্ধাচরণ। কেন এই বিদ্রোহ? কার বিরুদ্ধে?

তুমি সাত কাজে ছুটে নিজেকে খানখান করে ফেলছো। এতে কি তোমার মনের ইন্‌টেগ্রিটি ঠিক আছে? না, তা কখনও থাকতে পারে? মানুষের মন আজ এমনিই তো বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে—তার ওপরে তুমি যদি তাকে ইচ্ছা করে ডিস্‌ইনটিগ্রেইট করে দাও, তা হলে আর কি হবে?

কিন্তু আমি নিজেকে খণ্ড খণ্ড করছি, এ কথাই যে মিথ্যা।

তোমার চৈতন্য যে মালিন্যপ্রাপ্ত হচ্ছে—দেখছো না?

ফোনের ঘণ্টা বাজিল, অমিত তুলিয়া লইল। তারপর কাহার সহিত কথা কহিতে লাগিল। তাহার কথাগুলিই শুধু উৎকর্ণ অপূর্বের কানে গেল।

তুমি! শোনো, ঠিক হয়েছে।

যুগল।

হ্যা, সেই আজই দেবে।

সন্ধ্যার পর পারবে না?

বেশ, কিন্তু কখন?

রাত দশটায়।

ওখানে? আচ্ছা।

এদিকে কোনও অসুবিধা হয়নি।

আচ্ছা।

ফোন রাখিয়া অমিত অপূর্বকে কহিল, যুগলের কাছে কটা টাকা চেয়েছি। রাত দশটায় কি যাবো? বরং কাল সকালেই যাওয়া ভাল, কি বলো?

অপূর্ব গম্ভীরভাবে কহিল, যদি রাত দশটায় অন্য কোথাও না যাও।

অন্য কোথাও কেন? তবে সুহৃদের সঙ্গে বায়স্কোপে যেতে হবে—তা সে কালই বলে গেছে।

দেখো, ঠিক সময়ে যেও। নইলে হয়তো তোমার জন্যে দেরি করে করে বায়স্কোপে আর যাওয়াই হয়ে উঠবে না।

অপূর্ব আবার কহিল, পাঁচটা বাজে। ওঃ! তোমাকে যে আজ বিকেলে ব্রজেন্দ্রবাবু যেতে বলেছেন।

কখন বললেন?

কতদিন পরে এক ঝলকে অমিতের মনে পড়িল—সবিতাকে।

বেলা এগারোটায় ফোন করেছিলেন। তুমি ছিলে না—বলেছিলেন, এলেই যেন বলি।

অমিত আনন্দিত হইল, কিন্তু চিন্তিতও হইয়া পড়িল। ইন্দ্রাণীর কাজ বিকালের পূর্বে, শোভাযাত্রা বিকালে; আবার ব্রজেন্দ্রবাবুর আহ্বানও বিকালে। কি করা যায়? ইন্দ্রাণীকেই বুঝাইয়া বলিবে—রাত্রিতে দেখা করিবে; পথে একবার শোভাযাত্রা দেখিয়া এখন ব্রজেন্দ্রবাবুর কাছেই তবে অমিত যাইবে। অমিত বলিল, খুব তো বলেছো! কেন ডেকেছেন জানো কি?

না। বোধহয় কিছু কাজ আছে।

তা হলে তো যেতেই হয়। এদিক আবার সুহৃদের তো তাগিদ আছে। চলো না, বেরুই।

অপূর্ব ও অমিত অফিস হইতে বাহির হইল। অমিত কহিল, আমি বাস ধরি, আজ আর হাঁটতে পারছি না। সময়ও তাতে ঢের লাগবে।

অমিত বাস ধরিতে চলিল।

* * *

বৃদ্ধ ব্রজেন্দ্র রায় অমিতের পিতার সহাধ্যায়ী। বড় সরকারী চাকুরি হইতে অবসর লইয়া গড়পারে বাড়ি করিয়া আছেন। আজীবন সাহিত্যানুরাগী, বিদ্যানুশীলনেচ্ছু। কিন্তু সরকারী চাকুরির জ্বালায় কিছুই স্থায়ী লেখা লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই। চাকুরির আয়ে অবস্থা সচ্ছল হইয়াছে, ছেলেদের ও মেয়েদের ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতে হইবে না। কিন্তু তাঁহার মুখে ছাপ পড়িয়াছে একটি সবিষাদ চিন্তার। অমিতকে তিনি ভালবাসেন, বলেন 'নিজের কিছু পরিচয় রেখে যেও। এই তার সময়। নইলে পরে দেখবে, শক্তি নিস্তেজ হয়ে গেছে। নানামুখীন চেষ্টায় তার আর জোর নেই।'

অমিত জানে, এই বৃদ্ধের মুখ কেন বিষণ্ণ। জীবনের পরিচয় অপূর্ণ রহিয়া গেল—এই বেদনায় তাঁহার মন ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। অথচ উহাই ছিল তাঁহার আজীবন স্বপ্ন। কেন এমনই হইল? এমনই সরকারী চাকুরি—এমনই জীবনের নির্মম ছলনা।...

জীবনের পরিচয়।

'এখনই তার আয়োজন করতে হবে, নইলে দেখবে শক্তি নিস্তেজ হয়ে আসছে। নানামুখীন কাজে আপনার অপচয় করতে করতে তার আর কিছুই থাকবে না।'

আজ বৎসর ঘুরিতে চলিল, একদিন গড়ের মাঠে অমিতকে ব্রজেন্দ্রবাবু এই কথা কয়টি কহিয়াছিলেন। নিজের জীবনের সমস্ত পরিকল্পনা কেমন করিয়া ঝরিয়া গিয়াছে; দিনের পর দিন অলস উপেক্ষায় কেমন করিয়া তাহাদের তিনি শুকাইয়া পড়িতে দিলেন। হিন্দুর সামাজিক ইতিহাসের যে চিত্র আঁকিবার সঙ্কল্প লইয়া তিনি যৌবনের চূড়ায় দাঁড়াইয়াছিলেন—অনার্য আর্য বহু সভ্যতা-সংঘাতের সেই বিশাল দৃশ্যপট—অপূর্ব উপাদান—কি করিয়া তাহার রঙ প্রথম ঝাপসা হইল, তাহার সুরের বিশুদ্ধতা নষ্ট হইল, তাহার সীমারেখা মুছিয়া যাইতে লাগিল, তাহার ভাবকেন্দ্রের সূত্র ছিঁড়িয়া গেল—ভাব ও কল্পনা অস্পষ্ট হইয়া, অনির্দেশ্য হইয়া শূন্যতলে মিলাইয়া গেল—ব্রজেন্দ্রবাবু তাহা শুনাইতেছিলেন। তখন সূর্য ডুবিতেছে। হেস্টিংসের নির্জন মাঠে কেহ নাই—গঙ্গার বুকে স্টীমারের ধোঁয়া ও ধ্বনি, ওপারের চিমনির অজস্র উদ্গীরিত ধূমকুণ্ডলী, তাহার উপর সূর্যাস্তের রক্তাভা। সমস্ত দৃশ্যটার মধ্যে যেন একটা ট্র্যাজেডির বিষণ্ণতা ছিল—যে ট্র্যাজেডিতে করুণার স্পর্শ নাই, আছে নিয়তির নির্বাক পরিহাস—মানুষের জীবন-স্বপ্নের উপর বাস্তব জীবনের রূঢ় হৃদয়হীন ব্যঙ্গ। কোথায় সেই ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার কল্পনা? ব্রজেন্দ্র রায়ের স্ফুটনোন্মুখ স্বপ্ন?

'জীবনের পবিচয় রেখে যেতে হবে; এখনই তার আয়োজন করতে হবে।' অমিত আয়োজন করিবে কি? ব্রজেন্দ্রবাবু বন্ধুপুত্রকে স্নেহের চক্ষে দেখেন। তিনি অমিতের

নিকট খুব বড় জিনিস প্রত্যাশা করেন—শুধু নবম শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস নয়, সমস্ত বাঙালী-জগতের ইতিহাস। কতদিন অমিতের সঙ্গে তিনি গড়ের মাঠে ঘুরিতে ঘুরিতে আলোচনা করিয়াছেন—বাঙালীর মানসজীবনের মূল প্রেরণাগুলি কোথায়? তাহার জাতীয় মনের তলায় কোন 'জাতিসংমিশ্রণ' রহিয়াছে; দ্রাবিড় মঙ্গোলেরও পিছনে কোন্ পলিমাটির অধিবাসী অস্ট্রিক জাতি তাহার মেরুদণ্ড যোগাইয়াছে? ধীরে, অতি ধীরে, কেমন করিয়া মৌর্য সাম্রাজ্যের পর হইতে আর্যসভ্যতার পতন হইল? তাহার পর বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব প্রেরণার বিভিন্ন বিকাশ, পরস্পর সংমিশ্রণ। মধ্যযুগের প্রথম তমিস্রা-স্রোতে নাথগুরুদের ও শৈব তান্ত্রিক ধর্মের সাক্ষাৎ ঘটিল। ...বাঙালীর সমস্ত ইতিহাসই হয়তো এই তান্ত্রিক সাধনার ইতিহাস। তাহারই উপর নানা মতবাদ চলিয়াছে, সাধনা পরিবর্তিত হয় নাই। বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব, ইসলামীয় দরবেশ, সুফী—বাঙালীর অধ্যাত্ম-জীবন কত কী আকার লইতেছে। কিন্তু মূলে তন্ত্র-সেই শতমিশ্রিত জাতের সুগুপ্ত সাধন-পদ্ধতিই মূল। অমিত যাহা শুনিয়াছে, বুঝিয়াছে, তাহা বলিত; যে অন্ধকার স্রোতের উপরে কোন চিহ্ন পাইতেছে না, তাহার কথা আলোচনা করিত। ব্রজেন্দ্রবাবুর ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার জীবন মনে পড়িতেছে—হিন্দুর সামাজিক ইতিহাস। তাঁহার দীর্ঘশ্বাস পড়িত। তিনি অমিতকে বলিতেন, 'যা করবার অমিত, এইবেলা। পরে বরং তাকে যাচাই করবে, ভাঙবে, গড়বে, কাটছাঁট করবে। নইলে দেখবে, নানামুখীন কাজে সব ফিকে হয়ে যাবে।'

বাসে অমিত ভাবিতেছিল—নানামুখীনই আজ অমিতের জীবন। এই তো অপূর্ব সেই একই কথা বলিতেছিল—'কেন নিজের অপচয় করছো? কার ওপর তোমার এই প্রতিশোধ তোলা? কেন এই আত্মদ্রোহ? এই আত্মঘাতী ভাব-বিলাসিতা?'

কাহার উপর?—কাহার উপর?—অমিতের কি মনে পড়িল, হাসি পাইল। অপূর্ব ওরা ভাবে cherceez la femme। হয়তো ওরা তাহাকে খুঁজিয়াও বাহির করিয়াছে। কাহাকে? বছর তিনেক পূর্বে হইলে ভাবিত—সুমিতা। ছয় মাস পূর্বে—সবিতা। আরও সাহস থাকিলে মনে করিত—মনে করিত—হাঁ, মনে না করিবে কেন? মনে করিত, ইন্দ্রাণী। অমিত কথাটা মন হইতে সরাইয়া দিয়া বলিল, আর আজ হয়তো অপূর্ব বলিতেছে, মিস বসু।

অমিত নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এদের কোন অনুমানে কি সত্য আছে অমিত?' নিজেই তাহার জবাব দিল, 'এক বিন্দুও না।' কিন্তু মনের একটি গোপন কোণে যেন অমিত নিজেকে প্রশ্ন করিল, 'নেই? তুমি তা হলে কত দুর্ভাগ্য হতে অমিত? ...কিন্তু না, না সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের বিচার থাক,—থাক, এসব থাক—তুমি ইতিহাসের ছাত্র, মানবভাগ্যের দ্রষ্টা।'...

অপূর্ব আজ রাগ করিয়াছে, বোধহয় সুহৃদের নিকট কিছু শুনিয়া থাকিবে। সুহৃদ নিজে বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে—'কেন তোমার এই আত্মদ্রোহ অমিত?'

সত্য সত্যই অমিতকে উহারা চিনে না। উহারা মনে করে, অমিত নিছক একটি শিল্পানুরাগী লোক। কেহ মনে করে, অমিত ইন্‌টেলেকচুয়াল্; আইডিয়ার

পসরা মাথায় লইয়া ফিরি করাই তাহার জীবিকা হওয়া উচিত। ব্রজেন্দ্রবাবু মনে করেন, অমিত একটি ডেডিকেইটেড্ স্পিরিট্। জীবন তাঁহাকে ঠকাইয়াছে, কিন্তু নবযুগের এই ব্রজেন্দ্রদের যেন আর সে ঠকাইতে না পারে ইহাই তাঁহার কামনা। অপূর্ব মনে করে, অমিত তাহার নিজ জাতের, হোক একটু নীচুকার পর্যায়ের, তবু অমিত সাহিত্যিক, সাহিত্যের প্রেরণা লইয়াই জন্মিয়াছে।

*   *   *

তখন ডাণ্ডীর যাত্রা শুরু হইয়াছে—অপূর্ব অমিত দুজনেরই মন দোদুল-দোলা খাইতেছে। এক সপ্তাহ তাহাদের চোখে ঘুম নাই, কেবল তাহারা নিজেদের পথ খুঁজিতেছে। একদিন অপূর্ব কহিল, ওসব বাজে। আমাদের কাছে শুধু বাজে নয় অমিত, ওসব আমাদের জগতের বাইরেকার জিনিস। আমরা সাহিত্যিক, আমাদের কাজ সৃষ্টি, আমাদের কাজে এসব কোলাহলের কোনো মূল্য নেই। সত্যকার জীবনবোধের দিক থেকে এগুলো বরং ক্ষতিকর—মনকে বিক্ষিপ্ত করে। কিন্তু আমাদের আসন হল ধ্যানের আসন, বক্তৃতার মঞ্চ নয়।...

ভাবিয়া আজ অমিতের হাসি পাইল। কিন্তু অমিতকে উহারা চিনে, জানে, ভালবাসে—অমিত তাহা অস্বীকার করিতে পারে না।···তুমিও এই সব কিন্তু ভালবাসো অমিত। গানে, বিশেষ করিয়া তার ধ্রুপদে, তোমার সম্মুখে যেন সহস্রস্তম্ভ, সহস্রদ্বার দেবমন্দির খুলিয়া যায়; এলিফ্যান্টার ত্রিমূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া তুমি আপনার অস্তিত্ব বিস্মৃত হও, এস্কাইলাস বা সোফোক্লিস পড়িতে পড়িতে এথেন্সের সমুদ্রস্তনিত বেলাবালুকায় বা একিপোলিসের এথেনা-মন্দিরতলে তুমি লুটাইয়া পড়ো; বাঙালীর ইতিহাস অনুসন্ধানে তোমার মনের অন্তঃপুরে প্রেমিকের প্রেমাকাঙ্ক্ষার মতো এক সুগভীর পবিত্র নিষ্ঠা জাগিয়া উঠে; শেক্সপীয়র খুলিয়া এখনও তুমি জীবনের সত্য জিজ্ঞাসার উত্তর পাও। . অমিত, তোমার বন্ধুরাও তোমাকে ভুল দেখে নাই। সত্যই তুমি জীবনের পরিচয়কে বিকৃত করিয়া ফেলিতেছ—সত্যই তুমি আত্মভ্রষ্ট—তুমি আত্মদ্রোহী।

*   *   *

অমিতের মন শিহরিয়া উঠিল। এই অমঙ্গলময় চিন্তা দুই-একবার দিনের মধ্যে তাহাকে নাড়া দেয়। তখনই সে মনের চোখ মুদিয়া এই চিন্তাকে এড়াইতে চেষ্টা করে।

অমিত তাই মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

তোমার সমস্ত ইতিহাস-চর্চার, সমস্ত বাস্তব-দৃষ্টির এই পরিণাম, অমিত? শেষে তুমি সস্তা মেটাফিজিক্যাল ফিলজফি ও সেন্টিমেন্টালিজমের চোরাবালুতে আটকাইয়া যাইতেছ? তুমি না মানবেতিহাসের পৌর্বাপর্যের মধ্য দিয়া সমাজ-বিকাশের গতিচ্ছন্দকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছ? তুমি না মানব-মহাকাব্যের বিপুল কাহিনীর প্রেক্ষাপটে এই যুগের অবসান-প্রায় ও সমাগত-প্রায় অধ্যায়টিকে পড়িয়া লইয়াছ? বুঝিয়াছ, পৃথিবীর নাড়ীতে নাড়ীতে কেন নবজন্মের সুতীব্র বেদনা, মানুষের চক্ষে কেন এত আশা, এত অস্থির ব্যাকুলতা? তুমি না সমস্ত জানিয়াই সমাগত বিপ্লবের

স্বাগতসম্ভাষণ গাহিবার স্পর্ধাকে নিজের পরিচয় বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছ? এই এতবড় সমগ্রবোধের পিছনে সমাজ-বিজ্ঞানের ও ইতিহাসের এমন ব্যাপকদৃষ্টির ফলে, শেষে কিনা তুমি এমন করিয়া বিচলিত হও! ভাব, নিজের পরিচয় বুঝি তোমার গুলাইয়া গেল। তোমার পরিচয় অমিত, তুমি কি জান না, কিসে তোমার পরিচয়?—উদয়-সূর্যের সম্বর্ধনায়—নিশীথের তিমির-পার হইতে সবিতারই আহ্বানে।...

'জীবনের পরিচয় রেখে যাও।'—অমিত তাহা রাখিয়া যাইবে বই কি। হ্যাঁ, গ্রন্থের পাতায়ও রাখিয়া যাইবে। সে তো শৈলেন নয়। একটু সময় পাইলেই সে পরিচয় রাখিতে পারিবে—একটুকু মাত্র সময়। জোর তিন-চার মাস। এই ঝঞ্ঝাটগুলি মিটাইতে পারিলেই সে আপনার মনীষার ঋণ চুকাইয়া দিবে; বন্ধুদের দাবি মিটাইবে; অন্তরের দি স্টিল স্মল ভয়েস্ আর কহিতে পারিবে না—'কোথায় তোমার পরিচয়-পত্র অমিত?—তোমার যে পরিচয় একান্ত তোমার—সমাজ-পরিপুষ্ট অমিতের নয়, একটি বিচিত্র সত্তার?'

দশ

কেমন একটা ভিড় পথের চারিদিকে বাড়িতেছে—তাকাইলেই তাহা অমিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অমিত বাঁচিয়া গেল, আর সেই দ্বিধাময় চিন্তার পীড়ন সহ্য করিতে হইল না। ব্যাপার কি? লোকগুলি কেন এমন উত্তেজিত মুখে দাঁড়াইয়া আছে? বাসের আরোহীদের কন্ঠে একই প্রশ্ন—'কি হয়েছে মশাই?' কিন্তু মশায়দের কেহ ঠিক উত্তর দিতে পারিল না—হস্তপদ ছুঁড়িতে লাগিল। একজন কহিল, 'গুলি চলেছে সামনে' 'গুলি'! কেন? 'শোভাযাত্রা'—বে-আইনী জনতা। অমিতের মাথার মধ্য দিয়া বিদ্যুতের ঝলক খেলিতে লাগিল। অমিত বাস হইতে নামিবার জন্য উঠিল। কিন্তু বাস থামে না, বৃথা সে ঘন্টা দিতেছে। সম্মুখের জনতা হঠাৎ "ওই" "ওই" বলিয়া দৌড়িতে শুরু করিল—বাস গতি বাড়াইয়া দিল।—এক মিনিটের মধ্যে প্রায় পথ পরিষ্কার,—শুধু ফুটপাথে পলায়মান ত্রস্ত পথিকদের উপর একদল গোরা সার্জেন্ট ব্যাটন চালাইয়া তাড়া করিয়া আসিতে লাগিল। মিনিট তিন-চার পরে রক্তমুখো, ঘাতকের মতো বীভৎস-দৃষ্টি গোরারা ফিরিয়া গেল। ফুটপাথে পড়িয়া রহিল তিনটি রক্তাক্ত দেহ, হত-চেতন পথিক—দুইটি দরিদ্র কেরানী-শ্রেণীর দুর্বলদেহ প্রৌঢ়, আর একটি হয়তো সাধারণ কলেজের ছাত্র।

চোখের সম্মুখে কাণ্ডটা অমিত দেখিল। বারে বারে ঘণ্টা দিল, বাস থামিল না। তারপর বাস পৌঁছিয়া গেল শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কোণে হ্যারিসন রোডে। সম্মুখে সাঁজোয়া গাড়ি, এক শত গজের মধ্যেও জনপ্রাণী নাই। পার্শ্বেই একটা কালো কয়েদী-গাড়িতে জনকয় খদ্দরশোভিত পুরুষ। বাসটা দেখিয়া তাহারা একবার

চেঁচাইল। কিন্তু বাসচালক মূর্খ নয়, এঞ্জিনের শব্দে চীৎকার দাবাইয়া তাড়াতাড়ি সে বাহির হইয়া গেল।

মেয়েদের শোভাযাত্রা সওয়ার পুলিসে ঘেরাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে। কোথায়, কেহ জানে না। পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে---যাহার যেমন ইচ্ছা বলিল। পুলিস গ্রেপ্তার করে নাই---কেহই গ্রেপ্তার হয় নাই। অমিত শুনিয়া আশ্বস্ত হইল। ইন্দ্রাণীর পরিচালিত শোভাযাত্রা আর অবশ্য দেখা হইল না। অমিত যেন তবু একটু আশ্বস্ত হইল---তাহারা চলিয়া গিয়াছে, নির্বিঘ্নেই পুলিসের বাহিনী অগ্রাহ্য করিয়া সসম্মানে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ...গৌরবোৎফুল্ল ইন্দ্রাণীর তেজোদৃপ্ত মুখ অমিতের চোখে ভাসিতে লাগিল---রাত্রিতে সে উহা নিশ্চয়ই দেখিবে, নিশ্চয়ই শুনিবে---'তুমি এলে না অমিত। তোমার ওপর রাগ করেছি, ভয়ানক রাগ করেছি। কোথায় ছিলে? সওয়ার ফৌজ এল, সাঁজোয়া গাড়ি এল---ভেদ করে আমরা পতাকা নিয়ে ছুটে চললাম, রক্তমুখো মেণ্ড সাহেব হাঁকছে, 'স্টপ দ্যাট, স্টপ দ্যাট'---ঠেলে চললাম আমরা' অমিত শুনিবে---রাত্রিতে একবার নিশ্চয়ই শুনিতে যাইতে হইবে ইন্দ্রাণীর সগর্ব সে বর্ণনা।...

অমিতের মুখে এক মুহূর্তের জন্য রক্ত ফিরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তখনই মাথায় রক্ত চাপিয়া বসিল। চোখের সম্মুখে জাগিল সেই প্রৌঢ় রক্তাক্ত-দেহ ভদ্রলোক দুইটির ছবি, আর সেই কালান্তক যম-সম সার্জেন্টদের চেহারা। ইন্দ্রাণী কোথায় গেল? দেখিয়াছে তাহারা এই দৃশ্য? তাহাদের শোভাযাত্রা যে আঘাত পায় নাই, সে আঘাত অপরের উপরে দ্বিগুণ হইয়া পড়িতেছে---দেখিয়াছে কি তাহা তাহারা? এই রক্তমুখো ঘাতকদের দেখিয়াছে? সমস্ত শক্তি দিয়া ইহারা মারে---মারিয়া ফেলিবার জন্যই মারে। খুনীর রূপ অমিত এই দেখিল আজ! বীভৎস! মানুষের মুখ এইরূপ হইতে পারে---এত রক্ত-লোলুপ, এত মনুষ্যত্ব বর্জিত?

অমিতের রাগ হইল। কেন সে আগে এখানে পৌঁছিতে পারিল না? কেন সে আবার বাসের ভিতর বসিয়া রহিল? কেন? একবার সে নিজেকে বুঝাইল ---বাহির হইলেই বা কি হইত? মাথাটি যাইত, এই পর্যন্ত। তাহা ছাড়া তোমার অন্য কাজ আছে---সুনীল রহিয়াছে, দীনু রহিয়াছে, মোতাহেররা রহিয়াছে, ইন্দ্রণীর মতো একটি মানুষেরও চাই তোমার কাছে পথ-জিজ্ঞাসা।

অমিতের মন মানিল না, ব্যঙ্গভরে কহিল, আরও আছে, নবম শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস, না? তুমি সাহিত্যিক, না? তোমার জীবনের পরিচয় রাখিয়া যাইতে হইবে না? গণবিপ্লবের নূতন সূর্যের উদয়-বন্দনা গাহিতে হইবে, না? ---কাওয়ার্ড! কাওয়ার্ড অ্যাণ্ড চীট!

* * *

হঠাৎ একদল রাস্তার ছোকরা বাস ঘিরিয়া দাঁড়াইল---চেঁচাইতে লাগিল, 'নেমে পড়ুন, নেমে পড়ুন।' কেন? 'সার্জেন্টরা লোকদের ঠ্যাঙাচ্ছে।' কিন্তু তাহার কি এই প্রতিবিধান? এই প্রশ্নেরই বা কে উত্তর দেয়? ছোকরার পাল ছোট ছোট লাঠি

দিয়া বাসের গায়ে আঘাত করিতে লাগিল, নানারূপ চীৎকার করিতে লাগিল—যেন একটা পরমোৎসব লাগিয়াছে। ইহাদের অঙ্গভঙ্গি দেখিলে হাসি পায়, অমিতেরও লজ্জা হয়। অপূর্ব থাকিলে বলিত, 'এসব বাজে লোকের সঙ্গে তুমি চাও মিলতে, অমিত? এদের কোনো জ্ঞান নেই।'

বাস চলিল। অমিতের আবার অপূর্বের উপর ক্রোধ হইল। অপূর্ব একদিন বলিয়াছিল, 'মিসেস চৌধুরীর কথা বলছো? তাঁর জেল হওয়াই উচিত। দেখতে যেমন বিশ্রী!' এই তো অপূর্ব! ইহার সহিত অমিতের কি যোগ আছে?...

* * *

না, অমিতকে তাহারা চিনে না, জানে না। তোমার পরিচয় কেহই পায় নাই অমিত। শুধু উহারা নিজ নিজ মনগড়া একটা রূপ আঁকিয়া তাহাই তোমার পরিচয় বলিয়া নিজেরা স্থির করিয়া লয়। আর মূঢ়ের মতো তুমিও তাহাতে খুশি হইয়া উঠিয়াছ। না অমিত, তুমি শিল্পানুরাগী নও। স্পষ্ট উহাদের বল, তুমি উইটি নও, কালচারিস্ট নও, ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কমিউনিস্ট নও, সাহিত্যিক নও, ডেডিকেইটেড্ স্পিরিটও নও;—তুমি ইহার কিছুই হইতে চাও না। তুমি সাধারণ—অতি সাধারণ বাঙালী, যাহার অদৃষ্টে এমনই লাঞ্ছনা আজ সাধারণ ঘটনা। সে ভাগ্যলিপি স্বীকার করিয়া লও, সেই লাঞ্ছনা উহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গ্রহণ করো অমিত। উহাতেই তোমার দেহের তৃপ্তি, তোমার প্রাণের আরাম, তোমার আত্মার মুক্তি। অমিত, ফিরিয়া যাও, ফিরিয়া যাও—ওই রক্তরঞ্জিত পশুলীলার সম্মুখে একবার ফিরিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াও—চুপ করিয়া মাথা পাতিয়া ওই লাঞ্ছনা গ্রহণ করো। ফিরিয়া যাও।

* * *

কিন্তু বাস শিয়ালদহের মোড়ে আসিয়া গেল। ডেলি-প্যাসেঞ্জারেরা তেমনই ছুটিয়াছে। হাতে একজোড়া কপি ঝুলিতেছে, কিংবা ভাঁজ-করা খবরের কাগজ। ইহাদের নিকট তো সাধারণ বাঙালীর এই গ্লানিকর লাঞ্ছনা এত বাস্তব নয়,—বাস্তব হইতেই পায় না।...তোমার কেন এইরূপ হইল অমিত?...তুমি ডেলি-প্যাসেঞ্জার নও? জীবনের পথে তুমি তীর্থযাত্রী।...তীর্থযাত্রী...কই, সুহৃদ তো এই লাঞ্ছনার জন্য বায়োস্কোপের টিকিট ফেরত দিবে না; শৈলেন শ্বশুরগৃহে আহার্য বর্জন করিবে না; সাতকড়ি বরানগরে সন্ধ্যার উৎসব মুলতুবি রাখিবে না; অপূর্ব নিশ্চয়ই জীন্‌সের 'মিস্টিরিয়াস ইউনিভার্স' হইতে নূতন গল্পের উপকরণ খুঁজিতে ভুলিয়া যাইবে না। ইহাদের নিকট তো সাধারণ বাঙালী-জীবনের এই গ্লানিকর লাঞ্ছনার অস্তিত্ব নাই। ইহাদের অনুভূতির তীব্রতা কি করিয়া ভোঁতা হইল?—সংসার?

সংসার, সংসার!

সংসার সকলকেই ডেলি-প্যাসেঞ্জার করিয়া ছাড়ে—কাহাকেও আর পিল্‌গ্রিম্ থাকিতে দেয় না।...কিন্তু তীর্থের পথ কি শুধু বাংলা দেশ বা ভারতবর্ষেই মুক্ত

হইয়াছে? এ গ্লানি তো বাঙালীরও একা নয়। সার্ বিপুলানন্দও বাঙালী; এই গ্লানি তাঁহাকে স্পর্শ করে? আবার, সাংহাইয়ের পথের উপরে চিয়াংকাইসেক যে সহস্র সহস্র তরুণ-তরুণীর ছিন্নদেহ সাজাইয়া রাখিতেছে, সেখানেও কি এমনিই গ্লানি আকাশের তলে জমিয়া উঠে নাই? গ্লানি আজ মানুষের, গ্লানি মানবসভ্যতার। সে আপনার পথ আপন বাধায় পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে, তীর্থের পথকে করিয়াছে রুদ্ধ।...

না না, অমিত, তুমি তীর্থযাত্রী, ইহাই তোমার পরিচয়। চাই না অন্য পরিচয়। পৃথিবীব্যাপী যে তীর্থের পথ গিয়াছে, তুমি তাহারই যাত্রী, অমিত, তেমনই তোমার যাত্রা।...

সেই নন্দলালের আঁকা 'বাপুজী'! ..শুষ্ক কঠিন দেহের সেই সজীব দৃঢ়তা---অমিতের চোখের সম্মুখে সে চিত্র ফুটিয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিল---দুর্ভেদ্য দৃঢ়তা, দ্বিধাহীন দৃঢ়তা---তীর্থযাত্রীর মূর্তি। এই দেশে এই মুহূর্তে এই পথ কি তোমারও জন্য?

মনে পড়িল, সুনীল শুনিলে হাসিয়া উঠিত, বলিত---বাপুজী! 'বানরসেনা!' ---যেমন সেনা তেমনই সেনাপতি।

বালক সুনীল!---অমিত মনে মনে মাথা নাড়িয়া কহিল---অশান্ত উদার বালক। আপনার অনুভূতির সুতীব্র দ্যুতি তাহাকে ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে। সে পথও দেখে না, দেখিতে চাহেও না; সতীর্থ পথিককে চিনিবে কি করিয়া? সার্চ-লাইটের আলোকফলা যেমন চোখ ধাঁধিয়া দেয়---দুই পার্শ্বের ছোটবড় স্নিগ্ধোজ্জ্বল সমস্ত প্রদীপ-জ্যোতিকে তিমিরে লেপিয়া ফেলে---সামনের পথটাকে অতি-দীপ্তিতে দুর্গম করিয়া তোলে---সুনীলের পথ তেমনই আলোক-বিচ্ছুরিত। যে আলোকে পথ ভুল হয়, ইহা সেই আলোক---সেই নয়ন-ধাঁধানো, চেতনা-বিভ্রান্তকারী অস্বাভাবিক আলো; তাহার পার্শ্বে আঁচলে প্রদীপ ঢাকিয়া যে চলিয়াছে ধীরপদে, সেই হয়তো পথ দেখিতেছে স্থির।...

কে জানে কাহার পথ ভুল? কিন্তু তীর্থের পথে হাত মিলাইতে হইবে, ইহাই বড় কথা। অমিত, তুমি তীর্থযাত্রী---অমিত, ইহাই তোমার পরিচয়। সেই পরিচয় রাখিয়া যাও। দেরি করিও না---নানামুখীন চেষ্টায় নিজের শক্তির অপচয় করিও না!

* * *

সুকিয়া স্ট্রীট সে আসিয়া গিয়াছে। অমিত বাস হইতে নামিল। মাত্র দুই মিনিটের পথ---অমিত হনহন করিয়া পরিচিত পথে অগ্রসর হইয়া চলিল।

* * *

তীর্থের পথকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই---এবার মানিয়া লও---ছবি, গান, সাহিত্য-চিন্তা, এই সকল দিয়া নিজের সত্তাকে আর ভুলাইবে না।...সত্তা অমলিন হইলে তাহাকে এইরূপে ভুলাইয়া রাখা সম্ভবও নয়।...চিন্তার মুক্তি?

চিন্তার মুক্তি কর্মে—কর্মই চেতনার মোক্ষ। প্রাণ কর্ম প্রেরণায় আপনা হইতে উৎসারিত হইয়া পড়ে—সে প্রাণ শুকাইয়া আসিলেই মানুষ চিন্তার মধ্যে সান্ত্বনা খোঁজে। চিন্তা কিছু নয়—প্রাণের একটা পরাজয় মাত্র।

* * *

ব্রজেন্দ্রবাবুর বাড়ি। একেবারে উপরে উঠিয়া যাইতে হইল। এই বাড়িতে অমিতকে সকলেই চিনে---মাঝে মাঝে দেখিয়াছে। বাবুর সে স্নেহভাজন সঙ্গী। একবার ছোড়দিদি সবিতার সঙ্গে ইহার বিবাহের কথাবার্তাও উঠিয়াছিল। বাবুর একান্ত ইচ্ছা ছিল; সকলেরই মত ছিল; কিন্তু ভবঘুরে ছেলেটিই পাশ কাটাইয়া গেল---বিবাহ আর হইল না। সবিতার বিবাহ হইল একটি বিলাতযাত্রী ডাক্তারি-পরীক্ষার্থীর সঙ্গে।

অমিতকে লইয়া চাকর উপরে চলিল। অমিতের এবার হঠাৎ মনে পড়িল---তাহার চোখ-মুখ হয়তো স্বাভাবিক নাই। মাথার চুলগুলি কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে---হাতে ঠেলিয়া দিতে গিয়া মনে পড়িল---আজ আবার স্নানও করা হয় নাই। মুখেও সমস্ত দিনে সাবানের স্পর্শ ঘটে নাই। নিশ্চয় কলিকাতার ধোঁয়া ও কালি দুই-এক পোঁচ জমিয়াছে। যদি ব্রজেন্দ্রবাবুর দৃষ্টিতে পড়ে? না পড়িবারই কথা; একে সন্ধ্যা, তাহাতে বৃদ্ধ ক্ষীণ দৃষ্টি। কিন্তু,---একটু স্বচ্ছ গোপন আনন্দে তাহার মন সচকিত হইল---কিন্তু বাড়িতে অন্য লোকও তো আছে। ---অন্য আর কে? তাঁহার মেয়েরা। তাহাতে অমিতের কি? তবু---তবু তাহারাই বা কি মনে করিবে? মনে করিবে, সে নিতান্তই বর্বর, উজবুক।

ব্রজেন্দ্রবাবু কহিলেন, তোমাকে আসতে বলেছিলুম একটু কাজে; কিন্তু কাজ আজ হবে না। আমার দু-একটি বন্ধু খানিক পরেই এসে যাবেন। তাঁরা সবাই আমার সহযোগী সরকারী কর্মচারী ছিলেন। এখন পেন্শন নিয়েছেন, মাঝে মাঝে গল্পগুজব করতে এক একজনের বাড়িতে সমবেত হন। আজ আসছেন আমার এখানে। তোমাকে দিয়ে কাজটা আজ করানো হল না। আর একদিন তোমায় আসতে হবে। আজ বরং ওঁদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবো, দেখবে, কয়েকটা পাসিং স্পেসিমেনস! ওদের মধ্যে দু-একজন কিছু কিছু লিখেছেনও। একজন অনুকূল দত্ত---ছদ্মনামে দুখানা আইনের নোট লিখেছেন। ল-এর ছেলেদের মহলে বেশ কাটতিও। আর একজন বঙ্কিম চাটুজ্জে---লিখেছেন দু খানা উপন্যাস। তোমার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় থাকা মন্দ নয়। তবে মাঝে মাঝে বিরক্ত করবে ---লেখা পাঠিয়ে বলবে, তোমাদের কাগজে ছাপাও। ছাপতে দেরি হলে আবার মনে মনে রাগ করবে---দেরিটা লেখকের প্রতি অবিচার এবং সম্পাদকের মূঢ়তার ও স্টুপিডিটির দৃষ্টান্ত।

প্রশান্তমুখে একটু কৌতুকের হাস্য ফুটিল। অমিতও হাসিল। ব্রজেন্দ্রবাবু কহিলেন, একেই তো জানো, আমরা সরকারী চাকুরে। মফস্বলে হাকিমী-জীবন কাটিয়ে নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধিতে অপরিমিত গর্ব অনুভব করতে অভ্যস্ত।

অমিতের মনে পড়িল...শৈলেন...শৈলেন মোটা হইয়া উঠিতেছে।

* * *

ব্রজেন্দ্রবাবু বলিলেন, পরে দেখি, পেন্‌শন নেওয়ার শেষে কেউ মুখ তুলে তাকায় না। তখন দুনিয়াটাকে মনে করি স্টুপিড অ্যাণ্ড আনগ্রেইট্‌ফুল। এর পরে আবার যদি সংবাদপত্রে লিখি আর তোমরা মনে করো, তা তেমন জরুরি নয়—তা হলে তোমাদের কি করে ক্ষমা করবো।

অমিত কহিল, ক্ষমা কেন করবেন? কোনো লেখকই কি আমাদের স্টুপিড ছাড়া অন্য কিছু মনে করেন? যদি একটা দিনের ডাকও আপনাকে একদিন দেখাতে পারতুম, আপনি সাহিত্যিক বা লেখক জগতের আর একটা মানসিক মাপকাঠি পেতেন। সাধে কি মহীধর রাগ করে বলে, দি ভ্যানিটি অব এ পীকক্‌ অ্যাণ্ড দি ম্যালিভ্যালেন্স অব অ্যান ওল্ড মাংকি কমবাইণ্ড উইথ এ ডিভাইন অ্যাক্‌সিডেন্ট, দি গিফ্‌ট্‌ অব এক্সপ্রেশন্‌, মেইক্‌ এ লিটর‍্যারি ম্যান।

ব্রজেন্দ্রবাবু কহিলেন, না হে, না, অতটা সিনিক্যাল এস্‌টিমেইট্‌ও করো না। ভুললে চলবে কেন, তাঁরাই মনীষী, বেস্ট থিংকার্‌স্‌।

যদি তাঁদের চিন্তা আর একটু শুদ্ধ বাংলায় ও সহজ ইংরেজীতে লিখতেন তা হলে না হয় এই দাবিটার আলোচনা চলতো।

ব্রজেন্দ্রবাবু কথাটির তীব্রতায় একটু চমকিত হইলেন, বলিলেন, হ্যাঁ, দেখো, কথাটা আমারও মনে হয়েছে। আধুনিক লেখকদের অনেক লেখা আমি কয়দিন পড়েছি। সম্প্রতি স্পেঙ্গলার পড়ার পর থেকেই আমার ইচ্ছা ছিল, আমাদের দেশের বর্তমান যুগের শিক্ষাদীক্ষার রূপ ও প্রেরণাকেও আমাদের বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। জীবনে তো কিছুই করতে পারি নি, তবু আমাদের পুরনো দিনের সভ্যতার একটা রূপ আমার মনে যেন দেখতে পেয়েছি। তারই সঙ্গে তার একালের রূপের তুলনা করতে সাধ গেল। একেবারে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে দেখতে চাইলাম তোমাদের বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের বাংলা দেশকে—দেখলাম তোমাদের এই সমরোত্তর বাংলা সাহিত্য ও চিন্তা। কতকটা পড়লাম—তোমাদের খানকয় বাংলা নভেল ও কবিতা দেখলাম। অন্যরূপ বই তো বাংলায় লেখা হয় না—হয় কি? দু-একটা সাহিত্যিক প্রবন্ধ—সে তো আরও হিজিবিজি—একেবারেই অস্পষ্ট; কেবলই উচ্ছ্বাস। 'রবীন্দ্র জয়ন্তী' হচ্ছে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ওপরে পর্যন্ত একটা সত্যিকারের সাহিত্য বিচার কোথায় খুঁজে পেলাম না। নলিনীকান্ত গুপ্তের লেখা চিন্তার কুয়াশায় ও স্টাইল-এর বক্রতায় বুঝে ওঠা শক্ত—তা ছাড়া, ও লেখা ধ্বনি নয়, অরবিন্দেরই প্রতিধ্বনি। সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় অজস্র ডীটেইল্‌স্‌—গাছ চিনতে চিনতে বনের রূপ আর চোখে পড়ে না। কি উৎকৃষ্ট, অদ্ভুত ঢঙ তোমাদের অভিজাত সাহিত্যের। না, চিন্তার বা লেখার কোনো স্টাইল নেই। তবু স্বচ্ছতা, প্রাঞ্জলতা দেখলাম অতুল গুপ্তের কাব্যালোচনায়। কিন্তু তিনিও তো মধ্য-জেনারেশনের—পশ্চিমের আকাশেই এসে পড়ছেন; আর

তার বড় চিহ্নই হল তাঁর পূর্বাকাশের দিকে, পুরনো ভারতীয় কাব্য-জিজ্ঞাসার দিকে অত লোলুপ ও মোহের দৃষ্টিতে তাকানো। প্রমথ চৌধুরী---চিন্তা ও লেখার ধার ক্ষয় হয়ে আসছে, অথচ কথা তোমরা তাঁকে বলাবেই; তাই বলবার তাড়াতেই তাঁকে বলতে হয়। এ কি কম জবরদস্তি লেখকের ওপর—আর পাঠকের ওপরও? নতুন লেখক কই? পাতার পর পাতা পাতিপাতি করে খুঁজলাম, গল্পগুলি পর্যন্ত পড়লাম। যেগুলো বুঝলাম, সেগুলোতে বোঝবার কিছুই নেই। যা বুঝলাম না, সেগুলো গল্প নয়, তা স্পষ্ট। হয়তো স্কেচ, হয়তো একটা ঢঙ, একটা বিশেষ 'পোজ',---যা পাঠকের চোখে পর্যন্ত 'পোজ'ই থেকে যাচ্ছে। সবাই বলছে প্রেম, প্রেম, প্রেম। কেউ কেউ তা বলছে বেশ তাল ঠুকে, কেউ বলছে বিনিয়ে বিনিয়ে। এত প্রেম কেন বলে ওরা? বাংলা দেশের জীবনে তা নেই বলে কি? কেউ আবার ভয়ানক সিনিক্যাল, যেন তাদের জীবনের পুঁজি সব উজাড় হয়ে গেছে, যুগ-যুগের জুয়াচুরি ধরা পড়েছে। কিন্তু সেটাও এতই মিথ্যা যে, তাকেও মূল্য দিতে পারছি না। আমার কাছে তো ধরা পড়ছে বরং তাতে তাঁদের বর্ণচোরা সেন্টিমেন্টালিজম্। আমি তো নতুন যুগের আর কোনো সুস্পষ্ট রূপ ধরতে পারি না---আমার অবশ্য পরিচয়ও বেশি নেই। তোমরা তো খবর রাখো---বলতে পারো, এই যুগের মেইন্ টেন্‌ডেন্‌সিগুলো কি? এই কথা-টার জন্যেই তোমাকে প্রধানত ডেকেছিলাম। দিন পাঁচ-সাত আগে আমি ইগন ফ্রিডেইল নামে একজন লেখকের 'এ কালচার অফ দি মডার্ন এজ' পড়েছি। আমাদের দেশে এই 'মডার্ন এজ' এসেছে অল্পদিন—শ'খানেক বছর মাত্র। তার আগেকার দিকটা আমার কতকটা চেনা আছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পরে ক্রমশই তা আমার থেকে দূরে সরে গেছে—আমি রইলাম জমির স্বত্ব, খাজনা, বাকি-বকেয়ার মামলায় বদ্ধ হয়ে।

ব্রজেন্দ্রবাবু খানিকক্ষণ থামিলেন। নীরবে ব্যর্থ অতীতের ম্লান দিগ্বলয়ের দিকে চোখ মেলিয়া বসিয়া রহিলেন। ধীরে অমিত কহিল, এই 'মডার্ন এজ' জিনিসটাকে আমি আর ওভাবে দেখি না, সে তো আপনাকে বলেছি। কলেজের ইতিহাসে রেনেসাঁস, রিফর্মেশন ও আমেরিকা-আবিষ্কার থেকে ওর সূচনা লেখা হয়, তাই অনেকদিন জানতাম। সেদিক থেকে দেখলে আমাদেরও মডার্ন এজ রামমোহনী রেনেসাঁস, ব্রাহ্মসমাজী রিফর্মেশন ও বিবেকানন্দীয় 'কাউন্‌সিল অব ট্রেন্ট' দিয়ে গণনা করা যায়---গোটা উনবিংশ শতাব্দীটা একটা নতুন মডার্নের পাতা হয়ে ওঠে। এমনই ভাবে দেখা একেবারে ভুলও নয়। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা পড়তে গিয়ে নৃতত্ত্বের ধারা খুঁজতে গিয়ে বুঝলাম, মানুষের সভ্যতাকে ঠিক চিনতে হলে চিনতে হয় তার বাস্তব ভিত্তি দিয়ে---যার ওপর মানস-ভিত্তি গড়া হয়, যে স্ট্রাক্‌চ্যার-এর ওপর ওঠে শিল্প-সাহিত্যের সুপ্যারস্ট্রাক্‌চ্যার্, বেদীর ওপর ওঠে বিগ্রহ। এই বাস্তব ভিত্তিটা জীবিকায়োজন দিয়ে তৈরি, উৎপাদনের উপকরণ দিয়ে গড়া। পাথর, তামা, লোহা; তারপর গোচারণ, কৃষি;—এমনই

করে সভ্যতা সামন্তযুগ ছাড়িয়ে এল আজ যন্ত্রবাহিত ধনিক যুগে। আমাদের দেশে সেই মর্ডান এজ, যন্ত্রযুগ দেখা দিয়েছে মহাযুদ্ধের শেষে। তার আগে আমাদের শাসকরা আমাদের রাখতে চেয়েছে কাঁচামালের যোগানদার করে আর তাদের কলের মালের খরিদ্দার-রূপে। অথচ, এদিকে পৃথিবী গিয়েছে এগিয়ে বণিকযুগের শেষ পাদে, তার ধাক্কা আমরাও পাচ্ছি—

হঠাৎ পর্দার ওপার হইতে একটি প্রশ্ন হইল, 'বাবা, খাবার?'

চমকিত হইয়া অমিত একেবারে থামিয়া গেল।

হ্যাঁ, নিয়ে এস মা।

ঘরে ঢুকিল সবিতা—হাতে খাবারের প্লেট, পিছনে চায়ের পট হাতে চাকর।

কিন্তু একবার হাত-মুখ ধুতে হবে যে আমার—বলিয়া অমিত দাঁড়াইল—অনেকক্ষণ বেরিয়েছি।

বিজলী বাতির নীচে সবিতাকে হঠাৎ বেশ লাগিল—পূর্বাপেক্ষা অনেক পরিবর্তিত। তখনকার সবিতা—সে ছয় মাস পূর্বের কথা মাত্র—ছিল আরও তন্বী, আরও একটু চঞ্চলা। কিন্তু এখন সে দেখিতে স্থির প্রদীপের মতো, তাহার দেহ ঘিরিয়া একটি স্বচ্ছন্দ ঔজ্জ্বল্য, সৌম্যশ্রী; তাহার পদক্ষেপ যেন একটা নবজাগ্রত সহজ মর্যাদাবোধ। আপনা হইতেই উহার সম্মুখে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইতে হয়। আর দাঁড়াইতেই যখন হইল, তখন উপস্থিত বুদ্ধিতে যোগাইল অমিতের এই কথাটা—

কিন্তু একবার হাত-মুখ ধুতে হবে যে আমার।

কথাটা অতিশয় খাপছাড়া, বোকার মতো শোনাইল অমিতের কানে। এতদিন পরে—ওর জীবনের এতবড় বিবর্তনের পরে—সবিতার সম্মুখে অমিতের এই প্রথম কথা। এমনিতর সামান্য অর্থহীন একটা কথা—কিন্তু অমিতের আর কিছু কি বলিবার ছিল—কোনো অর্থপূর্ণ কথা, অসামান্য কথা? কই, না। অমিত নিজেই মনে মনে বুঝিতেছে—না। তাহা ছাড়া, সবিতাই কি তেমন কথা প্রত্যাশা করিত? বিশেষ করিয়া এখন করিত? এখন, যখন একটা নূতন ঔজ্জ্বল্য ও মর্যাদা ওর দেহ-মনে বিকাশ পাইতেছে,—আর সবিতা নিজেও দেখা যায় সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন।

না না,—কিছুই বলিবার ছিল না, কিছু না।

কিন্তু তাই বলিয়া এই কথাটা ভাবিয়াও অমিত নিজের উপর খুশি হইতে পারিল না।

চাকর লইয়া চলিল। স্নানঘরে অমিত ভাল করিয়া মাথা ধুইল, সাবান দিয়া মুখ মার্জিত করিল। ইঃ! যা শ্রী হইয়াছিল—সারা দিন ঘুরিয়া না খাইয়া! লোকে কি না মনে করিয়াছে, একটা পরম গাড়ল। অথচ অমিতই আবার ছবি দেখে, সৌন্দর্য ভালবাসে বলিয়া নিজের মনেও নিজের কাছে বড়াই করে।...বেশ ভাল করিয়া অমিত মুখে সাবান ঘষিতে লাগিল, হাতে, পায়ে, গলার নীচে, কপালে। আজ সমস্ত দিন শেভ করাও হয় নাই। যেন শেভ করিলে তাহার সময় বহিয়া যাইত।...

সবিতার মুখ ভাল করিয়াও দেখা হইল না। দেখার কি দরকার? কোনো কাজ ছিল কি? কতবার দেখিয়াছে, গত ছয়মাস তো মাত্র দেখে নাই। তখন সবিতা ছিল শ্বশুরবাড়িতে, আর অমিত ছিল দারুণ ব্যস্ত। সবিতার কথা মনেই ছিল না অমিতের। না, মনেই পড়ে নাই। ছয় মাসে সবিতার এমন কি পরিবর্তন ঘটিতে পারে? কিন্তু ঘটিয়াছে। ইহাই আশ্চর্য!...

'বিবাহের জল।' সত্য কথাই, বিবাহ, জীবনযাত্রায় স্থায়িত্ববোধ, হয়তো প্রেম বা অমনই কিছু একটার প্রথম অরুণাভাস, এই সকলে জড়াইয়াই মানুষের জীবনশ্রী হঠাৎ আপনার দলগুলি মেলিয়া ধরে।...

বিবাহ একটা আলোক-বন্যার মতো, আর তাহাতেই মানুষ আপনার মুখশ্রী দেখিতে পায়; দেখিয়া একেবারে সবিতার মতো পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সবিতা এই পরিপূর্ণতার অপেক্ষায় ছিল...সকলেই প্রতীক্ষায় থাকে---যতদিন জীবনপথের অ্যানিমা বা অ্যানিমাস্-কে না পায়। জন্মজন্ম সেই দোসরকে না পাওয়া পর্যন্ত সে আধখানা হইয়া থাকে। আধখানা হইয়া থাকে বলিয়াই ঘুরিয়া মরে, দিশেহারা হইয়া ঘুরিয়া মরে, নানামুখীন কাজে জীবনের অপচয় করিয়া ফেলে।

এইবার মুখখানা অনেক তাজা হইয়া উঠিয়াছে। চোখেও পূর্বেকার তীক্ষ্ণতা নাই, বরং একটি শান্ত ছায়া আসন পাতিয়াছে।...

* * *

অমিত খাবারের প্লেট তুলিয়া লইল। সবিতা ঘরে নাই। দক্ষিণের বারান্দায় সে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে---ঘরের দিকে তাহার পিছন---মাথার ঘোমটা ছাপাইয়া এলো চুল পড়িয়াছে পিঠে। অলস একখানি হাত রহিয়াছে রেলিঙের উপর; করতলে নিশ্চয় চিবুক; শীতের নিষ্প্রভ আলোকেও লালপেড়ে শাড়ির বাহিরের অনাবৃত বাহুর আশ্চর্য মসৃণতা ও লাবণ্য চোখে পড়িতেছে।

তোমাকে যা বলছিলাম অমিত---

অমিতের চমক ভাঙিল। কি বলিতেছেন [illegible]বাবু, আর তুমি কি করিতেছ অমিত? অমিত শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইল।

তোমাকে যা বলছিলাম অমিত। তোমাদের জেনারেশনের চিন্তাধারার কোনোও স্পষ্ট রূপ কি তুমি দেখতে পাও? আমি তো পাই না। সেদিন ডৌজেল নামীয় এক লেখকের 'জার্মানি অ্যাণ্ড দি জার্মান্স্' নামে একখানা বই পড়ছিলাম, জার্মানির চিন্তাজগতেও এমনই একটা কেওস্ এসেছে। হয়তো সমস্ত পশ্চিমের জীবনেই তা দেখা দিয়েছে। তার কারণ আমি বুঝতে পারি। কুরুক্ষেত্রের পরে আমাদের সভ্যতাও পাংশু বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, খানখান হয়ে পড়েছিল। পশ্চিমের অবস্থাটা আজ অনেকটা তেমনিতর। কিন্তু আমাদের জীবনে তো যুদ্ধ নেই, যুদ্ধান্তের সমস্যাও নেই। তা হলে আমাদের জীবনে এমন রূপহীনতা, এমন বিবর্ণতা এল কেন?

অমিত সচেতন হইয়া উঠিল। অমিত অন্যান্য চিন্তা ভুলিয়া গেল।

আমাদেরও জীবনে একটা বড় সমস্যা এসেছে। আরও মুশকিল—শুধু একটা সমস্যা নয়, একটা বিষম গ্লানি এযুগে আমাদের ঘিরে ধরেছে। গ্লানিটা অবশ্য এই যুগেই প্রকট হয়েছে; নইলে তা বহুযুগেরই সঞ্চিত। পশ্চিমের ধনিকতন্ত্র বাণিজ্যলোভে এদেশে এল—সাম্রাজ্যবাদ দেখা দিলে। মুনাফাই তার প্রাণবায়ু। সে মুনাফা বজায় রাখবার জন্যে সে সাম্রাজ্যবাদ আমাদেরই দেশের শিল্প বাড়তে দিলে না, বাণিজ্য ধ্বংস করে দিলে। তাতে পশ্চিমের সমৃদ্ধি বেড়ে গেল, সভ্যতা গড়া হল। আবার তারই তাগিদে এদেশে গড়তে হল তার শোষণ-পথ, এই রেল প্রভৃতি। পৃথিবীতে ধনিক-সভ্যতার গৌরব আমাদের রক্ত শুষেই। কিন্তু শেষ পর্ব তার যখন শেষ হচ্ছে, সে সময়ে আমাদের দেশেও, যুদ্ধের পরে, সেই ধনিকতন্ত্র আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ পেল, এই তেরো-চোদ্দ বছরের মধ্যে কাপড়ের কল, লোহার কারখানা থেকে এমন কলকারখানা নেই, যা আমরা না গড়ছি, হয়তো বিদেশী অর্থও খাটছে। কিন্তু এই যন্ত্রযুগের মধ্যে গিয়ে পড়াতে আমাদের গ্রামপালিত সভ্যতা ভেঙে চৌচির হবে। হচ্ছেও তাই। এই হল এক বিপ্লব—বলতে পারি এ আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়্যাল রেভ্যালুশন্ কিন্তু এদিকে পৃথিবীতে জোর কদমে আসছে, সোশ্যাল রেভ্যালুশন্ ওঅ্যাল্ড ক্যাপিট্যালিজম্-এর যুগ নিয়ে এসেছে, ওঅ্যাল্ড স্লাম্প্, আনছে ওঅ্যাল্ড রেভ্যালুশন্। এর প্রভাবও পড়ছে আমাদের দেশে। ফলে একই কালে দুটো যুগ আমরা পেতে চলেছি। আমাদের জীবনে কোথাও আর স্থিরতা নেই, থাকতে পারে না। আপনার এখানে আসছি এইমাত্র—

অমিত সংক্ষেপে পথের ঘটনাটি বলিল। তারপর আবার, তখন সে বেশ উত্তেজিত—

এই লাঞ্ছনা আমাদের জেনারেশন্ মেদে-মজ্জায় নিয়ে বেড়ে উঠেছে। ওর তীব্রতা যে কত বেশি, তা বোঝা যায় না। এই জেনারেশনের জীবনে যা কিছু সত্য, যা কিছু নিত্য, তা তাদের রাষ্ট্রীয় কর্ম-প্রচেষ্টায় ফুটছে। সে প্রয়াস ঠিক-মতো দেখবার পক্ষে যেটুকু কালের ও স্থানের দূরত্ব দরকার, আমরা তা এখনও পেতে পারি না। তাই আমরা দেখছি এসব প্রয়াসের অসঙ্গতি, তার অযৌক্তিকতা, তার প্রবঞ্চনা, তার হাস্যকরতা। চ্যাঙড়া ছেলের দল বাস ঠেকাচ্ছে, সার্জেন্ট আসছে শুনলেই আবার পালাচ্ছে; হয়তো গলির ভেতর থেকে ছুঁড়লে ঢিল। জিনিসটা শুধু অন্যায় নয়; একেবারে হাস্যকর। কিন্তু হয়তো উপস্থিত থাকলে, ফরাসী বিপ্লবের দিনে যারা ভার্সেইতে গিয়েছিল বা রুশ-বিপ্লবে যারা সমাজ উল্টে দিলে, তাদেরও এমনই হাস্যকর কাণ্ড করতে দেখা যেত। সমসাময়িকের চোখে ট্রীজ্ বেশি ঠেকে, বনানীর রূপ দেখা সম্ভব হয় না। আমাদের চোখের অত্যন্ত কাছে থাকাতে এগুলো আমাদের চোখে বড় ঠেকে—প্রয়াসের পেছনকার মরাল ইন্স্পিরেশন বা রিয়েল কন্ডিশন্স্ আমরা ভুলে যাই। ভুল যথেষ্ট ঘটছে—উন্মত্ততার অভাব নেই; কিন্তু মোটের ওপর তাতে একটা সত্য আছে, যা আমাদের জীবনে আর কোথাও নেই—কোথাও না, কোথাও না, কোথাও না।

ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রশান্ত মুখ চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। অমিতের মুখে যেমন তাহার বাক্যেও তেমনই উত্তেজনা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সে থামিল, কিন্তু চোখে তাহার আবার জ্বালা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সবিতা বাহিরের দিকে পিছন ফিরিয়া একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতেছিল; জানিলে অমিত আবার কুন্ঠিত হইত। কিন্তু তাহার মন হইতে সবিতার অস্তিত্ব তখন মুছিয়া গিয়াছে।

ব্রজেন্দ্রবাবু কহিলেন, কিন্তু কজন যাচ্ছে রাষ্ট্রপ্রয়াসে? অল্প—অতি অল্প, জনকয়েক মাত্র। যারা চিন্তা করে, যারা সৃষ্টি করে, যারা সমাজের অন্তরের বিশ্বাস গড়ে, যারা সমাজের আধ্যাত্মিক ধন অর্জন করে, তারা তো এসবে যায় নি। তাদের কথাই আমি বলছিলাম তোমাকে। তাদের চিন্তার রূপ, কল্পনার গতি দেখছি না যে!

অমিত কহিল, চিন্তা, কল্পনা, সৃষ্টি, এখন ওসব অসম্ভব; ওসব বাজে কথা। যারা রাষ্ট্রপ্রয়াসে ভেসে পড়েনি, তারা নিজেদের ভয়কে নানারূপ পোশাক পরিয়ে নিজেদের আর অপর সকলকে ফাঁকি দেয়। কেউ হন বীরবলের অনুকরণ—'পান্'এর সস্তা রসিকতায় শব্দ গাঁথেন; ভুলে যান, এই 'নওরতনের দরবারে' আবুল ফজল, ফৈজীর আসন খালি পড়ে আছে। কেউ হন গল্প-লেখক, হয় দরিদ্রের জন্যে চোখের জল ফেলেন, না হয় দেখান প্রেমের হিস্টিরিয়া, না হয় সস্তা সিনিসিজ্ম। ও সবই আসলে আত্মপ্রবঞ্চনা, নিজেদের মন থেকে এই গ্লানি-বোধ ওঁরা ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না তাই। যারা কর্মের একটা নির্দিষ্ট ধারার মধ্যে নিজেদের জীবনকে সঁপে দিতে পারছে, তারা তো বেঁচেছে। যারা তা পারেনি, তাদের মধ্যে অর্ধেক নিজেদের মধ্যেই নিজেরা দগ্ধ হচ্ছে। তাদের জীবন অত্যন্ত নিষ্ঠুর, যেন একটা জতুগৃহ—ওরা পুড়ে খাক হচ্ছে হ্যামলেটের মতো, 'Time is out of joint. O cursed time! that ever I was born to set it right!' তাদের জীবনের ট্র্যাজেডি 'To be or not to be'. আর বাকি অর্ধেক এই ট্র্যাজেডির হাত থেকে আত্মরক্ষা করছে অ্যাট দি কস্ট অব দেয়ার সৌল—কাব্য লিখে, গল্প লিখে। এটা ইস্কেইপ্ইজ্ম্। তারা সবাই এই কথাটাই প্রমাণ করছে যে, তারা স্পিরিচুঅ্যালি নিঃসম্বল, ইমোশন্যালি ডিফাংট্, মর‍্যালি ব্যানাল্...

অমিতের স্বরে একটা আত্মগ্লানির সুর বাজিতেছিল। সে থামিল। তারপর স্বর নামাইয়া কহিল—

এযুগে চিন্তার খোঁজ করবেন না। চিন্তা আমাদের সেকেণ্ড বেস্ট সাব্স্টিটিউট্। ইট ইজ অ্যান এজ অব অ্যাক্শন। আপনি কর্মের মধ্য দিয়েই এই যুগের নৈতিক আধ্যাত্মিক রূপের সন্ধান করুন।

চা ঢালিয়া দিতে সবিতা ঘরে প্রবেশ করিল। অমিত এতক্ষণে তাহার অস্তিত্বের সম্বন্ধে পুনশ্চেতন হইয়া চমকিত হইল।

ব্রজেন্দ্রবাবু কহিলেন, কর্মই তো শেষ কথা নয়; কর্ম সভ্যতার গঠনভঙ্গির

একটি খণ্ড মাত্র। তার পেছনে থাকে চিন্তা, কল্পনা, সৃষ্টি, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য। ওসবের মধ্য দিয়ে যাঁদের সত্তার ফোটবার অধিকার, তাঁদের তুমি কর্মে লাগিয়ে দিলে হবে কি?

অমিত ধীরস্বরে কহিল, কি করে বলবো, এযুগে ওসব জিনিস সম্ভব? সৃষ্টি সম্ভব তখন, যখন প্রাণে সেই সৃষ্টি-চেতনা সহজ। শিল্প-সাহিত্য মানব সমাজের সুপ্যারস্ট্রাক্‌চ্যার, কিন্তু যে কালে সভ্যতার বনিয়াদ ভেঙে পড়ছে, নতুন বনিয়াদ গড়ে উঠতে পায়নি, তখন সেই সব সমাজ-শিখরের আর কি দশা হবে? এযুগে সৃষ্টিপ্রেরণা চিন্তার রূপ পায় না, ফোটা সম্ভব নয়; সে প্রেরণা ফুটতে পায় কর্মে। সৃষ্টি যা হবে, তাতে দেখবেন বার্ধক্যের ছাপ, আত্মচেতনার অধ্যাত্মবাদ, কিংবা নিতান্তই কাম, নিতান্তই সেক্‌সপ্রমত্ত কল্পনা। চিন্তায় নয়—কর্মে এযুগের জীবন আপনাকে প্রকাশিত করছে।

অমিত একটু থামিয়া আবার বলিল, আপনি বুঝতে পারলেন---আমার কেবলই মনে হয়, বিশুদ্ধ চিন্তা বলে কিছু নেই। চিন্তা প্রাণের ধর্মই নয়, বরং প্রাণবেগের বিরোধী। প্রাণ চায়, স্ফূর্ত হতে অর্থাৎ মূর্ত হতে। প্রাণ মূর্ত হয় একমাত্র কর্মে। যখন কর্মে তা ফুটতে পায় না, তখন কখনও কখনও সে নিজের পুঁজির খোঁজ নেয়, বুঝে দেখতে চায়, কেন ফুটতে পাচ্ছে না। এরই নাম চিন্তা---অবজেক্টিভ থট্‌—এ স্যরট্‌ অব স্পিরিচুয়াল ট্রিক্‌ টা। আবার কখনও প্রাণ একেবারে পেছন ফিরে একটা কাল্পনিক রূপজগৎ সৃষ্টি করে, তাতে কাল্পনিক কর্মে নিজেকে তৃপ্ত করে। এইটা হল সেকালের সৃষ্টি---ক্রিয়েটিভ্‌ থট্‌ এর জগৎ এ সার্ট্‌ অব স্পিরিচুয়াল্‌ নার্‌কটিক্‌স্‌। থট্‌ ইজ রিপ্রেসড্‌ অ্যাকশ্‌ন্‌।

ব্রজেন্দ্রবাবু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, তা নয় অমিত। বিশুদ্ধ চিন্তারও জগৎ আছে, তারও দাবি আছে, সে দাবি গৌণভাবে দেখলে হয়তো কর্মেরই দাবি। কিন্তু তা আসলে হচ্ছে সত্তার দাবি। বিশেষ বিশেষ পার্সোন্যালিটির ওই হল রূপ; ওটাই ধর্ম। আর স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।

অমিতের অপূর্বকে মনে পড়িল। অপূর্বের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রবাবুর কথার মিল আছে। কিন্তু অপূর্ব ঠিক এখনও এতটা অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহার মন একটা মূল্যজ্ঞানের মাপকাঠি পাইয়াছে। পাইয়াছে কি না কে জানে,---অমিত ভাবিল, তবে অপূর্ব পাইয়াছে ভাবিয়াই সুখী ও তৃপ্ত। একদিন অমিতও এমনই একটা মানদণ্ডের সন্ধান করিতেছিল--- কর্মে, চিন্তায়, জ্ঞানে, শিল্পে, জীবনের সর্বত্র, একটা মূল্য খুঁজিতেছিল---সত্যকারের মূল্যজ্ঞান আয়ত্ত করিতেছিল। কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না---শিল্প, সাহিত্য, পাণ্ডিত্য এই সবের নামে কিছুতেই তাহার সত্তা ঢাকা পড়িল না; নিজ সত্তার দাবি ও বিরাটত্বের দাবিকে একটি সমন্বয়ে আনিয়া পৌঁছাইতে পারিল না। কেন তাহা পারিল না? অমিত অনেক করিয়া ইহার উত্তর খুঁজিয়াছে, অনেকরূপে নিজের মনে বুঝিয়াছে, ভাল করিয়া বুঝিয়াছে---তাহার নিজের অপরাধ নয়। অপরাধ তাহার দেশের পারিপার্শ্বিকের, তাহার যুগের পরি-

মণ্ডলের। সে আত্মসর্বস্ব নয়, তাহার সত্তা নিজেকে চিনিয়াছে, চিনিয়াছে বলিয়াই তো সে নিজেকে কালের সহিত, কাজের সহিত, মিলাইয়া লইতে চায়। এতটুকু জানিয়াছে বলিয়াই সে জানে, নির্বিশেষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলিয়া কিছুই নাই। ইতিহাসের ছাত্র সে; সে এই কথা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। ব্যক্তিবাদ আসলে মানুষের 'ছোট আমি'র পূজা যে 'আমি' সংসারের ভয়ে, জীবিকার ভয়ে, গুরুর ভয়ে ছোট হইয়া নিজের ছোটত্ব মানিয়া লয়, status quo মানিয়া চলে। এই ভয় দূরে ঠেলিয়া ফেলিলে দেখিবে, যেখানে সত্তার সত্যকার প্রকাশ, সেখানে সত্তার অনন্ত বিরাট রূপ। শ্রেণীবৈষম্যপীড়িত এই ব্যবস্থা শেষ না হইতে মানব সত্তা সেই মহত্তর রূপ গ্রহণ করিতেই পারে না—সমাজকে পঙ্গু করিয়া নিজেরও সেই সুস্থ সম্ভাবনাকেই সে অস্বীকার করে।...'অনন্ত নিজস্বতার' অর্থ কি একেরই স্বাধ-রক্ষা? বন্ধ ঘরে বসিয়া শক্তশ্রেষ্ঠ-সাহিত্য লেখা বা নির্বাণোন্মুখ উল্কার দিকে তাকাইয়া থাকা? না না, এই সাব-নর্‌মাল্‌, অ্যারেস্টেড্‌ গ্রোথ-কে সত্তার প্রকাশ বলা চলে না। সে প্রকাশে ঘরের দুয়ার-জানালা খুলিয়া যায়, হয়তো ছাদ ফাটিয়া পড়ে, তাহা ভেদ করিয়া আকাশ ছুঁইয়া খাড়া হয় বিরাট সত্তা—জগতের কোণে কোণে তাহার দৃষ্টি, উল্কার আলোতে তাহার মাথায় আশীর্বাদ ঝরে—বিশ্বব্যাপী বেদনার সৌন্দর্যময় অনুভূতিতে তাহার করুণা উচ্ছলিয়া উঠে—এ করুণা 'দি ডীপ ওভারফ্লোইং লাভ্‌ দ্যাট ইজ দি ব্রেস্‌ট অব গড্‌'—জগৎ-জোড়া। সেই করুণার প্লাবন। তাহাই আছড়াইয়া পড়ে তাহার বুকে। যেখানে তাহার সত্তার পূর্ণতা, সেখানে সে এমনই 'বড় আমি'—আত্মস্থ অথচ একাত্ম, আর তাই বিশ্বাত্ম।

ইহাই অমিতের জীবনবোধ। কিন্তু এই কথা সে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিল না। তাই সবাই তাহাকে ভুল বুঝে। মনে করে, সে ক্ষণিক নেশায় নিজেকে ভাসাইয়া দিতেছে, নিজের সত্তাকে বিস্মৃত হইতেছে।

*　　　　　*

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ—অমিত মনে মনে কহিল, অতএব জীবনের প্রধান কথা —'ধর্ম কি?' মানে, তোমার ধর্ম কি? "অথাতোধর্মজিজ্ঞাসা"। ইচ্ছা করিলে তাহাতেই জীবন কাটাইয়া দিতে পারো।

অমিত কহিল, মসিয়েঁ বাদার La Trahison de Clerke মহীধর আমাকে শোনালে—এমনই ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্‌-এর স্বধর্মের দাবি। সেদিন ধূর্জটি-প্রসাদের লেখারও এমনই কথা পড়েছিলাম। কিন্তু তাঁর লেখা এখনও পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠেনি। তাই তাঁর কথাও বুঝে ওঠা শক্ত। তাঁকেই এ বিষয়ের উদাহরণ ধরা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও পদ্ধতির দাবি নিয়ে তিনি সকলকে আঁচড়ে ফেরেন। তাঁর মতে তাঁর সত্তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সহায়েই রূপ-পরিগ্রহ করবে। সে সত্তা সত্য হলে আর ক্ষুদ্র থাকবে না; নিজের আত্মার ও পৃথিবীর সুখ-দুঃখের দাবিকে সমানভাবে মূল্য দেবে। কিন্তু তাঁর লেখায় দেখবেন, যে-কোনও কর্ম বা প্রচেষ্টার প্রতিই একটা অসহিষ্ণুতা। কেন? তিনি নিজেও বোধ হয় জানেন

না, কেন। জানলে তাঁর ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্‌-সুলভ আয়েশী জীবন ছাড়তে হয়। দেখবেন, নব্য ব্রাহ্মণের দল বিদেশী রাজার অনুচর ও গুপ্তচর। এই কাজ দুটো গেলেই তাঁদের ব্রাহ্মণত্বও যাবে। তাই এই ব্রাহ্মণদের 'সত্তার পূর্ণতা'র মানে হচ্ছে, কথার জাবর কেটে জীবনকে শেষ করে দেওয়া। এই হল বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও পদ্ধতির পরম পরিণতি---আমাদের ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালদের বিশুদ্ধ চিন্তার নমুনা। এই ব্যানালিটি থেকে জীবনকে পরিত্রাণ পেতে হবে। জীবন তা পাবে একমাত্র কর্মে—ভুল কাজে, পাগলামো কাজে, হাস্যকর কাজে—তবু কাজেই তার মুক্তি। আমাদের সত্তারও আজ ঠিক এই দাবিঃ আমাকে ছোট গণ্ডি থেকে ছাড়া দাও। আমার 'নিজ সত্তার' অর্থ আমার 'স্বার্থ' বলে মনে করো না, যে নিজ সত্তার মানে নিজেকে পৃথিবীর সঙ্গে সমন্বয়ে সুস্থির করাতে, ভবিষ্যতের হাতে নিজেকে তুলে দেওয়াতেই; তার পূর্ণতা আপনাকে প্রসারিত করায়। আমি তাই চাই—আমার সত্তা তাই চায়। তার ঋজুতা নষ্ট হয়ে যায়,—কাঁধের উপর চেপে বসে ওল্ড ম্যান অব দি সী,—তার মেরুদণ্ড বেঁকে যায় সেলাম ঠুকে ঠুকে, আর তার চেতনা মথিত হয়ে ওঠে করুণায়...সংরুদ্ধ, সংক্ষুব্ধ করুণায়; এবং প্রাণ বিক্ষুব্ধ হয় হিংসায়---উদ্বেল, উন্মত্ত হিংসায়---বাই সৌল্‌ফুল লাভ অ্যাণ্ড সৌল্‌ফুল হেইট্‌। হ্যাঁ, হেটইট্‌। স্বীকার করি, হেইট্‌। যখন চোখে দেখি কাটা মাথা, ফাটা পিলে, তখন সত্তা পূর্ণ হতে পায় না। যখন মনে করি এই সভ্যতার ভারবাহী মরণযাত্রীদের ---এই শোষণধর্মী রাষ্ট্র, তখন একটা হাই ভিলোস্‌টি বুলেট-এর মতো মন-প্রাণকে এপিঠ-ওপিঠ ফুঁড়ে নিষ্প্রাণ ফেলে রেখে যায়---Time is out of joint. Time is out of joint.

* * *

অমিতের স্বর ক্রমশঃ চড়িতেছিল; শেষদিকে তাহা হঠাৎ ক্রন্দনের মতো ক্ষুব্ধ করুণ হইয়া উঠিল। থামিতেই হঠাৎ তাহার চৈতন্য হইল, সে একি একটা নাটুকে বক্তৃতা করিয়া ফেলিয়াছে! অথচ সে বক্তৃতা করিতে পটু নয়। বজবজের মজুরদের মধ্যে দাঁড়াইয়া সেদিন সে যেন কথাই খুঁজিয়া পায় নাই; এত তাহার বলিবার আছে, কিন্তু তাহা তো উহাদের কাছে বলিবার মতো নয়। তবে আজ তাহার মুখ খুলিয়া গেল কিরূপে? লজ্জাবোধই জাগিতেছিল, এমন সময়ে তাহাকে পরিত্রান দিলেন বঙ্কিম বাড়ুজ্জে ও অনুকূল দত্ত। ব্রজেন্দ্রবাবুর অতিথিরা আসিতেছেন।

সবিতা, তোর কাকাবাবুদের জন্যেও একটা ব্যবস্থা করিস।---বলিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু ইঙ্গিত করিলেন।

অমিতের দৃষ্টি পড়িল---ঘরের কোণের একটা চৌকিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সবিতা এতক্ষণ তাহার কথা শুনিয়াছে। না জানি, এই তরুণী বিদুষী মেয়ে তাহাকে কি পাগলই না মনে করিয়াছে! নিশ্চয়ই তাহার কৌতূহল বাড়িয়া গিয়াছে, কোন্‌ জগতের জীব এই অমিত? না না, অমিতকে সবিতা বেশ চিনে, কতবার

দেখিয়াছে, কতবার শুনিয়াছে—কত দিন, কত সন্ধ্যায় শুনিয়াছে তাহার অদ্ভুত মতবাদ। সবিতা নিশ্চয়ই অমিতকে জানে, আজও বিস্মিত হয় নাই। কিন্তু এমন করিয়া কথা অমিতই কি বরাবর বলে যে, সবিতা আজও বিস্মিত হইবে না? বিস্মিত না হউক, নিশ্চয়ই কৌতুক বোধ করিয়াছে, এ কি ক্ষ্যাপা!... অমিত, পৃথিবীতে সবাই ইন্দ্রাণী নয় যে, পলিটিক্যাল উন্মাদনায় উন্মাদ হইবে; আর তোমার কথাকে মনে করিবে উইজ্‌ড্যাম—বুঝি যুগের বাণী। অমিতের নিজের সম্বন্ধে সঙ্কোচ বাড়িল। এদিকে সিঁড়ি বাহিয়া জুতার শব্দ ও কন্ঠস্বর নিকটে আসিতে লাগিল।

অমিত কহিল, আমি কিন্তু খানিকক্ষণ পরে পালাবো। আজ সকালে বাড়ি না ফিরলে চলবে না।

এত সকালেই? এখন তো সবে সাতটা।

না, আর একটু পরে হলেও চলবে। আজ খুব সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি কি না, আর ফিরতে পারি নি।

কেন? খাওয়া-দাওয়া হয়নি তা হলে?

ঘরে দুইজন অতিথি প্রবেশ করিলেন। ব্রজেন্দ্রবাবু কহিলেন, এস, বড় দেরি করলে ভাই তোমরা। এর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। আমার বন্ধুপুত্র—

পরিচয় অগ্রসর হইতে লাগিল। অনুকূলবাবু কহিলেন, ওঃ, তাই! তা এখন কি করছো? জার্নালিজ্‌ম? কত দেয়? একশো? শোনো ব্রজেন্দ্র, শোনো বঙ্কিম—একশো; এত লেখাপড়া শিখে শেষে কিনা একশো! আর কিছু করো না? টিউশনি?

না।

চলে কি করে? তোমার বাবা তো এখন কাজ করেন না; তা হলে উপায়? ছেলেপুলে হয়েছে?

ব্রজেন্দ্রবাবু কহিলেন, অমিত বিয়েই করেনি এখনও।

ওঃ! ভুলে গেছলাম। আর বিয়ে করবেই বা কি? একশো টাকায় কি এদিনে পরিবার প্রতিপালন চলে? আমার মৃত্যুঞ্জয়কে তো দেখছি, ছেলেপুলে বাড়ছে বছরে বছরে, এদিকে মুন্সেফির চেষ্টায় বুড়ো বাপের পর্যন্ত হাইকোর্টে ছুটোছুটি করে পায়ের শির ছিঁড়ে গেল, কোথায় কি! ভাগ্যিস আইনের নোটগুলি ছিল, নইলে—আচ্ছা, তুমি এক কাজ করো না—কিছু টেক্‌স্ট বই লেখো না! স্কুলপাঠ্য বই। কথাটা আমি ভাবছিলাম। এখনও ওদিকে খুব সুবিধা আছে। দেখো, এক-একটা লোক—

অমিত নীরবে মাথা নোয়াইয়া শুনিতে লাগিল। ভাবিল, এইবারই শুনিতে হইবে, 'ইতিহাসের নোট লেখো.' 'ইংরেজীর নোট লেখো',—বাই অ্যান ইক্‌স্‌পিয়্যারি-অ্যান্সড্‌ প্রফেস্যর—ক্ষুদে অক্ষরে যথাসম্ভব বেশি লেখা; ভারী মোটা বই। ছেলের দল্ কিনিবার জন্য ছুটিবে। 'ম্যান' অর্থ লিখিবে 'এ ম্যাস্কুলিন পার্সন, এ বাইপেড

অব দি হিউম্যান স্পিসিস্।' আর কি? পকেট ভারী হইবে, এই যুগের যুবকদলের কাছে তোমার ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল পরিচয়ও দেওয়া হইল, সত্তা পরিপূর্ণ হইল।

ব্রজেন্দ্রবাবু কহিলেন, ওকে দিয়ে সে সব হবে না। বড় জোর দুটো প্রবন্ধ লিখে ও বেরিয়ে যাবে দেখতে মহেঞ্জোদড়ো বা নাগার্জুনকুণ্ডম্।

অনুকূলবাবু সবিস্ময়ে কহিলেন, সে আবার কি?

দুটো হিস্টরিক্যাল প্লেস---

বঙ্কিমবাবু বিজ্ঞভাবে কহিলেন, হরপ্পা অ্যাণ্ড মহেঞ্জোদড়ো, সেই পুরনো শহর দুটো, পড়োনি তার কথা? এবারকার স্টেট্‌স্‌ম্যানে কার বই রিভিউ করতে ওগুলোর উল্লেখ করে প্রবন্ধ আছে। শহর দুটো নাকি আশ্চর্য ব্যাপার।

অনুকূলবাবু কহিলেন, না, স্টেট্‌স্‌ম্যান আমি পড়িনি, বাড়িতে অমৃতবাজার আসে।

বঙ্কিমবাবু কহিলেন, ওই তোমার এক রোগ। কি হয় ও কাগজ দিয়ে? একটা ভাল প্রবন্ধ নেই, কাল্‌চার্ড জগতের কোনো খোঁজই নেই। ইংরেজীও কি কদর্য! এড্‌ওয়ার্ড্‌স সাহেব আমাকে বলেন, ওদের নতুন বাড়িতে গেলে---

অনুকূলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, এড্‌ওয়ার্ড্‌স কে?

ব্রজেন্দ্রবাবু বুঝাইয়া দিলেন, স্টেট্‌স্‌ম্যানের সম্পাদক বিভাগের অন্যতম কর্তা।

অনুকূলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সঙ্গে তাঁর চেনা কি করে?

বঙ্কিমবাবু উত্তর দিলেন, রাজশাহীতে। উনি তাই যখন প্রিন্সিপাল, আমি তখন---। মেজ ছেলেটা আবার পড়তো ইংরেজীতে অনার্স। সেই সূত্রে ইংরেজী সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা হত। এখনও তা চলে। এড্‌ওয়ার্ড্‌স বলেন, 'তুমি তোমাদের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে লেখো না মিঃ ব্যানার্জি! স্টেট্‌স্‌ম্যান তা সসম্মানে নেবে।'

ব্রজেন্দ্রবাবু কহিলেন, লেখচো নাকি কিছু?

লিখবো কি? আছে কি লেখবার? বাংলা সাহিত্য আজকাল না বোবাস, যেমনই বিশ্রী তেমনই অশ্লীল। এড্‌ওয়ার্ড্‌স বলেন, 'বেশ, তাই লেখো।' কিন্তু তাতে যত সব ছিঁচকে ছোকরাদের [illegible] হবে। আমি তাই লিখি না। এড্‌ওয়ার্ড্‌স হেসে বলেন, 'রাইট্ অব [illegible], দ্যাট ইজ অব ইওর নেইমসেক। বাংলা সাহিত্য ক্যান্ বি সাম্‌মড্ আপ ইন টু ওয়ার্ডস্। বঙ্কিম অ্যাণ্ড বঙ্কিম, ইজ্‌ন্'ট্ সো?'

এই বলিয়া বঙ্কিমবাবু স্মিতহাস্য করিলেন। পরে---আমি তো জানি, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ আছেন, শরৎচন্দ্র আছেন;---তোমাদের ডাক্তার নরেশ সেনও আছে। আরও অনেক ছেলে-ছোকরা আছে, কিন্তু সত্যি সত্যি বাংলা সাহিত্য বড় পুয়্যাব, তা এড্‌ওয়ার্ড্‌সকে বোঝালাম। তিনি বলেন, 'তা ঠিক, মিস্টার ব্যানার্জি। তা হলে এক কাজ করো---তোমরা অনুবাদ করো। ইংরেজী থেকে বাংলায় খুব অনুবাদ করো, তাতে হয়তো তোমাদের সাহিত্য একটু সজাগ হবে।' কথাটা

মন্দ নয়---সত্য সত্যই যুবকরা যদি তা করতো, তা হলে দেশের একটা বড় কাজ হত। এই তো 'ইফ উইন্টার কাম্‌স' রয়েছে। কিংবা ধরো 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'। করো না তোমরা অনুবাদ। তুমিই করো না অমিত! শুধু জার্নালিজ্‌মে সময় নষ্ট না করে একটু স্থায়ী কাজ করো। দেখো এখনও কেউ হল্‌-কেনের বই অনুবাদ করেনি। রাইডার হ্যাগার্ডেরই কি বিশেষ কিছু অনুবাদ হয়েছে? তাও হয়নি, অথচ তোমরা গোর্কি, ক্নুট হ্যাম্‌সুন এদের বইও অনুবাদ করছো। এসব বইয়ে কি মাথামুণ্ড আছে? অমিত, তুমি ভাল বই অনুবাদ করো।

অমিত কি উত্তর দিবে ভাবিতেছিল, উত্তর না দিলেও আর চলে না। ব্রজেন্দ্রবাবু তাহাকে রক্ষা করিলেন।

অমিতের সঙ্গে আমার খানিক আগে কথা হচ্ছিল, বঙ্কিম। ও বলে---এযুগ লেখাপড়ার যুগ নয়---কাজের যুগ। এই লেখাপড়া আপাতত বন্ধ না করে লাভ নেই---লেখাপড়ার সত্য রূপ ফুটবে না।

বঙ্কিমবাবু বিস্মিত হইলেন। কহিলেন, সে কি! লেখাপড়ার যুগ নয়, কাজের যুগ! তার মানে কি? কাজ আবার কি? কি কাজের কথা বলছো তুমি?

ব্রজেন্দ্রবাবুই উত্তর দিলেন, যে কাজের ডাক মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্বকে নাড়া দেয়, সেই কাজ---অনেকাংশে সেটা আমাদের রাষ্ট্রীয় চেষ্টায় রূপ নিয়েছে।

পলিটিক্‌স!---বলিয়া বঙ্কিমবাবু গম্ভীর হইলেন। অনুকূলবাবু একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন, মৃত্যুঞ্জয়ের মুন্সেফির সম্ভাবনা এখনও যথেষ্ট আছে। খুব সতর্কতার সহিত বঙ্কিমবাবু কহিলেন, আমি ওসবের অর্থ বুঝি না, এই খদ্দর পরা, নিশান ওড়ানো, চরকা ঘোরানো। তোমরা রবীন্দ্রনাথের মতামত জানো নিশ্চয়। এসব নিতান্তই বাজে জিনিস, এর মধ্যে চিন্তাশীল লোকেরা যাবে কেন? বরং এসব হৈ-হল্লা ও আবর্জনা থেকে দেশকে মুক্তি দেওয়াই হয় তাঁদের কর্তব্য। দেশকে চিন্তা করতে শেখাতে হবে, তবে-না দেশ বাঁচবে।

অমিতের মনে পড়িল, 'চিত্তের মুক্তি, চেতনার আত্ম-পরিচয়!' ইহাই না অপূর্বেরও দাবি? তবু অপূর্ব শুধু ফাঁকা কথা কহে না, তাহার মন এখনও ততটা শূন্য, দেউলিয়া হয় নাই। কোথাও তাহার একটা সত্য আছে; সে শুধু কাঁচা সোনা। কিন্তু ইহারা যেন সংসারের গিল্‌টি করা মানুষ।

অনুকূলবাবু কহিলেন, আজকালকার ছেলেপিলে কেমন যেন কেমন। আমাদের যুগে আমরাও সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনেছি, আনন্দমোহনকে দেখেছি। তখনকার দিনে পলিটিক্‌স ছিল ভদ্র। কিন্তু স্বদেশী যুগের পর থেকে সেসব এমন বিশ্রী হয়েছে! ছেলেরা কথাই শোনে না। আমার বাঁশার বড় ছেলে---সে নাকি জেলে চলে গেছে পিকেটিং করে। লজ্জাও হয়, ভয়ও হয়। ছেলেদের বাপ-মা কারও প্রতি বিন্দুমাত্র রেস্‌পেক্‌ট নেই---কেবল কথায় কথায় স্বাধীনতা, স্বাধীনতা। মেয়েগুলো পর্যন্ত বেলেল্লাপনায় ঝুঁকেছে---না আছে লজ্জা, না সরম।

ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রাণী, এ তোমাদের কি গঞ্জনা? ইহার পরে কি কালের সমুদ্র তোমাদের চারিদিকেও গর্জন করিয়া উঠিবে?...অমিত যেন গ্লানিতে বেদনায় মরিয়া যাইতেছে।

বঙ্কিমবাবু কহিলেন, সে ঠিক ব্রজেন্দ্র, আমাদের সেই যুগে আমরা অনেক বেশি খাঁটি পলিটিক্‌স করেছি; অথচ নিজেদের লেখাপড়া, কাজকর্ম ভাসিয়ে দিইনি। নিজে মানুষ না হলে দেশের লোককে মানুষ করবো কি করে? আর তাই যদি না হয়, তবে আবার 'স্বরাজ'!

তাঁহার ভঙ্গিতে মনে হইল, তাঁহার কথানুযায়ী না হইলে স্বরাজ শুধু অসম্ভব নয়, সে স্বরাজ সম্ভব হইলেও তাঁহার নিকট অগ্রাহ্য। অমিতের মন তখনও বলিতেছিল---ইন্দ্রাণী, বিষ-রসনা বুর্জোয়ার জগতে তোমাদের পথ কোথায়? এমন সময় তপ্ত লুচি ও খাদ্যাদির প্লেট পড়িল অমিতের সম্মুখে। অমিত বিস্মিত হইল। বুঝিল, সে সারা দিন খায় নাই---এই কথাটুকু সবিতার কানে গিয়াছে। তাহার মন একটি স্নিগ্ধতায় ভরিয়া গেল।

ব্রজেন্দ্রবাবু ধীরভাবে কহিলেন, খাবারটা শেষ করো। সত্যি অমিত, আমাদের কালে একটা অবাধ অবকাশ ছিল---তখনও তোমাদের বর্তমান সভ্যতার উৎকট তাড়া আমাদের পেয়ে বসেনি। দিনগুলো আমরা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতাম, তার রূপ রস রঙ উপভোগ করতে পারতাম। এখন যেন সব ছুটেছে গতির উত্তেজনায়---সব তলিয়ে যাচ্ছে। দিনগুলো যেন পথের পাশে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে। সেই অবকাশের দিনে আমরা রবীন্দ্রনাথ পড়তাম, রাস্কিন পড়তাম; সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমরা সেসব চিন্তার শ্যামল ছায়ায় বসে কাটিয়ে দিতাম। অথচ আমরা হাক্‌স্‌লি, হার্বার্ট স্পেন্সার, কোঁৎ, মিল এসব নিয়েও তখন উৎসাহী ছিলাম। তোমাদের যুগটা যেন তাই আমরা ধরতে পারি না। একটা সিভি-লিজেশন অব রিপোজ-এর শেষপাদে আমাদের আবির্ভাব; একটা সিভিলিজেশন অব স্পীড-এর প্রথম পাদে তোমরা এসেছো---বড় ব্যস্ত, বড় ত্রস্ত, বড় ক্ষুব্ধ।

অমিত চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতে লাগিল।

সত্যই যুগ শেষ হইয়াছে---সেই দিন ফিরিয়া আসিবে না।

এই তো তাহার সম্মুখে একটা বিগত-যুগের বাহনদের সে দেখিতেছে---ব্রজেন্দ্র-বাবু, বঙ্কিমবাবু, অনুকূলবাবু। ব্রজেন্দ্রবাবু সত্যই সেই পুরানো পৃথিবীর অধিবাসী, যে পৃথিবীতে মানুষের ধ্যানের আসন পাতা সম্ভব ছিল---সকাল থেকে সূর্যাস্ত, যেখানে মর্মরিত তরুচ্ছায়ায় বসিয়া জীবন সম্বন্ধে কল্পনা চলে, সুন্দর কথার মৃদুগুঞ্জনে দিন ভাসাইয়া দিলেও যেখানে অশোভন হয় না। কিন্তু সেদিন আর নাই। আজ সত্যই যৌবনের চোখে মধ্যাহ্নজ্বালা---আউট অব টাইম, আউট অব টাইম... সুহৃদের ভাবনায় গভীরতা নাই, তাই সে সুখী; অপূর্ব এক চোখ বুজিয়া পৃথিবী দেখে, তাই সে সুখী। কিন্তু, সে সুখ তো অমিতের নাই। অমিতের কেন, সত্য-কার জীবনপিপাসা কাহারও নাই। তাহাদের কাছে ওয়ান ওঅ্যার্ল্ড ইজ ডেড্, দি

আদ্যার পাওয়ারলেস টু বি ব্যরন্---আর সেই নবজন্ম চাই। নবজন্ম চাই---মানবসভ্যতার নব-জন্মের আয়োজন---মানবসমাজে সাম্যের প্রতিষ্ঠা---সমাজের সেই রূপান্তরের প্রয়াস---কর্মের সেই আনন্দলোকে অমিতও পাইতে চায় নবজন্ম।

অমিত কহিল, কিন্তু এবার তো আমি যাবো---মা বসে আছেন। বাড়িতে খাবার দরকার হবে না, তবু একবার যাওয়া উচিত।

বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, এত সকালে কেন? ব্রজেন্দ্রবাবু কারণটা বলিলেন। অনুকূলবাবু বলিলেন, এই দেখো এই হাড়ভাঙা খাটুনি---দেবে একশোটি টাকা। আজকালকার ছেলেরা বাঁচবে কি করে? তুমি বরং অন্য কিছু কাজ দেখো। টেক্স্ট-বই লেখো। শিক্ষার তো এই উদ্দেশ্য---শিক্ষা বিস্তার করা।

টেক্স্ট-বইয়ের মারফত শিক্ষা-বিস্তারের কল্পনা অমিতের নিকট খুব কৌতুক-কর বোধ হইল। 'প্রিয় সুবোধ! আমাদের এই দেশের নাম ভারতবর্ষ। ইহার বর্তমান রাজা সম্রাট পঞ্চম জর্জ। তিনি ইংলণ্ডেরও রাজা। তাঁহার রাজত্বে সূর্যাস্ত হয় না---'। কিংবা, 'ম্যান---এ বাইপেড অব দি হিউম্যান স্পিসিস'।

অমিত একটু চুপ করিয়া পরে কহিল, উপায় নেই। একটা জেনারেশনকে আপনাদের বলি দিতেই হবে। মায়া ত্যাগ করে আমাদের কাজের দুয়ারে বলি দিন---নইলে আমরা না পাচ্ছি শান্তি, না পাচ্ছি সুখ। আমাদের প্রাণই যাচ্ছে ছন্নছাড়া হয়ে। কাজের মধ্যে দিয়ে আমাদের জেনারেশন যদি তার মনুষ্যত্বের প্রমাণ দিতে পারে তা হলে এসব বিক্ষোভ কেটে যাবে, দেশের আকাশ মেঘমুক্ত হবে, পৃথিবীতে নূতন সূর্যোদয় সম্ভব হবে। তা হলেই এর পরের জেনারেশন আবার চিন্তায় ও সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। এই জেনারেশনের ভাগ্যলিপি ---কাজের মধ্যে পূর্ণ হওয়া। তা না করলে আমরাও নষ্ট হবো, ভাবী জেনারেশনও এই মরীচিকার পেছনে ছুটে মাথা খুঁড়ে মরবে। কাজেই দু-একটা জেনারেশনকে চিন্তার জগৎ থেকে ছুটি দিন, চিন্তার জগতে তাদের দান খুঁজবেন না।

এত বড় বক্তৃতা---কিন্তু গরম লুচিতে কী-না সম্ভব। বিশেষত, শেষ দিকে রসগোল্লার সুস্বাদু রসে তাহার মন পর্যন্ত ভিজিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এবার অমিত বিদায় লইল।

বঙ্কিমবাবু কহিলেন, তোমাকে আর একটা কথা বলবো অমিত। আমার নূতন উপন্যাসখানা দেখেছো? তুমি না হয় তোমাদের কাগজে রিভিউ করো--- ---আমি একখানা বই দেবো। অনেকের বইখানা খুব ভাল লেগেছে। 'দেবদূতে' একজন বলেছেন যে, Sorrows of Satan-এর পরে এমন বই হয়নি। তুমি সে রিভিউটা দেখে নিও, লিখতে সুবিধা হবে।

অমিত বিনীতভাবে স্বীকার করিল। ব্রজেন্দ্রবাবু তাহাকে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলেন। কহিলেন, অমিত, তুমি রবিবার আসবে? রবিবার দুপুরে খাবে এখানে। তারপর আবার কথা হবে। কাজই বলো আর যাই বলো, আমার সঙ্গে তোমার কাজ কিন্তু কথা বলার। তা থেকে আমি তোমাকে ছুটি দেবো না---রবিবার

ছুটির দিনটাতেও না। আর তা ছাড়া অমিত, চিন্তাও কাজ। হয়তো তোমার কাজ তাই।...

একটু থামিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু আবার বলিলেন, আমাদের জেনারেশন তো শ্মশানে এক পা দিয়েছে, আর পা তুলে নিলে বলে। তাদের কাজ কে তুলে নেবে হাতে? ভেবে দেখো, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-হীন বাংলা, বিপিনচন্দ্র-রামানন্দবাবু-ছাড়া বাংলা; অরবিন্দ-ব্রজেন্দ্র শীল প্রায় চোখ মুদেছেন, জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্রও তো চলেছেন —পলিটিক্স যেন তোমাদের আবার সর্বক্ষেত্রে দেউলে না করে। দেউলে হয়ো না, 'কাজ, কাজ' করে আত্মহারা হয়ো না। বুড়োদের কাজ হাতে তুলে নিও।

কথার স্বর আগ্রহাতিশয্যে যেন একটু কাঁপিয়া গেল। অমিত এই প্রথম পাইল তাঁহার কন্ঠে ভাবাবেগের আঁচ—এমনই আঁচ অমিত পাইয়াছে তাহার পিতার নিকট, এমনই দুই-একটি নিমেষে। সেই পিতার ও পিতৃবন্ধুর কথা একযোগে তাহার মনে পড়িল। তাঁহারা সেই প্রাচীন, পরিপূর্ণ অবকাশের স্নেহময় ছায়ায় লালিত জেনারেশন।

ব্রজেন্দ্রবাবু কহিলেন, তা হলে রবিবার এসে দুপুরে খাবে।

সম্মতি জানাইয়া অমিত সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেল।

একটা জেনারেশন চলিয়া যাইতে বসিয়াছে, নূতন জেনারেশন আসিয়া গিয়াছে —চোখের সম্মুখে যেন অমিত শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রিতে সে দৃশ্য দেখিতে পাই-তেছে। ওই পথ বাহিয়া অস্পষ্ট কুয়াশায় মিলাইয়া যাইতেছে তাহাদের পিতৃগণ —তাহার পিতা ও ব্রজেন্দ্রবাবু। গম্ভীর স্থিরপদের সেই স্থির শব্দ মিলাইয়া যাইতেছে; শান্ত কন্ঠস্বর যেন একটু ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে—'বুড়োদের কাজ হাতে তুলে নিও, নিউ জেনারেশন!' কি অপরিসীম উদ্বেগ আছে ঐ শান্ত মিনতির পিছনে! যুগে যুগে এমনই বুঝি পিতৃগণ জীবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার হাত হইতে নিজেদের উদ্ধার করিতে চান এই সান্ত্বনায়—পুত্রগণ তাঁহাদের অনায়ত্ত স্বপ্ন জিনিয়া লইবে, তাঁহাদের আত্মার তর্পণ করিবে। ঊর্ধ্বে পিতৃলোক হইতে নির্নিমেষ চোখে তাঁহারা চাহিয়া থাকেন, পৃথিবীর জীবন্ত বুকের রক্তের দোলায় কহিতে থাকেন, 'বুড়োদের কাজ হাতে তুলে নিও, নিউ জেনারেশন।' আর নব নব জেনারেশনের অঞ্জলি লইয়া সুবিস্তৃত প্রাণস্রোত ছোটে কালের পারাবারে আপনাকে ঢালিয়া দিতে। মহাকালের এই দীপালী-উৎসবে এক-একটা জেনারেশন যেন এক-একটি প্রদীপ।...

তোমাদের প্রদীপ কি নিবিয়া যাইবে, ধোঁয়াইতে থাকিবে।

কে জানে, কোথায় কোন্ সমুদ্রাহত গিরি-কবাটের পিছনে নবযুগের জোয়ার প্লাবন তুলিয়া আসিতেছে, তিমিররাত্রির অবগুন্ঠন খসিয়া পড়িতেছে।

Say not, the struggle naught availeth...

ওল্ড জেনারেশন, তোমাদের দান ফুরাইয়াছে—তোমাদের মধ্যেও বঙ্কিম বাঁড়ুজ্যে, অনুকূল দত্ত আছেন—সেই অভিশপ্ত বিষয়ী-মনের দূতেরা তেমনই মূর্তিমান। না, তেমনিতর সাংসারিকতায় নিউ জেনারেশন না ডুবিলেই ভাল, ম্যাথু আর্নল্ড-কীর্তিত

অক্সফোর্ডের মতোই ছিল তোমাদের ছায়াসুন্দর জীবন---ধনিক-সভ্যতার বিকাশের মাঝখানে একটি শান্ত পর্ব---সাক্‌সেস দেবতার এই পূজারীদের গড়িয়াছে তবু সেই দিনগুলিই। উহার পিছনে ছিল অচেতন মানুষের অব্যাহত শোষণ---দুই একজন ব্রজেন্দ্রবাবুকে পালন করিতে শত শত লোক চিরজন্মের ক্ষেতের মধ্যেই দাসত্ব করিয়া গেল, দুই একটি আর্নল্ডকে পোষণ করিতে সহস্র সহস্র বালকের বুকের রক্ত ঢালা হইয়াছে কারখানার তলে। সেই 'সিভিলিজেশন অব রিপোজ'-এর অর্থ---জন দুই লোকের বিকাশ, বিরাম ও বিশ্রাম ; আটানব্বই জনের দিনরাত্রির পরিশ্রম, ক্ষুধা, অশিক্ষা, গ্লানিময় পশুবৎ জীবনযাত্রা। এই তো সেদিনকার সভ্যতা---'সিভিলিজেশন অব রিপোজ'। তাহার অপেক্ষা এই 'সিভিলিজেশন অব স্পীড' ভাল---এই রক্তচক্ষু মোটর যাহা অমিতের চোখ ধাঁধিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, নিশ্চয়ই তোমাদের ওই ছ্যাকরাগাড়ির জীবনের অপেক্ষা তাহা গরিমাময়।

পাশ ঘেঁষিয়া একটা মোটর তীব্র বেগে চলিয়া গেল। এ কি সার্কুলার রোড ? না, ধোঁয়ার মলাটে মোড়া একখানা কালো পাত ?

নিউ জেনারেশন---কেন ? ওই তো সবিতাকে দেখা যাইতেছিল, ওই রেলিংএর উপর শ্লথ বাহু রক্ষা করিয়া একটি সুপরিণত সুসীমতায় স্থির, ওই অতিথির জন্য বাক্‌হীন আতিশয্যহীন সুন্দর সেবা---কোথাও নিজেকে জাহির করা নাই।... সত্যই সবিতার জীবনে একটি কমনীয়তা ও মহনীয়তা আসিয়াছে। এই মহনীয়তা সে পাইল কোথায় ? বিবাহের মধ্যে ? এমনই করিয়া নিজেকে পূর্ণ করার জন্যই তো বিবাহ। আর, তাহার অভাবে সেই সহজন্য দোসর হারাইয়া ছন্নছাড়া জীবন-যাপনের নাম ব্যাচিলরহুড ?...

শুধু এই ? ইহার বেশি কিছু নয় ? ফুলকো লুচি ভাজিয়া তোমার সামনে ধরা, একটা তন্বী, গৃহলক্ষ্মী---অন্তত বা অধিকন্তু---অবসর-মাফিক জিজ্ঞাসা করিবে গোর্কির বইটার কথা ?

ইহাই কি আজিকার নারীর পক্ষে যথেষ্ট ?---অমিত মনে মনে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল। এই মানব-মহাবিপ্লবে তাহার রোল-টা শুধু এই ?...

*   *   *

কিন্তু অমিতের চিন্তা বন্ধ করিয়া দিয়া বাস আসিল। কোথায় যাইবে ? যুগলের বাড়িই এখন যাওয়া উচিত ; দক্ষিণগামী বাসের জন্য অমিতের অপেক্ষা করিতে হইবে।

*   *   *

ব্যাচিলরহুড! অমিত ভাবিতে লাগিল, সেও তো ব্যাচিলর। কেন ? ব্যাচিলর থাকিবে ইহাই কি তাহার সঙ্কল্প ? যাহারা অন্তরঙ্গ নহে, তাহারা ভাবিত, অমিত কাহারও প্রেমে পড়িয়াছে---কিংবা কেহ অমিতের প্রেমে পড়িয়াছে। তাহাদের বিবেচনায়---যুবক, খানিকটা লেখক-শ্রেণীর ও অধ্যাপকজাতের যে লোক, তাহার প্রেমে পড়াই উচিত। আর প্রেমে না পড়িয়াই বা কোন্ মেয়ে পারে---রূপ তাহার

যাহাই হউক, রোজগারও তাহার যতই কম হউক? ইহাদের রহস্যময় ইঙ্গিতে অমিতও রহস্যময় হাসি হাসিত—ইচ্ছা করিয়াই। অমিত অপূর্বকে বলে, 'ফুলে ফুলে ঘুরে মধু খাবো।' সুহৃদকে বলে, 'তোমার মতো বাড়ি আর গাড়ি নেই, তাই। জান তো মোটরকার না থাকলে পরিবার রক্ষা করা অসম্ভব।' যাকে বলিত, 'কদিন অপেক্ষা করো, পেনশন নিয়ে সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ।' কিন্তু কেন অমিত বিবাহ করে নাই?...বিবাহ—না, বিবাহের কথা সে ভাবিয়া দেখে নাই। মহীধর বলিতেন, 'ওটা দেখবার চিজ নয়, করে ফেলবার জিনিস। অতএব—' কথাটা ঠিক, ব্যাচিলরহুডকে অমিত এমন কিছু মহৎ জিনিস বলিয়া বিশ্বাস করে না। সে বরং বিবাহকেই মানব-জীবনের একটা অপরিহার্য অভিজ্ঞতা ও আশ্রম বলিয়াই মনে মনে চিন্তা করে। তাহাতে জীবনবোধ রিচ্ ও সিমেট্রিক্যাল্ হয়।...কিন্তু তাই কি হয়—যে যুগে সমাজের সমস্ত পাঁজরে পাঁজরে আজ অসামঞ্জস্যের ঘুণ ধরিয়াছে? দেখিতেছ না ইন্দ্রাণীকে?

* * *

বাস আসিয়াছে। শীতের রাত, ভিড়ও কম, ভালই হইল। অমিত বাসে চাপিয়া জানালা দিয়া অস্পষ্ট কুয়াশার দিকে তাকাইয়া আপনার মনে ভাবিয়া চলিল। হয়তো সে সবিতাকে লাভ করিতে পারিত—জীবনে পাইত কি একটু সুসঙ্গতি?...

জীবন—কর্মের মধ্য দিয়াই আপনাকে চিনে, প্রেমের মধ্য দিয়াই আপনাকে পূর্ণ করিয়া লাভ করে। একা পাওয়া—আধখানা পাওয়া।

* * *

এমনই সন্ধ্যায় যদি দুইজনে নীরবে পাশাপাশি দাঁড়াইতে পারে, যেমন একদা সে দাঁড়াইতে পারিত সবিতার সহিত—অমনই শ্লথ মসৃণ অনাবৃত বাহুখানি হয়তো তাহার বাহুতে ঠেকিবে, রেলিঙে দুইজনের বুক ন্যস্ত রহিবে।...কিংবা তাহার ছোট ছাদের দূর আঙিনার কোণটিতে সন্ধ্যাতারার নীচে দাঁড়াইয়া আছে সবিতা—যেন সত্য সত্যই আকাশের তারাই নীচে নামিয়া আসিয়াছে। তারার মতো তাহার চোখের আলো স্নেহে কোমলতায় উজ্জ্বল...অমিত হয়তো তাহার কাছে বলিতে থাকিত তাহাদেরই কথা, জীন্সের 'মিস্টিরিয়াস ইউনিভার্স' কত বেশি মিস্টিরিয়াস হইয়া উঠিত তাহার চোখের দৃষ্টিতে, বিস্ময়ে-সুন্দর ওই চোখের রহস্য-ব্যাকুল দৃষ্টিতে, তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া চুলের সুগন্ধে আকুল চেতনা উপপ্লাবিত করিয়া, অমিত তখন কহিত, সেই সুদীর্ঘ, লীলামধুর, অতল-দৃষ্টি দুইটি চোখের উপর চোখ রাখিয়া—

'শিয়ালদা, শিয়ালদা, শিয়ালদা, শিয়ালদা।' অমিত চমকিত হইল, একি! তাহার নিমীলিত নয়নের সম্মুখে কাহার চোখ দুটি ফুটিয়া উঠিয়াছে? ইহা তো সবিতারও নয়। কাহার? এ যে ইন্দ্রাণীর—ইন্দ্রাণীর।

যেন কে তাহাকে কোন্ অসাবধান মুহূর্তে দেখিয়া ফেলিতেছে—অমিতের

এইরূপ মনে হইল। কে সে? অমিত নিজে? না না, অমিত এ ভাবে নিজেকে দেখিতে দিবে না। কিছুতেই না।

পরক্ষণে অমিত জোর করিয়া হাসিল। কাহাকে ঘিরিয়া এই অদ্ভুত খেয়াল রচনা করিতেছিল অমিত? সবিতাকে? ইন্দ্রাণীকে? কি অদ্ভুত! সবিতার তো আজ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আর ইন্দ্রাণী? সে তো পূর্বাপরই তাহার বিবাহসূত্রে আত্মীয়া। সাধারণ একটি স্বামীবর্জিতা নারী, বছর ঊনত্রিশ বয়স, কিংবা একটি আই. এ. ক্লাসের ছাত্রী, বছর উনিশ যাহার বয়স, তাহাকে লইয়া জীন্‌স-এডিংটনের স্বপ্ন দেখা কি হাস্যকর কামনা, রোমান্স-বিলাসিতা! ইহার পরেও তুমি ফ্রয়েডকে বলিবে 'ফ্রড'? মনের গোপনপুরে একবার ঢুকিয়া দেখো না!...বেশ, বিজ্ঞান আলোচনাই যদি করিতে হয়, তোমার বন্ধুরা তো রহিয়াছে, তোমার ছাত্ররাও তো ছিল অনেকে।...সেই নিষ্প্রভ-দৃষ্টি, ভাবলেশহীন-মুখ—ক্লাসটা অমিতের মনে পড়িল। বিদ্যায়, মনের বুদ্ধিতে সবিতা তো তেমনই দুই শত ছাত্রের মধ্যে একজন মাত্র। ইন্দ্রাণীর বিদ্যা হয়তো তাহারও কম, অমিত নিজে মানুষের বিদ্যা অপেক্ষাও বুদ্ধির উপর আস্থা রাখে বেশি। তথাপি উহাদের শিক্ষিতা বলিয়া বিবাহ করাও যা, ওই দুই শত ছাত্রের একটিকে বিবাহ করাও তো তাই। এক অসুবিধা, তাহারা পুরুষ; তেমনই আবার লেস্ ইক্সপেনসিভ্‌ও।...

কিন্তু ইন্দ্রাণী? না, অবিচার করিও না অমিত। ইন্দ্রাণী ইক্সপেনসিভ্ বটে; তাহার কারণ, সে পরের জন্য মুক্তহস্ত হইতে না পারিলে মুক্তপ্রাণ হয় না। সবিতাই কি ইক্সপেনসিভ্? বোধহয় না। সে তাহার পিতারই কন্যা। তাহার পিতা তো ফ্যাশানের পূজারী নন, 'স্নব'ও নহেন। হয়তো সবিতাও খানিকটা তদ্রূপ হইয়াছে। ...অমন একটি ছোট কথার ইঙ্গিত মনে রাখিয়া কেমন আশ্চর্য শোভনতার সহিত অমিতের আতিথেয়তা সে সম্পন্ন করিল। অথচ কোথাও নিজেকে জাহির করিল না—কিছুই প্রকাশ করিল না, কোনো আগ্রহ, কোনো ব্যগ্রতা, কোনো বিশেষ নিদর্শন। অমিতকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে তাহার কোনোই অসুবিধা হইল না। অথচ তাহাতে ঔদাসীন্যও নাই, বরং হৃদয়ের পরিচয়ই আছে। কিন্তু বাহুল্য নাই, আতিশয্য নাই। ইন্দ্রাণী হইলে তাহার সেবায় থাকিত একটা ঐশ্বর্য, একটা মধুর আতিশয্য। কিন্তু সবিতা, বালিকা সবিতা, মাধুর্য ও ডিগনিটি দুইই সম্পূর্ণ রাখিয়াছে। এই সুনিপুণতা সত্যই এক আশ্চর্য জিনিস। একেবারেই অসম্ভব কিন্তু নয়, তবু তাহা আশ্চর্যকর বই কি। অমিত ইন্দ্রাণীকেও দেখিয়াছে, অনবদ্য তাহার আতিথেয়তা। অমিত দেখিয়াছে ললিতাকেও—চঞ্চলা সে হরিণী; দেখিয়াছে সুরোকে।...আশ্চর্য এই বাংলা দেশের মেয়েরা—এমনই তাহাদের সুন্দর সুশোভন স্নেহ। মায়েদের কথা ছাড়িয়া দিই। মা, মা, মা,...না, তাহাদের শ্রেণীই আলাদা। কিন্তু ইহারাই বা কি কম—এই সবিতা কিংবা সুরো, অথবা সুধীরা বা ললিতা, ইন্দ্রাণী?...বাংলা দেশই বা কেন বলি, সর্বত্রই বোধহয় ইহারা এমনই। অলক্ষিতে আপনাকে লোপ করিয়া শুধু কল্যাণহস্তের সেবাটুকু পুরুষের অভিমুখে

উৎসর্গ করিয়া দিতেছে। এ জাতের দেশ নাই, কাল নাই।...সেই পুরাতন মায়ের জেনারেশন চলিয়া যাইতেছে---নূতন জেনারেশন জন্ম লইতেছে। ধরণীর মাতৃহৃদয় যুগের পর যুগ এমনই নারীর মধ্য দিয়া আপনাকে মেলিয়া ধরিতেছে—অবিচ্ছিন্ন মাতৃত্বের ধারা জীবনকে আপনার স্নেহপীযূষ পিয়াইয়া অগ্রসর করিয়া লইয়া চলিয়াছে।...বুড়ীদের কাজ হাতে তুলে নাও, নিউ জেনারেশন।...

এমনই জীবন---এমনই মহাকালের বিরাট মিছিল।

* * *

বিবাহ তো সবাই করে—শুধু বিবাহের মধ্যে সেই অমৃতত্ব নাই। বরং বিরহের, বিচ্ছেদের মধ্যেই প্রাণের দুবার গতি গজাইয়া উঠে---যেমন উঠিয়াছে ইন্দ্রাণীর। বিবাহের জলে মেদ বাড়াইয়া দেহমনে সে ঝরিয়া পড়ে নাই---যেমনই ঝরিয়া পড়িবে হয়তো সবিতা, যেমনই ঝরিয়া পড়িয়াছে সুনীলের বউদিরা, যেমনই ঝরিয়া পড়িতেছে সুধীরা, যাহার কিছুরই অভাব নাই, প্রেমেরও অভাব নাই—এমনই হয়তো ঝরিয়া পড়িতেছে, কে জানে, সুরো। কে জানে, বুঝি ইহাই জীবনের অলঙ্ঘ্য বিধান। পরশপাথর লইয়া সে জীবনকে ছুঁইয়া সোনা করিতে চাহে—সোনা করিয়াও রাখে। কিন্তু চক্ষুহীন ক্ষ্যাপারা অভ্যাসবশে জীবনের দান ছুঁড়িয়া ফেলিয়া যায়---ফিরিয়াও তাকায় না। উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষায় ছুটিয়া চলে—মুন্সেফি, ওকালতি, ছেলের জন্য নোট লেখা—নূতন উপন্যাস লিখিয়া যশোলাভ।...

* * *

'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর'...

এমনই জীবন।

এগার

এস্‌প্ল্যানেড পার হইয়া গাড়ি চলিয়াছে—শীতের মাঠের হিমেল হাওয়া। কতদিন এই মাঠে অমিত বেড়ায় নাই। বুক ভরিয়া একবার হাওয়া টানিয়া লইয়া ভাবিল---মাঠটা সমস্ত শহরের যেন হৃদ্‌যন্ত্র। শহরটা তো কুৎসিত— কি নগ্নজি হইয়াছে। চোখ মেলিয়া শীতের রাত্রির বর্ণহীন রূপ অমিত পান করিতে লাগিল।

জগুবাবুর বাজার। যুগলের বাড়ি এখান হইতেই যাইতে হয়। অমিত নামিয়া চলিল। রাত্রিও হইয়াছে—শীতের সাড়ে আটটায় এখনই মনে হয় অনেক রাত।

যুগল অপেক্ষা করিতেছিল, কহিল, এসেছে?

না, রাত দশটার পরে নিজে আসবে। বাড়িটা দেখবে, তোমার সঙ্গে কথা বলবে। তারপর কাল সকাল থেকে থাকবে—যদি কথায় গোলমাল না হয়।

গোলমালের কি?

কোনো বাঁধাধরা নিয়ম, তোমাদের নিষেধ, তার ওপর খাটবে না—তাতে তুমি রাজি?

যুগল কহিল, তা না হলে তাকে আসতে বলবো কেন?

তাহলে চলো তাকে নিয়ে আসছি।

কোথায় সে?

এখন বেরুলে খিদিরপুরে ট্রামের লাইনের মোড়ে দেখা হবে। চলো।

যুগল ভিতর হইতে জামাকাপড় লইয়া আসিল। দুয়ারে দাঁড়াইয়া একটি তরুণী প্রশ্ন করিল, তাহলে তুমিও তখনই খাবে? বাবা যদি দেরি করতে চান? তুমি না এলে খেতে চান না যে তিনি।

তুই সঙ্গে বসে কিছু বলে আজকের মতো তাঁকে বুঝিয়ে রাখবি বুলু।

অমিত যুগল চলিল। অমিতের পুরাতন প্রশ্নে মন মোচড়াইতে লাগিল—কোথায় লইয়া চলিলে এই উদার যুবককে পিতার স্নেহ হইতে, ভগ্নীর ভালবাসা হইতে, আপনার উন্মুক্ত নিশ্চিন্ত জীবন হইতে?

রাস্তার মোড়। অমিত একবার পিছন ফিরিল—ঘরের দুয়ার তেমনই খোলা, সেই আলোকে তেমনই একটি ছায়া।...ছায়া, আরও ছায়া, আরও ছায়া হইয়া তুমি মিলাইয়া যাইবে বুলু, আজ হইতে তোমার দাদার জীবনে। উপায় নাই, উপায় নাই—Time is out of joint'...'দু একটা জেনারেশনকে আপনারা বলি দিন, Time is out of joint'।

সুদীর্ঘ কাহিনী। সুনীল শেষ করিয়াছিল—কাল থেকে আসতে পারি। কিন্তু কথাগুলো জেনে বুঝে আমাকে বলবেন যুগলবাবু। বঞ্চনা আমি করি না যে তা নয়। না বলে অনেক জায়গায় ঠাঁই নিই। আমার প্রয়োজন তাদের থেকে বড়, এই হল আমার মটো। আপনার কাছে বঞ্চনায় চলতো না। একে আপনি অমিদা'র বন্ধু। তাতে আবার আপনার বুদ্ধিও আছে। ধরা পড়ে যেতাম। তার চেয়ে এইটা অনেক বেশি সুবিধার। তাই জেনে রাখুন আমার লক্ষ্য, পথ, পাথেয়। এখন চলুন যদি শখ থাকে, দেখি আপনার বাড়ি।

যুগল লইয়া আসিল। রাত এগারোটা। বাড়ি পাতি-পাতি করিয়া সুনীল দেখিল। বুলু উঠিয়া আসিল। যুগল কহিল, আমার বোন বুলু, স্কুলে পড়ে।

সুনীল তাহাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, কহিল, তথাপি আমাকে এখানে থাকতে বলছেন যুগলবাবু?

কেন?—যুগল জিজ্ঞাসা করিল, বুলু সবই জানে।

জানেন, আমার আঁচ লাগলে আপনাদের সব ছাই হয়ে যেতে পারে—এমন কি ওঁর মান-সম্ভ্রম পর্যন্ত ফুঁকে শেষ করে দেবে—শুধু অপরে নয়, আপনার আত্মীয়রাও?

মাথা নীচু করিয়া বুলু কহিল, আপনি আমাদের দাদা। বোন কি এসব ভয়ে ভাইকে ছেড়ে দেবে?

এই রাত্রিতে কথাটা একটুও নাটুকে ধরনের শোনাইল না। আর কথা নাই।

বেশ, কাল সকালে আটটায় আমি আপনাদের এখানে আসছি। আপনারা মনে রাখবেন, আমি দার্জিলিং মেলে নামবো, জলপাইগুড়ি থেকে আসবো ; নাম সুরেশ মৈত্র।

সকলে বিদায় লইল।

অমিত কহিল, আজ কোথায় কাটাবে সুনীল ?

খারাপ জায়গায়। হাজরা রোডে। আশ্রয়দাত্রীর নাম নাই শুনলে ? সে সতী মেয়ে নয়।---বলিয়া হাসিয়া গলির মধ্য অদৃশ্য হইয়া গেল।

অমিত রমেশ মিত্র রোডের দিকে চলিল। এবার অমিতের কাজ একটু হাল্কা হইল। অমিত অন্তত খানিকটা ভারমুক্ত বলিয়া নিজেকে বোধ করিল---আজিকার মতো, এই রাত্রির মতো, সে করিয়াছে তাহার কর্তব্য।...কিন্তু করিয়াছে-কি সত্যই ? সুহৃদ কি বলিত ? সুরোকে একটা চিঠিও লেখা হয় নাই। আর ইন্দ্রাণী--- কাল দেখা করা হয় নাই, আজ অফিসে সে কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছিল ? চিঠি রাখিয়া গিয়াছে---'বিকালের পূর্বে তোমার দেখা চাই।' অমিত পারিল না তাহার কথা রাখিতে, অমিত পারিল না তাহাদের শোভাযাত্রাটা দেখিতে, পারিল না তাহার সেই অনুরোধটিও রাখিতে---সেই সগৌরব স্পর্ধিত গতি, সেই উজ্জ্বল জ্বলন্ত দৃষ্টি---অমিত দেখে নাই। এখন গেলে দেখিবে অন্য রূপ---ইন্দ্রাণীর অভিমানিনী রূপ, ছল্ম ক্রোধ, সুন্দর সহাস্য আনন্দ। নিশ্চয়ই সগর্বে বলিবে ইন্দ্রাণী আজিকার শোভাযাত্রার কথা---'জানো অমিত, জানো.---না, তোমাকে বলবো না, কেন তুমি গেলে না ? ভারী অন্যায় তোমার।' তারপর ইন্দ্রাণী করিবে উহার বর্ণনা। বলিতে বলিতে স্বর আনন্দে গর্বে গরিমায় উচ্ছলিত হইবে, চক্ষু আয়ত হইবে, মুখ উজ্জ্বল হইবে।...সেই সুশ্রী মুখ, বিস্তৃত চক্ষু, অমিত যেন চোখে দেখিতেছে।

কিন্তু এই তো ইন্দ্রাণীর বাড়ি, ঘর অন্ধকার যে! ইন্দ্রাণী কি তবে শুইয়া পড়িয়াছে ? অমিত যেন হতাশ হইল, যেন কি তাহার ব্যর্থ হইতেছে! কড়া নাড়িতে দুয়ার খুলিয়া গেল। ঝি জানাইল, মাইজী একবার ফিরিয়াই আবার বাহির হইয়া গিয়াছেন। বলিয়াছেন, ফিরিতে দেরি হইবে। অমিত অপেক্ষা করিবে নাকি ?

রাত প্রায় বারোটা। শীতের রাত্রি। অমিত হতাশ হইয়া একটু দাঁড়াইল। তারপর চলিল রসা রোডে।

বাস আসিতে একটু দেরি হইল। তবু অমিতের মনে একটু আরাম আসিয়াছে, দিনের মতো কাজ চুকিয়াছে। এখন সমস্যা বাড়ি ফেরা। মা, বাবা, পিসীমা, কানাইয়ের মা---ইঁহাদের সম্মুখে কি করিয়া উপস্থিত হওয়া যায় ? না, ইঁহারা এক বিষম দায়। অমিত ইঁহাদের যদি একটু তৈয়ারি করিয়া লইতে পারিত, এমনই বুলুর মতো! হয় না ? মা কি বুলুর মতো বলিতে পারেন না ? না, তাহার মা নিতান্তই অবুঝ, সরল। তাঁহার চিন্তার ও কল্পনার গণ্ডি বড় ছোট। সেই ছোট্ট আকাশের তলায় তাঁহার স্নেহঘেরা কোলটিতে তিনি আপনার আঁচলখানি দিয়া

ছেলেকে ঢাকিয়া রাখিতে চাহেন। বিশাল দিগন্তপ্রসারিত দিক্‌চক্রবাল কেন তাঁহার সেই শিশুকে টানিয়া কাড়িয়া লয়? তাঁহার আঁচল শূন্য করিয়া দেয়? সর্বনাশিনী সে দিগঙ্গনা কেন মাতাকে নিঃসন্তানা করিতেছে?

অমিতের মা বড়ই অবুঝ। অতি সামান্য, অতি সাধারণ বাঙালী মা, আর কিছুই নহেন। ইহার বেশি কিছু হইলে অমিতের সুবিধা হইত, অমিত গৌরব বোধ করিত। কিন্তু না, কি জানি, আবার তাঁহাকে মানাইত কি না—কেমন দেখাইতেন!...

আবার অমিত ভাবিতে লাগিল, ইন্দ্রাণী গেল কোথায়? কোন্ নূতন ক্ষ্যাপামির সন্ধানে? কোনো লক্ষ্মীছাড়া বৈপ্লবিক রোমান্টিক বীরের খপ্পরে পড়িল কি? না, ওই চৌধুরীর ফিরিয়া আসিবার কথা উঠিয়াছে, আর ইন্দ্রাণী খুঁজিতেছে জেলের পথ---সুরঙ্গের পথ। অমিত জানে, কত সহজ ইন্দ্রাণীকে ঠকানো। সংসারকে সে জয় করিতে চায়, সংসারের পরিচয় সে জানে না। আদর্শের উত্তেজনায়, প্রাণের আবেগে---সে চায় উত্তেজনা, চায় উদ্দাম রোমান্টিক স্বপ্ন। তাই অমিতের কথায় সে ধৈর্য হারায়। ইন্দ্রাণী মনে মনে জানে, অমিতের কথাই সত্য। কিন্তু জীবনে তাহার এত স্থিরতা সহ্য হয় না। সে চায় দ্রুত গতি, সে চায় রোমান্টিক আদর্শ। আজগুবি প্ল্যান ও প্লট লইয়া, ইংরেজকে চমকাইবার কল্পনা লইয়া যে আসে, ইন্দ্রাণী তাহাকে বিশ্বাস করিয়া বসে, মনে করে, সেই সত্যকার বিপ্লব-ধর্মী। দুই হাতে টাকা ছড়ায়, নিজের অলঙ্কারও সে রাখে না। সময়ে-অসময়ে তাহারই পিছনে ছোটে, কোনো কথায় কান দেয় না---মানের কথা নয়, লজ্জার কথা নয়, ভয়ের তো লেশও তাহার নাই। আজ সে কি এমনই কোনো কল্পনার খেয়ালে ছুটিয়াছে? তাহাকে কে রক্ষা করিবে? অমিত? এ কি অমিতেরই দায়?...

বাস আসিল, অমিত উঠিয়া বসিয়া পড়িল, জানালায় মাথা রাখিতে শীতের হাওয়া মাথায় লাগিল। আঃ! বাঁচা গেল। কনকনে অগ্রহায়ণ-শেষের শীতল বাতাস। তবু যেন আরামে চোখ বুজিয়া আসে।

এক রকম করিয়া দিনটা কাটিয়াছে, ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা হইল না বটে, সুনীলের একটা ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার পরে তাহার যাহা ঘটিবে, সে অমিতের ঠেকানো অসম্ভব। সবই তো এইমাত্র শুনিল, নিজেই আগু-বাড়াইয়া বিপদ টানিয়া আনিয়াছে। অমিতের সাধ্য কি সে তাহাকে বাঁচায়! কিন্তু বাঁচাইতে সে চাহে কেন? সুনীলের ভাগ্যলিপি সুনীল পরিপূর্ণ করিবে। ইন্দ্রাণীর ভাগ্য সে নিজে করিবে জয়। দুই-একটা জেনারেশনকে তো আমাদের বলি দিতেই হইবে---তাহাদের ধরিয়া রাখিয়া ভাবী জেনারেশনকেও ব্যর্থ হইতে দিলে তো চলিবে না। সেদিক হইতে কেইবা সুনীল, কেইবা ইন্দ্রাণী, কেইবা অমিত? আপনাদের জীবনকে নিঃশেষে সঁপিয়া দেওয়ার মধ্যেই তাহাদের পরিপূর্ণতা, না হইলে তাহাদের কোন মানে নাই। সুনীল চলিয়া যাক। তাহার দিন সুদীর্ঘ হইবে না, না হউক। দিন-মাসের বালু কুড়াইয়া জড়ো করিলেই কি জীবন দীর্ঘ হইল? দিনের সংখ্যা-

তেই জীবনের পরিমাপ?...অমিত জানে, শুধু দিনের পর দিন গাঁথাতেই মানুষের মনের আশা, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা---শুধু বাঁচিবার, মাত্র বুক ভরিয়া নিশ্বাস লইবার জন্য আদিম দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের। শুধু আকাঙ্ক্ষা নয়, তাহাতেই মানুষের আনন্দ। কিন্তু জীবনের মানে আরও বেশি---সে শুধু দিন গাঁথিয়াই শেষ হয় না ---দীর্ঘতাই সফলতা নয়। সে চাহে বিকাশ---আপনাকে মেলিয়া দিতে, উদ্‌ঘাটিত করিতে। বিকাশ দিনরাত্রির সংখ্যায় নয়, বিকাশ আপনার পরিপূর্ণতায়, চেতনার তীব্রতায়, অনুভূতির গভীরতায়, কর্মের ঔজ্জ্বল্যে। দেয়ার ইজ ওনলি ওয়ান্ ইট্যার্‌নিটি—ইন ইন্‌টেন্স্‌ লিভিং। সেই অসীমত্ব হয়তো একটি নিমেষের মধ্যে জীবনে মূর্ত হইয়া উঠিবে—অপরিমেয় বিদ্যুদ্দীপ্তিময় একটি নিমেষে— এক নিমেষে মানব সত্তার চরম শ্রী ফুটিয়া উঠিবে---পরমুহূর্তে আর তাহা নাই, থাকিবার দরকারই বা কি?

সুনীল থাকিবে না—সুনীল থাকিবে না---হয়তো ইহাই তাহার পরিচয়ের পথ —তোমার দুঃখ করিয়া লাভ নাই।

দেয়ার ইজ ওনলি ওয়ান ইট্যার্‌নিটি—ইন ইন্‌টেন্স্‌ লিভিং...ইন্‌টেন্স্‌ লিভিং... ইন্‌টেন্স্‌...লিভিং...ইন্‌টেন্স্‌ লিভিং...।

*   *   *

অমিত একবার চোখ খুলিল,---আর্ট এক্‌জিবিশনের চিত্রিত প্রাচীর-পট বাহিরে ঝুলিতেছে, বাস তাহা পিছনে ফেলিয়া গেল। এমনই করিয়াই অমিতও ওই সুপ্ত প্রাসাদের শিল্পনিদর্শনগুলিকে আজ পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে। বিকাশের সঙ্গে আজ তাহার এখানে আসিবার কথা ছিল, তাহা সম্ভব হয় নাই। দিনটা ক্ষ্যাপার মতো তাহাকে উড়াইয়া লইয়া গেল, দাঁড়াইবারও সে অবসর পায় নাই। ততক্ষণ ওই সুসজ্জিত সৌধের চিত্রগুলির সম্মুখে কত লোক ঘুরিয়াছে—কেহ দাঁড়াইতেছে, কেহ পালাইতেছে। নন্দলাল বসুর 'মহাপ্রস্থান' এখানে রহিয়াছে---প্রাচীর-গাত্রের সেই চিত্রিত সৃষ্টিগুলি তেমনই নিশ্চল মূক প্রতীক্ষায় ঘরের অন্ধকারে এখন কি করিতেছে। উহারা কি দিনের দর্শকদের অলস জড়দৃষ্টির কথাই স্মরণ করিয়া অন্ধকারের আসর জমাইয়াছে? ওই প্রাচীরের তীর হইতে তাহাদের নীরব ভর্ৎসনা কি অমিতের উপর বর্ষিত হয় নাই?...অমিত, সৌন্দর্যলোলুপ অমিত, শিল্পরসিক অমিত, কোথায় ছিলে সারা দিন---অর্থহীন অকাজের আরাধনায়, আয়ুহীন মিথ্যার মোহে? অথচ এখানে একবার দাঁড়াইলে তোমার মন ভরিয়া উঠিত। হয়তো সকলকে তুমি গ্রহণ করিতে না। কিন্তু, কে জানে, নন্দলাল বা অবনীন্দ্র, বা কোন নূতন শিল্পী মুহূর্তমধ্যে তোমাকে এই ইট্যার্‌নিটির প্রশান্ত অন্তঃপুরে পৌঁছাইয়া দিত, তোমার ধ্যানলোকে তুমি উত্তীর্ণ হইতে;---ইট্যার্‌নিটি উড্‌ ডিসেণ্ড অ্যারাউণ্ড্‌ ইউ। একবার দাঁড়াইলে, তুমি ইন্‌টেন্স্‌ লিভিং-এর মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যাইতে; দেয়্যার ইজ ওনলি ওয়ান ইট্যার্‌নিটি—ইন ইন্‌টেন্স্‌ লিভিং। সারা দিনের ছুটাছুটিতে তুমি তাহাই উপেক্ষা করিয়া গেলে।...'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।'...সমস্তটা

দিন এই ছুটাছুটি---স্নান নাই, আহার নাই, বিশ্রাম নাই—যেন উন্মত্ত কীটাণুদুষ্ট কোনো কুকুর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছুটিতেছে।...যাওয়া যায় না? এই সুপ্ত প্রাসাদের দ্বার খুলিয়া একবার চুপি-চুপি, অমিত, এখন সেখানে ঢুকিলে---গৃহমধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইবে, প্রাচীরের যে কল্পনা-মূর্তিরা নামিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গোপন সভা ভাঙ্গিয়া যাইবে---তাহারা ছুটিয়া পলাইবে...গৃহান্তরবর্তী অন্ধকার তোমার অনধিকার-প্রবেশে চীৎকার করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িবে।...

* * *

অমিত চোখ খুলিয়া আবার টান হইয়া বসিল। মাথায় কি সব অদ্ভুত খেয়াল যোগাইতেছে? আজ আর প্রদর্শনীতে যাওয়া হয় নাই। বাড়িতে ফাঁকিটা তবু বজায় রাখিতে হইবে, ধরা না পড়িলেই হয়। একদিন কিন্তু বিকাশের সঙ্গে প্রদর্শনীতে যাইতে হইবে। নন্দলালবাবুর ছবি কি আসিয়াছে, কে জানে! নূতন শিল্পীরাই বা কি করিতেছে? সেই ছদ্মভারতীয় চিত্রকলা ও অনুভূতিহীন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা বিক্রয় করিয়া ইঁহারা কতদিন মানুষকে ঠকাইবেন? অমিত জানে, এই ভারতীয়তার মূল নাই, তাই মূল্যও নাই। থাকিবে কি করিয়া? বাঙালীর সভ্যতারই মূলে শিকড় নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চাপে পড়িয়া দেশের ধনিকেরা শিল্পপতি হইতে পারিল না। শেঠ, বসাকেরা উলটা হইলেন জমিদার ও কোম্পানির কাগজের মালিক। বাঙালীসমাজে মধ্যযুগের আধ-ভাঙা সামন্ততন্ত্রই টিকিয়া রহিল ---অস্বাভাবিক এই বিদেশীয় শাসনে। এদিক আবার সে শাসনের চাপেই দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত হইল। দেশের মধ্যবিত্তরা পড়িল---বিলাতী বুর্জোয়া সভ্যতার যাহা সৃষ্টি তাহা। ইহাতেই তাহাদের মন রাঙা হইয়া উঠিল। তাহারাও একটা কিছু সৃষ্টি করিতে গেল। কিন্তু সৃষ্টি জিনিসটা এই অনাসৃষ্টির মধ্যে আর সম্ভব নয়। সৃষ্টির নামে এখন উহারা খোঁজে নিজেদের এই বিক্ষুব্ধ বাস্তব হইতে আত্মগোপনের উপায়—থট ইজ রিপ্রেসড অ্যাক্‌শন। আর্ট ইজ অ্যান ইস্‌কেইপ ফ্রম লাইফ্‌।

জীবনকে বীরের মতো না হউক, পুরুষের মতো স্বীকার করাই বড় কাজ। পৃথিবীকে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখিবার মতো বুদ্ধি ও সাহসই বড় কথা। বাস্তব পৃথিবীর এই বাস্তব রূপান্তরের দাবিকে নিজের জীবনে গ্রহণ করিতে পারাই বড় সার্থকতা। অমিত তাহাই করিতে চায়। থাক শিল্প-প্রদর্শনী, থাক চিন্তার মুক্তি, হল-কেনের অনুবাদ কিংবা টেক্‌স্ট বই।

অমিতের মনে পড়িয়া গেল---'হল-কেনের অনুবাদ কিংবা টেক্‌স্ট-বই', অনুকূল দত্ত ও বঙ্কিম বাঁড়ুজ্জে, অতীত-প্রায় জেনারেশন।...পাকা বিষয়ী বুদ্ধি...ক্লীব এই জেনারেশন---কি শুষ্ক ইহারা! আত্মার এক অন্ধকার নিশা।—ইহার অপেক্ষা এই সুনীলদের উন্মত্ত আত্মবিলোপও অনেক বেশি হেল্‌থি; ইন্দ্রাণীর অশান্ত গতিবেগও পুষ্টিকর।

অমিতের একে একে মনে পড়িল---ইন্দ্রাণী, সুনীল, দীনু, মোতাহের—হাঁ,

মোতাহেরও। না, নূতন জেনারেশন নূতন ধারণা, নূতন কল্পনা ও নূতন পদ্ধতিতে ব্যাকুল হইয়াছে। বুড়োরা কহিতেছে—নূতনদের দান নাই। সত্যই তাহাদের দান নাই। তাহারা যে খুঁজিতেছে,—নানা পথে, নানা মতে, নানা প্রয়াসে পথ খুঁজিতেছে—ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসায় জ্বলিতেছে। তাহাদের দান? তাহাদের দান যে আত্মদান। তাহাদের দান—স্বপ্ন। এখনও তাহারা স্বপ্ন দেখিতে জানে। জীবনরূপ মহাস্বপ্নে তাহারা বিভোর। And whom a dream hath possessed he knoweth no more of doubting. অনলশিখার মতো তাহারা। তাহারা সবাই জ্বলিতেছে—জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইতে চলিয়াছে। না, খাক হয় নাই, হইবে না। তাহারা জ্বলিবে—জীবন ব্যাপিয়া জ্বলিবে—দিনের পর দিন জ্বলিবে—'দি বার্নিং বুশ বার্ণ্ড উইথ ফায়ার, অ্যাণ্ড দি বুশ ওয়াজ নট ক্যান্‌সিউম্‌ড্‌। ...'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' এই তাহাদের প্রার্থনা।—ছোঁয়াইলে এযুগে কবিতা বাহির হয় না—অপূর্ব, বিকাশ যাহাই বলুক—মানুষ ক্ষেপিয়া যায়।

* * *

অমিত একবার চোখ মেলিয়া দেখিল—একটা বায়োস্কোপের বাড়ি। বাড়িটার আলো নিবানো। তবে কি রাত্রির অভিনয়ও শেষ হইয়াছে? আজ যে সুহৃদের সঙ্গে ফিল্মে যাইবার কথাও ছিল। সুহৃদ আবার অমিতের খোঁজে তাহার বাড়ি না গিয়া থাকিলেই এখন রক্ষা। তাহা হইলে বাবা-মা আবার বুঝিবেন, অমিত ফাঁকি দিতেছে। আজ পূর্বেই নিবারণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবে, কেহ তাহার খোঁজে আসিয়াছিল কি না। সুহৃদ খুব রাগ করিয়াছে। করুক, অমিতের উপায় নাই। তাহার কি সাধ যায় না গান শুনিতে, বায়োস্কোপ দেখিতে, আড্ডা জমাইতে কিন্তু মন যে সরে না; তাহার সমস্ত মন যে অস্বীকার করে। সুহৃদ বুঝিবে না। সুধীরা কিন্তু বোঝে। সুধীরার প্রাণে কোথায় গভীরতা আছে। সেখানে বেদনার তার গোপনে বাজিতেছে। কি অনির্দেশ্য এই বেদনা? অমিত ভাবিয়াই পায় না। সুহৃদের সঙ্গীতগ্রাহী কানে তো সুধীরার সেই সুর ধরাই পড়ে না। সুহৃদ ভাগ্যবান। এই শতাব্দীতে জন্মিয়া, হৃদয়হীন না হইয়াও এমন নিশ্চিন্ত আনন্দে ভাসিয়া বেড়ানো সহজ কথা নয়। সত্যই আজও যে এমন বুর্জোয়া-রচা দুর্গে নিষ্কণ্টকে ও নির্বিবাদে বাস করিতে পারে, সে ঈর্ষার বস্তু। অথচ সুহৃদের হৃদয় আছে, চেতনাও আছে—কেবল তাহা সবই সুকোমল আলোকে রঙিন, আগুনের আঁচে জ্বলিয়া যায় নাই। সত্যই সুহৃদ ভাগ্যবান। সাতকড়িও হঠাৎ উন্মনা হইয়া পড়ে—নিতান্ত শৌখিনভাবে হইলেও উন্মনা হয়—খণ্ডবিখণ্ডিত সমাজের গ্লানির জন্য একটিবার দীর্ঘশ্বাস সাতকড়িও ফেলে। সে অবশ্য জ্বলিয়া মরিবার মতো লোক নয়। এতক্ষণে হয়তো সে বরানগরের বাড়িতে অনারেব্‌ল অতিথিদের জন্য পেয় ও আহার্য বিলাইতেছে। চাই কি রাত্রির মতো তাহাদের শয্যাসঙ্গিনীদের বিলিবন্দোবস্ত করিতেছে—সাতকড়ি জ্বলিয়া মরিবে না। বিষয়ের প্রাচুর্যের মধ্যে সে বেশ আরামে কাটাইয়া দিবে। অনুকূল দত্ত দেখিয়া খুশি হইতেন—সাতকড়ি

একশত টাকা মাহিয়ানার সাব-এডিটর নয়। না, বঙ্কিম বাঁড়ুজ্জে-অনুকূল দত্তের ট্রাডিশন্ লোপ পাইবে না। বুড়াদের কাজ হাতে তুলিয়া লইবে---নিউ জেনারেশনের সাতকড়িরা আর অপূর্বেরা, এবং শৈলেনেরা---আত্মার অমাবস্যারাত্রিতে ইহারা ছোট ছোট জোনাকির মতো ঘুরিয়া বেড়াইবে।...

দুই-একটা জেনারেশন বলি দিতে হইবে। তারপর ভাবী জেনারেশনের অপূর্ব, বিকাশ যখন আসিবে, তখন এখানকার নীল আকাশের তলে নিশ্বাস লইতে তাহাদের আর গ্লানি বোধ হইবে না। তবু এই গ্লানিই আজ ললাটলিপি এযুগের কবির, বঞ্চিত কালের দার্শনিকের, লাঞ্ছিত জাতির বৈজ্ঞানিকের। ওল্ড জেনারেশন, ভাবী জেনারেশন সমর্পণ করিবে পরিপূর্ণ অর্ঘ্য---তোমাদের বিস্মৃত অলক্ষিত যজ্ঞবেদিকার উপরে।

* * *

অমিত চমক ভাঙিয়া উঠিল।...বাস বাড়ির পথ যে ফেলিয়া যাইতেছে। অমিত গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল।

বার

কড়া নাড়িতেও ভয় হয়, অথচ নিজেরই বাড়ি। বারোটা বাজিয়া গিয়াছে, এখনও বাবা-মা না জাগিয়া থাকিলেই মঙ্গল।

গলিটায় আজ এত লোক এত রাত্রি পর্যন্ত কি করিতেছে? তাহাকেই দেখিতেছে নাকি? একটা লোক আবার সরিয়া বাড়িটার ছায়ায় অন্ধকারে দাঁড়াইল যে!... বাজে লোক, বৃথা সন্দেহ।

যতটুকু অল্প শব্দ করিয়া সম্ভব, ধীরে ধীরে অমিত কড়া নাড়িল। নিবারণ দুয়ার খুলিয়া দিল, দুয়ারের পাশেই সে শুইয়াছিল। অমিত চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা খেয়েছো নিবারণ?

হ্যাঁ বাবু।

সুহৃদবাবু আমাকে আজ খুঁজতে এসেছিলেন নাকি?

না।

যাও, দোর বন্ধ করে ঘুমোও।

জুতার শব্দটা রাত্রিতে এমনই বড় হইয়া ওঠে---বিশ্রী! অথচ এই সময়টাতেই শব্দ হওয়া উচিত মৃদু। সাবধানে পা ফেলিয়া সিঁড়ি বাহিয়া অমিত উঠিতে লাগিল। বাতির সুইচ টিপিল না। কিন্তু একটু পরেই উপরকার বাতি জ্বলিয়া উঠিল, সিঁড়ির অন্ধকার ঘুচিয়া গেল। অমিত যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাই হইয়াছে---মা জাগিয়া আছেন।

সিঁড়ির উপরে মা দাঁড়াইয়া। খুব সহজ সুরে অমিত কহিল, এখনও ঘুমোও নি যে?

মা তাহার চোখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, ঘুম পায় নাকি? সারা দিন খোঁজ নেই তোমার---

কেন? ব'লে গেছলাম তো বিকাশের ওখানে খেতে হতে পারে। বিকাশ যে পাগল, ছাড়লে না। তোমাকে বলে নি নাকি কেউ?

মা কহিলেন, বললে কি হবে? বসে থাকতে তো হয়। আর তারপরে এতটা রাত হয়েছে—দেড়টা-দুটো।

দেড়টা-দুটো! তোমার যেমন কথা! বারোটা বাজবে।

অমিত জামা-কাপড় ছাড়িতে লাগিল। মেঝেতে খাবার ঢাকা রহিয়াছে---গরম জলের বড় বাটির মধ্যে একটি বাটিতে রুটি তরকারি। শীতে যেন ঠাণ্ডা না হইয়া যায়, তাই এই আয়োজন।

অমিত কহিল, খাবার তো ইচ্ছে নেই। সুহৃদের পাল্লা, খেতে হল ওর ওখানে। তারপর এই রাত্রি সাড়ে ন-টার বায়োস্কোপ। যাক্ ফিল্মটা ছিল ভাল---চমৎকার।

সহজ সুরেই অমিত কথা বলিতেছে; কিন্তু কথাটা জমিল না। মায়ের মুখ হইতে কিছুতেই চিন্তার মেঘ কাটিয়া যায় না। হাত-মুখ ধুইতে অমিত পাশের ঘরে গেল। ভাল করিয়া একবার মাথাটা ধুইল, শীতের রাত্রি, তবু মাথায় জল দিলে ঘুমটা ভাল হইবে।

খাবো নাকি?

মা দাঁড়াইয়া আছেন, কহিলেন, খাও, যতই খাও না, খানিকটা ক্ষিদে আছে।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই যেন অমিত খাইতে বসিল---ক্ষুধা নাই। তরকারি, মাছ একটু ছুঁইয়া যাইতে লাগিল---এই তো আটটার সময় সুহৃদ খাওয়াইয়াছে। এখন কি আর খাওয়া চলে?

খাওয়া শেষ হইল। তৈয়ারি বিছানায় অমিত গা ঢালিয়া দিল। হাতের কাছে রহিয়াছে টয়েনবির ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স। মা টেবিলের চিঠি দেখাইয়া দিলেন, কহিলেন ---আর একটা পত্রিকাও এসেছিল।

কই? কি পত্রিকা? বাংলা?

না, ইংরেজী।

দেখছি না যে?

ওঘর হইতে পিতা কহিলেন, এখানে আমার টেবিলে আছে। নিয়ে যাও।

সর্বনাশ, বাবাও জাগিয়া গেলেন যে।

না, আপনি পড়ে নিন পরে দেখবো।

রাত্রিতে একবার দেখো, তবে পড়ো না---রাত প্রায় একটা হতে চলেছে।

একটা! না বোধ হয়।

পিতা কহিলেন, হ্যাঁ, বারোটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ।

তাহা হইলে তিনি সমস্তক্ষণই জাগিয়া ছিলেন। অমিতের মন নিজের কাছে নিজে অপরাধী হইয়া উঠিল। মা কাগজটা আনিয়া দিলেন, নাইনটীন্থ সেঞ্চুরি অ্যাণ্ড আফ্টার। দুখানা চিঠি দিতে দিতে বলিলেন, ইন্দ্রাণী এসেছিল—এই রাতে, খানিকক্ষণ আগে; কি দরকার নাকি। রেখে গেছে একখানা চিঠি।

চিঠির লেখার দিকে হঠাৎ অমিতের দৃষ্টি পড়িল। পরিচিত লেখাই---ইন্দ্রাণীর সেই বাঁকা লেখা---দ্রুত অস্থির হাতের লেখা। আর সুরোর চিঠি। আগেও সুরো দুইখানা চিঠি লিখিয়াছে; আজ কাল করিয়া অমিতের উত্তর দেওয়া হইয়া উঠে নাই। অমিত কি করিবে? পারিয়া উঠে না।

অমিত চিঠি পড়িতে গেল। ইন্দ্রাণীর চিঠিই পড়িতে হয় প্রথম, কেন সে এত ছুটিতেছে? মাও তাহার এত রাত্রিতে ছুটাছুটি পছন্দ করেন নাই। অবশ্য ইন্দ্রাণীর তাহাতে দৃক্‌পাত নাই। সে আসিয়াছে অমিতের সন্ধানে, আর অমিত তখন গিয়াছে হয়তো তাহারই সন্ধানে। অমিত পড়িল---"কোথায় তুমি ঘুরছো? আমি যে তোমার জন্যে সারা দিন শহরের সর্বত্র ছুটে বেড়াচ্ছিলাম। বড় জরুরি কথা, বড় চিন্তার কথা। তোমার সম্বন্ধে দু-একটা খবর শুনলাম, মন যে আমার দুশ্চিন্তায়, নুয়ে পড়েছে। তোমাকে চাই আমি, শোভাযাত্রার খবরটা কাগজে পর্যন্ত দিতে যাই নি---তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। তুমি এস, আজ রাত্রিতেই এস---যত রাত্রিই হোক আসবে, কিছু ভেবো না; মনে করো না, ঘুমিয়ে পড়বো---ঘুম আজ আমার অসম্ভব।"

অমিত হাসিল, 'যত রাত্রিই হোক আসবে।' ক্ষ্যাপা ইন্দ্রাণী! যেন সম্ভব হইলে অমিত যাইত না। তথাপি দুইবার অমিতের মন বলিল, 'চল, চল।' তারপর 'না, এত রাত্রে আর না।'

অমিত সুরোর চিঠি খুলিল।---"দুই-দুইখানা চিঠি লিখে আশায় আশায় পথ চেয়ে রইলুম। বৃথা আশা। তোমার একছত্রের একটি উত্তরও নেই। নিজের কুশলটুকুও জানাতে চাও না, জানলেই বা কি বেশি হত? তুমি যে এমন মানুষ তা তো ভাবি নি; এমন যে তুমি হতে পার, তাও কোন দিন কল্পনা করি নি। বিজয়ার শুভাশীর্বাদটা থেকেও এবার আমাদের বঞ্চিত করেছো; (অমিত মনে মনে সকৌতুকে বলিল, 'ইচ্ছা করে নয়।') প্রণামটুকু গ্রহণ করলে কি না, তাই বা জানবো কি করে? ('তা সর্বদাই গ্রহণ করি।')

কিন্তু যাক, সপ্তাহ খানেকের মধ্যে আমি ফিরছি, ('কেন?') অনেক দিন ফেরবার দরকার ছিল। কাল খোকা এসেছে আমাকে নিয়ে যেতে। ('খোকা মানে, সুরোর ভাই? কবে সে এখান থেকে গেল জানতুম না তো!') তার মুখে তোমার কিছু কিছু সংবাদ শুনলাম, ('কি সংবাদ আবার!') সংবাদ কিছুই নয়, আবছায়া, ঝাপসা---কিন্তু আমাদের ভাবনার অন্ত নেই আর। তোমার কি হয়েছে?

শুনলাম, শরীরেও যত্ন নাও না। কোন দিনই তো খুব ভাল দেহ ছিল না। তার ওপর যদি এরূপ অমনোযোগী হও, তা হলে কি যে দাঁড়িয়েছে, তা বুঝতে পারি না। আমি আসছি, কিন্তু তার পূর্বেই তোমাকে সাবধান করছি, শরীর যদি খারাপ দেখি, তা হলে তোমার সঙ্গে আর দেখা করবো না। ঠাট্টা নয়।

দিন তিনেক আগে ওঁর সঙ্গে এখানকার একজন প্রফেসার এলেন আমার বাড়িতে। তোমারই সঙ্গে নাকি পড়তেন, একসঙ্গে পাস করেছিলে। উনি বললেন,

তোমার অনেক নীচে পাস করেছিলেন। এ ভদ্রলোকটি নাকি এবার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেলেন। ('ওঃ! বিনয় রায় বুঝি!') তোমার কথা মনে পড়ল। তুমি কি করছো? উনি বললেন, ইচ্ছা করলে তুমি নাকি অনেক আগেই তা পেতে পারতে। কিন্তু খোকা বললে, তুমি ওসব কাজ এখন আর করো না, খেয়াল-খুশিমতো ঘুরে বেড়াও। শুনে আমার মন আবার নিরাশ হয়ে গেল! তুমি কেন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ হচ্ছ না? ('পাচ্ছি না তাই।') ইচ্ছা করলে তুমি কি না করতে পার? ('হায় অবোধ মেয়ে! অনেক কিছুই করতে পারি না।') আমি এসে দেখছি, তুমি কি করো। আসছে বুধবার কলকাতা পৌঁছব, দুপুরেই আসা চাই। নইলে আমাকেই তাড়া করতে হবে তোমার বাড়ি; আর জানই তো তার অর্থ—তোমার বইয়ের আলমারির চাবি চুরি যাবে। এক সপ্তাহের মতো আমার কাছে কাছে খোশামুদি করে ঘুরতে হবে। বুঝলে?

আমাদের প্রণাম জানবে।"

* * *

আলমারির বই—অমিত একবার দেখিল, ধূলিমলিন গ্রন্থগুলি নীরব ভর্ৎসনায় তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। তাহাদের এখন আর পূর্ব আদর নাই। মনে পড়িল—সাতকড়ির বুককেস। এই আলমারিগুলি যেন তাহার তুলনায় রক্তহীন—দরিদ্র ভিখারী।

আবার চোখে পড়িল সুরোর চিঠি—বই-এর আলমারির চাবি চুরি করিয়া সে শাস্তি দিবে ভয় দেখায়। না, সুরো তেমনই রহিয়াছে—ঠিক তেমনই। তবু একটু বদলাইয়াছে—প্রথম দিকটার লাইন কয়টা অমিত আবার পড়িল। আগেকার সুরো এতটা ব্যাকুল হইত না—অভিমান ও রাগই ছিল তাহার নিয়ম। এখনও সুরো তাহা হারায় নাই। চিঠির মাঝখান হইতেই অমিত যেন পুরোনো সেই বালিকাকে দেখিতেছে। কিন্তু সে বালিকায় ছাড়াইয়া উঠিতেছে, তাহাতেও ভুল নাই। উঠিবে বইকি। বয়সও তো কম নয়—বোধহয় এখন তেইশ-চব্বিশ হইবে। মানুষ দেখিতে দেখিতে বড় হইয়া যায়—সুরোও কত বড় হইয়াছে। কিন্তু কেমন মানাইবে তাহাকে? ইন্দ্রাণীর মতো? না, সে ইন্দ্রাণীর অপেক্ষা ছোট—সেও কি এখন সবিতার মতো তেমনই সুশোভনা, মহিমময়ী হইয়া উঠিয়াছে? ...আবার ইন্দ্রাণীর চিঠিটা হাতে লইয়া অমিত ভাবিতে লাগিল। ইন্দ্রাণী কেন এমন উতলা হইল? যাইবে কি অমিত? এ রাত্রিতে? পাগল!...

* * *

মা ডাকিয়া কহিলেন, এবার ঘুমোও, আলো নেবাও।

একটু নাইনটীনথ সেঞ্চুরিটা উল্টে নিই।

বাবা কহিলেন, তা হলে সারারাতেও ওল্টানো শেষ হবে না। অনেক ভাল প্রবন্ধ আছে।

তিনি পড়িতেছিলেন নাকি?—পত্রিকার মধ্যে হইতে একখানা পুরাতন পোস্ট-

কার্ড বুকমার্করূপে উঁকি দিতেছে। অমিত পাতাটা খুলিল। অধ্যাপক ম্যারিয়টের লেখা ডোমিনিয়ান গভর্নমেন্ট সম্বন্ধে—ব্রিটিশ কন্‌স্টিটিউশনে ইহার কি অর্থ দাঁড়ায়, তাহারই ব্যাখ্যা।

পিতা পড়িতেছিলেন...চোখে তিনি এখন অল্প দেখিতে পান; তাঁহার রক্তের চাপও অধিক। তথাপি তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেয় না। এই নূতন কাগজখণ্ড তিনি কালই শেষ করিবেন। সার্ভে অব ইন্টার-ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স তাঁহার চার দিনে শেষ হইয়া গিয়াছে। অথচ অমিতের কতদিন লাগিবে কে জানে! অমিত হয়তো শেষ করিতেই পারিবে না। তাহার মন যে এখন, পড়ায় নিবদ্ধ হয় না। সত্যই তাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত—যেন কেন্দ্রহারা, অস্থির, এই যেমন ইন্দ্রাণী।... ইন্দ্রাণীর চিঠি অমিত আবার পড়িল। কেন এত ব্যাকুলতা তাহার?

অমিত আলো নিবাইয়া দিল। শেষবারের মতো বইয়ের আলমারিগুলি করুণ দৃষ্টিতে তাহাকে আহত করিল। তারপর—অন্ধকার।

এবার পিতাও ঘুমাইবেন। কিন্তু কি তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা। ব্রজেন্দ্রবাবুর কথা মনে পড়িল—কি সুতীব্র জ্ঞাননিষ্ঠা, শান্ত মনীষা। সত্যই এই যুগে অমিতেরা এই মনন শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। নিউ জেনারেশন বড়ই বিক্ষুব্ধমনা, কেন্দ্রভ্রষ্ট, খণ্ডিত চেতনা। নিউ জেনারেশন, বড়োদের কাজ তোমরা তুলে নিতে পারিবে না—অসম্ভব, অসম্ভব।...

Time is out of joint. Time is out of joint....

চোখ বুজিয়া আসিল।...কাল—কাল পড়িবে বইটা, আজ হইল না।...অনেক কাজ কাল। ইন্দ্রাণীর চিঠি হাতে ঠেকিল, সকালেই যাইতে হইবে। সুহৃদ ও সুধীরাকেও দেখিতে কাল যাইবে। সুধীরা নিশ্চয়ই আহত হইয়াছে। সন্ধ্যাবেলা—দীনুদের টাকা দিতে হইবে। কালও কি তাহা হইলে এ লেখাটা পড়া হইবে? আজিকার মতোই কালও তাহাকে ফাঁকি দিয়া যাইবে। তবু কাল...কাল...। আজ তো আর পারা নাই—যে ছুটাছুটি; কালও কি এমনটি হইবে?...দিনগুলা তো এইরূপেই শেষ হইয়া যায়—কিছুই করা হইয়া উঠে না; ভরসা থাকে—কাল।

দিনগুলি হাত-ধরাধরি করিয়া যেন ছুটিয়া পালাইয়া যায়—চোখের পলক সহে না—হঠাৎ দিনের মালাগাঁথা শেষ হয়—চোখ হয় পলকহীন।

দিনের পর দিন, দিনের পর দিন—জীবনের মালা পূর্ণ হইয়া আসে। জীবনের পর জীবন—কালের হাতের অক্ষমালা সরিয়া সরিয়া পর্যান্তে ঘুরিয়া আসে। বিপ্লবের পরে আবার বোধন, আবার নূতন কালের নূতন বিরোধ, নূতন সমন্বয়। —দিনের পর দিন—যুগের পর যুগ।

এইরূপে মহাকালের ধ্বনি প্রতিদিনের ক্ষুদ্র বাঁশীর মধ্য দিয়া উচ্ছ্বিত হইয়া উঠে। আজও তেমনই উঠিয়াছে—কালও তেমনি উঠিবে। আজও যাহা, কালও তাহাই—একই। কালও আজও,...আজও কালও।...

পিতা ঘুমাইলেন, বোধহয়। নাসিকাধ্বনি শোনা যায়। ওই নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে

ক্ষীয়মাণ অতীতপ্রায় জেনারেশন চলিয়াছে---রাত্রির এই নিশীথ-অন্ধকারে ওই দূরের তারাদের মতো তাহাদের চোখ তাকাইয়া আছে অগ্রবর্তী সন্তানদের দিকে—'আমাদের কাজ তুলিয়া লও---তুলিয়া লও---তুলিয়া লও।' মহাকালের বিলীয়মান তরঙ্গ ডাকিতেছে পিছনের তরঙ্গকে ---'মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াও---আকাশ ছুঁইয়া দাঁড়াও—সবিতার পদ চুম্বন করিয়া দাঁড়াও।'

ইহারাও আবার এমনই ডাকিবে---আবার এমনই নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ক্ষীয়মাণ নূতন যুগ ডাকিবে নূতনতর যুগকে।

অনন্তকাল এমনই ডাক চলিয়াছে। যুগান্তের অস্তরশ্মি মাথায় লইয়া আমরা আসিয়াছি--নিজেদের ডালি দিয়া না গেলে আমাদের মুক্তি নাই—নিমিষের বিদ্যুতালোকে আমরা জ্বলিয়া উঠিব---অনন্তকালের জন্য জ্বলিতে থাকিব –বার্নিং বুশ...।

আমাদের দান---আত্মদান---ইন্‌টেন্স্‌ লিভিং।

চোখ অমিতের বুজিয়া আসিয়াছে, মনে মনে সে কহিতেছে বার্নিং বুশ, বার্নিং বুশ...

সুনীল। সুনীল---দীনু---যুগল---মোতাহের...

These laid the world away; poured out the red
Sweet wine of youth; gave up the years to be
Of work and joy and that unhoped or serene
That men call age; and those who would have been
Their sons, they gave their immortality.

অমিত জিহ্বাতে স্বাদ লইতে লইতে নীরবে আওড়াইল---'The red sweet wine of youth' মনীশ---সুনীল---যুগল---দীনু---মোতাহের...

তারপর---

ইন্দ্রাণী---বুনু---সুধীরা---সবিত ---সারো---

Sufferance is the badge of this tribe—

চিরদিন মায়ের জাতের ওই পরিচয়---

For you, you too, to battle go,
Not with marching drums and cheers,
But in the watch of solitude,
And through the boundless night of fears,
Your infinite passion is outpoured.

আহত প্রাণের সহস্র ফাটল দিয়া ঝরিয়া পড়ে সেই বেদনা...আহত মৌন সেই প্রাণগুলি।...মা আজও মুখ বুজিয়া মৌন রহিয়াছেন---মুখ বুজিয়াই তিনি আঘাত সহেন।

'না, মা বড় জঞ্জাল! মরেও না।'

* * * * *

সুনীল আসিতেছে বুঝি? রক্তমুখো সার্জেন্টের দল ছুটিয়া চলিয়াছে অসহায় পথিকদের মারিবার জন্য...দেখিয়াছ ইন্দ্রাণী? দেখিয়াছ সেই জিঘাংসু মুখ? ...ঐ যে উহাদের দ্রুত পদশব্দ...ইন্দ্রাণী, এত রাত্রিতে তুমি কেন ব্যস্ত হইতেছ? আমি আসিব, সকালেই আসিব; রাগ করিও না, ইন্দ্রাণী।

নীচের তলায় ভারী বুটের সদর্প দৃঢ় শব্দ হইতেছে। বুঝি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে কে উঠিতেছে, না?

*　　　*　　　*

আমাদের চোখে পড়িল, ভোরের আলো আসিতেছে। অন্ধকার সরাইয়া নূতন দিনের বাতায়ন খুলিতেছে।

ততক্ষণে সবুট পদধ্বনি দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া গেল।

অন্যদিন

স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

ও

স্বর্গীয় সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উদ্দেশে

এক

প্রাঙ্গণ পার হইয়া শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে প্রভাত-আকাশের প্রথম দূত।

চোখ মেলিতে না মেলিতে অমিতের চোখে আসিয়া পড়িল আর-একটি দিনের আলো। আশ্চর্য বাংলাদেশ, আশ্চর্য তার শরৎকাল! সাত দিন বুঝি আজ? না আট দিন? প্রতিদিন প্রভাতে চোখ মেলিতেই আগ্রহভরে অমিত তাকাইয়াছে বাহিরের প্রাঙ্গণের দিকে, দেখিয়াছে নূতন দিনের আলোক আসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে সেই প্রাঙ্গণের শিশিরার্দ্র ঘাসে, বর্ষা-বিধৌত অশ্বত্থের পাতায়, সম্মুখের স্তব্ধ-নিথর পুকুরের জলে, আর প্রাচীর-পারের দূর ঝাউগাছের চূড়ায়। আট দিনের প্রভাত আজ—নিদ্রাজড়িত চোখের উপর আজও লাগিয়া গেল শরতের সোনা-মাখানো দিনের মায়া। সমস্ত মন ও দৃষ্টি আজও বলিয়া উঠিল—আশ্চর্য বাংলাদেশ, আশ্চর্য তার শরৎকাল। কত সাধারণ, আর কত অসাধারণ তাহা!

সাত দিন আগেকার প্রভাতে এ সত্য এমনি সবিস্ময়ে অমিত মানিয়াছিল চলন্ত ট্রেনের কামরা হইতে। আসানসোল ছাড়াইয়া তখন উদীয়মান সূর্যের দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে দিল্লী এক্সপ্রেস; আবদ্ধ কামরার পিঞ্জর হইতে অমিত দেখিল—বাংলাদেশ।—শরৎকালের বাংলাদেশ। কতকাল দেখে নাই তাহা অমিত। কিন্তু দেখিয়াছেও কত বার আগে। তথাপি এ যেন আর দেখা নয়—আবিষ্কার। এ যেন আর পরিচিত পথ-ঘাট-প্রান্তর নয়,—এক আবির্ভাব। দেখিয়াও তাই শেষ করা যায় না এ দেখা—শেষ করা যায় না কোনো দেখা।... কোনো দেখাই শেষ করা যায় না—অমিতের মুগ্ধ দৃষ্টি যেন এই প্রভাতের প্রাঙ্গণের দিকে তাকাইয়াও তাহাই আবার স্বীকার করিতেছে: দেখিয়া শেষ করা যায় না কাহাকেও—আকাশকে নয়, পৃথিবীকে নয়, আলোককে নয়, অন্ধকারকে নয়, মানুষকে নয়, পশু-প্রাণীকে নয়,...কোনো দেখারই শেষ নাই।

আশ্চর্য বাংলাদেশ! আশ্চর্য তার শরৎকাল! কথা না বলিয়াও কথা কহিয়া উঠিল অমিতের মন।

এমন দিনের আগমনী গাইবে না, অমিত?

* * *

অমিত আর স্থির থাকিতে পারিল না। বিছানা ছাড়িয়া গারদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সাত দিনই সে এমনি দাঁড়াইয়াছে;—বাংলাদেশের প্রভাতকে এমন করিয়া

প্রণাম জানাইয়াছে। ভাষাহীন আনন্দের এই প্রণাম তাহার,—তাহার ও আরো অনেকের। ইহার মধ্যে আসিয়া মিশিয়াছে তাহাদের দীর্ঘ বৎসরের দিন-রাত্রির নিশ্চল প্রতীক্ষা, আর দীর্ঘদিন-মাসের বাঁধ-ভাঙা অধীর আগ্রহ!⋯এক-একটা দিনই এখন এক-একটা পরীক্ষা। ছয় বৎসর যেন ইহারই প্রস্তুতি। ছয় বৎসরের চাপা-পড়া আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা অবশেষে দিন ও প্রহরের হিসাবে আসিয়া পৌঁছিতেছে; এবার তাহারা আর শাসন মানিতে চায় না। এক-একটি প্রভাতের মধ্যেই আকুলি-বিকুলি খায় ছয় বৎসরের প্রত্যাশা; এক-একটি প্রশ্নের মধ্যে উদ্দাম হইয়া উঠে ছয় বৎসরের প্রতীক্ষা। ছয় বৎসরের প্রত্যাশা আর ছয় বৎসরের প্রতীক্ষা. প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা...

মাথা ঝাঁকিয়া কোন একটা অনিবার্য চিন্তাকে অমিত ঝাড়িয়া ফেলিল। আবার সানন্দ দৃষ্টি মেলিয়া দিল প্রাঙ্গণ ছাড়াইয়া, প্রাচীর ছাড়াইয়া বাহিরের ঝাউ-অশ্বত্থের দিকে, নবালোকিত আকাশের বুকে। আর, আবার মনে-মনে বলিয়া চলিল—আশ্চর্য বাংলাদেশ, আশ্চর্য তার আশ্বিনের এই প্রভাত। . আশ্বিনের বাংলা যেন স্নেহ-সজল বাঙালী মায়ের মতো---পরগৃহ হইতে কন্যার আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। চক্ষে স্নেহাশ্রু বিন্দু, বক্ষে আনন্দের ধীর আলোড়ন...যেন বাঙালী মা...

মা ..মন জাল বুনিয়া যায়।

অমিতের জন্য আর বসিয়া নাই মা। সকাল না হইতেই আর দেখিতে আসিবেন না—অমিত ঘুমাইতেছে, না, জাগিয়া বসিয়া আছে। রাত্রির আঁধারে সন্তর্পণে আসিয়া আর দুয়ারে দাঁড়াইবেন না, দেখিবেন না—অমিত পড়িতেছে, না, শুইয়া পড়িয়াছে। এদিকে সকালবেলা হাত-মুখ ধুইয়া চা না পাইলে অমিত রাগ করে। চায়ের দেরি থাকিলে অমিত বিছানা ছাড়িয়াও উঠিতে চাহে না। আবার চায়ের পেয়ালার টুং টাং শব্দ শুনিলেই সে উঠিয়া আসিবে,—মা তাহা জানেন। উঠিয়া মায়ের সহিত এ-কথা ও-কথা বলিয়া একটা গল্প ফাঁদিবে; চাহিবে মায়ের গম্ভীর উদ্বিগ্ন মুখে একটু স্বাচ্ছন্দ্য ফুটাইয়া তুলিতে। কিন্তু তাহা আর এখন সম্ভব হয় না। মাও জানেন, আগেকার দিন হইলে অমিত এরূপ গল্প ফাঁদিত না;—মায়ের সহিত চা লইয়া অমিত করিত মিথ্যা কলহ, মাও করিতেন অমিতের উপর মিথ্যা রাগ!

তা বেশ, আমি যখন চা করতে জানি না, তুমি চা-করতে-জানা বউ আনলেই প র।

অমিত অমনি উত্তর দিত: কোন্ গরজে? তুমি চা করতে জাননা বলে পরের মেয়েকে এনে খাটাতে হবে এ বাড়িতে?

তাই নিজের মাকে খাটাতে হবে, না?

নিশ্চয়। মজা পেয়েছ—ভালো করে চা-টুকুও তৈরি করতে পার না?

খুশিতে হাসিয়া উঠিত দুষ্টু বোনটা, অনু। মা কিন্তু তখন রাগ করিতেন: পারব না আমি। এর চেয়ে ভালো হবে না আর চা।

না হলে তোমাকে ছাড়ছে কে?

কেন, তোমার চাকরি করি না কি?

নিশ্চয়।

মায়ের পক্ষ লইবার জন্য ছোট ভাই মনু তখন তৈয়ারী হইতেছে। অনুর বাড়াবাড়ি সে দেখিতে পারে না : কেন, অনু করে কি? চা-টুকুও করতে পারে না?

মা অমিতকেই উত্তর দিবেন : কবে থেকে করি তোমার চাকরি?

জন্ম থেকে;—আর মৃত্যু পর্যন্ত।

মায়ের মুখের গর্ব ও আনন্দের হাস্য লুক্কায়িত থাকে না।

'জন্ম থেকে,—আর মৃত্যু পর্যন্ত'—কতবার মায়ের সঙ্গে এমনি ছলকলহে অমিত তাহার দিন আরম্ভ করিয়াছে। সাধারণ বাঙালী মায়ের মতই তো তাহার মা;—অমিত আকাশের দিকে কি চাহিয়া নাই?...রঙে সাধারণ, রূপে সাধারণ, কথায় সাধারণ। হয়তো স্নেহ-ভালোবাসায়ও অসাধারণ নন। কত সাধারণ,—আর কত অসাধারণ তবু মা।...সাধারণ বাঙালী মায়ের মতোই ছিল তাঁহার জীবন, আর হয়তো জীবনান্তও মিলিল তেমনি সাধারণ বাঙালী মায়ের মতোই।—সেই মাঝারি গোছের রং তখনি ঔজ্জ্বল্য হারাইতে শুরু করিয়াছিল। করিবেই তো, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা তাঁহাকে তখন পাইয়া বসিতেছে। তাঁহার দিনে শান্তি নাই; রাত্রিতে তিনি স্বস্তি পান না—অমিত কি করিতেছে? কোথায় চলিয়াছে? পিতার শান্ত স্থির মূর্তি তখন গম্ভীর হইতেছে, মায়ের বুক রাত্রি-দিন ভয়ে দুরু-দুরু কাঁপে। পঞ্চাশের দিকে আগাইয়া চলিয়াছেন কেন না; রঙের ঔজ্জ্বল্য, স্বাস্থ্যের বাঁধন সবই চিড় খাইবার কথা—বয়স হইতেছে; আর কত খাটিবেন? তবু তাঁহার নাতিস্থূল কোমল দেহে তখন ক্লান্তি ছিল না, আলস্য ছিল না;—ক্লান্তি আসিবেও না, আলস্যও না। কিন্তু অমিতের ভাবনায় ভাবনায় মায়ের মুখে পড়িল কালো ছাপ, দেহে আসিল কেমন অস্থিরতা। চিড় খাইল না, কিন্তু ক্ষয় হইয়া যাইতে লাগিল বুঝি সেই প্রাণ আর তাহার অধিষ্ঠান সেই দেহ।

বড়ি ঝি অমিতকে ছাড়িত না। তোমার জন্য শেষ হলেন, বাপু, মা। ভাত কোলে করে বসে থাকবেন সারা দুপুর। চক্ষেও দ্যাখো না নিজের মায়ের চেহারাটা?

দেখিত না কি অমিত মায়ের সেই উদ্বেগ-ভরা, জিজ্ঞাসা-ভরা, আশঙ্কা-ভরা রূপ? দেখিত না কি সেই ছায়া-পরিম্লান দেহের নির্বাক্ জিজ্ঞাসা, নিরুপায় মিনতি? আর কলহহীন থমথমে দিন-রাত্রির অস্বচ্ছন্দ সম্পর্ক মাতায়-পুত্রে, পিতায়-পুত্রে, সমস্ত গৃহে—দেখিত না কি অমিত, বুঝিত না কি অমিত মাকে?

অমিত রাগ করিয়া উত্তর দিত : ভাত কোলে করে বসে থাকতে তাঁকে বলেছে কে? জানই তো, দেরি হলে আমি হোটেলে খেয়ে নেব, বাড়ি ফিরব না। বলিত আর সঙ্গে সঙ্গে অমিত নিজের উপরও রাগ করিত।

মা তাহাও জানিতেন, জানিতেন তাহার অর্থও। তাই আরও বেশি উৎকণ্ঠায় বসিয়া থাকিতেন। আর ইহাও অমিত জানিত—বলিলেও অন্য কথা মা শুনিবেন না, বসিয়া থাকিবেন। ঠাকুর চাকর চলিয়া যাইবে, বেলা গড়াইয়া যাইবে; পরিচিত পদক্ষেপের জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিবেন তবু অমিতের মা। ইহাও তিনি জানেন—সে পদক্ষেপ আর ঐ-বেলা শোনা যাইবে না, দুয়ারের কড়া আর নড়িবে না। মধ্যাহ্নের রাঁধা

ভাতও আর খাইবার যোগ্য নাই; অমিতকে তাহা খাইতেও মা দিবেন না। তবু বসিয়া আছেন মিনিট গুনিয়া, ঘণ্টা গুনিয়া।

অমিত জানে বসিয়া আছেন, বাবাও; কিন্তু আপনার গৃহে। স্থির, সংযতচিত্তে, ঈজিচেয়ারে চোখ বুজিয়া বসিয়া আছেন; কিন্তু কান রহিয়াছে সদরের কড়া-নড়ার অপেক্ষায়। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কাটাকুটির ফাঁকে কতদিন এই চেতনাও নাড়া দিয়াছে অমিতকে। বাসের কর্কশ চীৎকার ও দুর্গন্ধ ধোঁয়া এবং দ্বিপ্রহর রৌদ্রের দুঃসহ তেজ যখন স্নানাহারহীন অমিতের স্নায়ুতন্ত্রীকে তীক্ষ্ণ, অস্থির করিয়া তুলিয়াছে, কলিকাতার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ছুটিবার কালে তখনো অমিতের মনের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছাইয়া রহিয়াছে এই চেতনা—মা বসিয়া আছেন, বসিয়া থাকিবেন;—বসিয়া আছেন, বসিয়া থাকিবেন—দিনে, রাত্রিতেও। খিদিরপুরে আর বেলেঘাটায়, টালা আর টালিগঞ্জে কথা বলিতে-বলিতে আর কথা না বলিতে-বলিতে অমিতের সতর্ক সুতীক্ষ্ণ চক্ষুর মধ্যে জ্বলিয়া উঠে সেই এক বাঙালী মায়ের অবসন্ন ক্লান্ত রূপ. .মা অপেক্ষায় বসিয়া আছেন জানালার ধারে, হাতের বাঙলা সংবাদপত্র ঘরের মেঝেয় লুটাইতেছে; ঘুমে মাথা ঢুলিয়া পড়িতেছে, অপরাহ্ণের দীর্ঘ ছায়া দীর্ঘতর হইতেছে ঘরের মেঝেয়...'জন্ম থেকে, আর মৃত্যু পর্যন্ত' অমিত, মুক্তি নাই, মুক্তি নাই তোমারও। বিরাটকাল তোমাকে কাড়িয়া লইতেছে, নিবিড় মমতা তোমাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। এ কী অলঙ্ঘ্য আহ্বান ইতিহাসের, তোমার কাছেও! এ কী দুশ্ছেদ্য বন্ধন জীব-চেতনার, তোমার মধ্যে। মুক্তি নাই, মুক্তি নাই তোমারও। 'মা বড় জ্বালা, মরেও না'—বলিয়াছিলে অমিত? 'মুক্তি পাইয়াছ কি, অমিত?—

জিজ্ঞাসা করে অমিত নিজেকে আজ। জিজ্ঞাসা করে আর উত্তর দেয়:

মুক্তি পাইয়াছেন আজ মা।...

চার বৎসর পূর্বে অমিত অনুর পত্র পড়িয়াছে:

"রাত-দুপুরে উঠে দেখি মা ঘরে নেই। তোমার ঘরে আলো জ্বলছে। গিয়ে দেখি, মা তোমার বিছানা পাতছেন। মশারি টাঙাবেন—দড়িটাকে কিছুতেই বাঁধতে পারছেন না দেয়ালের আংটাটার সঙ্গে। বললাম, 'এ কি করছ, মা?' আমার হাত ছাড়িয়ে নিলেন। বললেন, 'কখন আসবে, কত রাত্রিতে অমি' আসবে, ঠিক আছে কিছু? বিছানা করে রাখি তো।' জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে তাঁর শরীর।...কর্তৃপক্ষকে খবর দিলাম; তোমার ছুটির জন্য দরখাস্ত করেছি।"—অমিতও দরখাস্ত করিয়াছে—দরখাস্তের পর দরখাস্ত, টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম: "শুধু এক সপ্তাহের ছুটি চাই মাকে শেষবার দেখতে।"—অনু আবার লিখিয়াছে, "পুলিশ তদন্ত করতে এসেছিল। বলে গেল,—তুমি আসছ শীঘ্রই, ছুটি হয়ে গিয়েছে। মাকেও বাবা বুঝিয়ে বললেন—তুমি আসবে দু-এক দিনের মধ্যে। মা আশা পেলেন। কেমন ভালোর দিকে চলল। দুপুরে একটু ঘুম পেয়েছিল সেদিন। হঠাৎ জেগে চমকে দেখি—মা বিছানায় নেই। উঠে বসে আছেন জানালার কাছে। বললেন, 'অমি' আসছে।' শুনতে চান না কোন কথা। বুঝোতে চাইলে কেমন তাকিয়ে থাকেন

চোখ মেলে...অনেক করে এনে শুইয়ে দিলাম।...দুদিন পরে শুক্রবার দুপুর-বেলা মা আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন—"

পত্র-পরীক্ষকের জমাট কালির সুদীর্ঘ আঁচড়ে পত্রের লেখা তার পর বিলুপ্ত।

পরের সোমবারই অবশ্য অমিত জানিল, মা নাই। আর তার পরের বুধবার পৌঁছিল বাঙলা সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের শীলমোহরযুক্ত উত্তর—অমিতের নামে পূর্ববর্তী বুধবারের লেখা: "তাহাকে জানানো যাইতেছে যে তাহার মাতার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে। অতএব, তাহাকে ছুটি দিবার আর কোনও কারণ নাই।"

সত্যই আর কারণ নাই, মুক্তি তখন পাইয়াছেন মা। 'মা বড় জ্বালা,' অমিত ; এবার তিনি মরিয়াছেন। তোমাকে মুক্তি দিয়া গিয়াছেন।...আর জানালায় বসিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিবেন না তোমার পথ চাহিয়া। অমনি করিয়া মায়া-ভরা দৃষ্টি লইয়া অমন কেহ আজ আর অপেক্ষা করিবে না এই প্রভাতের আলোকে তোমার জন্য, অমিত। আকাশে দিনের আলো ফুটিবে, আরও সুন্দর হইয়া ফুটিবে সেই আলো বাঙলাদেশের বুকে, আগমনীর আহ্বান বাজিয়া উঠিবে বাঙলাদেশের আলো-বাতাসে...কিন্তু তোমার গৃহে কাহারও প্রাণে সেই বাঁশি আর বাজিবে না...'মা বড় জ্বালা', না অমিত ?

এ কি !—অমিত চমকিয়া উঠিল। নিজেকে তিরস্কার করিল,--এ কি, অমিত, এ সব কি ভাবিতেছ ? এই সুন্দর শরৎ-প্রভাতের দিকে তাকাইবে না ? শরতের বাঙলাদেশকে দেখিতেছ না ?---না, না, অমিত অন্য কথা ভাবিবে।---দ্যাখো তো, এমন শরৎকাল আসে আর কোন্ দেশে ? আসে কি উত্তর-ভারতে ? আসে কি দক্ষিণ-ভারতে ? দেখিয়াছে এমন শারদশ্রী ইংলণ্ডের মানুষ ? দেখিয়াছে রূপমুগ্ধ কবি কীটস্ ? সেখানে প্রবীণ হেমন্ত হরিৎ-পাণ্ডুর শস্যক্ষেত্রের আল বাহিয়া চলে মন্থর চরণে, বাজনতাড়িত পক্ককেশ প্রৌঢ় 'অটাম' বিশ্রাম করে গোলাবাড়ির কোণে সমাগতপ্রায় বার্ধক্যের অবসাদে। মহাকবি কীটস্, দেখিতে যদি আমাদের শারদ-লক্ষ্মীকে! এখানে শ্রান্তি নাই, অবসাদ নাই ; প্রতিটি প্রভাত যেন আগমনী অনাগতের আশ্বাস। সে আশ্বাসই কি বহিয়া আনিল আজ এই প্রভাতের আলো ? হে মুক্ত আকাশের দূত, জান নাই তোমার স্বপ্নে স্বপ্নে বহিয়া গিয়াছে বন্দী পৃথিবীর কত দিন আর কত রাত্রি ? কত দিনের সংগোপন প্রত্যাশা আর রাত্রির সতীব্র প্রতীক্ষা—কত নিরুদ্ধ প্রত্যাশা আর অসম্পূর্ণ প্রতীক্ষা!

'প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা ?' না।—হাত দিয়া শব্দ দুইটিকে অমিত যেন দূরে সরাইয়া দিল। প্রাঙ্গণ ও আকাশের দিকে আর-একবার তাকাইয়া তখনি মুখ ফিরাইল। দিনের আলো এখনি ফুটিয়া উঠিবে ; হাত মুখ ধুইতে হইবে।

ঘরে নাক ডাকিতেছে এখনো কাহার ? লক্ষ্মীধরবাবুর। ভাগ্যবান লক্ষ্মীধরবাবু ! দিন বা রাত্রি, বর্ষা বা গ্রীষ্ম,—কোনো ঋতুরই উপর পক্ষপাতিত্ব নাই তাঁহার নাসিকার। দুইজনের গৃহেও উহার বাধা নাই, বাধা নাই এই বিশজনের ব্যারাকেও।.. জ্যোতির্ময়ও মাথার উপর চাদরটা টানিয়া দিয়াছে। তাহার সকাল বেলাকার এই মিষ্টি ঘুমটুকুর প্রতি আকাশের আর সূর্যের অনন্তকালের ঈর্ষা। দুই-ঘণ্টার মতো আকাশ আরও অন্ধকার হইয়া থাকিলেই বা কি ক্ষতি ছিল ? কি ক্ষতি হইত পৃথিবীর যদি ভারতবর্ষের

আকাশে সূর্যদেব এমন প্রত্যূষে না উঠিয়া একটু দেরি করিয়া উঠিতেন? শুধু জ্যোতির্ময় ভোর বেলাকার এই নিদ্রাটুকু নিষ্কণ্টক ভোগ করিতে পারিত—আটটা পর্যন্ত। কিন্তু জ্যোতির্ময়ও পরাজয় মানিবে না—চাদরে মুখ ঢাকিয়া আরও একঘণ্টা অন্তত এই ঘুমের মাধুর্যকে সে বাড়াইয়া লইবে, অবজ্ঞা করিবে লক্ষ্মীধরবাবুর নাসিকা-গর্জন। মনে মনে হাসিয়া অমিত টুথ পেস্ট লইয়া 'সাত খাতার' আঙিনায় বাহির হইয়া গেল—শহরের কলে জল আসিয়াছে নিশ্চয়। আঙিনায় নীহার মিত্র শ্লথ-নিরুদ্দেশভাবে পদচারণা করিতেছে। মুখ শুষ্ক, দেহ ক্লান্ত, মাথার চুল অবিন্যস্ত;—যেন সে বহু পথ পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেছে। অমিতের সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই নীহার মিত্রের ম্লান ওষ্ঠপ্রান্তে ক্লান্ত হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। তেমনি একটু বেদনাময় হাস্যে অমিত তাহাকে সম্ভাষণ জানাইল। একবার জিজ্ঞাসা করিল, 'আজও—?' নীহার মিত্র চলিতে চলিতেই ঘাড় নাড়িয়া ক্ষীণ নির্বাক হাসি হাসিয়া জানাইল—বলা নিষ্প্রয়োজন। ক্লান্ত ওষ্ঠ, কণ্ঠ যেন আর ক্লান্তিভরে মুখ ফুটিয়া বলিতে চাহে না—নীহার মিত্রের কাল রাত্রিতেও ঘুম হয় নাই। এখনো তাহার অনিদ্রার একটা নূতন পর্ব চলিয়াছে। অনেক রাত্রির মতো গত রাত্রিও সেই নিদ্রাহীন যাতনায় কাটাইয়াছে। এ যাতনা অসাধারণ নয়, নীহার মিত্র একাই এ যাতনা সহ্য করে না। কারাবাসে ইহা একটা মামুলী পীড়া। কিন্তু কী অসহ্য তবু এই যাতনা! না অমিত তাহা ভাবিবে না, ভাবিতে চাহে না। অমিত ভালো করিয়াই জানে নিদ্রাহীন রাত্রির সেই নির্দয়তাকে—ভালো করিয়াই জানে তাহা।

নল ছাপাইয়া জল পড়িতেছে শহরে। মোটা নল হইতে অনেকটা জলধারা সবেগে উৎসারিত হইয়া পড়ে। সুবৃহৎ কলিকাতার বিপুলসংখ্যক অধিবাসীদের প্রাণধারা যেন জাগিয়া উঠিতেছে সকাল বেলাকার এই জলধারার সঙ্গে। ভিতরের আঙিনার নিম ও প্রাচীর-পারের বাহিরের কৃষ্ণচূড়ার মাথায় ভর করিয়া সূর্যালোক এখনি নামিয়া আসিবে এই ওয়ার্ডের নীচু আর্দ্র মেঝেয়—আসিবে তাহা কলিকাতার দেবদারু নারিকেলের মাথায় ভর করিয়া, রাত্রিশেষের সিক্তস্নাত পথে পথে পা ফেলিয়া। আপার সার্কুলার রোডের পশ্চিম পারের বাড়িগুলির গায়ে ঊষার সোনা-মেশানো আলো এখন প্রভাতের রূপা-ঢালা রৌদ্র হইয়া উঠিবে। পূর্বপারের খর্বকায় গাছগুলির পাতায়ও এতক্ষণে সেই সূর্যালোক আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে। শ্যামবাজারের মোড়ে বাসের উচ্চকিত গর্জন ও ট্রামের একটানা আত্মঘোষণা এবার পথযাত্রীর পদধ্বনির ও কণ্ঠধ্বনির সঙ্গে মিশিয়া শহরের কোলাহলে পরিণত হইতেছে। হাফশার্ট ও হাফপ্যান্ট পরা ডাঃ বোস এতক্ষণে ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিতেছেন। দোকানের কাঠের পাটখানা ধুইয়া-মুছিয়া গোষ্ঠ পানওয়ালা এবার স্থির হইয়া বসিতেছে। 'বিনোদ কেবিনের' চায়ের খরিদ্দাররা 'সিঙ্গল' কাপ শেষ করিয়া আর-এক 'হাফ কাপের' জন্য প্রস্তুত হইতেছে—সম্মুখে দৈনিকের পলিটিক্স, খেলা ও রেসের হিসাব। দক্ষিণের জানালার ধারে সংবাদপত্রের সত্য ও মিথ্যার উপরে এতক্ষণে উদ্বেগে, আগ্রহে, শঙ্কায় অমিতের পিতাও ঝুঁকিয়া

পড়িয়াছেন। সকালের এই আলোকে বুঝি তিনি ভালো করিয়া দেখিতে পান না বাঙলা দৈনিকের ছাপা লেখা। চোখে বুঝি কমও দেখেন এখন বাবা? না, কম দেখিবেন না। এই তো সেদিন চশমা পরিবর্তন করিয়া আনিয়াছেন। আকাশের আলোই এখনো তাঁহার সেই ঘরে তেমন করিয়া ফোটে নাই। কিন্তু তিনি স্থির থাকিতে পারেন না; সকাল হইতে না হইতেই তাঁহার সংবাদপত্র দেখা চাই। কালও অনেক রাত্রিতে ফিরিয়াছে অমিত, তিনি তাহা জানেন। এখনো হয়তো সে শুইয়া আছে। কিংবা শোনা যায় তাহার গলা—জোর করিয়া গল্প জুড়িবার ভান করিতেছে। চায়ের কোণে শোনা যায় তাহার একক কন্ঠ; আপনারই সৃষ্ট আড়ষ্টতা ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য বৃথাই অমিতের এই চেষ্টা। তবু শোনা যায় তাহার কন্ঠ, অমিত জানাইতে চায়, সে বাড়িতেই আছে। বাবাও জানেন—আছে, অমিত বাড়িতেই আছে এখনো। কিন্তু কতক্ষণ? পৃথিবীজোড়া দুর্যোগের ঝটিকা কখন কোন তটে আছড়াইয়া পড়িতেছে, কোথায় উপড়াইয়া ফেলিতেছে কাহাকে কখন দুর্দিনের শাসক ঝটিকা—গৃহ হইতে, পরিবার হইতে, জন্ম ও জীবনের নিশ্চিত উত্তরাধিকার হইতে;—কোথায় উড়াইয়া নিবে বুঝি তাঁহার অমিতকেও—। অমিত জানে, তাহার পিতা সমাগত এই নিয়তির ঝটিকাভাস খুঁজিয়া পাইতে চাহেন দৈনন্দিন সংবাদের ভস্মস্তূপ হইতে।

জানালার সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বাবা পড়িতেছেন সংবাদপত্র...পড়িবেন প্রতিটি সংবাদ—এই জটিল কালের জটিল ভগ্ন ভগ্ন কাহিনী। কিন্তু তাঁহার রেখাঙ্কিত শান্ত মুখের কোনো রেখায় উহার কোনো আভাস ফুটিবে কি? প্রৌঢ়ত্বের পরিণত স্নিগ্ধ আলোক তাঁহার চক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাঁহার জীবন-রচনার কুশলতায়। এই বার্ধক্য-সীমায় পৌঁছিয়া দুইটি প্রশান্ত জিজ্ঞাসু চক্ষের মধ্যে এখনো কি সেই আলো অমিতের জন্য শঙ্কায়-বেদনায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে থাকিবে? না, অমিত জানে, তাহা হয় নাই। তাঁহার আত্মসমাহিত জীবনের মধ্যে কোনো অধৈর্য দেখা যায় নাই; আচরণে অস্থিরতার বা বিক্ষোভের আভাসও জাগে নাই। প্রভাতে নির্বাক চক্ষে তিনি দেখিবেন অমিত কোথায়। স্থির কথাবার্তার মধ্য দিয়া চা শেষ করিবেন, আরম্ভ করিবেন দিনের কাজ। শুধু তাঁহার নূতন দৃঢ়তর গাম্ভীর্যে, দৃষ্টির স্থির জিজ্ঞাসায় বুঝা যাইত—পৃথিবী টলমল, জীবন মথিত সমুদ্রের মতো অশান্ত, আর সেই চিরসংযত চিত্ত আপনার মধ্যে আপনি আলোড়িত।...সেই আগেকার মতো স্বচ্ছন্দ গল্প-আলাপের সম্ভাবনা এখন আর নাই, আর সম্ভব নয় পিতার ঘরে বসিয়া একসঙ্গে সকালের চা-পান—অমিতেরও; অনু-মনুর কলহে দীর্ঘায়িত করিয়া তোলা তাহাদের চায়ের আসর;—মায়ের শত তাড়না আর আপত্তি সত্ত্বেও পড়া ফেলিয়া জমিয়া-বসা বাবার ঘরে পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভগিনীতে। না, আর তাহা হয় না। অমিতের ত্রস্তবিক্ষিপ্ত জীবন-গতি গৃহের সেই অন্তরঙ্গ আবেষ্টনীকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। তেমন চা পান আর সম্ভব নয়, সংবাদপত্রের সংবাদ লইয়া আর পিতা-পুত্রে তেমন তর্ক ওঠে না, সকলে মিলিয়া আর আসর জমে না। কতদিন বাবার গৃহে চা লইয়াই আর অমিত প্রবেশ করে নাই, বাহিরে চায়ের চৌকিতে বসিয়া-দাঁড়াইয়া কোনরূপে

চা শেষ করিয়া ফেলে। বাবাও নীরবে চা পান করেন। অমিত দুই-একটা কাগজ উলটায়। যে-কোন অছিলায় নিজের ঘরে গিয়া বসে। তখন বাবা ভ্রমণে বাহির হইয়া যান।...পদক্ষেপ অগ্রসর হইয়া যায় অমিতের দুয়ারের সম্মুখ দিয়া সিঁড়ির দিকে। কানের উপরে ধ্বনিত হইতে থাকে সেই সুপরিচিত স্থির পদধ্বনি। পদক্ষেপে, জুতায়, লাঠির শব্দে সমস্ত কিছুতে একটা সুনিশ্চয়তা,—কোথাও শিথিলতা নাই।—সুপরিস্ফুট একটি গোটা মানুষের গোটা চরিত্র। অখণ্ড মানব-সত্তা অনায়াস মর্যাদায় আপনাকে প্রকাশিত করিয়া যায় আপনারও অজ্ঞাতে। অমিত তাহা দেখিয়াছে—দৈনন্দিন কত সামান্য প্রকাশের মধ্যেই দেখিয়াছে মানুষের সেই অখণ্ড সত্তা—কত সাধারণ আর কত অসাধারণ তাহাও। দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করিতে করিতেও অমিতের কড়া-নাড়ার অপেক্ষায় সে উৎকর্ণ রহিবে। শেক্‌সপীয়রের বহুপঠিত পাতায় আবার দাগ কাটিতে কাটিতে দেখিবে অমিতকে, তাহার বন্ধুদের, 'হ্যাম্‌লেট্‌স্‌ অব্‌ দি এজ্‌'। 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স' পড়িয়া পড়িয়া সে জানিতে চায়, বুঝিতে চায়—এ কোন বিষম কালের বিষম পরীক্ষা তাঁহার অমিতকে ছিনাইয়া লইতেছে—তাহার গৃহ হইতে, পিতৃ-সাধনার পথ হইতে, মাতৃ মমতার স্নেহনীড় হইতে।...

আজ মা নাই; বাবা আজ একা। অমিত জানে—আপন একান্ত সত্তায় আজ সত্যই তিনি একাকী। আর তাই অনেক বেশি সংযত, প্রশান্ত, সৌম্য তাঁহার আচরণ চিন্তা হৃদয়। অনেক ধ্যানের মধ্য দিয়া তাঁহার জীবন গঠিত। উনবিংশ শতকের জ্ঞানে ও ধ্যানে রচিত একটি মিল্‌টনিক সনেটের মতো তাহা স্থির, বেদনা-সমুজ্জ্বল!...একা আজ বাবা, মা নাই। অমিত জানে, সেই প্রশান্ত আলোক আজ ঘিরিয়া ধরিয়াছে তাহার মাতৃহীন ভাই আর বোনটিকে। স্নেহ-মমতায় বাবা ঢাকিয়া দিয়াছেন হয়তো সেই অস্বচ্ছন্দ সংসারের অভাবের রূঢ়তা। অমিত জানে, অপরাজেয় সেই পিতৃ-হৃদয়, অপরাজেয় সেই পুরুষকার। হয়তো আজ তিনি মনুর সঙ্গে তুলিয়া লইয়াছেন তাহার অধীত প্রাচীন ইতিহাসের গবেষণা-সম্পদ; হয়তো অনুর সঙ্গে তিনি সহপাঠী হইয়াছেন প্রাণবিজ্ঞানের নূতনতম তত্ত্বের! হয়তো সে চিত্ত সানন্দে অভিনন্দন করিবে এবার অমিতের নৃ-বিজ্ঞানের খেয়ালকে; উৎসাহভরে খুলিয়া বসিবে অমিতের পড়া আধুনিক অর্থনীতি ও রাজনীতি-তত্ত্ব--কেইনসের গবেষণা কিংবা ভার্গার বিশ্লেষণ। বাবা ছাড়া কে বুঝিবে অমিতের কথা? কেই বা না বুঝিলে নয় অমিতের এই জীবন-সত্য?...হয়তো অমিতের আগমনীও আজ মায়ের অভাবে তাঁহারই প্রাণে বাজিয়া উঠিতেছে। অমিতের আশায় হয়তো তিনি উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। সংবাদ-পত্রের পাতায় চোখ রাখিয়া এতক্ষণে সন্ধান করিতেছেন আভাস ও উত্তর---আজ গৃহে আসিতেছে কি অমিত? জিজ্ঞাসায় উদ্‌গ্রীব তাঁহার মন, তবু বাবা অমিতদের মতো আশায় ও নিরাশায় বিচলিত হইবেন না; একালের অশান্ত যৌবনের মতো তাঁহারা অধীর হইবেন না—ব্যাহত প্রত্যাশায়, অজ্ঞাত প্রতীক্ষায়...

এ কি অমিত! কি ভাবিতেছ আবার? হাসিয়া কৃষ্ণচূড়ার পুষ্পহীন চূড়া হইতে আপনার শূন্য দৃষ্টি ফিরাইয়া অমিত আবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল—দাঁত মাজিবে আর কতক্ষণ? মুখ ধুইবে না?

অমিত মুখ ধুইতে লাগিল। জলের শীতল স্পর্শে যেন চেতনার আর-একটা নূতন হিল্লোল জাগিয়া উঠিল।...শরতের সোনালি রৌদ্র জেল-ওয়ার্ডের কার্নিশের ফাঁক দিয়া আসিয়া তাহার পায়ের কাছে পড়িয়াছে—অরুণ আলোর একটি অঞ্জলি।...'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি'...গীতহীন কন্ঠেও গান কলকল করিয়া উঠিতে চাহে। আকাশের আলোকে সুরে বাঁধিয়াছেন কবি!...কিন্তু কেমন আছেন কবি? হঠাৎ থামিয়া গেল কন্ঠের সঙ্গীত, জলের কল-ধ্বনি—কেমন আছেন কবি? বুকে অধীর উৎকন্ঠা জাগিয়া উঠিল। এই প্রাচীরের পার হইতে তাহাদের প্রণাম কালিম্পং-এর পাহাড়-চূড়ায় পৌঁছিল না। সহস্রের সঙ্গে এক হইয়া তাহারা উৎকন্ঠিত চিত্তে জানাইতে পারিল না—সূর্য, তুমি তোমার মুখ ঢাকিয়ো না। আমরা বড় নই, বিরাট নই। কিন্তু তোমাকে আমরা দেখিয়াছি। আমাদের কবির মধ্যে আমরা ভাষা পাইয়াছি, বাণী পাইয়াছি,—আমরা বন্দিজাতি,—ইতিহাসের মধ্যে তবু আমরা বাঁচিয়া উঠিয়াছি।

বাঁচিয়া উঠিয়াছি, হাঁ নিশ্চয়ই আমরা বাঁচিয়া উঠিয়াছি।—অমিত টুথ ব্রাশ ঝাড়িতে ঝাড়িতে যেন জোর করিয়া নিজেকে বলিতে লাগিল...আমাদের পরিচয় রাজা-রাজ্যে নয়, কীর্তি-কাহিনীতেও নাই। আমাদের পরিচয় শুধু, কবি, তোমার প্রাণের সঙ্গে আমাদের প্রাণও বাঁধা।...তুমি আমাদের দেখিয়াছ—জানিয়াছ, কিন্তু তোমাকে দেখিতে হইবে আমাদের এই রক্তঝরা ইতিহাসও। দেখিতে হইবে আমাদের ভবিতব্যকেও—আমাদের জীবন দিয়া যে সত্যকে আমরাও সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছি সহস্র ব্যর্থতার মধ্যে, তোমাকে সেই পরম অধ্যায়ও দেখিতে হইবে কবি!...

কিছুদিন পূর্বে সেই বিক্ষুব্ধ, হতাশ শত যুবকের অন্তরে তর্কের তুফান উঠিয়াছিল—কবি, তুমি দিলে তাহাদের ললাটে এই কলঙ্কের ছাপ?

'এ যুগের এই মানুষের এই কি পরিচয়, অমিত? কবির সৃষ্টিতে এই থাকবে তার ইতিহাস?'—বই শেষ করিয়া সেদিন আলোচনা করিতে করিতে শেষ বারের মত প্রশ্ন করিয়াছিলেন সুশীলদা—সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়। 'চার অধ্যায়' শেষ হইয়া গিয়াছে, সম্মুখে পড়িয়া আছে সেই ক্ষুদ্র গ্রন্থ। বিক্ষোভে ও অপমানে কাব্যের সত্যকে অস্বীকার করিবার জন্য অধীর প্রায় সকলে। এ কি লাঞ্ছনা কবির হাতে তাঁহার জাতির যৌবনের! এক খণ্ড 'চার অধ্যায়' পোড়াইয়া ফেলিলেও সুধীনের মনের ক্ষোভ মিটিবে না। মহাত্মাজীর হাতে অবজ্ঞা লাভ করিতে তাহারা অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল বা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট হইতেও তাহারা অভিনন্দন পাইবে না, ইহা জানা কথা। কিন্তু বাঙলার কবির নিকট হইতেও কি পৃথিবী এই দুরন্ত সন্তানদের এমন বিকৃত পরিচয় লাভ করিবে?—যে কবি সেদিনও বেদনাদগ্ধ প্রাণে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন মনুমেন্টের তলায়, তাঁহার বেদনাহত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাঁহার বিধাতাকে...

> যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
> তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো॥

অমিত অনেকের সঙ্গে তর্ক করিয়াছে, তর্ক করিয়াছে সুধীনের সঙ্গেও। কিন্তু তর্ক নয়, আলোচনা করিতে হইয়াছে সুশীলদার সঙ্গে। তাঁহার সহিত তর্ক চলে না, চলে যুক্তি ও

চিন্তার বিনিময়। না বলিলেও তাহারা জানে—উহার উদ্দেশ্য পরস্পরের বুদ্ধির ও বিশ্বাসের সংস্কার। একসঙ্গে অনেক গ্রন্থ তাহারা পড়িয়াছে। মধ্যাহ্নের সুতীব্র দাবদাহ তখন বাহিরে ঝরিয়া পড়িতেছে। ঘুমাইবার সাধ্য কি অগ্নিশালায়। কেহ সেই অগ্নিকুণ্ডকে ভুলিতেছে পাশা লইয়া, দাবা লইয়া। একান্তে কেহ 'পেশেনস্' খেলিয়া চলিয়াছে—একা-একা নিজের তাস মিলাইতেছে, চুরি করিতেছে। কেহ বা দৃঢ়চিত্তে বই পড়িয়া যায়—অগ্রাহ্য করিয়া গ্রীষ্মের উত্তাপ আর পাশাখেলার সমবেত চীৎকার। এমন কত মধ্যাহ্ন গিয়াছে অমিতেরও—সুশীলদার সঙ্গে এমন কত দিন অমিতও বসিয়াছে কোনো সুগম্ভীর গ্রন্থ লইয়া। হয়তো ইতিহাস, হয়তো রাজনীতি বা অর্থনীতি, কিংবা সমাজ-বিজ্ঞান। বসিয়াছে তাহারা আহারান্তে বিশ্রামের পর, আর বই বন্ধ করিয়া উঠিয়াছে সূর্যের তীব্র তির্যক দৃষ্টি যখন পশ্চিম আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়াছে গৃহমধ্যে, মেঝেয়, আসবাব-পত্রে, টেবিলের নিঃশেষিত চায়ের পেয়ালায়-পিরিচে, তারপর প্রাচীরের গায়ে, আর শেষে একাগ্র সমাসীন সুশীলদার চিন্তা সুগম্ভীর মুখে।

সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণভাবে গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। স্বল্পভাষী, দশজনের মধ্যে বসিয়া কথা বলিতে পারেন না, তাহা শিখেনও নাই। বয়স পঁয়তাল্লিশ ছাড়াইয়া চলিয়াছে। সুদীর্ঘ সুদৃঢ় সেই দেহের উপর কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের ছাপ আরও গভীরতর রূপেই আঁকা হইয়া গিয়াছে। মাথায় প্রকাণ্ড টাক। কানের কাছে ও পিছনে ছোট করিয়া ছাঁটা চুলের মধ্যে এখনো অবশ্য যথেষ্ট কালো চুল রহিয়াছে, কিন্তু সুপরিসর টাকই তবু সমস্ত মাথাটিকে জুড়িয়া বসিয়াছে। মুখের ও দেহের রেখায় বার্ধক্যের আভাসই পরিষ্কার। স্থির মুখের উপর সেই রেখা গভীর হইয়া পড়িয়াছে, দেহের রক্তস্রোতে শিথিলতা দেখা দিতেছে। গৌরবর্ণের দীপ্তি নিবিয়া এখন পাণ্ডুরতা আসিতেছে। শান্ত চোখেরও চতুর্দিকে জমিতেছে কালির রেখা। তবু সুদীর্ঘ সেই দেহের সুগঠিত কাঠামো দেখিয়া বুঝিতে বাকি থাকে না—বিধাতার অকুণ্ঠিত দান সঙ্গে লইয়াই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন এই দেহের অধিকারী মানুষ। আর সেই সুগঠিত দেহের এখনকার শান্ত পদক্ষেপ, ক্লান্ত গতি দেখিতে দেখিতে সন্দেহ থাকে না—এ পৃথিবীর অনেক ঝটিকা আর অনেক উত্তাপের পীড়নে এই সমুন্নত দেহ আজ ফাটল-ধরা জীর্ণ মন্দির মাত্র। উনিশ শ' পাঁচ হইতে এমনিতর কত দেহের মন্দিরে-মন্দিরে দেবতার আরতি আরম্ভ হয়। তারপর ত্রিশ বৎসরের মধ্য দিয়া সেই পূজা এখনো অসমাপ্ত এ জীবনে। দেউলে ভাঙন ধরিয়াছে ; বিগ্রহের গায়ে কি তাই বলিয়া লাগিয়াছে কোনো মলিন স্পর্শ ?

ফ্রেজারের 'গোল্ডেন বাউ'-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ শেষ করিয়া এঙ্গেলসের 'পরিবার গোষ্ঠী রাষ্ট্র' লইয়া বসিয়াছেন সুশীলদা অমিতের সঙ্গে। 'সমাজবাদী চিন্তার ইতিহাস' শেষ করিয়া সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসায় লইয়া বসিয়াছেন মার্কসের 'ক্যাপিটেল'। না বুঝিয়া তিনি কিছুই গ্রহণ করিবেন না, কিন্তু না জানিয়া বর্জনই বা করিবেন কেন কিছু ? গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু বয়স ও আকৃতির জন্য নয়, প্রকৃতির ও আচরণের জন্যও সকলের নিকট হইতে ভীতি-মিশ্রিত মর্যাদা লাভ করেন। দশজনের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া তিনি আসর জমাইতে পারেন না। কি করিয়া অন্যেরা জানিবে

তাঁহার মার্গসঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ?—আর তাই প্রাণপণে সেই সঙ্গীতের আসর হইতে তাঁহার দূরত্ব রক্ষা। এখানেও সঙ্গীতের আসরে আসিলে তিনি বসেন দূরে একান্তে। তাঁহার স্থির দৃষ্টি সকলের অজ্ঞাতে যাচাই করিয়া বাছিয়া লইয়া চলে নানা জনের গল্প, গান, হাস্য-পরিহাস, কৌতুক-রঙ্গ। হয়তো তিনিও উপভোগ করেন সেই জমাট-বাঁধা আড্ডার আনন্দ। কিন্তু উচ্ছলতায় কোথাও মাত্রাচ্যুতি ঘটিলে তাঁহার মর্যাদাবোধে তৎক্ষণাৎ তাহা ধরা পড়িবেই, চোখ এড়াইয়া যাইবে না। তাঁহার নির্বাক প্রতিবাদ গোপন রহিবে না। শান্ত নীরব নেত্রে সব দেখিয়া সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় নীরব থাকিবেন। তারপর সকলেরই অজ্ঞাতে আসর হইতে কখন সরিয়া পড়িয়া নিজের কোণটিতে আশ্রয় লইবেন—কিংবা অভ্যস্ত পদচারণার ক্ষুদ্র পথ-রেখাটিতে। কোনো এক সুনিভৃত অবকাশে হয়তো অমিতের সঙ্গ পাইবেন, কিংবা অমূল্যের সাহচর্য। মৃদু কণ্ঠে তখন গল্প জমিবে, শান্ত কণ্ঠে পরিহাস ফুটিবে। মনে পড়িবে ভুলিয়া-যাওয়া কথা, স্বচ্ছ কৌতুক, সহজ রঙ্গ-কাহিনী। অর্ধোদয় যোগের প্রথম জাতীয় সেবা-সংগঠন, উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ ও দামোদরের বন্যা—দেশের জনতার সহিত এক হইয়া দেশকে স্বীকৃতির সেই প্রথম সাধনা; —তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের দিনে রায়মঙ্গলের মোহনায়, বনে-জঙ্গলে উচ্চকিত দৃষ্টিতে প্রতীক্ষা স্বাধীনতার সমরাস্ত্রের জন্য, ডুলাণ্ডা হাউসের পুলিশ-নির্যাতনের পরীক্ষা পার হইয়া হাজারিবাগ জেলে সত্তর দিনের অনশন;—আবার গ্রামের জীবনের সহস্র তুচ্ছ সুন্দর কথা,—সাধারণের সাধারণ কাহিনী: উচ্ছ্বাস নাই, উচ্ছলতা নাই; শৃঙ্খলা আছে সেই গল্পে, আর আছে মৃদু একটু মাধুর্য; জমানো স্বচ্ছতা; স্বাচ্ছন্দ্য। কে জানিত সেই গম্ভীরপ্রকৃতি মানুষের মনেও এমনি স্বচ্ছন্দ একটি সকৌতুক আলোচনার, স্বচ্ছন্দ বন্ধুত্বের লুক্কায়িত ভাণ্ডার আছে? আছে একটি স্থির আবেগের প্রক্ষালিত বেদীতল?

গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ তবু সুশীলদা। মনীন্দ্র কিংবা সুনীন্দ্র বুঝিত না কি করিয়া এমন গম্ভীর মানুষের সহিত অমিতের মত কৌতুকপ্রিয়, আড্ডাপ্রিয়, মিশুকে প্রকৃতির মানুষ আনন্দ লাভ করে? হয়তো গম্ভীর মোটা-মোটা বইগুলি পড়িবার জন্যই তাহাদের পরিচয় ও সৌহার্দ্য। সুশীলদার ভয়ে উহারা দূরে দূরে থাকে। অমিত সুশীলদার সঙ্গে মোটা-মোটা বই পড়িয়া চলে--সত্যই গম্ভীর বই। মধ্যাহ্নের প্রদীপ্ত সূর্য অপরাহ্ণের তীরে গিয়া ঠেকে—মাথার উপরকার অগ্নিরশ্মি নামিয়া আসিয়া গৃহের ভূমিতল হইতে ওঠে প্রথম টেবিলে, তারপর সুশীলদার মুখে।

এবার 'বিরতি'—গ্রন্থ রাখিয়া হাসিয়া বলেন সুশীলদা।—আমরা কিন্তু সেকালে বলতাম 'বিশ্রাম'।—'বিরতি' শব্দটা তাঁহার নিকট হাস্যকর।

তারপর?—অমিত প্রশ্ন করিত।

তারপর ছুটতাম ফুটবলের মাঠে। সমস্ত বাঙলাদেশের যৌবন আপনাকে আবিষ্কার করতে পেরেছিল ফুটবলের মাঠে। মোহনবাগানের আগেই বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন এ সত্য—বেদান্ত ছেড়ে তিনি ফুটবল খেলতে বলেছিলেন।

টাক-পড়া মাথা, ভাঙন-ধরা দেহ, ক্লান্তগতি সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, গম্ভীর প্রকৃতি, মিতভাষী, গ্রামোফোনেও ফৈয়াজ খাঁর কণ্ঠ শুনিতে না শুনিতেই যিনি সচকিত হন—

মনঃসংযোগ করিতে পারেন না গ্রন্থে,—ফুটবলেরও উপাসক ছিলেন নাকি একদিন তিনি? হাসি পায়, বিস্ময় জাগে, কিন্তু অমিত সম্ভ্রমও বোধ করে।

'চার অধ্যায়' শেষ করিয়া সেদিন শান্ত উদাস নেত্র তুলিয়া গম্ভীর-প্রকৃতি সুশীলদা বলিলেন: এ বই তোমার ভালো লাগলো, অমিত?

কার্তিকের ক্লান্ত সূর্য তখন অগ্নি হারাইয়া সন্ধ্যার দিকে চলিয়াছে।

অমিতের 'চার অধ্যায়' ভালো লাগিয়াছে। লাগিবে না কেন? সকলের সহিত সে তর্ক করিয়াছে: বাঙালী বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলি অমন করে ব্যক্তিসত্তাকে বলি দেয় নি—মানলাম এ সত্য। কিন্তু যে-সত্য নিয়ে সাহিত্যের পরিচয়, সে-সত্য তো তোমার-আমার মত বাঙালী বিপ্লবীর জীবনের কর্মপদ্ধতি বা এ-প্রয়াস, ও-প্রয়াস মাত্র নয়। সে-সব ঘটনা, চিন্তা ও প্রয়াসের স্থূল রূপের মধ্যে থেকেই সাহিত্য ছেঁকে তোলে তার সত্য—মানব-সত্য, মানুষ যেখানে মানুষ, জীবন যেখানে জীবন। সে পৃথিবীকে ভালবাসে, তার প্রিয়জন চাই—সন্তান-সন্ততি—এ সত্য গভীরতর। এখানেই তো সাহিত্যের তাই জয়, সে বাইরের সত্যের কারবারী নয়।...অমিত যেন নিজেরই অন্তরের একটা দিককে প্রকাশ করিয়াছে...মাকে ভাবিয়া শুধু নয়, আরও কাউকে, যাহাকে সে পাইবে না।

সুশীলদার সঙ্গে তর্কও করিবে। কিন্তু সুশীলদা তর্ক করিবেন না। শান্তভাবে বলিলেন, এই কি বাঙলাদেশের বিশেষ একটা কালের, বিশেষ একটা গোষ্ঠীর মানুষের চিত্র? এ দেশের বিপ্লবী চিন্তা ও কর্মের মধ্যে এ সত্যই কি বিকশিত হইয়াছে? না, সেই ঘাত-প্রতিঘাতে বিকশিত হইয়াছে এই জাতীয় মানুষ, এমনি তোমার মানব-সত্য? তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে শিল্পের সত্যও যে এখানে পরাজিত।

অমিতের মনে কোনখানে যেন—কাহাকে যেন সে দেখিয়াও দেখে না—কে সে ইন্দ্রাণী?...

অমিত সুশীলদাকে বুঝাইতে চাহিয়াছে, বুঝাইতে পারে নাই: বাঙালী বিপ্লব-প্রয়াসের পরিপ্রেক্ষিতকে নিজের সৃষ্টির প্রয়োজনে কবি গ্রহণ করেছেন—যতটুকু তাঁর চাই, যে-ভাবে তাঁর চাই—ততটুকু, সেই ভাবে।—তাঁর গৃহীত পরিপ্রেক্ষিতটাই আমাদের বিবেচনায় অযথার্থ কিন্তু দল-দৌরাত্ম্য অন্যত্রও আছে। তা মেনে নিয়ে দেখলে মানুষগুলি সত্য হয়ে দাঁড়ায়...।

বুঝাইতে পারিল না অমিত। সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শান্ত চক্ষুর মধ্যে তবু বিক্ষোভ জমে নাই। শ্রান্ত মুখে কোনো উদ্ধত বিরক্তি জাগে নাই। গম্ভীর, আরও গম্ভীর হইলেন সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্ত দৃষ্টি আরও শান্ত, আরও গভীর হইয়া রহিল। শেষে দীর্ঘশ্বাস পড়িল:

ত্রিশ বৎসরের বাক্যহারা ইতিহাসের উপর এই রইল কি তবে এ কালের মহাকবির তিরস্কার—বিপ্লবের সাধনা শুধু আত্মার আত্মবিনাশ? শুধু নিজেকে, সংসারকে ফাঁকি দিয়াছি—দেশকেও পাই নাই?...

সময় সেদিন বহিয়া গেল। টাইম্-পীসের কাঁটা টিক্-টিক শব্দে অগ্রসর হইতেছে। অমিতের মুখে কথা যোগাইল না।...

ইতিহাসের কথা তুমি বোলো না, অমিত? ইতিহাসে এরূপ সাক্ষ্যই কিন্তু থাকবে। বড় নেতা, বড় কবি, বড় মনস্বীদের কথা—আমরা ভ্রান্ত, বিপথগামী। তারপর একদিন যুগান্তরের শেষে নিরাপদ-আলস্যে ইতিহাস ঘটা করেই লিখবে হয়তো সেদিনের ভাগ্যবান নেতৃত্বের আত্মদানের সালঙ্কার স্তুতি;—হয়তো তোমাদের মূঢ় সাহসের জন্যও থাকবে একটু কৃপামিশ্রিত মৃদু প্রশংসা বা মৃদু ভর্ৎসনা। কে জানবে তার পিছনের এই মানুষের কথা—অমিতের এই জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা, এই নিরন্তর প্রশ্ন, অনির্বাণ পিপাসা; এই ক্লান্ত চরণের পথান্বেষণ ও রক্তাক্ত হৃদয়ের পথাবিষ্কারের সত্য? ইতিহাসের কতটুকু সত্য তবে সত্য?

সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে জল নাই। কিন্তু বেদনায় সে চোখ তখন অতল-সমুদ্রের মত নিথর।

অমিত তখনো বলিতে চাহিয়াছিল,—ইতিহাস শুধু কাগজের পিঠে কলমের আঁচড়ে লেখা হয় না সুশীলদা। বরং কর্ম দিয়ে, প্রয়াস দিয়ে সে ইতিহাস লেখা হয়। আর লেখা হয় তা গণদেবতার আত্ম-পরিচয়ের চেষ্টা দিয়ে। মানুষই তার সেই ইতিহাসের স্রষ্টা। এ যুগের ইতিহাসও গড়ে উঠছে আমাদেরই এ যুগের দৃষ্টিতে, এ যুগের সৃষ্টিতে। তার মধ্যেই আমাদের পরিচয়—পুঁথিশালার পোকারা তার উদ্দেশও পাবে না।

'এ যুগের দৃষ্টি, এ যুগের সৃষ্টি—তাতেই পরিচয় আমাদের জীবনের',—ঠিক অমিত, ঠিক। এ পরিচয় পুঁথিশালায় থাকে না, কিন্তু এ পরিচয়ও ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাসদেরই উদ্ভাসিত করে দিতে হয়। এই বাক্য-বঞ্চিত মানুষের কথা—তাদের বুক-জ্বালা জিজ্ঞাসা, তাদের বুক-ভরা ভালোবাসা—তাদের বারে বারে এই পথ-হারানো আর পথ-নির্মাণের কাহিনী—এ সব তবে বলবে কে, অমিত? যে কবি জ্বলে নি এমন করে, যে ঔপন্যাসিক ভালোবাসে নি এমনি ভাবে, যে দার্শনিক কোনোদিন করল না পথে পদার্পণ, যে ঐতিহাসিক কোনোদিন জানল না পথের মানুষকে—তারা?...

একবার স্তব্ধ হইল শান্ত স্বর। তারপর অমিতের মুখের উপর পড়িল দুইটি বেদনাহত চোখের সানুনয় দৃষ্টি...

'এ যুগের দৃষ্টি, এ যুগের সৃষ্টি'...আর, আর, অমিত, এ যুগের এই মানুষের পরিচয়—এ দায়িত্ব হাতে তুলে নাও তোমরা, অমিত। এই মানুষের পরিচয়—তোমার পরিচয়—তুমি দেবে না, অমিত?

'তোমার পরিচয় তুমি দেবে না অমিত?' অমিত চমকিয়া উঠিল।

চমকিয়া উঠিবার কথা—ছয় বৎসরের ও-পার হইতে শীত-সন্ধ্যার একটি সস্নেহ স্বর কানে আসিয়া পৌঁছে...ব্রজেন্দ্র রায়ের স্নেহ-বাৎসল্য-ভরা এই অনুযোগ—তাহা যেন ক্লাসিক্সের সংযত নির্দেশ, সেই ক্লাসিক্স-গঠিত জীবন হইতে। আর মনে আসিতে থাকে আরও অনেক স্নেহ-শঙ্কিত সূর্যাস্তমাখা মধুর সায়াহ্ন...

দাঁড়াইয়া উঠিল অমিত।—সন্ধ্যা হচ্ছে সুশীলদা।

চোখে তেমনি প্রতীক্ষায় উন্মুখ দৃষ্টি রহিয়াছে তখনো। একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস

গোপন করিতে করিতে দাঁড়াইয়া পড়িলেন সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়। চলো।—তারপর : যাঃ! চা জুড়িয়ে গিয়েছে কখন।

হাসিলেন দুইজনেই স্বচ্ছ আনন্দে।

কয়দিন পরেই সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় হাসপাতালে গেলেন। মরুভূমির প্রথম হেমন্তের হিম-শীতল স্নানের জল তাঁহার রক্তাল্প ভগ্নদেহ সহ্য করিতে পারিল না। শীতে গ্রীষ্মে কাহারও নিকট নিজের ভঙ্গুর দেহ লইয়া কথা বলা, অভিযোগ জানানো তাঁহার স্বভাব নয়—মর্যাদায় বাধিত। মুখ ফুটিয়া তাই বলেনও নাই যখন এই উত্তাপহীন দেহ এই জলে বারে বারে সঙ্কুচিত হইয়াছে। জ্বর-বুকে ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। তারপর আর দুইদিন মাত্র। জানা গেল—বারে বারে আঘাতে-আঘাতে যে শ্বাসযন্ত্র ও হৃদযন্ত্র বহুদিন হইতে দুর্বল হইয়া আসিয়াছিল, এখানকার এই কার্তিকের হিমে উহার নিউমোনিয়া হওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়; আর---ডাক্তার জানাইলেন, নিউমোনিয়া হইলে এমন মানুষকে রক্ষা করা কাহার সম্ভব?

দেউল ভাঙিয়া পড়িল—কিন্তু তাহার দেবতা?

আর তোমার দেবতা, অমিত?...নামহারা মানুষের মিছিলে নামিয়া পড়িয়াছেন সে দেবতা---তাঁহার মন্দির পথের ধুলায়, না?

সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়কে অমিত আর দেখে নাই, দেখিবে না। দেখিবে না অনেককে--- অনেককে---

কিন্তু না, এ চিন্তা থাক।

শেভিং ব্রাশ হইতে জল ঝাড়িতে ঝাড়িতে অমিত ফিরিয়া আসিল। নিত্যকরের অভ্যাসমত কখন কামানো শেষ করিয়া সে ক্ষুর, ব্রাশ ধুইতে আসিয়াছে--ধুইয়া ফেলিয়াছে। ব্যারাকে ও আঙিনায় নিদ্রোত্থিত বন্ধুদের দেখিয়াছে, চিনিয়াছে। চোখে চোখে সম্ভাষণও হয়তো সকলকে জানাইয়া গিয়াছে অভ্যাসবশে। হয়তো কুশল জিজ্ঞাসাও করিয়াছে, কে জানে? ক্লাসিক্‌সের শিষ্ট অনুশাসন কি অমিতই মান্য করে না---ব্রজেন্দ্র রায়ের মত, তাহার পিতার মত? সভ্যতার সদাচার হইতে সে ভ্রষ্ট হয় নাই, হইবে না। এমন কি, অমিত জানে না কখন কেমন করিয়া সেই সদাচার সে আজও পালন করিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ সে দেখিয়াছে বরং কার্তিক-অপরাহ্ণের সেই শান্ত শঙ্কিত-দৃষ্টি ব্রজেন্দ্র রায়ের মুখ, শীত-সন্ধ্যার সেই স্নেহময় সম্ভাষণ; শুনিয়াছে দূরবর্তী আর-এক যুগের পার হইতে ভাসিয়া-আসা তাঁহার অনুযোগ---'তোমার পরিচয় তুমি দান করো, অমিত।...বুড়োদের কাজ হাতে তুলে নাও।'...ব্রাশ ঝাড়িতে ঝাড়িতে অমিত যেন পশ্চাতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া আসিতেছে সেই স্মৃতি, সেই কথা।

না, এ চিন্তা নয়, এ চিন্তা নয়। এ চিন্তা নয়, ইহা সত্য নয়, সত্য নয়। সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ও অমিতকে জানেন নাই, ভুল করিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রনাথের মতই অমিতকে তিনি ভালোবাসিয়াছেন, ভালো করিয়া জানেন নাই।...ভালোবাসা আর ভালো করিয়া জানা তো এক কথা নয়। বরং ভালোবাসিলে ভালো করিয়া আর জানা যায় না। তাই কি অমিত? ভালো না বাসিলে কাহাকেও জানা যায়? সত্যিই কি জানা যায়? তুমিই

কি জানিতে অমিত, মানুষকে ভালো না বাসিলে ?...কাহাকে, কাহাকে ভালোবাসো তুমি অমিত ? কাহাকে ? অ্যাবস্ট্রাক্‌ট মানুষ কি ? না, বঞ্চিত শ্রেণী ? তাহা ছাড়া কংক্রীট্ কোনো মানুষ...জীবনের মধ্যে যে জীবন্ত-সত্য...

সচকিত হইয়া উঠিল অমিত। ত্রস্ত হইয়া উঠিল, গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে অনেককে ভালোবাসে, অনেক মানুষকে। আর,—ইতিহাসের বৃহত্তম সত্য যে সেই মানুষকে।

...মানুষকে ভালোবাসো তুমি, অমিত ? হাঁ, ভালোবাসো। ভালোবাসো বলিয়াই তুমি তাহাকে জানিতে চাও, আর দেখিতে চাও। আর বুঝিতে পার এ জানার অন্ত নাই, এ দেখার শেষ নাই ..কোনো দেখাই শেষ করা যায় না---মানুষকে নয়, পশু-প্রাণীকে নয়; পৃথিবীকে নয়। বিশেষ করিয়া মানুষকে নয়---হাঁ, কোনো—কোনো মানুষকেই নয়। তুচ্ছতম মানুষকেও দেখিয়া দেখিয়া শেষ করিতে পার কি তুমি, অমিত ? অতি-চেনা, অতি-স্থূল মানুষকেও কি মনে হয় না মিরাকল্ অব্ মিরাকলস্ 'হোয়াট্ এ পীস্ অব ওয়ার্ক ইজ ম্যান'---না, না, শুধু হ্যামলেটের চেনা মানুষ নয়---সে মানুষ নয়। সে যুগ নাই, সে মানুষ নাই, সে হ্যামলেটও নাই। বলুক ব্রজেন্দ্রনাথ ও অমিতের পিতা অমিতদিগকে 'হ্যামলেট্‌স্ অব্ দি এজ'। না, তাহারা হ্যামলেট নয়। . অমিত তুমি হ্যামলেট নও, তুমি প্রিন্স অব ডেনমার্ক নও। তুমি ইউরোপীয় রিনাইসেন্‌সের নব জাগ্রত মানব-সত্তা নও। না, তুমি ভারতবর্ষের এ কালের কলোনিয়াল ট্র্যাজিডির স্বাক্ষরও শুধু নও। আরও কিছু---তুমি ভারতবর্ষের আগামী দিনের মুক্ত মানুষের পুরোধা, তুমি মহামানবের আগমনী-গায়ক ! ইতিহাসের নবজাতকের আভাস তোমরা, অমিত; আর সেই নবজাতকের স্রষ্টাও তোমরা। তোমরাও---তুমিও।

আবার অমিত নিজেকে বলিয়া চলেঃ

...না, তুমি হ্যামলেট নও। তুমি এ যুগের মানুষ।—মানুষের সৃষ্টি-শক্তি আজ পৃথিবীকে নতুন করিয়া রচনা করিতে শিখিতেছে, মানুষ আজ শিখিতেছে নিজেকেও রচনা করিবার বিদ্যা। ইহাই এ যুগের দৃষ্টি, ইহাই এ যুগের সৃষ্টি। আর এই মানষের পরিচয়-রচনাতেই তোমাদের পরিচয়। এই দায়িত্ব হাতে তুলিয়া লও তোমরা, অমিত। অর্থাৎ, 'বুড়োদের কাজ হাতে তুলে নাও তোমরা, অমিত'...ব্রজেন্দ্র রায়ের আশা...

...ক্লাসিক্‌সের এই শক্তি সত্যই কি আছে অমিত, আজো ? ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ছাত্র ছাড়া কাহারও পক্ষে বুঝা সম্ভব কি—সভ্যতার এই গতিছন্দ ?—কি জানি, অমিত জানে না। কিন্তু ক্লাসিক্‌স-পড়া মানুষকে সে দেখিয়াছে—তাহার পিতা আর পিতৃবন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথকে। মানিতে হইবে—অমিত তাঁহাদের মধ্যে একটা সত্য দেখিয়াছে। তাহা কি ক্লাসিক্‌সের দান ? না, তাহা উনবিংশ শতকের আলোকোজ্জ্বল লিবারলিজম-এর দান ? অমন কথায় কথায় জীবনকে মিলাইয়া লওয়া শেক্‌সপীয়রের সঙ্গে, মিলটনকে আর মাইকেলকে গাঁথিয়া ফেলা আবৃত্তিতে আর তুলনায়। বার্কের বক্তৃতা আর ফক্‌স-শেরিডেনের বক্তৃতা লইয়া অমিতের সঙ্গে তাঁহারা বিচার ও বিতর্ক করিতেন। নূতন করিয়া তাঁহারা ব্রিটিশ আইন ও রাষ্ট্রবিধি এবং উহার ইতিহাসকে

অমিতের তর্ক হইতে বুঝিতে চাহিতেন। গ্যয়টে আর ভিক্তর হ্যুগোকে ছাড়াইয়া কালিদাস-রবীন্দ্রনাথ লইয়া তাঁহারা উৎসাহিত হইয়া উঠেন, অমিতকে পরাস্ত করেন। আবার ইলিয়ড-ওডেসি ছাড়াইয়া মহাভারতের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়েন স্তব-পাঠনিরত স্নান-শুচি স্থিরকণ্ঠ ব্রাহ্মণের মত। প্রশান্ত মর্যাদাময় তাঁহাদের সেই জীবন। মহাভারতের বিপুল ব্যাপ্তি ও সুগম্ভীর পরিণাম—তখন অমিতের হৃদয়কেও অবনত করিয়া দেয় প্রাচীন ভারতের উদ্দেশে। সংযত-বাক্ শিল্পের মত তাঁহারা জীবন ও সংসার রচনা করিতেন। কীটসের সেই ওড্-এর মত ব্রজেন্দ্র রায়ের জীবন, মিলটনের সনেটের মত ঘননিবদ্ধ অমিতের পিতার দিন-রাত্রি: তাহাই কি ক্লাসিক্সের দান—এই স্নিগ্ধ সংযত প্রশান্তি মর্যাদাময় আত্মসমাহিতি? তাহা যদি হয় তবে অমিত ক্লাসিক্সের এই সত্য দেখিয়াছে। কিন্তু অমিত ইতিহাসের গতিমুখর যুগের মানুষ—গতিচঞ্চল জীবন-মহাকাব্যের ছাত্র সে। সে ইতিহাসের ছাত্র—সে ক্লাসিক্সের সংযত গম্ভীর শিল্পমূর্তি নয়। না, হ্যামলেটের দেখা সে মানুষ নাই,—সে যুগ নাই। হ্যামলেটও নাই। আজ অন্য যুগ, অন্য দিন।...

তথাপি অমিতের মনে কোথা দিয়া মিশিয়া যায় ব্রজেন্দ্রনাথ ও সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়। হয়তো ভালবাসার মধ্য দিয়া। ভালোবাসার মধ্য দিয়াই তাঁহারা অমিতের মনে এক হইয়া উঠেন। অথচ তাঁহারা দুইজন দুই পৃথিবীর দুই মানুষ, বুদ্ধিবাদী প্রিয়ভাষী সরকারী কর্মচারী; আর মুক্তিবাদী স্বল্পভাষী 'স্বদেশী' কর্মী। দুই পৃথিবীর দুই মানুষ তাঁহারা, দুই পৃথিবী হইতে ভালোবাসিয়াছেন তাঁহারা অমিতকে। সেই ভালোবাসার মধ্য দিয়া দুই মানুষ অমিতের চেতনায় একসঙ্গে একত্র হইয়া দাঁড়ান। ইঁহাদের কাহাকে তুমি অস্বীকার করিবে, অমিত? কে তোমার পর ও অনাত্মীয়? কোন্ পৃথিবী তোমার অগ্রাহ্য? অমিত যেন ব্যক্তির সীমাবদ্ধ গণ্ডী ছাড়াইয়া আরও অনেকের মধ্যে মিশিয়া যাইতেছে, তাহার অন্তরের মধ্যে একটা প্রসারতার আভাস।

* * *

দুই

চা লইয়া আসিয়াছে রঘু ওড়িয়া। ছয় বৎসর পরেও সে ভোলে নাই অমিতকে—অমিতও তাহাকে ভোলে নাই। ইতিমধ্যে বহুবার রঘু এই জেলে আসিয়াছে, গিয়াছে। বার কয় ঘানি-ঘরে গিয়াছে; ছোবড়া পিটাইয়াও দিন কাটাইয়াছে; 'সাত খাতায়'ও ফিরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সেবা-নৈপুণ্যের ত্রুটি নাই রঘুর। বহু বহু কর্মীর আদর-অনাদর মাথায় বহন করিয়াই একটু সলজ্জ হাসিয়া হয়তো তাহাদের চা, টোস্ট, আহার ও পানীয় যোগাইয়াছে; তাহাদের বিছানা ও জিনিস-পত্র পরিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু অমিতের মত এমন করিয়া কি কেহ রঘুকে আর জানিয়াছে? না, রঘুই জানিয়াছে অন্য কাহাকেও?...

দুই মাস একান্ত-বাসের পর ছয় বৎসর পূর্বে যখন অমিত প্রথম এখানে পদার্পণ করিয়াছিল, তখন এমনি এই ঘরে চা লইয়া ঢুকিতে দেখিয়াছিল রঘু ওড়িয়াকে। সেদিন অমিত যেন মৃত্যুলোকের প্রত্যাবৃত্ত মানব ছায়ার মত আসিয়াছিল। সমবেদনশীল লোকের অভাব এ স্থানে ছিল না। রঘু ওড়িয়া তখন ছয় মাস জেলের বাকি তিন মাস শেষ করিবার জন্য রহিয়াছে এই 'কিতায়'। দড়ি পাকাইতে পাকাইতে পাকিয়া গিয়াছে তাহার দড়ির মত পাকানো শরীর। বয়স নাকি ত্রিশের কোঠায় পৌঁছে নাই। কিন্তু তাহার চেহারায় কালজয়ী ছাপ—কোন বয়সের এ মানুষ, তাহা জানিবার উপায় নাই। চল্লিশ ছাড়াইয়া যে-কোনো বয়স হইতে পারে। দেহের নিজ রঙ পুড়িয়া একটা পোড়া-পোড়া রঙ ফুটিয়াছে। বৈশিষ্ট্যহীন চক্ষু। চোয়ালের উঁচু হাড়ের নীচে চোপসানো ভাঙা গাল। খাটো মোটা নাকটা হঠাৎ ওষ্ঠের দিকে আসিয়া অসাধারণভাবে লাফাইয়া উপরে উঠিতে চাহিয়াছে। রঘুর সমস্ত মুখটিকে হাস্যব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্য দিয়াছে এই নাসিকার উল্লম্ফন। কোথাও শ্রীলেশ নাই রঘু ওড়িয়ার রূপে—সে প্রয়াসও রঘুর নাই। ঘোড়া-ছাঁটা ক্লিপের সাহায্যে জেলে প্রথম দিনেই তাহাদের মাথা মুড়াইয়া দেওয়া হয়। মাসে একবার করিয়া সার বাঁধিয়া বসিয়া সেই কেশমুণ্ডন আর গুম্ফ শ্মশ্রু বিমর্দন বিধিগত—উহার নামে রক্তপাতও অনিবার্য, মুখের চামড়া মাসে তখন নাকি একবার করিয়া ট্যানড হইয়া যায়। তাহারই মধ্যে তবু সেই কদমদছাঁটা চুলে কত জন বদ্রিনাথের মত সযত্ন কেশ-বিন্যাসের গোপন চেষ্টা করে। গোপনে গোপনে বহু আয়াসে সেফটি ব্লেড সংগ্রহ করিয়া চামড়া চাঁচিয়া দাড়ি কামায়, গোঁফ ছাঁটে, নহরের জলে নিজের রূপকে বারে বারে দেখে। ইহাও এখানকার নিয়ম—এই নিয়ম ভাঙা। কিন্তু প্রসাধনের এইরূপ কোনো প্রযত্ন রঘু ওড়িয়ার নাই। নিজের থালা-বাটি যত্ন করিয়া মাজে, জাঙ্গিয়া-কুর্তা সাফ করে—বস্, এই পর্যন্ত। তথাপি এই বাইশ-মহলা বাড়ির সকল মহলেই রঘুর পরিচয় আছে। গলায় 'খোকড়' সে রাখে না। সোনা-দানা গলায় পুড়িয়া আনিয়া জেলের জীবনটাকে একটু সহনীয় করিবার চেষ্টাও যে করিবে, রঘু এমন নয়। সীসার ঢেলা দাঁতে বাঁধিয়া গলায় পুরিয়া 'খোকড়' তৈয়ারী করিতে রঘুর বিশেষ কষ্ট হইত না—গলাটা একটু পচ ধরিত, মাস পাঁচ-ছয়ে সকলেরই তাহা সহ্য হইয়া যায়। তারপর খোকড় তো রীতিমত টাকার থলে—জেলখানা তাহার জোরে রীতিমত হোটেল। কিন্তু রঘু আর প্রত্যাশা করে না টাকার থলে। আসুরিক বলে ও সাহসে সকলের মারপিটকে সর্বাগ্রে চ্যালেঞ্জ করিয়া—মারপিট সহিয়া আর মারপিট করিয়া—জেলখানার সেই নিয়মিত পথে আপনার স্থান এখানে করিয়া লইবে, এমন বল, এমন সাহসও ওড়িয়া-সন্তান রঘুর নাই। সেই পথ হেমা ঘোষের মত খুনীদের জন্য; সেই পথ খোদাবক্সের মত পেশোয়ারী ডাকাতদের জন্য। বাঁচিতে হইলে অপরকে মারিয়াই বাঁচিতে হয়, যেই মুহূর্তে মারিতে না পারিলে সেই মুহূর্তেই মরিতে আরম্ভ করিলে,—ইহাই প্রধান ও সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য, হেমা ঘোষ অমিতকে হাসিয়া জানাইয়াছে। রঘুর মত মানুষেরা

কিন্তু এই সত্যের অন্যার্ধও আবিষ্কার করিয়া লয়,—এই নিয়মে মার সহিয়াই তাহারা মারকে সামান্য করিয়া ফেলে—এবং বাঁচিয়া থাকে। 'এমনি হয়'—ইহাই নিয়ম—তাহা তাহারা জানে।

রঘুর নাম অবশ্য এই 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ'-শক্তির জন্যও নয়। দর্জির কাজ হইতে দড়ির কাজ, কোনো কাজেই তার নৈপুণ্য কম নয়। কিন্তু তাহাতেও রঘুর পরিচয় নয়। রঘুর পরিচয়---এই হাজার দুই অভিজ্ঞ ও রসজ্ঞ বন্ধুর মহলে রঘু ওড়িয়া 'ওস্তাদ'—সে চরসের গুরু। কতটা তামাক-পাতা, কতটা গুলি, কতটা কি মিশাইয়া কোন স্তরের মানুষকে কি দিতে হইবে,—রঘুর মত তাহা কয়েদিরা আর কেহ জানে না—জমাদার, সিপাইরাও নয়। অবশ্য এই নিষিদ্ধ জিনিসের আমদানি-রপ্তানি রঘুর কারবার নয়। সে জানে উহা আসিবেই। যাহাদের আত্মীয়বন্ধু বাহিরে আছে তাহারা নিজেরাই উহার লুক্কায়িত সোনা-দানা দিয়া ঐ সব জিনিস আমদানি করাইবে। আর তাহারাই তারপর ডাকিবে রঘু ওড়িয়াকে—'এ রঘু, আও, আও'।—হিন্দুস্থানী বরাবরই জেলখানার রাষ্ট্রভাষা।—চোখে পড়িবার মত মানুষ রঘু নয়, তবু তাহাকে সকলে চিনে। তাহার শত্রু নাই, একান্ত মিত্রও নাই, সকলেই প্রায় সমান বন্ধু। কারণ এই তুচ্ছদেহ মানুষটাই দরকার পড়িলে পরশুরাম কি শুক্কুরের কমতি-পড়া ছোবড়া পিটিয়া তাহাদের বরাদ্দ পূরণ করিয়া ফেলিবে—পারিলে তাহাকে না হয় পরশুরাম সেইজন্য দিবে আধখানা বিড়ি। আর না পারিলে? কতবার এমন হইয়াছে রঘুর একাদিক্রমে দুই-এক দিন বিড়িও মিলে নাই। 'এমন হয়', এখানে এমন হয়—তাহাও সে জানে। তাই কষ্ট পাইয়াছে, কিন্তু রঘু কাহারও বিরুদ্ধে ক্ষোভ রাখে নাই। দুইদিন পরেই তো আবার সব মিলিয়া যাইবে।

এই জেলে অমিতের হাত হইতে অমিতের দেহ-ভার অত্যন্ত সহজ ভাবেই সেবার রঘু ওড়িয়া লইয়া ফেলিয়াছিল। এ জীবনে অমিতকে এই ভাবে ভার-মুক্ত করিবার সৌভাগ্য আর কেহ পায় নাই,—মা না, বোন নয়, ভৃত্যরা নয়। হয়তো অমিত বড় শ্রান্ত অসুস্থ ছিল বলিয়াই রঘু তখন তাহা আয়ত্ত করিয়া লইল।

কাঁচের গেলাসে খাবার জল হাতের কাছে রহিয়া গিয়াছে। কোথা হইতে উহার এই অ্যালুমিনিয়মের ঢাকনি মিলিল? অমিত ঢাকনিটা নাড়িয়া দেখিল। তারপর রঘুকে জিজ্ঞাসা করিল।

রঘু সম্ভ্রমে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কোথায় পাওয়া যায় এ ঢাকনি?—আবার প্রশ্ন করিল অমিত।

এম্-ডি'তে হয়, বাবু। কারখানা-ঘরে হয়।—রঘু শেষ পর্যন্ত উত্তর দিয়াছে—কলিকাতার বাঙলার সঙ্গে কলিকাতার ওড়িয়া মিশাইয়া।

কারখানা? এখানে কারখানা! কোথায়?—বেশী ভালো করিয়া উত্তর দিতে পারে না রঘু, তবু নতুন খবর পাইয়া অমিত আশ্চর্য হয়। এখানেও কারখানা চলিতেছে। অ্যালুমিনিয়মের থালাবাসন তৈরী হয়। মগ ও ঢাকনিও তৈরী হয়,—তাহা হাসপাতালে যায়।

তুই পেলি কোথায় ? অমিত প্রশ্ন করিয়াছে। রঘু মুখ নামাইয়া সলজ্জ হাস্য গোপন করিতে চাহিল। উত্তর দিল না। নিজের কৃতিত্ব ও বুদ্ধির কথা সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না।—ভাষাও নাই। কেষ্ট 'পাহারা' হইলে এতক্ষণে অনায়াসে একটা বড় গল্প ফাঁদিয়া ফেলিত—কালই শোনাইল যেমন কেষ্ট অমিতকে।

'দিতে চাইছিলেন না'—ডিপুটি জেলার বাবু ভয় পান। আমি বললাম 'কি বলেন স্যার, এ সব বই আপনারা কত পড়েছেন। জানেন না কি ? আর আপনারা ছাড়া এঁদের মত লার্নেড ম্যানদের কে দেখবেন ? এই ইডিয়েট সাহেবগুলো ?' কেষ্ট ইংরেজি-জানা লোক, সে বিষয়ে কাহারও সে কোনো সময় সংশয় পোষণেরও স্থান রাখে না। কেষ্ট জানায় সেই 'স্যারের' সঙ্গে তাহার 'পাহারার' বুদ্ধির খেলা, কথার ম্যারপ্যাঁচ। তাহাতেই বই-এর পুরনো মোহরাঙ্কিত পৃষ্ঠায় এ-জেলের নতুন নীলমোহর পড়িয়া গেল। বন্দী বাবুর বই 'পাস' হইয়া গেল। আর কেষ্ট পাহারা সেই ফরাসী ডিক্‌শনারি ও ইংরেজি বাইবেলের পুস্তকভার সম্মুখে রাখিয়া অমিতকে সপ্রতিভভাবে বুঝাইয়াছে, 'কাল নিয়ে এলাম স্যার, কৌশল করে। দুপুরবেলা, বড় সাহেব-টাহেব নেই তো কেউ। একমাত্র ছোট ডিপুটি সাহেব ছিল। বুঝি তো স্যার, কিছুটা পড়াশোনা না করতে পারলে আপনার মত লার্নেড ম্যানদের দিন কাটবে কি করে ?'—তারপর কেষ্টর কৃতিত্বের কাহিনী আরম্ভ হইল। কত ভাবে বই কয়খানা আদায় করিয়া, কয়টা দুয়ারে কয়টা তল্লাসী পার হইয়া, কেষ্ট পাহারা অমিতের জন্য এই বই উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিয়াছে 'সাত খাতায়'। সর্বশেষে সবিনয়ে জানায় কেষ্ট—'সে স্যার আমাকে আটকাতে পারবে না, আপনাকে গর্ব করে বলতে পারি।'

তারপর কেষ্ট বলিল : আপনি সিগারেট খান না বুঝি ? অনেকদিন স্মোক করি নি—। অমিত বুঝিল—এইবার কেষ্ট একটা সত্য কথা বলিল।

কিন্তু রঘু মুখ ফুটিয়া তথাপি বলিতে পারে না কোথায় পাইল সে গেলাসের এই ঢাকনি।

অমিতের কৌতূহল বাড়িল : কি রে, কোথা থেকে পেলি—

হাসপাতালে।—অনেক পরে সলজ্জ হাস্যে একটি কথা উচ্চারণ করিল।

হাসপাতালে ? এখানে এল কি করে ?

বার কয় জিজ্ঞাসার পর জানা গেল হাসপাতালের লোক আসে ঔষধপত্র বহন করিয়া—তাহারাই ইহাও আনিয়াছে। অমিতের কাপড়-কাচা সাবানের এক টুকরা রঘু এইজন্যই বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। সাবানের টুকরা ঢাকনির দাম !

পরিচ্ছন্ন গেঞ্জি কাল গায়ে পরিয়া অমিতের মনে তৃপ্তি আসিয়াছিল। রঘু সাবান দিয়া কাচিয়া দিয়াছে। আজ মনে মনে কৌতুক ও কৌতূহল জাগিল—কারণ, রঘু জানায়, সেই সাবানের একটা টুকরাই কোথা দিয়া আবার পরিণত হইয়া আসিয়াছে গ্লাসের ঢাকনিরূপে। এমনি হয় এখানে। আশ্চর্যরূপে জিনিসের রূপান্তর ঘটে—তামাক-পাতা পরিণত হয় হাজার টাকার নোটে। আবার নোটও

পরিণত হয় তামাক পাতায়, বিড়িতে, চরসে—হয়তো হাসপাতালের রঘু কর্তব্যে, গোশালার দুগ্ধে, ঔষধে, বড় সাহেবের ব্যাটারে ও ব্রাণ্ডিতে। এই আণবিক পরিবর্তন-পদ্ধতি সনাতন ও সুদীর্ঘ।—এই জন্যই ইহার বিরুদ্ধে যেসব নিয়ম কানুন আছে তাহাও অপরিবর্তনীয়—বরং এই সব ট্যারিফ, উট্রায়ার সূত্রেই এই ট্রেড চ্যানেল ঊর্ধ্বে-নিম্নে সুদূর-বিস্তৃত। অন্য সময় হইলে রঘুর কাজটা অমিতের ভালো লাগিত না। কিন্তু তাহার নিকট জেলখানার ইতর ও নিষ্প্রাণ অবস্থা ও ব্যবস্থার একটা হাস্যকর দিকও ক্রমশ চোখে পড়িতে লাগিল। আমলাতন্ত্রের এই কৃত্রিম বিধি-বিধানের অষ্টাবক্র রূপটাও কি কম সত্য? যেন ফলস্টাফের জগতের একটা টুকরা আসিয়া পড়িয়াছে এখানে। অনেক পার্থক্য আছে; তবু কত মিলও!—শ্রান্তচক্ষে অমিত তাহা বসিয়া দেখিত। আর দেখিত তাহার শেভিং-বাক্স ও ক্ষুর ধুইবার জন্য জল লইয়া দাঁড়াইয়া রঘু। আহারশেষে পেয়ালা, প্লেট সোডায় সাবানে অমনি পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া যায় তৎক্ষণাৎ রঘু। এমন হাতের কাছে আহারান্তে পাইয়া অমিত লবঙ্গ-এলাচ আবার ধরিয়া ফেলিল। সোরাই জলে ভরা। শুধু চা-ই নিয়মিত আসে না, মসলা-যুক্ত আহার্যও তাহার জন্য দশজনের ভিড়ের মধ্যেও সযত্নে প্রস্তুত হইয়া যায়। না, ইহার পূর্বে এমন করিয়া অমিতকে সেবা করিবার অধিকার আর কে লইতে পারিয়াছে?—

শুধু ফলস্টাফের পৃথিবী নয়, ও যেন গোর্কির 'পাতালপুরী'ও।

অমিত রঘুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কিন্তু উত্তর সহজে পায় নাই। একটু একটু করিয়া সংগ্রহ করিয়াছে রঘুর সংবাদ। গঙ্গার ওপারে শিবপুরে তাহার দাদার দোকান আছে। ছোট দোকান; মুড়ি-মুড়কির দোকান। ডাল-চালও এখন রাখে। চিনি-গুড়, বাতাসা, সামান্য 'বানিয়াতি' জিনিসও মিলে। বৎসর পাঁচ সাত পূর্বে রঘু সেই দোকানেই দাদার সাহায্য করিতে আসিয়াছিল; এখন রঘু আর দোকানে যায় না। বাড়ি যায়, তবে অনেক সময়ে যায়ও না। রঘুর জন্য দাদা ও ছোট ভাইটাকে পুলিশ টানাটানি করিতে থাকে, দুই-এক টাকা ঘুষ না পাইলে তাহাদেরও থানায় লইয়া চলে। ভ্রাতৃবধূও আর বারে বারে রঘুর জন্য এই জ্বালাতন সহিতে চায় না। দেশে অবশ্য রঘুর বাপ-মা আছেন; পুরী জিলার গ্রামে। জায়গা-জমি আছে, তাঁহারা চাষবাস করেন।

স্ত্রী?—জিজ্ঞাসা করে অমিত।

রঘু লজ্জা পায়।

স্ত্রী নেই?—বারে বারে জিজ্ঞাসা করে অমিত।

রঘুর লজ্জা কাটে না।

বিয়ে করিসনি?

মাথা নাড়িয়া রঘু জানায়—বিবাহ সে করে নাই।

কিন্তু কথাটা সত্য নয়। আর একদিন রঘুর সামনেই অমিতকে হাসিয়া আপ্পাস্বামী জানাইয়া দেয় ওড়িয়াদের শিশু-বয়সেই বিবাহ হয়।

সত্যই তো, অমিতের মনে পড়ে,—এদেশে কাহার না শিশু-বয়সে বিবাহ হয়? বিবাহ তো এ দেশের মানুষ নিজে করে না, বিবাহ 'হয়'। বিবাহ তাহাকে 'দেয়' তাহার পিতা-মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, আত্মীয়, পরিজন। তাহা পরিবারের অনুষ্ঠান, ব্যক্তির পত্নী-নির্বাচন নয়। রঘুরই বা তবে বিবাহ হইবে না কেন? রঘুর পিতা-মাতারও রঘুর জন্য যথাসময়েই বউ আনিবার কথা—অর্থাৎ রঘুর যখন আট দশ বৎসর বয়স।

অমিত জিজ্ঞাসা করে, বিয়ে হয় নি বলেছিলি যে তবে?

মাথা নোয়াইয়া নীরবে মেঝের ঝাড়-দেওয়া কুটা ও ধূলা খুঁটিয়া তুলিতে থাকে রঘু।

মিথ্যা কথা বলেছিলি। কি রে, মাথা তোল না।

মাথা তুলিতে বাধ্য হয় রঘু।

মিথ্যা কথা বলেছিলি—না?

অম্লান বদনে তেমনি সলজ্জভাবে রঘু জানায়, হাঁ, বাবু।

মিথ্যা বলিবে না, এমন প্রতিশ্রুতি রঘু তো দেয় নাই। অমিতই কি দিয়াছে কাহাকেও কোনো কালে? সংসারে মিথ্যা সকলকেই বলিতে হয়। যুধিষ্ঠিরকেও বলিতে হয়। 'তবে যুধিষ্ঠিরের মত অত মারাত্মক মিথ্যা সাধারণ মানুষে বলিতে জানে না, ইহাই পার্থক্য'—অমিতের এই পরিহাস শুনিয়াই পরে একদিন লক্ষ্মীধর বাবু ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু, মিথ্যা বলার জন্য রঘুর উপর অমিতের কোনো বিরাগ-বিরক্তি হইল না। কারণ, অমিত ভাবিয়া দেখিয়াছে, এ মিথ্যায় কি লাভ রঘুর? কিছুই নয়। একেবারে 'নিষ্কাম' এই মিথ্যা, আর ইহাই তো নির্দোষ মিথ্যা। নিষ্কাম কর্মই যদি জীবনের চরম সাধনা হয়, তাহা হইলে নিষ্কাম মিথ্যাতেই বা আপত্তি কি? কাহারও ক্ষতি নাই—লাভ নাই বক্তারও, কিন্তু সেই সূত্রে বরং জীবনে জোটে অনেক রহস্য, অনেকখানি কৌতুক, অনেকখানি ফলস্টাফীয় আনন্দ আর সত্য।

এই স্বচ্ছ মিথ্যাটা উপভোগ করিতে করিতে অমিত জানিয়াছে—রঘু জানে না তাহার স্ত্রী কোথায়, রঘুর পিতা-মাতার কাছে আসিয়াছে, না এখনো রহিয়াছে বধূর পিতৃগৃহে। এখনো কি সে বালিকা, না যুবতী—রঘুর সে সম্বন্ধেও কৌতূহল নাই।

বাড়ি যাস্ না? কতদিন যাস্ না?

রঘু জানাইয়াছে অনেকদিন, পাঁচ বছরের বেশী।

স্ত্রী সম্বন্ধে রঘুর ঔৎসুক্য নাই। তাহার বন্ধুরা অনেকে বাড়ি যায় না—স্ত্রী-পুত্রের নিকট 'চোর' বলিয়া পরিচয় দিতে কেমন লজ্জা-বোধ করে বলিয়া। স্ত্রী-পুত্রও গ্রামে দশজনের নিকট তাহাদের জন্য মুখ দেখাইতে পারে না। রঘুর জীবনে অবশ্য স্ত্রীর স্থান মোটেই হয় নাই। হইলেও সম্ভবত তাহা মুছিয়া যাইত। অন্য রমণীর ছায়া হয়ত আসিয়া জুটিত। তাহাও আসিত, যাইত,—কখনো ঘন

হইয়া দাগ কাটিয়া বসিত, কখনো ক্ষিকে হইয়া আবার উঠিয়া যাইত। রঘুর জীবনে কি তেমন কোনো বন্ধন নাই? অমিতের কৌতূহল হইত, কিন্তু অমিত তাহা জানিতে পারে নাই, জিজ্ঞাসা করিলে লজ্জায় পড়িত। অমিতকে যে সে অনেক বেশী মান্য করে। হয়তো জিতেন্দ্রিয় পুরুষ নয় রঘু, তবু অমিত বুঝিয়াছে—রঘু নির্বিকার পুরুষ, বৈদান্তিক, মায়া-বন্ধনই যেন তাহার নাই।

কিন্তু বন্ধন রঘুরও আছে। ছেনীর জন্য রঘুর প্রেম নিতান্ত সাধারণ নয়। জেলখানায় বিড়ালের জন্য সরকারী ভাতা মঞ্জুর আছে—ইঁদুর ধরিবে। বিড়ালগুলি স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে দেয়ালে, কার্নিশে, গরাদের ফাঁকে ফাঁকে। এই বিড়াল লইয়াই কয়েদীর পরিবার। রঘুও ইহার মধ্যে একটা বিড়াল-ছানা জুটাইয়া লইয়াছে। আর রঘুর সৌন্দর্যবোধ আছে—সাদার উপরে সামান্য কালো রঙ মিশানো হৃষ্টপুষ্ট ছেনী দেখিতে চমৎকার—অমিতও তাহা মানে। ছেনী রঘুর সঙ্গী।

জিজ্ঞাসা করিলে রঘু লজ্জা পায়, কিন্তু মনে করিতে পারে না—কখন সে চুরি আরম্ভ করিয়াছিল। শুধু মনে পড়ে—সে পকেটমার ছিল না। কয়েদি-সমাজে পকেটমাররা উপহাসের পাত্র। রঘু উহার অপেক্ষা একটু উপরের তলার লোক—'তালাতোড়'।—সিঁদেল চোর নয়, ডাকাত-গুণ্ডাও নয়—অতটা দুঃসাহসের দাবী রঘু করে না। কিন্তু প্রথম বার জেলে আসিয়াছিল ছিঁচকে চোর হিসাবে। হাওড়া হাটের একটা দোকান হইতে সেবারও খানকয় কাপড় লইয়া রঘু সরিয়া পড়িতেছিল, ধরা পড়িয়া যায়। সেই প্রথম জেল। তারপর ও-রকম আরও ঘটিয়াছে; নানা ভাবে বার পাঁচ-সাত ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

কেন চুরি করিস?

রঘু উত্তর দেয় না। অমিত মনে করাইয়া দেয়,—তুই তো চমৎকার কাজকর্ম করতে পারিস। কাজ করিস না কেন?

রঘু উত্তর দেয় না। বেড়ালছানাটা তাহার পায়ে সাদরে গা ঘষিতে থাকে। বুঝা যায় কথাটায় সে মোটেই গুরুত্বও দেয় নাই।

কে বলিয়াছিল, নেশার টাকার জন্যই চুরি করিতে হয়। অমিতও তাই বলিল,—চরস তো সস্তা নেশা। আর কিছু নেশা করিস না কি?

রঘু মাথা নোয়াইয়া, একটু হাসিয়া বেড়ালটাকে আদরের সঙ্গে সরাইয়া দেয়।

আর কি কি নেশা খাস?—অমিত সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করে।

রঘু ধীরে ধীরে বলিয়া যায়—মদ-অ খাই, গাঁজা খাই, গুলি খাই, চরস-অ খাই—যেমন-অ পাই খাই।—গর্বের লেশ নাই তাহার কথায়, বরং একটু লজ্জা আছে।

না, শেক্সপীয়ারও তাহার পরিচয় পায় নাই—অমিত তাহা বোঝে,—গোর্কিও দেখে নাই তাহাকে। সে প্রেসিডেন্সি জেলের রঘু ওড়িয়া।

অমিত জিজ্ঞাসা করে, এত পাস কোথায় রে?

চুরি করি।—নির্বিকার-চিত্তে রঘু জানায়। চুরির নেশাই রঘুর পক্ষে বড়, না নেশার জন্য চুরিই তাহার পক্ষে প্রয়োজন, অমিত জানিতে চায়। রঘু ঐ তত্ত্ব কখনো ভাবিয়া দেখে নাই,—কোনো তত্ত্বই সে জানে না, বলিতেও পারে না।

আচ্ছা, সংবাদপত্র অফিসে কাজ করবি তুই,—দপ্তরির কাজ, বাঁধাইর কাজ? তুই তো বেশ ভালো শিখেছিস তা জেলে।—রঘু নীরব থাকে। সম্মতি আছে ভাবিয়া অমিত বুঝাইতে থাকে—বাহিরে গিয়া চাকরির জন্য কোথায় সে কাহার নিকট অমিতের নাম করিবে।

তাড়াতাড়ি বাধা দেয় রঘু। কেন রে?—ঠিকানা নিবি না?

না, না—। চোর-অকে বিশ্বাস-অ নাই, বাবু। ঠিকানা দিবান না। বাড়ির-অ নয়, আপিসের-অ নয়।—না, না। কখন নেশার দরকার হব; আপনকার মাক কইব, 'অমুক বাবু' জেলরু চাহি পাঠাইলেন—পনরটা টঙ্কা দিয়।'

রঘু তাই অমিতের নিজের ঠিকানাও গ্রহণ করিবে না।

অথচ অমিতের বাক্সের চাবি হইতে কলম, ঘড়ি সবই তো থাকে রঘুর জিম্মায়। সাধ্য নাই কেহ সে বাক্স, সে টেবিলের কাছেও ঘেঁসিবে—রঘুর পাহারায় কিছুই খোয়া যাইবার উপায় নাই।

যুবক মিহির বোস সেবার ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। জন পঁচিশ সিপাহী লইয়া জেলার আসিতেছে। তল্লাসি শুরু হইবে।

এরূপ ঘটনা পূর্বেও ঘটিয়াছে। তল্লাসির নিয়ম জেলে বরাবরই আছে। মাঝে মাঝে সব তল্লাসি করিতে হয়। এতদিন বন্দীদের ব্যারাকে তল্লাসি হইত না। এবার শুরু হইল। ও-ব্যারাকে তল্লাসি শুরু হইয়া গিয়াছে; এ-ব্যারাকে মিহির করিবেন কি এখন? দশ টাকার দশখানা নোট তাঁহার নিকট আছে। অমিত খতকটা পীড়িত, অনেকটা সম্মানিত;—হাতের মোটা খামটা লইয়া মিহির উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসু চক্ষে, বলেন,—অমিদা—.

জেলে টাকাকড়ি রাখা নিষিদ্ধ, তাহা দণ্ডযোগ্য অপরাধ।

অমিত চুপ করিয়া থাকে। প্রশ্ন করা নিষ্প্রয়োজন। অমিত ইহাও জানে টাকার প্রয়োজন আছে এখানে—টাকা এখানে রাখিতেই হয়। শেষে অমিত হাত বাড়াইয়া দেয়—দিন।

তারপর? আপনার কাছে পেলে?—উৎকণ্ঠিত মিহির নোটের খামটা দিতে দিতে একবার জিজ্ঞাসা না করিয়া পারেন না।

পাবে না। পেলে?—নিয়ে যাবে। কিন্তু পাবে না।—মিহিরও যেন ইহা শুনিতেই চাহিয়াছিলেন, শুনিলেই আশ্বস্ত বোধ করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, বাঁচেন।

মিহির চলিয়া গিয়াছেন। অমিত ডাকিল,—রঘু!

রঘু সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। অমিতের চাবি তাহার কাছে, তল্লাসির সময়ে বাক্স-পেটারা খুলিয়া দিবে, অসুস্থ অমিত অত মাল-পত্র খুলিয়া দেখাইতে পারিবে কেন? তাই রঘুর তল্লাসি একবার হইয়া গিয়াছে, এখন ঘরের বাহির হইতে গেলে

আবার তল্লাসি হইবে। অমিত খামটা হাতে দিয়া বলিল,—রঘু, রাখতে পারবি তো? দশটাকার দশখানা নোট।

রঘু বিনা দ্বিধায় হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল। অমিতের হাতে তাহার বাক্সের চাবি দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল—যেন বেড়ালছানাটাকে এদিকে-সেদিকে খুঁজিতেছে।

তল্লাসি উপলক্ষ করিয়া কর্তৃপক্ষের সহিত বন্দীদের সেদিন ধ্বস্তাধ্বস্তি হইল। অল্পবিস্তর হাতাহাতিও হইল। এক পক্ষের নিয়ম-রক্ষার ও অপর পক্ষের বিরোধিতার জন্য জবরদস্তি যতটা হইবার হইল। ঠিক তল্লাসি সম্ভবত হইল না, ঠিক প্রতিরোধ হইল না। অমিতও মৌখিক প্রতিবাদ যথেষ্ট করিল, বাধা দিল না. দিতে পারিতও না, সে তখনো অসুস্থ। কিন্তু নিষিদ্ধ বস্তু কিছুই পাওয়া যায় নাই।

অমিত এ জেলে থাকিতে থাকিতেই সেবার আর একদিন তল্লাসি হইয়াছে; কেহ বাধা দেয় নাই, কিন্তু সেই দশখানা দশ টাকার নোটের সন্ধান কোনো কালে কেহ জানিতেও পারে নাই—রঘু চোর, হুঁশিয়ার লোক। টাকাটায় কাজ হইয়াছে—যেমন হইবার, যদিও এখানে টাকা বাঁচাইয়া রাখা সহজ নয়। এখানে-ওখানে কয়েদীর লুকানো টাকা চুরিও যায়। সিপাহীরা পাইলে কাড়িয়া লয়। মিথ্যা করিয়াও কেহ কেহ কাঁদা-কাটি করিয়া জানায়—সর্বনাশ হইয়াছে, কে তাহার গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। নিজেদের 'স্বদেশী' সঙ্গীদেরও টাকার ব্যাপারে সেরূপ আচরণ একেবারে অমিতের অজ্ঞাত নয়—নরেন্দ্র মিত্রের সেইরূপ কাণ্ড অমিত শুনিয়াছে। এই জেলেই তাহার কাছে কিছু লুক্কায়িত টাকা জমা ছিল। সকলেরই সন্দেহ নরেন সেই টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে—। চোরেরা কেহ স্বদেশীদের টাকা স্পর্শও করে নাই। কিন্তু রঘু থাকিতে অমিতের কিংবা মিহিরের ভাবিতে হয় নাই। টাকা ধরা পড়িবে না, মারা যাইবে না।

অথচ. 'চোর-অকে বিশ্বাস নাই' বলে রঘু; অমিতের বাড়ির ঠিকানাও সে বলিতে দেয় না অমিতকে। ভাবিয়া অমিতের আনন্দ হয়—একবারের মত অন্তত সে তাহার মতবাদের আরও সমর্থন পাইল—মানুষকে বিশ্বাস করিলে যত ঠকিতে হয়, তাহার অপেক্ষা বেশী ঠকিতে হয় মানুষকে অবিশ্বাস করিলেই। মনে পড়িল টলস্টয়ের লেখা গল্প—আশ্চর্য সে গল্প। সে লোকটাও চোর, তবু সে ভালবাসে। সেই ভালোবাসার পাত্রী তাহারই হাতে তাহার টাকার থলি যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার ভার দিল। দায়িত্বের ভার ও ভালোবাসার ঐকান্তিকতা এক দিকে, আর এক দিকে চোরের লোভ, নগদ টাকার দুর্বার আকর্ষণ। দুর্বার সংগ্রাম মানুষটির অন্তরে; আর শেষ পর্যন্ত জয়ী হইয়া যখন সে গন্তব্য-স্থলে-পৌঁছিল তখন দেখিল সংগ্রামের মধ্যে সেই থলিই খোয়া গিয়াছে। কিন্তু কে তাহার এই কথা বিশ্বাস করিবে?

বিশ্বাস করিলে কিন্তু ঠকিতে হয় না। যে রঘু 'তালাতোড়'—'স্বদেশীদের' নগদ টাকাও সে এমনি করিয়া আগলাইয়া ফিরিতেছে। কিন্তু রঘুর মুখ দেখিয়া সে মুখে অমিত আত্মসংগ্রামের কোনো চিহ্ন দেখিতে পায় না। তেমনি নিস্পৃহ নিশ্চেতন নির্বিকার, কাজ করিয়া যাইতেছে। টলস্টয় কি কখনো চোর দেখিয়াছিলেন—যে

চোর নিজ হইতে বলে, 'চোরঅকে বিশ্বাস-অ নাই।' আর টাকা হাতে পাইলেও মনে যার দ্বন্দ্ব বাধে না। টলস্টয় অনেক দেখিয়াছেন, কিন্তু অনেক দেখেনও নাই নিশ্চয়। অথবা, দেখিয়াছেন কম, কিন্তু আঁকিয়াছেন তিনি দেবতার মত স্থির হস্তে। অমিত আঁকিতে জানে না, কিন্তু দেখিতে পাইল অনেক।

রাওয়ালপিণ্ডির পাঠান এনায়েত খাঁ। রঘুর বেড়াল-ছানাটার সৌন্দর্য তাহার চোখে পড়িয়াছে; হয়তো বাচ্চাটার প্রতি রঘুর ও অন্য কয়েদীদেরও মায়া চোখে পড়িয়াছিল। আরও বেশি চোখে পড়িয়াছিল বেড়াল-ছানাটারও রঘুর জন্য আকর্ষণ। সিপাহী এনায়েত খাঁ বার-কয় ছানাটাকে ধরিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়াও ধরিতে পারে নাই। তাই পাঠান-পৌরুষে লাগিয়াছিল, সিপাহী মর্যাদাতেও লাগিয়াছিল। কিংবা হয়তো ইহাই এনায়েত খাঁর ভালোবাসার নিজস্ব ভাষা—একটু তাক্ করিয়া থাকিয়া ছানাটাকে কাছে দেখিতেই সে ছুঁড়িয়া মারিল ব্যাটনটা। অভ্রান্ত পাঠানি লক্ষ্য। মাথায় ডাণ্ডা লাগিতে ছানাটা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল, ছটফট করিতে লাগিল। এনায়েত খাঁ সোল্লাসে ছুটিয়া গেল—এবার ছানাটা পালাইতে পারিবে না। কিন্তু নড়িতেছে না যে আর? পায়ের মোটা জুতা দিয়া উল্টাইয়া দেখিল এনায়েত খাঁ। কয় ফোঁটা রক্ত নাক দিয়া মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে, মাটিতে পড়িয়াছে। 'বস্—খতম্?' এনায়েত খাঁর দৃষ্টিতে একটু বিস্ময় জাগিল; আর সঙ্গে সঙ্গে একটু কৌতুকও—'খতম!' তার পর ব্যাটন কুড়াইয়া লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে আঙিনার অন্য দিকে চলিয়া গেল।

অমিতের খদ্দরের জামাটার নতুন বোতাম পরাইতেছিল রঘু। কি একটা কলরব উঠিয়াছে, কে ছুটিয়া আসিয়া কি বলিল,—এ রঘু, সুনা?

দুইজনে অমিতের নিকট হইতে একটু দূরে গিয়া কি বলিতে লাগিল। অমিত পড়িতেছে, বাধা পাইবে। অমিতের কানে গেল শুধু 'বিল্লী' শব্দটা। দেখিল, রঘু কোথায় চলিয়া গেল। রঘুর কাণ্ডই এইরূপ—সামান্য একখণ্ড মাছ রাখিয়াছে তাহার জন্য অমিত; এ চোরটা তাহাও খাইবে না। শুধু চরস আর নেশা। মাছ হোক, অন্য খাদ্য হোক, বেশি জোর করিলে তুলিয়া রাখিয়া দিবে, খাওয়াইবে সেই বেড়াল-ছানাটাকে। সেই উদ্দেশ্যেই নিশ্চয় এখন গেল।

একটা চাপা-গলার অস্ফুট শব্দ শোনা যাইতেছে। অমিত পিছন ফিরিয়া দেখিল—রঘু কখন আসিয়া সেলাইয়ের উপর ঝুঁকিয়া বোতাম লাগাইতে বসিয়া গিয়াছে।

কখন এলি?

কিছু আগে।

গেছলি কোথায়?

রঘু মাথা নোয়াইয়া রইল। অমিত আবার জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় গেছলি রঘু?

ডাকিল অরা—। কেমন ভাঙা যেন রঘুর গলাটা।

এবার অমিতের সন্দেহ হইল।—কি হয়েছে রঘু, বল তো।

রঘু এবার শান্ত কণ্ঠে বলিল, ছেনীকে মাঁরি ফেলিলা—

কাকে ?—অমিত চেয়ার লইয়া সরিয়া বসিল।

নিস্পৃহ স্বাভাবিক কন্ঠে এবার বলিল রঘু ঃ ছেনী। ও বিড়াল-বাচ্চাটা—

কাহিনীটা তখন অমিত শুনিল। বেশি বলিতে পারিল না রঘু। তখনো সে বোতাম লাগাইতেছে। আঙিনায় কয়েদীদের জটলা তখন 'স্বদেশীদের', জটলায় পরিণত হইয়াছে। সকলে বিরক্ত হইয়াছে—কী পশু এই পাঠান সিপাহীরা, হেলায়-খেলায় মারিতেই যেন উহাদের উৎসাহ! 'স্বদেশীরা' ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে।

কোনো ইংরেজ-হত্যায় ইহাদেরও মনে বিন্দুমাত্র খেদ জাগিত না। কিন্তু সেখানে হত্যা শুধু একটা প্রকাণ্ড জাতি হত্যার প্রতিবাদ। তবু জীবহত্যা এই জাতির যেন প্রকৃতিবিরুদ্ধ। অমিতও মানে—কোথায় একটা কাঁটা থাকিয়া যায় এইরূপ কাজে, নিষ্ঠুরতায় ; ইহার মধ্যে একটা কাপুরুষতা আছে।

সকলের দৃষ্টিতে এনায়েত খাঁর ঔদ্ধত্য আরও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় সকলেই একমত—অমিতও মানিতেছে,—'ছেনী' একটা 'কজ্', উহাকে লইয়া 'ফাইট্' করিয়া এনায়েত খাঁয়ের ঔদ্ধত্যকে খর্ব না করিলে চলিবে না। অন্যায় সহিলে তাহা হয় ঘৃণ্যতম অন্যায়। ইহার বিরুদ্ধে বল পরীক্ষা করিতে হইবে।

কিন্তু সন্ধ্যার পূর্বেই জটলা থামিয়া গেল।

বিকালের দিকে কালীকিঙ্করবাবু আসিয়া 'অমিতবাবুর' নিকট বসিলেন—উগ্র তরুণেরা তাঁহাকে বলে, 'শ্বেত কিঙ্কর'। সেদিনের বিপ্লবী 'দাদা' না হউন, এদিনের 'কংগ্রেসী মেজদাদা'। কিছুদিন আগে, তিনি চেষ্টা করিয়া এ 'খাতার' বন্দীদের প্রতিনিধি হইয়াছেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁহার সর্ব সময়ে বাক্যালাপ করা প্রয়োজন—বন্দীদের অভাব-অভিযোগে বিরোধ মীমাংসায় তিনিই স্বীকৃত মুখপাত্র। কালীকিঙ্কর বাবু জানাইলেন—'বড় জমাদার' তাঁহাকে ধরিয়াছিল, এনায়েত খাঁ ছিল দূরে দাঁড়াইয়া। বড় জমাদার খুব আফসোস জানাইল। বেইমানির জন্য এনায়েত খাঁকে খুব তিরস্কার করিল কালীকিঙ্করবাবুর সম্মুখে ; 'যা-তা ওদের হিন্দুস্থানী ভাষা—জানেনই তো'। এবং পরে কালীবাবুর কাছে বাবুদের উদ্দেশে এনায়েতকে দিয়া 'মাফি মাঙ্গাইল'। অতএব—

কি করা যায় বলুন তো ?—জিজ্ঞাসা করিলেন কালীকিঙ্করবাবু।

কি আর করা যাবে ? অমিত বুঝিতে পারে না। বেড়াল-ছানাটা তো আর বাঁচিয়া উঠিবে না। সিপাহীদের সহিত সংঘর্ষ সে কামনা করে না। তাহা বাঁধিলে জেল কর্তৃপক্ষই উৎফুল্ল হইবেন—লাঠি-গুলির সুযোগ মিলিবে, সিপাহীরা স্বেচ্ছায় কর্তাদের হাতিয়ার হইয়া উঠিবে।

কালীকিঙ্কর বুঝিয়াই বলিলেন, আমিও তাই ভাবছি। চুকে যাক তবে। বড় জমাদার-ব্যাটাও একটু হাতে রইল। তাতে 'ট্যাক্‌টিকালি' একটা 'অ্যাডভান্টেজ' আমরা পাব! যে পাজী লোক সে ব্যাটা—জেলটার মালিক আসলে এই ফতে মহম্মদ। না, না, তাকে কোনো কথা আমি দিইনি। তাকে বলেছি, 'আচ্ছা ওয়ার্ডে গিয়ে দেখি।' আপনার সঙ্গেই তাই প্রথম কথা বলছি। আপনিই বুঝবেন কথাটা—

নইলে আমি কিছু বললেই ফ্যাকড়া তুলে দেবে হয়তো লক্ষ্মী ঘোষের দলের ওই ছেলেগুলো। জানেনই তো, সেই কংগ্রেসের মারামারিতে ওরা আমার বিপক্ষে ছিল। এখানেও রিপ্রেজেনটেটিভ যেন আমি না হতে পারি, সে জন্যও কী কাণ্ডটা করেছে দেখেছেন তো! ঝাগড়াঝাঁটি করবে জেলের অফিসারদের সঙ্গে কথায় কথায়। আমি বলি, 'বাপু' একটু ট্যাকটিকালি চলতে হয়। ওরাও তো দেশের মানুষ—হোক জেল-অফিসার।' এই তো আপনার ইন্টারভিয়্যুর ব্যবস্থা ঠিক করে এলাম এস্-বি-র নবকান্তকে বলে। অমিত চমকিত হইল, প্রতিবাদ করিল, তাকে বলতে গেলেন কেন? কালীকিংকরও বলিলেন, 'বলতে গিয়েছি নাকি? তার সঙ্গে দেখা হল আপিসে; অমনি দিলাম শুনিয়ে। হাঁ, কড়া কথাই বলেছি। হয়ে যাবে দেখবেন দু-এক দিনের মধ্যেই ইন্টারভিয়্যু—'

অমিত তবু একবার বলে, 'না, না, সে যখন এখানে আছি, হবেই। সে জন্য আপনার ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই।—মনে মনে যথেষ্ট উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল অমিত ইন্টারভিয়্যু শব্দটা শুনিবা মাত্র। অনেক আশা আর অনেক নিরাশা একসঙ্গে দোলা দিতেছিল বুকের মধ্যে। তবু যথাসম্ভব শিষ্টাচার ও অনুবেগের সঙ্গেই মুখে বলিল,—'প্রয়োজন নেই।'

কালীকিংকর বুদ্ধিমান। বলিলেন, 'প্রয়োজন কেন, এ তো আপনার অধিকার। কেন দেবে না ইন্টারভিয়্যু। হাঁ, তবে কি না—আদায় করতে জানতে হয়। বাড়ির লোকেরা আমার সঙ্গেও ইন্টারভিয়্যু পায় পনেরো দিনে একবার। আমরা মধ্য-কলকাতার লোক। জানেন তো, পাড়াটায় আমাদের পরিবারের খ্যাতিও আছে; তাই থানার লোকেরাও খ্যাতির না করে পারে না। কিন্তু আদায় করতেও জানতে হয়। কারণ, এ তো বাইবে নয়—'

কালীকিংকরবাবু মিষ্টভাষী। সত্যই মধ্য-কলকাতার মধ্য-শ্রেণীদের মধ্যে তাঁহাদের মর্যাদা আছে। ইহাও অমিত দেখিয়াছে—তিনি আদায় করিতে জানেন। হয়তো এই গুণ তাঁহার স্বভাবগত, হয়তো বা পরিবারগত। কারণ, সত্যই ভদ্র-পরিবারের শিষ্ট মানুষরূপে অনেক উগ্র বিরোধিতার মধ্যেও তিনি মিষ্টভাষিতা বজায় রাখিতে পারেন। কালীকিংকর বুদ্ধিমান লোক, আর এই বুদ্ধি দুই-এক পুরুষের বিষয়-বুদ্ধিরই বর্তমান রূপ—দুই-এক পুরুষের সেই অনর্জিত বাড়ি-ভাড়ার ও পরিশ্রম-বিমুখ জীবন-যাত্রার ছাপ যেমন আছে তাঁহার পরিচ্ছন্ন পোশাকে, তাঁহার মাজা-ঘষা কালো রঙে, সুন্দর নাকে, চোখে, পাট-করা চুলে, অনুগ্র কথাবার্তায়। আদায় করিতে তাঁহারা জানিতেন; আদায় তিনিও করিতে জানেন। তিনিও তাহা করিতে পারিবেন—কংগ্রেসের মধ্য হইতে আদায় করিতে পারিবেন—'স্বদেশীর' মধ্য হইতেও আদায় করিতে পারিবেন। এই তো এখানে দশ-জনকে বলিয়া কহিয়া নিজের জন্য প্রতিনিধির পদ আদায় করিলেন। আবার ইহার পরে বাড়িভাড়া, কোম্পানির কাগজ, 'স্বদেশী' ও কংগ্রেসী পাণ্ডাগিরি, সব মিলাইয়া মুক্ত রাজবন্দী কালীকিংকর সরকার আদায় করিতে পারিবেন—কী? আরও কী করিবেন? কর্পোরেশনের কাউনসিলরি, অ্যাসেম্‌ব্লির সদস্য-পদ। হয়তো বা সেই সোপানে সোপানে

উঠিয়া যাইবেন আরও উর্ধ্বে, আরও উর্ধ্বে। কিন্তু আদায় করিতে তিনি পারিবেন—আদায় করিতে তাঁহারা জানেন। 'আদায় করিতে জানা চাই'—সংসারে ইহাই আসল কথা।

এ যে জেলখানা, কি বলেন?—বলিলেন কালীকিঙ্করবাবু।

তাতে সন্দেহ কি?—অমিত বলিল।

একটু সন্তুষ্ট হইয়া কালীকিঙ্করবাবু ঘুরিয়া ঠিক প্রসঙ্গে আসিলেন, 'তা হলে চুকে যাক এ বেড়ালের ব্যাপারটা—'ক্যাট মার্ডার কেস।'—হাসিলেন এইবার কালীকিঙ্কর বাবু।—আর বলতে কি মশায়, নুইসেনস্ এই বেড়ালগুলো। কুকুর হলে কথা ছিল—ভাল কুকুর চমৎকার। কিন্তু বেড়ালগুলো যত ব্যারাম-পীড়া নিয়ে আসে। তা ছাড়া, বড় জমাদার বললে, 'বেড়াল গবর্ণমেন্ট পালে গুদামের জন্য। কিন্তু কয়েদীদের বেড়াল পালা নিষেধ। পাললে তাদের সাজা হয়। জান্‌লে বড় সাহেব রঘুটাকেই শাস্তি দেবে,'—'ছোবড়ায়' পাঠিয়ে দেবে আর কি? 'তা হবে কেন'? বলেন কি হবে না? ব্যাপারটা কম নয়। কয়েদিরা ওই বেড়ালের গলায় বিড়ি, তামাকপাতা, চিঠি, মায় নোট পর্যন্ত বেঁধে রাত্তিরে পাঠিয়ে দেয় এক ওয়ার্ড থেকে আর-এক ওয়ার্ডে। জেলখানার 'ক্যারিয়র পায়রা পিজিয়ন' আর কি। আরও অনেক কাণ্ড মশায়, এটা বি-ক্লাস জেল তো। কাজেই ওই বেড়াল নিয়ে হৈ-চৈ করে আমাদের লাভ নেই। বরং বড় জমাদারের অ্যাপোলজি আর এই রিকোয়েস্ট রাখি, হাতে থাকবে সেই পাকা বদমায়েশটা। তা হলে কত কাজ হবে। গুড্ ট্যাক্‌টিক্‌স্, কি বলেন? ঠিক না।

তাই তো মনে হয়।

অন্যদেরও তাহাই মনে হইল। কারণ, অনেকেই ততক্ষণ তাস ও পাশা খেলিতে খেলিতে কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিল। ভালো করিয়া ভাবিতেও পারে নাই।

বিকেলের দিকে মিহিরবাবু অমিতকে বলিলেন, রঘুটা কাঁদছে ছেনীটার জন্য। তাই তো!—অমিতের মনে পড়িল,—রঘু সেই দ্বিপ্রহরের পর হইতে পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইয়াছে। অমিতের চা ও খাবার দিয়াছে, কাজ সবই করিয়াছে; কিন্তু অমিতের সামনে আর বেশি আসে নাই।.. ব্যাটার কষ্ট হইয়াছে। ছেনীটাকে ভালোবাসিত রঘু। আর সত্যই ছেনীটা দেখিতে বেশ ছিল। অমিত কোনো দিন বেড়াল ভালোবাসে না। তাহার কেমন একটা বিরাগও আছে এ সব নোংরা-ঘাঁটা জীবের উপর। কিন্তু রঘু ছেনীটাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিত, সযত্নে খাওয়াইত-পরাইত। দেখিতে ভালোই লাগিত—বিশেষত যখন আদর করিয়া রঘুর পা ঘেঁষিয়া নিজের গাত্রমার্জনা করিত ছেনী।

সন্ধ্যার একটু আগে অমিত কি কাজে রঘুকে খুঁজিতে গিয়া পায় না। আবিষ্কার করিল ব্যারাকের কোণে চটের আড়ালে একা রঘু বসিয়া আছে। দেয়ালে ঠেস দিয়া হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া।

এখানে যে রে?—

যাই, বাবু!—এ কি, গলাটা এখনো ধরা-ধরা রঘুর!

সে কি রে, কাঁদছিলি না কি?

না, বাবু।—চোখটা মুছিয়া ফেলিয়া বরাবরের মত লজ্জায় হাসিল রঘু। তারপর তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল কাজে।

এক মিনিটের জন্য অমিতের সেদিন অদ্ভুত মনে হইয়াছিল পৃথিবীটা। যে রঘু বাড়ীর খোঁজ রাখে না, স্ত্রীর বিষয়ে যার কৌতূহল নাই, স্ত্রী আজ যুবতী না বালিকা ইহাও সম্ভবত পুলকিত চিত্তে ভাবে নাই যে জীবনে;—ভাবে না বাপ-মায়ের কথা, ভাইদের কথা—নিস্পৃহ, অনুত্তেজিত সেই রঘু গোপনে গোপনে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে জেলে-পালিত একটা বেড়ালছানার জন্য! মানুষের জন্য যে কাঁদে নাই, কাঁদিবে না—চোরের জীবনকে মানিয়া লইয়া যে মানিয়াই লইয়াছে মানুষের সমাজে সে অবান্তর, হয়তো বা বিড়ম্বনা,—সেও কি তবে সেই মানুষের প্রাণ, মানুষের পিপাসাকে এমনি করিয়াই বুকে বহিয়া বেড়ায়—এই অদ্ভুত মানবমমতা? হয়তো জানেও না তাহার স্বরূপ?...না, জানে তাহা কী?

রাত্রিতেও নাকি রঘু কাঁদিয়াছিল অনেকক্ষণ—তাহার সঙ্গীরা বলিয়াছে। পরদিন আবার নিয়মিত গতিতে নিয়মিত হাসো সে অমিতের কাজ করিতে লাগিয়া গিয়াছে। চা আনিয়াছে, সোরাই ভরিয়াছে, ঘর পরিচ্ছন্ন করিয়াছে—কোথা দিয়া দিন চলিয়া গিয়াছে। আবার অমিত দিন-দুই পরে যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছে: এবার বাইরে গিয়ে কি করবি রঘু?

রঘু আগেকার মত আস্তে আস্তে জানাইয়াছে: কি আর করব বাবু। ওই করব!

'ওই'টা কি? চুরি? অ্যাঁ?

হাঁ, বাবু।

কোথায়?

রঘু তাহার প্ল্যান জানায়: শিবপুরে যেখানে তাহার দাদা-বউদিদি থাকে, সে বাড়িতে তাহাদেরই দেশের তাহার মাসি-মায়ের ভাইও থাকে। সে রূপার কাজ করে। সম্পর্কে কিন্তু খুবই আত্মীয় তাহাদের। বলরামের ঘরে বেশি কিছু নাই। কিন্তু দোকানটায় বেশ কিছু পাওয়া যাইতে পারে। প্রায় তিন-চার শত টাকা।

খানিকক্ষণ শুনিয়া অমিত বলিল, কিন্তু সে না তোর আত্মীয়।

হাঁ।

তার বাড়ীতে চুরি করবি?

হাস্যনতমুখে রঘু বলে, চোরের-অ সে সব-অ কিছি নাই, বাবু।

আর-একবার কেমন নতুন লাগিল পৃথিবীটা। চোরের আত্মীয়-অনাত্মীয় নাই। তাই অমিতের কোনো বন্ধুর ঠিকানা এ অঞ্চলের কাহাকেও দিতে রঘু নিষেধ করিয়াছে—চোরের কিছুই বিশ্বাস নাই। এমন এখানে ঘটিয়াছে, এই সেইদিনও ঘটিয়াছে। মুক্তি পাইয়া কেমন করিয়া কোন বাবুদের বাড়ি হইতে ধাপ্পা দিয়া টাকা লইয়া আসিয়াছে—'বাবুর ভয়ানক দরকার, টাকার জন্য আমাকে পাঠালেন।' দরকার পড়িলে চোরেরা সবকিছু করিতে পারে; করে। সেখানে তাহাদের আত্মীয়-অনাত্মীয় নাই, বন্ধুও

নাই; পরম বৈদান্তিক তাহারা। কিন্তু রঘু দশ টাকার দশখানা নোট মারিয়া দিয়া কেন তবে নরেন্দ্র মিত্তির' মত একটা অভিনয়ও করে না? অমিত তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছে।

আপনার-অ টঙ্কা, বাবু! ও হবে না।

ভয়ানক লজ্জা পায় রঘু এই সব কথা বলিলে। অমিত পরে শুনিয়াছে—রঘু সেবার মিথ্যা প্ল্যান দেয় নাই। প্ল্যানমতই চুরি করিয়াছে এবং ধরাও পড়িয়াছে। আবার জেলে আসিয়াছে;—কিন্তু অমিত তখন এখানে নাই।

এক মাস পরে অমিতের হঠাৎ অনত্র যাইবার নির্দেশ আসিয়াছিল। আবার স্থানচ্যুতি। কোথায়? সম্ভবত 'তরাই'র পাহাড়ে আর জঙ্গলে। রঘু জিনিস-পত্র গুছাইয়া দিতে লাগিল—মাজিয়া মুছিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া আনিল কাপ, ডিশ, জুতা, ছাতা।

এ কি? এ ডিশ তো আমার নয়, রঘু।

আপনার-অ পেলেট বাবু।

আরে না, না, দেখছিস না এ নতুন ডিশ!

না, এ আপনকার।

রঘুকে বুঝানো যায় না। কাহার সহিত বদল করিয়া কাহার নতুন ডিশ সে অমিতের বলিয়া লইয়া আসিয়াছে:—যা নিয়ে যা; আর খুঁজে নিয়ে আয় গে আমার ডিশ দুখানা।

রঘু ডিশ তুলিয়া লইল। একটু পরে অমিত দেখিল রঘু তখনো দাঁড়াইয়া আছে।—কি রে, গেলি না?

রঘু ধীরে ধীরে বলিল,—ও ব্যারাক থেকে এনেছিলাম বাবু, এ নতুন ডিশ। আপনি যাচ্ছেন, নিয়ে নিন।

অবাক হইয়া অমিত তাকাইয়া রহিল এক মুহূর্ত। তারপর হাসিয়া ফেলিল, বলিল, ব্যাটা বজ্জাত। ডিশ চুরি করেছিস আমার জন্য। যা, যা, নিয়ে আয় গে আমার ডিশ। আবার চুরি করগে আমার সেই পুরনো ডিশ—যা।

মনে মনে হাসিতে লাগিল অমিত। কিছুতেই চুরির অভ্যাস নষ্ট করিবে না। চোর-অকে বিশ্বাস নাই, সত্যই।

রঘুর তখনো দুই মাস জেল বাকি ছিল, অমিত চলিয়া গেল! রঘু অন্য দশ-জনের কাজ তখন করিয়াছে। মিহিরবাবু ছিলেন, অন্যেরাও ছিল। তার পর হঠাৎ একদিন কেমন করিয়া—কোনো কিছু নাই, রঘুর তল্লাসী হইল। রঘু তখন জমাদারের হাতে ধরা পড়িয়া গেল, বাবুদের দুইখানা দশটাকার নোট সমেত। কালীকিঙ্করবাবু তখনো প্রতিনিধি। কিন্তু রঘুকে তখন উদ্ধার না করাটাই তিনি গুড্ ট্যাকটিকস্ বলিয়া স্থির করিলেন। কারণ এমনিতে রঘুর নিকট হইতে বন্দীদের কাহার নাম বাহির হয়, কে জানে? বাহির হইলে সেই বন্দীর পক্ষে শাস্তিলাভও সুনিশ্চিত। তাই সেই যে নোটসুদ্ধ ধরা পড়িয়া রঘু তখনি 'চুয়াল্লিশ ডিগ্রি'তে বন্ধ হইল, সেই সূত্রে তাহার অর্জিত 'রেমিট' খোয়াইল, জমাদার-সিপাহীর মারে মারে

অজ্ঞান হইয়া রহিল,—ডাণ্ডা-বেড়ি তাহার পায়ে পড়িল, স্ট্যাণ্ডিং হ্যাণ্ডকাপ হাতে উঠিল—তাহার পর চলিয়া গেল ঘানি-ঘরে, ছোবড়ায়; কিন্তু তাহার মুখ হইতে কোনো দিন কাহারও নাম বাহির হইল না!...তার পরে রঘু জেলে আবার আসিয়াছে, কিন্তু তিন বৎসর পর্যন্ত তাহাকে আর জমাদার কিছুতেই স্বদেশী খাতার কাজ করিতে দেয় নাই। রঘু তখন ঘানি টানিয়াছে, দড়ি পাকাইয়াছে, কারখানায় খাটিয়াছে—কখনো বিড়ি পাইয়াছে, কখনো পায় নাই—সে জানে 'ইহাই নিয়ম' : চোরের জীবন এইরূপই।

মাস চার পরে যখন আবার অমিত এক সপ্তাহের জন্য এখানে আসিয়াছে, নির্বাসনে পারঘাট হিসাবে এখানে অপেক্ষা করিয়াছে, রঘু তখন স্বদেশী 'খাতায়' নাই। দ্বিপ্রহরে ঐ 'খাতার' হাওদার কাজে রাজমিস্ত্রিদের বিলাতী মাটি ও চুনা পৌঁছাইয়া দিতে কিছু কয়েদি আসিয়াছিল, অমিত তাহা জানিত না। আবদুল্লা 'মেট' হঠাৎ ডাকিল,—বাবু।

অমিত চাহিয়া দেখিল—আবদুল্লা, সঙ্গে—রঘু না? মাথায় ও মুখে চোখে চুনা ও বিলাতী মাটির গুঁড়া; সেই জন্যই চেনা শক্ত। না হইলে সেই শ্রীহীন মুখের উপর হাস্যকর নাক! রঘুকে চিনিতে কোনো কষ্ট নাই।

দুমিনিটের জন্য ফাঁকি দিয়া রঘু অমিতের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। পাহারার সিপাহী গল্প করিতেছে। বাঙালী সিপাহী তত হারামী নয়,—অমিতকে আবদুল্লা জানাইল।

অমিত খুশী হইল। রঘুকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল—কি করিয়া নোটশুদ্ধ সে সেবার ধরা পড়িয়াছিল। রঘু বলিতে পারে না। কেষ্ট পাহারার তাহার উপর রাগ ছিল। সবটাতেই সকলের তামাক-পাতায় নিজের বখরা না পাইলে কেষ্ট অমন করিয়া কয়েদিদের ধরাইয়া দিত। উলটা—'ফালতুদের' ও কয়েদিদের বলিত, বাবুদেরই এই কাজ।---না, সে কিছুতেই হয় না; বাবুরা একাজ করিবে না; তাহা আবদুল্লাও জানে।

বিড়ি খা---রঘুকে গুঁজিয়া বিড়ি দিল অমিত। সলজ্জ কৃতজ্ঞ হস্ত এবার রঘু গুটাইয়া রাখিতে পারিল না, বাড়াইয়া দিল। অনেক তৃষ্ণায় এইটুকু লজ্জাবর্জন এখন সম্ভব হইয়াছে।

অমিত বলিল, নে, এখানেই ধরা একটা। সিপাহী ভয়েও আসবে না আমার এখানে।

কিন্তু না, অতটা হয় না। কিছুতেই তাহা হইবে না। আবদুল্লা মেট বলিল : ও কোণে চল তবে, চটের আড়ালে।

দুইজনে ব্যারাকের কোণে আশ্রয় লইল। চটের আড়ালে যে তীব্র গন্ধটা খানিক পরে উঠিল তাহা শুধু বিড়ির নয়, চরসেরও। আবদুল্লা মেটও রঘুকে ওই রসে ওস্তাদ না মানিয়া পারে না। অমিতের আবার হাসি পাইল।

তাহার পর দীর্ঘ দিন চলিয়া গিয়াছে। কোথা দিয়া বৎসর গেল। বৎসরের পর বৎসর কাটিল। সাতদিন পূর্বে যখন জামা খুলিয়া আবার অমিত এখানে সবে বসিয়াছে---দীর্ঘ পথের ঘাম ও ধূলায় তখনো দেহ ঢাকা,---চাহিয়া দেখিল হোলডু

অলের স্ট্র্যাপ খুলিতে লাগিয়া গিয়াছে আবার রঘু।---সেই রঘু, সেই 'সাত খাতা'---এত বৎসরেও কিছুই পরিবর্তন হয় নাই ইহাদের। দড়ির মত পাকানো শরীর আরও পাকিয়াছে---ঘানি-ঘরে আর ছোবড়ায়। সেই বাঁক-ধরা কোমর আরও একটু বাঁকিয়া আসিতেছে। আর সেই লাফাইয়া-উঠা নাসিকাগ্র তেমনি হাস্যকর উৎসাহে লাফাইয়া উঠিয়াছে---সেই রঘু! আর আসিতেছে তেমনি চা, তেমনি টোস্ট, তেমনি নিয়মিত পানীয়, আহার্য। আছে রঘুর তেমনি কুন্ঠিত, সলজ্জ স্বল্পভাষিতা, আর অনুচ্চ-প্রচারিত ভালোবাসা অমিতের জন্য।

রঘুও অমিতকে ভালোবাসে নাকি? অমিত সকৌতুকে ভাবে। ব্রজেন্দ্র রায়, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় নয় শুধু, রঘুচোরও ভালোবাসে অমিতকে। তাই বলিয়া অমিতকে জানে না কি রঘু? বোঝে সে অমিতকে? সহস্র সহস্র আলোকবর্ষের ব্যবধান যাহাদের জগতের---অমিতের আর রঘুর।---তবু বুঝি তাহারা বুঝিতে পারে দু'জনকে।

অমিত ভাবে,---সত্য সত্য এতই কি বড় এই ব্যবধান?

হঠাৎ চায়ের আঘ্রাণ টোস্টের স্বাদে যেন অমিতের মনের তীব্রতা একটা কোমল জিজ্ঞাসায় পরিণতি হইল---এতই কি বড় এ ব্যবধান? রঘুকে তো অমিত অত দূরের মানুষ বলিয়া অনুভব করে নাই। ইহার অপেক্ষা অনেক, অনেক দূরের মনে হইয়াছে তাহার দিবা-রাত্রির প্রতিবেশী অনেক 'স্বদেশী' বন্ধুকে। কিন্তু রঘুকে তো তত দূর মনে হয় না।---মনে হইবার পথ রাখে নাই রঘুই। সে অমিতের দেহকে চিনিয়াছে, অসহায় মুহূর্তে আপনার হাতে তুলিয়া লইয়াছে উহাকে। সে অমিতের মনকে লইয়া নাড়া-চাড়া করে নাই;---খেলিতে পারে নাই, আঘাতও দিতে পারে নাই, দোলা দিতে শিখে নাই। হয়তো সে মনকে স্পর্শ করিবারও আকাঙ্ক্ষা রাখে নাই। নিস্পৃহ, নিশ্চেষ্ট, সলজ্জ আত্মগোপনশীল এই রঘু ওড়িয়া! তবু---আজ অমিত বুঝিতেছে---অমিতের মনের মধ্যে সে-রঘু একটি স্থান করিয়া লইয়াছে---যে স্থান মানুষের। মানুষের মধ্যেকার দেবতার নয়, মানুষের মধ্যেকার দানবেরও নয়, শুধুই মানুষের। চোরের, নেশাখোরের, দাগী কয়েদীর; তবু মানুষের। এই মানুষকেই অমিত দেখিয়াছে---দেবতাকে নয়, দানবকে নয়,---মানুষকে। এই তো তাহার নবাবিষ্কার---এই বন্দিশালার বিশ্ববিদ্যালয়ে।...এই মানুষকে দেখিয়া দেখিয়া কি শেষ করিতে পারা যায় অমিত? রঘুও তো একটা অশেষ রহস্য একটা আশ্চর্য কৌতুক---এই চিড়-খাওয়া পৃথিবীর বিকলাঙ্গ এক রহস্যময় কৌতুক।

তিন

কৌতুকে পাইয়া বসিতেছে অমিতকে। সে ডাকিল,---রঘু!

রঘু সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অমিত স্মিতহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, বল তো জেল থেকে ছাড়া পেলে তুই কি করতিস?

প্রশ্ন পুরাতন, রঘু তাহা জানে। তাই একটু সলজ্জ মুখে পুরাতন উত্তরই দিল,---অবশ্য বার বার অমিত পীড়াপীড়ি করিবার পর,---নেশা করিব, চুরি করিব।

অমিত আর-একটু জমিয়া বসিল। বলিল, বেশ। কিন্তু জানিস এবার গবর্নমেন্ট আমাদের ছেড়ে দিচ্ছে। তা হলে জেল থেকে বেরিয়ে কি করব আমি, বল ? বলছিস না যে কিছু।---আমিও 'নেশা করিব, চুরি করিব ?'

রঘু লজ্জায় মরিয়া গেল। অমিত বলিল, কেন, আপত্তি কি ?

অনেক প্রশ্নের পর রঘু জানাইল ঃ আপুনি 'স্বদেশী বাবু'।

তাতে কি ?

রঘু বলিতে জানে না। গুছাইয়া বলিতে পারে না। প্রশ্ন করিয়া অমিত জানিল ঃ গান্ধীজীর মন্ত্রী হইছেন, আপুনিরা বড় লোক। ভারী চাকুরী হইবেক। মোটা মাহিয়ানা পাইবেন, ভালো থাকিবেন।

এত বৎসর 'স্বদেশী' বাবুদের নিকট-সাহচর্যে রঘু ইহাই বুঝিয়াছে---জানিয়াছে এইরূপ সুখ-সুবিধাই তাহাদের লক্ষ্য। অমিতের মুখের হাসি মিলাইয়া যাইতেছে। কিন্তু মিলাইয়া গেলে চলিবে না---রঘু তাহাতে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে। তাহার অপরাধ কি ? সে শুনিয়াছে গান্ধীজীর লোকেরা মন্ত্রী হইতেছেন ; বাবুরা বাহির হইয়া গেলে মেম্বর হন, কর্পোরেশনে চাকরি পান, আরও অনেক পুরস্কারই তাহাদের লাভ হয়।...বড় মানুষ, বড় চাকরি, বড় মাহিয়ানা---অমিতের প্রসন্ন হাস্যের মধ্যে যেন বক্রহাস্যের রেখা দেখা দিল। রঘুকে সে বলিল ঃ তার মানে 'স্বদেশীর' নেশা, 'স্বদেশীর' চুরি,---এই করাই ঠিক তা-ই না ?

রঘু কথাটা বুঝিতে পারে না—কী কথার কী অর্থ করিতেছে অমিত। বলে,—না, না বাবু।

আবার অমিত তাহাকে লইয়া পড়ে ঃ না' নয় তো তবে কী ?

অনেকক্ষণ পরে রঘু বলে, আপুনি লেখাপড়া করিবান, ভালো করিবান।

'লেখাপড়া করিবে' 'ভালো করিবে'—দুইই সে করিতে চায়। কিন্তু দুইটা কেন, একটাও কি সে করিতে পারে ? অমিতের ভাবনা সরাইয়া অমিতের কৌতূহল আবার জাগিয়া উঠে।—'ভালো করিব'। কার ভালো করব রে ? চোরের ? না, নিজের ? না, কার ?

রঘু আবার বিপন্ন বোধ করে। শেষে অনেক ভাবিয়া বলে—মনুষ্যরঅ।

'মনুষ্যরঅ'—একবার চমকিয়া উঠে অমিত আপনার মনে।...মানুষের ভালো করিবে তুমি, অমিত ? মানুষের তুমি ভালো করিবে ; মানুষকে সত্য কি ভালোবাসো তুমি, অমিত ? কিন্তু কোন্ মানুষকে ? বড় মানুষকে, না, গরিব মানুষকে ? শিক্ষিত তোমার স্বজনকে, না শিক্ষাবঞ্চিত তোমার অগণিত সহোদরদের ?...

অমিত হাত দিয়া চোখের সম্মুখ হইতে কী যেন সরাইয়া দিল। রঘুকে বলিল, "মানুষের ভালো করব। কিন্তু তাতে তোর কী হবে ? চোরের সুবিধা হবে? তুই আর চুরি করবি না ?

রঘু হাসিয়া ফেলিল—কথাটাকে সে আমোলই দিবে না। অমিতবাবুর স্বভাবই এই রকম হাসি-তামাসা করা। অমিত ছাড়ে না, শেষে রঘু আবার বলিল, চোর-অ আছি, চুরি করিব।

'চোর-অ-আছি—চুরি করিব।'...অনেকক্ষণ শুনিয়াছিল সেবার অমিতদের কথা তেজা সিং। পশ্চিম ইউ-পি'র দুর্ধর্ষ মানুষ সে। ডাকাতদের সর্দার অথচ অমিতদের নিকট সে ভদ্র, অমায়িক প্রকৃতি। জেলের কয়েদিরাও কয়েদি তেজা সিংকে সেলাম দেয়—অনমনীয় মানুষ সে। পাঁচ বৎসর আগে অমিতের মুখে অনেকক্ষণ সে শুনিয়াছিল অমিতদের পরিকল্পিত কাহিনী, ভাবীকালের স্বাধীন দেশের জীবন-যাত্রার কথা।

'চুরি ডাকাতি আর কেন থাকবে তেজা সিং?' ইহা শুনিয়া একটু বিস্ময়ের সহিত হাসিয়া একবার প্রশ্নমাত্র করিয়াছিল তেজা সিং,—'কেয়া বাবু ডাকাতি ছোড়নে কা চীজ হ্যায়?'

আরও এক বৎসর পরেঃ ভালো রাঁধিত বাঙালী কয়েদি নিধিরাম। বসিয়া বসিয়া গল্প করিত। বাদার গল্প, লাটের গল্প, সুন্দরবনের কথা। অনেকক্ষণ সে অমিতদের পরিকল্পিত সমাজের কথা শুনিল—যেখানে মানুষ কাজ করিবে, খাইবে, পরিবে—অভাবের জ্বালায় মানুষ অমানুষ হইয়া পড়িবে না। তারপর সবিনয়ে নিধিরাম তাহার কথা জানাইল,—চুরি উঠে যাবে, বাবু? সে কি হয়; সে হয় না। তবে আপনারা রাজা হলে আমাদের চোরদের বড় কষ্ট হবে।

রঘু বলিল, 'চোর-অ আছি চুরি করিব।' সেই পুরাতন কথা—'Why Hal, 'tis my vocation, Hal, 'tis no sin for a thief to labour in his vocation'.

অমিতেরও পুরাতন উত্তর মনে পড়িল। সহাস্যে অমিত সেবার রঘু ও গফুরকে বলিয়াছিলঃ চুরি করবি?—ভেবেছিস তোদের জেলে দোব আমরা? তা নয়। জেলগুলোতে বাড়ি তৈরি করাব। বাড়ি থেকে বৌ, ছেলে, মা বাপ এনে রাখব তোদের কাছে এখানে। তোরা বেরুতে পারবি না, তাঁরা ইচ্ছেমত বেরুবেন, কাজকর্ম করবেন আর তোদের পাহারা দেবেন।

শুনিয়া বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল গফুর ও রঘু। সে যে ভয়ানক বিপদ হইবে গফুরের। অবশ্য এবার তাহার জেলের নাম গফুর। কিন্তু মুঙ্গের হইতে গয়াপ্রসাদ দোসাদের স্ত্রী লখিয়া যদি আসিয়া হাজির হয়! সহজ মেয়ে নয় সেই লখিয়া দোসাদনী। কিংবা হাওড়া হইতে গঙ্গারামের স্ত্রী মনসুখিয়া যদি আসিয়া বসে এই জেলের মধ্যে—গফুর তো তাহারই আদমি! সশব্দে ডাণ্ডাবেড়ি বাজাইয়া এখানে চলা-ফেরা করে গফুর—দৃক্‌পাত নাই জেলের শাসনে; সব সহিতে পারে যেমন রঘু উড়িয়া। কিন্তু অমিতের এমন অদ্ভুত প্রস্তাবে সেই গফুরের মন মুষড়িয়া যায়। সে কি লজ্জা, সে কি অপমান! চোরের স্ত্রী, চোরের ছেলে, চোরের মেয়ে,—বড় শরম তাহাদের, চোরের মা-বাপেরও। তাহাদের নিকট হইতে দূরে না থাকিলে

গফুরের রক্ষা আছে? রঘুরই কি পথ আছে? সর্বাপেক্ষা কঠিন দণ্ড তো হইবে ইহাই। পুত্র-পরিবারের সেই বন্ধন যে বড় বিষম বন্ধন। তাহাতে যে অসম্ভব হইয়া উঠিতে চাহিত রঘুর পক্ষে চুরি ও নেশা, গফুরের পক্ষে তালাতোড়ি ও রাহাজানি!

গফুর হাসিতে চেষ্টা করিয়াছিল, বলিয়াছিল, আপনার সব অদ্ভুত কথা বাবু, বাড়ির মানুষকে জেলে আনবেন।—কিন্তু গফুরের চোখে রীতিমত ভয়।

অমিত রঘুকে আজও বলিল : মনে আছে তো কি শাস্তি দোব আমরা চোরদের?

রঘু মুখ নিচু করিয়া হাসে। এখন আর সে বিশ্বাস করে না—ইহা সম্ভব।

অমিত বলিল : ওই চুয়াল্লিশ ডিগ্রিতে—এক-এক ঘরে, এক-এক জন, আর তার পরিবার।...

কিন্তু এই চুয়াল্লিশ ডিগ্রিতেই ছিলেন অরবিন্দ—এখানেই তিনি দেখেন নারায়ণ। ...এই চুয়াল্লিশ ডিগ্রিতে অমিতরাও ছিল, কিছুই দেখে নাই। আবার রঘুরা সেখানে দেখিয়াছে রাত্রিতে 'স্বদেশী ভূত'—যাহাদের ফাঁসি হইয়াছে, সে ডিগ্রির কোণের কুঠুরিতে যাহারা থাকিত।...মাথা ঢাকা, গলায় শাদা মালা, শাদা ধবধবে পোশাক পরা সেই স্বদেশী বাবুরা পদচারণা করেন এই প্রাচীরের উপর, এই অতি সংকীর্ণ প্রাঙ্গণে। সাহেব ওয়ার্ডাররাও তাঁহাদের দেখিয়াছে। ভয়ে সেই কোনটায় প্রহরীরাও রাত্রিতে যাইতে চাহে না।—কে পথরোধ করিবে অমন মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষের?... পথরোধ করিবে কে এই জীবন্ত 'স্বদেশীদের'? পরিবার পরিজন? না, না। অমিত জানে—তাহাদের পথরোধ করিবে, বড় মানুষ, বড় চাকরি, বড় মাহিয়ানা। ওসব ছেড়ে মানুষের ভালো করবে কিরূপে তুমি, অমিত?

সংবাদপত্র আসিয়া গেল, রঘু পলাইতে পারিয়া বাঁচিল। অমিত তাড়াতাড়ি কাগজ খুলিয়া বসিল...মাদরিদ এখনো স্পেনের প্রজাতন্ত্রীরা রক্ষা করিতেছে। 'ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড' 'মানুষের ভালো' করিতেছে কি তাহারা? ধর্মপ্রাণ ক্যাথোলিক চার্চ, স্পেনের অভিজাত সামন্ত-গোষ্ঠী, বর্মকণ্ঠ দর্পিত সেনাপতি-চক্র কি তাহা মানিবে? মানিবে কি হিটলার মুসোলিনি? কিংবা ব্রিটেনের অভিজাত ক্লাইভডেন-সেট্? ফ্রান্সের 'দুই শত পরিবার'?...মানুষের ভালো কিরূপে তবে করিবে তুমি, অমিত? রক্তের সঙ্গে রক্ত ঢালিয়া এ যুগের যৌবন 'ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড'-এ কি ভালো করিবার পথের ইঙ্গিত স্পেনে লিখিতেছে?...'দি ইন্টারন্যাশনাল ইউনাইটস্ দি হিউম্যান রেস্' বলিয়াছিল সুনীল দত্ত... সত্য কি তাহা? না, সুনীলের উন্মাদনা? পতঙ্গের অগ্নিতে আত্মাহুতির মোহ? অথবা অমিতের বিচারবুদ্ধির প্রতি সুনীলের ধিক্কার? থাক সুনীল, থাক স্পেন। অমিত ভারতবর্ষের সংবাদই পড়িবে প্রথম। সে ভারতবর্ষের মানুষ, হাঁ, সে ভারতবর্ষের মানুষ। কখনো সে অস্বীকার করিতে পারিবে না—তাহার কৈশোরের মন্ত্র : "আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।" কিন্তু স্বীকার করিবে না কি অমিত তাহার জীবনের শিক্ষা— ধনী ভারতবাসী, শোষক ভারতবাসী,...'বড় চাকরি, বড় মাহিয়ানার' ভারতবাসী তাহার ভাই নয়, কেহ নয়। 'ইণ্ডিয়ান ফার্স্ট?' না 'দি ওয়ার্কারস্ হ্যাভ নো কানট্রি!' না,

'সবার উপরে মানুষ সত্য?'...থাক সেই অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব। কর্মক্ষেত্রেই উহার মীমাংসা হইবে।—অমিত হাত দিয়া বিছানো সংবাদপত্র আবার মুছিয়া লইল,—যেন মুছিয়া ফেলিল মনের আভ্যন্তরীণ অসমাপ্ত দ্বন্দ্ব, আপনার স্মৃতিও। মনে মনে বলিল, দেখি দেশের খবর। কি বলেন ফজলুল হক, কিংবা নাজিমুদ্দীন? বন্দীশালার ফটক কবে খুলিবেন তাঁরা?...কবে কখন খুলিবে তোমার জন্য এই জেলের ফটক, অমিত? কবে কখন?...সেই 'প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশা'।

অমিত আবার সচকিত হয়; নিজেকে শাসন করা প্রয়োজন।—ইতিহাসের ছাত্র তুমি, অমিত। ইতিহাসের রক্তাক্ত পদচিহ্ন আজ মাদরিদের পথে আর আকাশে মানুষের ভাগ্যলিপি আঁকিতেছে। মানুষের ভবিষ্যৎ আজ আর একবার জীবন ও মৃত্যুর অনিবার্য সংঘর্ষের মধ্যে গিয়া পড়িতেছে। সেই সুগম্ভীর মহিমাকে স্থির দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করা চাই। তবু কি না দেখিয়া পারিবে না তোমার নিজের ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র সম্ভাবনার কথা, ক্ষুদ্র আশা আর ক্ষুদ্র স্বপ্নের কথা? এই ফটক-খোলা পথে তোমার শিকল-ছেঁড়া ক্ষুদ্র পা দুইখানি কবে আবার স্বাধীন সহর্ষ পদ-বিক্ষেপে বাহির হইতেছে—তোমার গৃহের পথে, তোমার বন্ধুর সান্নিধ্যে, বান্ধবীর আনন্দ-কণ্টকিত সম্ভাষণের আশায়...

অমিত, এ কি। ইতিহাসের এই ঝটিকা-স্বনন ছাপাইয়া ব্যক্তি-হৃদয়ের ক্ষুদ্র আশার বাঁশিটি কেবলই যে বাজিয়া উঠিতে চায়। .

উল্লাস-কলরব ভিতরের আঙিনায় ফাটিয়া পড়িতেছে। সংবাদপত্রের পাতা হইতে অমিত মুখ তুলিল,—যে অক্ষর পড়িয়াও সে পড়িতেছিল না, সে অক্ষরগুলি হইতে একবারের মত চক্ষু তুলিল...সম্মুখে বাহিরের প্রাঙ্গণের সেই রৌদ্র-ঝলমল পুকুরের জল, আর কানে সেই ভিতরের আঙিনায় উল্লসিত কলকণ্ঠ!

অমিতবাবু। ..

একটা ঢেউ যেন ভাঙিয়া পড়িল অমিতের মাথার উপর—যেমন করিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছিল পুরীতে সমুদ্রস্নানকালে সমুদ্রের উদ্দাম তরঙ্গটি। সে তরঙ্গাভিষেক—স্বপ্নে কল্পনায়—অনেক পূর্ব হইতে প্রত্যাশিত ছিল। তবু সমস্ত প্রত্যাশাকে মিথ্যা করিয়া—এবং সত্য করিয়া,—সমুদ্রের সেই প্রথম আলিঙ্গন অমিতকে ছাইয়া দিয়াছে...তরঙ্গাকুলিতা ইন্দ্রাণী তখন নতুন করিয়া আবার শিথিল বেশভূষা সংবৃত করিয়া লইতেছে... অদ্ভুত, অদ্ভুত এই ভাঙিয়া পড়া তরঙ্গের তলে অমিতের একটি মুহূর্তের অভিজ্ঞতা। পূর্বেকার সমস্ত প্রত্যাশা এক মুহূর্তে সত্য হইয়া উঠিয়াছে, আর পূর্বেকার কল্পনা সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যাও হইয়া গিয়াছে। অদ্ভুত এই দেহময় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অনুরণন, সমগ্র চেতনার অনুরঞ্জন!...আর অদ্ভুত উদ্বেলিত সমুদ্রের শিয়রে আনন্দোচ্ছ্বসিতা ইন্দ্রাণীর উচ্ছল কণ্ঠ: 'অমিত!...' তেমনি এই নতুন তরঙ্গাভিষেক:

অমিতের মুক্তির আদেশ আসিয়াছে। তাহারই সম্বর্ধনায় বন্ধুকণ্ঠের এই আনন্দোচ্ছ্বাস। দূর দূরান্তরের কত কণ্ঠের আহ্বান তাহার মধ্য দিয়া বাজিতেছে।

শব্দের তরঙ্গস্নানে অমিতের সমস্ত দেহ অনুরণিত, কণ্টকিত। মুহূর্ত পরে তাহার চেতনা বজ্রালোকিত—মনে পড়ে সুনীল দত্ত! কোথায় তুমি...

এই বিদ্যুৎতীক্ষ্ণ প্রশ্নও মনে ঝলকিয়া উঠিতেছে। অকম্পিতকণ্ঠে স্মিতহাস্যে অমিত বলিতে চাহিল,——আর কার?

অনেকগুলি কণ্ঠ জানাইল, নীহার মিত্রের।

আপনাকে স্থির করিতে অমিত কহিল, এবার ঘুমুতে বলুন নীহারবাবুকে।

ইংরেজ ওয়ার্ডার সকৌতুক হাস্যে খাতা অমিতের সম্মুখে ধরিল। স্থির দৃষ্টিতে অমিত নির্দেশ পড়িয়া গেল,—বেলা দশটায় মালপত্র লইয়া জেলের ফটকে তাহাকে উপস্থিত হইতে হইবে। বাঁধা-ধরা আদেশ। কিন্তু উহার অর্থ কি? বেলা দশটা? বরিশাল এক্সপ্রেসে কোথাও যাইতে হইবে কি অন্তরীণ হইয়া? না কলিকাতায় যাইতে হইবে স্বগৃহে? ইংরেজ ওয়ার্ডারও আজ গোপন সংবাদ আপনা হইতেই জানাইয়া দিতে দ্বিধা করিল না;—দুইজনই তাহারা স্বগৃহে যাইতেছে, অমিত কলিকাতায়, নীহার মিত্র খুলনায়।

বাড়ি, বাড়ি, বাড়ি,...সমুদ্রের ঢেউ নাচিয়া উঠিতেছে অমিতকে ঘিরিয়া।

ইংরেজ ওয়ার্ডার বলিল, সই করে দাও।—তারপর হাসিয়া বলিল, আমাকে কি দিচ্ছ প্রেজেণ্ট।

অমিত স্বাক্ষর করিয়া দিল। হাতের দামী কলের পেনসিলটা দিয়া বলিল, যদি নাও। সাহেব গ্রহণ করিয়া জানাইয়া গেল, গুড মর্নিং। গেটে আবার দেখা হবে।

এই সাহেব ওয়ার্ডারদের সঙ্গে এত বৎসর কথায় কথায় কলহ গিয়াছে—পারিলে অমিতদের উহারা জব্দ করিয়াছে, কারণ অমিতেরা সাহেবদিগকে নিষ্ঠুর-ভাবে মারিতেছে। আর পারিলে অমিতরা করিয়াছে ইহাদের অপমান; কারণ, ইহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উদ্ধত সিপাহী। আজ অমিতের মনে হইল,—ইহার সহিত কোনো কলহ নাই। এমন করিয়া যে বন্ধুভাবে হাসিয়া তাহাকে সম্ভাষণ করিতে পারে তাহাকে তাহারা কি করিয়া শত্রু মনে করিত?

জন কয় অমিতকে ঘিরিয়া বসিল। 'এখানে এবার সাত দিন রইলেন, না? আট দিন?' 'সবাইকে এবার ছাড়বে, কি বলেন?' 'কাউকে আর ছাড়তে দেরি করবে না।' 'বাড়িতেই যাবেন, মনে হয়?' প্রত্যেকটি প্রশ্ন, কল্পনা, জল্পনা, সানন্দ-সম্ভাষণের সঙ্গে প্রত্যেকেরই মনের একটি প্রত্যাশা পরিষ্কার—আমারও এই শুভদিন আসিতেছে কি? কেন আসিতেছে না? কি বলে সংবাদপত্রে? কি বলেন ফজলুল হক? কিছু নাই।—মুক্তির কথা কিছু নাই সংবাদপত্রে?

সম্মুখের কাগজখানাকে টানিয়া লইয়া অমিত নিজে পড়িতে বসিয়া গেল।

স্টেট্‌সম্যান আর পড়তে হবে না, বাঁচবেন।—কে একজন জানাইল।

সত্য বটে, এবার স্বাধীনভাবে অমিত সংবাদপত্র পড়িতে পারিবে। এতদিন দেশীয় পত্র-পত্রিকা তাহাদের নিকট নিষিদ্ধ ছিল। বাধ্য হইয়াই তাহারা বিদেশীয় সাময়িকপত্র বেশি পড়িয়াছে। সেই সূত্রে এইখানে এই কয় বৎসরে বিদেশীয় সাময়িকপত্রগুলি দেশ-বিদেশের জীবন ও রাজনীতির সহিত নাড়ীতে নাড়ীতে অমিতের যোগসাধন করিয়া দিয়াছে, এবং অমিতের মত সংবাদপত্রবঞ্চিত ও সংবাদ-জিজ্ঞাসু তাহার বন্ধুদের

বুঝিতে হইয়াছে—আজ কোনো দেশ, কোনো জাতি বিচ্ছিন্ন নাই। ইতিহাস সকলকে জড়াইয়া ফেলিতেছে।

একটু স্পেনের সংবাদটা পড়ে নিতাম।—জানাইল অমিত।

স্পেন আর দেখতে হবে না, অমিতদা। ফ্রাঙ্কো এসে গিয়েছে।—একটু পরিহাস, একটু উল্লাস মিশাইয়া বলিল অনাথ।

অমিত হাসিল। বালক অনাথ! তাহার উপায় নাই। আপনাকে বাঁচাইবার নামেই সে আপনাকে ছাঁটিয়া রাখিবে;—বই পড়িবে না, ঘরে রাখিবে হিটলারের ছবি। অনাথের জন্য মায়া হয়, দুঃখ হয়...ইহাদের জন্য অমিতের স্নেহ ভালোবাসা বুক ছাপাইয়া পড়ে। মানিত কি তাহা, সুনীল?...অমিতের আকাশ আবার চিড় খাইল।

সংবাদপত্র পড়া হইল না। রাজবন্দী-মেসের ম্যানেজার আসিয়া বলিলেন, মাছটা এসে যায় কি না দেখি, নইলে ডিমের ওম্‌লেট করে দিই।

খেয়ে যেতে হবে?

অমিতকে না খাওয়াইয়া তিনি জেলখানা হইতে যাইতে দিবেন না। সকাল বেলা দশটার আগে হয়তো জেলের বাজার আসিয়া পৌঁছিবে না। তবু তিনি কি একটা ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না, এতই অকর্মণ্য তিনি? অবশ্য অমিতবাবু বাড়িতে যাইবেন। হয়তো বাড়িতে আহারও তৈরি থাকিবে, ভালোই খাইবেন—বাড়ির রান্না। কিন্তু জেলের বন্ধুরা তাহাকে এই 'আইবুড়ো ভাত' না খাওয়াইয়া এখান হইতে বিদায় দেয় কি করিয়া? এইটা তাহাদের একটা নিয়ম।

একঘেয়েমির পচ-ধরা পলেস্তারা ছাড়াইয়া এই মুহূর্তে যেন সকলের অন্তর্নিহিত সৌহার্দ্য ও সদিচ্ছা আবার প্রকাশিত হইতেছে। অতি-আকাঙ্ক্ষিত এই মুক্তির মধ্যেও বিদায়-বিচ্ছেদের একটি বেদনামাধুর্য জমিতে চাহিতেছে।

জ্যোতির্ময় বলিল।—উঠে পড়ুন অমিতদা, গুছিয়ে দিই জিনিসপত্র। আগে স্নান করবেন? বেশ! সেরে আসুন।

অমিত উঠিয়া দাঁড়াইল। স্নান করিবার জন্য সাবান-তোয়ালে লইয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল। একে একে এবার অনেকে চলিয়া যাইতেছে। অমিত অবকাশ পাইতেছে—অবকাশ পাইবে এবার, ভাবিবার, বুঝিবার।...

রঘু কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

শুনেছিস নাকি, রঘু? চললাম।

সহাস্যে রঘু জানাইল—শুনিয়াছে। তারপর: ধোবাকে বলে আসিছি—কাপড় নিয়ে আসিবো।

বেশ, তবে আর কি? স্নান করে আসি। জিনিসপত্র তারপর গুছিয়ে দিবি।

স্নানঘরের সম্মুখে সহাস্যমুখে লক্ষ্মীবাবু বলিলেন, কি দাদা, ফাঁকি দিলে?

সাধারণত এ জাতীয় পরিহাসেই লক্ষ্মীবাবুর পরিচয়। তাঁহার ঘুম অনেকক্ষণ ভাঙিয়া গিয়াছে। ঘুম ভাঙিলেও নাকের ডাক থামে না, লক্ষ্মীবাবুর এইরূপ

একটা খ্যাতি আছে। এ বিষয় লইয়া রীতিমত ডাক্তার ডাকিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়। কিন্তু সেই নাকের ডাক এখন থামিয়া গিয়াছে। যথানিয়মে দুই টিপ নস্য লইয়া বৃহৎ দেহকে টানিয়া তুলিয়া হস্ত-মুখ প্রক্ষালনে যান লক্ষ্মীধর ঘোষ। চা তিনি খান না, এ কালের এ সব পানীয় অপেক্ষা তিনি পেস্তা-বাদামের সরবতের পক্ষপাতী। দৈনন্দিন ক্রিয়াগুলি স্বভাবতই একটু সময়সাপেক্ষ। সময়ের তাড়া গৃহেও তাঁহার ছিল না, এখানে আবার কি? পৈতৃক গৃহে মোটামটি স্বচ্ছল অবস্থায় দিন যায়। বৃদ্ধা অবস্থাপন্ন বিধবা পিসীমার নিকট লক্ষ্মী এখনো বালক। পিসীমার ধারণা হয়তো একেবারে মিথ্যা নয়। যুবক ভ্রাতুষ্পুত্র ভাগীনিয়দের নিকট 'ছোটকাকা', 'ছোটমামা' একটি জীবন্ত মহারথী,—মহাভারতের পাতা হইতে নামিয়া কোনরূপে এই হরিণাভির ভদ্রাসনে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। হয়তো, ভীষ্ম-দ্রোণ না হোক, ভীম-ঘটোৎকচ বলিয়া গ্রামের অন্যেরাও মানিবে। আর পাড়া-প্রতিবেশীর নিকট 'লক্ষ্মীদা' সত্যই একটা জাগ্রত প্রতিষ্ঠান। ব্যায়ামের আখড়া জমিয়া উঠে তাঁহার বিশাল কৃষ্ণদেহের আবির্ভাবে। হাঁক-ডাকে ছেলেরা চারিদিকে ঘিরিয়া বসে গল্প শুনিতে, দুষ্টুমি করিতে। গ্রামের যত বখাটে ছেলের নেশা ও বদখেয়ালও লক্ষ্মীদার নামে পলাইয়া যায়। যাইবে না? দুই হাতে দুই মণ লোহার মুগুর লইয়া লক্ষ্মীধর ঘোষ দৈনিক এক ঘণ্টা উহা ভাঁজেন। বৈঠক এখন আর বেশি দিতে পারেন না, মেদ-মজ্জা-পেশীর বাহুল্যে উপবেশন ও সঞ্চরণ লক্ষ্মীবাবুর নিকট আর সহজসাধ্য নাই। কুস্তি করিতে চাহেন, মাঝে মাঝে দুই-একটি পশ্চিমা সাক্‌রেদ পাইলে সে বাসনা চরিতার্থ হয়। না হইলে ওপাড়ার সরকারদের দরওয়ান চৌবে ও পাঁড়েজীর জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু সিদ্ধিখোর বলিয়া লক্ষ্মীবাবু উহাদের বেশি সমাদর করেন না। আর বাঘের থাবার মত তাঁহার হাতের থাবা ঘাড়ে পড়িলে পাঁড়ে-চৌবের পক্ষেও তাহা সুখকর হয় না। তাঁহার দুঃখ, গ্রামের যুবকেরা কেহ তাঁহার আখড়ায় তাঁহার মত হইল না। একটু মাথা তুলিতে না তুলিতেই ছেলেগুলি কলিকাতায় ছোটে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করিবার জন্য। আর তার পর দুই দিন যাইতেই দেখা যায়—সন্ধ্যায় গ্রামে ফিরিয়া আসে শুধু তাসের আড্ডা আছে বলিয়া। কোথা দিয়া ইতিমধ্যে বিবাহ করে, ছেলেমেয়ের বাপ হয়, মাথায় টাক পড়ে তবু গ্রামের থিয়েটার পার্টিতে গোঁফ কামাইয়া মেয়ের পার্ট করিতে ছাড়ে না। দেখিয়া-শুনিয়া লক্ষ্মীধর ঘোষ হতাশ হইয়া যান। আনন্দপ্রিয় উৎসাহপ্রিয় লক্ষ্মীধরকে সেই যুবকেরাও এড়াইয়া চলে, ভয় পায়, অথচ ভরসাও রাখে তাহার উপর। পুলিশেই বলে, লক্ষ্মীবাবুকে প্রথম বার ধরিতে গেলে নাকি তিনটা ভোজপুরী পেটে ঘুষি খাইয়া অচেতন হইয়াছিল; ডুলাণ্ডা হাউসের হাতকড়ি নাকি মট করিয়া তাঁহার হাতে ভাঙিয়া গিয়াছিল, আর এই সে-বৎসর নাকি তাঁহার হাতের বোমার অদ্ভুত শক্তিতেই ফোর্ট উইলিয়ামের একটা তোপখানা উড়িয়া গেল। এসব "ঐতিহাসিক সত্য" হাস্যমুখর লক্ষ্মীবাবুকে দেখিলেই অন্যেরাও বলিবে। এই সব শুনিয়া—লক্ষ্মীদার সযত্ন-ছাঁটা ঘন গুম্ফের ফাঁকে একটা

আপত্তির হাসি ফুটিয়া উঠিত। 'দ্যাখো তো ভাই, ধরে আনবে না পুলিশ ব্যাটারা এসব শুনেও? এ সব গাঁজাখুরি কথাই গাঁজাখোর ব্যাটারা বিশ্বাস করে বসেছে। 'নইলে আমি সত্যই নির্দোষ।'

অমিত বলিত: কিন্তু এ তো আর মিথ্যা নয়;—ভীম যখন শালগাছটা উপড়িয়ে ছুঁড়ে মারলেন, তখন আপনিই বা...

তোমরা হনুমানরা ভাই, যা খুশি করো, আমাকে কেন? এই ইজম্-ফিজমের দিনে আমাকে আর কেন টানো।

কথাটার মধ্যে লক্ষ্মীবাবুর একটু বিষাদও থাকে, অভিযোগও থাকে। এককালে ব্যায়ামের সূত্রেই তিনি জিম্‌নাস্টিক ও স্বদেশীর গুরুমন্ত্র লাভ করেন। দেশোদ্ধারের সেই মন্ত্র তিনি অখণ্ডভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতে ইংরেজী লেখা-পড়া বর্জন করিতে তাঁহার বেগ পাইতে হয় নাই। দুই পুরুষ 'বড়বাবুর' বংশে লক্ষ্মীধরের জন্ম। পিতা তাই আপত্তি করিয়াছিলেন—অফিসে সাহেবের কথা বুঝিতে হইবে তো? লক্ষ্মীকেই কিন্তু পিসীমা 'ষাট ষাট' বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন,—লক্ষ্মী বাঁচিয়া থাকাই তাঁহার যথেষ্ট পুণ্য। অফিসে নাই-বা গেল। তারপর, পুণ্যভূমি হইতে যবন-বিতাড়নের স্বপ্নে যথানিয়মে বঙ্কিমের নভেল পর্যন্ত বয়কট করিয়া লক্ষ্মীধর আশ্রয় করেন কালীপ্রসন্ন সিংহের বঙ্গানুবাদ মহাভারত (ওজন দরে 'বসুমতী'র কৃপায় যাহার বিতরণ আরম্ভ হয়); আর বানান করিয়া প্রথাগতভাবে তিনি পাঠ করিতেন 'শ্রীমদভগবদ্‌গীতা'। ইহাই গুরুর নির্দেশ—একবার কারাবাসের পরে যিনি হিমালয়ে স্বাধীনতার জন্য তপস্যা করিতেছেন। আজও লক্ষ্মীধর ঘোষের উহাই পাঠ্য, উহার বেশি অন্য কিছু নয়। কেবল এবটের রচিত বঙ্গানুবাদিত নেপোলিয়নের জীবনচরিত আসিয়া ইহার সহিত পরে যোগ হইয়াছে। দ্বিপ্রহরে এখনো না ঘুমাইয়া চেয়ারে বসিয়া মহাভারতের বিপুল একটি খণ্ড লইয়া তিনি বসেন, কিংবা গ্রহণ করেন নেপোলিয়নের জীবনচরিত। উহারই উপর চোখ বুজিয়া আসে, প্রাঙ্গণে অপরাহ্ণের ছায়া নামে,—প্রথম যৌবনের স্বপ্নগুলি প্রভাতের কুয়াশার মত এই আবেষ্টনীতে এখন যেন কেমন আর ঠাঁই পায় না। সেদিনকার গুরুভক্তি আজও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, লক্ষ্মীধর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া দিতে পারেন গুরুর বাক্যে। 'মহাভারতের অপেক্ষা বড় সত্য হইবে নাকি ইংরেজের আমলের কোন ইতিহাস বা আবিষ্কার!' গুরুমন্ত্রে বিশ্বাসী লক্ষ্মীধর এখনো তর্ক করিবেন। কিন্তু এ যুগের 'স্বদেশীরা' এখন মহাভারত ছাড়িয়া, পুণ্যভূমির সমস্ত ধর্ম, নীতি, আচার-আচরণকে পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় বিজাতীয় কোন 'ইজম'ও গ্রহণ করিতেছে। এই সাধনা-বিচ্যুতি সহ্য করিতে পারেন না লক্ষ্মীধর ঘোষ। গুরুকে অনেক দিন চোখে দেখেন নাই—আহা, আর কি সেই মূর্তি চক্ষে দেখিবেন লক্ষ্মীধর? কোথায় হিমালয়ের কোন গুহায় তিনি স্বাধীনতার জন্য তপস্যা করিতেছেন! এই কথা স্মরণ করিতেও চোখ ছলছল করিয়া উঠে লক্ষ্মীধরের। —পিসীমায়ের লক্ষ্মীধর বালকই হয়তো।

কিন্তু গুরুভাইদের ও শিষ্যদের মত-পরিবর্তনের সংবাদগুলিও এতই গুরুতর যে, তাহা উড়াইয়া দিবার মত সাহস আর লক্ষ্মীধর ঘোষের নাই—তিনি মনের মধ্যে একটা অসহায়তা বোধ করেন। তাই, তাঁহার পরিহাসেও আজকাল একটু বিষাদ, একটু অভিযোগ থাকেঃ 'আমাকে আর কেন, ভাই, এই ইজমের দিনে? আমার মহাভারতখানাই থাক। এবারকার মত বিদায় দিক গবর্নমেন্ট।'

'ইজমের' সাইক্লোন আসিয়াছে—লক্ষ্মীধর এই কথাটা ভালো করিয়া বুঝিয়াছেন। খাদ্যাখাদ্য-বিচার নাই, আচার নিয়মের কোনো বাঁধন নাই, সিগারেট-বিড়িতে কোনো মান্য-গণ্য নাই, জেলখানার চারিদিকে লাল-পিঙ্গল কেতাব, কাগজের ঝড়। দুই পাতা লাল কেতাব পড়িয়াই সকলে মাতাল। যাহারা লক্ষ্মীধরের স্বপক্ষে, তাহারাও প্রাচীন আচার-বিচারে উৎসাহী নয়। কেতাব তাহারা কেহ বড় ছোঁয় না, কেহ বা ছোঁয় তাহা তর্কের দ্বারা টুকরা-টুকরা করিবার জন্য। কিন্তু লক্ষ্মীধর দেখেন তাহাদেরও মুখে বিজাতীয় বুলি, বিদেশীয় নজির।—কেন, মহাভারতের 'অনুশাসন পর্ব' পড়িলে কি ইহারা জানিত না এই পলিটিক্সের মূলতত্ত্ব? কেহ 'মহাভারত' ছোঁয় না, ছুঁইলেও কেহ শ্রদ্ধা করিয়া যেন আর ছুঁইতে জানে না।... এই তো অমিতবাবু। তিনি কোনো দলের নন; যথেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়াছেন, রহস্যপ্রিয়ও। সংস্কৃত বাঙলা মিলাইয়া তিনি মহাভারত পড়িয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে বসিয়া মহাভারত পড়িবার মত সময় লক্ষ্মীধরের হয় নাই। হইবে কি করিয়া? দুপুর বেলাটা অমিতবাবু পলিটিক্স লিখিতে না বসিলে কোন ভারী ইংরেজি বই পড়িবেন। আলোচনা করিবেন সমাজবিজ্ঞান। সকাল বেলাটায়? লক্ষ্মীধর তখনো হাতমুখ ধুইয়া তৈয়ারী হইতে পারেন না। সেই সব দৈহিক নিত্য-নৈমিত্তিক তো অন্যদের মত অপরিচ্ছন্ন ভাবে মিটাইয়া দিলেই হয় না। উহা সময়সাপেক্ষ। তৎপর লক্ষ্মীধর বাবুর নিত্যকার ব্যায়াম সারিতে হয়। উহার পর একটু হাওয়া খাওয়া, এক গ্লাস পেস্তা-বাদামের সরবত পান, বিশ্রাম, আর বেশ করিয়া তৈলমর্দন করিয়া স্নান—কোনোটাই তো যেমন তেমন করিয়া সারিবার জিনিস নয়। ইহাতেই তো বেলা বারোটা বাজিয়া একটা হইয়া যায়। তাহার পর একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে আহার। এই অপরিচ্ছন্ন ঘরদুয়ারে লক্ষ্মীধরের অন্যদের মত দশ-জনের থালা-বাসনের নিকটে বসিয়াও আহার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এই কারণেই স্বতন্ত্র রন্ধনের ব্যবস্থাও নিজের জন্য তিনি করিয়াছেন। তারপর খাইতে খাইতে তাঁহার দুইটা বাজে। তাহা হইলে লক্ষ্মীধরবাবু দিনের বেলা পড়িবার সময় পাইবেন কখন? সন্ধ্যায়ও তাঁহার এমনি দুর্দশা। স্নান করিতে হয়, স্থির চিত্তে বিশ্রাম করিতে হয়, না হইলে রাত্রিতে ঘুম হইবে না;—ব্লাড্‌প্রেসারটি বেশি—ঘুমই হয় না। সত্য কথা, লক্ষ্মীধরবাবুর ঘুম হয় না। অবশ্য তথাপি নাক ডাকে। লক্ষ্মীধরবাবুর নাক যদি ডাকে নিজের নিয়মেই ডাকে—ঘুমের ঘোরে ডাকে না,—এই কথা ব্লাড-প্রেসারের রোগী লক্ষ্মীধর হলপ করিয়াই বলিতে পারেন। অন্য সকলে নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলে না, নাক তাঁহার ডাকে, এ কথা

তিনি মানেন। কিন্তু সকলে যাহা বোঝে না—না বুঝিয়া ডাক্তারের কাছে তাঁহার কেস্ খারাপ করিয়া দেয়—তাহা এই যে, ঘুম ছাড়াও নাক ডাকিতে পারে, অন্তত লক্ষ্মীধরের ডাকে। রাত্রে তাই লক্ষ্মীধরবাবুর পড়া নিষেধ, ডাক্তারেরই তাহা মত। অমিতও হয়তো এই সময়ে বিলাতী কাগজ ও দেশী নভেল পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়ে। লক্ষ্মীধর ভাবিয়া পান না কিসে অমিতের নিদ্রাকর্ষণ হয়,—নভেলে কি? হয়তো তাই। অবশ্য লক্ষ্মীধর দেখিবার সুযোগ পান না—দশটার আগেই তাঁহাকে আলো নিভাইয়া শুইতে হয়। আর অমিতকে তিনি যত দিন দেখিয়াছেন, তখনো তাহার আলো জ্বলিতেছে—জেলেও, অন্যত্রও। লক্ষ্মীধরের পক্ষে অমিতের সঙ্গে বসিয়া তাই মহাভারত পাঠের সময় হয় নাই। হয়তো পড়া সম্ভবও হইতো না। এইতো সেই মহাভারত লইয়া তর্ক উঠিতেই অমিত বলিয়া বসিল : 'চরিত্রহীন' পড়েছেন লক্ষ্মীবাবু?

লক্ষ্মীধর বইটার নাম শুনিয়া বিরক্ত হইলেও জানিতেন না, সে কি বই। শুনিলেন শরৎচন্দ্রের লেখা নভেল। নভেল লক্ষ্মীধর জীবনে পড়েন না। তাই অমিতের পরিহাস বুঝিলেন না। কিন্তু এমন কি অন্যায় বলিয়াছে সেই সুরবালা মেয়েটি যে বলিল—অর্জুন যদি ধরিত্রী বিদীর্ণ করিয়া গঙ্গা না আনিলেন তাহা হইলে শরশয্যায় ভীষ্ম জল পাইলেন কোথায়? না, কৌতুকটা লক্ষ্মীধরবাবু ভালো করিয়া বুঝিতে চাহেন না। না হয় একটু রূপক-ছলে সেকালের মহামুনি ঘুরাইয়া বলিয়াছেন। কিন্তু একালে যদি টিউবওয়েল বসাইয়া পাতালগঙ্গার জল টানিয়া তুলিতে পার, তাহা হইলে অর্জুনের শরটা তোমাদের এই টিউবওয়েলের তুলনায় এমনি কি উপেক্ষণীয় হাস্যকর অস্ত্র হইল? উহা অস্ত্র, আর ইহা যন্ত্র এই বলিয়া? অস্ত্র অপেক্ষা ইহাদের মনে যন্ত্রটা এমনি করিয়া আজ বড় হইয়া পড়িতেছে। ইহার পরে বড় হইবে যন্ত্রদাস শূদ্ররা, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু লক্ষ্মীধরবাবু জানেন—পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় এখনো মরে নাই; সেই কথাই হিটলার, মুসোলিনিও আবার প্রমাণ করিতেছে। অবশ্য সত্যকার তেজ ব্রহ্মতেজ। আর সত্যকার ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রতেজের আকর এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ। পরিহাসচ্ছলে হইলেও লক্ষ্মীধর তাহা শুনাইলেন। তবু মনে মনে সংশয় আসিত—অমিতের কথা নিতান্ত পরিহাস নয়। ইহার পরেই অমিতের মুখে লক্ষ্মীধর একদিন শুনিলেন,—যুধিষ্ঠির পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মিথ্যাবাদী। পরিহাসচ্ছলে অমিত বুঝাইতে চাহিল,—সাধারণ মানুষ মিথ্যা বলে অনেক সময়ে বিনা স্বার্থে; তাহা 'নিষ্কাম মিথ্যা'। তাই স্বার্থের দায়ে তাহারা কোন সময়ে মিথ্যা বলিলেও লোকে সেই কথা বিশ্বাস করিতে চাহে না। কিন্তু ধর্মরাজের কথা স্বতন্ত্র। বাজে কথা যুধিষ্ঠিরের মুখে নাই। সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া সত্যবাদী বলিয়া নিজের এমন একটি খ্যাতি ধীরে ধীরে তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন যে, প্রয়োজন যখন আসিল তখন মিথ্যাটি ছাড়িলেন—'অশ্বত্থামা হতঃ—ইতি গজঃ'। সত্যটুকুর ভাঁওতা তখনো সঙ্গে ছিল 'ইতি গজঃ'—হুলের মত পিছনে সুগুপ্ত। অমোঘ তাঁহার মিথ্যা। একটি মিথ্যায় তিনি গুরুবধ সমাধা

করিতে পারিলেন, রাজ্যলাভ করিলেন, আবার সত্যবাদিতার নিণ্ঠাটুকুও অটুট রাখিলেন। পৃথিবীতে মিথ্যাবাদিতার আর্টের শ্রেণ্ঠ আর্টিস্ট হইলেন যুধিষ্ঠির।

লক্ষ্মীধর সেদিন আর পারিলেন না। গোল বাঘের মত মুখের মাংসপেশী যেন থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, দেহ ঝড়ের পূর্বেকার সমুদ্রের মত স্তব্ধ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল।

—আপনাদের এই ইজম-ফিজম ওসব মহাপুরুষদের নিয়ে না করলে কি ক্ষতি হয়? আরো কত তো আছে। পাদ্রীরা শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে পরিহাস করে, মা-কালীকে যা-তা বলে—এ তো নতুন কিছু নয়।

এতটা উষ্মার জন্য অমিত প্রস্তুত ছিল না। যথাসম্ভব হাসিয়া কথাটা মানিয়া লইতে চাহিয়াছে: একালের মহাপুরুষদের নিয়ে পরিহাস করলে যে খুনোখুনি হবে, লক্ষ্মীধরবাবু। হিটলার-মুসোলিনীকে কিছু বললে এঁরা, আর লেনিন-স্ট্যালিনকে বললে ওঁরা আমার মুণ্ডপাত করবেন। পুরনো মহাপুরুষদের নিয়ে বলা একটু নিরাপদ—তাঁদের চেলা-চামুণ্ডা একালে আর বেশি নেই।

লক্ষ্মীধর নিজের ক্রোধ সম্বরণ করিবার অবসর পাইলেন। হাজার হোক, অমিত লোকটা বিদ্বান্, তা ছাড়া কোন দলের মধ্যে সে ঢুকিয়া পড়ে নাই—'ইজম্' পড়িলেও 'ইজম্' করে না। লক্ষ্মীধর হাসিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, গুড্, অমিত-বাবু, গুড্! সস্নেহে অমিতের স্কন্ধে বৃহৎ থাবার প্রীতিময় মুণ্ট্যাঘাত প্রদান করিয়া কহিলেন, 'পুরনো মহাপুরুষদের পিণ্ডি চটকিয়েই এবার আমরা পণ্ডিতি ফলাব।

মেঘ কাটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে অমিতবাবুর সঙ্গে লক্ষ্মীধর ঘোষের আর এই পুরানো ইতিহাস লইয়া আলোচনার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। চির-দিনের মত কৌতুক চলিয়াছে—সেই নব-জলধরকান্ত দেহ লইয়া, সেই অনিদ্রাহীন নাসিকার উচ্চ গর্জনের ইতিহাস লইয়া, সেই তোপখানা ওড়ানো বোমার মাহাত্ম্য লইয়া। দুইজনার মধ্যে দূরত্ব অবশ্য রহিয়াছে, তবু সেই সঙ্গে রহিয়াছে কৌতুক-হাস্যের সৌহার্দ্যও।

স্বচ্ছন্দে তাই লক্ষ্মীধর আজ বলিলেন: কি, দাদা, ফাঁকি দিলে?

তা নয় দিলাম, কিন্তু কাকে দিলাম, বলুন তো?

...কাহাকে ফাঁকি দিয়াছে অমিত? তাহার পাউণ্ড অব্ ফ্লেশ আদায় করিয়া লয় নাই সাম্রাজ্যের সঙ্গীনধারীরা? তাহার সাঁঝ-সকালের বেদনার স্বাদ পায় নাই তাহার ছয় বৎসরের সতীর্থরা?...ফাঁকি দিয়াছে অমিত হয়তো নিজেকে। এই ভীড়ের মধ্যে সকলেই তাহার বন্ধু, সকলেই তাহার প্রিয়—কিন্তু সে খুঁজিয়া পায় নাই নিভৃতি, পায় নাই প্রশান্তি—আত্মার স্বাচ্ছন্দ্য। কাহাকে ফাঁকি দিয়াছে অমিত? নিজেকে?...না, সুনীল দত্তকে?

লক্ষ্মীধর একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিলেন: কেন ভায়া, আমাদের—এই বুড়োদের। ওল্ড্ ফুল্সদের 'হেট' করে চলে গেলে, না?

অমিত চমকিয়া উঠিল...এই বুড়োদের,—'বুড়োদের কাজ হাতে তুলে নাও, অমিত',—পিতৃবন্ধু জ্ঞানজ্যেষ্ঠ ব্রজেন্দ্রনাথের সেই পুরাতন অনুনয়ই অমিতের উদ্দেশ্যে এই অভাবনীয় ক্ষেত্র হইতে অপ্রত্যাশিত কণ্ঠে আবার উত্থিত হইতেছে !

অমিত সহাস্যে বলিল : কি যে বলেন লক্ষ্মীবাবু ?—ইন্দ্রেররথ আসছে আপনাদের মত মহারথীদের জন্য। আমরা পদাতিকরা যাব আগে সার বেঁধে দাঁড়াতে—আপনারা আসবেন।

লক্ষ্মীধর হাসিলেন, বলিলেন, যাক সেজে নাও। আই-বি-র রথ এসে গিয়েছে হয়তো। দশটায় যেতে হবে ? বাড়িতে খবর দিয়েছে বোধ হয় ?

স্নানের জল মাথায় ঢালিতে লাগিল অমিত।

কাহাকে ফাঁকি দিয়াছ, অমিত ? কাহাকে ফাঁকি দিয়াছ ?...বারে বারে চমকিয়া উঠিয়াছে এই কথা কত দিন তাহার মনে,—'ফাঁকি দিয়াছ, অমিত, ফাঁকি দিতেছ, নিজেকে ফাঁকি দিতেছ।' তাহার নিঃসঙ্গ সত্তার চারিদিকে মরু-প্রান্তরের গভীর শূন্যতা ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার স্ফটিক-স্বচ্ছ রস-চেতনা রহিয়াছে যুগান্তরের উপবাসী। তখনি আবার অমিত সেই বোধকে দূরে সরাইয়া দিয়াছে,—এ পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-গান কোন কিছুকেই তুমি অগ্রাহ্য করিতে চাহ না, অমিত ; কিছুতেই তোমার পরিসমাপ্তি নাই, অমিত।—জীবন-রসের রসিক তুমি, মানুষের-মুক্তি-স্বপ্নে উন্মাদ তুমি। তবে আজ এই মুক্তি-মুহূর্তে মানিবে না কেন বন্দীজীবনের এই বৎসরগুলি তোমার হাতে তুলিয়া দিয়াছে কত বিচিত্র জীবনের স্পর্শ,—কত রূপ, কত শব্দ, কত সম্ভাবনা আর আবর্জনা, আশার বঞ্চনা আর পিপাসার পীড়ন, আদর্শের ভগ্নাবশেষ আর আত্মার নবজন্ম।

...কত মূর্তি, কত মানুষ ভিড় করিয়া আসে। জন্ম-মৃত্যুর এই দোদুল দোলায় দুলিয়া ভাসিয়া—অমিত এইখানেই মানুষকে প্রথম চিনিয়াছে, বুঝিয়াছে সেই পরম বিস্ময়কে। আপনাকে অনেকের ভালোবাসার সঙ্গে পরিচিত করিয়া তুলিতে শিখিয়াছে।

মমতায় কৌতুকে আবার অমিতের মনে ছাইয়া গেল—মহাভারত-আশ্রয়ী লক্ষ্মীধর আজ বাহু বাড়াইয়াও তাদের যুগকে ছুঁইতে পারিতেছে না। বিরোধিতা অপেক্ষাও লক্ষ্মীধরের মনে বেদনা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ...একটি সকরুণ প্রীতি লক্ষ্মীধরের ওই সুদূর সৌহার্দ্যের মধ্যেও জমিয়া আছে অমিতের জন্য, জমিয়া আছে 'স্বদেশীর' একটি অতীতপ্রায় যুগের অভিযোগ—'ফাঁকি দিয়াছ'। একদিনের আদর্শ ছাড়াইয়া অন্যদিনের সত্যের দিকে আগাইয়া যাইতেছে জীবন। তাই লক্ষ্মীধর, সুনীল ফাঁকি পড়িয়া যায়।

নিজেকে ফাঁকি দিয়াছে কি অমিত ? অমিত মানুষের বিশ্বরূপ দেখিয়াছে,...আর, আরও ভালোবাসিয়াছে মানুষকে। ভালোবাসিয়াছে সেই মানুষদের...যাহারা দিনে দিনে ক্ষয় হইয়াছে, কিন্তু ক্ষুদ্র হয় নাই।...

এই যুগের এই মানুষের পরিচয় দিবে—এই দায়িত্ব হাতে লও তুমি, অমিত। এই মানুষকে তুমি দেখিয়াছ, ভালোবাসিয়াছ...কিন্তু ভালোবাসিয়াছে বলিয়াই তো অমিত

ইহাদের কথা বলিতে পারিবে না। বলিয়া শেষ করিতে পারিবে না বলিয়াই বলিতে পারিবে না। সেই শক্তি তাহার কোথায় যে সে মানুষের এই সত্যকে রূপদান করিবে? সেই স্পর্ধা কই, বলিবে অমিতের হাতেই তাহাদের আত্মা আত্মলাভ করিবে। সেই শিল্পীর নির্বিকারত্ব এই পরম আত্মীয়দের মূর্ত করিবে? রূপ দিতে গিয়া তাহাতে ব্যর্থ হইলে মানুষের অপচ্ছায়া আঁকিয়া লজ্জায় অবমাননায় মাটিতে মিশিয়া যাইবে যে অমিত।...

আত্মজিজ্ঞাসা শেষ হয় না। থাকুক তাহা---অমিতের পরিচয়। সে আপনাকে স্মরণ করাইয়া দেয়---থাক এই প্রশ্ন এখন। ইতিহাসের মহাসত্যকে তুমি জানিতে চাহিয়াছ, অমিত; তাহাই তোমার পরিচয়। মানুষের বিশ্বরূপ দেখিবে অমিত; তাহাতেই তোমার মুক্তি---তোমার নিঃসঙ্গ সত্তার সম্পূর্ণতা। এই মুক্তি, এই সম্পূর্ণতার স্বপ্ন লইয়া তুমি জীবনের মধ্যখানে গিয়া আজ আবার দাঁড়াইবে---ইতিহাসের আকাশ জুড়িয়া যখন বজ্র-বিদ্যুৎ-অগ্নিভরা প্রলয়ের মেঘ সাজিতেছে, পৃথিবীর নাড়ীতে নাড়ীতে যখন নবজন্মের প্রসব-বেদনা।

অন্য দিন আজ, অন্য দিন, অমিত!

চার

অন্য দিন আজ---অন্য দিন।...

অমিত শুধু ইতিহাসের মধ্যেই মিলাইয়া যাইবে না; আজ সংসারের মধ্যেও সে আবার ফিরিয়া যাইবে---মায়া-মমতা-ভরা মানুষের মধ্যেও গিয়া সে দাঁড়াইবে। সে শুধু আর ইতিহাসের ছাত্র নয়, মায়া-মমতা-ভরা মানুষও। তাহার এই পরিচয়ই কি কম সত্য? নিজের এই পরিচয় কি সে এখানে বসিয়া এবার আবিষ্কার করে নাই? পৃথিবীর এই মায়া-মমতা-ভরা প্রত্যেকটি স্পর্শকে অমিত তাহার ললাটে ছোঁয়াইয়া, তাহার কপোলে বুলাইয়া, তাহার বুকে দুলাইয়া লইতে চায়; জীবন-রসের পিপাসা তাহার প্রাণে অশেষ, অনির্বাণ, অতলস্পর্শী।...

অনেক বাধা ডিঙাইয়া মায়ের চিঠি আসিত। আঁকা-বাঁকা, ভুল বানানে ভরা সেই পত্র। উহার স্পর্শে অমিতের মনে হইত কে যেন তাহার শিরশ্চুম্বন করিল। তাহার দিন-রাত্রির সমস্ত কর্মপ্রবাহের মধ্যে সেদিন একটা শিহরণ জাগিয়া যাইত।...বড় দুর্বল, বড় উন্মাদ তুমি, অমিত। বড় দুর্বল, বড় দুর্বল---আর বড় ভাগ্যবান! পিতার চিঠি আসিত; স্থির চিত্তের আর কম্পিত হস্তের স্বল্প সম্ভাষণ। অমিত জানে এই বেদনা-গম্ভীর সম্ভাষণ অনেক অনেক ক্লাসিকস্-গঠিত আত্ম-সমাহিতির সাক্ষ্য। শ্রদ্ধায় নিজের তুচ্ছতায় অমিত অবনত হইয়া পড়িত সেই লিপির সম্মুখে। তেমনি স্থৈর্য ও চিত্ত-ভরা আর-এক মাধুর্য লইয়া বৎসরে দুইবার আসিত অমিতের নিকটে পিতৃবন্ধু ব্রজেন্দ্র রায়ের পত্র;---নববর্ষের শুভেচ্ছা বহন করিয়া আনিত, বিজয়ার আলিঙ্গন জানাইয়া যাইত। সেই স্বল্প, স্বচ্ছ অক্ষরের

মধ্য দিয়া একটা যুগই যে শুধু একালের এই অগ্নি-মেখলা যুগ-সীমানায় আসিয়া দাঁড়াইত তাহা নয়, একটি ব্যক্তি-জীবনের মধুময় স্পন্দনও অমিতের ব্যক্তি-মানসের মধ্যে জাগিয়া উঠিত। প্রথম দিকে সুরো-র চিঠিও আসিয়াছিল। সেন্সরের অনেক কালির পুচ্ছাঘাত বহিয়া, কাঁচির অনেক ব্যবচ্ছেদ সহিয়া মাত্র খান দুই-তিন চিঠি আসিয়াছিল। পরে তাহাও আর আসিতে পারে নাই। অমিত সুরো-র খবরও আর পায় নাই। হয়ত বা অবরুদ্ধ অমিতকে নাগালও পায় নাই আরও কারো কারো কন্ঠস্বর, আরও কোনো কোনো আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবীর করলিপি। শুধু অনু-মনুর কল-কাকলি পার হইয়া আসিয়াছে সেন্সরের কালির প্রাকার, কাঁচির প্রাচীর। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যেন সুস্থ হইয়া বসিয়াছে অমিতের ব্যক্তি-মানস—মমতা আনন্দের সম্পর্ক-জালের মধ্যে আপনাকে সে দেখিতে পাইয়াছে, আপনার কথাই সে শুনিতে পাইয়াছে। পত্র পড়িতে পড়িতে তাহার মন স্বচ্ছ হইয়াছে, তাহার প্রাণ স্বস্তিবোধ করিয়াছে। না, স্বাধীনতার নামে কাহাকেও তো অমিত হারায় নাই, কাহাকেও অস্বীকার করে নাই। এই তো—শুধু দুইটি স্বাক্ষর স্বগৃহের; অমনি স্বচ্ছন্দে যে আপনার গৃহমধ্যে আপনার স্থানটি গ্রহণ করিতেছে, গ্রহণ করিতেছে ভাই-এর বোনের মমতা আর ভালোবাসা। না, কিছুই সে অস্বীকার করে নাই, ফাঁকি দেয় নাই কোথাও নিজেকে। অমিত তো তাহার ভ্রাতা ভগ্নীর দাদা, এ পরিচয়টা কত সত্য। তারপর নিজের সীমাবাঁধা পত্রের ধরাবাঁধা বক্তব্যের মধ্যেও যেন অমিতের মন উত্তর লিখিতে লিখিতে হাসে, কৌতুকে উচ্ছল হইয়াছে, স্বপ্ন ফুটিয়াছে চোখে।...মরুভূমির অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা সহোদরার সম্ভাষণ পাঠাইতেছে পদ্মা-ভাগীরথীর দুকূল-প্লাবী স্রোতকে...দুই তীরে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে বাঙলা দেশের আকাশ, লুটিয়া পড়িতেছে কাশে-ছাওয়া বালুচর আর ঘাসে-ছাওয়া মাঠ, বুড়ো বট আর বিশাল অশ্বত্থ; ছোট ছোট গ্রামের আড়ালে আর আকাশের ছায়ায় বাঙালীর শ্যাম গৃহাঙ্গনে সেখানে আপনার স্নেহময় কোল পাতিয়া রাখিয়াছে বাঙলা দেশ;—আর দিনান্তে ধূম্রমুখী সেই গ্রামলক্ষ্মী আর অশ্রুমুখী গৃহলক্ষ্মী সেখানে সেই শূন্যকোল লইয়া করিতেছে তাহার গৃহহীন, নির্বাসিত সন্তানদের প্রতীক্ষা।

চার বৎসরের সীমানায় এমনি এক পত্রে অমিত জানিল—মা নাই। কিন্তু দুই বৎসরের কাছে আসিয়াই একদিন শুনিয়াছিল ব্রজেন্দ্রবাবুর শোকসংহত কন্ঠ। একটি কথা শুধু সেই পত্রে ছিলঃ "হয়ত জানিয়াছ আমাদের সংসারে কত বড় বজ্রপাত হইয়াছে।" তখনো অমিত কিছুই শোনে নাই; কিন্তু অচিরেই জানিয়াছিল—সবিতা বিধবা হইয়াছে। নবপরিণীতা সবিতাকে ছাড়িয়া তাহার স্বামী ডাক্তার সুখেন্দুভূষণ বিদেশে বিদ্যার্জনে গিয়াছিল, তাহা অমিত জানিয়া আসিয়াছিল। আর কি তবে সুখেন্দুভূষণ ফিরে নাই?...পিতৃগৃহে শেষ দেখা সেই নম্রমুখী, শান্তচিত্ত সবিতা—শীত-সন্ধ্যার বৈকালী আলোতে তেমনি তাহার অনাবৃত সুডৌল বাহুটি লইয়া তেমনি কি অন্তপারের আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল।

এতদিন---মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর? আর তেমনি সে অপেক্ষা করিবে আজীবন, অনন্তকাল, মরণের এপারে আর মরণের ওপারে?...ইহার কল্পনাও অমিতের বুকে বাজিয়াছিল। গৃহসুখের, ভালোবাসার, জীবনানন্দের সমস্ত রস হইতে এমন করিয়া নিজেকে বঞ্চনা করিবার অধিকার আছে---সবিতার?...অধিকার তো নয়, ইহা যে জীবনের দেবতার প্রতিই অবিশ্বাস। অমিত জানে না,—অন্ততে সে মানে না---এই অধিকার।...হয়তো এই ভাগ্য সবিতা এড়াইয়া যাইত যদি অমিত তাহাকে গ্রহণ করিত...ভাবিতে ভাবিতে অমিত ত্রস্ত হইয়া উঠিল---না, না, একি বিকৃত কল্পনা"—শান্ত ভাষায় অমিত বিজয়ার শেষে ব্রজেন্দ্রবাবুকে বেদনাপূর্ণ প্রণাম জানাইয়াছে। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের সম্ভাষণ আর তখন ফিরিয়া আসে নাই। আসিয়াছে অমিতের উদ্দেশে একটি সবিষাদ প্রার্থনা। তারপর অমিতের মাতৃ-বিয়োগের সূত্রে ব্রজেন্দ্র রায়ের সেই বিষাদ-ঘন কন্ঠ অশ্রু-মথিত হইয়া উঠিল। হৃদয়ের সম্বৃত বেদনা গাম্ভীর্যও একবারে এক পশলা বর্ষণে তখন আপনাকে উৎসারিত করিয়া দিল; তাহা কি শুধু ব্রজেন্দ্রনাথের অমিতেরই কথা-সূত্রে? না, চিঠির এই নতুন হস্তাক্ষরের নতুন সূত্রেই তাঁহার হৃদয়-বেদনা এই অবকাশ পাইয়াছে?

ব্রজেন্দ্রনাথ বারাণসীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন,—বিশ্বনাথের সন্ধানে নয়, ভারতবর্ষের সভ্যতার আকর্ষণে। সবিতার হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন-সীমা উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছিল। রোগটা সম্ভবত বেরিবেরি মাত্র, কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের দৃষ্টিশক্তি লইয়াই টান পড়িয়াছে—গ্লোকুমা। তাই তিনি আর নিজ হস্তে অমিতকে পত্র লিখিতে পারিলেন না—এই সময়ে, আজ অমিতের এই পরম শোকের দিনে—"যে শোকে সান্ত্বনা নাই, অমিত। সান্ত্বনায় তোমার প্রয়োজনও নাই জানি। শোক সহিয়াই তুমি উত্তীর্ণ হইবে শোকাতীত স্থৈর্যে, তাহাও বুঝি। বিশ্বদেবতার যে রূপ তুমি ধ্যান করিয়াছ তাহাতে এই বিয়োগ-বেদনায় ব্যাকুল হইবে না, তাঁহার আশীর্বাদ তুমি লাভ করিবে। কিন্তু আমরা বিধাতাকে বড় করিয়া দেখি নাই। তাঁহাকে একান্ত করিয়া চাহিয়াছি। আপনার জনের মধ্যে একান্ত আপনার করিয়া পাইতে গিয়াছি—প্রিয়জনের মধ্যে প্রিয়জন লইয়া। তাই, সান্ত্বনা পাই না আমরা, পাইবেন না তোমার পিতা। তাই বলিব না, অমিত,—আমরা শান্তিলাভ করিয়াছি। কিন্তু জানি, অমিত, তুমি অধীর হইবে না। তোমাদের বিরাট চেতনায় ব্যাকুলতার স্থান নাই।"

মায়ের মৃত্যুতে অমিত ব্যাকুল হয় নাই। কোথা দিয়া কি যেন পরিসমাপ্ত হইল, এই বোধই জাগিতেছিল। আর বিদেশীয় শাসনব্যবস্থার মিথ্যাচারে একটা হৃদয়ভরা ঘৃণার হাসি ফুটিয়াছিল মুখে। মুক্তির একটা নিঃশ্বাসও পড়িয়াছিল বন্ধন-ছিন্ন বুক হইতে: ঘুচিয়া গেল, ঘুচিয়া গেল। তাহার হৃদয়ের দুর্বলতম প্রদেশটিকে যেন ভাগ্যদেবতা উপড়াইয়া ফেলিয়া দিল এইবার। অমিত কতবার তাহার এই অসহায় অন্তরের সঙ্গে যুঝিতে যুঝিতে হারিতে হারিতে বলিয়াছে—'মা বড় জঞ্জাল।

মরেও না।' শেষ হইয়াছে এখন তাহার মায়ের জীবন-সংগ্রাম। সে সংগ্রাম তো মাকে শুধু হৃদয়ের একটি প্রদেশ জুড়িয়াই করিতে হয় নাই, করিতে হইয়াছে হৃদয়ের সমস্ত কেন্দ্রে, প্রান্তে, তন্তুতে তন্তুতে। দেহের প্রতিটি রক্তকণা দিয়া যেমন তাঁহার অমিতকে তাঁহার গড়িতে হইয়াছে, আয়ুক্ষয় করিয়া যেমন অমিতকে মা আয়ু দিয়াছেন, তেমনি অন্তরের প্রতিটি সূক্ষ্ম স্থূল আবেগ আকাঙ্ক্ষা দিয়াও জড়াইয়া ধরিয়াছেন তিনি তাঁহার এই আত্মজকে—অমিত তাঁহার পরিচয়, অমিত তাঁহার অমরত্ব;—আর সেই অমিত তাঁহার অস্বীকৃতি, সেই অমিত স্বতন্ত্রও। অমিত তাঁহার সৃষ্টি—রক্তমাংসের প্রাণপ্রবাহের; তাই অমিত তাঁহার পরিচয়। কিন্তু সে অমিত আবার নূতনকে সৃষ্টি করিবে, প্রাণলীলার নূতন সম্পদ যোগাইবে—দেহ দিয়া, মন দিয়া, প্রাণ দিয়া; তাহাতেই অমিতের পরিচয়। আর তাহারই ফলে অমিত হইবে বিশিষ্ট স্বতন্ত্র, তাহার মায়ের নিকট পর, মায়ের-ও অপরিচিত।

অমিতকে অমিত হইতে নাই—পৃথিবীর আত্মক্ষয়ী মাতৃপ্রাণের ইহাই নিগূঢ়তম কামনা; অমিতকে অমিত হইতেই হইবে, ইহাই আবার সেই পৃথিবীর নবায়মান প্রাণশক্তির প্রবলতম প্রেরণা। আর এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে পড়িয়া সেই মাতৃপ্রাণ অনির্বাণ জ্বালায় জ্বলিয়াছে; সেই দ্বন্দ্বের সীমান্ত ছাড়াইয়াও অমিতের প্রাণ শঙ্কায়-বেদনায় অপরাধ-বোধে নিজেরই কাছে নিজে পলাইয়া পলাইয়া ফিরিয়াছে। এবার সেই দ্বন্দ্ব শেষ হইল, শেষ হইল—নিবিয়া গেল সেই জ্বালা; মায়ের বুকের জ্বালা, আর মুক্তি পাইল অমিত, মুক্তি পাইল আপনার নিকট হইতে।

অমিত সেদিন মুক্তির নিশ্বাস ফেলিল। সে হাসিয়াছিল বিদ্রূপভরে, পরিহাস করিয়াছে শাসক-সুলভ মিথ্যার হাস্যকর বেসাতিকে। তাহার ঘৃণার হাসিকে বিজয়ীর মত পরিণত করিয়া তুলিয়াছে অবজ্ঞার হাসিতে। তারপর তাহা ক্রমে পরিণত হইয়াছে সর্বজয়ী দেবতার সবিষাদ নির্মল কৌতুকের হাসিতে—লাফ্‌টার অব্‌ দি গড্‌স। জেলে পীড়ার মধ্য দিয়া, মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়া যে সত্য অমিত বুঝিয়াছিল, তাহাই রসঘন উপলব্ধিতে স্থির হইল—"ভাল আমি বাসিয়াছি এই শ্যাম ধরা।—কিন্তু তারপর?" তাবপর বিচ্ছিন্ন-বন্ধন অমিতের হৃদয়ের সেই শূন্যস্থল হইতে কেমন যেন একটা দীর্ঘনিশ্বাসও আবার ধ্বনিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। মায়ের যে আশা, যে স্বপ্ন, অন্নপূর্ণার মত সংসার পাতিবার তাঁহার যে সহজাত কামনা মিথ্যা করিয়া অমিত, অমিত হইতে চাহিল, অমিত হইতে পারিল, কে যেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে শুরু করিল,—ইহার কী প্রয়োজন ছিল, অমিত? এমন করিয়া মাকে নিরাশ করিয়া কোন্ সার্থকতা তোমার লাভ হইল? তোমার লাভ হইল কোন সম্পূর্ণতা—জীবন-রসের এই সহজ উপলব্ধির পাত্রটিকে দূরে সরাইয়া দিয়া?...অনেক অস্বীকৃতির অনেক বিকৃতি,—অনেক বিভূতির অনেক ভস্মাগ্নি,—দেখিয়া দেখিয়া তখন অমিত হাস্যমুখর। কিন্তু অমিতের বক্ষতলে সেই ক্ষুদ্র জিজ্ঞাসাটাও অনিবার্য সংশয়ে রূপান্বিত হইয়াছে,—'অমিত, কাহাকেও ফাঁকি দিয়াছ কি তুমি? ফাঁকি দিয়াছ তোমার মাকে? ফাঁকি দিয়াছ আপনাকে,

আপনার জীবনকে?'—হাসি মিলাইয়া যাইতে চাহে—যতবার অমিত হাসিতে থাকে চোখে ভাসে ভাগ্যগ্রস্ত ইন্দ্রাণীর, সবিতার মুখ। আবার নিজেকে লইয়াই সে হাসে নিজের কল্পনায়।...

পিতার হস্তাক্ষর আর মাতৃহারা ভাইবোনের সেই প্রথম শোকাবেগ সংসারের শরশয্যা হইতেও অমিতের উদ্দেশে বহিয়া আনিতেছিল—জীবনের মায়া। এক বৎসর হইল পিতার সেই কম্পিত হস্তাক্ষরের ঋজু স্বাক্ষর আর অমিত পায় না। ভাই বোনের চিঠিতে জানিয়াছে কঠিন পীড়ায় তিনি অশক্ত। পরিস্ফুট চিত্তের ছাপ বহন করিয়া তাহাদের যৌবনচঞ্চল হস্তাক্ষর তখন অমিতের মনের নিকট বর্ষণ-বর্ধিত নদীর সতেজ গতি-চিহ্ন লইয়া আসিতেছে। ব্রজেন্দ্রবাবুর পত্রের মধ্য হইতে সেই স্বচ্ছ স্থিরতা আর অমিত পায় নাই। পাইল একটি সংহত-যৌবন, সংহত-বেগ প্রকৃতির নূতন আভাস: 'দিন যায়, নূতন বৎসর আসে;---আমরা প্রত্যাশা করিয়া থাকি, তোমার জন্য প্রতীক্ষা করি সকলে।' 'প্রত্যাশা' আর 'প্রতীক্ষা'।...ইহা নূতন সুর, ইহা ব্রজেন্দ্রবাবুর সেই স্নিগ্ধাবেগ কণ্ঠ নয়। ইহা শুধু নূতন হস্তাক্ষর নয়, নূতন চিত্তের স্বাক্ষরও। অমিতের মনের মধ্যে সেই ভাষা গুঞ্জরণ করিয়া ফিরিতে থাকে, সেই অক্ষর এক নূতন সত্তার আভাস ফুটাইয়া তোলে।...আর অমিতের অন্তরের প্রশ্ন অপ্রতিহত হইয়া উঠিল,—কাহাকেও ফাঁকি দিয়াছ কি, অমিত?---কাহাকে? কাহাকে?

সেদিন মরুভূমিতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। চোখ মেলিতেই নবাঙ্কুর তৃণদলের এক উজ্জ্বল শ্যামলিমা চোখে মোহ বিস্তার করে---অমিতের লেখা পত্রেও কি তাহার স্পর্শ লাগিয়া গিয়াছিল?...'প্রত্যাশা' আর প্রতীক্ষা'। আবার বিজয়ার আশীর্বাদ-আলিঙ্গন আসিল। রুদ্ধবেগে স্রোতস্বতী যেন আছড়াইয়া পড়িতে পড়িতে থামিয়া গিয়াছে---সে যে নিশ্চল গম্ভীর হিমাচলের বাণীবাহিকা: 'তোমার "প্রত্যাশা" করিব না, আমরা? তোমার জন্য "প্রতীক্ষা" করিব না আমরা কেহ? সে কি অমিত! তুমি যে আমাদের গৃহের অনেকখানি ছাইয়া আছ। তোমাদের জন্য যে অপেক্ষা করিতেছে সারা দেশ, সারা সংসার'...সংসারের কালির পোঁছে মুছিয়া গিয়াছে দেশের আর পৃথিবীর সেই প্রতীক্ষা! কথা---যেন সংবাদটা পুঁছিয়া ফেলিলেই অমিতেরা দেশের বুক হইতে মুছিয়া যাইবে।

যে গৃহের অনেকখানি ছাইয়া আছে অমিত,---একা অমিত,---সেই গৃহের প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষাই অমিতকেও ছাইয়া রহিল। একটি সুডোল অনাবৃত বাহুর আভাস, পশ্চিম-আকাশের মুখ-চাওয়া একটি তরুণী মুখের স্থির নির্বাক প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা...আর প্রতীক্ষা—অধীর উন্মুখ ইন্দ্রাণীর—সেই দৃপ্ত সাহসিক মুখ,—চমকিয়া ওঠে অমিত। কী হয়েছে তোমার অমিত? নিজেকে আবার পরিহাস শাসন করে অমিত। না, অমিত কিছুতেই এই কল্পনা হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিল না। অমিত অনেক পরিহাস করিয়াছে নিজেকে---আপনাকে ছাড়া কাহাকে লইয়া হাসিবে সে এখানে---এই নিঃসঙ্গ বনবাসে?—ক্ষ্যাপা হয়েছ, পড়িয়াছ, অমিত,—

এটর্নি সাতকড়িও যাহার নাম করিয়া শপথ করিত? একালে যাহা না পড়িলে তোমার জীবনের বারো আনাই মিথ্যা। পড়ো বা না পড়ো, এই দিবাস্বপ্নের মোহ-বিলাসে কাহাকে তুমি ফাঁকি দিবে?' দেখিয়াছ নগেন ভটচাজ্‌কে? নৃপেন দত্তকে? বৈদ্যনাথ বাঁড়ুজ্জেকে? ভাপে-সিদ্ধ মাংসের মত তাঁহারা শুধু আপনার মধ্যে আপনারা গলিয়া গিয়াছেন। আর, শুনিয়াছ কি প্রেম-প্রীতিভরা শশাঙ্কনাথের একান্ত নিবেদন, ট্রাজিক দীর্ঘশ্বাস?...

অমিতের আত্ম-পরিহাস ক্রমে আত্মজিজ্ঞাসায় পরিণত হইয়াছে: কাহাকে, অমিত, ফাঁকি দিয়াছ তুমি? নিজেকে, শুধু নিজেকেই দিয়াছ। আর তাইতেই জানো—নিজেকে মানুষ ফাঁকি দিতে পারে না। সংসারকে পারে, বিধাতাকে পারে, পারে না নিজেকে ফাঁকি দিতে। কি করিয়া, অমিত নিজেকেই বা ফাঁকি দিবে? স্বপ্ন রচিয়া? 'প্রতীক্ষা' আর 'প্রত্যাশা', শুধু এই দুইটি শব্দ অবলম্বন করিয়া কোন মূঢ়তার জাল বুনিতেছ তুমি?...

সেই জিজ্ঞাসার সঙ্গে এইবার মুখামুখি হইতে হইবে তোমাকে, অমিত।—স্নান শেষ করিতে করিতে অমিত নিজেকে বার বার বলিল: স্বপ্ন শেষের দিন আসিল এইবার,—আসিল স্বপ্নভঙ্গের আর জীবন-পরীক্ষার দিনও। কাঁটাতারই শুধু তোমাকে এতদিন ঘিরিয়া রাখে নাই, স্বপ্নেও তুমি নিজেকে ঘিরিয়া লইতেছিলে। আজ আর স্বপ্ন নয়,—জীবনের স্বপ্ন-রচনা নয় শুধু,—জীবনের প্রত্যক্ষ, 'কংক্রিট' রূপ এইবার তোমাকে প্রতিটি পদক্ষেপে পরীক্ষা করিয়া লইবে। অজ্ঞাত, অনিশ্চিত, অশেষ সম্ভাবনাময় সত্য এইবার তোমাকে কাড়িয়া লইবে, জীবনের সঙ্গে মুখামুখি দাঁড় করাইয়া দিবে। মৃত্যুর সঙ্গে মুখামুখি করিয়া, অমিত, এতদিন; জীবনের সঙ্গে মুখামুখি করিতে পারিবে কি আজ?...বাঁচিতে চাহিয়াছিলে, মরিতে চাহ নাই,—জীবনের মূল্য বুঝিয়াছিলে, চক্ষে তাই জল ঝরিয়াছিল ব্যাকুল কামনায়, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'। এইবার জীবনের সেই মূল্যদানের দিন—'মানবের মাঝে' বাঁচিবার আহ্বান...অন্যদিন আজ, অন্যদিন!...

নির্জন কারাবাসের বিভীষিকার মধ্যে অমিত সেবার চমকিয়া উঠিয়াছিল—মৃত্যু বুঝি ইহার অপেক্ষা অনেক শান্ত, অনেক সুশৃংখল, অনেক সহনীয়। হে রুদ্র, তোমার সেই দক্ষিণ মুখই প্রকাশিত করো,.. অমিতকে হত্যা করিয়ো না, অমিতের মন-বুদ্ধি চেতনাকে লইয়া এমন হিংস্র খেলায় মাতিয়ো না। তাহার চেতনা, তাহার আত্মার অখণ্ডতা, আত্মবিশ্বাস, সব কিছুকে এমন ভাবে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহাকে মিথ্যা করিয়া দিয়ো না। উহার তুলনায় মৃত্যুও অগৌরব নয়।

জীবনই গোপনে গোপনে আশ্বাস বহিয়া আনিল—সামান্য এক সার পিপীলিকা। নির্জন কক্ষে তাহাদের জীবনলীলার তুচ্ছ সেই কাহিনী জানিয়া বুঝিয়া—দেখিয়া দেখিয়া—অমিত আপনার মধ্যেও আপনার অজ্ঞাতে একটা আশ্বাস সংগ্রহ করিতে চাহিল।

প্রহরে প্রহরে প্রহরী পরিবর্তিত হয়। সতর্ক দৃষ্টিতে তাহারা অমিতের কক্ষ

সন্ধান করে, সন্তর্পণে দেখিয়া যায় 'আসামী' কোথায়। অমিতকে তাহারা বিরক্ত করিতে চাহে না, নিজেরাই শুধু নিশ্চিন্ত হইতে চায়। অমিত শোনে, কোথায় দূরে ঘণ্টা বাজে—সুদীর্ঘ ষাট মিনিটের এক-একটা ঘণ্টা। দিন ফিরিয়া আসে। কাগজ নাই, কলম নাই, বইপত্র নাই;—সব নিষিদ্ধ। দ্বার হইতে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিয়া যায়—শারীরিক কোনো অভিযোগ আছে কিনা। ডাক্তার কথা বলিতেও ভীত, তাহার চাহনি চকিত; কোনো কথায় 'হাঁ' নাই, 'না' নাই। ডাক্তার শুধু শুনিয়া যায়, টুকিয়া লয়, হয়ত যথানিয়মে জানাইয়াও দেয় সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌টকে। —দিনের অস্পষ্ট আলোকে ইহারই মধ্যে একদিন অমিত আবিষ্কার করিল দেয়ালের কোণে মাকড়সা। সারাদিন আশ্চর্য হইয়া তাহা দেখিল। দেখে তাহার জালবোনা, সন্তর্পণে শিকার, কঠিন জীবনসংগ্রাম,—কীট কবলিত করা, জীর্ণ করা, গ্রাস করাঃ—প্রাণকণার একটা অদ্ভুত প্রকাশ। খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাহা অমিত দেখে। একটা আত্মীয়বন্ধন গড়িয়া উঠিতে থাকে জীবলোকের সঙ্গে।

কিন্তু অন্ধকারও হাত বাড়াইয়া দেয়।

তারপর, ডাক্তারের হুকুমে 'আসামীর' ঘর পরিষ্কৃত হইল। দূর হইল পিপীলিকার সার ও মাকড়সার জাল—অমিতের আত্মীয় পৃথিবী। রহিল রাত্রির অন্ধকারের হিমশীতল মন্থর স্পর্শ। সে অন্ধকার কথা বলে না। কিছু বুঝিতে পারে না অমিত। নিজের চিন্তাকে অনুসরণ করিয়া চিন্তা চলে পিছনের দিকে, আবার চিন্তার অনুসরণের চিন্তা আসিয়া তাহা গুলাইয়া দেয়। স্মৃতিকে পুনর্জাগরিত করিয়া চলে পিছনে, ছেদ টানিয়া জাগিয়া ওঠে শুধু উদ্ভট স্বপ্ন। কেমন কানাকানি পড়িয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে, কাহারা কিলবিল করিতেছে।...বিনোদ বল? না, আই-বি অপিসের সেই বিড়ালটা তাকাইয়া আছে? তাহার জ্বলন্ত চক্ষু দুইটাই দেখা যায় শুধু। সেই 'মাধব'-মর্কটটা বুঝি মুখভঙ্গী করিতেছে; তাহার ওষ্ঠ নামিয়া পড়িয়াছে একদিকে। সরিয়া যায় বুঝি সেই ভূপেন-শৃগালটা, দাঁড়াইল গিয়া এক পার্শ্বে ওই অন্ধকারের মধ্যে।...মানুষকে চিনিবার বুঝিবার সকল সুস্পষ্ট চিহ্ন আরও গুলাইয়া যাইতেছে। ক্রমে পুরুষে স্ত্রীতে, মাতায় আর দয়িতায়, মুখে আর চোখে, সম্ভাষণে আর সম্বোধনে, সব মিশাইয়া যায়। সব একাকার, সব অবাধ্য, সব বিশৃঙ্খল? অজ্ঞান মনের এ কি ছলনা! উন্মাদ হইয়া যাইতেছে বুঝি অমিত?...অখাদ্য ও ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রিই তাহাকে মুক্তি দিল শেষে এই অবাধ্য মনের হাত হইতে। তারপর জীর্ণ দেহ আবার বিশ্রাম পাইল এ জেলে সহযাত্রীর সাহচর্যে, রঘুর সেবায়, বই-খাতার স্পর্শে! দেহ বিশ্রামই পাইল, পাইল না স্বাস্থ্য।

চার মাস পরে পাহাড়ের কোলে বর্ষাস্ফীত ঝর্ণার শব্দে, অনন্ত-নক্ষত্রখচিত আকাশ দেখিতে দেখিতে, গম্ভীর পর্বতরাজের নির্নিমেষ দৃষ্টির তলে শুইয়া শুইয়া অমিত তখন বিষণ্ণ বিস্ময়ে ভাবিয়াছে—মৃত্যু কি এমনি করিয়াই আসে—পা টিপিয়া টিপিয়া, রক্তের মধ্যে একটু একটু করিয়া ক্লান্তি ঢালিয়া দিয়া, নির্নিমেষ স্থির-দৃষ্টি শিকারীর মত? অমিত তাহাকে কী বলিবে, কী বলিয়া সম্বোধন করিবে?—'অত

চুপি চুপি কেন কথা কও,\ওগো মরণ, হে মোর মরণ?' বারে বারে অমিত বলিতে চাহিল 'ওগো মরণ, হে মোর মরণ'...নিশীথ রাত্রির দিকে তাকাইয়া, আকাশের নক্ষত্রাবলীর চুম্বন শিরে লইয়া, অনাদি অটল হিমাচলের পর্বত চূড়ার গাম্ভীর্যের সম্মুখে অবনত চিত্ত হইয়া, অমিত বলিতে চাহিল, 'তুমি এসো হে মরণ, হে মোর মরণ।' বারে বারে ভাবিল---বিবাহে চলিয়াছে 'বিলোচন,' আর 'সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল।' কিন্তু না, না, পাহাড়ীয়া পাখি ডাকিয়া ওঠে। অনাদি অচঞ্চল পর্বতের কোলে প্রভাতের চাঞ্চল্য জাগে, দিবারম্ভে প্রাণ-যাত্রার স্পন্দন ওঠে বন্দিশালার অঙ্গ অঙ্গনে,---টুংটাং শব্দ শোনা যায় তাহার চা-খানায়। শীতল হওয়ার মধ্য দিয়া সেই সেই পরিচিত পানীয়ের আঘ্রাণ ভাসিয়া আসে, শব্দ-গন্ধের স্বাদও বুঝি অমিতের পিপাসার্ত ঠোঁটে লাগিয়া যায়।...নির্বোধ ভুটিয়া ভৃত্য—অর্ধেক সে গবাদি পশুর মত মূঢ়,—ভুটিয়া হিন্দুস্থানীতে জানায় অমিতকে তাহার সুপ্রভাত, আনন্দ, বিস্ময়ঃ 'বাবু, জিন্দা হ্যায়?' কাল রাত্রিতেও তবে অমিত মরে নাই? তারপর, নাদু হাসিয়া উঠে 'হা-হা-হা—'। বুদ্ধিহীন মানুষের প্রাণখোলা হাস্য। পাহাড়ীয়া মানুষ তো নয়,—জীবনাগুযাত্রিক জীবন-প্রান্তাশ্রয়ী অমিতের সম্মুখে নাদু যেন একটা জৈব রহস্য। কী সুডোল মাংসপেশী তাহার বাহুর চরণের; প্রশস্ত বক্ষের কী রূপ, স্কন্ধের কী বিশালতা! বুদ্ধিমুক্ত, চিন্তামুক্ত, জীব জীবনে—শ্যামল সতেজ পর্বত বনানীতে গর্জমান ঝর্ণার জলে, আত্মবিস্মৃত এই অর্ধমানুষের বুকে: দুনিয়ার নর-নারীর আশ্চর্য অদ্ভুত প্রাণলীলায়! অথচ, অমিত,—এত যে জীবন-সচেতন, এত যে জীবনমুগ্ধ, আকাশে আকাশে যাহার কল্পনা এখনো কাঁপিতেছে আলোক-তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে,—এই প্রাণলীলার মধ্য হইতে সেই অমিত খসিয়া পড়িতেছে—খসিয়া পড়িতেছে, খসিয়া পড়িতেছে!...

অমিতের বক্ষতলে প্রাণের শেষ প্রার্থনা রূপ ধরিয়া উঠিলঃ 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।'

চোখের জল গালে গড়াইয়া পড়ে। এই পৃথিবী বড় সুন্দর; অপরূপ মানুষের মুখ—নির্বোধ ভুটিয়ার মুখও—অমিত সেদিন তাহা আপনার সমস্ত সত্তা দিয়া জানিল। আর তাহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। জীবনের মমতায় বুক ভরিয়া উঠিয়াছে।...

জীবনের মমতাতেই সেবার অমিত মরণকে ঠেকাইতে পারিয়াছে,—এইবার সেই জীবনের পরীক্ষা! বন্দিশালায় জীবন এতদিন বহিয়া গিয়াছে। জীবনের স্পর্শ-লাভ সে করিয়াছে, অর্জন করিবার অধিকার তাহার ছিল না! এইবার তাহাকে বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে মুখামুখি করিতে হইবে---জীবনের সঙ্গে এইবার মুখামুখি করিতে হইবে...মূল্য দিয়া অর্জন করিতে হইবে---জীবন-সত্য।...

রঘুকে লইয়া জ্যোতির্ময় ও শেখর জিনিসপত্র অনেকটা গুছাইয়া ফেলিয়াছে, অমিতের জন্য তাহারা অপেক্ষা করে নাই। সাবানের খণ্ডটা রঘুকে দিয়া অমিত

বলিল ঃ—নে রেখে দে, গায়ে দিস্। বিছানাটা না হয় পরেই গুটাবে, জ্যোতি। যা পড়ে থাকে তা হোল্ড-অলে দেওয়া যাবে। দেখছিস রঘু, সম্পত্তি কম আদায় করিনি—ছয় বৎসরের রোজগার।—ট্রাঙ্ক ভরা শীতবস্ত্রের কথা ছেড়ে দে, বাইরেও দ্যাখ বেন্ কোট, পেন, ঘড়ি, ছাতা, জামা, কত টুকিটাকি জিনিস এখানে ওখানে। আবও কত জিনিস বওলাব বাইরেই ফেলে দিয়ে এসেছি নির্বাসনের বন্দিশালায়।

অমিত রঘুকে জিজ্ঞাসা করিল, কি নিবি বল?

রঘু কিছুই চাহিতে জানে না। চাইলাই বা লাভ কি? জামা হোক্, জুতা হোক্, যাহাই সে পাইবে তাহা আসলে সিপাহি-ওয়াডারদের কবলে যাইবে। অমিত বিড়ি ও তামাক পাতা সংগ্রহ করিবার জন্য জ্যোতির্ময়কে পাঠাইল। মুঠি ভরিয়া তাহা লইয়া রঘুকে দিতে যাইবে, এমন সময় ডাক শুনিল 'গিনতি'।

'বড়সাহেবের ফাইল'। আজ এই 'খাতাস' বড়সাহেবের পরিদর্শনের দিন। অঙ্গনের ওধারে তাই রঘুদের এখন ফাইল করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। এ খাতার কয়েদিদের আবদ্ধ থাকিতে হইবে। 'তফাৎ যাও, তফাৎ রহো'—পাছে কেহ বড়সাহেবকে আক্রমণ করে? বড়সাহেব চলিয়া গেলে আবার তাহাদের মুক্তি। অমিতের বন্ধুরাও চলিয়া গেল। আপন আপন আসনে থাকাই এই সময় বন্দীদের নিয়ম। এখন আর সে নিয়ম কারণে-অকারণে ভাঙিবার জন্য শেখরের মত সদা-সংগ্রামকারী যুবকরাও উৎসাহ পায় না। তাহার প্রয়োজনও দেখে না। পদে পদে সংগ্রাম করিবার সাধ এই বৎসরে কোথা দিয়া তাহাদেরও লুপ্ত হইয়াছে। এই চেতনাও আসিয়াছে—সংগ্রাম মাত্রই 'স্বদেশী' কর্তব্য নয়। জ্যোতির্ময় নিজের আসনে ফিরিয়া গেল। ওদিকে লক্ষ্মীধরবাবু ব্যায়ামের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, আপাতত তাহা স্থগিত রহিল।

'সবকার। এ্যাটেন্‌শন্'---একটা বিরাট কণ্ঠের বিকট ধ্বনি।

সাড়া দিয়া মিছিল আগাইয়া আসিল। গর্ভের সতর্ক পদক্ষেপে মার্চ করিয়া সম্মুখে চলিয়াছে প্রথম ছয়জন সিপাহী ও স্পেশ্যাল জেলর, স্পেশ্যাল ডেপুটি জেলর। ইহার পরে স্বয়ং বড়সাহেব---বিশাল সুগঠিত-দেহ, পাঞ্জাবী, লেফ্‌টেনান্ট-কর্নেল পিণ্ডিদাস। মেডিকেল কলেজের বাঙালী ডাক্তার ইঁহারই বিদ্যাবত্তার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন অমিতের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতে করিতে—এই লেঃ কর্নেল পিণ্ডিদাসকে 'পাঞ্জাবী ট্যাক্সিওয়ালা' বলিয়া। বলিষ্ঠ হস্তে বলিষ্ঠ যষ্ঠি, পাঞ্জাবী-সুলভ বিলাতিয়ানায় দেহ সজ্জিত, বলিষ্ঠ চোয়াল। বলিষ্ঠ মুখে কিন্তু অনুন্নত নাসিকা, ক্ষমতাগর্বিত দৃষ্টি। লেফ্‌টেনান্ট কর্নেল পিণ্ডিদাস প্রয়োজনবোধে সম্মুখে হাসিবেন, বন্দীদের আবেদন শুনিবেন, সুবিবেচনার সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিবেন। অপিসে গিয়াই তেমনি অতি অনায়াসে সেই প্রতিশ্রুতি অবজ্ঞা করিবেন,---হাসির প্রতারণায় বন্দীদের মনে জিয়াইয়া রাখিয়া যাইবেন একটা অবিশ্বাস নিজ নিম্নতন কর্মচারীদের প্রতি। কিন্তু লেঃ কর্নেল পিণ্ডিদাস মানী লোকের মান রাখেন—

ব্যক্তিগত অনুনয়কে বেশ অনুগ্রহ ও শিষ্টাচারের সঙ্গে প্রশ্রয় দেন। অনেক সিনিয়র 'দাদার' মাথাও তাই 'সুপারের' সম্মুখে নুইয়া আসে ; মুখে অনুগৃহীতের হাসি ফোটে। লেঃ কর্নেল যাচিয়া কাহারও অসম্মান করেন না—অপমানিত হইবার ভয়ে। প্রয়োজন না হইলে অন্যদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন না—ক্রোধে দুর্বলতা প্রকাশ পায় বলিয়াই। ক্ষমতার তিনি অপব্যবহার করেন না; কিন্তু ব্যবহারের প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেই ক্ষমতা ব্যাপক ও নিরঙ্কুশভাবে ব্যবহার করেন—স্ক্রুর প্যাঁচের মত আঁটিয়া আঁটিয়া। এই সার্থক কৌশলে কারা-পরিচালনা করিয়া তিনি ভাগ্যের চূড়ায় উঠিতেছেন---শুধু ক্লাবে সস্ত্রীক পাঞ্জাবী সামাজিকতার গুণে নয়। বলুক তাহাকে বিদ্যাবুদ্ধির জন্য বাঙ্গালী 'বেগার'গুলি 'ট্যাক্সিওয়ালা'।

ছয়জন সিপাহী আর জন তিনেক অফিসার-পুরঃসর লেঃ কর্নেল পিণ্ডিদাস ওয়ার্ড পরিদর্শনে আসেন—হয়ত অনাদিকালের কারা-ঐতিহ্য পালন করিতে। তাঁহার পিছনে সাদা-কাপড়ের বিস্তৃত রাজছত্র, কয়েদি-পুঙ্গব পেশোয়ারী হাসান খাঁর সেই ছত্রধারী! সাত ফুট উঁচু দেহের পঞ্চাশ ফুট চওড়া বুক, মুখে দৈত্যের প্রভুত্ব আর দস্যুর পাশবতা। পৃথিবীই পেশোয়ারী হাসান খাঁর পায়ের ভরে কাঁপে—জেল কাঁপিবে না কেন? তাহারই অন্যপার্শ্বে জেলের আসল মুনিব,—হেড্ জমাদার খাঁ সাহেব ফতে মহম্মদ! দুশ্চিকিৎসা ব্যাধি আর সমাগত বার্ধক্যের পীড়নে তাহার সুগোল পরিপুষ্ট দেহ আর সচল থাকিতে চাহে না। অতি আয়াসে তাহাকে বড়সাহেবের পিছনে পা ফেলিয়া ছুটিতে হয়, পা মিলাইয়া-মিলাইয়া চলিতে হয়। আর তাহারও পিছনে আবার ছয়জন সিপাহীর সদর্প মার্চ। তবে ইহাদের মুখে একটু বক্রহাস্যের রেখা, বড় জমাদার খাঁ সাহেব ফতে মহম্মদের গতি-বিভ্রাটের দৃশ্যে ইহারা উৎফুল্ল। 'অজন্তা'র কোনো শোভাযাত্রা হইলে ফতে মহম্মদ অনায়াসে রাজবয়স্যের সম্মান পাইত। ইউরোপীয় কোন চিত্রকরের হাতে পড়িলে ইংরেজ রাজের 'খাঁ সাহেব' ফতে মহম্মদ হইতেন স্যর জন ফলস্টাফ্—বাক্যে নয়, মেদ-বহরে। কিন্তু অসিতের চোখে এই শোভাযাত্রাটা একটা অদ্ভুত অসঙ্গতিরই জমকালো স্বাক্ষর। মোগল দরবারের কোন একটা টুকরা যেন 'বানিয়া রাজদের' জেলখানায় ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। বিলিতী টোপর মাথায় পরিয়া, বিলিতী স্যুটে দেহ মুড়িয়া বারো হাতি রাজছত্রের ছায়ায় প্রেসিডেন্সি জেলের 'বড়সাহেবের' এই দৈনন্দিন শোভাযাত্রা—এ যেন একটা কার্জনী দরবারের মতই ক্ষুদ্রতর কৌতুক-চিত্র। বণিক-রাজা বাদশাহী সমারোহে হাতি ঘোড়া, আমীর, ওমরাহ লইয়া বাহির হন—'নেটিবদের' এভাবেই ভক্তিতে ভয়ে অভিভূত করিতে হয়। প্রাক্-কার্জনী আমল হইতেই এই মিছিলও চলিয়া আসিতেছে—এই লোহার গরাদ, লোহার ফটক, লোহার প্রহরণের মতই উহা অপরিবর্তনীয়! আর চলিয়া যখন আসিতেছে তখন কে তাহার রদবদল করে? লেঃ কর্নেল পিণ্ডিদাস কিংবা মেজর ডিক্সন, যে খুশী উহারই মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়া যায়—'বড়সাহেবের ফাইল', মিছিল তেমনি চলে বাদশাহী কায়দায় যে কোনো 'বড়সাহেব' আসুক বা যাউক।

দ্রুত পদক্ষেপে পুরোরক্ষী ছয়জন সিপাহী ঘরে ঢুকিয়া অমিতকে পার্শ্বে রাখিয়া চলিল.—অর্থাৎ বড়সাহেব এবার এঘরে এদিকে আসিতেছেন।

লেঃ কর্নেল কিন্তু অমিতের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চলিয়া গেলেন না. অমিতকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন ঃ গুড্ মর্নিং। তা হলে যাচ্ছেন?—প্রসন্ন সম্ভাষণ।

'মর্নিং। তাই মনে হয়।'—অমিতও স্মিতমুখে বলিল। পৃষ্ঠরক্ষী সিপাহীরা এক পদ পিছনে সরিয়া সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে।

'মনে হয়', মানে? ফিরে আসবেন নাকি আবার?—সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন লেঃ কর্নেল।

আর না।

প্লিজ্ ডোন্ট্।...পরিহাসের কণ্ঠ নয়, সাধারণ মানুষের সহাস্য অনুরোধের স্বর, —আসবেন কেন? এখন আমাদের দেশের শাসন আমাদের হাতে আসছে—

'আমাদের দেশ' আর 'আমাদের হাতে'।—এই দেশকে এতকাল কোন দিন লেঃ কর্নেলরা স্পষ্ট করিয়া 'আমাদের দেশ' বলেন নাই। তাহা হইলে আজ 'আমাদের হাতে'র অর্থ কী তাহাও বুঝা দুঃসাধ্য নয়। অমিতের মনে বিদ্রূপ জমিয়া উঠিতেছিল। সে হাসিয়া বলিল ঃ দেট্স্ ইয়েট্ টু বি সিন্..তা প্রমাণসাপেক্ষ।

'প্রমাণসাপেক্ষ' কেন?—কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছে—

কিন্তু রাজত্ব লাভ করেনি।—অমিত বলিল।

রাজত্ব আবার তবে কার হওয়া চাই?—সাশ্চর্যে জিজ্ঞাসা করিলেন পিণ্ডিদাস।

দেশের মানুষের।

তার মানে? আপনারা সোভিয়েত রুশিয়া চান নাকি?—পরিহাসের মধ্যেও ঔৎসুক্য ফুটিয়া উঠিতেছে লেঃ কর্নেল পিণ্ডিদাসের কথায়।

না। সোভিয়েত ইণ্ডিয়া চাই।—অমিত উত্তর দেয়।

ধর্ম, ভগবান, আত্মা সব বরবাদ করে?—

ওসব ধার্মিকেরাই বরবাদ করেছেন, করতেও পারবেন। আমরা শুধু সম্পত্তিটুকুর বনিয়াদ বরবাদ করেই আপাতত থামতে পারি।

ওয়েল, ওয়েল, প্লিজ। এই গরীবের পেনসেন কেটে দেবেন না। উইশ ইউ গুড লাক,—বলিয়া আজ হঠাৎ হাত বাড়াইয়া দিলেন হাস্যপ্রফুল্ল লেঃ কর্নেল পিণ্ডিদাস। বন্দীদের সহিত 'বড় সাহেবের' করমর্দন একটা অভাবনীয় ব্যাপার।

করমর্দন করিতে করিতে অমিতও আজ প্রসন্নচিত্তে বলিল ঃ ধন্যবাদ। কিন্তু অত টাকা দিয়ে আপনিই বা কি করবেন? একটা রিফর্মেটারি করবেন নাকি?

ওঃ হেল্। ওসব মাথামুণ্ডুতে কি হয়? ক্রিমিন্যালস্ উইল বি ক্রিমিন্যালস্—আপনাদের সোভিয়েতেও। গুড বাই—

...'চোর চুরি করিবে'—শুনিল কি অমিত? প্রস্থানোদ্যত হইয়াছেন লেঃ কর্নেল পিণ্ডিদাস। তাই আবার একটা চাঞ্চল্য উঠিল সিপাহীদের স্থাণু মিছিলে।

গুড বাই।—জানাইল অমিত।

হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইলেন লেঃ কর্নেল পিণ্ডিদাস। জ্যোতির্ময়ের শয্যার দিকে জুতার শব্দ তুলিয়া মিছিল অগ্রসর হইল।

স্পেশাল জেলর শরৎ গুপ্ত একটু পিছনে পড়িয়া গেলেন, কানে কানে বলিয়া গেলেন অমিতকে ইশারায় : বাড়িতেই---। খবরও পাঠিয়ে দিয়েছি।---খাঁ সাহেব ফতে মহম্মদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহা এড়াইল না---স্পাইং তাহার কাজ। কিন্তু তাহারও চক্ষুর মধ্য দিয়া একটু কোমল দৃষ্টি আজ খেলিয়া গেল---বাবু আজ খালাস যাইবেন। আর অপেক্ষা না করিয়া স্পেশাল জেলর শরৎ গুপ্ত মিছিলে আপনার স্থান লইতে ছুটিলেন।

চতুর, বুদ্ধিমান, কিন্তু মন্দলোক কি, অমিত, এই শরৎ গুপ্ত? মন্দ লোক কি লেঃ কঃ পিণ্ডিদাস? কেমন বন্ধুভাবে করমর্দন করিয়া গেলেন। অমিতের সঙ্গে গল্প তিনি আগেও দু-একবার করিয়াছেন। কিন্তু বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। অমিত তাঁহার বন্দী; হোক তাহারা রাজবন্দী, তবু তাঁহারই বন্দী। আজও তিনি বিস্মৃত হন নাই---তিনিই এই পাতালপুরীর রাজাধিরাজ সিপাহীর মিছিলে, রাজছত্রের উচ্চতায় ও প্রশস্ততায়, দুর্দান্ত শাসনের দুর্দান্ততর ভূত-প্রমথের অধীশ্বর হইয়া তাহা ভুলিবার অবসর কই লেঃ কর্নেল পিণ্ডিদাসের? তবু আজ তাঁহার বলিষ্ঠ হাতের সঙ্গে হাত সংযোগ করিতে অমিতের বাধিল না। করমর্দন করিতে করিতে অমিতের শীর্ণ করপত্র যেন একটা সত্যও মানিয়া লইল---বলিষ্ঠ এই হাত, বলিষ্ঠ মানুষের।---উহার মধ্য দিয়া মানব-প্রাণের কবোষ্ণ স্পর্শও কি তুমি লাভ করিলে না, অমিত,---তোমার শীর্ণ হাতের শিরায় শিরায়?...

ঘর ছাড়িয়া 'মোগল-মিছিল' আঙিনায় আবার চলিয়া গিয়াছে। আবার উঠিয়াছে সেই বিকট কণ্ঠের বিকট চীৎকার---'সরকার---এটেনশান্।'...তফাৎ যাও, তফাৎ রহ। লেঃ কর্নেল পিণ্ডিদাস জেল দর্শনে বাহির হইয়াছেন।

জ্যোতি ফিরিয়া আসিল, বলিল : আজ বুঝি খুব খাতির? একদিন শাস্তি দিয়ে এ জেল থেকে পিণ্ডিদাস আপনাকে সলিটারি সেল-এ পাঠিয়েছিল মরতে---

সে দিন ওরও যখন মনে নেই, আমারই বা মনে রেখে কি হবে?---অমিত হাসিয়া বলিল।

বিনা চিকিৎসায় আপনাকে যে প্রায় মরতে হচ্ছিল।

মরি নি তো জ্যোতি। আরও অনেক জ্বালাব ওদের অনেককে। সো, ফরগিভ এ্যাণ্ড ফরগেট।

নেভার। আই উইল নট্ ফরগেট। আমি ভুলব না।

আমি ভুলব। না ভুললেই ভুল হবে।---অমিত বলিল।

আজ যাইবার মুহূর্তে কি মতভেদ হইবে দুইজনায়? এতদিন জ্যোতির্ময় অমিতের যে স্থিরতা ও সংকল্প দেখিয়াছে তাহা কি এখনি ভাঙিয়া যাইতে শুরু করিল---বাহিরে পদার্পণের পূর্বেই? অমিত তাহার মনের কথা বুঝিয়াই তাড়াতাড়ি বলিল : এ্যাণ্ড 'আই উইল নট্ রেস্ট্'।

এমনই সামান্য ভুলবোঝাতেই সুনীল অমন অবিচার করিয়াছে।

জ্যোতিরই আবেদন ইহা। রোলাঁর 'মাতাপুত্র' পড়িয়া রোলাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ অমিতকে উৎসর্গ করিতে করিতে জ্যোতিই একদিন বলিয়াছিল—এই তোমার কথা হোক, অমিতদা, ঠিক এমনিতর অনির্বাণ আহ্বান। অন্য কিছু নয়, শ্রান্তি নয়, ক্লান্তি নয়, তা তোমাকে স্পর্শ করিবে না জানি। কিন্তু দেহের ওপর উৎপীড়নও করো না, বুদ্ধির অস্বীকৃতিও করো না। কাজ কাজ করে ছুটোছুটি করো না। আমরা তোমার কাছে চাই আত্মার এমনি অঙ্গীকার, পৃথিবীর কানে এই অনির্বাণ আহ্বান,—আর চাই সৃষ্টি। শুনতে চাই এই দেশের 'বিমুগ্ধ আত্মার' কথা!...

'বিমুগ্ধ আত্মার' কথা? অমিত সে কথা হয়তো জানে, বোঝে। কিন্তু তাই বলিয়া সেই জীবন-সত্যকে সে সৃষ্টি করিতে পারিবে কি?—পারিবে না। জ্যোতি তর্ক করিত—সেই সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতই বলিত,—তুমি পারবে না তো পারবে কে? যারা দেখে নি সেই মানুষ, বোঝেনি সেই আত্মার আকুতি? কিন্তু দুইজনাই তাহারা একমত হইত, 'আই উইল নট রেস্ট,'—ইহাই অমিতের উপর দাবি তাহাদের দেশের। আর এই মুহূর্তে অমিতের তাই এই আত্ম-ঘোষণা।

জ্যোতি উৎফুল্ল চিত্তে বলিল: তা হলে?

কোনো খেদ নাই, জ্যোতি। আঘাত পাব না, তা তো সম্ভব নয়। পৃথিবীর বৃহত্তম অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার দুঃসাহস যখন রাখি, তখন বাইরে গিয়ে এই ক্ষুদ্র আর তুচ্ছ ঘটনাগুলি মনে পুষে নিয়ে বেড়াব নাকি?

সবই কি তুচ্ছ? সবই কি ক্ষুদ্র?

একেবারের মত স্তব্ধ হইল অমিত। রক্তাক্ত অন্তর এক-একটি ছিদ্রমূল দিয়া এখনি উচ্ছ্রিত হইয়া পড়িবে।...হিজলির, বহরমপুরের, আর শেষে নির্বাসনের বন্দিশালায়, মানবাত্মার বেদনা বিদীর্ণ আত্মদান,—বাহিরে গৃহে গৃহে অশ্রুমুখী মাতৃমুখ...তোমার মায়ের মুখ, অমিত, গ্রামে-গ্রামে শরবিদ্ধ শত শত মায়ের বুক... সবই কি তুচ্ছ?

অমিত বলিল: না। সবই তুচ্ছ হত—যদি আমরাও তুচ্ছ করবার মত হতাম। আমাদের সত্য অমর বলেই এদের মিথ্যাও এত বর্বর।—একটু থামিয়া অমিত আবার বলিল: আর যতটা বর্বর তার চেয়েও বেশি হাস্যকর, তাই না?—কৌতুক ফুটিয়া উঠিল এবার অমিতের চোখে: ব্যাপারটা ভেবে দ্যাখো একবার, জ্যোতি। 'বড়সাহেবের' ভারী 'গোসা'—সেদিন আপিসে এসে বললে তাঁর অর্ডারলি সিপাহী। কারণটা কি জানো? একটু বেশি রাত্রিতে কাল ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরে মেমসাহেবের সঙ্গে সাহেবের হয় কলহ। এ কি কাণ্ড সাহেবের! প্রতিদিন তাসের টেবিলে এতটা হারা—এ হলে সংসার চলে? সাহেবও হেরে গিয়ে গিয়ে মনে মনে নিজের ওপরে ক্রুদ্ধ। কিন্তু স্ত্রী ঝঙ্কার দিতেই ক্ষেপে উঠলেন, 'সংসারটা কি রকম? অতটা করে ড্রিংক্‌স্ গেলা মেয়ে-মানুষের, আর এ বয়সেও ক্লাবে অমনি

ফল্টিনল্টি ছোকরা ক্যাপটেন ও ছুঁড়িগুলোর সঙ্গে।'---ক্রমে একটু প্লেট ভাঙ্গাভাঙ্গি ---বেশি কিছু না। সকালে উঠে সাহেব দেখলেন---মেমসাহেব নেই চায়ের টেবিলে ;---তিনি উঠবেন না এখনো; তাঁর শরীর ভাল নেই। বেয়ারা চা ঢালছে। অমন কেচে-যাওয়া রাতের পরে এমন চা ভালো লাগে কারো? তবু কালকের পরে আজ আর সাহেব রাগ করতে সাহস করলেন না। কাজে আসবার জন্যে তৈরী হতে গিয়ে দেখলেন---গিন্নী কালি ভরে ফাউন্টেন পেনটা সাজিয়ে রাখেন নি। টাইটা বেছে ঠিক করে রাখেন নি। বিরক্তিকর সংসারে পৃথিবী একটা বিশ্রী ব্যাপার! আপিসে এসেই আজ চোখে পড়ল চেয়ারের হাতলে, ঘরের কোণে-ধুলো। সব ঢিলে দিয়েছে। কড়া অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তিনি, তবু তাঁরই পিছনে পিছনে এত ঢিলেমি! গর্জন করে উঠলেন বড়-সাহেব, সবাইকে তিনি 'স্যাক' করবেন আজ। এর পরে ফাইল নিয়ে গেলেন স্পেশাল জেলর।---একখানাকে তাই আরও তিনখানা করে তাঁর কইতেই হয় এ অবস্থায়। আর অথ ফলম্ঃ রঘু ওড়িয়া হলে--- 'স্ট্যাণ্ডিং হ্যাণ্ডকাপ, ডাণ্ডা, বেড়ি।' অমিত কি জ্যোতির্ময় হলে---'ডাক বন্ধ, বইপত্র বন্ধ, চিকিৎসা বন্ধ।' তাতে হয়তো হ্যাণ্ডকাপে রঘু ওড়িয়ার হাত বেঁকে যাবে। আর আমার কি তোমার, রাজসাহী বা মেদিনীপুর জেলে অনিদ্রার সঙ্গে যোগ হবে হৃদয়যন্ত্রের লাফালাফি। কর্ণেলের এ কমিডি এসে ট্রাজিডিতেও ঠেকে। কিন্তু ব্যাপারটা মূলতঃ কি? অল অভার এ টী কাপ; স্টর্ম ইন দি টী কাপ। কাল রাত্রিতে যা হয়েছে হয়েছে, আজ সকালে যদি মিসেস্ সযত্নে চা ঢেলে দিতেন, তাহলে ঠিক উল্টো স্নিগ্ধতায় ভরে উঠত এ জেলের সীমানা। দেখতে সব মাপ হয়ে যেত---রঘুর বিড়ি খাওয়া, আর তোমার আমার 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করে জেল ডিসিপ্লিন ভাঙা।

জ্যোতি হাসিল। না হাসিয়া পারিল না। বলিল : অতএব, ড্রিংক ইণ্ডিয়ান টী। আর শেষে ছোট্ট করে লিখে দিয়ো---'টী এক্সপান্শান্ বোর্ডের সৌজন্যে!'

যাই হোক। মনে রাখতেই হয় 'হোয়াট ডায়ার কন্সিকোয়েনসেস্ ফ্রম্ এমোরাস্ কজেস্ স্প্রিং'।

মনে রাখব---ভুলব না।

বেশ, এখন রঘুকে নিয়ে গুছিয়ে ফেলো সব। আমি বরং ততক্ষণ একবার এখানকার সকলের সঙ্গে দেখা-শুনা সেরে আসি। আর ঠিকানাটা রঘুকে মুখস্থ করিয়ে দিয়ো---আমার ঠিকানা।

পাঁচ

বিদায়ের পর্ব।

সাধারণ ভাবে শিষ্টাচারসম্মত অভিবাদন ও শুভেচ্ছা বিনিময়---'নমস্কার! যাচ্ছি, জানি না কোথায়?' 'শুনছি বাড়ি',...এমনিতর। কোথাও একটু বেশি---

'মনে রাখবেন, দেখা হবে, আশা করি আবার।' কোথাও বা 'ওর অসুখের খবরটা একটু পৌঁছে দেবেন কাগজে।' 'খবর পেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবে হয়তো আমার ভাই, কিংবা বোন কিংবা আমার মাসীমা;—মা আর পারবেন না হয়তো।' আর কোথাও আরও একটু বেশি—এ বিদায়ের মুহূর্তে আগামী দিনের কাজের কথা: 'এখন আর নতুন কি আছে বলবার? যা বুঝেছি—অন্য দিন, এবার অন্য আয়োজন, অন্য পরীক্ষা।' ইহারই মধ্যে কোথাও একটু সংক্ষিপ্ত সংযত স্নেহবিনিময়ও হয়। মথিত অতীতের কোনো একটি ছোট বা বড়, মহৎ বা গভীর অধ্যায়কে চক্ষে চক্ষে স্মরণ করিয়া নীরবে স্মৃতি বিনিময় চলে। কিন্তু আবার স্বচ্ছ কৌতুকে ঢাকিয়া দেওয়া হয় এই বিদায়ক্ষণকে।

এক-এক করিয়া অমিত তিনটি ব্যারাকের জন পঞ্চাশেক সতীর্থের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়াছে। অনেকেরই অনেক কথা রহিয়াছে। অমিতের পূর্বেও অনেকে মুক্তিলাভ করিয়াছে; সেই 'অনেক কথা' তাহারাও শুনিয়া গিয়াছে। তবু অমিতকে 'কিছুটা' শুনিতে হয়—'বেশি' বলিবারই বা 'বেশি' প্রয়োজন কোথায়? সবাই এবার বাহিরে যাবে তো—ক্রমে ক্রমে!

শশাঙ্কনাথ অমিতকে আলিঙ্গন করিয়া সংবর্ধনা করিলেন, নিজের শয্যার পার্শ্বে লইয়া বসিলেন। তাঁহারও মুক্তির দিন নিশ্চয় সন্নিকট। তথাপি তাঁহার প্রসন্ন সুন্দর মুখের হাসিতে বিষাদের একটি সস্নেহ রেখা ফুটিল। এমনি অমিত তাহা ফুটিতে দেখিয়াছে, অমিতের চোখের সম্মুখে দিনের পর দিন গত চার বৎসর ধরিয়া এমনি তাহা ফুটিয়াছে। অমিত এই হাসির ইতিহাসে জানে; এই হাসির মধ্য দিয়া একটি মানুষের ইতিহাসকেও সে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। না, না, এই হাসির মধ্য দিয়া তাহার অপেক্ষাও বেশি সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। একটি মানুষকে, একটি যুগকে আর একটি যুগান্তরকেও। এই প্রসন্ন-চিত্ত মানুষের শুভ্র কৌতুকের হাসি—সমস্তক্ষণ মুখে লাগিয়া-থাকা এই হাসি—ইহা তাহার অন্তরাত্মার আলোক। অমিত দেখিয়াছে কেমন করিয়া একটু একটু করিয়া এই হাসি আপনাকে না হারাইয়াও আপনার মধ্যে খুঁজিয়া পাইল বিষাদের বেদনার ছায়াশ্যাম এক সকরুণ রেখা। সেই আত্মার সহজ আনন্দের মধ্যে ক্রমে জিজ্ঞাসা জাগিল, সে আনন্দ গভীর হইল, গভীরতর হইল জিজ্ঞাসা। তারপর—আরও শেষে—মন্থন-শেষ-সমুদ্রের মতো তাহা স্থির নিশ্চল হইল সুগভীর বেদনায়, লুণ্ঠিত সুধার চেতনায়, কুণ্ঠিত জীবনের অসম্পূর্ণতায়, হারানো যৌবনের অবহেলিত দানের অনুশোচনায়। শশাঙ্কনাথের মুখের হাসি মুছিয়া গেল না, তবু তাহার মধ্যে একটি দীর্ঘশ্বাসভরা বেদনার রেখা স্ফুরিত হইয়া উঠিল।—অমিত দিনের পর দিন তাহা দেখিয়াছে।

একটি মানুষ নয়,—ইহা একটা যুগের ইতিহাস। জীবনকে তাঁহারা বড় কঠোর সাধনারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আদর্শে—রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ স্বীকার করিলেই স্বাধীনতার সাধনায় পরাজয় হইবে। পরাজিত জাতির সর্বপ্রয়াসেই পরাজয়ের বিভীষিকা। গৃহে, সমাজে, সংসারে তাহার চারিদিকেই যেন পরাজয়ের

সূক্ষ্ম আর স্থূল নানা জটিল জাল। কি করিয়া সে এই জীবনকে সহজরূপে, স্বচ্ছন্দে, অনায়াসে গ্রহণ করিবে?—আশ্রম করিয়া, সেবা করিয়া, লাইব্রেরি গড়িয়া, শিক্ষাদান করিয়া ছোট বড় নানা বালকের সাহচর্যে এই উপবাসী চিত্তকে সজীব ও সরস রাখিতে রাখিতে—১৯১৬এর মতো ১৯২৫এর মতো এবার ১৯৩০এও যখন শশাঙ্কনাথ বন্দিশালায় আসিয়া পৌঁছিলেন তখন সচকিত হইয়া দেখিলেন এই বায়ুমণ্ডলে এবার নতুন হাওয়া বহিতেছে। পৃথিবীর নানাদেশের ইতিহাসকে চমক লাগাইয়া এই দেশের সেই মায়া-মমতাময়ী মেয়েরাও ছেলেদের বীরত্বপনার সঙ্গিনী হইয়া দাঁড়াইতেছে। নতুন রঙের ছোপ লাগিয়াছে 'স্বদেশী' তরুণদের সে কাশের শুভ্র উত্তরীয়ে, নেশা লাগিয়াছে স্বদেশীতে। জীবনকে যাঁহারা অস্বীকার করিয়াছিলেন সেই প্রৌঢ় তপস্বীর দল কিন্তু আরও উদ্ধতভাবেই এই আদর্শচ্যুতিকে বাধা দিবার অসাধ্য সাধনায় লাগিলেন। কিন্তু বাঁধ ভাঙিয়া পড়িতেছিল—ভাঙিয়া গেল। সেন্সরের উন্মোচিত স্লুইস্ গেট দিয়া তখন অবাধে জেলে ঢুকিয়া পড়িল একদিকে মার্কস-এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক গ্রন্থ, পুস্তিকা, সাহিত্য; অন্যদিকে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের যত বৈজ্ঞানিক আর অপ-বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, কামকলার চিত্তাকর্ষক তথ্য ও তত্ত্ব। বছর দুই পরে অবশ্য মার্কসীয় চিন্তার উপরে আবার এই স্লুইস্ গেট নামিল; কিন্তু যৌনবিজ্ঞানের গ্রন্থ-প্রবাহে বাধা রহিল না। তাহার তাপে তপ্ত অবরুদ্ধ নির্বাসন-গৃহের বায়ু মথিত হইতে লাগিল।

'আগুন লইয়া খেলা'—কি উহার অর্থ?—সেন্সরের পাশ-করা বাংলা উপন্যাস হাতে লইয়া বন্দিশালার অধ্যক্ষ ইংরেজ মেজর বাঙালী কেরানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।
কেরানীবাবু ইংরেজি করিয়া বলিলেন: প্লেইং উইথ ফায়ার, স্যর।

প্লেইং উইথ ফায়ার? এ-বই পাশ করলে কে?—অগ্নিমূর্তি সাহেব।

ভয়ে কেরানী বিবর্ণ। গোয়েন্দা-সেন্সরের শনিদৃষ্টিতে 'চলন্তিকা' 'কালচার অ্যাণ্ড এনার্কি' হইতে এম-সেনের পোলিটিক্যাল ইকোনমির নোট পর্যন্ত পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। তাহারও উপর আবার আপত্তি সাহেবের! কিন্তু বাঙালী কেরানীও সাহেব চরাইয়া খায়, সে তাড়াতাড়ি বলিল: নভেল, স্যর, নভেল। 'ফায়ার মিনস্ হিয়ার উমেন। প্লেয়িং উইথ উমেন—'

আঃ!—ইজ্ ইট? দাও, দাও, এ মুহূর্তে দাও এ বই পড়তে ওদের। মেক্ ইট্ কমপালসারি ফর অল্ ডেটিন্যুজ্! সবকে পড়তে হবে।

অতএব উম্যান লইয়া না হউক ফ্রয়েড লইয়া খেলা চলিল---অবাধ, উদ্ধত। আর সাহিত্যের ঝরিয়া-পড়া পাতা হইতে আসিল মন দেওয়া-নেওয়ার রোমাঞ্চিত রোম্যান্স্, বাঙালী অশ্বত্থামার দুগ্ধপান।

নৃপেন্দ্র দত্তের, বৈদ্যনাথ বাঁড়ুজ্জের মত প্রৌঢ় প্রবীণদের পঞ্চাশের ওপারবর্তী ভ্রূকুটি আর পঁচিশের এপারস্থিত অনুগামী যুবকচিত্তকে শাসনে রাখিতে পারে না। সেই বহুদিনের কর্তৃত্ব-অভ্যস্ত প্রবীণ চিত্ত আহত হয়। কিন্তু তাঁহাদের প্রস্তরিত

জীবন-প্রাকারেও ক্ষয় দেখা দিল, এখানে-ওখানে ধস ধরিল, জীর্ণ ফাটলের মধ্য দিয়া অস্বীকৃত যৌবনের নিরুদ্ধ কামনা শ্বসিয়া উঠিতে চাহিল।

...বীরেনটা এসব কাণ্ড করিয়াছে নাকি?—আগেকার সেদিন থাকিলে বদ্যিনাথ বাঁড়ুজ্জে উহাকে বলি দিতেন। বলি এখনো দিবেন—চোখে বোদে-দা কম দেখেন আজ—ছানি পড়িতেছে অকালে,—জীবনের অনেক নিপীড়নে, আয়ুক্ষয়ে;—তবু স্বদেশীদলে অনাচার সহিবেন না। নরবলিটাই আবার প্রচলিত করিতে হইবে বৈকি। এই সব মার্কসিস্ট নাস্তিক আর চরিত্রহীনদের হাতে নৃপেন্দ্র দত্তরা দেশটাকে ছাড়িয়া দিবেন নাকি?

কিন্তু বুঝিতে বাকি থাকে না—আদর্শের সেই দৃঢ় সুনিশ্চয়তা নৃপেন্দ্র দত্তের মনেও আর নাই। ওই মন্থর, শ্লথ, স্থূল মানুষটির মধ্যে যে হতচেতন যুবক যৌবন হইতেই মরিতে শুরু করিয়াছিল আজ এই আবহাওয়ায় সে-ই অসময়ে আবার জিইয়া উঠিতেছে: 'বারীনদা' কাণ্ডটা করিলেন কি? আহা, তাঁর বয়স তো আমাদের অপেক্ষাও বেশিই হবে।

অতএব বারীনদার অপেক্ষাও বয়স যাঁহার কম—তাঁহার নিজের হিসাবেই অবশ্য কম—সেই নৃপেনদারও দিন আছে—না, না, সংসার বাঁধিবার কথা তিনি ভাবিতেই পারেন না তিনি 'স্বদেশী', 'কর্মযোগী'।

জগন্নাথ চৌধুরী পরিহাস করিল। 'জগা' নৃপেন্দ্রের এককালের সহচরদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাই বরাবরই সে একটু আদরের—'দাদার' সহিত ইয়ার্কিও দেয়। বৎসর সাত আগে অগ্রজের মত 'জগাও' বিবাহ করিয়াছে। তরুণী ভার্যার কথা তাই এখই বলিবার জন্য তাহার এখানে-ওখানে ছুটিতে হয়, যাইতে হয় কুতূহলী বয়ঃকনিষ্ঠদের রসালাপের আড্ডায়। আবার কখনো ফিরিয়া আসিতে হয় সসম্ভ্রম আনন্দ উপভোগের জন্য প্রৌঢ় নিপুদাদের পাশার বৈঠকে। জগন্নাথের সরস পরিহাসটা কিন্তু শেষ করিতে হয় না: 'বারীনদার পরেই নৃপেনদা।' 'নৃপেনদা' গম্ভীরকন্ঠে চোখ তুলিয়া ডাক দেন—'জগা'! তারপর গম্ভীর হন নৃপেন্দ্র দত্ত। কিন্তু বুঝা যায় সেই স্থূল মানুষের স্থূল অন্তরাবেগ ও চিন্তার মধ্যেও এই প্রশ্নটা ইতিপূর্বেই মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল—তাহা হইলে নৃপেন্দ্রনাথেরই কি সময় একেবারে বিগত? বদ্যিনাথ বাঁড়ুজ্জের অবশ্য কথা ওঠে না।

মুশকিল এই, নৃপেন্দ্র দত্ত-বদ্যিনাথ বাঁড়ুজ্জেরা সেই প্রশ্নের বাণবিদ্ধ দেহ ও মন গোপন করিতেও জানে না। এ-জাতীয় বিড়ম্বনা সহিবার জন্য তো তাঁহাদের কালে তাঁহারা দেহমনকে প্রস্তুত করেন নাই। তাঁহারা জানিতেন পুলিশের সূচ নখের তলে বসিবে, ব্যাটনের গুঁতায় নাক দিয়া মুখ দিয়া রক্ত পড়িবে, সাহেবের সবুট লাথিতে প্লীহা বা যকৃত ফাটিয়া যাইবে, হাতকড়া পরিয়া মুখ বুজিয়া তাহা সহিতে হইবে,—সহিতে হইবে শেষ দিনের রজ্জুর কন্ঠালিঙ্গন। কিন্তু এ কি হইল?—এই অলক্ষ্য শরাঘাত, এই শব্দভেদী অস্ত্রপীড়া, অতনুর অদৃশ্য রজ্জুর এই টানা-হেঁচড়া—এ কি দুর্দৈব! তরুণদেরও বুঝিতে বাকি থাকে না নৃপেন্দ্র দত্তের,

বদ্যিনাথ বাঁড়ুজ্জের অন্তরে বাহিরে ফাটল ধরিয়াছে—আর তাহা জোড়া লাগিবে না। পঞ্চান্নের দিক হইতে ষাটের দিকে চলিবে আয়ু; ভুলিয়া-যাওয়া যৌবনের ভুল আরও জীর্ণ করিয়া তুলিবে মনের চারিকোণ; আরও অসহায়, আরও বিড়ম্বিত, আরও পরাজিত, আরও পরিত্যক্ত সেই ভগ্ন দেউলের মধ্যে তখন জীর্ণ খণ্ডিত ক্ষয়িত হইবে নৃপেন্দ্র দত্ত, বদ্যিনাথ বাঁড়ুজ্জে—প্রথম-মহাযুদ্ধকালের অখণ্ড অটল এই দুই 'স্বদেশী' সাধক।...

দেউল ভাঙিয়া পড়িতেছে; কিন্তু দেবতাও কি চাপা পড়িয়া যাইতেছে সেই ভগ্ন দেউলের স্তূপের তলে?

অমিত এই প্রৌঢ়দেরও বন্ধুস্থানীয়। কেমন একটু করুণ বেদনায় তাঁহার মন ভরিয়া ওঠে। নিরঞ্জন বা চিত্তের সঙ্গে বসিয়া জগন্নাথ এই 'পঞ্চশরে দগ্ধকরা' অসহায় 'নিপুদা' 'বোদেদা'র সঙ্গে আপনার ব্যঙ্গ-চাতুর্যের কাহিনী বলে। কিন্তু শুনিতে শুনিতে অমিতের মন ভরিয়া যায় ভাঙা দেউলের ব্যথায়...এবং গোপনে গোপনে নিজের সম্বন্ধে আশঙ্কায়।

শশাঙ্কনাথ একদিন আসিলেন। একটু সময় হইবে কি অমিতের? 'একটু' কেন? শশাঙ্কনাথের জন্য তো অমিতের রাত্রিদিন সর্বক্ষণ মুক্ত। অমিত পরিহাস করে নাই। সত্যই এমন সানন্দ মানুষের সঙ্গে কথা বলিলে মন জিইয়া ওঠে। কিন্তু উহার সময় কোথায়? তাঁহার সহিত অমিতের দেখা হয় সামান্য এই দৈনন্দিন ভ্রমণের সময়টুকুতে। শশাঙ্কনাথ থাকেন এক ছাউনিতে—অমিত অন্যটায়; মধ্যখানে কাঁটা তারের বেড়া ও পাহারা। শশাঙ্কনাথ বলিলেন: তাই তো মুশকিল—দেখাই হয় না। কিন্তু একটু সাহিত্য পড়াতে পার?

সাহিত্য? আমি পড়াব আপনাকে?

অমিত নাম করিল—নিরঞ্জন ইংরেজীতে ফার্স্ট ক্লাশ আর সুবোধ বাঙলায়। শশাঙ্কনাথ তাহা স্বীকার করিলেন; কিন্তু তিনি শুধু পড়িতে চাহেন না—বুঝিতে চাহেন। এবার বেদনার হাসি তাঁহার মুখে।—ফিলজফি হইতে, ইতিহাস হইতে, জীবনকে ছাঁকিয়া লইয়া তিনি তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন—সে বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্বে। বুঝিয়াছিলেন—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। বুঝিয়াছিলেন সে মিথ্যা অনিত্য বটে, কিন্তু অনিত্যের মধ্যেও নিত্যই রূপায়িত হয়। ভাবময় সত্য ইতিহাসের ঘটনার পরিচ্ছদ বুনিয়া-গাঁথিয়া আবার টানিয়া-ছিঁড়িয়া এমনি করিয়াই নিত্য প্রকাশিত হইবে,—ইহাই জানিতেন শঙ্কর-হেগেল-পাঠী শশাঙ্কনাথ। নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়া, 'চিত্তবৃত্তির নিরোধের' মধ্য দিয়া সেই নিত্যলীলার রহস্য উদ্‌ঘাটনেই তাঁহার আত্মোপলব্ধি—আর ভারতের সভ্যতার আত্ম-প্রতিষ্ঠা। ইহাই ছিল সেদিন তাঁহার তপস্যা। 'বড় কর্মের মধ্যে যাই নি, ভাই। আমি ছিলাম তোমাদের কর্মযোগের নেপথ্য-শালায়—নিষ্কাম সাধনার দীপশিখা জ্বালিয়ে। কিন্তু যে আলোক আমার ছিল তা নিষ্কাম বুদ্ধির নয়; ভালোবাসার।'

জন্ম-মিশুক মানুষ শশাঙ্কনাথ। মানুষ পাইলেই খুশি। তাঁহার ভালো লাগিত

মানুষের মুখ, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কৌপীন আঁটিয়াছেন; তবু কঠোর হইতে পারেন নাই, —কাহারও উপর তিনি কঠোর হইতে পারিতেন না। কেহ দোষ করিলে দুঃখ পাইয়াছেন; তাহার হইয়া বড়দের তিরস্কার সহিয়াছেন। আবার অপরাধীদের যখন সেই দোষ সংশোধন হইল না দেখিয়াছেন, তখন নিজের মনে আরও দুঃখ পাইয়াছেন। মানুষকে তিনি চিনেন না—বন্ধুদের এই দোষারোপ বিনা দ্বিধায় মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এইবার তাঁহার পঁয়তাল্লিশ বৎসরের সীমা হইতে মনে হইল—মানুষকে কি ইহারাই কেহ চিনিয়াছেন? কাহাকে চিনিয়াছে কে? —'ইতিহাস পড়ি, দর্শন পড়ি, সভ্যতার মূল্য বিচার করি—কিন্তু কি দিয়ে?'

অমিত বলিতে চাহিল : বৈজ্ঞানিক চেতনা চাই, শশাঙ্কদা।

বাধ দিলেন শশাঙ্কনাথ : না, না। বিজ্ঞান সত্য, কিন্তু বিজ্ঞান যথেষ্ট নয়। সে তো দর্শনের ইতিহাসের আর-এক নাম।—বলিতে লাগিলেন—মানুষকে লসাগু-গসাগু করিয়া বিজ্ঞানও তত্ত্বে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কতটা স্নায়ুতন্ত্রীর সঙ্গে কতটা রক্তমাংস মেদমজ্জা মিশাইয়া পাকাইয়া কি দাঁড়ায়।—বিজ্ঞান তাহার নামকরণ করে, হ্রাসবৃদ্ধি হিসাব করে, নিয়ম বানায়।

তত্ত্ব তো শুধু সত্যের অ্যানাটোমি। তাই না?—জিজ্ঞাসা করেন শশাঙ্কনাথ।

অমিত নিবিষ্টচিত্তে শুনিতেছিল। শশাঙ্কনাথ স্ফূর্তিপ্রিয় লোক, কিন্তু অগভীর নন, তাহা অমিত জানে। কি কি বলিতে চাহেন আজ শশাঙ্কনাথ? তর্ক করিয়া অমিত বলিল : অ্যানাটোমিও বটে, কিংবা ফিজিওলজিও বটে। অথবা বায়োলজি। কিন্তু তাতে হল কি?

হল এই যে, এরা মানুষ ছাড়িয়ে অ্যাবস্ট্রাক্ট নীতিতে পৌঁছয়, পরে আর মানুষকে খুঁজে পায় না। তুমিই বলেছিলে একদিন একথা সাহিত্যের আসরে বলতে গিয়ে—'সাহিত্য' শিল্প সেই মানুষকে, সেই জীবনকেই ধরে। তার নিষ্প্রয়োজনের খোলস ছাড়ায়, তার মেদমাংস আর আশা-আকাঙ্ক্ষাভরা সত্তাটাকে মুঠোয় চেপে ধরে; একেবারে চুলের মুঠোয় ধরে দাঁড় করিয়ে দেয় চোখের সামনে—'এই জীবন, এই মানুষ'—অ্যাবস্ট্রাকশন নয়, কংক্রিট; তত্ত্বকথা নয়—সত্যরূপ!—যাকে দেখি, ছুঁই, বুকে নিই, হাসি-কাঁদি, ভালোবাসি,—আর ভালোবেসেও অন্ত পাই না।' মনে আছে তোমার সেই কথা?

শশাঙ্কনাথের সুন্দর প্রসন্ন সেই আননে কেমন একটা পরিচ্ছন্ন উদ্ভাস, বেদনা ও উৎকণ্ঠা। বলেন, —একে আমি চাই—এই মানুষকে চাই। তাই সাহিত্য পড়তে হবে, ভাই। সত্যকে অন্যপথে আমি পাব না; সে আমার পরধর্ম।

দুইজনার নতুন পরিচয়ের বনিয়াদ এইরূপে রচিত হইল। তাহার পূর্বেই শশাঙ্কনাথের নতুন চক্ষু ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ত্রিশ বৎসরের ভুল তো আর ফিরাইয়া লওয়া যাইবে না। শশাঙ্কনাথ আর ফিরিয়া যাইতে পারিবেন না তাঁহার বিশ-বাইশ বৎসরের যৌবনে; বিধবা মায়ের চরণ ছুঁইয়া বলিতে পারিবেন না,—'মা, তোমার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি।' বলিতে পারিবেন না কোনো একটি তুচ্ছ মানবদুহিতাকে

আপনার সামনে বসাইয়া,—'তুমি সুন্দর'।—সংসারে এমন একটি নিভৃত মানব-ছায়াও নাই যাহাকে শশাঙ্কনাথ একবারের মতো আপনার সব কথা বলিতে পারেন।

'যাকে সব বলা যায়'—এমন মানুষ, এমন একটি মানুষ। অমিতবাবু হাসছ তুমি মৃদু মৃদু কিন্তু এই ভুল যেন তুমি কোরো না,—এ ভুলের কিন্তু সীমা শেষ থাকবে না আর পরে—

অমিত বেশ জোর করিয়াই হাসিল—একটি শুধু? একাধিক নয় কেন? কিন্তু ভুল কোরো না...ভুল কোরো না, অমিত।

অনেক সন্তর্পণে আবার এই কথাটাই শশাঙ্কনাথ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। তখন অমিতের মাতৃবিয়োগের সংবাদ আসিয়াছে। মায়ের অতৃপ্ত সাংসারিক আকাঙ্ক্ষার কথা শশাঙ্কনাথ খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। কে এখন দেখিবে পিতাকে? বোন অনু? একদিন তাহারও সংসার হইবে—তারপর? তারপর? তারপর অমিত? তারপর?

অমিত হাসিয়া বলিয়াছে : আবার তারও পর?

শশাঙ্কনাথ তখন সাহিত্য হইতে, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের পাতা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন আপনার জীবনের উত্তর। আর অমিতের সঙ্গে বসিয়া আলোচনা করিয়া লিখিতে বসিলেন—নাওমি মিচিসনের মতো নয়, বাঙালী মায়ের মতো বাপের মতো করিয়া—বাঙলা, 'আউটলাইন ফর বয়েজ অ্যাণ্ড গার্লস।'—যে ভাগ্নে-ভাগ্নীদের দুই-চার বৎসরের তিনি দেখিয়া আসিয়াছিলেন—যাহাদের দেখিয়াও আসেন নাই,—আগামী দিনের ভারতবর্ষ তো তাহাদের লইয়াই; আগামী দিনের শশাঙ্কনাথের সংসারও তাহাদের লইয়া।

একদিনের ভুলের এই অকুণ্ঠ স্বীকৃতি—আর একদিন—ভালো না বাসিলে তাঁহার মুক্তি নাই।

শশাঙ্কনাথ শুধু একটা মানুষ নয়, একটা যুগও শুধু নয়, নতুন যুগের একটি সচনাও—এ দেশের সাধনা জীবন-স্বীকৃতি।

আজ অমিতের সঙ্গে দুই-এক কথা বলিতে বলিতে আবার শশাঙ্কনাথের মুখে শুভ্র হাসি দেখা দিল। তারপর নিজেই বলিলেন ঃ যাও, সকলের সঙ্গে দেখাশুনো শেষ করোগে। আর আমি স্নান সেরে আসছি, আবার দেখা করব। আর কি চাই?

অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ—

অমিত ইঙ্গিতটা বুঝিল। মনে মনে মানিল। মুখে হাসিয়া কহিল, 'অসংখ্য'ই তা হলে; একটি নয়?—বলিতে বলিতে চলিল।

শশাঙ্কনাথ বলিলেন, এক না হলে অসংখ্য আসবে কোথা থেকে?

রঘু আসিয়া জানাইল—ম্যানেজারবাবু ভাত নিয়ে আসতে ডাকিছেন।

চল—অমিত আগাইয়া চলিল।

নিরঞ্জন কি একটা লিখিতেছিল, অমিতের কণ্ঠ শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বহু দিনের বন্ধুত্ব তাহাদের। তাহারা সমসাময়িক কালের ছাত্র। অবশ্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দিনে দুইজনাতে শুধু দৃষ্টি বিনিময়ের সম্পর্ক ছিল। নিরঞ্জন ইংরেজী পড়িত, অমিত পড়িত ইতিহাস। এখন সেই পরিচয় প্রীতির ও সেবার বন্ধনে সুন্দর হইয়াছে। এমন করিয়া নিজের হাতে অসুস্থ অমিতকে সুস্থ করিবার চেষ্টা আর কেহ করিতে পারে নাই। কিন্তু সেবা এই প্রীতির সামান্যতম একটি অংশ মাত্র। গল্প করিয়া, মৃদু হাস্যে কৌতুক পরিবেশন করিয়া যদি কেহ অমিতের সেই দিনগুলিকেও স্মরণীয় করিয়া থাকে তবে সে নিরঞ্জন ও চিত্ত। এক ছাউনিতে থাকিতেন নিরঞ্জন, অন্য ছাউনিতে অমিত, আর চিত্ত বছর দুই পূর্বেই বন্ধনমুক্ত হইয়াছে। হয়তো এখন সে স্বাধীন; পরিবারের দুর্দশাভার আবার ঘাড়ে তুলিয়া নিজের উদ্যমে সংসার গড়িতেছে। কলিকাতায় থাকিলে সেও আজ অমিতকে দেখিতে আসিবে; কলিকাতায় না থাকিলেও আসিবে—দুই দিন আগে কিংবা দুই মাস পরে। 'যাকে সব কথা বলা যায়'...নয় কি চিত্তপ্রিয় বসু তেমন মানুষ? অমিত বলিতে পারে না, 'না'। কিন্তু নিঃসংশয়ে, বলিতে পারে কি 'হাঁ'? কাঁটাতারের কৃত্রিম জগতের কৃত্রিম জীবন-যাত্রার মধ্যে চিত্তের অপেক্ষা অমিত নিকটতম সখা আর পায় নাই। পাইয়াছে সখা নয়—স্নেহভাজন অনুজ; কিন্তু তাহারা সখা নয়। যাহার সহিত চিন্তার বিনিময় স্বাভাবিক রসবস্তুকে ভাগ করিয়া আস্বাদন করিলে আস্বাদনের আনন্দ বাড়িয়া যায়—এবং যাহার সহিত শিষ্টতাব সুচিন্তিত সীমা ছাড়াইয়াও অন্তরঙ্গরূপে একটু আন-পার্লেমেন্টারি উক্তি আর রঙ্গকৌতুকেও মুক্তি পাইতে পাবে—অমিতের এমন বন্ধু নাই, চিত্ত ছাড়া ছিল না। নিরঞ্জন দ্বিতীয় ব্যক্তি। এই বন্ধুত্বের জন্যই কৃত্রিম দিন-রাত্রির অধিকতর কৃত্রিম মুখোস পরিয়া তাহাদের বেড়াইতে হইত না——নৃপেন্দ্র দত্ত ও বৈদ্যনাথবাবুর মতো,—জগন্নাথের মতোও। অমিতের দিনগুলি সহনীয় হইয়াছে, সুন্দর হইয়াছে—তিন বন্ধুর বুদ্ধি ও অন্তরের এমনি পরিচয়ে—অমিতের, চিত্তের, আর নিরঞ্জনের। অমিতের মতো ছিটগ্রস্ত তো তাহারা নয়—এমন নিরেট পণ্ডিত নয়। তাহাদের স্ত্রীপুত্র আছে। তবু বোধ হয় আহরণ করিতে পারে নাই বৈষয়িক মনোভাব, সার করিতে পারে নাই লাভক্ষতির গণনা, নিরাপদ গৃহকোণ ও নিশ্চিন্ত আরাম।

সংসারকে সার করে নাই—কিছুতেই নিরঞ্জন করিতে পারিবে না। এখনো সে সেক্‌সপীয়র খুলিয়া বসে, তাহার গভীর অন্তশ্চেতনা ইংরেজী কবিতার গভীর উজ্জ্বল রসধারায় অভিষিক্ত। আর সমস্ত অন্তরের তীব্রতা দিয়া সে ভালোবাসে বাঙলাকে—বাঙালী জাতিকে, বাঙলার এই নতুন কালচারকে। সে ইংরেজকে করে ঘৃণা, বাঙালী ছাড়া সমস্ত ভারতবর্ষের অন্য জাতিদেরই করে কৃপা। তাহার বুকভরা ঈর্ষার আর বিদ্বেষের যোগ্যতম পাত্র—ইংরেজ,—অন্যেরা অনুকম্পার পাত্র। 'ওদের মধ্যে ভদ্রলোক পাবে না। ওরা হয় নকল-নবাব ওমরাহ, নয়

নকল-ইংরেজ; বাদ বাকি গোলাম, গরিব, অনুগ্রহভাজন। ভদ্রলোক নয়—সে গান্ধীই হোন আর জওহরলালই হোন; কিংবা হোন্ জিন্নাহ্। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র ও‘রা বুঝবেন না—ও‘দের মধ্যে জন্মাবে না সেই জ্বলন্ত পুরুষকার—দেশবন্ধু বা সুভাষচন্দ্র। ভদ্রলোকের সমাজ ওসব দেশে নেই।'

নিরঞ্জন 'বাঙালীর মিশানে' বিশ্বাসী, 'ভদ্রলোকের নেতৃত্বে' আস্থাবান। তাহার অর্থ—বিশ্বাসী সে বাঙালী ভদ্রলোকের 'ডিভাইন রাইট্ টু রুল'-এ। অবশ্যই সেই অধিকার অর্জন করিতে হইবে—একদিকে এশিয়াটিক ঐক্যে জাপানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কে হাত মিলাইতে হইবে; অন্যদিকে জাপানীদেরই মতো প্রাণ দিয়া, আর সাহিত্য শিল্পকলা দিয়া দিগ্বিজয় করিতে হইবে। বাঙালী তাহা করিতেছে; করিবে। সেই জন্য চাই—শক্তির সংগঠন, অর্থাৎ 'স্টর্ম ট্রুপারস'—বাঙালী 'স্টর্ম ট্রুপারস।' বাঙলা আসাম আর ব্রহ্মের উপর একটা রাজনৈতিক প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। আর তারপর কালচারাল কন্‌কোয়েস্ট্?—নিরঞ্জন পরিহাস-স্বচ্ছ কন্ঠে বলে, 'একবার শরৎচন্দ্র পড়িয়ে ফেলব,—পাঞ্জাবী, গুজরাটী, সিন্ধী, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়ী সকলকে। দেখবে রাজলক্ষ্মী, অভয়া, কিরণময়ীকে দিয়ে মাত করে ফেলব ভারতবর্ষ। সব্যসাচী শ্রীকান্তরা যেখানে ফেল করবে, সেখানে জয়ী হবে পিয়ারী, কিরণময়ী, সাবিত্রী। বাঙালী রাজনীতি যা শক্তিতে অধিকার করবে, বাঙালী কালচার তাকে দেবে শ্রী।'

অমিত জানে ইহার সবটুকু পরিহাস নয়। আর জানে বলিয়াই উভয়েই জানে তাহাদের আন্তরিক বন্ধুত্বের মধ্যখানে কাঁটাতারের বেড়া দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া থাকিবে। অমিতের দৃষ্টিতে নিরঞ্জনের দৃষ্টিতে মিলিবে না; অমিতের পথে নিরঞ্জনের পথে ছাড়াছাড়ি অনিবার্য। সুনীল দত্ত তাই নিরঞ্জনকে দেখিলেই মুখ ফিরাইয়া লইত—'ফ্যাশিস্ত'। কিন্তু অমিত জানে—এ পথ হইতে ও-পথে তাহাদের মুখ চাওয়া-চাওয়ি চলিবে না, অথচ যে-কোন শেক্‌স্‌পীয়ার ও রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র-আলোকিত মধুর সন্ধ্যায় তাহারা যখন মুখোমুখি বসিবে—দুই দেশের দুই পথের মোড়ে,-তখনো অমিতের ও নিরঞ্জনের অন্তর মানিয়া লইবে তাহারা সতীর্থ, পৃথিবীর পথে না হোক---জীবনের নিত্যকার পথে, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের ক্ষেত্রে, তাহারা সহযাত্রী।...আনত মুখখানি অমনি ফিরাইয়া লইত সুনীল দত্ত... 'তুমিও আসলে আমাদের নও, অমিতদা'...

ভগ্নস্বাস্থ্য নিরঞ্জনের এবার দীর্ঘদিন ধরিয়া পারিবারিক শোক সহিতে হইয়াছে। দিনের পর দিন এই দূরের বন্দিশালায় তাহার কন্ঠনালীর প্রদাহ আরম্ভ হইল, তারপর জ্বর। শেষে দেখা গেল শ্রবণশক্তিই সে প্রায় হারাইতে বসিয়াছে, কিন্তু তবু চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় নাই। সম্প্রতি এখানে পীড়াটা এই প্রথম সরকারীভাবে গ্রাহ্য হইয়াছে। কিন্তু এখন মেডিকেল কলেজের বিশেষজ্ঞ সখেদে জানাইলেন—আর আসিলেন কেন? কোনো আশাই আর এখন নাই। নিরঞ্জন ম্লান বিষণ্ণ হাস্যে মানিয়া লইয়াছে এই দুর্ভাগ্য। শ্রবণশক্তি আর সে সম্পূর্ণ ফিরিয়া পাইবে

না, উহার আট-আনি লইয়াই চলিতে হইবে। কোনো দিনই সে বাক্‌পটু নয়, শুধু বন্ধুগোষ্ঠীতেই গল্প করিতে পারে—কিন্তু তাহাও আর এখন পারে না। কথা যে কানে স্পষ্ট শুনিতে পায় না সে আলোচনা করিবে কিরূপে? সে ভাবে, মানুষের সঙ্গে কথা কহিবার মত মানুষ সে আর নাই। অবশ্য নিরঞ্জনের মন ভাঙে নাই, কিন্তু দেহ ভাঙিয়া গিয়াছে।

অমিত নিরঞ্জনের কাছে গিয়া দাঁড়াইল : তারপর?

ক্লান্ত মুখে শান্ত হাস্য ফুটিল : যাও।

অমিত বলিল : এসো তুমিও।—অমিত হাত ধরিল।

নিরঞ্জন হাসিল, বলিল, একসঙ্গে? যেতে দেয় কে বলো?

হাতের মধ্যে হাত কাঁপিয়া উঠিল। মৃদুভাবে মন্থরবাহী রক্তস্রোত শীর্ণ হস্তের মধ্য দিয়া অমিতের মন্থরবাহী রক্তস্রোতের সঙ্গে প্রতিবেদন জানাইয়া গেল।

অমিত বলিল, ছেড়েই বা থাকবে ক-দিন, দেখব!

চক্ষে চক্ষে চাহিয়া দুইজনে বিদায় লইল, এবার হইতে দুইজনে দুই দিকে চলিবে। কিন্তু দিন তো শেষ হয় নাই; চলার পথের পথিকদের ঐক্য তো এখনো প্রয়োজনীয়। বরং আরও তাহা নতুন করিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে সমস্ত পক্ষ হইতে। 'মস্কোও তাহা ঘোষণা করিয়াছেন সেভেনথ্‌ কংগ্রেসে', জানাইবেন বিভূতিবাবু, জানাইত সুনীল দত্ত,—জানে তাহা অমিত। আর বাঙালী 'স্টর্ম ট্রুপার', বাঙালী দিগ্বিজয়?...তাহা দুরাশার পরিহাস মাত্র ইহাও জানে অমিত। ইহাও নিরঞ্জন বোস বুঝিবে। কোথায় থাকিবে সেই স্বপ্ন যদি দুইজনা একসঙ্গে দাঁড়ায় ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের সহ-সৈনিকরূপে? সেই যুদ্ধের তাহারা সহযোদ্ধা ইহাই তো প্রধান কথা।

অনেকের সঙ্গে অমিতের দেখা হইল না। বিভূতিবাবুদের কোণটিতে কেহ নাই। বই খোলা রহিয়াছে, পড়িতে পড়িতে কোথাও তাঁহারা উঠিয়া গিয়া থাকিবেন। এখানে আসিয়াই ক্লাস খুলিয়া বসিয়াছে বিভূতি রায়, এই কয়দিনের জন্যও একটা ক্লাস চাই! কি পড়িতেছিল? অমিত সোৎসুক দৃষ্টিতে একবার দেখিল, 'লেনিনিজিম্‌।' বিচার বিতর্ক সমালোচনা,—আর উৎসাহ, বন্দিশালায় দিনের পর দিন ইঁহারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ইঁহারা আজ কর্ম-মুখর, অন্যরা শ্রান্ত। অন্যরা জেলের বাহিরে যাইতেছে যেন একটা ব্যর্থতার বোঝা মাথায় লইয়া—ইহারা বাহিরে চলিয়াছে এক নতুন সত্যের উপলব্ধি লইয়া। তাই অসহিষ্ণুতা, উগ্রতা ও শ্রীহীনতা ইহাদের একদিন যেরূপ পাইয়া বসিতেছিল, আজ আর তাহা নাই। বিভূতিবাবুদের মতো আন্দামান-প্রত্যাগতরা এই সাম্যবাদের পথে আসিয়াছেন, আসিতেছে শ্রেষ্ঠ যুবকেরা, প্রাণবান বলিষ্ঠপ্রকৃতি মানুষেরা — অনেকেই প্রিয় বন্ধু অমিতের। তাহারা স্নেহভাজন কিন্তু অমিত তাহাদের সহিত যোগদান করে নাই। বিভূতিবাবুদের রাতদিন ক্লাস করিয়া পড়া চলিতেছে; লেখাও তাহারা শিখিতেছে; তর্কসভা করিতেছে। ইতিহাসের কলধ্বনি শুনিতেছে কি অমিত? এ যৌবন-

জলতরঙ্গ রোধিবে কে?...অমিত, তুমি কি ইহাদের কেহ নও? সুনীলের সেই উগ্র তিরস্কার কি সত্য?

ভুজঙ্গ সেন নিজের ঘরেই ছিলেন। বড় ওয়ার্ডটা চট দিয়া ঘিরিয়া তিন-তিন জনের এক-একটি 'ঘবে' বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহার মধ্যেও নিজের একটু বৈশিষ্ট্য ও স্বামিত্ব কেহ কেহ স্থাপন করিতে পারেন—তিনজনী বেড়ার মধ্যেও নিজস্ব একটি কিউবিক্‌ল্‌ রচনা করিয়া লন। অবশ্য কর্তৃপক্ষের আপত্তি না থাকা চাই। ভুজঙ্গ সেনের ক্ষেত্রে আপত্তির প্রশ্ন ছিল না। তিনি সম্মানিত 'দাদা', অন্যান্য বার তিনি ছিলেন 'গোরা ডিগ্রিতে', একটি সেলে একা থাকিতেন। এবারও দীর্ঘদিন ভারতের কোনো কারাগৃহে অবরুদ্ধ থাকিয়া এখন বাঙলার জেলে ফিরিয়াছেন। বন্দীমহলে তাঁহার অনুচর অনেক, সম্ভ্রম প্রায় পূজার সমতুল্য। অমিত তাহার সহিত বেশি পরিচয়ের সুযোগ পায় নাই, তবু অমিত ইহা বুঝিয়াছে সত্যই ভুজঙ্গ সেন পূজনীয় লোক। বিদ্যা আছে, বুদ্ধির প্রখরতা আছে, ভুজঙ্গবাবুর বাক্যালাপে নূতনত্ব আছে।—বুদ্ধির অপেক্ষাও চতুরতা তাহাতে বেশি। নিক্তির মাপে তাঁহার আপ্যায়ন বাড়ে কমে—পাত্রভেদে এবং নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী। তিনি ব্যক্তিত্ববান লোক। কিন্তু বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ বহুদর্শী ভুজঙ্গ সেন এই সত্যটা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সত্যকারের বুদ্ধির প্রমাণ বুদ্ধির বাহাদুরিতে নয়; আত্মশক্তির প্রমাণ নয় আত্মশ্লাঘা। হয়তো বহু বহু কাল ধরিয়া একনিষ্ঠ অনুচর-সমাজে আপনার অবিসংবাদিত বুদ্ধি ও শক্তির খ্যাতি শুনিতে শুনিতে ভুজঙ্গ সেন নিজেও বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন—তাঁহার শক্তি অতুলনীয়; আর তাহা নিরঙ্কুশরূপে প্রকাশ করাই মানুষকে তাহা জানাইবার উপায়. তাহাতেই ব্যক্তিত্বেরও পরিচয়। সকলে তাঁহার কথা মানিবেই তো। কারণ সাধারণ মানুষ ব্যক্তিত্বহীন, ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে তাহারা না মানিয়াই পারে না। 'লোক' না 'পোক',—পূর্ববঙ্গীয় এই প্রবাদ তাঁহার নিজেরও স্থির অভিমত। লোকেতে ও পোকাতে কিছু তফাত নাই—তফাত ঘটে ব্যক্তিত্বের বশে। ব্যক্তিত্ব অর্থই—আত্মার বৈশিষ্ট্য। ভুজঙ্গ সেন অধ্যাত্মবাদী। তিনি তাই জানেন—যে সর্বাত্মা তাবৎ চরাচর ব্যাপিয়া প্রকাশিত,—অন্নময়, প্রাণময় কোষ হইতে উঠিতে উঠিতে প্রজ্ঞানময় চৈতন্যের মধ্যে যে আপনাকে উপলব্ধি করিবার মহাযাত্রা শুরু করিয়াছে—ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যে তাঁহারই বিশেষ বিশেষ আত্মপ্রকাশ মাত্র। আর তাহাতেই বিশ্বের অভিব্যক্তি, ইতিহাসের প্রগতি, ব্যক্তিরও জন্মজন্মান্তর বাহিয়া অনন্ত সাধনার মধ্যে ক্রমিক আত্মবিবর্তন, বুদ্ধত্বলাভ, পরমচৈতন্যে প্রতিষ্ঠা। ইহাই দিব্যপথ, নব্য-ভারতের হিস্‌টোরিকাল্‌ আইডিয়ালিজম্‌—'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' বা পাশ্চাত্য দানব-সত্য ইহা নয়। ব্যক্তিত্ব তাই শুধু ব্যক্তির পরিচ্ছদ নয়, উহা আত্মারই আত্মপ্রকাশ এই 'আত্মবোধ'ও ভুজঙ্গ সেনের আছে। ইহাও জানেন তিনি-নিম্নতম প্রকৃতিকে ইহা মানাইয়া লওয়াইতে হয়,—প্রাণশক্তি দেখাইয়া, বিজ্ঞান-বিভূতির সাহায্যে। যে প্রকৃতি যেভাবে গঠিত তাহাকে সেভাবেই আত্মপ্রভাবে

আনিতে হয়। এক কথায়—'চাল' দিতে হয়, ইহাই রাজনীতিতে 'ভুজঙ্গীয় অধ্যাত্মবাদ'। ভুজঙ্গ সেন স্বল্পভাষী নন, একটু বেশি-ভাষীই—কিন্তু প্রয়োজন হইলে ও পাত্রভেদে। ভুজঙ্গ সেনের মুখে-চোখে চাতুর্য আছে, মর্যাদা নাই; কথায় দাম্ভিকতা আছে, গাম্ভীর্য নাই। এই চাতুর্যকেই তিনি বুদ্ধি বলিয়া জাহির করেন এবং দাম্ভিকতাকে ব্যক্তিত্বরূপে দাঁড় করাইতে চাহেন নাতিসূক্ষ্ম আত্ম-কীর্তনে। স্বাভাবিক ভাবেও তিনি মানুষের চিত্তে মর্যাদা উদ্রেক করিতে পারিতেন; কিন্তু উহা উদ্রেক করেন 'চালের মাথায়' চলিয়া—আপনাকে সচেষ্টভাবে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া। একা ও স্বতন্ত্র তিনি থাকেন;—সকলের সঙ্গে আলাপও নিজ হইতে করিবেন না; কথা বলিবেন মাপিয়া মাপিয়া। না হইলে ব্যক্তিত্ব সস্তা হইয়া যায়।

'আসুন।'

অমিত ঘরে ঢুকিতে হেলান-দেওয়া ডেকচেয়ারে ভুজঙ্গ সেন একটু টান হইয়া বসিলেন—উঠিয়া দাঁড়াইলেন না, দাঁড়ানো তাঁহার ব্যক্তিত্বের রীতি নয়। সেইভাবে বসিয়াই একবার হাত বাড়াইলেন কাঠের চেয়ারটা ছুঁইবার জন্য—অমিতকে তাহাতে বসিতে দিবেন, তাঁহার শিষ্টাচারের মাপকাঠিতে এইটুকু অমিতের প্রাপ্য।—বসুন। —ভুজঙ্গ সেন নাতিউৎসাহে বলিলেন।

কোথায় বসিবে, ঠিক নাই। অমিত বলিল, বসব কি করে? সময় হয়েছে।—

ভুজঙ্গ সেনের নিকটে আসিয়া অমিত চেয়ারের হাতলে একটা হাত রাখিয়া দাঁড়াইল। ভুজঙ্গবাবুর আর চেয়ারটা ছুঁইবার চেষ্টা করার প্রয়োজন রহিল না। অমিত দেখিল, সেই টেবিলের উপরে মাসারিকের 'মেকিং অব দি স্টেট্' রহিয়াছে। সাত দিন আগেও সেখানে অমিত তাহা দেখিয়াছে। সেদিনও বুক মার্ক যেখানে ছিল,—শতখানেক পৃষ্ঠার শেষে,—মনে হয় এখনো সেইখানেই আছে। পার্শ্বেই শ্রীঅরবিন্দের 'লাইফ্ ডিজাইন' ও হিট্লারের 'মাইন কাম্ফ্', এডিংটনের 'নেচার অব দি ফিজিক্যাল ওয়ার্লড' ও রাধাকৃষ্ণনের 'হিন্দু দর্শনের ইতিহাস'। ভুজঙ্গ সেন চিন্তাশীল পাঠক।

ভুজঙ্গবাবুর বলিলেন: দশটায় যেতে হবে? এখন সাড়ে ন-টা? তা হলে তো সময় নেই। আমারও সময় হয়ে এল স্নানের।—তবু চেয়ারের হাতলেই ততক্ষণ বসিয়াছে অমিত।

তারপর? ওটা কিন্তু করলেন না?—বলিলেন ভুজঙ্গ সেন।

আপ্যায়নের সূত্র হিসাবে ভুজঙ্গ সেন দিন পাঁচেক পূর্বে অমিতকে যুবকদের জন্য একটি পাঠ্যপুস্তক তালিকা প্রণয়ন করিতে বলিয়াছিলেন। 'ঢোকাবেন না-হয় মার্কস লেনিনের বই তাতে।'

অমিত বলিল: না, না।

না কেন? পড়বে বৈকি ছেলেরা ওসব।

পড়ুক কমিউনিজম্ ছেলেরা;—ভুজঙ্গ সেন তাহাতে ভয় পান না। কি ভয়?

'যখন আমাদের দেশ, আমাদের অধ্যাত্ম-সম্পদ ও রাজনৈতিক আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া 'আমরা' প্রোগ্রাম দিব—'তখন তাসের ঘরের মতো ভেঙে যাবে এসব 'ইজম্।'

অমিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সে প্রোগ্রাম কোথায়? তৈয়ারি করেছেন কি?

রহস্য-সূচক হাসি হাসিয়া ভুজঙ্গবাবু জানাইয়াছেন—আছে। অমিতেরাও পাইবে। তবে জেলে নয়।—এখানে পলিটিক্স্‌টা কি? 'যেখানে দশ জনের মধ্যে ন'জন স্পাই বা গর্দা মাল।'—ভুজঙ্গ সেন এই সব বাজে লোক লইয়া পলিটিক্স্‌ করেন না। তবে এখানকার ছেলেগুলিকেও তৈয়ারি করিতে হইবে। তাহা ছাড়া দেখাই যাউক না অমিতেরও বিদ্যাবুদ্ধি—সে ছেলেদের পাঠ্য-তালিকা কেমন প্রণয়ন করে। সেই পাঠ্য-তালিকারই তাগিদ এখন দিলেন ভুজঙ্গ সেন।

অমিত চেয়ারের হাতলে বসিয়া জানাইল, সে আর পুস্তক-তালিকা তৈয়ারি করিবার সময় পাইল না। আর, উহার প্রয়োজনই বা কি আছে? যুবকেরাও সকলেই তো বাহিরে চলিয়াছে এখন।

তা ঠিক। আর তা ছাড়া এবার নিয়ে দেখলাম এতবার। শতকরা দশটিও টিকে না—জেলের পলিটিক্স্‌ জেলেই শেষ।

ভুজঙ্গবাবু নিজের অভিজ্ঞতা বলিতে লাগিলেন। যাহারা সরকারের সাপ্লাই করা 'লাল কেতাব' লইয়া এত মাতামাতি করিয়াছে, তাহারাই তো প্রথম বাহিরে গিয়াছে, যাইতেছে। ভিতরের বস্তু শেষ না হইলে এত সহজে তাহারা বাহিরে যাইতেও পারিত না। অমিতও গিয়া তাহাই দেখিবে। অবশ্য আগে বাহির হইয়া যাইবার একটা সাময়িক রাজনৈতিক সুবিধাও আছে। আগেই গিয়া উহারা দল বাঁধিতে পারিবে।

এই ইঙ্গিত অমিতের পক্ষে দুর্বোধ্য নয়। রঘুও আবার খাবার তাগিদ দিতে আসিয়াছে। তাই চেয়ারের হাতল হইতে স্মিতমুখে অমিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল: রাজনীতি থাক। রুজি-রোজগারের কী হয় তাই এখন দেখি গিয়ে—

ভুজঙ্গ সেন হাসিলেন। অর্থাৎ বিশ্বাস করিলেন না অমিতের কথা।—এতটুকু লোকচরিত্র কি তাঁহার জানা নাই? রুজি-রোজগারের আসল পথই তো রাজনীতি। না হইলে ধনকুবেরেরা পলিটিক্সে টাকা ঢালেন কেন? তবে একটু বিপদসঙ্কুল এই পথ। কিন্তু বিপদ আছে বলিয়াই তো লাভও বৃহৎ। যাহাই বলুক অমিত, অমিতের লক্ষ্য কি?—কর্পোরেশন? কোনো ক্ষমতাবান জাতীয়তাবাদী পত্রের সম্পাদকত্ব? অ্যাসেমব্লির সদস্যপদ? কী চায় অমিত? কোন্‌ টোপ সে গিলিবে? কোন্‌ সৌজন্য বা বদান্যতা দিয়া তাহাকে গাঁথিয়া তুলিতে হইবে এই প্রোফেসার-মার্কামারা লোকটাকে?

ভুজঙ্গ সেন বলিলেন: যান।—এবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন ভুজঙ্গ সেন,—স্নানের উদ্যোগ করিবেন, অমিতকেও শিষ্টাচার দেখাইবেন,—যান।—তবে আমরাও আসছি।—জোর দিলেন 'আমরা' শব্দটুকুর উপর, যাহাতে বুঝিতে বাকি থাকে না এই 'আমরা'র সামনে তোমাদের তাসের ঘর ভাঙিয়া যাইবে। ইঙ্গিতপূর্ণ কথাটি

বলিয়া ভুজঙ্গবাবু স্নানের তোয়ালে লইতে গেলেন, মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিলেন—অমিতের দিকে চাহিয়া। অমিত বুঝিল, হাস্যমুখে সহজভাবে বলিল : শীগগির আসুন আপনারা;—নইলে কিছু হবে না দেশের।

...মানুষ লইয়া খেলা,—আগুন লইয়া নয়, মানুষ লইয়া খেলা—ইহাই কি ইতিহাস, অমিত? আর ইহারই নাম ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সাধনা? তাহার আধ্যাত্মিকতা, তাঁহার নতুন কালের 'হিস্টোরিকাল আইডিয়ালিজম্'—এডিংটন-অরবিন্দ-শ্রীশ্রীচণ্ডী...

নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল অমিত।

দেরি নাই আর। মাত্র এক মিনিটের মতো কথা বলিবার সুযোগ আছে শেখরের সঙ্গে। দুইজনে কেহ উল্লেখ করিল না...কিন্তু একটি অদৃশ্য মুখ দুই জোড়া বেদনাস্তব্ধ চক্ষুর মধ্যে ফুটিয়া রহিল...সুনীলের চোখ...

ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস বিশেষ অধীতব্য বিষয় করিয়া শেখর অমিতের তাড়ায় এম-এ পরীক্ষা দিল। অনেক কষ্টে একবারের মতো হকি ও ফুটবলের ব্যস্ততার মধ্যেও সে সময় করিয়াছে। সুনীল তাহাতে প্রীত হয় নাই। জেল হইতেও শেখর ফার্স্ট ক্লাস আদায় করিতে পারিল। ফার্স্ট'ই হইত, কিন্তু হয় নাই। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত অধ্যাপনা ছাড়াই যদি কেহ এই সম্মান লাভ করে তাহা হইলে অধ্যাপকদের পক্ষে তাহা লজ্জার কথা হয়। আরও কারণ ছিল, ফার্স্ট হইয়াছে একটি মেয়ে—'লেডিজ ফার্স্ট' বহুদিনের নীতি বিশ্ববিদ্যালয়েরও। নিতান্ত কর্তাদের পুত্র বা জামাতা না থাকিলে কবিধর্মী অধ্যাপকেরা এই নীতি পালনেই তৎপর হন। লেডিজই হউক, কিংবা হউক যে কোনো জামাতা ফার্স্ট, শেখরের তাহাতে যায় আসে না। শেখরের পরিচয় হউক হকিতে, সে অপরাজেয় মিলিটারি ড্রিলে। 'এসে' পেপারে সে বিলাত-ফেরতা যুবক পরীক্ষককে চমক লাগাইয়াছে। শেখরের নিকট সে সংবাদও আসিয়াছিল—ভ্রাতৃগর্বিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতা হইতে শেখরকে লিখিয়াছে; তাহাতে শেখরের একটু তৃপ্তি আছে। অমিতদার নিকট তাহার সেদিনের সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব ও ভারতবর্ষের ব্রিটিশ-শাসনের বিশ্লেষণ পাঠ ও আলোচনা তাহা হইলে বৃথা হয় নাই। কিন্তু সুনীল তাহাতে আরও ক্ষুব্ধ হইয়াছে। শেখরেরও অতৃপ্তি বাড়িয়া গিয়াছিল—এদেশে এমন বিশ্ববিদ্যালয় কোথাও কি নাই যেখানে যুদ্ধবিদ্যার ইতিহাস অধ্যয়নের কোনো ব্যবস্থা করে? না হইলে কি লাভ হইবে শেখরের? আর তাহার সহযোদ্ধা সুনীলের? তাহারা প্যারেড করিতেছে; সৈনিকের জীবনের জন্য তৈয়ারি হইতেছে। খেলা আর প্যারেড, প্যারেড আর খেলা—ইহাই তাহাদের রুটিন। ছোটখাট মিলিটারি রেগুলেশনের বই পাইয়া বুভুক্ষুর মতো শেখর তাহা আয়ত্ত করিয়াছে। পড়িয়াছে হ্যামস্‌ওয়ার্থের মহাযুদ্ধের ইতিহাস, চার্চিলের 'ওয়ার্লড ক্রাইসিস্'। অমিতের সাহচর্যে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি হইতে দুষ্প্রাপ্য 'সেভেন্ পিলার্স অব্ উইস্‌ডম্' আনাইয়া পড়িয়াছে, গরিলাযুদ্ধের রীতিনীতি বুঝিয়াছে। ছাত্তা-পড়া, পাতা-না-কাটা ক্লাউজভিট্‌জ

লইয়া বসিয়াছে; টাইমস্ ও স্টেটস্‌ম্যানের মিলিটারি সংবাদ-দাতার সন্দর্ভের কাটিং করিয়াছে—'সম্ভবত লিডল হার্টের লেখা'। ভারতবর্ষের সীমান্তের ভৌগোলিক আর উপজাতিক অবস্থা লইয়া মাথা খুঁড়িতেছে। অমিতদা বলিতেছেন—মহাযুদ্ধ আসিয়া গেল। এতই যদি তাহাদের যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ে আগ্রহ তাহা হইলে আজ দাসখত লিখিয়া বাহির হইয়া পড়ুক—যুদ্ধের মুখে ইহার পর অপ্রস্তুত হইতে হইবে না। ...না, অমিতদা কেবল সংশয়ই জাগাইয়া দেন। শেখরদের মনেও সন্দেহ জাগান—তাহাদের এই প্যারেড ও জঙ্গিপনার স্বরূপ কি? তাহা শেখর ও সুনীল বুঝে কি? তাহারা কি চায়—ব্লাঙ্কিজম? ক্যা-দে-তা?

শেখর অত তর্কের কচকচিতে যাইবে না। সে বিচার বিতর্ক করিবেন বয়োর্দ্ধরা—অমিতদারা। শেখরেরা, সুনীলেরা হইবে সৈনিক—স্বাধীনতার শাণিত অস্ত্র—দ্বিধাহীন দ্বন্দ্বহীন অস্ত্র।

শুধু এই?—অমিত পরিহাস করিয়াছে,—মানুষকে অস্ত্রে পরিণত করলেই কি যুদ্ধজয় করা যায়? না, মানুষ তাতে সার্থক হয়? মানুষ তো যন্ত্র নয়, সে যন্ত্ররাজ; —তাই সে জয়ী।

শেখর বা সুনীল কিছুতেই অমিতদার এইসব কথা মানে না।—'লাল কেতাব' তাহারা ছুঁইবে না—শেখরও না, সুনীলও না। কিন্তু অমিত জানে শেখরের অতৃপ্তি অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিণত হইতেছে। স্পেনে ইণ্টারন্যাশনাল বিগ্রেডের আত্মদান তাহাদের সংবেদনশীল চিত্তকে মথিত করিতেছে। তাই শেখর যতটা জোর করিয়া অমিতকে এই সব বিষয়ে আঘাত করিতেছে তাহার চতুর্গুণ জোর দিয়াই সে আপনার পুরাতন বিশ্বাসকে, পুরাতন কর্মপদ্ধতিকে আঘাত দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তারপর? সুনীলের সঙ্গেও শেখরের বাক্যালাপ বন্ধ হইয়া গেল! অমিত জানে—'সল্' হইবে 'পল্'; তেমনি দৃঢ়ব্রত, অক্লান্ত এবং কর্মোন্মাদও। কর্মোন্মাদ—উহাই বিপদও শেখরদের লইয়া। যুদ্ধ লইয়াই বা শেখরের এত মাতামাতি কেন?

'যুদ্ধ রাজনীতিরই সম্প্রসারণ—অন্যবিধ বলে'। এ কথা তুমি মানো?—অমিতকে শেখর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

আমি কে? তবে যুদ্ধশাস্ত্রীরা মানে।

কিন্তু যুদ্ধের মূল 'বল' কী? অস্ত্র না অর্থ, মনোবল না জনবল? 'প্রুশিয়ান যুদ্ধনীতি', না 'লাল ফৌজের যুদ্ধনীতি,?

সর্বনাশ, এ তর্ক এখন?—অমিত বলে।

তর্ক বাইরের জন্য জমা থাকবে; এখন চাই উত্তর।

ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে দাঁড়াইয়া থাকে স্ফিঙ্কস—'উত্তর চাই', 'উত্তর চাই'।

অমিত হাসিয়া বলে: তা হলে শোনো স্ফিঙ্কসরূপী শেখর,—যদিও আমি জানি এই শক্তিচয়ের ডায়েলেকটিক্যাল দ্বন্দ্ব সমন্বয়েই জয়, তবু জানি মানুষকে যুদ্ধ-যন্ত্রে পরিণত করে যুদ্ধজয় হয় না, মানুষকে যন্ত্ররাজ করেই যুদ্ধজয় সম্ভব হয়। আর তাই সর্বকালের স্ফিঙ্কসেরই প্রশ্নের উত্তর এক :—'মানুষ'।

সেই পথ ধরিয়াই তবে শেখর চলিবে, সৈনিকের নামে যন্ত্র গড়িবে না, মানুষ গড়িবে। আর বন্ধু সুনীলের সঙ্গে তাহার বাক্যালাপ তখন বন্ধ হইয়া গেল। সুনীলই তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

যুবক শেখর, স্থিরচিত্ত, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, হয়তো বা স্থিরপ্রজ্ঞ সে এই অস্থির যুগে। আর সুনীল—অস্থির যুগের উদ্দাম অধীর যাত্রী, উল্কার আলোতে যার পথ চিহ্নিত। চিরন্তন সৈনিক তাহারা দুইজনেই ইতিহাসের রক্ত-পিচ্ছিল পথে ...এমনি উহারা। ভুজঙ্গ সেন জানেন কি—ইহাদের 'দশজনের নয়জনই' এইরূপ উদ্দাম প্রাণ লইয়া এখানে আসিয়াছিল?—কিন্তু কেন প্রাণ লইয়া তাহারা ফিরিয়া যাইবে? আর কোন প্রাণই বা রাখিয়া যাইতেছে তাহারা—যাহারা ফিরিল না—যাহারা আর ফিরিবে না—যাহারা ফিরিবে না—যাহারা ফিরিবে না...

শেখর ও অমিত, দুইজনের দুই জোড়া চক্ষের মধ্যে একটি অদৃশ্য মূর্তি ভাসিয়া উঠিল এই নিমেষে...সুনীল......

এক মুহূর্তে যেন অমিতের মুখ নীরক্ত হইয়া গেল, চক্ষু নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল, নির্বাপিত হইয়া আসিল চক্ষের আলো...সুনীল...সুনীল...মনে পড়িল, ফিরিবে না।

অমিতকে শেখর প্রণাম করিতে গেল—তাহার চক্ষুভরা জল।

জ্যোতি রাগ করিয়া বলিল, দেখা আর শেষ হয় না। এদিকে দশটা বাজে। জেল ছেড়ে যেতে চাও না? এমন কি রেখে গেলে পিছনে?

কী রাখিয়া গেলে পিছনে, অমিত? কী রাখিয়া গেলে পিছনে—প্রাণ? প্রাণের পরাজয়? না, প্রাণের পাথেয়?

অমিত সবিষাদ হাসি হাসিল, বলিল: চলো, খেতে খেতে না হয় শুনবে তা।

জ্যোতির্ময়ের পক্ষে রাগ করা স্বাভাবিক। অনেকের অপেক্ষা সে অমিতের আপন। বাহিরে আপন, ভিতরেও আপন। যাহারা মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া আনন্দ লাভ করে জ্যোতিও তাহাদেরই দলের মানুষ। সেই মৃত্যুর জুয়া খেলিতে খেলিতে তবু সে বাঁচিয়া গিয়াছে, আসিয়া ঠেকিয়াছে এই অচল স্রোতের কর্মনাশা ঘাটে। এখানে করে কি জ্যোতি? খেলা? প্যারেড? ব্যায়াম? কসরত?

অনেক যুঝিয়া, বুঝিয়া ভালো করিয়া, জ্যোতি ঝাঁপাইয়া পড়িল নতুন এক প্রবাহে—সে পড়িবে, লিখিবে, জানিবে, বুঝিবে। অমিত তাহার আবেদন অস্বীকার করিতে পারিল না। তখনো বন্দিজীবনের প্রথমার্ধ মাত্র। জ্যোতির আগ্রহ অমিতের আশাকে ছাড়াইয়া গেল। সেই সূত্রেই বন্ধুমহলে দেখা দিল কৌতুক, বিস্ময়, সংশয়, পরে অমিতের বিরুদ্ধে বিরোধিতা। কিন্তু অগ্রজ, অনুজ, সহকর্মীর সকল ঘৃণা বিদ্বেষ মাথায় লইয়া জ্যোতি শুধু অমিতের পার্শ্বেই দাঁড়াইল না, তাহার অগ্রে গিয়াও দাঁড়াইল। সে ঘোষণা করিল—'যুদ্ধং দেহি';—জগৎ সত্য—ব্রহ্ম মিথ্যা। বস্তু ছাড়া সত্য নাই, আর মার্কস সেই বস্তু-ব্রহ্মের প্রবক্তা। কমিউনিজমই পথ আর কোমিন্টার্নই গতি।

অমিত তাহাকে বারে বারে বলিতে চাহিল : ধীরে জ্যোতি, ধীরে—

কিন্তু ধীরতা, লাভ-ক্ষতি গণনা করিয়া জ্যোতি চলে না। সর্বস্বপণই তাহার স্বভাব। সেই সর্বস্বপণের নেশায় সে সমুত্তীর্ণ হইতে পারে অনেক পরীক্ষা...উত্তীর্ণও হইয়াছিল, জ্যোতি মুখ ফুটিয়া না বলুক, অমিত তবু জানিয়াছে।—জেনানা ফটকের দুয়ার দিয়াই এক বৎসর আগে মিনতি রায় বাহির হইয়া গিয়াছে। অন্য মেয়েরাও কে কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে।...জ্যোতি আর মিনতি, দুই জনাই দুইজনকে না বুঝিয়া একদিন বরণ করিয়াছিল এক দুর্জয় ব্রত উদ্‌যাপন করিতে করিতে। হৃদয় সত্যটা তাহারা যখন বুঝিল, তখন আরও জোর করিয়া মুখ ফিরাইয়াছে দুই দিকে—ব্রতটাই সত্য ; হৃদয়ের দৌর্বল্য দিয়া তাহা খাটো করা আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। জ্যোতির্ময় আজ জানে—ব্রতের নামে হৃদয়কে অস্বীকার করাও আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। কিন্তু এই নূতন সত্য কি মিনতি জানিয়াছে?... সম্ভবত। নয় শত মাইলেরও ওপার হইতে জ্যোতি তাহা মিনতিকে জানাইতে পারিয়াছে ; সম্ভবত মিনতিও তাহা জানিয়া লইয়াই এই ফটক দিয়া বাহিরে গিয়াছে।

সেই মিনতি অমিতদার কাছে আসবে—'আজই, কালই।' মৃদুকণ্ঠে, পরিচ্ছন্ন লজ্জার সহিত জানায় জ্যোতি।—কিন্তু না আসিলেও অমিতদা তাহাকে সংবাদ দিবেন তো?...

কি সংবাদ দিবে, অমিত? মিনতিকে কি জানাইতে চায়, জ্যোতি?—জ্যোতি মনে করিতে পারে না।

...'বোলো, জ্যোতি তাকে ভোলে নি', না?—অমিত মনে মনে বলে।

মিনতি জানে, জ্যোতি তাহাকে ভোলে নাই। কিন্তু জ্যোতি তাহা মিনতিকে জানাইবে কিরূপে? অমিতকে পাওয়াই যায় নাই।...সে রাগ করিতেছিল অমিতের উপর।

অমিত সস্নেহ কৌতুক মনে অনুক্ত সেই কথাটুকু উপভোগ করিতে লাগিল—সত্যই জ্যোতি রাগ করিতে পারে। যে কথা বলিবার জন্য সে আজ তিন ঘন্টা ধরিয়া অবসর খুঁজিতেছে—বিছানাপত্র বাঁধিতেছে, অমিতের কাছ ছাড়িতে চাহে না, সে কথাটাই বলিতে পারিতেছে না লোকের ভিড়ে। খাইতে বসিতে বসিতে অমিত জ্যোতির কথার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

জ্যোতি বলিল : পাওয়াই যায় না তোমাকে। বিভূতিবাবুরা এসে বসেছিলেন।

এই কথা? এই কথা বলিবার ছিল জ্যোতির? এইজন্য জ্যোতির এতটা অভিমান! মনে মনে অমিত বলে, না, না, জ্যোতি,—বৃথা কেন সময় নষ্ট করিতেছ? মুখে বলিল : আমি বিভূতিবাবুদের ওখানে গিয়ে ফিরে এলাম যে। আচ্ছা দাঁড়াও, খাওয়া শেষ হলে একবার চট করে আবার ঘুরে আসব। রঘু দ্যাখ তো বিভূতিবাবুরা কোথায়?

জ্যোতি বাধা দিল,—দেখতে হবে না। আমি খবর পাঠিয়েছি, এসে যাবেন এখনি।

সত্যিই বিভূতিবাবু ও রবি গুপ্ত তখনি আসিলেন। কিছুই আর জ্যোতি বলিতে পারিল না। অমিত উঠিয়া দাঁড়াইতে গেল, বিভূতিবাবুদের বসাইয়া আবার খাইতে বসিল।

বেশি কথার সময় নেই—বেশি কথার প্রয়োজনও নেই।

বিভূতিবাবু তাই সরাসরি বলিলেন, আমাদের কথা তো জানেন, আপনার কাছে গোপন করবারও কোন কারণ নেই। আপনার মত জানতে চাই।

অমিত শান্তভাবে হাসিয়া বলিল, আমার মত তো জানেনই আপনারা—সে মতাদর্শ বদলায় নি।

কিন্তু বিভূতিবাবুদের নিকট কথাটা পরিষ্কার হইল না। আরও স্পষ্ট করিয়া তাঁহারা অমিতের পথ জানিতে চাহেন।

বিভূতিবাবু বলিলেন, তা জানি, তবু ভবিষ্যৎ-নীতি, কর্মপন্থা, পার্টি—

অমিত একটু নীরব রহিল। তারপর বলিল : ধোপে কি টিকবে, না টিকবে জানি না; বড় কথা বলে কি লাভ হবে—কর্মক্ষেত্রে যদি আমাকে খুঁজে না পান?

কর্মেই তো মতাদর্শের পরীক্ষা : ওন্‌লি ইন অ্যাক্‌শ্‌ন ডু উই লিভ, ওন্‌লি ইন অ্যাক্‌শ্‌ন...

কর্মক্ষেত্রেই পরিচয় কর্মীর।

কথাটা ইহার বেশি স্পষ্ট হইল না। বিভূতিবাবুরা তাই সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না। কেন পারিতেছেন না, অমিত তাহা বুঝিতে পারে না। ইহারা মানুষ ধরিতে চান? পৃথিবী জোড়া মানুষের অভিযান গড়িতে হইবে আজ। সেখানে কী অমিত? কতটুকু সে? কেন অমিতকে লইয়া ভাবেন? ভাবেন না কেন সম্মিলিত অভিযানের কথা?—সমবেত কার্যক্রম, উহার আয়োজন?

বিভূতিবাবু বলিলেন : ভাবছিলাম, এ দেশের সম্মুখে এ যুগের স্বরূপ যদি আপনার মত ইন্‌টেলেকচুয়ালরা প্রকাশিত করবার ভার নেন- -

আমি ইন্‌টেলেকচুয়াল!

তা নয় তো কী?—অমিত চুপ করিয়া রহিল। ..ইতিহাসের এই বিপ্লবী গতির মহিমা...'এ যুগের দৃষ্টি, এ যুগের সৃষ্টি' এ যুগের মানুষের পরিচয়.. বিপ্লবময় শতাব্দীর মহিমা ..কে বুঝিতে পারে? কে তাহা বলিতে পারে সার্থক রূপে?

অমিত বলিল : যদি যোগ্য হই, যদি ভার পাই—

যদি...যদি...যদি ইন্‌টেলেকচুয়ালদের এরূপই স্বভাব।

না, অমিতবাবুকে কোনোখানে যেন ধরা ছোঁয়া যায় না।—বিভূতিবাবুরা নিরাশ হইলেও সৌহার্দ্যের সহিত নমস্কার বিনিময় করিয়া চলিয়া গেলেন। মনে মনে বুঝিলেন, পাকা লোক অমিতবাবু, আর নিশ্চয়ই বড় রকমের দাঁ মারিবার সুযোগ দেখিবে। কর্পোরেশনের সভ্যপদ—?

জ্যোতির দিকে অমিতের চোখ পড়িল; সে গম্ভীর। অমিত হাসিয়া বলিল : কি জ্যোতি, কি বলো?

না, কিছু না।

অন্যায় বলেছি কিছু?

না। বরং অন্যরূপ বললেই অন্যায় করতে।—জ্যোতি গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। অমিত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। হঠাৎ শুনিল: একটা কথা ছিল আমার—

আহার-শেষে অমিত উঠিতেছে, অমনি উৎসুক হইল। বলিল: তাড়াতাড়ি বলো জ্যোতি, লোকের ভিড়ে তোমার সঙ্গে কোনো কথাই হল না।...নিজের কথাটা তবু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না বেচারা জ্যোতির্ময়! শেষে জ্যোতি বলিল, তাই সংক্ষেপে বলছি—তারপর এক মুহূর্ত থামিল, পরে বলিল: তুমি পলিটিক্স্ ছেড়ে দাও—

অমিত থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। আর একটি প্রার্থনা—ও প্রীতিপূর্ণ অনুনয়—প্রাণময় আর একটি অনুজের এমনি সনির্বন্ধ অভিমান মনে পড়িল...আবার মনে পড়িল সেই গম্ভীর ট্রাজেডি। এক গভীর শপথ আপনার কাছে আপনার...

জ্যোতির্ময়কে অমিত বলিল: কেন, বলো তো?

তুমি পলিটিক্সের অযোগ্য।

বেশ তো—'আমি নাই বা হলাম নব্যবঙ্গে নবযুগের চালক—'

ফাঁকি দিতে চেয়ো না, অমিতদা; পলিটিক্স্কে তুমি 'ক্যারিয়ার' হিসাবে গ্রহণ কর নি, দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছ। কিন্তু এর বেশি তুমি তা গ্রহণ করতে পারবে না, গ্রহণ করতেও যেয়ো না—

'ক্যারিয়র'? অর্থাৎ মানুষ লইয়া খেলা, মানুষে মানুষে, পার্টিতে পার্টিতে যোগ-বিয়োগ-পূরণ-ভাগ, ইহারই নাম পলিটিক্স্? শুধু তাহাই নয়, মিশ্রগণিতও। বিভূতি-ভুজঙ্গ-নিরঞ্জন-লক্ষ্মীধরদের সকলের 'লসাগু' ও 'গসাগু';—একটা স্বাধীনতার সম্মিলিত ফ্রন্ট, কংগ্রেসের শ্রীক্ষেত্র, হরিহর ছত্রের মেলা? ইহা তুমি চাও, অমিত?

মুখে অমিত বলিল: বেশ! তা হলে কি 'আই উইল রেস্ট'?

জ্যোতি বলে, না, 'অন্ধ জনে দেহ আলো'; তুমি অধ্যাপক ছিলে, সাংবাদিক ছিলে, লেখাপড়া তোমার জাত-ব্যবসা। অ্যাণ্ড দেয়ার ইজ নো রেস্ট দেয়ার! বিশ্রাম চাও না তুমি, বিশ্রাম পাবেও না তুমি— এ অন্ধকারের রাজ্যে।

তাহা ছাড়া আবার কোন পলিটিক্স্ বা গ্রহণ করিয়াছে অমিত?—আলোকের উপাসনা: ইহা ছাড়া অমিতের নিকট কিই বা পলিটিক্সের অর্থ?...তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ধিয়ো যো নো প্রচোদয়াৎ—সবিতার বরণীয় যিনি...

ছুটিয়া-আসা, ফুটিয়া-ওঠা কোন কথা বিদ্যুচ্ছটার মত, অমিতের মনের মধ্যে ঝলকিয়া উঠিল। অমিত তাহা থামাইয়া দিয়া বলিল: শুধু এই কথা, জ্যোতি? আর কিছু কথা নেই?

না।

না, আর কোনো কথা নেই জ্যোতির। এই মুহূর্তে, এই সময়েও তাহার আর কোনো কথা নাই—অন্য কাহাকেও বলিতে পারিবে না সেই কথা? মিনতি নামে

একটি মেয়ে আছে না, জ্যোতি? তবু জ্যোতি বলিতে পারিল না। অমিত মনে মনে হাসিল—থাক না বললে কিন্তু আমার মনে থাকবে... ।

লোক আসিয়া গিয়াছে—মালপত্র ফটকে লইয়া যাইবে। অমিত বলিল : যা বললে জ্যোতি, তা হয়তো মনে থাকবে না ; কিন্তু মনে থাকবে যা বলো নি।...

অমিত জামা পরিল। ডাকিল : রঘু—মুখস্থ করলি?

রঘু নীরবে ঘাড় নোয়াইয়া জানাইল,—হাঁ।

খালাস পেলেই দেখা করবি। নইলে বুঝছিস—এখন গান্ধীজীর রাজ্য। জেলে বিড়ি তামাক পাতা কিছু পাবি না।

রঘু হাসিল।

কেমন? দেখা করবি?

রঘু মাথা নাড়িয়া জানাইল, করিবে। কিন্তু অমিত জানে—সে আশা কম। রঘুর কয়েদি বন্ধুরা এবার আগাইয়া আসিয়া অমিতের পায়ের ধুলা লইল, রঘুও লইয়া লইল।

দুই-চারিটা বিড়ি তাহাদের বাঁটিয়া দিয়া অমিত বলিল, আমরা চলে গেলে কিন্তু বিড়ি আর তামাক পাতা জেলে ভয়ানক মাগগি হয়ে যাবে, বুঝে চলিস।

কিন্তু আর একবার নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলে হয় না? জ্যোতি রাগ করিল,—ভিতরের আঙিনায় নীহার মিত্র প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। সিপাহীরা তাগিদ দিতেছে।—তবু একটু নমস্কার বিনিময় নিরঞ্জনের সঙ্গে—

অমিত ছুটিয়া গেল। নিরঞ্জনও বুঝি জানিত অমিত আবার আসিবে।

অঙ্গনে আরও অনেকে বিদায় দিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। সোল্লাসে কলরব করিতেছে। সীমানা তাহাদের এই অঙ্গনের দ্বার পর্যন্ত। অমিতদা কোথায়? জেল ছাড়িয়া যাইতে চাহেন না নাকি? ছুটিয়া আসিতেছে অমিত—নিরঞ্জনদাও আঙিনায় আসিয়াছেন পিছনে পিছনে।

অমিত চলিল কাহাকেও এ-কথা বলিয়া, কাহাকেও ও-কথা বলিয়া। শশাঙ্কনাথ আসিয়া দাঁড়াইলেন : অমিতবাবু আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি—ভুলো না।—পরিহাসের স্বচ্ছকণ্ঠের মধ্যেও আসে প্রার্থনা।

অমিত হাসিয়া বলিল : নিশ্চয়। 'ভুলব না'।

শশাঙ্কনাথ অমিতকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে নীহারকেও। হাসি, করমর্দন, আলিঙ্গন—শেষ মুহূর্তের শেষ একটুকু আনন্দময় উৎসব। সকলের মনে আশার সঞ্চার হইতেছে—তাহারা পিছনে রহিল বটে, কিন্তু এই তো বন্দীদের মুক্তির পালা আরম্ভ হইল, আর দেরি নাই বেশি।

ব্যায়ামশেষে লক্ষ্মীধরবাবু এতক্ষণে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। বাঘের থাবার মতো হাতটি বাড়াইয়া করমর্দন করিলেন : যাও, ভাই, খুব মেরে দিলে যা হোক—বলিবার ভঙ্গিতে একটা হাস্যতরঙ্গের সৃষ্টি হইল। খানিকক্ষণ তাহার আলোড়ন চলিল।

নীহার মিত্রের পিছনে পিছনে অমিত মুক্ত দ্বারের চৌকাঠ পার হইয়া গিয়া

দাঁড়াইল—চোখে পড়িল জ্যোতিকে, চোখ খুঁজিয়া বেড়াইল শেখরকে, খুঁজিয়া পাইল না রঘুকে। এবার কেমন ভরিয়া উঠিল মন...কেমন ভরিয়া উঠিল...কে রহিল পিছনে? কি রহিয়াছে সম্মুখে?...

একটা জীবন অমিত ছাড়াইয়া যাইতেছে। ছাড়াইয়া যাইতেছে তাহার অনেক দিন-রাত্রির সতীর্থদের।...ছাড়াইয়া যাইতেছ তোমার জীবনের একটা অংশ।...এ যে জন্মান্তর তোমার, অমিত। এ যে লোক হইতে লোকান্তর; যুগ হইতে যুগান্তর; দেহের মধ্যেই দেহান্তর, অমিত।

নতুন এক বেদনায় সকলকে চোখ দিয়া অমিত আলিঙ্গন করিল। তাহার হৃদয় সকলের সম্মুখে, সকলের পায় নুইয়া পড়িতে চাহিল—'এই তীর্থ-দেবতার ধরণীর মন্দির প্রাঙ্গণে। রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম।' অমিত দুই হাত তুলিয়া শেষবারের মতো নমস্কার করিয়া বলিল,—এই শেষ কথাটুকু শেষ মুহূর্তে না বলিয়া পারিল না: 'তোমাদের সবারে প্রণাম।'

জোর করিয়া মুখ ফিরাইল অমিত। পিছনকার শব্দে বুঝিল দুয়ারও বন্ধ হইয়া গেল। বুঝিল—বিদায়ের শেষ কলধ্বনি শেষবারের মতো তখনো জানাইতেছে তাহাকে শুভেচ্ছা: 'অমিতদা, ভুলো না।'

'যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই'—বাহিরের আঙিনার প্রত্যেকটি ঘাসের মধ্য হইতে কোন সত্য যেন মাথা তুলিয়া ইহাই বলিল। প্রত্যেককে ছুঁইতে চায় অমিত। প্রত্যেককে আর-একবার চোখ ফিরাইয়া দেখিতে চায়। দোতলায় গরাদের ফাঁকে ফাঁকে সেই আগ্রহ-প্রীতি-ভরা মুখগুলি, চক্ষুগুলি এখন ফুটিয়া আছে।—অমিতের গৃহযাত্রা তাহারা দেখিতেছে। কত প্রীতি ওই চক্ষে, কত অদ্ভুত আবেগ, কত জটিল বাসনা, কত স্বপ্নভঙ্গ, আর তবু কত অমর আকাঙ্ক্ষা, অশেষ স্বপ্ন!...কে বলিল—পাতালপুরী? এই তো স্বপ্নপুরী, অমিত! এত স্বপ্ন আর এদেশের কোথাও ফুটিয়াছে কোনো দিন? এমন কত ছোটখাটো সংসারের-সুখ-দুঃখের স্বপ্ন, আর বিপুল পৃথিবীর ও মহাজাতির মহামুক্তির স্বপ্ন—আর কাহাদের বুকে এদেশের কোথায় ফুটিয়াছে অমিত?...কে বলে বন্দিশালা?—বন্দনা যেখানে মানবাত্মার মহত্তম ভবিষ্যতের দিকে দিবারাত্রি সমুত্থিত হইল; বেদনা যেখানে সহস্র বন্ধনের মধ্যেও প্রতিনিয়ত প্রদক্ষিণ করিয়াছে কত দীপহীন গৃহপল্লী-জনপদ?... প্রেতলোক, অমিত? এ যে জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়—জীবনের জয়গান যেখানে রচিত হইয়াছে শত মিথ্যার, শত তুচ্ছতার, শত প্রতিক্রিয়ার পীড়নকে ছাড়াইয়া।...'অপরূপকে দেখে এলাম দুটি নয়ন ভরে'...

ছয়

অমিত চোখ তুলিল না, ফিরিয়া তাকাইল না, তাহার রহস্য-নিবিড়দৃষ্টি কিছুই দেখিল না...আপনার মনেই মানিয়া চলিল, 'অপরূপ...অপরূপ!'

প্রাঙ্গণ শেষ হইতে চোখ খুলিল—

অশ্বত্থের ছায়ায় 'টিকটিকি' তেমনি প্রস্তুত রহিয়াছে, জেলখানার বেত লাগাইবার ফ্রেম। এক মুহূর্তে অমিতের চক্ষু পীড়িত হইয়া পড়িল। রহস্য-ঘন পরিপূর্ণ হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। আজ এই শেষ বিদায়ে প্রীতিস্পর্শের মধ্যে—মানুষের অপরূপতার আরাধনায়—অমিত কি ভুলিয়া যাইবে এই রূপহীনতার যন্ত্রদের, এই পশুদের, শ্বাপদদের, রক্তনখরদন্ত এই জিঘাংসুদের—জীবনের কী অপঘাত!

মেদিনীপুর জেল। এমনি ফ্রেমে আঁটিয়াছে বারীন নন্দীকে সেখানকার পেশোয়ারী বেত্রধারী, সেখানকার হাসান খাঁ!—যাহার বিপুল দেহ ও দুর্মদ পশুত্বকে সংরক্ষণের জন্য বরাদ্দ আছে প্রতিদিন মাংস আর সুপ্রচুর খাদ্য—কয়েদিদের সে বেত মারে; সেই মেদিনীপুরের হাসান খাঁ পেশোয়ারী বেত মারিতেছে বারীন নন্দীকে।...

বলিষ্ঠ বালক। তখনো মুখ কাঁচা, হয়তো বাঙাল বলিয়া। আই-এ ক্লাশের লজিক লইয়া বারীন দিন দুই অমিতের নিকটে এই জেলে লজিক বুঝিতে আসিয়াছিল। অমিত বুঝিতে পারে না লজিক নামক মাথামুণ্ডু কেন পড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়? গতানুগতিক নিয়ম বলিয়া? জীবনের লজিককে কেতাবী লজিকে চাপা দিতে হইবে বলিয়া? অমিত যুক্তির সহজ দৃষ্টান্ত লইয়া বসিত,—দৈনিক কাগজের সংবাদ বুঝিবার জন্য যুক্তিতর্ক-প্রয়োগ করিতে শিখাইত। অমিতের মুখে সেই জীবন্ত লজিকের দৃষ্টান্ত শুনিতে শুনিতে, বুঝিতে বুঝিতে সেই বাঙাল বালক বারীন নন্দী খুশি হইয়াছে। তাহার কথা সহজ, বুদ্ধি সহজ, সহজ তাহার জীবন-দৃষ্টি। কিন্তু বারীন আই-এ পাশ করিবার অবকাশ পাইল না। অমিত চলিয়া গেল পাহাড়-জঙ্গলের বন্দিশালায়। বারীন নন্দী জেল হইতে গিয়াছিল কোন গ্রামের সাপের-বাসা বন্দীঘরে। সাপ তাহাকে আঁটিতে পারিল না, সে বাঙাল দেশের ছেলে, সাপ দেখিয়াছে। কিন্তু সাপ নয়—ম্যালেরিয়া ও দারোগার দাপটেই পড়াশুনা আর বারীনের হয় নাই। সেখানে বই মিলে নাই, পথ্য ও খাদ্য মিলে নাই, ঔষধ মিলে নাই। শেষ পর্যন্ত মিলিয়াছিল নিয়মভঙ্গের জন্য কারাদণ্ড। তারপর সেই সহজ ছেলের সহজ যুক্তি জীবনের যুক্তিতে আপনি রূপ গ্রহণ করিল। দণ্ডাদেশ শেষ হইল। হুকুম হইল আবার ঠিক গ্রামের সেই ম্যালেরিয়ার ও দারোগার উপহাস উৎপীড়নের শিকার হইতে হইবে বারীন নন্দীকে। না, বরং বারীন আবার নিয়ম ভঙ্গ করিবে, আবার জেলের কয়েদি হইবে। বর্ধমান জেলের পরিবর্তে এবার তাহার স্থান হইল মেদিনীপুর জেল—পুরাতন ও দুর্দান্ত কয়েদির জন্য নির্দিষ্ট স্থান। এবার দণ্ডকাল হইল দুই বৎসর। আর দ্বিতীয় ডিভিশনের পরিবর্তে 'হ্যাবিচুয়াল ক্রিমিন্যালে'র জন্য ব্যবস্থা হইল সাধারণ কয়েদির তৃতীয় ডিভিশন।

ঘানিঘর, কারখানা সব পাশ হইয়া দুই বৎসর পরে বারীন নন্দী আবার যখন অপেক্ষা করিতেছে মেদিনীপুর জেলেই কয়েদির জাঙিয়া ছাড়িয়া বন্দীর ধুতিজামায়, বন্দীদের ওয়ার্ডে বন্দীরূপে, এগুারসন্ সরকারের নূতন কোনো মর্জির অপেক্ষায়—

তখন আসিল গুজরাতী আই-এম-এস্ মেজর পটেল। ছিপছিপে সাধারণ তাহার চেহারা, সাধারণের অপেক্ষাও সে রোগা, দ্রুত চলে, দ্রুত বলে জঙ্গি অভ্যাসে, দ্রুত নিয়ম খাটায় জঙ্গি চালে। জেলের বাইবেল 'জেলাকোড' দুই বেলা কপালে ঠেকাইয়া এই রাজ্যের আধিপত্যে নূতন বসিয়াছে মিলিটারী-ফেরতা ভারতীয় মেজর পটেল। প্রথমেই হুকুম হইল—'সরকার' ব্যারাকে ঢুকলেই বন্দীদিগকেও কয়েদিদের মতো 'ফাইল' করিয়া দাঁড়াইতে হইবে, করিতে হইবে 'সালাম'। জেল কোডের ইহাই নির্দেশ—ডিসিপ্লিন্। কিন্তু এতদিন যদি এই নির্দেশ পালিত না হইয়া থাকে, উভয় পক্ষের স্বীকৃত শিষ্টাচারের আদান-প্রদানেই এই জেলের ডিসিপ্লিন্ চলিয়া থাকে? কই, সেই কথা তো কোন সরকারি হুকুমে লিখিত নাই। তদভাবে মেজর পটেল সরকারি জেলকোড অগ্রাহ্য হইতে দিবেন না; ডিসিপ্লিন্ তিনি রাখিতে জানেন, সদ্য মিলিটারি হইতে তিনি আসিয়াছেন। তাই জেলকোডের নিয়ম অনুযায়ী তাঁহার দণ্ডনীতি অগ্রসর হইয়া চলিল। বন্দীদের 'ডায়েট' কাটা গেল, বিকালের চলাফেরা বন্ধ হইল এবং অপরাধীরা 'ডিগ্রীবন্দী' হইল। তারপর একে একে 'ফ্যানভাত', 'ছালা-চট', 'জাল-ডিগ্রী', 'ডাণ্ডাবেড়ি', 'স্ট্যাণ্ডিং-হ্যাণ্ড-কাপ'। কেহ কেহ ভাঙিয়া পড়িতেছে। না ভাঙিলে কেহ কেহ চালান যাইতেছে জেলের হাসপাতালে। কেহ কেহ নিস্তেজ নিরাশ হইয়া ধুঁকিতেছে একা সেলে, তবু ভাঙিবে না।

বারীন নন্দীও ভাঙিল না। জেলকোডের দণ্ডচূড়ার প্রান্তে দাঁড়াইয়া মেজর পটেল দয়ার্দ্র চিত্তে তখন ঘোষণা করিলেন, 'ফ্লগিং-ফাইব্ স্টাইপস্। দেট উড্ বি এনাফ।' ডাক্তার ব্যবস্থামত বারীনের দেহ পরীক্ষা করিল, বেত্রদণ্ডের জন্য তাহাকে পাশ করিয়া দিল—বারীন সহিতে পারিবে। পাকানো বেতে চর্বি-মাখানো চলে; হাসান-খাঁর মাংসের বরাদ্দের এবার পরখ হইবে। 'টিকটিকিতে' বারীনের উলঙ্গ দেহ বাঁধা হইল। এক-একটি আঘাতের সঙ্গে উলঙ্গ দেহের কাঁচা মাংস উঠিয়া আসে—রক্ত ঝরিয়া পড়ে। অমনি ছোট ডাক্তার ও সাহেব দেখিয়া লয় বারীনের দেহাবস্থা,—হাঁ, ঠিক আছে, সহিতে পারিবে। কেহ বলিতে পারিবে না কর্তৃপক্ষের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নাই। এক ইঞ্চি বাদ দিয়া হাসান খাঁর শিক্ষিত হাতের দ্বিতীয় আঘাত তখন নামে...আশ্চর্য নৈপুণ্য আর আশ্চর্য শক্তি। সার্থক তাহার মাংসের বরাদ্দ। বারীনের কণ্ঠ, বারীনের কাতরোক্তি কেহ তবু শোনে নাই।

পাঁচ ঘায়ের শেষে 'টিকটিকি'র বাঁধন ছাড়াইয়া বারীনের রক্তাক্ত উলঙ্গ দেহ সিপাহীরা মাটিতে দাঁড় করাইল। তাহার স্থির মুখে কি হাসি, না, খুনের নেশা? মেজর পটেলের তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। আগাইয়া আসিয়া মেজর বলিলেন, নাউ, আর ইউ স্যাটিস্‌ফাইড? কেমন সাধ মিটেছে তো?

স্থির ওষ্ঠ বাঁকিয়া উঠিল হাস্যে: হ্যাভ্ ইউ গট্ ইউর সালাম? পেয়েছ সালাম?

মিলিটারি দীপ্তিতে দৃপ্ত মেজর হুকুম করিলেন, ফাইভ মোর। ও, ইয়েস, হি ক্যান্ স্ট্যাণ্ড ইট। লাগাও আরও পাঁচ বেত। হাঁ, খুব পারবে এ তা সইতে।

আবার বারীনের দেহ টিকটিকিতে বাঁধা হইল, আবার জেলকোডের নির্দেশমতো ব্যবস্থা হইল—এক-এক ইঞ্চি পরে পরে এক-এক বেত, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরীক্ষা, রক্তাক্ত আঘাতস্থলে অমনি ঔষধ-প্রলেপ,—অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হইল না।

দ্বিতীয়বার যখন সে দেহ নামাইয়া সিপাহিরা দাঁড় করাইল, তখন বারীনের পা টলিতেছে। সাহায্যার্থে ধরিবার জন্য আগাইয়া আসিয়াছে ডাক্তারের বেয়ারা কয়েদি বদ্রিপ্রসাদ—বারীন নন্দী হাত দিয়া তাহাকে সরাইয়া দিতে গেল।

মেজর পটেল বলিলেন : কেমন, চ্যালেঞ্জ করবে আর আমাকে?

চ্যালেঞ্জ ইউ?—বুক-ভরা ঘৃণা আর আগুন-ভরা দৃষ্টি লইয়া দৃপ্ত কন্ঠে গর্জিয়া উঠিল—আই চ্যালেঞ্জ দি ব্রিটিশ এম্পায়ার।—চ্যালেঞ্জ তোমাকে করব? চ্যালেঞ্জ করছি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে।

...এক মুহূর্তের মতো সমস্ত ভারতবর্ষের একালের ইতিহাসকে বাণীময় করিয়া তুলিয়াছ তুমি বারীন নন্দী। 'আই চ্যালেঞ্জ দি ব্রিটিশ এম্পায়ার!' এক মুহূর্তের মতো সমস্ত সতীর্থের তুচ্ছতা ও ভঙ্গুরতা, নিরাশা ও নির্বীর্য দিন রাত্রিকে মহিমান্বিত সার্থকতা দান করিয়াছ তুমি,—সাধারণ চেহারার, সাধারণ ছেলে বারীন নন্দী, অমিতের কাছে যে পড়িতে আসিয়াছিল লজিক।...

অমিত মনে মনে মহিমান্বিত হইয়া ওঠে—জীবনের লজিক হার মানে নাই এম্পায়ারের বেতের কাছে।

জঙ্গি অভিজ্ঞতা নিরুপায় হইয়া পড়িল কয়েক মুহূর্তের মতো। কয়েক মুহূর্তের মতো বাঙালী ছোট ডাক্তারের জেলে গুপ্ত ছোট মনও কেমন হইয়া গেল।

'এ দেহে আর বেত চলবে না, স্যর'—ডাক্তার সবিনয়ে কিন্তু দৃঢ়ভাবে এবার জানাইল।

টলিতে টলিতে কয়েক পদ গিয়া বারীনের হতচেতন দেহ তখন মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

তারপর মেদিনীপুর ও আলিপুরের ফটক দিয়া কয়েদি জাহাজ 'মহারাজা'র যাত্রীরূপে বারীন নন্দী পৌঁছিয়াছে গিয়া 'পোর্ট ব্লেয়ারের' ভূস্বর্গে—সেখানে অনশন ধর্মঘটের আর দেরি নাই। সেদিন ডাক্তারের কৃতিত্বে আন্দামানে অনশনরত যে 'স্বদেশীরা' মরিয়াছে তাহাদের মধ্যে বারীনের নাম অমিত দেখে নাই। অতএব, বারীন হয়তো ফিরিবে—'দশজনের নয়জনের মতো' নামহীন, গোত্রহীন,—আত্মীয়ের নীড়ে। বারীনও মিশিয়া যাইবে 'বারীনদা', 'উপীনদা'দের মতোই চিরন্তন জীবনস্রোতে। তাহাই সত্য, তাহাই নিয়ম। তবু জীবনে একবারের মতো সেই রক্তসিক্ত বালক আপনার অন্তরাত্মার মহিমায় ইতিহাসের এই বিরাট চ্যালেঞ্জকে রূপদান করিয়াছে and touched immortality. 'Only in intense living do we touch infinity.'...এমন এক স্ফুলিংগ ফ্রেমে আটা সাধারণ বালক কুশবিদ্ধ

মানবপুত্রের মতো সেই অনন্ত রহস্যকে স্পর্শ করিয়াছে---জীবনের অন্তরতম সত্যকে স্পর্শ করিয়াছে, আর হইয়াছে---ইতিহাস.।

অমিত ইতিহাসের ছাত্র, এ কালের এই কুসিফিকেশান---সে কি করিয়া ভুলিবে? ইহা ইতিহাস, ইতিহাস।...ছাপার অক্ষরে যার চিহ্ন থাকে না।

সম্মুখের বারান্দায় চামড়ার চাবুক হাতে দাঁড়াইয়া সেই পেশোয়ারী হাসান খাঁ। বারান্দার দেয়ালে ঠেস-দেওয়া সুপারের সেই প্রকাণ্ড ছাতা ; বড় সাহেব 'রাউণ্ড' দিয়া ফিরিয়াছেন, আপিসে বসিয়াছেন। হাসান খাঁরও এখনি ছুটি হইবে। তাহার দুই চক্ষু অমিতকে চিনিয়া ফেলিয়াছে---বড়সাহেব আজ সকালে যাহার সহিত গল্প করিতেছিলেন সেই 'স্বদেশী' বাবু! অমিত চক্ষু ফিরাইয়া লইল! না, অমিত ভুলিতে চাহিলেও ভুলিতে পারিবে না।...বিধাতা, শুধু অপরূপকেই তুমি দেখাও নাই মানুষের অসহনীয় শ্বাপদ রূপও দেখাইয়াছ।

অমিত হাসান খাঁকে এই জেলেই ছয় বৎসর পূর্বে প্রথম দেখিয়াছিল। শ্রান্ত পীড়াগ্রস্ত অমিত চক্ষু বুজিয়া জেল হাসপাতালে পড়িয়া আছে। সহসা একটা কি আপত্তি শুনিল, অনুনয় শুনিল, চোখ মেলিয়া দেখিল---রোগজীর্ণ এক কয়েদিকে এক চড়ে শোয়াইয়া দিয়া এই পেশোয়ারী দৈত্য তাহার মুখ হইতে কাড়িয়া লইল রোগীর পথ্য---দুধের বাটি। এক চুমুকে তাহা শেষ করিয়া সে হাঁকিল কয়েদি শুশ্রূষাকারীদের, লে আও, আর কেয়া হ্যায়। তাহাদের মধ্যে একটা ছুটাছুটি পড়িল। হাসপাতালে হাসান খাঁর জন্য দুধ ও ফল না রাখিলে সেখানকার কয়েদি-কর্মীদের রক্ষা নাই। তাহার জন্য---আর বড় জমাদার খাঁ সাহেবের পরিতুষ্টির জন্য---নবাগত ছোকরা কয়েদি এইরূপই বরাদ্দ আছে, হয়তো নেহাত ছোকরাও নয় সকলে তাহারা। এই সেই হাসান খাঁ পেশোয়ারী---বড় সাহেবের ছত্রধারী, বড় জমাদারের পার্শ্বরক্ষী, যাহার পাশব অত্যাচারে এ জেলেই মানুষ মরিয়াছে। জেলের লজিক ও বাহিরের লজিক আশ্চর্য রকমে আয়ত্ত করিয়া হাসান খাঁ জানে---ইহাই বাঁচিবার লজিক---জগৎ-জঙ্গলে ইহাই আইন :---খুন, আরও খুন, আরও খুন। যত বড় খুনী তুমি তত তোমার জীবন এই জেলকোডের হত্যাশালায় নিষ্কণ্টক, তত তোমার জীবন এই শ্বাপদ-নীতিক সভ্যতায় 'সাক্‌সেস্‌ফুল'।

আজ অমিতকে দেখিয়া হাসান খাঁ পরিচয়ের হাসি হাসিতেছে। বন্ধুত্বের হাসি---বড়সাহেব আজ অমিতের সহিত অতক্ষণ আলাপ করিয়াছে, বাহিরে চলিয়াছে এবার সেই 'স্বদেশীবাবু'।

অমিত চোখ বুজিল।...বিধাতা, মানুষের এই শ্বাপদ-শক্তিকে এই মুহূর্তেও কি ভুলিতে দিবে না আমাকে?...সত্যের এই রক্তনখরদন্ত প্রতিসত্যকে, মানবাত্মার এই বিকট বিকৃতিকে?

ইহা কি তুচ্ছ? শুধু এই সত্যই কি মনে রাখিবার মতো : অপরূপকে কি তুমি দেখিয়াছ, দেখিয়াছ শুধু মানুষের মুখ?...

সম্মুখের দুয়ার খুলিতে দেরি হইতেছিল। শেষবারের মতো পশ্চাদস্থ প্রাঙ্গণের

ওপারে অমিত তাকাইল...অপরূপ। ওই রৌদ্র সমুজ্জ্বল পুকুরের জল, শরতের রৌদ্রস্নাত সতেজ তৃণদল, তার ওপারে ওই ওয়ার্ডের প্রকাণ্ড জানালার পিছনে সারি সারি খাটিয়া---যাহার সাদা চাদর দেখা যায়। আর জানালার গরাদের আড়ালে মানুষের মুখ---বিদায়-সম্ভষণমুখর তাহার সহযাত্রী-মানুষের সেই অস্পষ্ট মুখগুলি!... শেষবারের মতো হাত তুলিল অমিত তাহাদের উদ্দেশে।---সবারে প্রণাম, সবারে প্রণাম, সবারে প্রণাম...

* * * * * * * *

একটি পদক্ষেপ—দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া গেল প্রাঙ্গণ, উহার পুকুর, পত্র, বৃক্ষ, ঘাস, সব; আর বন্দিশালার অভ্যন্তরের উৎসুক, প্রীতিপূর্ণ সেই মুখগুলিও। মাত্র চৌকাঠের এপার হইতে ওপার---অথচ জন্ম ও মরণের মতো একটা বিরাট সমুত্তরণ!

হাস্যভরা মুখে জেল অফিসের কর্মচারীরা সংবর্ধনা জানাইল। গোয়েন্দা কর্মচারী পর্যন্ত!—

আসেনই না যে আর, অমিতবাবু!—যুবক কর্মচারী বলিল।

আমি তো আসি নি দু-মিনিট---আপনারা তো আসেন নি অনেক বৎসরেও।

সব্যঙ্গ উত্তরে প্রত্যুত্তরে, হিসাবপত্র, সঙ্গেকার বাক্স ও খাতাপত্রের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে, আবার অমিত ভুলিয়া গেল পশ্চাতের বাস্তবকে।. এই বইপত্রের এক-একদিনের এক-একটি ছত্রের সহিত তাহার কত ইতিহাস জড়িত। কত ছল করিয়া কেনা জেলখানার বই; কত আয়াসে আয়ত্ত করা এক-একটি অবসরক্ষণের এক-একটি লেখা; আশায় নিরাশায় ভরা এক-একটি প্রয়াস। উহাদের মধ্যে কত গ্রীষ্মের অগ্নিজ্বালার দিন, শীতে হিম-আড়ষ্ট করাঙ্গুলির কাকুতি, বর্ষমুখর পার্বত্য নির্ঝরিণীর উন্মাদ কলহাস্য, আর তাপদগ্ধ মরুভূমির তপ্তবালুকার ক্ষুব্ধ উত্তাপ? এই গোয়েন্দারা কি করিয়া জানিবে সেই সব ইতিহাস? অমিতই কি মনে করিতে পারে আর সেই মুহূর্তসমূহকে---তাহার লেখার এক-একটি শব্দের মধ্যে যাহাদের আয়ু এমন করিয়া মিশিয়া গিয়াছে?

সরকারী রাজনৈতিক বিভাগের হুকুমপত্র হাতে দিতে দিতে গোয়েন্দা কর্মচারী জানাইল—অমিতবাবু মুক্তিই পাইবেন, তবে দস্তুর মাফিক কিছু বাধাও থাকিবে—"কোনো রাজনৈতিক বন্দী বা ভূতপূর্ব রাজবন্দীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না; চিঠিপত্র পুলিসকে না দেখিয়ে লিখবেনও না, গ্রহণও করবেন না; সভাসমিতিতে বা কলকাতার বাইরে কোথাও যাবেন না। রাত্রি নটার পরে বাড়ির বাহিরে থাকবেন না,—আর সপ্তাহে একদিনের জন্য থানায় গিয়ে হাজিরা দিয়ে আসবেন।"

শুধু এইটুকু বাধা? অমিত হাসিল। আরও কত কি তো আদেশ করিতে পারিত সরকার বাহাদুর। সত্যই মহানুভব বলিতেই হইবে।

খাতাপত্র বিছানা তল্লাসী হইয়া গেল। একদিন এই খাতা পাইবার জন্যও অমিতকে কত কলহ করিতে হইয়াছে; তবু পায় নাই—জেল কোডের অপূর্ব নিয়মে

তাহারও উপকার আই-বি কোডের সর্বজয়ী ইঙ্গিতে। নির্জন 'সেলের' শেষে এই ছেঁড়া খাতাটা কত দুর্লভ ঠেকিয়াছিল। মানব সভ্যতার প্রাচীনতম লিপির মতো দুর্লভ মনে হইয়াছিল এই পাশকরা বাঁধানো খাতাটাকে যেদিন "পরীক্ষিত ও অনুমোদিত" হইয়া উহা সত্যই আসিয়া পৌঁছিল অমিতের হাতে এই জেলেই। আর আজ এই গোয়েন্দা সাব ইন্‌স্পেক্টর কেমন নিস্পৃহ লঘু হস্তেই না উহাদের উল্টাইয়া দেখিয়া 'পাশ করিয়া দিতেছে : 'কি হবে আর দেখে? বাইরেই যখন যাচ্ছেন।' আর এত খাতা, এত কাগজ, এত লেখা—ইহা কি সত্যই পরীক্ষা করা যায় এই সময়ে?...এত ক্ষোভ, এত অপমান, আর এত যন্ত্রণা-জর্জরিত প্রতিটি মুহূর্ত—ইহাও কি তবে এমনি লঘু, এমনি অর্থহীন, এমনি বিবর্ণ তুচ্ছ হইয়া যাইবে অমিতের জীবনে?

সব তল্লাসী ও পরীক্ষা শেষ হইল, আধ ঘন্টাও লাগিল না। নিষিদ্ধ গ্রন্থগুলিও এবার অমিত খাতায় স্বাক্ষর করিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে। 'চলন্তিকা', জওহরলালের 'আত্মজীবনী' ফেরত পাইল;—আই-বি-র নির্বিচার নিষেধাজ্ঞায় ইহাও একদিন নিষিদ্ধ ছিল। সেদিনকার গোয়েন্দা কর্মচারীর মেজাজ ছিল তিক্ত : কর্ণেল পিণ্ডিদাসের মতো—পারিবারিক কারণে কি? না, ইহাই ব্যুরোক্র্যাসির ধর্ম। অত বিচার বিবেচনার প্রয়োজন নাই—যে বই বন্দীরা চাহিবে তাহাই বন্ধ করিয়া দিবে। নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে করিতে তাই অমিতের হাসি পাইল—বিধাতা, তুমি শুধু রসিক নও, বিদ্রূপ-বিলাসীও। এত মূঢ়তা যদি এতখানি রূঢ়তার সঙ্গে না জুটাইয়া দিতে তাহা হইলে এই গোয়েন্দা-বিভাগকে এত ঘৃণা সত্ত্বেও এতটা তুচ্ছ করা চলিত না। সেই মানুষগুলিকে শ্বাপদই ভাবিতাম, বুঝিতাম না তাহারা ইতিহাসের সঙ, দিবালোকের শৃগাল।

জেলের কর্মচারীরা একে একে নমস্কার করিতে লাগিলেন। শরৎ গুপ্ত আর একবার বলিলেন, 'বাড়িতে খবর গিয়েছে (অর্থাৎ তিনিই পাঠাইয়াছেন)—তাঁরা নিশ্চয় খবর পেয়েছেন।' সাহেব ওয়ার্ডরা আগাইয়া আসিল। করমর্দন করিল, বলিল : আর এসো না কিন্তু। এ তো নরক। এ-কাজ করতে চাই না—একদিনও।

ফটকের শিখ ও পাঠান সিপাহী ফটক খুলিতে খুলিতে হাসিল। অমিতের অন্তরে শিহরণ জাগিতেছে বাহিরে পদার্পণ করিতে গোয়েন্দা পুলিস জানাইল—এদিকে। আমাদের গাড়ি রয়েছে। একবার আমাদের আপিসে যেতে হবে। রায় বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করবেন।

আবার সেই আপিস, সেই 'রায় বাহাদুর'!...অমিত দাঁড়াইল। আবার সেই!... তথাপি এই তো সম্মুখে মুক্ত প্রাঙ্গণ মুক্ত আকাশ—মুক্ত মানুষের পথের প্রারম্ভ...

এইখানে...কী হইল?...মা!

অমিত দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে।

অশ্রুস্ফীতমুখী মা...

এইখানেই অমিত তাঁহাকে শেষ দেখিয়াছে...

অশ্রুস্ফীত নয়নের বাঁধ-ভাঙা অশ্রু উদগত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ছাপাইয়া পড়িতেছিল—ওই দেবদারু তলের ছায়ায় আসিয়া বেদনা-মথিত বুকের মধ্যে ঝড়ের মাতন মা আর ঢাকিয়া রাখিতে পারেন না। বহু বহু রাত্রি জাগা বিমলিন মুখের রেখাগুলি বুঝি ভিতরের ভাঙিয়া-পড়া আবেগের আঘাতে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, বহু যাতনায় ভঙ্গুর দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। আছড়াইয়া পড়িতেছে আর মাথা খুঁড়িয়া পড়িতেছে—ওই দেবদারুতলার শীর্ণ ছায়াখানি হইতে,—ওই পাটল পথপ্রান্ত হইতে—এই কারাফটকের তটভূমিতে জন্ম-জন্মান্তরের মানব-মমতা, বাংলা দেশের মাতৃহৃদয়ের অসহায় ব্যাকুলতা, দীর্ঘশ্বাস, অভিশাপ—ও আশীর্বাদ!

ভাঙিয়া পড়িবেন—ভাঙিয়া পড়িলেন কি, অমিত, তোমার মা?

পাঁচ বৎসর পূর্বে মাত্র একবারের মতো,—আর তাহাই শেষবারের মতো—অমিতকে জেলে দেখিতে আসিয়াছিলেন তাহার মা—। অমিত তখন এই জেল হইতে চালান যাইবে দেশান্তরে—কোথায় কতদূরে তিনি জানেনও না। সৌভাগ্য বলিতে হইবে, অনেক মা তখনো তাঁহাদের সন্তানকে দেখিতে পান নাই, অমিতের মা তবু অমিতকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। অনু, মনুও দাদাকে দেখিতে পাইয়াছিল। কিন্তু পিতা দেখিতে পান নাই,—এক সঙ্গে তিনজনের বেশি সাক্ষাতে অনুমতি দেওয়া হয় না, তাই। ফটকের-বাহিরে এইখানটিতে বাবা দাঁড়াইয়া রহিলেন। দূর হইতে এক নিমেষ অমিতকে হয়তো দেখিতে পাইবেন, এই আশায়। সাক্ষাৎ শেষে অশ্রুমুখী মাও তাই এইখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। জেলের রুদ্ধ ফটকের মধ্যে যতক্ষণ অমিত অন্তর্হিত না হয় ততক্ষণ গরাদের ফাঁকে অমিতকে তিনিও দেখিবেন। যতক্ষণ চক্ষে দেখা যায় ততক্ষণ চক্ষু ফিরাইবেন কি করিয়া? আর তাহার পরে—চক্ষুই বা আর কী দেখিবে?...স্থির দৃষ্টিতে মায়ের পার্শ্বে অমিতের ভাই ও বোন স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে। আর অবিকম্প স্থির প্রদীপ-শিখার মতো সকলের পিছনে—সকলের হইতে স্বতন্ত্র, একটু দূরে—দণ্ডায়মান অমিতের পিতা। নিকটে আসিবার, একটি কথা বলিবারও অধিকার তিনি পান নাই। প্রকৃতপক্ষে অমিতকে এভাবে চক্ষে দেখাও তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। ওই গরাদের ফটকের মধ্য হইতে সিপাহী, প্রহরীর ও গোয়েন্দা কর্মচারীর বাধা ও নিষেধ অবজ্ঞা করিয়া তথাপি অমিত এইখানে অগ্রসর হইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—এজন্য তাহার যত শাস্তিই হউক—পিতা তাহাকে দেখিতে পাইবেন। হাসিয়া দুই হাত তুলিয়া পিতার উদ্দেশে অমিত প্রণাম করিয়াছিল—পিছনের দুয়ার তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য তখন অধীর আগ্রহে মুখ ব্যাদান করিয়া আছে। আর বাহিরের পৃথিবীর এই প্রান্ত রেখাটিতে—এই দেবদারু ছায়ার তলে—জেল গেটের সম্মুখে—ভাঙিয়া-পড়া তরঙ্গের মতো পিতার চরণপ্রান্তে পড়িয়া যাইতেছিলেন তাহার মাতা। শেষবারের মতো অমিত সেই তাঁহার মুখ এই পৃথিবীতে দেখিয়াছে...এইখানে ওই জেলগেটের সম্মুখে।

ওইখানে.. ওই দেবদারু ছায়ায়...ভাঙিয়া-পড়া তরঙ্গের মতো সেই মা!...

অমিত দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া গোয়েন্দা যুবক বলিল: এদিকে অমিতবাবু, ওই আমাদের গাড়ি—চলুন!

গৃহাঙ্গন

এক

গাড়ি ছুটিয়াছে। বাঁক ঘুরিয়া রাজপথের বুকে পড়িয়াছে। কংক্রিটের সেতুর তলে আদিগঙ্গা শুইয়া আছে। বর্ষান্তের জলস্রোতে একটু স্থির গাম্ভীর্য আসিয়াছে। দুই পারের জীবনের মায়া নদীর নিশ্চল দৃষ্টির উপর ছায়া বিছাইয়া দিতেছে। মোটর গাড়ি উড়িয়া চলিল। ময়দানের সম্মুখে পড়িতে না পড়িতে মোড় ঘুরিল। রৌদ্র-ছায়া-আঁকা লোয়ার সার্কুলার রোড। অমিত নির্বাক। নির্নিমেষ চক্ষুর সম্মুখে ক্রমপ্রকাশিত পথ, ক্রমোদ্‌ঘাটিত পৃথিবী. চোখের তারায় সেই পথ ও পৃথিবীর চলমান ছায়া জাগিয়া জাগিয়া মুছিয়া যাইতেছে। অমিতের অচঞ্চল দৃষ্টিতে তখনো ফুটিয়া আছে সেই দেবদারু-ছায়ার অশ্রু-মথিত, বেদনা-মথিত মায়ের মুখ।

সেই মুখ আর অমিত দেখিবে না, সেই মুখ আর দেখিবে না। এই সত্যটা এতক্ষণ এমন করিয়া তাহার চেতনায় পরিব্যাপ্ত হইয়া ওঠে নাই। মায়ের স্মৃতি যতই দিনে দিনে তাহার অন্তরে শ্বসিয়া উঠিয়াছে, অমিত ততই উহাকে ঠেলিয়া আরও দূরে সরাইয়া দিয়াছে। ততই তাহার নিকট এই কথাটাও সহজ হইয়া উঠিয়াছে; মা কাহারও চিরকাল থাকেন না। "লাইফ মার্চেস", জীবন আগাইয়া চলে। সব পিছনে ফেলিয়া যায়, সকল বন্ধন সে ছাড়াইয়া চলে। অমিতও আগাইয়া চলিয়াছে। কাঁটাতারের মধ্যেও তাহার জীবন আগাইয়া গিয়াছে,—আগাইয়া গিয়াছে তাহার মন, তাহার বুদ্ধি, তাহার আত্মা। কিন্তু সেই আগাইয়া-যাওয়া জীবনের গহনতলে, গহনতর চেতনায় জীবন বুঝি পুরাতন বন্ধনকেও আগাইয়া লইয়া আসে। তাই সেই দেবদারু ছায়া, সেই অশ্রুমাখা মায়ের মুখ, সেই দীর্ঘশ্বাসভরা মায়ের বুক, অমিতের দিন ও অমিতের রাত্রির সঙ্গে জড়াইয়া রহিবে। অমিতের এই আগাইয়া যাওয়া জীবন, অমিতের ক্রমোদ্‌ঘাটিত পৃথিবী মায়ের সেই স্মৃতিকে মুছিয়া মুছিয়াও আবার তাহা প্রগাঢ় করিয়া তুলিবে।

কর্কশ চীৎকারে আত্মঘোষণা করিয়া গোয়েন্দা-গাড়ি থামিয়া পড়িল। অমিত চমকিয়া উঠিল, যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া গেল। সম্মুখে চৌরঙ্গী। দক্ষিণে ও উত্তরে আপিস যাত্রী ট্রামের সার চলিয়াছে। দোতলা একতলা বাস লঘুপক্ষ বিহঙ্গের মতো দুই দিকে চলিয়াছে। আর ট্রাফিক পুলিসের ইঙ্গিত অপেক্ষায় পূর্বে-পশ্চিমে থামিয়া পড়িয়াছে অধীর মোটর গাড়ির অধীর আরোহীরা; অধীরতর তাহাদের ড্রাইভার, গর্জমান যান্ত্রিক যান।

অমিত এই প্রথম স্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইল—নূতন পৃথিবী, নূতন পথ, প্রাণের অভিযান।

সেই চিরদিনকার চৌরঙ্গীই কিন্তু। সেই ট্রাম, সেই বাস, সেই মানুষ, আর

সেই পৃথিবী। মানিতে হইবে—সবই সেই, সবই সেই, অমিতের পূর্ব দিনরাত্রির চেতনার সাক্ষী ও সম্পদ সবই সেই। দেখিয়া একটা নৈরাশ্য জাগে কি মনে? না, জাগে একটা কৌতুক?.. সেই তোমার চিরদিনকার পৃথিবী—সেই তোমার চিরকালের বাংলাদেশ—অনেক কান্না যাহার চাপা পড়িয়াও চাপা পড়ে নাই লালবাজারী দাপটে, চোরাবাজারী কপটতায়,—কই তাহার আত্মার আগমনী? তাহার সেই অশ্রুশুষ্ক মুখে সেই বিরহের দিন রাত্রির স্মৃতি কই?—অমিতের মনে কৌতুক জাগে—সব সেই, সব সেই। তুমি দ্যাখো বা না দ্যাখো, তুমি থাকো বা না-থাকো, তোমার চরণ-চিহ্ন এই বাটে পড়ুক, বা না পড়ুক, সেই চিরদিনকার চৌরঙ্গী তেমনি রঙ্গময়ী। আলো ঝরিতেছে, বায়ু বহিতেছে, ট্রাম-বাস চলিতেছে, প্রাণ উপছিয়া পড়িতেছে—যেন কোন বিলাসিনী উদ্যান-বাটিকার মর্মর-কঠিন শুভ্র জলাধারের বুকে উৎসারিত কোন কৃত্রিম উৎস। কে নাচিবে, কে গাহিবে, কাহার দীর্ঘশ্বাসে মথিত হইবে নিশীথের কোন কক্ষতল, আর কাহাদের মত্ত হাস্যে আবিল হইয়া উঠিবে কোন মধ্যাহ্ন-সভা,—কিছু যায় আসে না। সেই অর্ধাবৃত প্রস্তর-রমণীর কক্ষস্থিত জলাধার হইতে জল ঝরিয়া পড়িবে দিবারাত্রি; চিরদিন স্ফটিকে ফুটিয়া আছে উহার স্বচ্ছ হাস্য। চিরদিনের মতোই চৌরঙ্গীও তেমনি রঙ্গময়ী—প্রাণচঞ্চলা। আর তাই যেন দেখিয়াও শেষ করা যায় না তাহাকে,—এত অপূর্ব।...

বাধামুক্ত গাড়ি গর্জন করিয়া আবার চলিল। লোয়ার সার্কুলার রোডের মসৃণ ঐশ্বর্যকে চোখ মেলিয়া দেখিতে না-দেখিতে এলসিয়াম রো'র ছায়া-সুনিবিড় তপোবন-শান্ত পথ দিয়া আসিয়া গাড়ি বন্ধ ফটকের দুয়ারে দাঁড়াইল। গুর্খা সান্ত্রী ভিতরের ফটক খুলিয়া দিল।

গোয়েন্দা দপ্তর। অমিত পূর্বেও ইহা দেখিয়াছে। প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে এই জেল হইতেই শেষবার এখানে আসিয়াছিল—তাহাও নির্বাসনের নিয়মিত উপক্রমণিকা। গোয়েন্দাচক্র তখন জ্ঞাপন করিয়াছে—'এখনো আত্মসমর্পণ কর এইখানে—ত্রাণ পাইবে।' কিন্তু তাহার পূর্বেও এইখানে অমিত আসিয়াছে। গ্রেফতারের পরে এখানেই প্রথম আসিয়াছিল। এক সপ্তাহ এখানে একটা জেলে কাটাইয়া বিদায় লইয়াছিল জেলার জেলে—সেখানে দেড় মাসের মতো নির্জন কক্ষে আবদ্ধ রহিবার জন্য। তখন অমিত জানিত না এখান হইতে সেবার কোথায় সে যাইতেছে। জানিত শুধু—পিছনে ফেলিয়া যাইতেছে ঐ স্বর্গের বাড়িতে তাহার সাতদিনের বাসভূমির এক সংকীর্ণ নির্জন কক্ষ। এ বাড়ির নয়, ও বাড়ির সেই পিছন দিকটায় দিনের বেলায় তাহার ডাক পড়িত। কোনো একটা ঘরে অমিত একা বসিয়া থাকিত। দিনে দশ পনের মিনিটের জন্য একবার শুনিত 'রায় বাহাদুরের' ফ্রিলজফি ও পলিটিক্স আলোচনা। রাত্রি বেলায় সেই সাতদিন সাতরাত্রি তাহার সহিত পালা করিয়া জাগিয়াছে 'সেলের' লোহার ফটকের সম্মুখে চেয়ার পাতিয়া বসিয়া রায় বাহাদুরের জন কয় শিকারী অনুচর। উদ্দেশ্য সারারাত্রি ঘুমাইতে না দিয়া তাহাকে ক্রমাগত স্নায়ু সংঘাতে ছিন্ন-ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিবে।

*　　　*　　　*

প্রথম প্রথম অমিতের চক্ষে কৌতূহল জাগিয়াছিল,—কেমন চমৎকার সবল পুরুষ ইহারা। ধোপ-দুরস্ত চেহারা, আর ধোপ-দুরস্ত সদালাপ। কিন্তু কেমন সম্পূর্ণ করায়ত্ত ইহাদের ইতরতা, আর সুপরিকল্পিত ইহাদের বর্বরতা। কত ঘষিয়া, কত মাজিয়া এই গোয়েন্দার শিষ্টাচার তৈয়ারী হয়। আর কত মাজিয়া তৈয়ারী হয় এই গোয়েন্দার মিথ্যাচার। মানুষে আর পশুতে কেমন মিলিয়া-মিশিয়া উহাদের জীবনটাকে ভাগ করিয়া লইয়াছে; অথচ কোনোখানে দুই জীবাত্মায় মিলিয়া যায় না। আশ্চর্য উহাদের দেবতার প্রতি ভক্তি; আশ্চর্য ইহাদের পারিবারিক নিষ্ঠা। প্রায় সকলের নিষ্কলুষ চরিত্র। পুলিস হইলেও মদ্য ও মেয়েমানুষ ইহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। ভারত সম্রাটের শ্বাপদবৃত্তিতে "চরিত্রবান" লোক ছাড়া অন্য কাহারও স্থান নাই। 'রায় বাহাদুরও' চরিত্রের দুর্বলতা সহ্য করিবেন না। আর 'রায় বাহাদুর দেবতুল্য মানুষ—সকাল বেলা আড়াই ঘন্টা শিবপূজা করেন।'—কোন রাজবন্দী এই অনুচরদের মুখে এই 'রায় বাহাদুরের' ভক্তি মাহাত্ম্যের কথা না শুনিয়াছে? তিনি যখন 'দেবতুল্য', তখন তাঁহার অনুচরেরাও প্রত্যেকেই দেবদূত। তাহাদের কণ্ঠস্বর সংযত, তাহাদের চলাফেরা সংযত, তাহাদের ইতরতা ও বর্বরতা পর্যন্ত সংযত—প্রয়োজনানুরূপ। এই বাড়ির দেয়ালে সেই সংযম-শিক্ষিতদের জয়গাথা অদৃশ্য অক্ষরে লিখিত।

অমিত অবশ্য তাহাদের সংযমশীলতার সামান্যই পরিচয় পাইয়াছে। এই সংযমী পুরুষেরা শুধু সাতদিন সাতরাত্রি নিদ্রার সুযোগ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল। থার্ড ডিগ্রি ব্যবস্থা। ক্রমাগত প্রশ্ন করিয়াছে, 'সদালাপ' করিয়াছে, কিন্তু গায়ে হাত তোলে নাই, পাঠান রক্ষীদেরও সে কার্যে নিযুক্ত করে নাই। প্রহরে প্রহরে একজনার পর একজনা ইহারা আসিত, গরাদের বাহিরে আসন গ্রহণ করিত, সহাস্যে কুশল জিজ্ঞাসা করিত, তারপর প্রত্যেকেই একবার করিয়া বিস্মিত ব্যথিত হইত—তাই তো অমিতবাবু ঘুমাইতে পায় না,—কী অন্যায়, কী অন্যায়! তখন প্রত্যেকেই আবার নিয়মিত নীতিতে সেলের বাহিরের আসনে বসিত—অমিতের সঙ্গে 'সদালাপ' করিবে! নিদ্রাবঞ্চিত মস্তিস্কে ক্রমাগত সে আলাপ শুনিতে শুনিতে হঠাৎ এক সময়ে অমিতের মনে হইত—একি, সে কোথায়!

'ম্যাও'...

সামান্য গুপ্তচর হইতে শুধু পশুত্বের জোরে বিনোদ বল হইয়াছে এস-আই, সাব ইনস্পেকটার। রাত্রি বারোটার পরে সে অমিতের সহিত দেখা করিতে আসে। অমিত কিছুই বলে নাই। ভদ্রতায় কোনো লাভ নাই; তাই বিনোদ বল এক একবার গোঙাইয়া উঠিতেছে, ক্রোধে ফুলিতেছে। আবার পরক্ষণে ক্রূরভাবে হাসিতেছে, "সব জেনে ফেলেছি আমরা, মজা টের পাবে সবাই।'...অন্ধকারে দেখা যায় শুধু এক জোড়া জ্বলন্ত চোখ। কিন্তু বিনোদ বল কই? মানুষ কই?—'ম্যাও'। শুধু সেই কালো বিড়ালটা বসিয়া আছে। অমিতের মুখের উপর একজোড়া চোখ; ক্রূর,

নিষ্ঠুর ছুরির ফলক তাহাতে ঝলসিয়া উঠিতেছে।...কতবার এমন হইয়াছে, সত্যই অমিত শুনিয়াছে—কমলাকান্তের মতো শুনিয়াছে,—ওইখান হইতে বিনোদ বলের কথা শুনিতে শুনিতে সে শুনিয়াছে—মানুষের স্বর নাই, বিনোদ বলের কণ্ঠ মিলাইয়া গিয়াছে, একটা স্বর বলিতেছে—'ম্যাও!' অর্থাৎ তোমাকে পাইয়াছি তুমি আমার কবলে। আবার...'ম্যাও'।

বিনিদ্র ক্লান্ত মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রীর সেই অদ্ভুত জাগ্রতস্বপ্ন। বুঝিতেই অমিতের হাসি ছলকিয়া উঠিতেছে। অমনি কেমন করিয়া সেই কালো বিড়ালটা বিনোদ বলের দেহাশ্রয় করিয়া গর্জিয়া উঠিয়াছে, 'কি হাসছিস্ যে? শালা কাওয়ার্ড!'

বিড়ালটা বুঝি এবার ফ্যাঁচ করিয়া উঠিল? আরও হাসি পাইয়াছে অমিতের। কিন্তু আরও নূতন নূতন রূপান্তর ঘটিতে লাগিল।

মাধব সরকার সোনার চশমার ফ্রেম মুছিয়া চশমা পরিতে পরিতে দুঃখ জানাইতেছে। কে বলে সে বৃদ্ধ? বৃদ্ধ হইলেও চটপটে লোক মাধব সরকার। এই তো কেমন স্মার্টভাবে কথা বলিতেছে: তাই তো অমিতবাবু বাজে লোকের পাল্লায় পড়ে কি করলেন! এমন আপনার বিদ্যা, এমন আপনার পাণ্ডিত্য, বিলাতে গেলেন না কেন? যান না চলে? যাবেন? লেখাপড়া করতে হলে কিন্তু বিলাত যাওয়া উচিত। দেখুন ভেবে।—এবার মাধব সরকারের চোখটা মিটমিট করিতে লাগিল। তখনো রাত্রি নয়টা মাত্র—তিনদিন কি চারদিন ঘুম নাই অমিতের! কিন্তু শুনিতে শুনিতে অমিতের মনে হইয়াছে—একি, মাধব সরকারের মুখটা কেমন করিয়া উড়িয়া গেল? ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসিল একটা বৃদ্ধ মর্কটের মাথা। আর সেই মর্কটের নাকে চড়িয়াছে মাধব সরকারের সোনার চশমাটা, মিটমিটে তাহার চোখ।...মানুষ, না মর্কট!...

একবার মানুষ, একবার মর্কট!

অমিতের সমসাময়িক ছাত্র ভূপেন ঘোষ। অমিতকে সে জানাইল, এই পুলিস লাইনে কিছু করিতে পারে নাই। করিবে কি করিয়া? তাহার নেশা তো অমিত দেখিয়াছে—প্রাচীন ভারতের সভ্যতা, শাস্ত্র, ইতিহাস সে ভালোবাসিত। এই জন্যই তো অমিতের সঙ্গে আজ ভূপেন ঘোষ তর্ক করিতে আসিয়াছে। গত রবিবারে 'নেশনের' প্রবন্ধটায় অমিত এসব কি আজগুবী কথা লিখিয়াছে? লিখিয়াছে যদি অমিত প্রমাণ দিক। একটা প্রবন্ধে সব প্রমাণ দেওয়া যদি সম্ভব না হয়? তাহা হইলে অমিত বড় গ্রন্থ লিখুক না?— বেশ তো, লিখুক অমিত গ্রন্থ। না, না। ভূপেন ঘোষের মতো অমিত যেন নিজেকে ক্ষয় না করে।...অনেক বড় কাজ করিবার আছে অমিতবাবু জীবনে। এদেশের ইতিহাসকে জানা, বোঝা, লেখা,—নূতন করিয়া সৃষ্টি করা। 'হাঁ, এই তো দেশ গঠন, জাতি গঠন, স্বাধীনতার বেদী নির্মাণ। এগিয়ে যান অমিতবাবু, বেরিয়ে যান। হাতে তুলে নিন আমাদের কালের ছাত্রদের শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব।'—চোখের কোণে একটা চোরা চাহনি, না? শুনতে শুনতে অমিত যেন বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে—কে কথা বলিতেছে? চিন্তাশীল ব্রজেন্দ্র রায়, না চতুর

এ্যাটর্নি সাতকড়ি? এ কোন 'নিশার ডাক' অমিতের কানে? না, এ কোন রাত্রিচারী শৃগালের স্বর?..মানুষ, না শৃগাল? মানুষ, না শৃগাল?...

অনেকদিনে অনেক বৎসরে একটু একটু করিয়া অমিতের কাছে সেই সাতদিনের এই মানুষগুলির স্মৃতি ঝাপসা হইয়া যাইতেছিল। আবার এখন মনে পড়িতে লাগিল। একবার পারা যায় না সেই মুখগুলিকে মিলাইয়া দেখিতে? সত্যই কি মার্জারের মুখ, মর্কটের মুখ, শৃগালের মুখ উহাদের? আজ এই মুহূর্তে নিশ্চয় আবার মানুষের মুখেও তাহা পরিণত হইয়াছে! অথবা মানুষের মুখোশেই এখন তাহা আবার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া...ইহাদের কোনটা কাহার মুখ? কোনটাই বা কাহার মুখোশ? ..

মেডিকেল কলেজে হঠাৎ জ্যোতির্ময়কে মুখ বাড়াইয়া দেখিল—কে ওই যুবকটা? আর অমনি কেন পলাইয়া গেল? চেনা-চেনা মুখ। না, মিথ্যা নয়। পরদিন নিজেই গোবিন্দ ধর নিভৃতে, সন্তর্পণে জ্যোতির্ময়ের শয্যাপার্শ্বে আসিল। সহজভাবেই সে স্বীকার করিল,—জ্যোতির্ময় দেশে ছিল না; অনেক কথাই সে জানে না। জানে না গোবিন্দ ধরের পিতা বাতব্যাধিতে অচল হইয়া পড়িয়াছেন; জমিদারের কাছারিতে গোমস্তার কাজটুকুও তাঁহার গিয়াছে। জানে না গোবিন্দের মা অন্ধ হইয়া পড়িয়াছেন; গৃহকর্ম বিধবা বোনটিই করে। সে-ই বা যাইবে কোথায়? কিন্তু ছোট ভাইটি ফার্স্টক্লাসে উঠিয়া আর পরীক্ষা দিতে পারিল না। পাশ সে করিত, কিন্তু গোবিন্দ ধর তখন তাহার পরীক্ষার ফি জুটাইতে পারে নাই। এখন? এখন সম্প্রতি ভাইটিকে বার্নায় এপ্রেন্টিস্ করিতে পারা গিয়াছে—এই আপিসেরই একজন বড় ইনস্পেক্টারের সুপারিশের জোরে। তিনি, গোবিন্দের মামার দেশের লোক, মাতারও পরিচিত। মাতার তাগিদে ও তাঁহারই অনুগ্রহে প্রথম গোবিন্দ গুপ্তচরের বৃত্তি পাইয়াছিল—কলিকাতায়।

জ্যোতির্ময় শুনিয়াছে, 'দেশে যাই নি। দেশে ওকাজ করব কি করে আমি? সেখানে তুমি যে একদিন আমাদের কাঁধে হাত রেখে বলেছিলে স্বাধীনতার কথা, স্বদেশীর কথা। বে-ইমানী করি নি সেই নিজের দেশের সঙ্গে, তোমার আমার কোনো সহচরের সঙ্গে। দেশের সঙ্গে বা জাতির সঙ্গেও বে-ইমানী করি নি—পারতে। ফিরে তো যাবে একদিন, গ্রামে জিজ্ঞাসা করো। তারপর বে-ইমানী করে থাকলে যেমন উচিত শাস্তি দিয়ো আমাকে।'—কলিকাতার পথে পথে তখন গোবিন্দ ঘুরিয়াছে, আই-বি'র গুপ্তচর হিসাবে, চোখ রহিয়াছে মানুষের উপরে। তখনকার দিনে সে বিশ-পঁচিশ টাকা পাইত। তাহাতেই তাহার পিতা, মা ও বিধবা বোন বাঁচিয়াছে। আর ভাইকেও একটা পথ করিয়া দিয়াছে। এখন? গোবিন্দ লেখাপড়া জানা কনেস্টবল হইতে পারে। অবশ্য সে পক্ষে বাধাও আছে,—তাহার স্বাস্থ্য। কিন্তু সেই পদের জন্য তাহার আগ্রহ নাই। ইতিমধ্যে সে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় মোক্তারি ক্লাসে পড়ে। একবার কিছু টাকা যোগাড় করিয়া পরীক্ষা দিলেই সে পাশ করিয়া ফেলিবে। ফিরিয়া যাইবে আপনার মহকুমার,

কোর্টে। বড় কিছু না হউক, সামান্যভাবে খাইবার পরিবার ব্যবস্থা সে নিশ্চয়ই সেখানে করিতে পারিবে। পঁচিশ টাকা যোগাড় করিবার জন্য এমন লাঞ্ছনা সহিতে হইবে না। 'তোমাদের হাতে লাঞ্ছনা নয় : তা সইতে হলে খেদ থাকত না। দেশের লোকের হাতেও আমাদের লাঞ্ছনা নয়; তাও তো আমাদের পাওনা বলেই মনে করতে পারতাম। কিন্তু অসহ্য এই আপিসের ব্যবহার। গোয়েন্দা এ-এস্-আই থেকে তাদের ইন্‌স্পেক্‌টার পর্যন্ত প্রত্যেকটি জানোয়ারের হাতে। কাকে কাকের মাংস খায় না, শুনেছি। গোয়েন্দা কিন্তু গোয়েন্দার মাংস পেলেই খুশি। অন্তত আমাদের মতো মড়ার উপর খাড়া না চালালে তাদের মনে সুখ নেই। সিংহের লাথি সহ্য হয়,---বুঝি যখন তোমরা অপমান করো;---কিন্তু শেয়ালের লাথি, ব্যাং-এর লাথি?'...

গোবিন্দ ধর নিশ্চয়ই মোক্তারি পাশ করিবে; জ্যোতির্ময় তাহার কথা অর্ধেকটা বিশ্বাস করিয়াছিল। হয়তো গোবিন্দ ইতিমধ্যে করিয়াছে? করিয়াছে কি? না, এখনো করে নাই? গোয়েন্দার গুপ্ত অনুচররূপেই এখনো কি সে সেইরূপ দিন যাপন করিতেছে? ..

আঙিনার দুই একটি যুবকের দিকে অমিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইল।... ইহাদের মধ্যে কি গোবিন্দ ধর আছে? ইহারাই কি কেহ গোবিন্দ ধর?--- বিনোদ বলের মতোই গোবিন্দও সামান্য গুপ্তচর রূপে জীবন আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু, তখনো সম্মানে জীবন গঠন করিবার স্বপ্ন সে দেখিত।—দূর মহকুমার সামান্য মোক্তারের জীবিকা লাভ করিয়া সে তাহার অচল পিতাকে, অন্ধ মাতাকে, অসহায় ভগ্নীকে বাঁচাইবে; কনিষ্ঠভ্রাতাকে মানুষ করিবে; আবার সম্মানের সংসার বাঁধিবে, মানুষের জীবন গঠন করিবে। ততক্ষণ? ততক্ষণ দেশবাসী ক্ষমা করুক তাহার গুপ্তচরবৃত্তি, আত্মদ্রোহিতা, এই মুখের উপর আঁটা মুখোশ।. সত্যই গোবিন্দ তাহা বহিয়াছে কি? না, সেই মুখোশের সঙ্গে আপনাকে মানাইতে মানাইতে তাহার সেই মুখ ক্রমে মুখোশ হইয়া গিয়াছে?

তাহা হইলে এইখানেই কি এখনো বিচরণ করিতেছে সেই গোবিন্দ ধর?... পার্শ্বের ওই দুয়ারে দাঁড়াইয়া চোরা-চাহনিতে এই মুহূর্তেই অমিতকে সে দেখিয়া লইয়াছে,—আগামী দিনে হয়তো পদে পদে সে অমিতকে অনুসরণ করিবে;— কে জানে সে-ই গোবিন্দ ধর কিনা? কে বলিবে এই লোকটার চতুর চোরা-চাহনিভরা মুখটাই মুখ, না উহা মুখোশ?---উহার পিছনে আছে ভূপেন ঘোষের মতো কোনো শেয়ালের মুখ, কিংবা গোবিন্দ ধর-নামা কোনো মানুষের মুখ? ইহাদের কে মানুষ কে মুখোশ? কোন মুখটা সত্যই মানুষের, কোন মুখটা সত্যই কোনো জ্বলন্তচক্ষু মার্জারের? মিটমিটে তাকানো মর্কটের, কিংবা চুরি-করিয়া তাকানো কোনো শৃগালের?

অমিতের গাড়ির সঙ্গী আফিসের ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিল। বলিল : রায় বাহাদুর বারোটার আগে আসবেন না। শিবপূজা না করে তিনি জলগ্রহণ করেন না।

অমিত মনে মনে যোগ করিল—আর 'রায়বাহাদুর দেবতুল্য মানুষ।' কই এখনো এই কথাটা বলিল না যে এই লোকটা? অমিতের হাসি পাইল—ভারতেশ্বরের গুপ্তচরেরা সকলেই জগদীশ্বরের বিশ্বস্ত অনুচর,—ইহা একটি পরীক্ষিত সত্য।

লোকটি বলিতেছিল: চলুন। আমাদের রায় সাহেবের সঙ্গেই দেখা করিয়ে দিই—কি হবে অতক্ষণ দেরি করে?

অমিত গাড়ি হইতে নামিল। লোকটিকে অনুসরণ করিল। পার্শ্বদ্বার দিয়া দ্বিতীয় একটা বাড়িতে গিয়া ঢুকিল। বড় একটা কামরার কাছে পৌঁছিতেই দ্বিতীয় একজন ভদ্রলোক তাহাকে সম্বর্ধনা করিল: এসেছেন? চলুন—রায় সাহেবের কাছে। অমিতের সঙ্গীকে বলিল, তুমি এখানেই থাকো।

নিশ্চয়ই এই নূতন লোকটি অন্ততঃ ইন্‌স্পেক্‌টার হইবে। না হইলে এই সাব্‌-ইন্‌স্পেক্‌টার পদের কর্মচারীটিকে 'তুমি' বলিয়া এমন অকুণ্ঠিতভাবে সম্বোধন করিত না। বাঙালীর সম্বোধন সমস্যা লইয়া বাঙলা মাসিক পত্রে কয়েক বৎসর পূর্বে অমিত তর্ক দেখিয়াছিল। 'তুমি' ও 'আপনি'র সমস্যা মীমাংসা করিতে না পারিয়া বাঙলার সম্পাদক ও সাহিত্য-পাঠকদের নিদ্রা লোপ পাইতেছে—যেকালে 'মার্কস', না, 'বেদান্ত' লইয়া বিনিদ্র রাত্রি ও কণ্টকিত দিন যাপন করিতেছিল সুনীল, শেখর, জ্যোতির্ময়েরা। অথচ, গোয়েন্দা পুলিসের নিয়মে কেমন সুমীমাংসিত হইয়া গিয়াছে এতবড় সম্বোধন সমস্যা। এক সঙ্গে কাল যাহারা বসিয়া কাজ করিয়াছি, আজ আমি যখন সেই গ্রেড্‌ ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়াছি,—হয়তো এখনো অস্থায়ীভাবেই উঠিয়াছি—অমনি আমার পূর্বসহযোগী হইবে আমার সম্বোধনে 'তুমি', আর আমি থাকিব তাহার সম্বোধনে 'আপনি'। আমি ডাকিলে সে থাকিবে সম্মুখে দাঁড়াইয়া সাব্‌-অর্ডিনেট-সম্মত বিনয়ে, আর আমি থাকিব বসিয়া অফিসার-সম্মত সম্মানে।

কিন্তু বেশ এই ভদ্রলোকটি। অমিতকে কেমন সুন্দর সস্মিতমুখে সম্বর্ধনা করিল—যেন কত কালের পরিচয়। অথচ এই প্রিয়দর্শন, স্বাস্থ্যবান্‌, বুদ্ধিমান্‌ মানুষটিকে অমিত ইতিপূর্বে কোথাও দেখিয়াছে বলিয়া মনেও করিতে পারে না। অমিত কি ইহার সঙ্গে এমন পরিচিত, এমন চিরকালের চেনার মতো ব্যবহার করিতে পারিত?

পর্দা একটু সরাইয়া ভদ্রলোক অমিতকে লইয়া ঘরে ঢুকিল, পা টিপিয়া টিপিয়া ভয়ে সম্ভ্রমে। দ্বারের বাহিরে যে দেহ এমন সমুন্নত ছিল দ্বারের এপারে আসিতেই তাহা বিনয়সঙ্কুচিত হইল। প্রিয়দর্শন মুখখানাও একটা চতুর স্নিগ্ধ স্তুতিতে রূপান্তরিত হইয়া গেল।.. চমৎকার!—অমিত মনে মনে স্বীকার করিল, চমৎকার!...মুখে আর মুখোশে এইরূপ পালাবদল অমিত পূর্বেও দেখিয়াছে। আরও বেশিই দেখিয়াছে। 'রায় সাহেবের' নিকটে ঢুকিতে যতটুকু পা টিপিয়া ঢুকিতে হইল, যতটুকু দেহকে সঙ্কুচিত আনত করিতে হইল, মুখে ধরিতে হইল দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর মতো যতটুকু ভীত দৃষ্টি, কিংবা অনুগৃহীত অধস্তনের মতো স্তুতি-স্নিগ্ধ চাহনি,—'রায় বাহাদুরের'

ঘরে ঢুকিতে উহার মাত্রাই আরও বাড়াইতে হইবে : আরও বেশি পা-টিপিয়া ঢুকিতে হইবে; দেহকে আরও সঙ্কুচিত হইতে হইবে, আরও সন্তর্পণে দাঁড়াইতে হইবে; কিংবা আরও একটু সৌভাগ্যপুষ্ট অনুগ্রহভাজনের হাসি রাখিতে হইবে মুখে ফুটাইয়া।...

চমৎকার!—অমিত মনে মনে হাসিল।

রায়সাহেব কি একটা কাগজ চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া পড়িতেছিলেন। ঘরে পদপাত ও ছায়াপাত দুইই অনুভব করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি আচরণে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিলেন না। কর্মব্যস্ত লোকের পক্ষে তাহা নিয়ম নয়। ইন্‌স্পেক্টর ভদ্রলোক খানিকটা ইঙ্গিতে, আবার খানিকটা রায়সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য, অনুচ্চস্বরে অমিতকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিল,—বসুন।

অমিত বসিতে বসিতে শুনিল টেবিলের অপর দিককার কাগজে-ঢাকা সাহেবি পোশাকের মধ্য হইতে ঘোঁৎ করিয়া একটা শব্দ হইল। সম্ভবত সেই মুখ বলিল—'এ্যা?' যাহাই বলুক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ইন্‌স্পেকটর ভদ্রলোকের মুখ স্তুতির হাসিতে উদ্ভাসিত হইল, তাহার দুইটি হাত সংযুক্ত হইয়া একখণ্ড কাগজ-সুদ্ধ সমুখিত হইল কপালের দিকে।

সাহেবি পোশাকের সম্মুখ হইতে কাগজ সরিয়া গেল। একখানা মুখ প্রকাশিত হইল।...

'বাঙালী বুলডগ্‌' হয় না? 'বাঙালী পাঁঠাই' কেবল হয়? বুলডগ্‌ কি একমাত্র সাহেবদের দেশেই জন্মে? অমিত তাহা মানিতে পারিবে না। এইরূপ একটা বাঙালীসুলভ সাধারণ খর্বতার সহিত সাধারণ মুখাবয়ব থাকিলেও মুখ দেখিলেই বুলডগের মুখ বলিয়া চিনিতে পারা যায়—যদি চোখে থাকে এই দৃষ্টি,—সতত উদ্‌গ্রীব, সতত উৎকর্ণ, ইঙ্গিতে যুদ্ধোন্মুখ। ইংরেজ এদেশে অনেক-কিছু করিয়াছে। কিন্তু তাহারা স্পানিশ বা পর্তুগীজ নয়। দো-আঁশলা জাত সৃষ্টি করিবার অপেক্ষা তাহারা শ্বেত রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করাই বেশি পক্ষপাতী। সেই সাম্রাজ্যাধিকারীর বিশুদ্ধ রক্ত বিশুদ্ধ রাখিয়াই তাহারা সৃষ্টি করে দো-আঁশলা মানুষ, যেমন, দেশী আই-সি-এস্‌; যেমন লেঃ কর্নেল পিণ্ডিদাস; যেমন রায়সাহেব অম্বিকাচরণ সরকার —ইংরেজ শাসকের সৃষ্টি 'বাঙালী-বুলডগ্‌'।

কিন্তু বুলডগ্‌ও হাসিতে পারে। কে বলিল, 'মানুষই একমাত্র জীব যে হাসিতে জানে।' ঠিক বলিয়াছেন হব্‌স। উচ্চহাসি একমাত্র মানুষই হাসিতে জানে। এমন কি, মানুষ-বুলডগ্‌ও একেবারে হাসি ভুলিয়া যায় না। ইংরেজের সৃষ্টি 'বাঙালী-বুলডগ্‌' এই রায়সাহেবও বাঙালীর মতো সানুগ্রহ কন্ঠে বলিলেন : কি মনোমোহন, কি চাই?

মনোমোহন একপদ অগ্রসর হইয়া কৃতার্থভাবে কহিল : অমিতবাবুকে নিয়ে এসেছি।

অমিতবাবু?—রায়সাহেবের দৃষ্টিটা চশমার মধ্য দিয়া একবার অমিতের দিকে হিংস্র কুটিল তীক্ষ্ণতায় ছুটিয়া আসিল।—বুলডগের সন্দিগ্ধ সন্ধানী চক্ষু অমিতের মুখের উপর পড়িল। পরক্ষণেই তাহা আবার বাঙালী ভদ্রতার রীতিতে পরিবর্তিত হইয়া গেল : ওঃ, অমিতবাবু। নমস্কার! নমস্কার!

অমিত নমস্কার করিত, অভ্যাসবশেই নমস্কার করিত, তাহার হাত সেজন্য কপালের দিকে উঠিতেছিল। কিন্তু আরও তাড়াতাড়ি সেই যুক্তকর কপালে উঠিল সহজকণ্ঠে যখন রায়সাহেব জানাইলেন,—'নমস্কার, নমস্কার!' একটু পরাজিত, একটু বিমূঢ়ভাবেই অমিত অর্ধস্ফুটকণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে বলিল : নমস্কার।

তারপর?—রায়সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাড়ি চললেন?

অর্ডার পেলাম রেশট্রিক্‌শান সুদ্ধ।

রায়সাহেব তাহার কথাতে কান দিলেন না : ছিলেন ভালো? কি বলেন?

ভালো ছিল অমিত? এবার অমিতের মুখে অবজ্ঞার হাসি ফুটিতেছিল। কিন্তু তাহা ফুটিতে পারিল না। আর তাহার ইচ্ছা নাই ইহাদের এখন বিদ্রূপ করে—এত বৎসর নির্বাসনের পরে সে দুর্বুদ্ধি কাটিয়া গিয়াছে। উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া রায়সাহেব নিজেই বলিলেন : তারপর, কি করবেন এবার, অমিতবাবু?

কি করিবে, অমিত? ছয় বৎসরে তাহাই ঠিক করিয়াছে; কিন্তু সত্যই কি ঠিক হইয়াছে? তথাপি অমিত জানে এই প্রশ্ন উঠিবে। এখানে উঠিবে, অন্য লোকও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে। আর, এই প্রশ্নের একটা সাধারণ উত্তরও সে স্থির করিয়া রাখিয়াছে। অমিত বলিল : কি করব, আমি তা কি করে বলি? কাজকর্ম আপনারা কী করতে দেবেন, তার উপরই তো তা নির্ভর করে।

আমরা করতে দেবো কেমন, অমিতবাবু? আমরা সরকারী পলিসী অনুসারে কাজ করি; যে রাজা, যে মন্ত্রী আমরা তো তারই চাকর।

.. কত সত্য কথা; আর কত মিথ্যাও।—সত্যই তো তাহারা চাকর মাত্র; আর আরও সত্য— এই দেশে চাকরই কর্তা। তাই এই শাসন-ব্যবস্থার নাম 'নোকরশাহী'। যে-কোনো স্বাধীনজীবী দোকানী কিংবা মিস্ত্রি-কারিগরের অপেক্ষা এদেশে একজন পাহারাওয়ালার বা পিয়াদার ক্ষমতা বেশি। যে কোনো বৈজ্ঞানিক বা সাহিত্যিকের স্ত্রীর অপেক্ষা সমাজে ও সংসারে বেশি সম্মান একজন ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রীর — খাঁ বাহাদুরনীর বা রায় বাহাদুরনীর। খাঁ সাহেব ফতে মহম্মদ বা রায়বাহাদুর যাদব দাসের সার্টিফিকেট তোমার 'সচ্চরিত্রতার' প্রমাণ;—ডাক্তার মেঘনাদ সাহার পরিচয়লিপি নয়, ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষ্যও নয়। আর, সেই চর-গুপ্তচর-ইনস্পেকটরের তৈয়ারী ফাইলে, তুমি অমিত, তাহাদের পক্ষে শুধুই অমিত। অথবা, মাত্র 'ফাইল নং ৫১৩; স্পেশ্যাল কনফিডেনশিয়াল,'—ওই যাহা মনোমোহন রায়সাহেবের সম্মুখে আগাইয়া দিতেছে—লাল খেরুয়ায় বাঁধানো; রামের অজ্ঞাত রামায়ণ। অথবা, ভারতবর্ষের এ-কালের মহাভারতের এই "অমিতোপাখ্যান।'

রায়সাহেব কিন্তু ফাইল ছুঁইলেন না। নিজের পূর্বেকার কথারই জের টানিয়া বলিলেন : তাও এখন শেষ হোল। সাহেবেরা যাচ্ছে, এবার মজা টের পাবেন ক্রমশ—

অমিত যেন কর্নেল পিণ্ডিদাসকে দেখিতেছে। পাঞ্জাবী ভাগ্যবান পিণ্ডিদাসও বুঝিতেছে, সাহেবদের মুরুব্বিয়ানায় ফাটল ধরিয়াছে। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে তাহারও মনে সংশয় জন্মিয়াছে। সেজন্য কর্নেল পিণ্ডিদাস ইতিমধ্যেই সেই ভবিষ্যতের মতো করিয়া আপনার ভাগ্যতরী ভাসাইবার জন্য প্রস্তুতও হইতেছে। কিন্তু বুলডগ্ রায়সাহেব বুঝি এত সহজে প্রভু-পরিবর্তন মানিয়া লইতে পারিবে না। তাই দুঃখে ক্ষোভে অনুশোচনায় অভিসম্পাতে তাহার চিত্ত মথিত। 'মজা টের পাইবে' এবার তাহার দেশের নির্বোধ লোকগুলি ..মজা টের পাইবে বৈকি। অমিতও তাহা বুঝে। যাইবার নামে ইংরেজ সেইরূপেই 'যাইবে' যাহাতে দেশের লোক 'মজা টেব পায়', রাখিয়া যাইবে তাহাব গাঅত পূতিগন্ধময় শবের গলিত পূতিগন্ধময় অবশেষ—এই পচা-গলা স্বদেশী চাকব-তন্ত্র; হয়তো তাহাদেরই মতো পচা-গলা নূতন এক মুনিব-দল।

রায়সাহেব কিন্তু শ্লেষও করিতে জানেন, আমরা স্বরাজ পাচ্ছি; নবাবী আমল ফিরে আসছে। দেখবেন এই ডিপার্টমেন্টেও আব আমরা থাকব না। ..আসছে ফিফ্‌টি পাসেন্ট—

কে ইহাকে বিলিতী বুলডগ্ বলে? এ যে বাঙালী বাড়ির গৃহপালিত দেশী কুকুর। নেড়ী কুকুরের পাল দেখিয়া আপনার আভিজাত্য রক্ষার জন্য যে প্রভুর গৃহে ছুটিয়া আসিয়া দুয়ার হইতে সদর্পে ঘোষণা করে আপনার বীরত্ব : 'ঘেউ'। তারপর, একটু মার খাইলেই যাহার কণ্ঠস্বর হইয়া ওঠে সানুনয় 'কেঁও কেঁও'। তখন লাঙ্গুল যায় পদদ্বয়ের অভ্যন্তরে; দেহ সংকুচিত হইয়া আশ্রয় লয় গৃহের অন্তরালে কোনো নিরাপদ সীমায়। এই তো সেই চিরদিনের 'চাকরে' বাঙালী, তোমার-আমার মতো চিরদিনের কুকুর বাঙালী, অমিত।

বুলডগের মুখের অভিযোগও এইবার অনুযোগে পরিণত হইল : কি করলেন আপনারা অমিতবাবু? একটা জেনারেশন শেষ করে দিলেন?

অমিত চমকিত হইল! একটা জেনারেশন বলি দিতে হইবে—ইহাই তাহারও ধারণা ছিল? এই বহু জেনারেশনের সঞ্চিত আবর্জনা না হইলে দূর করা যাইবে না; বহু বহু ভাবী জেনারেশনকে এই আত্মার অবমাননা হইতে রক্ষা করিতে হইবে। সেই আত্মদানের মধ্য দিয়াই তাহাদের জেনারেশনের আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মোপলব্ধি। ...কিন্তু শুনিতে না-শুনিতে অমিতের এই বিদ্যুৎগতি চিন্তার চমক নিবিয়া গেল। রায় সাহেব তখন দুঃখ করিতেছেন : হিন্দু ইয়ংম্যান, আর রইল কই? গিয়ে দেখুন দেশেগ্রামে। হিন্দু ভদ্রলোক আজ আর পরিবাব পরিজন, মান ইজ্জত নিয়ে গ্রামে থাকতে পারে না।

রায়সাহেব অম্বিকাচরণ সরকার রীতিমতো ব্যথিত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। হিন্দুর মান ইজ্জত রাখিবার জন্য এই হাজার চারেক কিংবা হাজার পাঁচেক বাঙালী যুবক

জীবনপণ করিয়া তাঁহার মতো সাহেবের সেবা করিল না। কী—দুর্ভাগ্যের কথা জাতির! —হাসি পাইতেছে কি, থাক; আর সেই দুর্বুদ্ধিতে কাজ নাই এখন। —অমিত নীরবে শুনিল, হাসিও গোপন করিল। না, রায়সাহেব অম্বিকাচরণ সরকার ইংরেজের পদলেহী নয়; শুধু হিন্দুসমাজের দায়েই তিনি জীবনে এই গুরুদায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন।

হঠাৎ রায়সাহেব অমিতকে প্রশ্ন করিলেন: বিয়ে করেন নি কেন?

অমিত এই আকস্মিক প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। না হইলে অভ্যস্ত উত্তরই দিত, 'পাত্রী জুটল কই?' কিন্তু প্রশ্নটা বড় আকস্মিক আসিল। হিন্দুর এতখানি সামাজিক ব্যথা-বেদনায় উদ্বিগ্ন রায়সাহেবের মুখে হঠাৎ এমন একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন! কিন্তু রায়সাহেবের মুখ ততক্ষণে গম্ভীর হইয়াছে: বিয়ে করেননি কেন? সমাজের একটা যোগ্য লোক আপনি! সংসার করুন, ঘর বাঁধুন, সমাজে সুস্থ আবহাওয়া, পবিত্র জীবন আবার ফিরিয়ে আনুন।

'হোলি ফ্যামিলি'?...শশাঙ্কনাথ কোথায় তুমি? এইখানে, এই আপিসে এই রায়সাহেব অম্বিকাচরণ সরকারের মুখে গৃহ-বন্ধনের প্রশস্তি একবার শুনিয়া যাও। ইহাদের অপেক্ষা দাম্পত্য জীবনের সুস্থ স্তম্ভ আর কে আছে?

অমিতের কানে গেল রায়সাহেব বলিতেছেন: মেয়েগুলোর বিয়ে হয় না, কি করবে? শেষে পলিটিকসেও আপনারা ছেলে-মেয়ে নিয়ে খেলা শুরু করে দিলেন, অমিতবাবু? কোথায় গেল আপনাদের সে যুগের ব্রহ্মচর্য্য, সেই আত্মসংযম, তপস্যা?

এবার অমিতের অসহ্য হইল। কিন্তু তথাপি অমিত মাথা খারাপ করিল না। ছয় বৎসরে মাথা এখন কিছুটা ঠাণ্ডাও হইয়াছে। অমিত বোঝে, সহজে যেখানে-সেখানে তাহা গরম করা সুবিধার কাজ নয়। তবু সে বলিল: বরং এইভাবে দেখুন না কেন ব্যাপারটা।—এমন প্রকাণ্ড, অপরাজেয় সত্যের অর্থ কি? 'ড্রেন ইন্‌স্পেক্টারের রিপোর্ট'ই' শুধু দেখছেন কেন?—আর সে ড্রেনও যখন একটা বিজাতীয় শাসন-ব্যবস্থারই রচনা—

মুহূর্তমধ্যে বুলডগের চোখ জ্বলিয়া উঠিল। সন্দিগ্ধ শিকারী কুকুরের দৃষ্টি সেই চক্ষে আবার ঝকঝক করিতে লাগিল। রায়সাহেবের কালোমুখের মাংসপেশী লৌহদৃঢ় হইয়াছে। কিছু না বলিয়া তিনি ফাইলটা তুলিয়া লইলেন। মনোমোহন পর্য্যন্ত প্রমাদ গণিল। খুলিলেন প্রথম পাতাটা। অমিত বুঝিতে পারিল রায় সাহেব তাহা পড়িতেছেন না। শুধু আপনার মন স্থির করিয়া লইবার জন্যই একটু সময় লইতেছেন।

ফাইল হইতে চোখ তুলিয়া আবার যথাসম্ভব স্বাভাবিক কণ্ঠে রায়সাহেব বলিতে গেলেন: যান।

সেই কণ্ঠ তেমন পরিষ্কার হইল না। তিনি ফাইল সশব্দে ফেলিয়া দিলেন টেবিলের উপর হইতে মেঝেতে, মনোমোহন তাহা অমনি কুড়াইয়া তুলিয়া লইল।

রায়সাহেব বলিলেন : যান, কমিউনিজম্ করুন গিয়ে এবার।—কিন্তু দেখবেন রেশট্রিক্শানগুলি ভেঙে আমাদের বিপদে ফেলবেন না। সাহেবরা তো কাউকে ছাড়তে চায় না। আমরাই ছাড়তে জোর করছি। দেখবেন,—আমাদের বিপদ ঘটাবেন না।

বলিতে বলিতে অনেকটা পরিষ্কার হইল সেই স্বর। রায়সাহেব বলিলেন, কয়টা মাস একটু সাবধানে থাকবেন। না হয় লেখাপড়াই করুন না এবার?

মনোমোহনের চোখ হইতে অমিত উঠিবার ইশারা পাইয়াছিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিতে করিতে বলিল, ইচ্ছা তো ছিল। এতদিন ইচ্ছামতো বইপত্র পাইনি, দেখি এবার। নমস্কার।

নমস্কার।

অমিত বাহির হইয়া আসিল। ঘরের বাহিরে আসিয়া মনোমোহন চলিতে চলিতে বলিল, এত তর্কও করেন আপনারা—কমিউনিজম্ ধরে অবধি।

অমিত তর্ক করিল, কোথায়? কিন্তু এই তর্ক অপেক্ষাও অমিতের কৌতূহল জাগিল শেষ কথাটুকুতে 'কমিউনিজম্ ধরে অবধি',—

আপনাদের তাই মনে হচ্ছে বুঝি?—জিজ্ঞাসা করিল অমিত।

মনোমোহন অমিতকে শিক্ষিত বলিয়া মানে। তাই অমিতের সম্মুখে নিজেকেও বুদ্ধিমান, শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিবার ইচ্ছা তাহার কম নয়। সময় পাইলেই তাহা দিত। কিন্তু সে দেখিয়া হতাশ হইয়াছে রায় সাহেবের উপরেও অমিত কথা বলে—এই সময়ে এখনো আবার সেই তর্ক! অমিতের মত-পথ সে জানে না—তবে কমিউনিস্টদেরই এরূপ দুর্বুদ্ধি হয়। তথাপি মনোমোহন অমিতকে সাহায্য করিতেও চায়। সে তাই বলিল : কি হয়েছিল? ওঁরা সেকেলে মানুষ; বলেছিলেন নয় আপনাকে একটা কথা। অমনি তর্ক বাধালেন। বাড়ি যাচ্ছেন, এ সময়ে এ সব না করলে কী ক্ষতি হত?

অমিত ছল-অনুতাপে বলিল : তাই তো, বড় ভুল হল, না?

না, না, বিশেষ কিছু নয়। তবে যাচ্ছেন তো, নিজেই গিয়ে দেখবেন—কি হয়েছে দেশের ছেলেমেয়েগুলি!

অমিত গাড়িতে উঠিতেছিল, বলিল, কেন কি ব্যাপার?

অমিতবাবু, ক্যারেক্টার চাই, ক্যারেক্টার চাই। তা যদি জাতের নষ্ট হয়ে যায়, তবে জাতের থাকে কি?

'ক্যারেক্টার'! শেষে এখানে এই গোয়েন্দা আপিসে অমিতের শুনিতে হইল 'ক্যারেক্টার চাই, ক্যারেক্টার চাই।' ইহাই গোয়েন্দা আপিসের চূড়ান্ত রায় একালের যৌবনের সম্বন্ধে। গাড়ি স্টার্ট লইয়াছিল...অমিত নমস্কার বিনিময় করিল।

'ক্যারেক্টার চাই' : হাসিবে, না, কাঁদিবে, অমিত!—অমিত নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল।—সত্য কথাই তো, ইহারাই তো এই গভীর তত্ত্বকথা বলিতে পারে—

'ক্যারেক্টার চাই।' সকলেই ইহারা দেবতুল্য মানুষ দেবদ্বিজে ভক্তিমান্, 'চরিত্রবান্',—মদ গাঁজায় আসক্তি নাই, কিছুতেই পরস্ত্রী লইয়া প্রকাশ্যে কেলেঙ্কারী বাধায় না। চরিত্রবান্ স্বামী, দায়িত্ববান্ পিতা। অর্থাৎ দাম্পত্য কর্তব্য পালন করিয়া ভারী অলঙ্কার ও দামি শাড়ি ইহারা যোগাইয়া থাকে। পুত্র-কন্যাদের ভালো খাওয়ায়, ভালো পরায়; 'বাজে লোকের' সাহচর্য হইতে সযত্নে তাহাদের রক্ষা করে। চাকরে বা হবু-চাকরে পাত্রের হাতে সালঙ্কারা কন্যাকে সযৌতুক দান করে। আর নিজে গুলিতে মরিয়াও পরিবারের স্বচ্ছন্দ ভরণ ব্যবস্থা পাকা করে। ...'কিং চার্লস্ প্রেমবান্ পতি, স্নেহশীল পিতা;—ত্রিশ বৎসরেব অত্যাচার, স্বৈরাচার বা কুশাসনে তবে ইংলণ্ডবাসীর আপত্তি করিবার কি ছিল?' সেই যুক্তি! অবশ্য ইহারা কেহ কিং চার্লস্ নয়, মেকলের এই তিরস্কারেরও পাত্র নয। ইহারা ভারতেশ্বরের গুপ্তচর, জগদীশ্বরের অনুচর,—চরিত্রবান্ স্বামী, দায়িত্ববান্ পিতা, 'ক্যারেক্টারের' গর্ব করিতে পারে বৈ কি? ইহারা গর্ব করিবে না, তবে কি গর্ব করিবে তোমার রঘু চোর—স্ত্রীর খোঁজ যে রাখে না, পরিবারের ধার ধারে না, চরসেব ওস্তাদ, তোমাদের দশ-বিশ টাকার চুরি করা নোট বাঁচাইতে গিয়া ডাণ্ডাবেড়ি ও স্ট্যাণ্ডিং হ্যাণ্ডকাপ্ হাতে পরিয়া মানিয়া লয এই 'ক্যারেক্টার-ওয়ালাদের' দণ্ড?...

'ক্যারেক্টার' কাহাকে বলে? শশাঙ্কনাথ বলেন, তিনি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তুমিই কি পারিয়াছ, অমিত? ছেলেবেলা জানিতে, সিগারেট খাইলে ক্যারেক্টার নষ্ট হয়। স্কুল-জীবনে শুনিয়াছিলে বাল্যজীবনের সহজ সখ্য এই পর্দা-ব্যাহত কৃত্রিম সমাজে যদি কৃত্রিম তীব্রতা ও বিকৃতি সঞ্চয় করিতে থাকে তবে তাহাই চরিত্রহীনতা। এই দেশের কৃত্রিম ও কতৃশাসিত সমাজে আপনা হইতেই তুমি তখন শিখিয়াছিলে—রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শকেও কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতে নাই। ভালোবাসা লজ্জাজনক অপরাধ। ভালোবাসিয়া বিবাহ করাটা তো নিশ্চয়ই কেলেঙ্কারী; বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে ভালোবাসাও হিন্দুর পরিবারে সমাজে নিতান্ত কম অপরাধ নয়। কারণ, তোমাব সমাজে কর্তারা বিবাহ দিবেন, আর তুমি সেই সূত্রে পুত্রকন্যা উৎপাদন করিবে, উহাই নীতি নিয়ম। আর এই নিয়মে চলাই সচ্চরিত্রতা। তবু ইহার মধ্যে আকাশ ফাটা বিদ্যুৎ নামিয়া আসিল। সেদিন এই সমস্ত ভালোবাসাবাসির ঊর্ধ্বে উঠিয়া তুমিও বিবেকানন্দের বজ্রবাণীর প্রতিধ্বনি তুলিয়া নিজেকে বলিয়াছিলে, 'অভীঃ, অমিত, অভীঃ'...ইহাই শেষ কথা জীবনের। এখনো সেই শেষ কথা নিঃশেষিত হয়, নাই। তবু ইহাও আজ তুমি জানো অমিত, "ওন্লি এক্স্প্লয়টেশন্ ইজ ইমরল্ এক্স্প্লয়্টেশন অব ম্যান্ বাই ম্যান্। সর্বমানুষের সেই শোষণহীন মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠাতেই কি 'ক্যারেকটার?' 'ইহাই ক্যারেক্টার?' মনুষ্যত্ব—মায়াদয়া-সহৃদয়তা—মানুষে-মানুষে ভালবাসা—কিছু নয়?

...'ক্যারেক্টার' কাহাকে বলে, অমিত? 'শব্দ গন্ধ রূপ রস স্পর্শ—ইন্দ্রিয়ের

সর্ব দ্বার সর্ব রকমে রুদ্ধ করে চলবে তুমি জীবনে?...অতটা ভালো ছেলে না-ই-বা হলে তুমি, ওগো ভালো ছেলে'...কে বলিয়াছিল তোমাকে?...

মাদাম্ পাবলোভা এদেশে আসিয়াছিলেন। তখনো অমিতের কাব্য-সঙ্গীত-চিত্র তৃষিত আত্মা আপনার এই রস পিপাসাকে সর্ব দিকে স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। নৃত্যকলার লীলারসে, নারীদেহের ছন্দঃসুষমায়, হাস্যরহস্যে বিমুগ্ধ হইতে অমিতের কেমন ভয়-ভয় করিত। অমিত কলেজের ছাত্র তখন। নৃত্যের টিকিট তাহার নিকট দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্যও। টিকিট কিনিয়া তাহাকে সঙ্গে লইবার জন্য জেদ করিতেছিল ইন্দ্রাণী—আর সাধ্য কি ইন্দ্রাণীকে কেহ ঠেকাইতে পারে?—'অতটা ভালো ছেলে নাই বা হলে তুমি, ওগো ভালো ছেলে।...বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি—সে আমার নয়।'...

অমিত সেই স্মৃতিকে দূরে সরাইয়া দিল; না, ইন্দ্রাণী নয়। মৃত্তার দিন অমিতের তাহার পূর্বেই শেষ হইয়া গিয়াছিল। তখন অবশিষ্ট ছিল শুধু একটা অভ্যাস।—না, ইন্দ্রাণী নয়।

...প্রণাম তোমাকে, রবীন্দ্রনাথ। জীবন-রসের আনন্দ-সায়রে, তুমি অমিতকে অন্তত মুক্তি দিয়াছ, গান্ধীবাদের কৃচ্ছ্র-সাধনার মধ্যেও তাহাকে তিষ্টিতে দেও নাই। প্রণাম তোমাদের শশাঙ্কনাথ—বন্দিশালার বন্ধুরা! তোমরা অমিতকে তাহার গৃহ-পথ, সহজ মানুষের সহজ জীবন, পিতা ভ্রাতা মাতার সংসার পুনঃপ্রদর্শন করিয়াছ! আর প্রণাম তোমাদিগকে জেলের সেবকরা—রঘু ও গফুর, তোমরা অমিতকে মনুষ্যলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছ।...তাই বন্দিশালার চরিত্রচূড়ায় বসিয়া ঘৃণা করিতে পারি নাই রঘু চোরকে; আর অশ্রদ্ধা করিতে শিখি নাই এ কালের এই ভালোবাসাবাসির আর প্রাণ কাড়াকাড়ির ভালোমন্দ বাহকদের!...ছেলেমেয়েগুলি কি ইয়ার্কিতে, বেহায়াপনায়, মন দেওয়া-নেওয়ায় বখিয়া যাইতেছে? যাক না বখিয়া। 'অত ভালো ছেলে নাই বা হল' এই ছেলেমেয়েরা। নাই বা হইল তাহারা রায় সাহেব অম্বিকাচরণ সরকার, কিংবা 'দেবতুল্য মানুষ রায় বাহাদুর'—পূজা না করিয়া যিনি জলগ্রহণ করেন না।...

কিন্তু একি কাণ্ড! অমিত দেখিতেছে না—চৌরঙ্গীর চলচ্চিত্র চোখের উপর দিয়া ফুরাইয়া যাইতেছে। ওদিকে রৌদ্র ঝলমল ময়দান যে শেষ হইয়া গিয়াছে, পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়াইয়া মোটরের ইঞ্জিন হাঁপাইতেছে। এদিকে ইলেকট্রিক ঘড়িটা এখনো দেখা যায়; ওদিকে দূরে দেখা যায় হাইকোর্টের চূড়া; উহার পার্শ্বে গঙ্গাতীরের জাহাজের মাস্তুল; আর সম্মুখে টার-ঢালা দীর্ঘপথ এই দ্বিপ্রহরের চৌরঙ্গী। সে পথও আকাশের নিচে হাঁপাইতেছে, উহার উষ্ণশ্বাস অমিতের মুখে চোখে আসিয়া লাগিতেছে। তবু এতক্ষণ অমিত দেখিবার অবসরও পায় নাই কোথা দিয়া ইতিমধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে কত বাড়ি, কত চিহ্ন, ট্রাম লাইনের পার্শ্বে পার্শ্বে ময়দানের ছায়াঢাকা পায়ে চলার পথ—অমিতের কত দিনের নির্জন সন্ধ্যার বন্ধু, স্বপ্নাতুর সত্তার সাক্ষী!

পৌনে বারোটা হচ্ছে—ঘড়ি মিলাইল গোয়েন্দা সহচর। হাতের ঘড়িটা মিলাইবে নাকি অমিত? একবার সে সময় দেখিল ঘড়িতে—সে ঘড়িটা একদিন সুনীল হাতে পরাইয়া দিয়াছিল,—আর একটা ঘড়ির কথা স্মরণ করিয়া। তাহাও হাতে আর একদিন পরাইয়া দিয়াছিল আর একজন, ইন্দ্রাণী—এইরূপ প্রীতিতে ভালোবাসায়। সে ঘড়ি গিয়াছে, সে ভালবাসাও আজ একটা নীরব স্মৃতি; সে স্মৃতিতে আছে একটা প্রীতি-নির্মলতা। আর সুনীলের দেওয়া এই ঘড়িতে কি আছে? ভালোবাসার টেস্টামেন্ট? জীবনের কন্ভিনেন্ট?

মেলালেন না?—গাড়ির সহচর জিজ্ঞাসা করিল। গাড়ি দম লইয়া আগাইয়া চলিয়াছে।

হাঁ,—মেলাব। এতদিন ঘড়ি মেলাবার দরকার ছিল না। জেলখানায় তো দিন মাসের হিসাবের দরকার নেই—অনির্দিষ্ট কালের জন্য সকল গতি বন্ধ। সেখানে দু-মিনিট 'ফাস্ট', কি দুমিনিট 'স্লো'তে কি আসে যায়?

ভদ্রলোক হাসিলেন। সহজ হাসি, অমিতের তাহা চোখে পড়িল। বলিলেন: এবার তো সময় ঠিক রাখতে হবে।

অমিত বলিল: অন্তত রাত্রি নটার হিসাব। নইলে আপনারা তা মনে করিয়ে দেবেন।

আমরা? আমরা কী বলুন তো? এসব রথী-মহারথীরা কি বলেন তাও বুঝি না, আপনারা কি করেন তাও জানি না।

অমিত চমকিত হইল। কথায় এ কেমন সুর? কে এ? গোবিন্দ ধর নয় তো? অমিত গোবিন্দ ধরকে দেখে নাই, চিনে না। অমিতের কৌতূহল দুর্নিবার হইল। চৌরঙ্গী সম্মুখে প্রসারিত হইতেছে দ্রৌপদীর বস্ত্রের মতো। তবু অমিত প্রশ্ন না করিয়া পারে না: যদি কিছু মনে না করেন,—আপনার বাড়ি?

মনে করার কি আছে?—খুলনা।

নাঃ।—নৈরাশ্যে অমিত মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহা হইলে সে গোবিন্দ নয়। গোবিন্দ ধর ফরিদপুরের লোক। ইহারই বা তবে কি নাম?

জিজ্ঞাসা করিতে পারি—আপনার নাম?

চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী।

'গোবিন্দ ধর' নয়।—না, কিন্তু হয়তো আর একটা মানুষ পাইলে, অমিত, এই নামের সঙ্গে সঙ্গে। মুখোশের রাজ্যে দেখিতেছো হয়তো আর একটি মুখ—চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর মুখ—শ্যামল, সবল বলিষ্ঠ ভালোমানুষের মুখশ্রী।—ভাবিতেই অমিতের কেমন ঔৎসুক্য জাগিয়া উঠিল,—এই তো মনুষ্যলোক—বুলডগ নয়, কিন্তু কী মানুষ চন্দ্রকান্ত? অমিত আলাপ করিতে উদ্যত হইল। তাহাই বুঝি চন্দ্রকান্তও চাহিতেছিল; একটা মানুষের সম্মুখে নিজেকে মানুষ বলিয়া চিনিতে জানিতে তাহারও সাধ!

চন্দ্রকান্ত সবে প্রোমোসন পাইতেছে এ-এস্ আই হইতে এস্-আইতে; এখনো মাঝে

মাঝে পূর্ব পদে নামিয়া যায়। আজও আসিয়াছে এ-এস্-আই রূপে। আজ একটু সে তাড়াতাড়ি ছুটি চাহিয়াছিল। বাড়িতে কাজ আছে; ছেলেটির ভাত হইবে। এইটিই প্রথম ছেলে, আগে একটি কন্যা জন্মিয়াছে।...

মায়ের ইচ্ছা ভালো করে নাতির ভাত করেন। দেশে গিয়ে করতে খরচপত্র অনেক। আমার সামর্থ্যে তা কুলোবে না। এখানে আই-বি ব্যারাকে থাকি। সে কোয়ার্টারে এ কাজ করলে আত্মীয়-স্বজনকে আনতে পারব না। তারাও আসতে চায় না, আমারও আনতে সাহস হয় না। কিসে কি হবে, আর তখুনি প্রাণ নিয়ে টানাটানি। তাই কাজের বন্দোবস্ত করেছি মাসতুত ভাই-এর বাড়ি—সেই টালিগঞ্জে। আত্মীয়-স্বজন তবু আসতে পারবে। আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিলেই ছুটি। ভেবেছিলাম নটা, দশটার মধ্যে তা হয়ে যাবে।

সাধারণ মানুষের সাধারণ কথা, সাধারণভাবেই চন্দ্রকান্ত বলিতেছে প্রথম পুত্রভাগ্যের আনন্দ; দশজনকে লইয়া উৎসবের সাধ; আর জন্মগত উত্তরাধিকারের মতোই তাহার চাকরির এই কৃত্রিম বাধা ও অসঙ্গতিকে গায়ে না মাখিয়া উহারই ফাঁকে ফাঁকে, জীবনের বাঁকে বাঁকে সেই সাধারণ জীবনের সাধারণ সুখ-দুঃখকে কোনো রকমে আহরণ;—ইহার বেশি কিছু নয়।—চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী, খুলনা জেলায় যাহার বাড়ি, আই এ পাশ করিয়াছিল ভালো। ফুটবল খেলিত চমৎকার, তাই ডসন্ সাহেব তাহাকে চাকরিতে ঢুকাইয়া লইয়াছিলেন। দেখিতে-শুনিতে স্বাস্থ্যবান, কর্মপটু। বেশি বুদ্ধি নাই, বেশি তীক্ষ্ণতা নাই, বেশি মাথাব্যথাও নাই সেই জন্য। একটু দুঃখ গোয়েন্দা কোয়ার্টারে দশজনকে লইয়া গল্প করিতে পারে না।—সে স্পোর্টসম্যান ছিল—খেলার জন্যই চাকরি পায়, দশজনের সঙ্গে মিশিত, গল্প করিত, হাসিতে-খেলিতে ভালোবাসিত—এখন কেহ তাহার সঙ্গে আর দেখা করিতেও আসে না।

আসবে কি? সেবার স্ত্রী বাপের বাড়ি গিয়েছিল। দু দিন পরেই কেঁদে-কেটে ফিরে এল। পাড়ায় তার পূর্বকার দিনের সখী ও প্রতিবেশিনীরা তাকে দেখলে মুখ বুজে থাকে। গ্রামের দুটো ছেলে কিছুদিন আগে ধরা পড়েছে। সকলে বলে, 'নতুন কাকে ধরিয়ে দিতে এসেছে গোয়েন্দার বউ তার ঠিক কী?'

বিরক্তি ও ক্রোধের সঙ্গে চন্দ্রকান্ত বলিতেছিল। একটু থামিল। পরে সকরুণ ভাবে হাসিল, বলিল: আমরা আপনাকে ধরাবারই বা কি, ধরবারই বা কে? খেলতে পারতাম বলে তো চাকরি পেয়েছিলাম; কোথায় গেল সেই খেলা?

গাড়ি হোয়াইটওয়ে ছাড়াইয়া চলিয়াছে। সেই মেট্রো সিনেমা—যেখানে, অমিত জেলে বসিয়া এবার শুনিয়াছে, 'আমেরিকান্' ম্যানেজার বাঙালী ফিল্মফ্যান্‌দের 'জুতিয়ে' ডিসিপ্লিন শেখায়? বাঙালীকে জুতাইবার লোক তবে আরও বাড়িতেছে। ইংরেজের পরে আসিতেছে আমেরিকানরা।

অমিত চন্দ্রকান্তকে জিজ্ঞাসা করিল: খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড এখন কেমন?

চন্দ্রকান্ত বলিবার মতো কথা পাইল। বলিয়া চলিল: বাঙালীরা গিয়াছে। এখন

পেশোয়ার বাঙ্গালোর হইতে প্লেয়ার আসে। মোহামেডান্ স্পোর্টিং-এর জয় জয়কার! বাঙালীরা খেলিবে কি? এই তো সে, চন্দ্রকান্ত...

গাড়ি ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে চিত্তরঞ্জন এভিন্যুতে। 'স্টেটসম্যান্' পূর্বভবন হইতে এই নূতন গৃহে আসিয়াছে। ইলেক্‌ট্রিক হাউস আগেও ছিল। স্যার আশুতোষের ধাতু-মূর্তি এখন পথের মোড়ে দাঁড়াইয়াছে,—উচ্চ মঞ্চেও, কিন্তু কোথায় সেই সতেজ ব্যক্তিত্ব? এখন 'জুতাইয়া ডিসিপ্লিন শিখায়' আমেরিকানরা। মূর্তিটা যেন বৈশিষ্ট্যহীন, ব্যক্তিত্বহীন একটা বাহুল্যের পিণ্ড...নূতন পথটা তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। ত্রিশের মন্দার বাজারে সস্তা মালে ভাগ্যবানেরা বাড়ি তুলিয়াছে। খালিও পড়িয়া আছে—অনেক ব্যবসায়ী কোম্পানির বড় বড় জমি।...

অমিত বলিল : একবার কলেজ স্ট্রীট দিয়ে যেতে পারেন? ইউনিভারসিটির সামনে দিয়ে।

চন্দ্রকান্ত খেলার গল্প ছাড়িয়া সবিনয়ে বলিল : তা নিয়ম নয়। কেউ দেখে ফেললে?—তারপর একটু থামিয়া নিজেই বলিল : কি আর হবে দেখলে? চলুন আজ। দেখুকগে যে খুশি!—খেলোয়াড়ের গায়ে-না-মাখা ভাব চন্দ্রকান্তের এখনো রহিয়া গিয়াছে। খেলার গল্প করিতে করিতে এখন তাহা বুঝি জাগিয়া উঠিয়াছিল।

একেবারে কলেজ স্কোয়ারের সম্মুখে গিয়া পড়িল গাড়ি। পূজার বাজার লাগিয়াছে দোকানের শো কেসে। সেই সিনেট হাউস। বিশ্ববিদ্যালয়ের এখানে-ওখানে ছাত্রের মুখ, ছাত্রীর মুখ, ইতস্তত শাড়ি ও আঁচলের খানিক ছটা, ভ্রূক্ষেপহীন তারুণ্যের আপন কথায় আপন তর্কে মত্ততা, আর নির্বিকার দৃষ্টি তরুণ-তরুণীর স্বচ্ছন্দগতি, সহজ ভাষণ আপনাদের মধ্যে,—সেই 'ক্যারেক্টারহীন' ছেলেমেয়েরা মুখ তুলিয়া কেহ তাকাইলও না। তাকাইলও না বুঝি সিনেট হাউস আর বিশ্ব-বিদ্যালয়ও মুখ তুলিয়া অমিতের দিকে। সে পিছনে ফেলিয়া যাইতেছে হেয়ার সাহেবের প্রতিমূর্তি ও প্রেসিডেনসী কলেজ।

বাতিল হইয়া গিয়াছে, বাতিল হইয়া গিয়াছ, তুমি অমিত, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন হইতে। হয়তো তুমি উহার পুরাতন ক্যালেণ্ডারের পাতার শুধু একটা পোকায় কাটা নাম। তোমাদের বৎসরের ইতিহাসের এম-এ পাশ নামগুলির শিরোদেশে 'শৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়' আর তারপরে তুমি। বস্, এইটুকুমাত্র তুমি আজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিকটে। আর, বিশ্ববিদ্যালয়ই বা তোমার নিকটে কি? জীবনে যে পরিচয় তুমি আহরণ করিয়া আজ গহে ফিরিতেছ উহা কি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দান?...বাতিল হইয়া গিয়াছে তাহার দেনা, বাতিল হইয়া গিয়াছে তোমারও পাওনা.. কোথায়ই বা সেই শৈলেন আজ? বৎসর ছয় আগে সেবার বড়দিনের পূর্বে যে কলিকাতায় শ্বশুর গৃহে আসিয়াছিল, মুন্সেফির ডিক্রি ডিসমিশে মশগুল। কোথায় সে-ই বা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে, কোথায়ই বা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দান তাহার জীবনে? কোথায় তোমাদের সেই সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পরিকল্পিত

বাঙলার ইতিহাস?...কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে অন্য সকলে?...সার্ভিস-পরীক্ষার দ্বারপথে চাকর-রাজের দেশে আজ সেই কৃতী ছাত্ররা চাকর-লোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহারা এতদিনে লাভ করিয়াছে মোটা বেতন, মোটা পুরস্কার,...মোটা গৃহিণী। শৈলেন হয়তো এতদিনে সব-জজ হইয়াছে—কোথায় তাহার সেই ইতিহাসের গবেষণা?... আর তুমি, তুমিই বা কোন প্রতিদান দিলে বিশ্ববিদ্যালয়কে? আর কি প্রোডিগ্যাল পুত্রের মতো তাহার ক্রোড়ে ফিরিবে, স্যার আশুতোষের আবক্ষ মর্মর-মূর্তিকে নমস্কার করিয়া দ্বারভাঙ্গা হলের দিবান্ধকার লাইব্রেরিতে তোমার বহু পরিচিত সেই গ্রন্থমালা খুলিয়া বসিবে?...সে লাইব্রেরিও নাকি এখন 'আশুতোষ ভবনে', আপন গৃহে সুস্থির হইয়াছে। তাহার প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত হইয়াছে ভারত ইতিহাসের গৌরবময় কাহিনী; এই কথা দূরে বসিয়া সংবাদপত্রেই শুধু পড়িয়াছ। সেই গৃহসজ্জা দেখিবে না, দেখিবে না সেই চিত্রকলা, সেকালের অজন্তার একালে পুনর্জন্ম? না, একদিনের জীবনের অন্যদিনে বিজৃম্ভণ? অতীতের স্মৃতি-সুষমা দিয়া প্রতারণা বর্তমানের সৃষ্টি-চেতনাকে? লুকোচুরি খেলা একালের দৃষ্টির, একালের সৃষ্টির সঙ্গে?

'একালের দৃষ্টি, একালের সৃষ্টি'...থাক এই বিশ্ববিদ্যালয়, অমিত। এ জীবনে প্রধানতম গুরুগৃহ হইতে আজ স্নাতকের মতো তুমি প্রবেশ করিতে চলিলে বিশ্বের বিশালতম বিদ্যালয়ে—তোমার গৃহাশ্রমে। 'অভীঃ অমিত, অভীঃ।'

গাড়ি মোড় ঘুরিতেছে—এখনি চোখে পড়িবে সেই গৃহ।

দুই

বহু-পরিচিত পথের সেই বহু-পরিচিত গৃহের দুয়ারে আসিয়া গাড়ি দাঁড়াইল, অমিত তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল। বাড়িটা অনেকটা ম্লান—হয়ত বর্ষার জলে। এপাশের ওপাশের বাড়িগুলিও যেন দীপ্তিহীন; তবে এত জীর্ণ নয়। শুধু জীর্ণই হয় নাই, দৈন্যও এই গৃহকে ক্ষয় করিয়াছে, অমিতের তাহা দর্শনমাত্র মনে পড়িল। সম্ভবত কয়েক বৎসর চুণকাম হয় নাই।. কই, কেহ তো অমিতের অপেক্ষায় নাই। তবে কি তাহারা জানে না অমিত আসিবে? শরৎ গুপ্ত শুধু চালই দিয়াছে—শেষ মুহূর্তেও? কই, কেহ নাই নাকি ওখানেও পথের উপরকার ঐ জানালায়?

ওখানে—ওই জানালায় নাই মা!

ওই জানালায় বসিয়া থাকিতেন অমিতের মা, বসিয়াছিলেন শেষ দিনকার দুপুরটিতেও. অমিত আসিতেছে।

অমিতের পা কাঁপিতে লাগিল, চোখ মুহূর্তের মতো দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলিল, সমস্ত শরীরের এপারে-ওপারে বিদ্যুতের প্রাণঘাতী স্ফুরণ চলিতেছে। কিছু একটা ধরিবে কি অমিত? কিছু বলিবে কি অমিত? চিৎকার করিয়া ডাকিবে কাহাকেও—এ জন্মের পার হইতে জন্মান্তরের পারে সেই স্বর পৌঁছিবে কি?

জানালায় একখানা মুখ ফুটিল—হয়তো মোটর থামিবার শব্দ কানে গিয়াছিল। আর মুহূর্তের মধ্যে সে মুখের উপর শরতের রৌদ্র-ঝলমল আকাশের সমস্ত আলো লুটাইয়া পড়িল? তারপর? উচ্চ কলকণ্ঠের আহ্বান তুলিয়া তুচ্ছ সিঁড়ির সোপান ভাঙিয়া, রুদ্ধ সদরের সুদৃঢ় কপাটের খিল খুলিয়া সম্মুখে আসিয়া অমিতের পায়ের উপর ভাঙিয়া পড়িল সেই সুগৌর তেজোময়ী তরুণীর মুখ, আর এক তেমনি আশ্চর্য শ্যাম সমুন্নত যুবকের মাথা।

অনু আর মনু।

এই অনু, এই মনু! এত বড়, এত সুন্দর, এতো বলিষ্ঠ। অমিত সবই জানিত। পত্রাক্ষরের মধ্য দিয়াও কি সে দেখে নাই এই এম-এ পাস করা কনিষ্ঠের ক্রম-পরিণত সজীব দেহমন? দেখে নাই এই বি-এস্-সি ক্লাশের কনিষ্ঠার ক্রমোদ্ভিন্ন তেজোময়ী গরিমাময়ী মূর্তি? ইহাদের ব্যক্তিত্বের রূপরেখা চিঠির মধ্য দিয়াও অমিত অস্পষ্ট দেখিয়াছে। কিন্তু ব্যক্তির প্রত্যক্ষ আবির্ভাবে সমস্ত স্মৃতি, সমস্ত কল্পনা আর স্বপ্ন মিথ্যা হইয়া সত্য হইয়া যায়। মিথ্যা হইয়া গেলে নাকি তুমিও, অমিত,—এই একটু আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে পৌঁছিয়া যেমন বাতিল হইয়া গিয়াছিলে—তেমনই এই তোমার নিজের গৃহচ্ছায়ায়? নিজের ভাই-বোনের সামনে দাঁড়াইয়া মনে হইতেছে না কি---কারামুক্ত 'কাবুলীওয়ালার' মতো—তোমার সংসারের পটভূমিও পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, জীবনাঙ্গনে এইখানে নতুন যৌবন প্রবেশ করিয়াছে, এবার এই রঙ্গমঞ্চে তোমারও পিছাইয়া দাঁড়াইবার দিন আসিল। আশ্চর্য, তুমি অমিত---চিরদিনের শ্যাম শীর্ণ ভঙ্গুর-দেহ বৈশিষ্ট্যহীন যাহার মুখ,—ইহারা তোমার ভাই আর বোন! হাসিবে, না কাঁদিবে, অমিত? নিজের তুচ্ছতায় লজ্জা পাইবে, না গর্বিত হইবে এই সৌভাগ্যে?

চেতনার আকাশে ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎ মুহূর্তে মুহূর্তে ঝলসিয়া উঠিতেছে। কিন্তু তাহা বুঝিবারও অবকাশ অমিতের নাই। বুকে মাথা-রাখা, জড়াইয়া-ধরা সেই তেজোময়ী ভগ্নীর মুখখানি হাসিয়া কাঁদিয়া চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেছে। আর সেই বলিষ্ঠ, গর্বিত অনুজের চোখ বিস্ময়ে বিষাদে ছলছল করিয়া উঠিতেছে।

মায়ের জিজ্ঞাসাই বোনের মুখে ফুটিল : একি চেহারা হয়েছে তোমার, দাদা?

আফগানিস্তানে পৌঁছিয়া পর্বতের পারে গিয়া কি কাবুলীওলাকে নূতন পরিচয়ের প্রার্থনা লইয়া আপন কন্যার কাছে দাঁড়াইতে হইবে? ভুল, কবি, ভুল!...

অনুর প্রশ্নেও অভ্যাস মতোই অমিতের মুখের উত্তর আসিয়া গেল : পাহাড়ের বৃষ্টিতে আর মরুভূমির রৌদ্রে সিজনড়, পাকা হয়েছে আমাদের শরীর—

কিন্তু একটা আবেগ উচ্ছ্বাস বক ছাপাইয়া উঠিতেছে, চোখে জল দেখা দিতেছে। অবোধ বোনটি তাহার অবাধ্য আবেগের বন্যায় বুঝি অমিতকেও ভাসাইয়া দিবে। মায়ের নাম স্মৃতি মমতা এই মুহূর্তে তাহার এই তরুণ দেহখানির মধ্যে আকুলি-বিকুলি বাধাইয়া দিয়াছে। অনেক দিনের চাপাপড়া সেই ঝড় অমিতের বুকের মধ্যেও গুমরাইয়া উঠিবে।

ওঃ! বাবা উপরে একা বসে আছেন।—নিজেকে ছাড়াইয়া লইল অনু।

চলো, চলো, শীঘ্র চলো।

'শীঘ্র চলো।' কিন্তু অমিত কোথায় চলিবে? এই গৃহে পা বাড়াইতেই যে আজ তাহার পা থামিয়া যাইতেছে।—জানালায় মা নাই, গৃহমধ্যে মা নাই,—কি করিয়া অমিত পা দিবে সেই গৃহে? আর, দাঁড়াইবে শূন্যগৃহে তাহার পিতার সম্মুখে—যেখানে তিনি বসিয়া আছেন একা।

মনু জিজ্ঞাসা করিল: দাঁড়ালে কেন, দাদা? জিনিস-পত্র?—আমি সে সব নিয়ে আসছি। তোমরা যাও। তুমি দাদাকে নিয়ে যাও, অনু।

অমিত চলিল।

চন্দ্রকান্ত একবার নমস্কার করিতে ভুলিল না। অমিতের তাহা চোখে পড়িল কি? প্রতি-নমস্কার করিল কিন্তু অমিতের তাহা মনেরও অজ্ঞাতে।

অমিত চলিল। মেঝে, সিঁড়ি, ধৌত পরিচ্ছন্ন।—তাহার সমাবর্তন আজ। একটি একটি করিয়া পা ফেলিয়া অমিত অনুর পিছনে পিছনে চলিল—গৃহ-পথে যাত্রা আরম্ভ হইল।

অনু বলিতেছে: সকালবেলা খবর পেলাম, তুমি সকালেই আসছ। বসে বসে আর সময় কাটে না। আসোই না তুমি! বাবাকে খাইয়ে দিলাম।

একটা প্রক্ষালিত পরিচ্ছন্নতা গৃহে। কেহ আসিবে তাহা যেন জানা ছিল। চারিদিকে সাগ্রহ অপেক্ষা। কিন্তু কাহার এক-জোড়া বহু-চেনা হাত উহাতে তবু পড়ে নাই, তাহাও অমিত বুঝিতে পারে। সিঁড়ির পার্শ্বের দেয়ালের গায়ের কুলুঙ্গিতে অমিতের বাহিরের জুতা, জুতার পালিশ, ব্রুশ প্রভৃতি থাকিত; তাহার সঙ্গেই থাকিত মায়ের পায়ের চাপালি।—কখনো-সখনো বাহিরে যাইতে হইলে মা তাহা পরিতেন। সময়মতো দুই-একবার অমিতই তাহা পরিষ্কার করিত;—শেষের দিকে তাহাতেও অমিত অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছিল। কাঠের ঢাকনিতে কুলুঙ্গির জুতা ব্রুশ প্রভৃতি বন্ধ থাকিত। সে ঢাকনিটি এখন ভাঙিয়া গিয়াছে; এখানেও অন্য জুতা আসিয়াছে—মনুর, অনুর; সেই চাপালিজোড়া আর নাই। কলেজ স্ট্রীটের একটি দোকান হইতে শেষ জুতা জোড়া অমিত মায়ের জন্য কিনিয়াছিল। শেষবার তাহা দেখিয়াছে মায়ের পায়ে জেলের সাক্ষাৎকালে। বাঁধুনির সোনালী পালিশ তখন ম্লান হইয়া গিয়াছে। তবু সেই সোনালী বাঁধুনির মধ্যে শেষবার অমিত দেখিয়াছে একজোড়া অনাবৃত অনাদৃত বহুদিনের গৃহকর্মে ক্ষয়িত অক্লান্ত চরণ। বয়সে দুঃখে উদ্বেগে সেই পা দুইখানিতে ক্লান্তি আসিয়াছে, স্ফীতি আসিয়াছে; তাহার মাংসপেশীতে শিথিলতা আসিয়াছে। অমিতের দেওয়া চাপালির সোনালী বাঁধুনি তাই সেই পা দুখানিকে তখন আঁটিয়া ধরিয়াছে। মা তবু সেই চাপালি পরিয়া দেখা করিতে আসেন; তাঁহার ভয়—না হইলে অমিত রাগ করিবে। কলিকাতার উত্তপ্ত পথ ও পাথর মায়ের পায়ে ফুটিবে।...সেই কুলুঙ্গি এখন পরিষ্কৃত, তাহাতে অন্য জুতা রহিয়াছে, নাই সেই চাপালি জোড়া। সেই

পা দুইখানিও নাই—কতবার এই সিঁড়ি দিয়া তাহা ছুটিত, বয়সের বাধা না মানিয়া উঠিত নামিত, শতবার শত কাজে যাইত রান্না ঘরে, ভাঁড়ার ঘরে, অমিতের সন্ধানে, পিতার কক্ষে।

অমিত সেই কক্ষের সম্মুখে আসিয়া গিয়াছে। কই, সেই প্রশান্ত প্রসন্ন মূর্তি দুয়ারের সম্মুখে অপেক্ষায় নাই তো!—ক্লাসিক্‌সের শিক্ষাদীক্ষায় সমাহিত-চিত্ত সেই মূর্তি, তবু বাঙালী পিতার মূর্তি—পুত্রের গৃহাগমনে আনন্দে-মমতায় একটু চঞ্চল-উদ্‌গ্রীব-উৎফুল্লও হইবেন,—কই, অমিত দেখিতে পায় না যে বাবাকে? তাহাদের কণ্ঠস্বর, পদধ্বনি বাবা শোনেন নাই নাকি? অমিত দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কোথায় বাবা? অনু আগাইয়া গিয়াছে গৃহমধ্যে, ও পার্শ্বের ঈজি-চেয়ারের দিকে, একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকিতেছে: বাবা,...বাবা, দাদা এসেছেন।

সেই পুরাতন ঈজি চেয়ারের উপর বর্ষীয়ান্ এক মূর্তি ছিল নাকি? অমিত এতক্ষণ তাহা দেখিতে পায় নাই।

দুই হাত দুই দিকের হাতলে, দেহভার তাহার উপর রক্ষিত, ভাঙিয়া-পড়া দেহ একটু আনত: অনুর কণ্ঠস্বরে অনুর দিকে মুখ তুলিয়া এখন জিজ্ঞাসাভরা বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে সে মূর্তি তাকাইয়া রহিল—যেন কি বুঝিতে চাহিতেছেন, বুঝিতে পারেন না। চোখে স্বচ্ছ আলো নাই, বার্ধক্যের একটা ঘোলাটে দৃষ্টি; দাবদগ্ধ একটা বিবর্ণতা দেহে; গাল ঝুলিয়া পড়িয়াছে; বাহুর মাংসপেশী শিথিল; বিরলকেশ শির, মুখ-কপাল গভীর রেখায় খণ্ডিত;—এক নিশ্চল বৃদ্ধ।

এই অমিতের পিতা? ক্লাসিক্‌সের শিক্ষাদীক্ষায় গঠিত সেই মূর্তি!

দাদা—দাদা এসেছেন—অনু তাঁহাকে একটু উচ্চস্বরে বুঝাইতেছে!

ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিল: কে?...মনু?—

যে কণ্ঠে অস্পষ্টতার চিহ্নও ছিল না, সেই কণ্ঠে দন্তবিরল মুখে, শুধু অস্ফুট একটা শব্দ ফুটিতেছে; ভালো করিয়া তাহা অমিতের কানেও পৌঁছিল না। অস্পষ্ট নিরুৎসুক শব্দ...সেই কণ্ঠ, সেই স্বর,—অথচ তাহা নয়; সেই মানুষ—অথচ সে মানুষও বুঝি নয়।

অভ্যাস মতো দুয়ারের বাহিরে জুতা খুলিয়া অমিত গৃহমধ্যে অনুর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। 'কে মনু?' মাত্র দুইটি অস্পষ্ট শব্দ সে শুনিল। দুইটি শব্দেই কিন্তু সুস্পষ্ট হইল—অমিতের অস্তিত্বও আর তাহার পিতার চেতনায় সহজ নাই। ...বাতিল হইয়া গিয়াছে সে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, আপন গৃহেও।...কাবুলীওয়ালা ফিরিবে না আর আপন গৃহে সেই বিগত দিনের আত্মজনের মধ্যে।

বাবা, আমি—আমি—নুইয়া পড়িয়া অমিত পদধূলি লইল।

অনুচ্চকণ্ঠে অনু বলিল: একটু জোরে বলো, দাদা।

অমিত তাহা বুঝিয়াছে; জোরেই এবার বলিল: আমি অমিত—

স্পর্শে ও কণ্ঠস্বরে মিলিয়া এবার সেই স্থবির দেহ, সেই মনে একটা অসহায় আলোড়ন সঞ্চার করিল। অমিত উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল সেই নিথর চক্ষু জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল হইয়াছে।

অমিত আবার বলিল : বাবা, আমি অমিত—

হাতলের উপরকার ডান হাত কি-যেন ধরিবার চেষ্টায় উপরে উঠিয়াছিল। আসন্ন চৈতন্য বুঝি হঠাৎ আত্মস্থ হইতে পারিল। এবার একটু স্পষ্ট একটু উচ্চ সেই স্বর : 'অমি—অমি—আসবার কথা ছিল আজ। এলে? এলে অমি?—কখন এলে?'

অচল দেহে দাঁড়াইবার জন্য একটা প্রয়াস দেখা দিল। টান হইয়া উঠিল সেই নুইয়াপড়া দেহ উঠিবার চেষ্টায়।

অমিত বলিল : এই তো, এখনি এলাম।

দেহে উদ্দীপনা জাগিল; নিঃশ্বাস দীর্ঘ হইল; বুক উঠিতে নামিতে লাগিল। তারপর মাথা আবার ক্লান্তিতে নুইয়া পড়িল। একটা অস্ফুটস্বর তবু শোনা গেল : বসো।

পার্শ্বেই আসন রহিয়াছে, অমিত বসিল। বসিয়া দেখিতে লাগিল সেই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-প্রকম্পিত বুকের ওঠা-নামা। আবার কানে গেল :

বসো, অমি, বসো।

কিন্তু সেই ক্লান্তমস্তক তখনো আর উঠিতে পারিতেছে না; চক্ষু তখনো আনত, হয়তো নিমীলিত।

...এই তোমার পিতা, অমিত? কোথায় সেই চির জীবনের শান্ত চিন্তাশীলতা, ক্লাসিক্‌স পাঠকের অভ্যস্ত সংযম, গাম্ভীর্য?—অমিত তাহার পিতাকে দেখিয়া গিয়াছিল পরিণত প্রৌঢ়ত্বের মহিমায় আত্মস্থ। গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্তি নয়, মানবদেহে অ্যালিফেন্টার স্থির সৌম্য মাহেশমূর্তি। সে মূর্তিতে ফাটল ধরে, তাহা ভাঙিয়া পড়ে, গুঁড়াইয়া যায়,—ইহাও ভাবিতে পারিত অমিত।...কিন্তু এ কি অমিত,—সেই ক্লাসিক্‌স-পরিপুষ্ট মনও শ্লথ হইয়াছে, নুইয়া পড়িয়াছে, সেই অখণ্ড সত্তা গলিয়া যাইতেছে—এ কি অমিত? এ কি? মানুষের দেহের এই কি অনিবার্য পরিণাম? আর তুমি তাহা কল্পনাও কর নাই!—এ কোন মানব-সত্যের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে অমিত? এই কি তাহার সেই স্বপ্নে দেখা গৃহ ও তাহার পিতার পরিণাম? তাহার অগোচরে নিয়তি এ কি পরিহাস তাহার জন্য রচনা করিতেছিল।

একটু সাবধান, দাদা, একটা স্ট্রোক গিয়েছে, এক বৎসর হল—তোমাকে তা লিখি নি। এখন বাবা সাবধানে চলতে-ফিরতে পারেন। অথচ অনেক কথা বুঝে উঠতে পারেন না।—অমিতকে নিম্নস্বরে অনু জানাইল।

ভাঙা-দেউলের দেবতা...দেউলের মতই সেও বুঝি ভাঙিয়া যায়।

অমিতকে অনু বুঝাইয়া বলিতেছে : অনেক কথা যেমন কিছুতেই বাবা বুঝতে পারেন না, আবার তেমনি এক-একটা পুরনো কথাও তাঁর কেমন হঠাৎ মনে পড়ে যায়—

প্রতিদিনের সান্নিধ্যের ফলে অনুর নিকট পিতার এই বার্ধক্য ও জড়তা একটা

পরিচিত সহজ সত্য। ক্রমে ক্রমে চোখের উপর শুকাইয়া যায় যেমন বনস্পতি—যে-কোনো একদিন তারপর দমকা হাওয়ায় ভাঙিয়া পড়িলেই হইল। অনু তাহা জানে। তাহার পূর্বে যে দাদা আসিলেন, বাবাকে দেখিতে পাইলেন, বাবাও দেখিতে পাইলেন দাদাকে, ইহাই যেন তাঁহাদের সকলের জীবনের অনতি প্রত্যাশিত এক চরিতার্থতা।

এলে, অমি? এলে—বাবা আবার নিজেরই মনে ধীরে ধীরে আওড়াইতেছিলেন। তখনো তিনি অমিতের মুখের দিকে চোখ তুলিতে পারেন নাই। তথাপি অনু তাঁহার এই চেতনা-লক্ষণ দেখিয়া উৎফুল্লভাবে অমিতকে চোখে ইঙ্গিত করিল—পিতার অমিতকে মনে পড়িয়াছে।

স্তিমিত দৃষ্টি চক্ষু অমিতের মুখের উপরে একবার স্থাপিত হইল। বাবা বলিলেন: অসুখ করেছিল, না? এখন ভালো আছ, অমিত?

পাঁচ বৎসর পূর্বেকার সেই অমিতের কঠিন পীড়ার কথাটা তাঁহার স্মৃতির গভীর স্তরে গাঁথিয়া রহিয়াছে, তাহাই বুঝি জীইয়া আছে।...অমিতের চেহারা তিনি ভালো করিয়া দেখিতে পান না, পরিবর্তন ঘটিয়া থাকিলেও চক্ষু দিয়া তাহা বুঝিয়া লইতে পারেন নাই।

অমিত তাড়াতাড়ি উত্তর দিল: অসুখ? তা করেছিল। এখন কিছু নেই, বেশ ভালো আছি।

'ভালো আছ'—'ভালো আছ।'—নিজের মনেই আবার আবৃত্তি করিলেন বৃদ্ধ। আবার দেহ ঈজি চেয়ারে এলাইয়া দিলেন, চোখ মুদিত করিলেন। অমিত চোখ মেলিয়া বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল—নিঃশ্বাসে বুক দুলিতেছে; মুখের মাংসপিণ্ডও কাঁপিতেছে, নাসিকা ও ওষ্ঠের কোণ একটু বাঁকিয়া যাইতেছে। একটু পরেই বাবার চক্ষু আবার উন্মীলিত হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন: কতক্ষণ থাকবে, অমি?

অনু শঙ্কিত হইল। অমিত বুঝাইতে চেষ্টা করিল: আর যেতে হবে না। ছাড়া পেয়ে এসেছি, ছেড়ে দিয়েছে ওরা।

বুঝিতে সময় লাগিল, কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন—একটা দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়া তাহার প্রমাণ মিলিল, এক ফোঁটা চোখের জলও ক্রমে তাঁহার চোখের কোণে দেখা দিল। অমিতের বুঝিতে বাকি রহিল না—মায়ের করুণ বেদনার স্মৃতিতেও তাঁহার আচ্ছন্ন চেতনা এইবার সম্ভবত আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে।

অমিত চোখ ফিরাইয়া লইল, ঘরের চারিদিকে দেখিতে লাগিল।—সেই পুরাতন গৃহ-পরিবেশটি মায়ের হাতে রচিত। পরিচ্ছন্নতার অভাব ঘটে নাই—পরিবর্তন যা ঘটিয়াছে নিজের নিয়মে। পিতার বইপত্র আজ আর এ-ঘরে নাই। তাঁহার লিখিবার ছোট টেবিলে আসিয়াছে ঔষধপত্র, আর অনুর এক-আধখানা বই। এখন অনুই আশ্রয় করিয়াছে এই ঘরের একটি কোণ, না হইলে কে আর সর্ব্ব সময়ে বাবাকে দেখিবে-শুনিবে? কিন্তু এ-ঘরে বোধ হয় অনও পড়াশোনা করে না। অনুর পুস্তকে, মনুর অধ্যয়নে গবেষণায় বাবার এখন কৌতূহলও নাই। অমিতের বই খাতাপত্রও আর তিনি দেখিবেন কি করিয়া।

...বাড়িতে বই আসিয়াছে, বাবা সে বই-এর একবার খোঁজ করিবেন না, একবার উলটাইয়া-পালটাইয়া উহা দেখিয়া লইবেন না, আর পাতা উলটাইতে উলটাইতে বইটা পড়িয়া ফেলিবেন না,—একথা অমিত ইহার পূর্বে ভাবিতে পারিত কি? পারিত কি দুই ঘণ্টা আগে? আধঘণ্টা আগে? তাহার বাড়ি—গৃহাশ্রম, গৃহবন্ধন, আত্মার আলয় ...সেখানে তাহার বাক্স-ভরা বই খুলিয়া বাবার সম্মুখে অমিতকে বসিতে হইবে; বলিতে হইবে প্রতিটি বই-এর পরিচয়। তাহারই আলোকে অমিতের আলোড়িত, আবর্তিত, বিবর্তিত, এই ছয় বৎসরের মানসজীবনের কথা বাবা বুঝিয়া লইবেন; আপনার নোট খাতা দেখাইতে দেখাইতে অমি ফিরিয়া যাইবে আবার আপনার রচিত খসড়ায়; উনবিংশ শতকের ইতিহাসের উপাদান দেখাইতে একবার পাণ্ডুলিপিটা বাহির করিয়া রাখিবে লজ্জায় সম্ভ্রমে—'আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির বনিয়াদ'। উহা ফেলিয়া চলিয়া যাইবে পিছনে "মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতি"তে, আর আরও পিছনে "বৌদ্ধ-যুগের বাঙালী জীবনযাত্রার রূপ-রেখা"য়। ঈজি চেয়ারের হাতলের উপরে বাবা একে-একে একদিকে স্তূপায়িত করিবেন অমিতের রচিত পাণ্ডুলিপি, অন্যদিকে সাজাইয়া রাখিবেন অমিতের আনীত পুস্তক। আর সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা জমিয়া উঠিবে; শান্ত মুখে আগ্রহ জাগিবে; হয়তো জাগিবে আপত্তি, উদ্বেগ, বেদনাও: 'না, অমিত, না'। 'ম্যান ডজ নট্ লীভ বাই দি ব্রেড এলোন' 'স্বচ্ছন্দ বন জাতেনাপি' দগ্ধোদরের দাবি মিটে,...এ সত্যও এদেশ প্রতিষ্ঠিত করেছে জীবনযাত্রায়। হয়তো তাতে বড় বেশি বাড়াবাড়ি করেছে, তাই মস্তিষ্কের অপব্যবহারও হয়েছে। কিন্তু বনে শাক আর গাছে তেঁতুলের পাতা থাকতে অভাব হয় না নৈয়ায়িক পণ্ডিতের ঘরে, বলেছিলেন বুনো রামনাথ। আর, তাঁদের ধর্মপত্নীরা? হাঁ, মেয়েদের আদর্শ তার অবস্থা থেকেই বরং তখনকার কালের সামাজিক মানদণ্ডের হিসাব ঠিক মতো পাওয়া যাবে। না, শাঁখাগাছি জোটেনি সর্বপূজিত পণ্ডিতের স্ত্রীর, শুধু লাল সুতো বাঁধা হাত। কিন্তু তা দেখিয়ে গর্ব করে বলেছেন গঙ্গার ঘাটে—'এ রঙিন সুতো যেদিন ছিঁড়ে যাবে, সেদিন নবদ্বীপের আলোও নিবে যাবে।' এই আমাদের সামাজিক আদর্শ, জ্ঞান-গরিমার এই মূল্যবোধ তা মিথ্যে রচনা নয়, অমিত। অমিতও বাবাকে উত্তর দিবে হাস্যমুখে, ওই ঈজি চেয়ারের স্থির বিষ্ণুমূর্তির দিকে মুখ তুলিয়াই... স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল।

কোথায় সেই মূর্তি? কাহাকে উত্তর দিবে অমিত?

বন্দিশালায় বসিয়া বসিয়া সে যখন আপনার মনে স্বপ্নের জাল বুনিয়াছে, কালের হাত তখন নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাসে ছিঁড়িয়া চলিয়াছে তাহার স্বপ্ন-চিত্রকে, তাহার জীবন-তন্তুকে, তাহার আত্মার উৎসকে...

মনু বই-এর বাক্সগুলি উপরে আনিয়া ফেলিয়াছে। এই ঘরে তাহা নামাইয়া কাজ নাই। এখানে কেন আর? বাবার সহিত একযোগে যাহা আর অমিত ভোগ করিতে পারিবে না?

সত্যের বৈজ্ঞানিক নির্লিপ্ত অনুসন্ধানে অমিত কৃতার্থ। কিন্তু সত্যের একটা

সমগ্রতা আছে ; আর সেই সমগ্রতায় সত্য শুধু তথ্য নয়, তাহা রসাপ্লুত। কিন্তু এই মুহূর্তে অমিত জানিতেছে—সেই রস-সমৃদ্ধ সত্য আর তাহার ভাগ্যে মিলিবে না। তাহার চিন্তা মুখামুখি করিতে পারিবে না তাহার পিতার চিন্তার সঙ্গে ; তাহার একালের জীবনবীক্ষার উপরে পড়িবে না তাহার পিতৃপ্রাণের জীবন-বোধের সুদৃঢ় স্বাক্ষর। বৈজ্ঞানিক সত্য উগ্র হইয়া উঠিবে আপন পরিধিতে; সমগ্রতাহীন রসহীন হইয়া তাহা অর্ধসত্যে পরিণত হইবে। রসহীন সেই সত্য, প্রাণহীন জ্ঞান লইয়া কি করিবে, অমিত ?

সজোরে একটা শব্দ হইল ; অমনি চঞ্চল হইল—পড়িয়া গেল বুঝি বই-এর বোঝাটা। গলা বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল সেই ঘরের দিকে। বইগুলি নষ্ট হইল বুঝি!

আমি যাচ্ছি দাদা, তুমি বসো—তাহার মনের কথা বুঝিয়া অনু হাসিয়া সেদিকে আগাইয়া গেল।

এখন অমনি রেখে দাও। আমি সব সাজিয়ে রাখব পরে—তোমরা পারবে না।

অমিতের কত মায়া-মমতা প্রত্যেকটি বই-এর পাতার সঙ্গে জড়ানো।

দুয়ার হইতে অনু হাসিতে হাসিতে বলিল, আচ্ছা দেখব—পারি কি না ?

মেঘের কোলে একবার সূর্যাভা ছড়াইয়া পড়িল, অমিতও হাসিল। গৃহের তের বছরের সেই কনিষ্ঠা কন্যাটি এখনো কনিষ্ঠাই রহিয়াছে,—হোক সে বিশ বৎসরের বি-এস সি. ক্লাশের ছাত্রী। সেই আদরের একগুয়েমি এই দায়িত্বশীলা তেজোময়ী প্রকৃতির মধ্যেও ফুটিয়া উঠে। আরও উঠিবে, বারে বারে উঠিবে ;—সেই জন্যেই তো দাদাকে তাহার চাই। অমিতকে চাই—এখানে এই গৃহে, গৃহবন্ধনের নিবিড় আশ্রয়ে একটি সহোদরা-সত্তার—কালের আবর্তিত উচ্ছ্বাসেও যাহার অন্তরের উৎস-মুখ বুজিয়া যায় না।

অমি—

বাবা ডাকিলেন বুঝি। তাড়াতাড়ি অমি মুখ ফিরাইল। ঈজি চেয়ারে স্থাপিত মস্তক তাহার দিকে ফিরিয়াছে, চোখ তাহার মুখের উপরে স্থাপিত। ডান হাতের আঙুল কয়টি ঈজি চেয়ারের হাতলের উপর চঞ্চল, যেন কিছু ছুঁইতে চায়, ধরিতে চায়, চায় কাহারও স্পর্শ। হয়তো আজন্মের সংযত আবেগ, সংযত আচরণ অভ্যাস এই দুর্বল দেহের আবেগ উত্তেজনার নিকটে তথাপি হার মানিবে না, ক্লাসিক্সের শিক্ষাদীক্ষা কোনো আবেগবাহুল্যকে প্রশ্রয় দিবে না। অথচ চোখের স্তিমিত দৃষ্টিতেও আসিয়া গিয়াছে একটু ব্যাকুলতা, একটা প্রার্থনা : অমি—

অমিত চেয়ারের হাতলের উপর হাত রাখিয়া মুখের সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল : কি বাবা ?

খেয়েছ ?—কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন ফুটিল।—বেলা শেষ হয়ে গেল না ?

খেয়েছি একবার, আবার নয় খাব কিছু।

বার্ধক্য শীর্ণ শিথিল হাতখানি উঠিয়া আসিয়া অতি আলগোছে হাতলের উপরে স্থাপিত অমিতের হাতের উপর পড়িল। ক্লাসিক্সের শান্ত মহিমা কি বলিবে জানে না

অমিত, কি বলিবে বেদান্ত-বিবেকানন্দ-স্বদেশী স্থিত-চিত্ত তাহাও জানিবার আজ প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই একটি স্পর্শে, একবারের মতো শশাঙ্কনাথের উপবাসী অন্তরের সাক্ষ্যই যেন অমিতের আত্মায় আবার সত্য হইয়া উঠিল।—সত্য নয় কি, অমিত, গৃহলোকের মায়া-মমতার মধ্য হইতেও অমৃতলোকের সুধা মথিত হইয়া উঠিতেছে? সত্য নয় কি, 'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন?' প্রাণরসে রহস্যময় সে জীবন আপনাকে চিনিয়া লয় এমনি মমতা-কম্পিত দেহস্পর্শে...অথচ 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে মরে পরশপাথর'---আদর্শের অন্ধ আবেগে।

শব্দ নাই। ওঘরে অমিতের বাক্‌স বোঝা নামিতেছে। অনুতে মনুতে এক আধটুকু তর্কও বাধিয়াছে: মুটেমজুরদের বুঝাইতে পারা যায় না সাবধানে নামাইতে হইবে দাদার জিনিসপত্র। ছয় সাল পরে ফিরিতেছেন না বাবু জেল হইতে। 'কুছ নেহি', সের্ফ জুলুম। স্বদেশী আদমি, স্বরাজের লড়াইতে ভারী কাম করতেন। না, না, গান্ধীজীর আদিমি নন, স্বদেশী ইন্‌কেলাবী, ক্রান্তিকারী—পিস্তল বোমা লইয়া যাহারা সাহেবদের খতম করে'---

এ কি কাণ্ড করিতেছে পাগল দুইটা মিলিয়া! অমিতের হাসি পাইল, মুটে দুইজন বুঝি দেখিতে আসিয়াছে অমিতকে। অমিত দুয়ারের নিকট আগাইয়া গিয়া হাসিয়া মনুকে বলিল: গরিবদের ঠকাবার ফন্দি বের করেছ তো বেশ। 'বাবু স্বদেশী', অতএব তোরা তার কাজ করে আবার পয়সা চাস? এত স্পর্ধা!

পয়সা দিয়েছি দাদা।

না, এ পেশাটা চলবে না---'স্বদেশীর' নামে গরিব শোষণ।—অমিত মুটেদের বলিল, —কেয়া ভাই, মিলা?

সম্ভ্রমে কৃতজ্ঞতায় বলিল দুইটি ঘর্মাক্ত প্রোলিটেরিয়ান্ দেহ: মিলা, সরকার।

'সরকার'! কে যেন চাবুক মারিল অমিতকে।...'সরকার সালাম!' মুক্ত-জীবনে এই প্রথম প্রোলিটেরিয়ান্ সম্ভাষণ অমিতের। অন্তত ঐ শব্দটা নয়, 'হুজুর', 'বাবু', 'সাব'---সব হজম হইবে, কিন্তু ঐ শব্দটা হজম করিতে অমিতের অনেক দেরি লাগিবে।

হাসিয়া অমিত বলিল। 'সরকার' নেহি, ভাই, বলো 'জী'।—অমিত বুঝাইয়া বলিতে চাহিল। কিন্তু প্রোলিটেরিয়ানের নিকট পার্থক্যটা পরিষ্কার হইল না; তবে নীরবে তাহারা 'বাবুজীর' কথা মানিয়া লইল। পার্থক্য সত্যই কিছু আছে কি?—অমিত নিজেকে জিজ্ঞাসা করে। 'বাবুজীরাই' তো দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, 'শাসকশ্রেণী' আর সেই কারণেই তো তাহারা 'সরকার' অর্থাৎ শাসনকর্তা। কিন্তু পার্থক্য বুঝাইতে হইবে—যতক্ষণ রাষ্ট্র 'উইদার এওয়ে' না করে,---বিশুষ্ক হইয়া না যায়। শুনিতে শুনিতে ইহারা ক্রমে বুঝিতে শিখিবে। সঙ্গে সঙ্গে শিখিবে যুঝিতে—তারপর?

বাবার সঙ্গে কথা হল?—অমিতকে মনুর ঘরে বসাইয়া অনু জিজ্ঞাসা করিল।

অমিত শুনিতে লাগিল—এখনো বাবা চলা-ফেরা করিতে পারেন। দেহযাত্রার নিয়মিত অভ্যাস এখনো মূলত ভাঙে নাই। নিজে মুখ হাত ধুইবেন, সংবাদপত্র পড়িতে পারেন না, তবু প্রভাতে প্রতিদিন সংবাদপত্র দেখিতে চাহিবেন। আহারের কথাও মাঝে মাঝে ভুলিয়া যান, কিন্তু আহারান্তে হাত ধুইবেন, দাড়ি নিজে কামাইতে পারেন না; তবু একদিন পর একদিন ক্ষৌরী হইবেন। মুখ ধুইবেন নিজে—ঘরে নয়, ছাদে গিয়া। ঐ এক ফালি ছাদেই গিয়া বসিবেন বিকালে। ধরিতে হয় না, নিজেই চলেন; কিন্তু চলা খুব স্থির নাই। দেহযাত্রা তত বিশ্রস্ত হয় নাই, কিন্তু বিপর্যস্ত হইয়াছে মন, স্নায়ু, চেতনা।...

অমিত জেলেই খাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সে আপত্তি টিকিল না। টিকিবে না, অমিত জানিত। তাই পূর্বেও যত কম সম্ভব খাইয়াছে, এখনো যতটা সম্ভব আপত্তি জানাইয়া আহারের জন্য সম্মত হইল। তাহারই জন্য অপেক্ষায় বসিয়া আছে—অনু ও মনু; দাদাকে লইয়া এক সঙ্গে খাইবে। রান্না কতকটা করিয়াছে বটুক। কতকটা 'আমরা',—জানায় অনু। 'কানাইর মা' এখন চোখে দেখে না,—ছেলের বউ ও নাতিদের কাছে থাকে, কালিঘাটে। অনু তাহাকে খবর পাঠাইয়াছে, বুড়ি আসিয়া যাইবে। ঠিকা ঝিই কাজ করে, রান্না সকালে বটুকই চালায়—অনুর তখন কলেজ। মনুর এখন দেরিতে হইলেও চলে। মনু প্রাচীন ইতিহাসের গবেষণা করে, আর করে একটা প্রাইভেট্ টিউশনি এবং দেশীয় একটা ইন্‌শিওরেন্‌স্ কোম্পানির এজেন্‌সি—বি-এ পাস করিয়াই এ কাজ আরম্ভ করিয়াছিল—বাড়ির পক্ষে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল—দূরে বসিয়া অমিতও যে তাহা অনুমান না করিয়াছে তাহা নয়।

ব্যবসা-মন্দার ডামাডোল অমিত আগেই দেখিয়া গিয়াছে। ১৯২৯-৩২এ পশ্চিম জগতের মানসিক বিপর্যয় যদি ঘটিয়া থাকে তবে তাহার কারণ সমস্ত পশ্চিম জগতের আর্থিক জীবনে ফাটল ধরিয়াছিল! কেইন্‌স্, স্ট্রেচার, লেইটন হালে পানি পান নাই। কোলে, লাস্কি প্রায় কবুল করিয়া ফেলিলেন 'প্লানড্ ইকোনমি' ছাড়া পথ নাই। রুজভেল্ট 'নিউ ডিলে' নয়া শুকতলার জোরে পুরানো জুতোতে কাজ চালাইতেছেন। সিড্‌নি ও বিয়েট্রিস ওয়েব আমেরিকার 'ক্যারেন্ট হিস্টরির' পাতায় সর-জমিন তদন্ত করিয়া সোভিয়েট ব্যবস্থার প্রমাণপত্র দাখিল করিতেছেন। চিন্তাশীল, সৃষ্টিশীল ইউরোপ শেষে এই মন্দার দুর্যোগে সমাজতন্ত্রী চিন্তা ও প্রয়াসের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে। অন্যদিকে উহার প্রতিক্রিয়ায় মাথা তুলিয়াছে হিটলার ফ্রাঙ্কো। আর আগামী দিনের আগমনী-স্বরূপ উঠিয়াছে ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড্...এইসব লইয়াই সে কী তর্ক, আলোচনা, অন্তর্বিরোধ, বিচ্ছেদ, রক্তক্ষরণ, মৃত্যু আর নবজন্মের আলোড়ন অমিতদের বন্দিশালার প্রতিটি জীবনে ঘটিয়াছে।...কিন্তু সে উহার বাস্তব অর্থ কতটুকু বুঝিয়াছে?...চায়ের শেয়ারের লভ্যাংশ কমিয়াছে, দুই-একটা পুরাতন কোম্পানি উঠিয়া গিয়াছে, পিতার সঞ্চিত সামান্য অর্থ নিঃশেষ হইয়াছে...নিজ গৃহের এই সব অভাব-তাড়নার মধ্যে দিয়া সংকটকে না দেখিয়া ইতিহাসের তত্ত্ব, তার প্রকৃত তাৎপর্য অমিত তুমি বুঝিয়াছ কি? সংকটের তত্ত্বকে

দেখিয়াছ, দেখো নাই তার কঠিন বাস্তব রূপ—ইতিহাসের গবেষক যেখানে আপনার জীবিকা সংগ্রহ করে ইন্‌শিওরেন্সের এজেন্টরূপে।...

পঁয়ত্রিশ টাকার সরকারী ভাতা অমিতের মাতৃবিয়োগের পরে আরও পনের টাকা কমিয়া যায়, বন্দিশালায় অমিত তখন সরকারী হিসাবের নৈপুণ্য দেখিয়া বিদ্রূপে ব্যঙ্গভরে হাসিয়াছে। কিন্তু দিনের পর দিন অভাব ও উদ্বেগের মধ্য দিয়া মনুর মতো তো সে অনুভব করিবার অবসর পায় নাই—পিতার সঞ্চয় ফুরাইয়া গেল, মাতার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়াও আর সংসার চলে না। নিজের পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে মনু তাই রোজগারের অন্যবিধ ধান্দায় ঘুরিতে ঘুরিতে কলেজের এক-একটি সোপান উত্তীর্ণ হইয়াছে। চাকর বামুনের পাট খর্ব করিতে হইয়াছে; আই-এস্-সির পরে ডাক্তারি পড়িবার সাধ অনুকে বিসর্জন দিতে হইয়াছে। রাঁধিয়া-বাড়িয়া গৃহকর্ম করিয়া, পিতাকে সেবা-যত্ন করিয়া অনু এইরূপে বি-এস্-সির সীমায় পৌঁছিয়াছে—সহজ দায়িত্ববোধে মনুর সহযোগী হইয়া উঠিয়াছে। সযত্ন আয়াসে ঘিরিয়া মনুই তবু তাহাকে কঠিন জীবিকা-গঞ্জনা হইতে বাঁচাইয়া লইয়া চলিয়াছে। জীবনে অনেক ঠেকিয়া যদি মনু ফার্স্ট ক্লাসের গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে তথাপি সে বুঝিয়াছে এনশিয়ান্‌ট্ হিস্টরি বা কালচারাল এ্যান্‌থ্রোপলজির ছাত্রের পক্ষে এদেশে এ জীবনে ইন্‌শিওরেন্স এজেন্টের স্বাধীন বৃত্তিও কাম্য—সরকারী আর্কিঅ্যালজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের কর্তার মুখে শুনিতে হয় না 'ভাই-এর কানেক্‌শন্‌টা খারাপ কি না, তাই তোমাকে চাকরিতে নিলে গোয়েন্দা বিভাগ কি বলবে কে জানে?' অতএব আর্কিঅ্যালজির বড় কর্তার সহোদরা শ্যালীর নন্দাইয়ের সে চাকরিটি প্রাপ্য। অমিতের ভাই হইয়া নিজ কলেজের প্রিন্সিপলের বিড়ম্বনাও বাড়াইয়া দিতে হয় না—তাঁহার কলেজের একশত টাকা মাহিনার 'লেকচারশিপের' জন্য মনু দরখাস্ত করিয়াছে। কি বিপদ!

'বরং তোমার মিস্টার মেহ্‌তারাই ভালো :—মনু খাইতে বসিয়া জানায়—তোমাকে ভোলে নি। কেমন আছ খোঁজ নিত তোমার বরাবর। তারপরে ওদের ছেলে-পড়ানোর কাজ আমাকে ওরা খুশী হয়ে দেয়। সে সূত্রেই ওদের ইন্‌শিওরেন্স কোম্পানির এজেন্‌সির কাজ করতে ওরাই দেয় পরামর্শ। ছেলেও পড়ে—এখন সে পড়ে সেন্ট জেভিয়ার্সে। আমার তাকে সপ্তাহে দুদিন পড়াতে হয় প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সভ্যতার কথা। টিউশনিতে দেয় পঞ্চাশ টাকা।'

কিন্তু অনু খাইতে বসিল না যে? সে পরে খাইবে, আগে দাদাদের পরিবেশন করিবে। বলে কি অনু? এখনো এ নিয়মই রহিয়াছে বুঝি দেশে—পুরুষদের দিয়া থুইয়া তবে মেয়েদের আহার।

চুলোয় যাক সে নিয়ম, সে দেশ।—বলে অমিত।—আর নিয়মই বা কোথায়? এক সঙ্গে বসেই তো আমরা বরাবর খেতাম—মা করতেন পরিবেশন।...

মা পরিবেশন করিতেন। অনেক রান্নাই মা তখন রাঁধিতেন, চাকর-বামুন থাকিলেও তিনি মানিতেন না। দিনের অনেকটা সময় তো তাঁহার রান্নাঘরে

কাটিত; রাঁধিতেন, কুটিতেন, রান্নার নানা আয়োজন করিতেন, ভাঁড়ার সাজাইতেন,—খাওয়া-দাওয়া ও হেঁসেলের সমস্ত হাঙ্গামা মিটাইয়া কী-ই বা আর সময় পাইতেন? হয়তো বা একটু বাঙলা সংবাদপত্র পাঠ; হয়তো পড়ার নাম করিয়া মেঝেয় মাদুর পাতিয়া একটু গড়াগড়ি। এখন স্কুল হইতে ফিরিবে মনু—স্কুলের ধুলাবালি সঙ্গে লইয়া; আসিবে অনু স্কুলের একরাশি কথা আর খেলার গল্প লইয়া। মা উঠিয়া পড়িতেন,—সময় হইয়া গিয়াছে অপরাহ্ণের জলযোগের ও চায়ের। বড় জোর কখনো সময় করিয়া মা বাঙলা মাসিকপত্রের পাতা উল্টাইতেন, বঙ্কিমচন্দ্র বা শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পড়িতেন; কানাইর মাকে কখনো পড়িয়া শুনাইতেন রামায়ণ ও মহাভারত।...রান্না আর রান্না, ইহাই ছিল যেন মায়ের জীবনের রুটিন...কিন্তু কাহার জন্য তাহা? আত্মদানের মধ্যেই তাঁহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা। 'হেঁসেলের হাঁড়ি-কুড়ি হইতে মেয়েদের মুক্তি দিয়া রাষ্ট্রচালনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে প্রত্যেকটি রাঁধুনি-মেয়েকে'—লেনিনের নির্দেশ। অমিত জোর করিয়া মায়ের স্মৃতি হইতে নিজের মুখ ফিরাইয়া লইল—লেনিনের কথায়। লেনিনের কথা—উহার মধ্যেই তাহার মায়ের এবং আরও কত কত মায়ের জীবনে চাপা-পড়া স্বপ্ন আপনার অজ্ঞাতে আপনার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে।...

অমিত বলিল: বুঝলে, এই হল এ যুগের দৃষ্টি—লেনিন-সংহিতার কথা। এস বস অনু, আমাদের সঙ্গে—

কিন্তু অনুরও আকাঙ্ক্ষা—আজিকার মতো সে রাঁধিবে, নিজের হাতে দাদাকে খাওয়াইবে।...

এই তো সেই গৃহপথ—ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়।...কে বলিল ভাঙিয়া গিয়াছে সেই নীড়?—আফগানিস্তানের কোলে আর কাবুলীওয়ালা ফিরিয়া গিয়া খুঁজিয়া পাইবে না সেই তিন-বৎসরের মিনির মতো তাহার নিজ মেয়েকে। কিন্তু পাইবে সেই ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়—পাঠানী জায়া-কন্যার স্নেহে-মমতায় তেমনি সুকোমল। বি-এস্‌সি-পড়া অনু সেই চিরদিনকার বাঙালী মায়ের মতো এমনি করিয়া রাঁধিয়া-বাড়িয়া পিতা ভ্রাতাকে খাওয়াইয়া সেবা করিয়া জীবনের রস উপভোগ করিতেছে। আর উহারই মধ্যে কি শশাঙ্কনাথের কথা মতো সেই রসের আস্বাদ অমিত পাইতেছে না, এখনো—এই নিমেষেও? এই লেনিনের বিধান ঘোষণা করিতে করিতে, অনুকে আপনাদের সঙ্গে খাইতে বসিবার জন্য জোর করিতে করিতে? নিজের কাছে অমিত তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়। তবে কি সেই 'সনাতন' নিয়মই এখনো চলিতেছে, ভবিষ্যতেও চলিবে? যত পরিবর্তন ঘটিতেছে ততই অপরিবর্তনীয় রহিয়াছে সেই পুরাতন পৃথিবী? না, না, মিথ্যার এই জারক-রসকে জীবন-রস বলিয়া ভুল করিয়া অমিত আপনাকে ভুলাইবে না। এ যুগের দৃষ্টিতে, এ যুগের সৃষ্টিতে জীবনের শাশ্বত সত্যেরও নব-রসায়ন চলিয়াছে। চিরন্তনী প্রাণলীলা—'এলাঁ ভিতাল'। নবায়মান দেহে, নবায়মান চেতনায়, নবায়মান সংগ্রামে সমৃদ্ধিতে জীবন আপনার অভাবনীয় সম্ভাব্যতাকে আবিষ্কার করিয়াছে, চলিতেছে—'লাইফ মার্চেস।' অনেক বেশি সম্পূর্ণ, সার্থক হইবে এই রসের

আস্বাদন যখন অনু দাদার সঙ্গে দাদার পার্শ্বে আসনে বসিবে—বসিবে না অনু? না বসিলে অমিত আর ভাতই ভাঙিবে না।

হাসিয়া, একসঙ্গে সব সাজাইয়া অনু দাদার পার্শ্বে বসিল। কুণ্ঠা তাহারও নাই। খাইতে খাইতে গল্প করিবে, ওখানে বসিয়াই প্রয়োজন বুঝিলে আবার দাদাকে পরিবেশন করিবে—না, বাধিবে না, তাহাতেও তাহার বাধিবে না। হয়তো মায়েদের যুগে এইরূপ একসঙ্গে বসিয়া খাইতে, পরিবেশন করিতে মেয়েদের বাধিত। কিন্তু অনুদের যুগে আজ এভাবে বসিলে তাহাতে অনু আর বাধা পায় না। কালের পরিবর্তন হইয়াছে, গৃহশ্রী নতুন ভঙ্গিমা লাভ করিয়াছে : 'লাইফ্ মার্চেস্'।

এ কি কাণ্ড! মাত্র দুই ঘণ্টা হইল অমিত জেলে মধ্যাহ্নভোজন শেষ করিয়াছে। এখন কি এতটা খাওয়া যায়? শুধু এক সঙ্গে বসিবে বলিয়া সে খাইতে বসিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এ কি কাণ্ড।

মাছ কিন্তু খেতেই হবে—ওদেশে তো আর মাছ পেতে না।

মাছ একেবারে পাইত না তাহা নয়। করাচীর সমুদ্র-মাছও আসিত, কিন্তু পাইত না এই রান্না। আর কাহারও সাধ্য হইত না—অমিতের মায়ের পক্ষে ছাড়া —মাছের এই রান্নাটা।

অমিত বুঝিতে পারিতেছে—কেন অনু আজ রাঁধিল, কেন রাঁধিল অমিতের প্রিয় আহার্য। কিন্তু শুধু অমিতকে মনে করিয়াই কি অনু রাঁধিয়াছে? মুখে না বলুক, আজ তাহারা সকলে সকল কাজে মাকে মনে করিয়া বসিয়া আছে। এ গৃহের প্রত্যেকটি আয়োজনের মধ্যে মাতৃপ্রাণের সেই দিনরজনীর শত আকাঙ্ক্ষা আর ব্যর্থতা আজ ডানা মেলিয়া বসিয়া আছে। কেহ তাহা কিছুতেই সহজে মুখ ফুটিয়া বলিবে না, বলিবে না বলিয়াই এখনও বলিল না। শুধু কেহ অনুযোগ করিতেছে আহারের, কেহ অভিযোগ করিতেছে গুরু ভোজনের। আর গৃহজীবনের ছোটখাটো তথ্য, হিসাব, উহারই মধ্য দিয়া ক্ষণে ক্ষণে পরস্পরে বাঁটিয়া লইয়া উপভোগ করিতেছে।

বিকালে কিন্তু দাদার চায়ের নিমন্ত্রণ আছে সবিতাদের বাড়ি।—ইহারই মধ্যে মনু অনুকে মনে করাইয়া দিল।

সবিতা?...মনের যে পটে মায়ের সেই আবেগাকুল মূর্তি সেই দেবদারুতলের মুহূর্তটি হইতে বারে বারে অনিবার্য ইঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিতেছিল, মিলাইয়াও একেবারে মিলাইতেছিল না এতক্ষণেও, অকস্মাৎ সেই পটে আর একটি ছায়াও মৃদু শান্ত স্থির রেখায় মূর্ত হইয়া উঠিল। অমিত জানে—ফুটিয়া উঠিবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল আরও দু-একটি মুখ—'প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশা'।.. অমিতের মুক্তির খবর তাহারা অবশ্যই পায় নাই।...

সবিতা?...অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে অমিত নামটা উচ্চারণ করিতে গেল—একটা অপরিচিত নাম যেন সে শুনিয়াছে। কিন্তু বড় বেশি সহজ, বড় বেশি স্বচ্ছন্দ, আর বড় বেশি ছল-বিস্মৃতির রেশও তাই ফুটিয়া উঠিল কি এই প্রশ্নটিতে? অমিত

অপেক্ষা করিতে লাগিল তাহা দেখিবার জন্য—মাথা না তুলিয়া চোখের কোণে গোপন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লইয়া দেখিতে লাগিল,—কি বলে অনু? কি করে মনু?

অনুই প্রথম উত্তর দিল: ব্রজ জ্যেঠামশায়ের মেয়ে সবিতাদি ওখানে আছে না? কিন্তু তাহার পূর্বে কি অমিতের অবনত মস্তকের উপর দিয়া একটা চকিত দৃষ্টি বিনিময় করিল অনুর দুই চক্ষু মনুর চক্ষুর সহিত?

অমিত একবার মাথা তুলিল, বলিল : ওঃ হাঁ হাঁ...অমিতের মনে পড়িয়াছে, ব্রজেন-বাবুর মেয়ে সবিতার কথা মনে পড়িয়াছে।

মনু জানাইল : সকাল থেকে সবিতাদি তোমার জন্য এসে বসেছিলেন—মনুর এই সহজ কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা আগ্রহ রহিয়াছে, একটা সৌহার্দ্যের সুর আছে। সে অমিতকে জানাইল এই বাড়িতে তাহারা খবর পাইবার পূর্বেই সবিতা কি করিয়া জানিতে পায় অমিত আজ মুক্তি পাইবে—জেলের কোন কর্মচারীর কন্যা তাহার ছাত্রী ছিল,—(হয়তো শরৎ গুপ্ত মিথ্যা কথা কহে নাই, অমিত...) সবিতা দুই-এক মাস ওপাড়ার একটা মেয়ে কলেজে মাস্টারিও করিয়াছিল। এন্‌শিয়ান্‌ট হিস্টরি এ্যাণ্ড কাল্‌চারে মনুর সঙ্গে সবিতাও পাস করিয়াছে; বৈদিক যুগ ছিল তাহার বিশেষ পাঠ্য। সে খুব ভালো পাস করিয়াছে। এখন গবেষণা করিতেছে ফিলজফির অধ্যাপক সেনশাস্ত্রীর নিকটে। অমিতের জন্য আজ সমস্ত সকাল অপেক্ষা করিয়া এই শেষে সবিতা চলিয়া গেল। 'জ্যেঠামশায়' ও আজ অমিতের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; অমিতকে নিমন্ত্রণও তিনিই করিয়াছেন। সবিতাদিও এখনি আসিয়া যাইবেন; অমিতকে তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। ব্রজেন্দ্রবাবু মোটের উপর সুস্থই আছেন। বৃদ্ধ হইয়াছেন; কিন্তু অমিতের পিতার মতো তাঁহার স্মৃতিভ্রংশ ঘটে নাই। সবিতার সমস্ত পাঠ আলোচনা গবেষণার তিনিই আসলে পথ-নির্দেশক আর সহচরও। ব্রজেন্দ্র রায় চক্ষে কম দেখেন। সেবার বারাণসীতে বেরিবেরি ও গ্লোকোমা হইবার পর হইতে তিনি আর পড়াশুনা করিতে পারেন না, সবিতাই পড়িয়া শোনায়। তাই সবিতা কলেজেরও কাজ করিতে চাহে না; বৃদ্ধ পিতার তাহা হইলে দ্বিপ্রহর কাটিবে কিরূপে? সবিতা পিতার কাছে বসিয়া বই পড়ে। মাঝে মাঝে লাইব্রেরিতে যায় বা কলেজে সেনশাস্ত্রীর নিকট পরামর্শ লইয়া আসে, আর এই বাড়িতে অনু-মনুর সঙ্গেও দেখা করিয়া যায়, পঠিত বিষয় লইয়া মনুর সহিত আলোচনা করিতে বসে। গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে সবিতাদি, বাজে মেয়েদের মতো ফাঁকি, ফাজলামো, স্মার্টনেসের ধার ধারে না। অমিতের কিংবা তাহার পিতার খোঁজ বেশি দিন না পাইলে ব্রজেন্দ্রবাবু ব্যস্ত হন, প্রায়ই সবিতাকে তাই ছুটিয়া আসিতে হয়, 'অমিতবাবুর কি খবর, মনু?' অমিতের জেলখানার চিঠি দেখে, চিঠি পড়ে; তাহা জ্যেঠামশায়কে পড়িয়া শুনাইবার উদ্দেশ্যে লইয়া যায়। আবার কোনো দিন হঠাৎ আসিয়া পড়িলে অমিতের উদ্দেশ্যে লেখা অনুর ও মনুর চিঠিও দেখিয়া যায়। মনুর সঙ্গেই তো এম. এ. পড়িত, তাই পড়াশুনার জন্যও প্রায়ই পূর্বে এ বাড়ি আসিত। অমিতের পিতার স্মৃতিশক্তি যতদিন ব্যাহত হয় নাই

ততদিন সবিতা তাঁহারও প্রধান এক সঙ্গী ছিল। বন্ধু ব্রজেন্দ্র রায় তত সচল নাই, অমিতের পিতাও সচল নাই; দুইজনার মধ্যখানে অতীতদিনের বন্ধুত্ব আর বর্তমান শোকাহত সহমর্মিতার বন্ধন এখন সুদৃঢ় করিয়া রাখিয়াছেন সবিতাদি।

মা যতদিন ছিলেন সবিতাদিকে পেলে সান্ত্বনা পেতেন। আর গোপনে গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন—'এমন মেয়ের এ দশা! এর আর কোনো উপায় নেই কি?' —অনু এই সংবাদটিও যোগ করিল।

অমিতের অচঞ্চল মুখে কি কোনো ক্ষীণছায়াও ফুটিয়া ওঠে নাই? অমিত নিশ্চয়ই জানে ওঠে নাই। কই ইন্দ্রাণীর কথা কেহ বলিল না তো!...এ জীবনে অনেকখানি সংযম, অনেকখানি আত্মশাসনের মধ্য দিয়া অমিতকে দিন অতিক্রম করিতে হইয়াছে। অনেক শ্যেনদৃষ্টি 'রায়সাহেব', 'রায়বাহাদুরের' প্রশ্ন ও ছলনাকে সুস্থিরভাবে কাটাইয়া উঠিতে হইয়াছে। অনেক ভুজঙ্গ সেন, বিভূতি বিশ্বাসের শাণিত বুদ্ধি ও সুচতুর 'সদিচ্ছা' তাহাকে সহজ স্বচ্ছন্দ মুখে গ্রহণ করিতে হইয়াছে—বন্দিশালায় যোগদান করিতে হইয়াছে সমমতের ও বিষম মনের বহু বন্ধুগোষ্ঠীর আলোচনায়। ধরা না পড়িবার বিদ্যা তাই অমিতের অনায়ত্ত নয়। সে যথেষ্ট সতর্ক। সেই সতর্ক মন স্বচ্ছন্দ মুখ লইয়া অমিত এতক্ষণ মনুর মুখে সবিতার কথা শুনিতে ছিল—ওই সহজ বিবরণ কি সত্য? সত্য মনুর কথা? না, উহা ইঙ্গিত আরও কোনো একটি গভীরতর সত্যের? অমিত নিঃসন্দেহ যে, সবিতাদির কথা বলিতে বলিতে মনুর মুখে চোখে একটা সহজ উৎসাহ দেখা দিয়েছে;—সবিতাও অমিতের গৃহ-পরিবেশে তাহার পিতা ব্রজেন্দ্র রায়ের মতো অনু-মনুর এখন অনেক বেশি আপনার জন হইয়া উঠিয়াছে, মনুর অকৃত্রিম আস্থা ও সৌহার্দ্যও সবিতাদি লাভ করিয়াছে। দিনের পর দিন এক সঙ্গে লেখাপড়া, সবিতার প্রকৃতিগত সৌন্দর্য ও মর্যাদাময় আচরণ, বিশেষত বন্দী অগ্রজের জন্য সবিতার চাপল্যহীন শ্রদ্ধা ও আগ্রহ,—মনু ও অনুর কাছে বুঝি তাহাকে তাহাদের সমগোষ্ঠীর করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু মনুর সকল উৎসাহের পিছনে কি তাই বলিয়া প্রচ্ছন্ন একটু প্রয়াসও নাই—দাদাকে বুঝিয়া লইবার একটু ইচ্ছা?—দাদার কতটা আগ্রহ সবিতাদির বিষয়ে। ভাবিয়া অমিত মনে মনে হাসিতেছিল—অত সহজে ধরা পড়িবার মতো নয় তোমার দাদা, মনু। আর তুমিও মনু বড়ই কাঁচা—নিজের আগ্রহাতিশয্যে নিজেই আবার ভুলিয়া গিয়াছ তোমার সেই উদ্দেশ্যও,—ঝোঁকের বশে সবিতাদির গল্পটাই করিয়া চলিয়াছ বেশি। সেই মূল জায়গাটিতেও তোমাকে, দ্যাখো, কেমন ফিরাইয়া আনিয়া দিতেছে চতুরা অনু—মায়ের কথা এই সঙ্গে তুলিয়া, আর সেই প্রসঙ্গে আরও গভীরতর এবং আরও মৌলিক একটি জিজ্ঞাসা মায়ের মুখে—'এর আর কোনো উপায় নেই কি?...' মায়ের প্রশ্ন? সবিতার বৈধব্যে মায়েরই কি ছিল শুধু এই প্রশ্ন, অমিত?— আর শুধু প্রশ্নই কি ছিল? ছিল না তাহার পশ্চাতে কোনো একটি সম্ভাবনার স্মৃতি, অমিতের নিজ হাতে নষ্ট-করা কোনো একটি শুভ পরিণতির স্বপ্ন?

অমিতের সঙ্গে সবিতার বিবাহের কথা একবার উঠিয়াছিল, যেমন ওঠে বাঙলাদেশের মেয়েমাত্রেরই বিবাহের প্রস্তাব অনেক স্থলে ও অনেকবার, তেমনি ;—তাহার বেশি কিছু নয়। ব্রজেন্দ্র রায় অমিতের সঙ্গে ইতিহাস ও নানা কথা আলোচনা করিয়া মনে সুখ পাইয়াছিলেন। সবিতা তখন বুঝি আই-এ দিয়াছে বা পাস করিয়াছে, আর অমিত ঝটিকাবিক্ষুব্ধ কালের মধ্যে ভাসাইয়া দিয়াছে তাহার দিনরাত্রির তরণী। কোথায় বা তখন সবিতা, আর কোথায় বা অমিত? যথানিয়মে সুপাত্রে কন্যাদান করেন ব্রজেন্দ্র রায়, আর অমিতের কুলায়ত্যাগী যৌবন-স্বপ্ন দিগন্তের অভিযানে উহার হিসাবও রাখে নাই। তবু বন্ধনদশার পূর্বক্ষণে ব্রজেন্দ্র রায়ের আহ্বানে অমিত এক সন্ধ্যায় তাঁহার গৃহে গিয়াছিল, আর দেখিয়াছিল তাঁহার গৃহের বারান্দায় নব-পরিণীতা, গম্ভীরা, মর্যাদাময়ী সবিতাকে—লাল পাড়ের শুভ্র বসনের আড়ালে উদ্ভাসিত একটি সুগৌর সুডোল বাহু-বল্লরী, চো'খে মুখে দেহে গতিতে বিবাহের স্বাভাবিক নিয়মেই মঞ্জরিত এক নতুন শ্রী, নতুন স্থিরতা, নতুন মহিমা। বলিতে গেলে অমিত সেদিনই সবিতাকে প্রথম দেখিয়াছিল। আর সেদিনই বুঝি প্রথম বুঝিয়াছিল—বিবাহ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত নিশ্চেষ্ট অমিত—শশাঙ্কনাথের সত্য :—গৃহের আশ্রয়েই জীবন নিশ্চয়তা লাভ করে, পায় তাহার সমৃদ্ধি আর মর্যাদার সন্ধান।

অমিতের সেদিনকার দেখা সবিতাই বহুদিনের অদর্শন সত্ত্বেও অমিতের নির্বিকার চৈতন্যের মধ্য হইতে অদ্ভুত শক্তি, বেদনা ও মাধুর্য লইয়া আবার সমুত্থিতা হইল বন্দিশালায় অমিতের শেষদিককার জীবন-খণ্ডে—যখন বন্দিশালার অতৃপ্ত বায়ুমণ্ডলে শশাঙ্কনাথের হৃদয়ের সদিচ্ছা আর আবেদন বারেবারে অমিতকে আপনার অতীত, আপনার ভবিষ্যৎ, আপনার পরিত্যক্ত গৃহ আর অবিচ্ছিন্ন গৃহবন্ধন সম্বন্ধে চমকিত, জিজ্ঞাসাকুল করিয়াই তুলিতেছিল ; যখন অমিতের নামে ব্রজেন্দ্র রায়ের চিঠি আসে সবিতার হস্তাক্ষরে, আর সেই হস্তাক্ষর জানায় অমিতের জন্য 'প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশা'। এই সত্য বুঝিয়াই কি এই সুতীক্ষ্ণ শর-নিক্ষেপ করিতেছে এখন তাহার বুদ্ধিমতী বোন অনু? অমিতের মর্মে তাহা বিঁধিয়াছে কি? বিঁধিয়াছে। কিন্তু অমিতের অত সহজে বিচলিত হইবার মতো কারণ নাই—অনু।

অমিত বলিল : উপায় নেই কেন, অনু? কার হুকুমে? সেই মনু-মহারাজের বিধানে? কিন্তু মনু-মহারাজের অপেক্ষা মানুষ-জীবটা অনেক বেশি বড়। উপায়ও মানুষই করে।

ধরা দিতেছ কি অমিত? না, না,—শুধু নিস্পৃহ একটা বিচার। একটা বিকৃত সমাজ-ব্যবস্থাকে অস্বীকার না করিলেই তো সে ধরা পড়িত। অনু মনে করিত কেন দাদার এই দ্বিধা? তাহাই তো বিকার। আর, আর...এইটুকু পরিমাণে ধরা দিতেই তো চাহে অমিত ; অবশ্য শুধু এইটুকু পরিমাণে।

মনু জানাইল—উপায় হওয়া কিন্তু সহজ নয়। তখনকার দিনে ব্রজেন্দ্রবাবু উপায় করিতে চাহিয়াছিলেন—তিনি সবিতার জন্য সংসার নতুন করিয়া গড়িয়া দিবেন। কিন্তু সবিতাই বাঁকিয়া বসিল। কিছুই শুনিল না। তাই শেষ পর্যন্ত আবার

সে পড়িতে লাগিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে সে জীবনের অর্থ প্রত্যক্ষ করিবে। রাজেন্দ্রবাবুও তাই তাহাকে লইয়া তখন বারাণসী গেলেন, সেখানে সবিতা সংস্কৃতে অর্নাস পাশ করিল। এখানে যখন সে ফিরিল তখন পড়িতে লাগিল ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এম-এ। নিয়ম-সংযত মর্যাদায় তাহার জীবন বাঁধা। বলিয়া মনু কথা শেষ করিল: তুমি দেখবে দাদা, এলেন বলে। তোমার কথা তো ওঁদের বাড়িতে লেগেই আছে।

অমিত চকিত হইল, কিন্তু বলিল: তা বলে আজই যেতে হবে চায়ের নিমন্ত্রণে?

বাঃ। যেতে হবে না? সকাল থেকে এসে বসে ছিলেন সবিতাদি। চায়ের নিমন্ত্রণ কই? জ্যেঠামশায় তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন; আর সে কবে থেকে! —কেন তোমার কোনো বাধা আছে নাকি আজ যাবার পক্ষে?

না, বাধা নয়। এই এলাম। বাবা রয়েছেন—আজ আমি বাড়িতেই থাকতাম তোমাদের কাছে—

যত সহজ করিয়া সম্ভব কথাটা সেইরূপেই অমিত বলিল।

গভীর এই স্বপ্ন ও উপলব্ধি অমিতের: পৃথিবীর যে সত্যকে সে অনায়াসে জন্মাবধি পাইয়াছে,—তাহাকেই এই নবজন্মারম্ভে সে সচেতনভাবে গ্রহণ করিবে। মা আর নাই; তবু পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী,—নাড়ীতে নাড়ীতে বাঁধা এই মানব-সম্পর্কের মধ্যে সে আপনাকে আবিষ্কার করিতে চায়। চায় সেই মানবীয় মায়া-মমতার সাধারণ রসে সঞ্জীবিত হইতে। এই গৃহ-পথে না হইলে পৃথিবীকেও সে আবিষ্কার করিতে পারিবে না; করিবে শুধু পরিক্রমণ; আপনাকেও করিবে পরিশ্রান্ত—শশাঙ্কমোহনের মতো...

মনু বলিল: একবার ঘন্টা দেড়-দুই-এর জন্য তুমি যাবে। শহরটাও দেখা হয়ে যাবে অমনি। আমিও মেহতাকে তখন খবর দিয়ে আসব, জীওনলালকেও পড়িয়ে আসব দু অক্ষর।

অনেকক্ষণ তাহারা পিতার খোঁজ লয় নাই। মা নাই, কিন্তু অমিতের জীবনের যে দ্বিতীয় প্রাণ-উৎস এইখানে, তাহাও যে আজ নিঃশেষপ্রায়,—অমিত বুঝি যথাসময়ে এই অমৃতধারাও স্বীকার করিতে পারিবে না।...অমিত পা টিপিয়া টিপিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল—পিতা বিশ্রাম করিতেছেন। শ্রান্ত বুকের আন্দোলন অমিত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। নিঃশ্বাসের সঘন শব্দ শুনিল। আবার নিঃশব্দে গৃহের বাহিরে আসিল।

'হোয়াট এ পীস অব ওয়ার্ক' অথচ 'এ কুইন্টেসেন্স অব ডাস্ট' তার নিয়তি।

নয়

অনু বলিল: ওঘরে বিশ্রাম করবে।

'ওঘরে' পার্শ্বের ঘরে। ইহাই ছিল মায়ের ঘর। এখানেই মা শুইতেন, পার্শ্বে থাকিত অনু। আর ওদিকে ওই দেয়ালের পার্শ্বে ছোট খাটে তখন শুইত মনু। আজ সে

খাটই গিয়াছে পিতার ঘরে, তাহাতেই অনুর শয্যা। আর, মায়ের এই খাটে আজ মনুর শয্যা। ঘরের চতুর্দিকে মনুরই নানা উপকরণ আয়োজন : ভাই-বোনের পড়িবার খান দুই টেবিল, চেয়ার, ব্যায়ামের সরঞ্জাম, ছাত্র-জীবনের তোলা কোনো কলেজীয় সেমিনারের ফটো, কোনো ফুটবল ইলেভন্-এর ছবি, দুই-একটি কালো কষ্টিপাথরের ভাঙা দেবতা ও অপদেবতা, পাহাড়পুর, না বানগড়, কোথায় গিয়াছিল একবার তাহারা ছাত্ররা, সেইখানকার কোনো গ্রামবাসীর নিকট হইতে সস্তায় উদ্ধার করা পোড়ামাটির মূর্তি।—'সূর্যমূর্তিই' হবে,—মনু বুঝায়,—দেখছ না বুটপরা সেই ঈরানী 'মিত্র'। শুনিয়া অনেক দিনের পুরাতন প্রেম অমিতের মনে জাগিয়া উঠিতে চায়—'সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলার ইতিহাস।'...তাহা বাতিল হইয়া গিয়াছে, বাতিল হইয়া গিয়াছ সেই তুমিও, অমিত।

কিন্তু এখন আর গল্প নয়,—অনু বিছানা তৈয়ারি করিয়াছে—দাদা ঘুমাইবেন।

ঘুমুব! পাগল নাকি?

অমিত দ্বিপ্রহরে ঘুমাইত না? তবে কি করিত সে?...তাই তো, কি করিত অমিত, ইহারই মধ্যে যে তাহা বলা অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। পড়িত? হাঁ, পড়িত। কিন্তু সব দিন তো পড়িত না। লিখিত—কিন্তু তাহা মাঝে মাঝে। গল্প করিত? হাঁ, গল্প করিত; কিন্তু তাহাও বা কতক্ষণ, কয় মিনিট? ঘুমাইতও, নেহাত দুই-একদিন কদাচিৎ। তবে করিত কি অমিত? সত্যই তো, কি করিত, ছয় বৎসরের দুপুরের হিসাব তাহার কোথায়।

সহাস্যে অমিত বলিল : গল্প করতাম। আড্ডা দিতাম—আর এখনো তাই করব।

শুধু গল্প? শুধু আড্ডা?—মনু বিশ্বাস করে না।

'শুধু' কেন? তাস আছে, পাশা আছে, দাবা আছে, লুডো আছে, মাজং আছে। আবার আছে সেতার এস্রাজ, এমন কি, গ্রামোফোনও।

বাদ ছিল শুধু লেখা আর পড়া, না দাদা?—হাসিয়া বিছানার পার্শ্বে একটা মোড়ায় বসিল অনু। তাহার উজ্জ্বল চোখের বুদ্ধির ছটা দেখিয়া হর্ষে গর্বে অমিতের দৃষ্টিও নাচিয়া ওঠে—কী দুষ্টু হইয়াছে এই বোনটা।

হাসিয়া অমিত বলে : হাঁ, লেখাপড়া ওখানে নিষিদ্ধ।

সু-সিদ্ধ তবে কি? ঘুমনো নয়, না?

ঘুম—বিকল্পে, মধ্যমভাবে। আড্ডাই প্রশস্ত।

বেশ, তাই হোক; তুমি শুয়ে পড়ো—আমরা শুনি তোমার কথা।

বিশ্রামের জন্য দেহ শয্যায় এলাইয়া দিল অমিত। নিকটে ঘিরিয়া বসিতে হইল অনুকে মনুকেও।

ছয় বৎসরে কথার শেষ আছে নাকি? কত কথা উহাদের মুখে ফোটে, অমিতের মনে পড়ে, সে প্রশ্ন করে। অসংখ্য জিজ্ঞাসা মনে চাপা রহিয়াছে, আরও অসংখ্য চিন্তা চেতনার প্রান্তসীমায় পাক খাইতেছে।

...এই খাটে, এইখানটিতে মা শুইতেন; শেষ দিনও শুইয়াছেন। তাঁহার সেই দেহের স্পর্শ আজও কি এই জীর্ণখাটের কাঠে কাঠে মাখা নাই? মাখা নাই এই দেয়ালে, চৌকাঠে, দুয়ারে, জানালায়? এই যে—দুয়ার ধরিয়া যেখানটিতে অশ্রুব্যাকুল মা দাঁড়াইয়াছিলেন—বাহিরে সিপাহী-সান্ত্রী-পুলিস—অমিত বিদায়কালে পদধূলি লইতে লইতে বলিয়াছিল, 'আসি মা।' এখানে উঠিয়াছিল সেই কম্পমান ব্যাকুল দেহের আকুল কন্ঠস্বর, 'আমার সংসার গড়বার সাধ যে শেষ হল'...মায়ের সেই প্রার্থনা, সেই আকুতি কি জাগিয়া নাই ওইখানটিতে, ওই মেঝে, এই মনু-অনুর মাথায়, বুকে হাতে?...ওই ঘরে বাবা এখনো বিশ্রাম করিতেছেন। কী আশ্চর্য, মানুষের কী শ্লথ পরিণতি; আশ্চর্য মনীষার কী অভাবনীয় ক্ষয়খিন্নতা! ইহারই মধ্যে—এই জীবনের মধ্যেই যেন তিনি থাকিয়াও এখন আর নাই! দেহটাই যা আছে, মন জীবনের বন্ধন হইতে নির্গলিত হইয়া যাইতেছে।...অথচ ওই ঈজি চেয়ার হইতে উঠিয়া পুলিশ-পরিবৃত অমিতকে সেদিন তিনিই স্থির নিষ্কম্প কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, 'এসো।' সে তো কণ্ঠস্বর নয়, যেন অভয় মন্ত্র—'অভীঃ অমিত, অভীঃ।' যেন তাঁহার গম্ভীর আত্ম-নিবেদন বিশ্বদেবতার উদ্দেশে, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।...আজও গৃহাগত অমিতকে তিনি বলিলেন, 'এলে'—সেই চেয়ারে বসিয়াই বলিলেন। কিন্তু আজ কতটা ইহা জীবন, কতটা ইহা মৃত্যু? ইহা যেন জীবনের শেষ পংক্তি দিয়া মৃত্যুর পাদপূরণ মাত্র। জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বের এই অনিবার্য পরিণামকে সম্মুখে লইয়া তথাপি তাঁহারই গৃহতলে, সংগ্রামে সংঘর্ষে কেমন করিয়া এই গৃহের আদরে বর্ধিতা বোন—সেই বালিকা অনু জীবনের সশস্ত্র সারথি হইয়া উঠিয়াছে; আর এ পাড়ার পূজায়-পার্বণে মেলায়-উৎসবে পাগল সেই ভাইটি কিশোর মনু দায়িত্ববান অগ্রজ হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তব, কঠিন বাস্তব—সংসারের দৈন্য, মাতৃহীন জীবনের দ্বন্দ্ব, পিতার বার্ধক্য-গ্রস্ত অসহায়তা—তাহাদের দুইজনার কৈশোর যৌবনের স্বপ্নে-ভরা, রঙে-ভরা, রসে-ভরা দিনগুলিকে কঠিন দায়িত্ববোধে স্থির গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে! এমন প্রথম যৌবনের দিনে, অমিত, তুমি তোমার জীবনের তরণী কত দুঃসাহসী যাত্রায় ভাসাইয়া দিতে, নিশ্চিন্ত উৎসবে ছাড়িয়া দিতে। সত্য সত্যই তো কস্তুরী মৃগের মতো আপন গন্ধে পাগল হইয়া বনে বনে ঘুরিবার মতোই ছিল তোমার সেই দিনগুলি—কলিকাতার জনারণ্যে, মানুষের মিছিলে, রাঢ়ের লালমাটির পথে, পূর্ব বাঙলার নদীস্রোতের বাঁকে বাঁকে, পুরীর সমুদ্র-তরঙ্গের মধ্যে...

'অমিত!'

কে ডাকিল না? একটা অর্ধবিস্মৃত কন্ঠস্বর...

তাই তো, এ কোথায় অমিত! অমিতের ঘুম পাইয়াছিল বুঝি। ওঃ, কখন পলাইয়া গিয়াছে দুষ্টুরা—দাদাকে ফাঁকি দিয়া।

অমিতই তাহাদের কথা শুনিতে শুনিতে উন্মনা হইয়া গিয়াছিল—কেমন করিয়া আত্মীয়রা তাহার বিদায়ের পরে একবার কোনোরূপে সংবাদ লইবার নাম

করিয়াই সরিয়া পড়িয়াছিল। অপূর্বের মতো অমিতের বন্ধুরাও মনকে পথে দেখিয়াই একবার কুশল জানিয়া লইত, বাড়ি আসিত না। আত্মীয় কুটুম্বরা কেহ কেহ আরও বিমুখ হইল। অমিত নাকি নিজের সর্বনাশই শুধু করে নাই, করিয়াছে আরও অনেকের সর্বনাশ...সুরোদি'র...ইন্দ্রাণীদি'র...

সুরোদির জন্যই প্রথম গোলমাল বাধল...ইন্দ্রাণীদি আইন অমান্যের ফলে আগেই জেলে...

কিন্তু কথাটায় অমিত সাড়া দিল না যে? দাদা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

অনু মনু তারপর উঠিয়া গিয়াছে। দাদার জিনিসপত্র ততক্ষণে গুছাইয়া ফেলিবে। ঘরটা সাজাইয়া ফেলুক। কিন্তু কাজ করিবার উপায় আছে? অনুর বিরক্তি ধরিয়া যায়—সে সব গুছাইতেছে; মনু কেন হাত দিয়া মিছামিছি সব অগোছাল করিয়া ফেলে?—

তন্দ্রা হইতে জাগিতেই নিজের ঘরের সেই তর্ক আপত্তি অমিতের কানে গেল। কি করিতেছে উহারা? অমিত ধীরে ধীরে গিয়া দুয়ারে দাঁড়াইল। সেই লেখার-খাতার বাক্সটা বুঝি—ইহাতেই আছে সুনীল ও সুশীলদার খাতাও।

আমি খুলে দিচ্ছি,—অমিত বলিল,—দু-একটা টুকিটাকি জিনিস আছে। আর খাতাপত্র।

কিন্তু তাহাতেই যে অনু-মনুরও ঔৎসুক্য। মনু না দেখিয়া পারে না—দাদা কি বই আনিলেন। অনু দেখিবে—দাদা কি লিখিয়াছেন। প্রত্যেকে তাহারা অন্যকে এতক্ষণ বুঝাইতেছিল—এইগুলি তাহারা বাখিয়া দিক, দাদার জিনিস দাদাই বুঝিবেন ভালো। কেন অন্যের উহা নষ্ট করা? কিন্তু দুইজনে এখন একসঙ্গে উত্তর দেয়: বেশ, তুমি দাঁড়িয়ে দ্যাখো, আমরা তুলে সাজিয়ে রাখছি।

সত্যই ইতিমধ্যে অনু অনেকটা গুছাইয়া ফেলিয়াছে, বাকি আছে বিশেষ করিয়া বই ও খাতা। টুথপেস্ট, টুথব্রাশ, শেভিংসেট্ পুরাতন জায়গায় গিয়াছে। দেয়ালের ছোট আলমিরাটায় স্থান পাইয়াছে টুকিটাকি জিনিস! জুতাও বুঝি সিঁড়ির সামনেকার কুলুঙ্গিতে গিয়াছে—যেখানে এখন আর নাই সেই সোনালি বাঁধুনির চাপালি...সেই পুরাতন গৃহ-সংসার, তবু তার সব আর নাই।

বিছানা এ ঘরে দিলে? বাবার ঘরে দিলে হত না? অমিত বলিল।

বাবার ঘরে?—চোখ তুলিয়া তাকাইল অনু। যে হাস্যময়ী বালিকা এতক্ষণ মৃদু কলভাষে কলহ করিতেছিল, সে আবার এই এক মুহূর্তে সেই প্রথম-নিমেষে দেখা দায়িত্বশীলা নারী প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে।—বাবার ঘরে তুমি থাকবে? বেশ দুদিন পরে হবে। বাবার কখন কি দরকার তুমি জানো না তো এখনো।

কত সহজে অনুর মুখে তাহার কথা নির্দেশের মতো হইয়া উঠে। অমিতকেও তাহা মানিতে হইবে।

এক কাজ করবে? বাবার কাছে গিয়ে বসবে তোমরা? এঘরে আমি কাজ শেষ করে ফেলি। সব শেষ হবে না—বইপত্রের জন্য একটা নতুন আলমিরা

কিনতে হবে এবার। ততক্ষণ দেখি কি ভাবে এগুলো রাখা চলে—বলিতে বলিতে অনুর মুখে আবার হাসি ফুটিল: ভয় নেই। তোমার খাতাপত্র চুরি করব না। দেখলাম তো—নোট বইতে বই আর খাতার তালিকা করে রেখেছ। বেশ, কাল না হয় তা মিলিয়ে দেখবে। আজ আমি হিসেব দাখিল করতে পারব না।

অমিত হাসিয়া বলিল: কাল গরমিল হলে আমি আর এই চোরদের পাব কোথায়? তবে দ্যাখো, আমিও প্রেসিডেন্সি জেল থেকে আসছি—সেটা 'মহাবিদ্যার' প্রেসিডেন্সি কলেজ।

কেমন সে কলেজ?...কি বলিবে অমিত! কাহার কথা বলিবে? কোথা হইতে আরম্ভ করিবে, কোথায় শেষ করিবে? অপরূপের সেই তীর্থক্ষেত্রকে কি বর্ণনা করা যায়? না, বর্ণনা করা যায় জীবনের বিরূপ-আয়তনকে? বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু ভোলাও যায় না। অমিতের মন গৃহচ্ছায়ায়ও সেই আলো-আঁধারি জাল বুনিতে থাকে। জন্ম-আত্মীয়ের মুখে-মনে আসিয়া সেই অনাত্মীয়ের আভাস মিশে।

আচ্ছা শুনবে সে সব। এখন দেখি বাবা কি করছেন।

বিশ্রামান্তে একটু সজীব সেই মূর্তি। অমিত সানন্দে সেই ঘরে ঢুকিল। এক মুহূর্ত পরেই অমিতকে তিনি চিনিতে পারিলেন। বলিলেন, আমি? বাড়ি এলে কখন?

অমিতের উৎসাহ আবার নিবিয়া গেল। না, বাবা ইহার মধ্যেই সব ভুলিয়া গিয়াছেন। অমিত বলিল: বারোটার সময়েই এসেছি।

বারোটার সময়।—আস্তে আস্তে তিনি কথাটা উচ্চারণ করিলেন। তারপর বলিলেন, ওঃ! বেরলে না আর?

একটা তীক্ষ্ণ আঘাতে যেন অমিত চমকিয়া উঠিল।—অমিত বাড়ি বেশিক্ষণ থাকিবে না, বাড়ি সে থাকিতে চায় না; সেই পুরাতন দিনের কথা এখনো পিতার স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায় নাই। আজও তিনি তাহাই ধরিয়া লইয়াছেন। নিষ্প্রভ চোখে ক্ষোভ নাই, জিজ্ঞাসাও নাই।—তাঁহার এই কথাকয়টিও শুধুই সেই চিরদিনের অভ্যস্ত ভাবনার সহজ প্রকাশ মাত্র। অমিত কি উত্তর দিবে?

আবার ধীরে প্রশ্ন হইল: আজ কাজ নেই বুঝি তোমাদের?

'তোমাদের'—তোমার নয়। অমিত একটু মৃদু হাস্যে বলিল: না, আজ আর বেরুতে চাই না!—তারপর যোগ করিল উহার সহিত অমিত,—এখন। একটু পরে বাবা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন'—এখন কটা অমিত? বলিবার মতো একটা সহজ কথা অমিত পাইল। বলিল: প্রায় তিনটে।

আপিসে যাবে না আজ?

এক মুহূর্তের মতো অমিত বিভ্রান্ত বিমূঢ় হইল: 'অপিসে?'...পর মুহূর্তে শুনিতে পাইল,—আর বুঝিতেও পারিল, বাবা বলিতেছেন: পূজা আসছে না? পূজো-সংখ্যার কাজ নেই?

অদ্ভুত এই মেঘাচ্ছন্ন চেতনা। বাবা বুঝিতেছেন—পূজা আসিতেছে; হয়তো সেই সঙ্গে জানেনও—মা আজ গৃহে নাই। আবার এখনো তিনি সেই সঙ্গেই ছয় বৎসর আগেকার অমিতকেই আঁকড়াইয়া বসিয়া আছেন—অমিত বাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়া বেড়ায়; পূজায় সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যা বাহির হইবে; 'নেশনের' সহ-যোগী সম্পাদকরূপে অমিতেরও এই সময়ে বিশেষ কাজ পড়িবে, অন্তত সেই অজুহাতে অমিত বাড়ি হইতে আরও বেশি পলাইবার সুযোগ পাইবে। কেমন অদ্ভুত এই চেতনা! বাস্তবকে আর তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, অথচ স্মৃতিলোকের কোন একটা রেখা মুছিয়া না গিয়া ইহারই সহিত মিলিয়া-মিশিয়া বরং নতুন করিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। সম্মুখের স্পষ্ট সত্য পশ্চাতের বিস্মৃত অতীতের মধ্যে তলাইয়া মিলাইয়া যায়। এখানে কাল-পারম্পর্য নাই, আছে শুধু অনুভূতির আর সংবেদনার নিত্যতা। তাই ছয় বৎসর পূর্বেকার পিতৃ-হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা ও অনুচ্চারিত আশংকা তাঁহার এই অবলুপ্ত প্রায় চেতনার মধ্য হইতে লোপ পায় নাই—তাহা লোপ পাইতেছে না, লোপ পাইবে না। ···অমিত, কাল তোমাকে টানিয়া লয়। আগাইয়া দেয়, পিছাইয়াও ফেলে; পাক খাইয়া তুমি ভাসিয়া চল। কিন্তু তোমার পিতার চেতনায়,—তাঁহার সংবেদনা অনুভূতির মধ্যে,—তোমার সেই ছয় বৎসর পূর্বেকার জীবন অবিনশ্বর হইয়া আছে। সেখানে অবিচ্ছিন্ন হইয়া আছে উহার তীব্রতা, উহার উদ্দামতা, আর উহার দৃকপাতহীন নিষ্ঠুরতাও। জীবন আগাইয়া গিয়াছে, তুমি আগাইয়া গিয়াছ লাইফ্ মার্চেস্। কিন্তু তাহা মুছিয়া যায় নাই, ছয়-বৎসর-আগেকার সেই তুমিও এই পিতৃ-চেতনায় এইরূপ বাঁধা পড়িয়া আছ। তুমি তোমার চলমান জীবন লইয়া সেই বাঁধা-পড়া তোমার পরিচয়কে ভাঙিয়া-গড়িয়া আর পিতার মনে নতুন করিয়া তুলিতে পারিবে না। এই ক্ষীয়মান, বালুকালুপ্ত চৈতন্য-প্রবাহে তুমি, অমিত তোমার চলমান, ধাবমান চিন্তা-ভাবনা-চেতনার ধারা আর মিশাইতে পারিবে না! বুক ভরিয়া উঠে চাপা কান্নায়। এ কোথায় ফিরিলে তুমি, অমিত, কোন গৃহে? কোথায় সেই মা, কোথায় তোমার সেই পিতা? তোমার সেই জগৎ, তোমার সেই জীবন?···

হয়তো অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল, অমিতের আত্মজিজ্ঞাসা আর শেষ হয় না। একটা বেপরোয়া মাছি বাবাকে বারে বারে বিরক্ত করিতেছে। এক-একবার তিনি তাহা বুঝিতেছেন, ক্লান্ত মন্থরভাবে হস্ত তাড়না করিতেছেন। আবার কিছুক্ষণের মতো ভুলিয়াও যাইতেছেন—শূন্য দৃষ্টিতে দেখিতেছেন সম্মুখের পথ।

'অনু এল কলেজ থেকে?'

অমিত চমকিত হইল। একবার ভাবিল বুঝাইয়া বলে, অনু আজ কলেজে যায় নাই। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল—কাজ কি? তাঁহার চিন্তা নিজ গতিতেই চলুক না। অনেক তাঁহাকে তোমরা মথিত করিয়াছ; আর কেন?

অমিত বলিল : অনুকে ডেকে দোব?

না। অনু আসবে।

সেই অর্ধস্ফুট কন্ঠে একটা শিশু-সুলভ নিশ্চয়তা---'অনু আসবে।' অর্ধস্ফুট শিশু-হৃদয়ের মতো অনেক দিনরাত্রির অপেক্ষায় তিনিও জানিয়াছেন---যথা সময়ে অনুর বাহু তাঁহাকে আশ্রয় দিবে। আর মাতৃ-হৃদয়ের মমতা দিয়াই অনুকেও বুঝি এই আস্থা, এই ভরসা অর্জন করিতে হইয়াছে।

অনু সত্যই আসিল। কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নারীমূর্তি। ইঁহার কন্ঠই বুঝি অমিত সেই ঘরে শুনিতেছিল একটু আগে। আপন চিন্তায় অমিত নিমগ্ন ছিল, তাই শুনিয়াও শোনে নাই। এই কন্ঠস্বরও বুঝি অপরিচিত, কিংবা বিস্মৃত। অমিত তখন ভাবিতেছিল শেকস্‌পীয়রের সুপরিচিত কন্ঠস্বর---'জীবনের সপ্তকাণ্ড', উহার শেষ দৃশ্য---

Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything...

না, শুধু তাহাও নও, Yet hath my night of life some memory...

অনু ও মনু যেন সেই শেষ অঙ্ককে অস্বীকার করিয়া ঘরে ঢুকিল---মুখে উজ্জ্বলা, চোখে উৎসাহ, কী একটা বলিবার আগ্রহ যেন তাহাদের চোখ ছাপাইয়া, দেহ উপছাইয়া পড়িতেছে। আর তাহাদেরই পিছনে একটু সসম্ভ্রম চরণে ও দৃষ্টিতে তাহাদের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইয়াছে অপরিচিতা সঙ্গিনী···

অনু সোৎসাহে ঘোষণা করিল : এসে গিয়েছেন সবিতাদি।

অমিত মুখ তুলিয়া দেখিল;---হয়তো বাবাও মুখ তুলিলেন, কিন্তু অমিতের তাহা লক্ষ্য করিবার মতো অবসর নাই;---সবিতা!

পরিপূর্ণ যৌবনের মাঝখানে একটি মৃণাললতিকার মতো দীর্ঘদেহী মেয়ে। আত্মসংযত দেহে কোথাও চাঞ্চল্যের আভাস নাই। মুখের বুদ্ধির আভা সম্ভ্রমে নম্রতায় স্নিগ্ধ, এবং আচ্ছাদিতও। শান্ত দৃষ্টিতে তাই কৌতূহলের কোনো ছটাও নাই। আপনাকে আপনি যে মাপিয়া মাপিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে, ছাঁটিয়া লইয়াছে, তেমনি এক আত্মসমাহিতা সঙ্কুচিতা নারী। ফুটিবার আনন্দে সে ফুটিয়া উঠে নাই,---পৃথিবীর ডাকে, মৃত্তিকার মায়ায়, সূর্যের অমৃত পান করিয়া প্রাণলীলার দুর্বার সুন্দর মোহে যে ফুটিয়া উঠে---তেমন স্বতঃস্ফুরিতা তরুণী নয়। শান্ত, শ্রীময়ী, কোনো তপোবন-কন্যা; পাগল হইয়া বনে বনে ফিরিবার মতো হরিণী নয়। সযত্ন-আয়ত্ত সংযম-শীলতায় সে যেন আপন যৌবনকে অগ্রাহ্য করিয়াই আপন জীবনকে বিকশিত করিতে চায়; বাহিরকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া চায় অন্তরে ফুটিয়া উঠিতে। কোনো দূর আকাশের আলোর জন্য তাহার প্রতীক্ষা নাই। সুন্দরী পৃথিবীর কোনো পরিণত দানের জন্য নাই কোনো প্রত্যাশা।

কী করিবে অমিত? কী করিবে? একটা অস্বাচ্ছন্দ্যতায় মুহূর্ত-কালের জন্য সেও সহজ হইতে পারিল না। অমিত দাঁড়াইয়া উঠিল, নমস্কার করিবার জন্য হাত তুলিল। কিন্তু তাহার পূর্বেই অমিত ব্যস্ত বিব্রত হইয়া পড়িল---করে কি সবিতা? সে যে পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেছে। না, না,---কিন্তু সবিতা তাহা শুনিল না। প্রণাম করিতে চলিল পরে অমিতের বাবাকে।

প্রথম যৌবনের সেই সুডোল গৌরবাহু এখন দীর্ঘ মৃণাল ভুজে পরিণত হইয়াছে। সুস্পষ্ট মুখমণ্ডল এখন দীর্ঘ মুখশ্রীতে রূপগ্রহণ করিয়াছে। শান্ত ওষ্ঠাধরের সুচিক্কণ শ্রীতে এখন দৃঢ়তা আসিয়াছে; কপালের উজ্জ্বল দীপ্তির স্থলে আসিয়াছে নির্মল বুদ্ধির স্থির আভা। সেদিনের 'স্ফুটনোন্মুখী তরুণী আজ বৈধব্য-নিয়মিতা আত্ম-সঙ্কুচিতা নারী। এই রূপ অপ্রত্যাশিত নয়। তবু অমিতের মনে এ রূপের কোনো ছায়াও জাগে নাই। এই সত্য আর সেই কল্পনাতে মিলাইয়া আবার অমিতকে নতুন করিয়া পরিচয় করিতে হইবে—ইহার সহিত, ও আপনার সহিত।

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন : কে?

আমি সবিতা, কাকাবাবু।—কন্ঠে আত্মীয়তা ও আগ্রহ।

সবিতা—সবিতা এসেছ—। কিন্তু অমি চলে গিয়েছে যে—

হায়, এ কোন চিন্তার সহিত কোন কথা বাবা মিলাইতেছেন। অমিত বুঝিল তাঁহার খণ্ডিত চিন্তার মধ্যে একটা নিগূঢ় সংযোগ আছে। কিন্তু তাহা না বুঝিবার ভান করিয়া অমিত বলিল :

এই যে আমি, বাবা। যাব কোথায়?

বৃদ্ধ কেমন বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন : যাবে—কোথায়?—একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল কি? না, না, অভ্যাস মতো বুঝি তাহাও তিনি গোপন করিলেন, বলিলেন : কে জানে? কিছুই বুঝি না যে আমরা।

অমিতের মাথা নত হইয়া যায়, দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া আসে। সকলকে শুনাইয়া সে হাসিয়া বলে : আর যাওয়া নাই এখন।

মনু বলিল : বসো, সবিতাদি।

বসুন,—কি বলিবে অমিত ইহাকে? 'সবিতা দেবী?' কিন্তু কেমন অদ্ভুত শুনাইবে না? তাহার পূর্বেই অনু হাসিয়া উঠিল, বলিল : 'বসুন'!—দেখলে সবিতাদি দাদার কাণ্ড। সবাই 'লেডিজ্'—তুমিও!

অমিত বিব্রত হইল। তাহার মুখেও রক্তাভাস দেখা দিল। রাগ করিয়া মনে মনে বলিল : মূর্খ মনু! তুমি কি করিয়া বুঝিবে—জীবনের দীর্ঘতম বৎসরগুলি যে নারী-মুখ না দেখিয়া পুরুষ সংসর্গে, পৌরুষ কল্পনায়, তর্কে আলোচনায় আপনার যৌবন অতিক্রম করিয়াছে, তাহার পক্ষে অকস্মাৎ এমনি পূর্ণযৌবনা নারীর সঙ্গে কথা বলা—আলাপ জমাইয়া তোলা,—কত বড় পরীক্ষা? বিশেষত, সবিতার মুখেও লজ্জারক্তিম আভা দেখা দিয়াছে।

থামো মনু—সবিতা মনুকে সস্নেহে শাসন করিল। তারপর অনেক বৎসরের সম্ভাষণ ফুটিল তিনটি সামান্য শব্দে :

আমাকে 'তুমিই' বলতেন।

মুখে শান্ত সলজ্জ নম্রতা। 'তুমি' বলিত কি অমিত? পূর্বে কোনো দিন সবিতার সহিত সে কথা বলিয়াছে কি? অমিতের কিছুই মনে পড়ে না। বলিয়া থাকিলেও মনে রাখিবার মতো মন তখন তাহার ছিল না। তাহা বুঝিয়া আরও

অমিত বিব্রত বোধ করে। আরও নিজেকে স্বচ্ছন্দ করিতে চায়। হাসিয়া বলে, আচ্ছা। কিন্তু আমাকেই কি তুমি 'আপনি' বলতে?

চেষ্টা করিয়া স্বচ্ছন্দ হওয়া যায় না, বরং অপরকেও অস্বচ্ছন্দ করিয়া তোলা যায়। সবিতা তাই কথা বলিতে পারিল না; মাথা নাড়িয়া জানাইল: হাঁ। অমিতকে সে আপনিই বলিত। তাহার স্বাভাবিক সঙ্কোচ অমিতের অস্বচ্ছন্দতায় আরও বাড়িয়া যাইতেছে।

অমিত বলিল: তা হলে তাও এবার বদলাও।

সবিতা আর উত্তর দিতে পারিল না। অনু ও মনুর মধ্যে একটা চকিত দৃষ্টির বিনিময় ঘটিল, অমিতের সন্দেহ হইল। সে তাড়াতাড়ি একটা সহজ প্রশ্ন মনে করিয়া ফেলিল: তোমার বাবা কেমন আছেন, সবিতা?

বাঁচিয়া গেল অমিত, বাঁচিয়া গেল সবিতা—সহজ আলাপের বিষয় লাভ করা গিয়াছে। সবিতা বলিল, বাবা ভালো আছেন। আপনার প্রতীক্ষা করছেন।

'প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশা'? ...কিন্তু অমিতের মুখে কথা যোগাইবার আগেই মনু বলিল: তোমরা ওঘরে বসবে, দাদা? তোমাকে দেখতে এসেছে এ পাড়ার স্কুলের ছেলেরা। ওরাই সেদিন তোমাদের মুক্তি দাবি করতে মিছিলে গিয়েছিল—

কোথায় তারা?—হাসিয়া অমিত দাঁড়াইয়া উঠিল। আমাদের 'লিবারেটরস্' —মুক্তি-সৈনিকেরা কোথায়?

বারান্দায় কয়েকটি বালক দাঁড়াইয়া ছিল। কিশোর কাঁচা মুখ অনু সকলের জন্য মেজেয় মাদুর পাতিয়া দিল। তাহাদের চক্ষে সসম্ভ্রমদৃষ্টি—এই সে 'স্বদেশী' যোদ্ধা—যাঁহারা দেশের জন্য ফাঁসি-কাঠে প্রাণ দেন, আন্দামানে গিয়াছেন, অনশনে মরিতেছেন;—আর এত সাধারণ দেখিতে!

বাবাকে একটু হরলিক্স দিয়ে আসছি।—বলিয়া অনু চলিয়া যাইতেছিল। সবিতাও তাহার অনুসরণ করিতেছে, মনু বাধা দিল। একটা মোড়া আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া বলিল: বসুন, লেডি সবিতা!

কথাটায় অমিতের প্রতিও পরিহাস আছে। কিন্তু মনুর মুখে সবিতার প্রতি পরিহাস বেশ স্বচ্ছন্দে জুটিয়া যায়। সবিতাও তাহা গ্রহণ করিতে পারে। তাহারা সহপাঠী ছিল, তাহাদের সৌহার্দ্যও তাই সহজ।

সবিতা শাসন করিল: কী যে বলো ফাজিলের মতো।

ফাজিল! বেশ বন্ধ করলাম কথা। সীরিয়াস কাজ তা হলে আরম্ভ করো তুমি। জিজ্ঞাসা করো দাদাকে কি জানতে চাও। শোনো দাদা, সবিতাদি ভেবেই পান না—তোমরা কী করতে, কী ভাবতে, কী পড়তে। আমরা কি বলব ওঁকে? তুমি কি চিঠিতে তা লিখতে? নানা লোকের কাছে নানামুখে এখানে-ওখানে গল্প শুনতাম। চাল দিয়ে ওঁকে তা বলতাম—'দাদা লিখেছেন।' উনি বলতেন, 'কই, দেখি চিঠি।' তখন বলতাম, 'হারিয়ে ফেলেছি।'

মনুর বাক্যস্রোতে আবার সবিতা কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছিল। অমিতই কুণ্ঠিত

হইতেছিল, সবিতা তো হইবেই! সবিতা আপত্তি করিল : এত বাজে কথাও বানিয়ে বলতে পার তুমি।

জানা না থাকলে বানিয়েই বলতে হয়। নইলে তোমার মতো মানুষের কাছে আমার দাম থাকত কি? 'অমিতদার ভাই'—এই দামটুকুও তো পেতাম না। দ্যাখো, 'অমিতের ভাই' বলে বাজারে চাকরি পাই না। ওঁর ভাই বলে তোমাদের থেকেও সম্মানটুকু আদায় করতে দেবে না?

অমিতের মুখে কথা জোগাইল : এটারও একটা বাজার দর হয়েছে বুঝি? 'রাজবন্দী',—কংগ্রেসে, কর্পোরেশনে তো দর হয়েছে। দেশের মানুষকেও ও-নামটা বিকি করে ঠকানো যাবে, না?

এবার মনু পরিহাস ছাড়িয়া দিল : ঠকানো কেমন দাদা? মিথ্যা নাকি কথাটা? না, এ সত্যের কোনো মূল্য নেই?

সে মূল্য বুঝি দেশের লোককে পরিশোধ করতে হবে?

এবার আলোচনার আসর তৈয়ারি হইয়াছে।—ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির কথা নাই,—আলোচনার নৈর্ব্যক্তিক সাধারণ ক্ষেত্র। এখানে বুঝি দশজনের মধ্যস্থতায় অমিত ও সবিতার আর কথা বলিতে বাধ বাধ ঠেকিবে না।

সবিতা সত্যই বলিল : পরিশোধ কেন বলছেন। এ তো স্বীকৃতি। দেশের স্বীকৃতি—'আমরা মুখ ফুটে যা বলতেও পারি না, তোমরা রক্ত দিয়ে তা ঘোষণা করেছ।'

যত শান্ত স্বরেই সবিতা কথা বলুক কথাটার পিছনে আবেগ আছে। ভালো করিয়া না বুঝিলেও, ছেলেদের চোখেও এই কথায় সম্মতি ফুটিয়া উঠিল। অমিত সতর্ক হইল।—বড় চাকরি...বড় মাহিয়ানা ..আরও বড় মোহ 'বীরত্বের' মূল্য। সে হাসিয়া বলিল : তাতে কিন্তু এক সাংঘাতিক মোহ দেশকে পেয়ে বসবে। 'একদিনের' নাম ভাঙিয়ে আমরা অনেক দিন খাব। শেষে সেই নামের সুযোগ নিয়ে আমরা দেশের ও মানুষের কল্যাণকে বিনষ্ট করব—অপমানিত করব।

অমিতের সত্যই আশঙ্কা জন্মিয়াছে। কিন্তু শুধু তাহা তো নয়। এই মুহূর্তে একটা 'বক্তৃতার' অবকাশ লাভ করিয়া আপনাকে সে আপনার অজ্ঞাতে সবিতার সম্মুখে স্বচ্ছন্দ করিয়া লইতে চাহিল।

অনু ফিরিয়া দেখিল একটা তর্ক ও আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। বলিল : ফটিকদের সঙ্গে এখন একটু কথা বলো, দাদা। আমি ততক্ষণ বইগুলি গুছিয়ে ফেলি ওঘরে।

চলো—বলিয়া মনও উঠিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সবিতাও চলিল—অনু আপত্তি করিল : তুমি বসো না, সবিতাদি—দাদার সঙ্গে কথা বলছিলে। ওঃ, দাদার বইপত্র, খাতাপত্র না দেখে বুঝি ছাড়বে না?—হাসিয়া উঠিল অনু। সবিতা লজ্জা পাইলেও অনুর আপত্তি শুনিল না, তাহার সঙ্গে চলিল।

স্নিগ্ধমুখে এবার অমিত মাদুরে বসিয়া ছেলেদের পরিচয় লইতে লাগিল।

ছোট ছোট মুখ কয়টি, তের চৌদ্দ হইতে ষোলর মধ্যে ইহাদের বয়স। আরও ছোট আছে দুইজনা, কাঁচা মুখ, কাঁচা মন---ইহাদের দিকে তাকাইতে কেমন মমতা হয়। ...এমনি বয়সেই, অমিত তোমার মনের দুয়ারে ভারতবর্ষের মাতৃমূর্তি রূপ ধরিয়া উঠিতে শুরু করিয়াছিল---।

একটু গল্প করিতেই ইহাদের সঙ্কোচ ঘুচিয়া গেল।

অমিত যে আসিয়াছে এ খবর তাহারা জানিয়া ফেলিয়াছে। একটু পরেই কলেজের দাদারাও আসিবেন। মা মাসীরা আসিবেন সন্ধ্যার পরে। তাঁহারা কি করিয়া অমিতের কথা জানিবেন? জানিবেন না? তাঁহাদের ছেলেরা মেয়েরা আন্দামান অনশনের সময়কার মিছিলে গিয়াছিল। দ্বীপান্তরে এমন করিয়া মারিবে নাকি আমাদের দেশের 'বীর যোদ্ধাদের'?

তোমরা বীরবালকেরা দেশে থাকতে,—না?—অমিত সকৌতুকে বলিল। ছেলেরা কিন্তু হাস্যকৌতুক বোঝে। হাসিয়া সলজ্জভাবে আপত্তি করে: আমরা বীর হব কি করে?

বীর তবে কি রকম? শাল গাছ দিয়ে যে দাঁতন করে? পাহাড়ের চূড়া ভেঙে ছুঁড়ে মারে? বাঃ! হাসছ যে? বীর কেন, তোমরা মহাবীর---

কৌতুকে ছেলেরা খুশী হইয়া উঠিল। কথা জমিয়া গেল। সেদিনের মিছিলের গল্প তাহারা অমিতকে বলিতে লাগিল। পুলিশ লাঠি চালাইয়াছে। মেয়েরাও দুই একজন আহত হইয়াছেন।...

সিড়িতে পদশব্দ শোনা গিয়াছিল। ডাক শোনা গেল: মনু। মনু!

পরিচিত কণ্ঠস্বর। অধ্যাপক রবিশঙ্কর দত্ত। অমিতের অধ্যাপক ছিলেন, মনুরও তিনি অধ্যাপক। একদিন অমিত তাঁহার প্রিয় ছাত্র ছিল। তখন অমিতের প্রথম কলেজ জীবন। অধ্যাপক দত্তেরও অধ্যাপনার প্রথম পর্ব। এম-এ ক্লাশের তীর হইতে অমিত তাঁহাকে হারায়, তিনি পদোন্নতির ফলে গিয়াছেন রাজসাহী কিংবা চট্টগ্রাম। বৎসর সাতেক আগে যখন আবার তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন তখন অমিতের জেল-প্রস্থানের দিন সন্নিকট। পথে একবার অধ্যাপক দত্তের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল: অমিত তাঁহার বাড়িতে যাইতে পারে নাই। যাইত, কিন্তু সময় হইল না। আর, ...উৎসাহও নিবিয়া গিয়াছিল! সেই প্রোফেসর দত্ত,—শাণিতবুদ্ধি, শাণিত-ভাষী সুরসিক লোক—সেদিন পথে দেখা হইতেই অমিত দেখিল, তাঁহার সাদা পাঞ্জাবির উপর দিয়া গলার তুলসীর মালা দেখা যাইতেছে। কথায় তখনো সজীবতা আছে, স্নিগ্ধতা আছে। কিন্তু নাই আর সেই বিজ্ঞানান্বেষীর দুঃসাহস, স্পর্ধা, পৃথিবীকে যুদ্ধে আহ্বান—একমাত্র পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুতে, অধ্যাপক দত্ত যেন অন্য মানুষ হইয়া গেলেন। অমিত প্রোফেসর দত্তের শোকে মায়াবোধ করিয়াছে, কিন্তু নিজে ইহাও অনুভব করিয়াছে---প্রোফেসর দত্তকে আর সে তেমন শ্রদ্ধা করিতে পারিবে না। তাই তাঁহার সহিত দেখা করিবার আগ্রহও অমিতের আর ছিলনা কিন্তু অমিতের গ্রেপ্তারের পরে তিনিই খোঁজ করিয়া

অমিতের বাড়ি আসিলেন; আর সেদিন হইতে তিনি অমিতের খোঁজ ছাড়িতে পারিলেন না। তারপর মনু তাঁহার ছাত্র হইল, সেই পরিচয় নিকটতর হইল। অমিতের মায়ের পীড়ার সময় অধ্যাপক দত্ত যাচিয়া রাইটারস্ বিল্ডিং-এ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন—তাঁহার এক ছাত্র সেখানে বড় চাকরে; আরও অনেকে অমিতের সমকালীন ছাত্র; হয়তো অমিতের পরিচিত; তাঁহারা অমিতের জন্য এইটুকু করিবে না? কেন করিবে না—অন্তত তাহার মায়ের এই মৃত্যুকালে? অধ্যাপক দত্তের ছুটাছুটিই সার হইয়াছে। কিন্তু রবিশঙ্কর দত্তের জন্য আত্মীয়তা বোধ অমিতের পিতামাতা ভ্রাতা ভগ্নী সকলের মনে স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। তাই আজ মনু সর্বাগ্রে তাঁহাকে কলেজে ফোন করিয়া সংবাদ দিয়াছে—অমিত আসিতেছে। আর কলেজ হইতে অধ্যাপক দত্ত সোজা আসিয়াছেন অমিতকে দেখিতে।

অনু দাদার ঘরে ছেলেদের লইয়া চলিল—একটু ফলমূল খাওয়াইবে আজ সকলকে। না হইলে দাদা সন্তুষ্ট হইবেন না।

অধ্যাপক দত্তকে অমিত প্রণাম করিতে গেল।

'নারায়ণ, নারায়ণ!'—বলিয়া রবিশঙ্কর দুই পা পিছনে হটিয়া গেলেন, কিন্তু প্রণাম বন্ধ করিতে পারিলেন না। সাদা পাঞ্জাবি-চাদরের মধ্যে সেই তুলসীর মালা দেখা যাইতেছিল, তবু ওই শব্দ দুইটি যেন অমিতকে আরও সচকিত করিয়া তুলিল। একটা কৌতুক মনে জাগিতেছিল, কিন্তু তাহা স্থির হইতে পারিল না। রবিশঙ্করের দুই বাহু অমিতকে টানিয়া আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিল আর সেই বক্ষস্পর্শের মধ্য দিয়া মানবীয় প্রাণের আবেশ-উত্তাপ অমিতের প্রাণেও সঞ্চারিত হইল। কৌতূহলের পরিবর্তে কেমন একটা আত্মীয়তা বোধ মনে জাগিল।...

অদ্ভুত এই মানুষের স্পর্শ! শুধু করস্পর্শের মধ্য দিয়া ক্ষমতা-চতুর লেঃ কর্নেল পিণ্ডিদাসকেও মানুষ বলিয়া মানিতে হয়। একটুকু বক্ষস্পর্শের মধ্য দিয়া এই তুলসীর মালা-পরা বৈষ্ণব অধ্যাপককেও আপন আত্মীয় বলিয়া চিনিয়া ফেলিতে হয়। এই প্রীতিমুগ্ধ আত্মীয়তাবোধের সূত্রেই অধ্যাপক রবিশঙ্করের সঙ্গে সঙ্গে অমিতের এখন মনে পড়িল শশাঙ্কনাথকে। আবার, শশাঙ্কনাথের সূত্রে ফিরে আবেগ-বাহুল্যহীন এক প্রীতি জাগিল অধ্যাপক দত্তের জন্য। মুখ তুলিয়া রবিশঙ্করকে বসিতে বলিতে গিয়া অমিত নিঃসংশয় হইল—এই মুখে শশাঙ্কনাথের সেই হাসির, সেই মমতার, সেই আনন্দের আভাসই সে দেখিতে পাইতেছে। মনে হইল অনেক কালের সুহৃদকে সে দেখিতেছে—শশাঙ্কনাথ ও রবিশঙ্করও।

বসুন, স্যর।—অমিত আসন আগাইয়া দিল।

তুমি বসো আগে। আরে, বাঃ, সবিতা! তুমিও চেনো নাকি অমিতকে? তোমার বাবা কেমন আছেন? তোমার গবেষণা চলছে কেমন? বসো তুমি, বসো তোমরা,—এ মোড়ায় বসো তুমি অমিত। হাঁ, আজ তুমিই বসবে প্রথম। হোক ওরা মেয়ে, ওরা বসবে পরে। আমাদের দেশের মেয়েরা তোমাদের এটুকু সম্মান

অন্তত আজ দেখাক—এক দিনের মতো। কি বলো সবিতা তোমাদের অসম্মান করলাম নাকি?

অমিত বসিল। কিন্তু বসিবারও পূর্বে এই কন্ঠ, এই সম্ভাষণ শুনিতে শুনিতে আলোড়িত হইয়া উঠিল। কিছুই মিল নাই শশাঙ্কনাথের সঙ্গে এই মানুষের রূপে। অথচ কেমন করিয়া সেই দুইটি পরস্পরের অপরিচিত মানুষ অমিতের জীবন-কক্ষে পরস্পরের আত্মীয় হইয়া উঠিল। অমিতকে ভালোবাসে বলিয়া—না, অমিত তাহাদের ভালোবাসে বলিয়া?—সেই ভালোবাসায় একসূত্রে গাঁথা পড়ে শশাঙ্কনাথ ও রবিশঙ্কর, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্রজেন্দ্র রায়, বঘু ওড়িয়া আর সুনীল দত্ত...

চিড়-খাওয়া আকাশে যেন বজ্র হাঁকিবে। কিন্তু না না ..

রবিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন—অমিত সুস্থির হইল অমনি—কেমন ছিলে অমিত? স্বাস্থ্যের কথাই জিজ্ঞাসা করি যদিও চোখেও দেখছি—আরও রোগা হয়েছ। চুল পাকছে? পাকুক। অসুখে বড় ভুগেছ, কষ্ট পেয়েছ।

আপনাদেরও তো কষ্ট দিয়েছি, স্যার। শুনলাম, সেই রাইটার্স বিল্ডিং-এ ছুটোছুটি করেছিলেন ওদের কাছে।

তা আর কষ্ট কি? আমাদের ছাত্র ওরা কেউ-কেউ; তোমাদেরও সমসাময়িক।

সে সব ওদের ঝেড়ে-মুছে ফেলতে হয় যে, স্যার। নইলে এই মেশিনারিতে ওদের স্থানই হত না।

তা সত্য। কিন্তু অমিত, আমিও তো সেই মেশিনারিরই একটা নাট-বল্টু। ওদের পর নই।

আপনারা শিক্ষা-বিভাগ; বিশেষ আবার আপনি। ওই মেশিনারির পক্ষে অনাবশ্যক। না থাকলেই বরং ভালো।

তবু আছি যখন না গিয়েই বা তখন ছাড়ি কেন?

অমিত একটু মাথা নিচু করিয়া রহিল। পরে বলিল ' কিন্তু ভালো লাগে নাই, স্যার। কোথায় যেন একটা অপমান-অপমান ঠেকে।

না না অমিত, এতে নতুন অপমান কিছুই নেই। তুমি বলবে সমস্তটাই অপমান। এক দিক থেকে দেখলে আমিও তা মানি। কিন্তু তার বেশি আর কিছু নয়। আর কি জানো—ওরা মেশিন ঠিক, কিন্তু মানুষও।

'মেশিন ঠিক, কিন্তু মানুষও'---সেই পিণ্ডিদাস আর খাঁ সাহেব ফতে মহম্মদ, সেই রায়বাহাদুর আর রায়সাহেব, বেত-মারা মেজর-মর্কট আর বেত্রধারী পেশোয়ারী হাসান খাঁ— সবাই 'মানুষ'। অ্যাণ্ড হোয়াট ম্যান হ্যাজ মেড্ অব ম্যান।

অমিত কিছু বলিতে পারিল না। সবাই মানুষ? কিন্তু সবাই কি এক শ্রেণীর মানুষ?—মানুষের শত্রুও যে মানুষ। কোনো মানুষ মানুষের বিপক্ষে, কোনো মানুষ মানুষের স্বপক্ষে—তাহাও কি জানিতে হইবে না? হাঁ, মানুষ সকলেই---কিন্তু সকলেই তাই বলিয়া মানুষের স্বপক্ষ নয়।

রবিশঙ্করের সন্দেহ হইল—তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া অমিতের মনে

ক্ষোভ রহিয়াছে। আর তাই সেই ক্ষোভের বশেই সে উহাকে ভুল করিতেছে রবিশঙ্করের অপমান বলিয়া। আর সেই সূত্রে অমিত তাহার সমকালীন সতীর্থদের উপর দ্বিগুণ ক্ষোভ জমাইয়া তুলিতেছে। রবিশঙ্কর তাই মৃদু হাসিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিলেন

সেই সিদ্ধার্থ সেন---তোমাদের ক্লাসের,---চোখ তুলে কথা বলতে পারল না যখন দেখা করলাম।

অমিত হাসিল চোখ তুলে সে কথা বলতে পারে না পুলিশের আই-জি, ডি আই-জির সামনেও।

রবিশঙ্কর তাহা মানিলেন খুব সম্ভব। বরাবরই লাজুক, 'শাই' স্বভাবের সে। তাই বলে মানুষ তো বদলায় না।

মানুষ বদলায় না? বলেন কি প্রোফেসার দত্ত---নিজেই যিনি আর সেই প্রোফেসার দত্ত নাই। মানুষের ভাবান্তর হয়, পক্ষান্তর হয়,---আর তারপর মানুষের বদলানোর কী বাকি থাকে? শুধুই হাড়-মাস।

অমিত বলিল বদলায়, স্যার। চোখ নাচিয়ে ওই সিদ্ধার্থ সেন চটকলের ধর্মঘটের সময় হাজার কুলিদের উপর গুলি চালাতে হুকুম দিলে।

রবিশঙ্করের চোখে বেদনা ফুটিল।---তাই বলি, কী যে ওদের বিপদ। সিদ্ধার্থকেও দিতে হয় গুলি চালাবার হুকুম

অমিত বলিল তা হলে হোয়াট ম্যান হ্যাজ মেড অব ম্যান।

এবার রবিশঙ্কর হাসিলেন। তাই অমিত তাই,---যতক্ষণ শুধু মানুষকেই দেখি---দেখি না এই লীলা রহস্যকে।

অমিত স্থির দৃষ্টিতে রবিশঙ্করের দিকে তাকাইয়া। একটা মৃদু মুগ্ধ আলোক সেই চোখে, আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্গ আনন্দময় বিমুগ্ধতা। এমনি আলো, এমনি আনন্দময়তা লইয়া শশাঙ্কনাথও বন্দিশালায় এবার আসিয়াছিলেন। তখনো তিনি জানিতেন না -আসলে মানবের রহস্যকেই তিনি না জানিয়া পাশ কাটাইয়া কাটাইয়া চলিয়া আসিয়াছেন। আজ সেই মানবরহস্যাবিষ্কারের সঙ্গে শশাঙ্কনাথের চক্ষে সবিষাদ রহস্যবোধও আসিয়াছে। কিন্তু কোন পথে রবিশঙ্করের বিদ্যুৎ তীব্র মনীষা এমন রহস্যালোকের সন্ধান পাইল? পুত্রের মৃত্যুতে সেতো পৃথিবীর জরা-মরণময় গৃহাশ্রমের নিয়ম। এ কি আজ তাঁহার আত্মসান্ত্বনা, না, আত্মবঞ্চনা? দুই-ই হয়তো এক জিনিস। যাহাই হউক, ইহাই বুঝি সংসার চায়, গৃহাশ্রমও দাবি করে--এই মায়া। 'এ যদি মায়া হয় বড় মধুর তবে এ মায়া'---বলিতেন শশাঙ্কনাথ। আবার তাহাই কাটাইতে কাটাইতে বিশ্বরূপে বিমুগ্ধ রবিশঙ্কর বলিলেন---লীলাময়ের বিশ্বলীলা।

রবিশঙ্কর বলিতেছেন শরীর দেখছি। মনের কথা তুমি না বললেও বুঝতে পারছি---তা ভাঙবে না। কিন্তু করলে কী এতদিন, বলো।

করলাম কী? কিছুই না, স্যার। কিছু করবার থাকে না বলেই তো এত

মনু আপত্তি করিল : 'কিছুই না' কেমন? ও ঘরে যাবেন, স্যর? বই, খাতা-পত্র, পাণ্ডুলিপির পাহাড়।

তাহাকে শেষ করিতে না দিয়া অমিত বলিল : জঙ্গল। আর তাতে হিজিবিজি। মাথার লক্ষ পোকা।—তুমি থামো, মনু।

সোজা হইয়া বসিলেন রবিশঙ্কর। দুই-এক কথা শুনিয়াই উৎসাহিত বোধ করিলেন, মনু তাঁহাকে বইপত্র দেখাইতে লইয়া চলিল। অমিত দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু থাকিতে পারিল না। কেমন কুণ্ঠিত বোধ করিতে লাগিল। ইহারা অধ্যাপক দত্তের সম্মুখে দাদার লেখা লইয়া কী পাগলামি করিবে। সে লজ্জিতও হইতেছিল, গর্বও বোধ করিতেছিল।—কি বলিবেন অধ্যাপক দত্ত, কে জানে? নীরবে সে ঘরের দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইল।

অনু প্লেটে করিয়া ফল লইয়া আসিল : জানি, বাইরে খান না। কিন্তু অন্তত একটু খাবেন—সামান্য একটু দেশী ফল।

মন হইতে কুণ্ঠা সরাইয়া রবিশঙ্কর বলিলেন : দাও। তারপর অমিতের দিকে চক্ষু পড়িল। উৎফুল্ল চক্ষে খাতাপত্র ফেলিয়া বলিলেন : এ কি, অমিত এ কী করেছ?

ছেলেরাও এই ঘরে ছিল। এখন এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে। সবিস্ময়ে তাহারা দেখিতেছিল অমিতের জিনিসপত্র—অনুকে প্রশ্ন করিতেছিল। বিস্ময়ের অপেক্ষা তাহাদের বালক-দৃষ্টিতে লোভ ফুটিতেছিল—রাজবন্দী হইলে এত জিনিসপত্রও লাভ হয় নাকি! তাহাদের বালক-মনের সরল প্রশ্নে অনু বিব্রত বোধ করিতেছিল, ক্ষুণ্ণ হইতেছিল। এই মনোভাব অমিতের অপরিচিত নয়। আর তাহার উদ্দেশ্য ছিল—উহাদের মোহনাশ হউক। কিন্তু সত্যটাই যেন উহারা জানে। যাই যাই করিয়া এখনো তাহারা যায় নাই, দেখিতেছিল অমিতের খাতাপত্র লইয়া অধ্যাপক দত্তের উৎফুল্লতা। অমিত তাহাদের মনে রাখিয়াই বলিল :

ছয় বৎসরের বাহুল্য, স্যর।—ছাতা, লাঠি, জুতা, জামা থেকে স্যুটকেস, হোলড-অল, বাক্স, ঘড়ি, ফাউনটেন্‌পেন—একটা দোকান। তাই না, ফটিক ইচ্ছা হয় না রাজবন্দী হতে?

ফটিক প্রস্তুত ছিল না। প্রথম চমকিত হইল, তারপর এই কথায় লজ্জা পাইল। কিন্তু চিন্তাটা তাহার একার নয়।

রবিশঙ্কর তাড়াতাড়ি বলিলেন; আমি ওসবের কথা বলছি না।

না বলুন, চোখে তো দেখছেন। ছেলেরা তো অবাক হয়ে গিয়েছে। কর্তারা একদিন সত্যই পুতুলের খেলাঘর সাজিয়ে দিয়েছিল—আমাদের মন ভুলোবে। কিছু কিছু মন ভুলে ছিলও। কিন্তু খেলাঘর দু মিনিটেই ভেঙে যায়। আমাদের বাঙালী আই-সি-এসের বাঙালী মাথায় এখন এই বুদ্ধি এসেছে—পুতুল দিয়ে যখন ভুলানো গেল না তখন যাঁতাকলে পিষে ফেলাই ভালো। আমাদের বন্দী ক্যাম্পের গোরা কম্যাণ্ডান্ট মেজর তাই আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে বলতেন, ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট

বলেই এত হিউম্যান। তোমাদের জন্য সপ্তাহে দুদিন করে বাঙালীর খাদ্য মাছ আসছে বারো শ মাইল দূর করাচী থেকে রেলে।' আমরাও উত্তর দিই, 'আসবেই তো। আমাদের জন্য মাছ কেন, সূঁচ আসছে শেফিল্ড থেকে, কাপড় আসছে ল্যাঙ্কেশায়ার থেকে, তুমি আসছ স্কট্ল্যাণ্ডের নিরন্ন গ্রাম থেকে।--আর আসছ তোমরা দেড় শত বৎসর ধরে। আসলে এসব আসে তো আমাদের জন্য নয় ---তোমাদের জন্য তোমরা এদেশটা শোষণ করছ বলে।' কম্যাণ্ড্যান্টের কথা থাক। জেলের বাঙালী ডাক্তারের চোখে ভালো লেগেছিল শীতের মরুভূমির এই আচ্ছাদন চেস্টারফিল্ডটা। জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাম কত?' মনে পড়ল কোহিনূরের দাম কে জিজ্ঞাসা করেছিল রণজিৎ সিংকে। রণজিৎ সিং বলেছিলেন, 'দশ জুতি।' তা বলবার মতো মুখ আমাদের নেই। কিন্তু ডাক্তারবাবুকে বললাম: 'দাম-ছ'বৎসরের জেল। কারণ ছ'বৎসরের এই তো রোজগার।---এর সঙ্গে আছে অনেক পরিবারের অনশন। এখন লাভ, ক্ষতি কষে বের করুন দাম।'— কি বলো, ফটিক, কত দাম এই ফাউন্টেনপেনটার?

ফটিক এবার অপ্রস্তুত হইল না, বলিল: কেন, দশ জুতি।---

অমিত সচকিত হইল। বলিল: সে কি ফটিক?

ফটিক বলিল: যেদিন দশ জুতি মারতে পারব ইংরেজকে সেদিনই ফিরিয়ে দোব এই ফাউন্টেনপেন।

অমিত চমকিত হইল।..পৃথিবী, তুমি তোমার অক্ষপথে দিন রাত্রি বৃথাই আবর্তিত হও নাই এই ছয় বৎসর। ভারতবর্ষ, তুমি তোমার ধ্যান-স্থির আসনে সেই মোহন-জো-দড়োর দিন হইতে শুধুই নাসিকাগ্র স্থাপিত দৃষ্টি যোগীর মতো আজও অপেক্ষা করিয়া নাই। আর সুনীল দত্ত, জানো তোমাদের দুঃসাহসী-চেতনার সেই উত্তরাধিকার নতুন নতুন সুনীল দত্তদের মধ্যে নতুন ভঙ্গিমায় স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছে?...

ছেলেদের সঙ্গে অমিত কথা বলিতে লাগিল। রবিশঙ্কর বই দেখিতে দেখিতে বলিলেন: তা হলে বই-টই পেতে অমিত?

অমিত জানাইল, গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র পাওয়া যাইত না। দশ-জনের হাতখরচের টাকা একত্র করিয়া যাহাও বা তাহারা দাম যোগাড় করিত, সে বইও গোয়েন্দা সেন্সরের বেড়া ডিঙাইয়া অনেক সময় আসিতে পারিত না। সেই পুলিশী পরীক্ষার কোনো যুক্তি নিয়ম নাই। তাহাদের জালে 'চলন্তিকা' 'রাশিয়ার চিঠি', 'রাজাপ্রজা'ও ঠেকিয়া যায়। গোয়েন্দা অপিসের বারান্দায় এখনো সেসব বই পড়িয়া আছে। হিটলারের মতো উহারা একদিন একটা ভালো লাইব্রেরি পোড়াইতে পারিবে।

. রবিশঙ্কর পাতা উলটাইতেছিলেন। বলিলেন: তবু অমিত কাণ্ডটা করেছ কি? এত লেখা পড়া, এত নোটস!

এবার অমিত লজ্জিত হইল।

রবিশঙ্কর অনেকটা আপন মনেই আবার বলিল: তাই বলি, এ রহস্য কে বুঝবে---এত নোট, এত বিষয়ে তোমার লেখা। তুমি বন্দিশালা থেকে এলে, না, এলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে?

রবিশঙ্করের বড় আনন্দের দিন আজ---অমিত আসিয়াছে। কিন্তু সেই আনন্দকেও ছাড়াইয়া যাইতেছে এক রহস্য-বোধ। কে জানিত অমিতের এই অজ্ঞাত বিকাশ?---এ যে বিধাতারই এক প্রকাশ!

অমিতের মন পুলকিত হইল। হাঁ, কারাগৃহ নয়, এ-বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গুরুগৃহ হইতে অমিত ফিরিতেছে। পুলকিত মনে সে তথাপি জানাইল—সে নিজে পড়াশুনা বিশেষ করিতে পারে নাই। কিন্তু কেহ কেহ সত্যই বৎসরের পর বৎসর দিনে দশ বারো ঘণ্টা করিয়া পড়াশুনা করিয়াছে। বাকী সময়টাতেও লেখা ও ব্যায়ামের পরে তর্ক-বিতর্ক আলোচনায় সে পড়ার পরীক্ষা তাহাদের দিতে হইয়াছে। সত্যই তাহাদের পক্ষে গুরুগৃহ-বাসই বলা যায়।

রবিশঙ্কর শুনিয়া আরও আনন্দিত হইলেন: এসো, এসো। এবার সংসারাশ্রমে প্রবেশ করো তোমরা। গৃহে পরিবারে এই জগৎ-জোড়া বিপুল খেলায় তোমাদের আর-এক খেলার ডাক পড়েছে। অন্য দিন আজ, অন্য খেলা তোমাদের।

একটা রহস্য-মাখা দৃষ্টি তাঁহার চোখে-মুখে। এ কোন মানুষ? অমিত তাকাইয়া রহিল। এ কি সেই শাণিত বুদ্ধি ইতিহাসের অধ্যাপকের পরাজয় অমিত দেখিতেছে, না দেখিতেছে তাঁহার পরিণতি?

রবিশঙ্কর দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন: তাই তো বলি এ লীলারহস্য কে বুঝবে বলো? এর যে আদি-অন্ত নেই। যত তাঁর এক একটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করি,---ইতিহাসের এ-পর্ব,---তত মনে হয়---অপরূপ, অপরূপ।

...'অপরূপকে দেখে এলাম দুটি নয়ন ভরে'.. অমিতের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল...শুধু একটি খণ্ডে নয়, প্রেসিডেন্সি জেলের গরাদের ফাঁকে ফাঁকে নয়। বিশ্বের সমস্ত ঐতিহাসিক যাত্রার মধ্যেই বুঝি বিজ্ঞাননিষ্ঠ রবিশঙ্কর অপরূপকে দেখিতেছেন। এ কি তাঁহার ঐতিহাসিক বুদ্ধির পরাজয়, না পরিণতি?

আজ চলি, অমিত। কাল আমার ওখানে আসবে? বাড়ীর ওঁরা আজই সন্ধ্যায় তোমাকে দেখতে আসবেন। সন্ধ্যায় তুমি থাকবে না? কিন্তু কাল তা হলে এসো আমাদের বাড়ি। দু-একজন বন্ধুকেও ডাকব। আর শোনো তো ব্যবস্থা করব ভাগবত পাঠের। আপত্তি নেই তো? না হয়, থাকুক একদিন ভাগবত পাঠ। তোমার মুখেই আমরা শুনব---তোমাদের কথা। সেও তো ভাগবত---এযুগের কংসপর্ব, কিন্তু 'ভাগবত'।

রবিশঙ্কর চলিয়া গিয়াছেন। অমিতের বিস্ময় আবার কৌতুকে পরিণত হইতেছিল। সে শুনিল, কোন এক সন্ন্যাসিনী মাকে কেন্দ্র করিয়া এক ভক্তমণ্ডলী গড়িয়া উঠিয়াছে। রবিশঙ্কর ক্রমে ক্রমে তাঁহারই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন।

তাঁহার গৃহে সপ্তাহে একদিন করিয়া ভক্তদের ভাগবত পাঠের, ব্যাখ্যার ও কীর্তনের মণ্ডলী বসে।

মনু বলিল: কিছু বলো না, দাদা। সবিতাদির কিন্তু 'ভারতী মাতা'র উপর ভয়ানক ভক্তি।

সবিতার চক্ষুর দৃষ্টিতে শাসন ও বিরক্তি প্রকাশিত হইল: তোমার আপত্তির কথাই বরং বলো না, মনু। ভারতী মায়ের সঙ্গে উপনিষৎ নিয়ে তর্ক করতে গিয়েছিলে। এঁটে উঠতে না পেরে চটে গেলে। কিন্তু চলো, চলো এখন। বাবা বাড়িতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

বড় দেরি হইয়া গিয়াছে। অমিত কাপড় বদলাইয়া লইল। সামান্য সেই চিরদিনকার বেশভূষা। মনুও তৈয়ারি হইয়াছে। কিন্তু অনুর বাবাকে দেখিতে হইবে, বাড়িতে থাকা দরকার। একা থাকিবে সে?---অমিত চায় না।

মৈত্রেয়ী আসবে না? শ্যামল?---মনু জিজ্ঞাসা করে।

খবর পাঠাতে পারি নি। খবর পেলে এতক্ষণে এসে যেত।

পথে চলিতে চলিতে অমিত শুনিল---কে মৈত্রেয়ী, কে শ্যামল। অন্য পরিচয়ও আছে---কাহার মেয়ে, কাহার ছেলে; কিন্তু সে পরিচয়ে বিশেষ জানিবার কিছু নাই। আসল পরিচয় ---মৈত্রেয়ী অনুর সহপাঠিনী; আর শ্যামল সহযোগী---শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়। এ কলের ছাত্র আন্দোলনের সে এক প্রধান কর্মী, সেদিনকার প্রতিবাদ মিছিলের প্রধান একজন উদ্যোক্তা। সেই ছাত্র-সমিতির কাজেই অনুও তাহার সহযোগী। কমিউনিস্ট ছাত্রেরাই মিছিলের সেদিন ব্যবস্থাপনা করিয়াছিল।

অন্যমনস্ক অমিত সচকিত হইল, 'কমিউনিস্ট ছাত্রও' আছে নাকি?

অল্প কয়টি কথার মধ্যে একই সময়ে অনেকগুলি নতুন কথা সে শুনিল:---'শ্যামল' অনুর 'সহযোগী' বন্ধু, ---আশ্চর্য নয় কি কথাগুলি? তোমাদের দিনে এ সম্ভব হইত? অথচ কেমন সহজে অনু মানিয়া লইল---বাড়িতে সবদিন সন্ধ্যায় সে একা থাকে না, শ্যামল প্রায়ই আসে, শ্যামল তাহার বন্ধু। পৃথিবী কত দূর চলিয়া গিয়াছে! ...অমিত, তুমি কি তোমার সহজ পদচারণার মধ্য দিয়া তাহার কোনো উদ্দেশ পাইতেছ? জানিয়াছ কি তোমার একটি পদক্ষেপের মধ্যে এই সসাগরা বসুন্ধরা---অনন্ত গতিময়ী, অনন্ত তেজোময়ী, অনন্ত বীর্যবতী এই ধরিত্রী, ---লক্ষ লক্ষ ক্রোশ শূন্যালোকে পরিক্রমণ করিল; আপনার কক্ষেও, কত পার্শ্ব পরিবর্তন করিল; আর কত দূর-দূরান্তরের অনাগত নক্ষত্রলোকের আলোক রশ্মির উদ্দেশে হাত বাড়াইয়া দিল! তুমি শুধু দেখ---স্থির নিশ্চল মৃতদেহের মতো ধরণী; আর তাহার উপর পায়ের পর পা ফেলিয়া তুমি আর তোমার মত প্রাণীরাই চলিয়াছে। কিন্তু পৃথিবী মরিয়া নাই, মরিয়া নাই, অমিত, নিশ্চল পড়িয়া নাই, ধ্যানে বসিয়া নাই। আপনার অক্ষেও সে শুধু পাক খাইতেছে না---কোনো সন্ন্যাসিনী মায়ের মতো।...

হঠাৎ সেই চিন্তাসূত্র ছিঁড়িয়া গেল একটি শব্দে---'কমিউনিস্ট'।

'ছাত্র-কমিউনিস্টও' আছে নাকি?—অমিত জিজ্ঞাসা করিল।

দুইজনা বাসের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। মনু দাদাকে জানাইল—ছাত্ররা সবাই এখন কমিউনিস্ট। তারা ছাত্রসমিতি গড়ে, পাড়ায় পাড়ায় 'স্টাডি ক্লাস' করে, সম্মেলন ডাকে।

তা বলে কমিউনিস্ট হল কি করে?

কি হলে তবে কমিউনিস্ট হয় আবার?—মনু অন্তত তাহা বুঝিতে পারে না। উহারা 'বন্দেমাতরম' বলে না; বলে 'ইন্‌কেলাব জিন্দাবাদ'। আর বলে কৃষক আন্দোলন করিবে, মজুর আন্দোলন করিবে। দুই একজন বিলাত ফেরতা ব্যারিস্টার উহাদের নেতা—মনু তাহাদের নাম করিল। প্রাচীন ভারতের সাহিত্য সভ্যতা সংস্কৃতি সব তাহাদের মতে ভুঁয়া, 'ফিউডাল প্রিন্‌স্‌ ও প্রচ্ছন্ন বুর্জোয়াদের' বজ্জাতি। অমিত তাহাদের নাম জেলে শুনিয়াছে—শুনিয়াছে তাহারা কমিউনিস্ট। অমিতের পূর্বেকার চেনা কমিউনিস্ট লীডার ডাক্তার দাস অনেকদিন পূর্বেই সরিয়া পড়িয়াছে; দীনু জেল ও আটক-ঘরের মধ্য দিয়া আর বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। মীরাট মামলার দণ্ডিত বা মুক্ত কর্মীরা তখনো কর্মক্ষেত্রে স্থান লাভ করিতে অক্ষম। এই অবসরে উদিত হইয়াছে মীরাটের নামকাটা কোনো কোনো অ-কমিউনিস্ট কর্মী, কংগ্রেসের নামকাটা দুই-একজন সদ্যোজাত 'সোশ্যালিস্ট'; আর অমিতদের অপরিচিত দুই-একটি ব্যারিস্টার বৈজ্ঞানিক, ধূমকেতুর মতো বহ্নিমান—পুচ্ছবানও। অমিত খবরের কাগজ মারফতে তাঁহাদের নাম পড়িয়াছে, মনে মনে ইহাদের প্রতি সম্ভ্রমও পোষণ করিয়াছে। বন্দিশালার বন্দি-পরিমণ্ডলে ব্যর্থতায় বিক্ষোভে ইহারা জন্মে নাই, কর্মক্ষেত্রের নিয়মে পোড় খাইয়া খাইয়া ইহারা পাকা সোনা হইবে—পুড়িয়া খাক হইবে না—সুনীল দত্তের মতো।

মনু বলিল : অনুর বিশ্বাস তুমিও কমিউনিস্ট।

...লম্বমান দড়িটা দেখে নাই, অমিত, পুষ্করের জলে জলে সেই অনুজ দেহের বিলয়ও দেখে নাই, কিন্তু মনুর কথায় সেই বাঙালী অনুজ শুনিতে পাইতেছে কি সুনীলের শেষ প্রশ্ন, 'তুমিও আমাদের সঙ্গে নাই অমিদা'?...

ধ্যানোত্থিত অমিত জিজ্ঞাসা করিল : আমি? আমি কমিউনিস্ট? কেন, এ কথা কিসে অনুর মনে হল?

...দি ইন্টারন্যাশনাল ইউনাইটস্‌ দি হিউম্যান রেস—এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরেও—অমিতও চায় মানুষের মহামিলন। চায় সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব সকলের জন্য। কিন্তু অমিত কর্মক্ষেত্রে পরীক্ষা না করিয়া কোনো মতবাদ মানিবে না।...

মনু বলিল : তোমার বইপত্র বাড়িতে যা ছিল তা পড়ে, নাকি অনুর এই বিশ্বাস হয়েছে।

অমিত এবার একটু উচ্চ কন্ঠেই হাসিল।—খুব পাকা হয়েছে তো অনুটা। তারপর আবার অমিত জানায় : তাতে পার্টির নাম গন্ধও নেই; না, 'সায়েন্টিফিক্ সোশ্যালিজম'ও তা নয়।

মনু আশ্বস্ত বোধ করিল, বলিল : অনুর মাথায় ওর বন্ধুরাই কেউ এ ধারণা ঢুকিয়ে থাকবে। আর মাথায় একবার কিছু ঢুকলে অনু তা ছাড়ে না। আবার, এমন গর্ব ওর যে, একটু তর্ক করবার পর সে বিষয় নিয়ে পরে আর কারও সঙ্গে তর্কও করবে না। এমন একগুঁয়ে।

'পাকা হইয়াছে' অনু। সেদিনের বাড়ির সেই আদরিণী কনিষ্ঠা বোন—তখন ফ্রক্ ছাড়িয়া সবে শাড়ি ধরিয়াছে, তথাপি মাকে কথায় কথায় জ্বালাতন করে, অন্য দিকে মা না হইলে একা ঘরে ভয়ে ভয়ে শুইতেও পারে না। সেই বোন এমন করিয়া একটা ভগ্ন, অভাবগ্রস্ত সংসারের ভার কেমন অনায়াসে গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছে—মনুর তাহা চোখে পড়ে না। চোখে পড়ে তাহা অমিতের ;---মাতৃহীন গৃহে হঠাৎ পদার্পণ করিতেই আজ এই সত্যটা তাহার চক্ষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই পরিণতবুদ্ধি বালিকাকে মুখে 'পাকা' বলিয়াই অমিত আপনার স্নেহভরা শ্রদ্ধা তাহাকে জানাইতে চায়। আরও বেশি করিয়া তাহা জানাইতে চায়---অনুর বুদ্ধি-মার্জিত দৃষ্টির সংবাদে। এই তো এ যুগের দৃষ্টি। ভাবিতে অদ্ভুত লাগে—সেই তাহার বোন অনু, কেমন অনায়াসে সেও এ যুগের জীবনপথকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করিল কোন এক তরুণ যুবক শ্যামলের সঙ্গে তাহার সৌহার্দ্য, সংযোগ, কর্মের যোগ,—আর হয়তো বা তাই হৃদয়েরও যোগ। অনুর কোথাও দ্বিধা নাই, সংকুচিত কুণ্ঠা নাই, আত্মগোপন নাই, আত্ম-অস্বীকৃতিও নাই.. নিশ্চয়ই পৃথিবী চলিয়াছে, অমিত তাহার গতিচ্ছন্দ শুনিতে পাইতেছে। শুনিতে পাইতেছে মহাকাশের সেই অনাহত সঙ্গীত।..

বাস আসিল। সেই বাস—সেই ভাঙ্গা, নীতিনিয়মশূন্য কলিকাতার বাস ; আর তাহার নিয়ম-শৃংখলা-বিমুখ কলিকাতার যাত্রী। অথচ দূরে কত সন্ধ্যায় বসিয়া এই অভিজ্ঞতারও কল্পনা করিয়া অমিত পুলকিত হইয়াছে. পথে বাস ছুটিবে, আর অমিতের চুল হাওয়ায় উড়িবে, চোখে মুখে ধুলা লাগিবে, নাকে কানে ধোঁয়া ঢুকিবে ;---কিন্তু ছুটিবে তবু মানুষের সেই সহজ যাত্রারথ ;—ছুটিবে। উহার নানা অনিয়মে অমিত ব্যাহত হইবে, বিরক্ত হইবে, তাহার সময় নষ্ট হইবে ; কিন্তু তবু বাস ছুটিবে।

টাল সামলাইতে সামলাইতে মনু দোতলায় আগাইয়া গেল, দাদাকে বসিবার জায়গা করিয়া দিল। অমিত চোখে ইসারা করিল---সবিতাকে বসিতে বলুক প্রথম মনু।

অমনি মনু বলিল : ওঃ লেডিজ ফার্স্ট।

সংকোচে লজ্জায় সবিতা মনুকে ভ্রূভঙ্গি করিয়া শাসন করিল, পিছনের একটা সিটে সে বসিয়া পড়িল।

অমিত বুঝিল সবিতা লজ্জায় দ্বিধায়---হয়তো ভয়ে, ভক্তিতেও,—তাহার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিতা। মনু কিন্তু দাদার পার্শ্বের স্থান দেখাইয়া তথাপি তাহাকে বলিতেছে : একটা সীট রয়েছে এখনো ; এখানে এসো না, সবিতাদি ?

তুমি ওখানে বসো, মনু।

দুই জনার চোখে চোখে একটু কথা কাটাকাটিও হইল। অমিত তাহা থামাইয়া দিয়া বলিল : তুমি ওর পার্শ্বের জায়গায় বসো মনু,—নইলে আবার কে বসে পড়বে সেখানে।

মনুর আপত্তি ছিল কিন্তু তাহার পূর্বে ধাক্কা দিয়া বাস আগাইয়া চলিল। কোনো রূপে মনু সবিতার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল; প্রায় তাহার গায়েই পড়িতেছিল বাসের ধাক্কায়। অপ্রস্তুত হইতে হইতে দুইজনা তাই হাসিয়া পরস্পরকে পরিহাস করিতে গেল। আবার অমনি সবিতা থামিয়া পড়িল—অমিতের সম্মুখে এই চাপল্য প্রকাশ বড় অন্যায়! অমিত মনে মনে হাসিতে লাগিল। দ্বিধা, সলজ্জ শ্রী, আনন্দবোধ সবই সবিতার আছে।—সবই থাকিবার কথা। চরিত্রে শ্রী আছে;—তাই অমিতের সহিত কেমন একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত দূরত্ব সে সহজে রাখিয়া চলিয়াছে। অথচ সামীপ্য-স্বীকারেরও ইচ্ছা আছে, প্রয়াসও আছে;—মনুর সহিত অত্যন্ত আচরণে তাহা ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হইতেছে। সবিতা জীবনের পোড়খাওয়া মানুষ, খাঁটি সোনা।

মুখ ফিরাইয়া মনুর সহিত অমিতের কথা বলিতে অসুবিধা। মনু উৎসাহ চাপিয়া রাখিতে পারে না---দাদাকে কত কথা বলা চাই। কিন্তু আবার সে থামিয়া যায়---দাদা বুঝি কথা বলিতে চান না; দুই চোখ ভরিয়া তিনি কলিকাতা দেখিতে চান। অগত্যা সবিতাকেই মনুর সে সব কথা বলিতে হয়। আর সবিতাও উত্তর দেয় নিম্নস্বরে, দাদা শুনিবেন না।

'মেট্রো'তে এখন পাবি না। 'মুক্তি' দেখছি দ্বিতীয়বার---কাননের গান।'... সবিতার কন্ঠ নয়, অপরিচিত সহযাত্রীদের উচ্চ বাক্যালাপ। 'সোনার সংসার'ও খুব ভালো বই হয়েছে।

কানন .বড়ুয়া-কানন ..কানন .

বহুদূরে দেখা একটা নীহারিকা-পুঞ্জ। ইতিমধ্যে নক্ষত্রলোকে পরিণত হইয়াছে কি? দূর হইতে অস্পষ্ট দেখা একটা উপকূলের মধ্য হইতে কি এবার আপন আপন পরিচয় লইয়া বহির্গত হইয়াছে রমণীয় বন-উপবন-উদ্যান, প্রাসাদ-বিলাস-গৃহ? অমিতের মন কৌতূহলে ভরিয়া উঠিতেছে। এই পৃথিবীতে যে এই সব ছিল তাহা তো কল্পনাও তাহারা করিতে পারে নাই! যখন 'ফ্রাঙ্কো, বা ইনটার-ন্যাশনাল ব্রিগেড' লইয়া তাহারা রক্তপাত করিয়াছে, ইতিহাসের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে আবিষ্কার করিবার আর অস্বীকার করিবার সংগ্রামে আপনাদের হৃদপিণ্ড উপড়াইয়া ফেলিয়াছে---কে জানিত—পৃথিবীতে—এই বাঙলার গৃহে গৃহে---তখন 'কাননবালা শাড়ি' ও 'মুক্তি ব্লাউজ' হইয়া গিয়াছে প্রধান প্রসাধন সাধনা;—'পাহাড়ী' আর 'লীলা দেশাইতে' তখন বাঙালী শিল্পের নতুন পাতা খুলিয়া দিতেছে।

'এ যুগের দৃষ্টি, এ যুগের সৃষ্টি'—ইহাও তো, ইহাও তাহারই একটা খণ্ড। 'তুর্কসিব' আর 'পোটেমকিন্' যেমন পৃথিবীর আগামী দিনের স্বপ্ন। বন্দিশালায় শুধু তত্ত্ব, শুধু তর্ক, শুধু রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির তথ্য ঘাঁটিয়াই কি জীবনের

এই অজস্রতার সন্ধান পাওয়া যায়। ইতিহাসের গতিপথ হয়তো তাহাতে বুঝা যায়, সাম্রাজ্যের বিকৃত রূপ অবিষ্কার করা যায়। কিন্তু জীবনের রূপ আরও জটিল, তাহা শত পাকে জড়ানো, অজস্র তুচ্ছতায় আশ্চর্যজনক রহস্য।

হালকা-হাওয়ায় উড়িয়া যাইতেছে, কত কথা আর কত মানুষ—

বাসের এই কোণটা জমাইয়া ফেলিয়াছে গুটিকয় যুবক। একটু অশোভন অবশ্য তাহাদের উচ্চকণ্ঠ আর তকণ্ঠিত ইয়ার্কি। সঙ্গে চলিয়াছে হয়তো তাহা-দেরই কাহারো জীবন-সঙ্গিনী কিংবা লীলা-সঙ্গিনী দুইটি নাতিমৌন তরুণী। 'কেমন ভাল্‌গার ইহারা'—চোখেমুখে গাম্ভীর্য ও অসম্মতি ফুটিয়া উঠিতেছে নিকটস্থ সীটের সমাসীন একজোড়া স্বামী-স্ত্রীর—ভাবী, বা বর্তমান, দম্পতি তাহারা। মোটর-পর্যন্ত-আয় তাহাদের নয়, কিন্তু তাহাদের স্বচ্ছলতার স্তর সাধারণ বাসের সাধারণ যাত্রী-স্তরের নয়, এই কথাটা সকলকে বুঝাইয়া দিতে না পারিলে স্বস্তিবোধ করিতেছে না সেই সোনার বোতাম, ধপধপে আদ্দি, কোঁচানো ধুতি এবং বাঙ্গালোর-শাড়ি-ব্লাউজের সুসজ্জিত আভিজাত্য। অমিত ইহাদের দেখিয়াও কৌতুক বোধ করিতেছে। মনু ও সবিতার সঙ্গেও চোখাচোখি হইল। দাদার সম্মুখে সেই ছোঁড়াদের এই চাপল্য যেন তাহাদেরও পীড়িত ও অপরাধী করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের আশস্ত করিবার জন্যই উৎফুল্ল মুখে অমিত বলিল : সব নতুন লাগছে!

মনু জানাইল : আরও দেখবে কত নতুন।

হালকা-হাসির গুচ্ছটি চাঁদনির মোড়ে নামিয়া পড়িল—সিঁড়ি দিয়া যেন রাখিয়া গেল তাহাদের হাসির গুঁড়া-গুঁড়া ঝিকিমিকি। দূরত্ব রাখিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে নামিল আদ্দির পাঞ্জাবি ও বাঙ্গালোরের শাড়ি। আপিস-শ্রান্ত মানুষের দল উঠিয়া পড়িল। বাস ভরিয়া গেল। দণ্ডায়মান মানুষের বেড়ায় মনুদের মুখ দেখা যায় না, আর কথার সুযোগ নাই। আলাপের ইচ্ছাও নাই। বাসে শুধু সংক্ষিপ্ত মন্তব্য শোনা যায়, আর চিন্তাভারাক্রান্ত বিরক্ত দৃষ্টি ও উক্তি। নীচে বোধ হয় যাত্রীদের সঙ্গে কন্‌ডাক্‌টারের তর্ক বাধিয়া গিয়াছে; উপরেও তাহার দুই একটা ঝাপ্‌টা আসিয়া লাগিতেছে। আশ্চর্য মনে হয় অমিতের আবার সব। সেই পুরানো পৃথিবী তেমনি মানষ, তেমনি মুখ—আর তেমনি বুঝি শরৎ অপরাহ্ণের চৌরঙ্গী রোডের পাশের মাঠ ঘাস গাছ, বাড়িঘর। তথাপি অমিতের ভালো লাগে —অপরিচিত এতগুলো মুখ—যাহারা খাটে, কলম পিষে; না জানিয়া বাঁচে, আর বাঁচিয়া মরে, মরিয়া বাঁচে।

ওঠো! নামতে হবে—পিছন হইতে মনু জানায়।

একটা স্টপ্‌ বাকি তখনো। কিন্তু সীট্‌ ধরিয়া ধরিয়া টাল সামলাইতে সাম-লাইতে এখন হইতে চেষ্টা না করিলে ঠিক জায়গায় নামা অসম্ভব হইবে। বাস ছাড়িবার বেলা যে দেরি হয়, নামিবার বেলা তাহা সংক্ষেপ না করিলে 'পাইজীদের' আত্মার শান্তি নাই।

ফুটপাতে হাঁফ ছাড়িয়া মনু বলিল : দেখলে তো? আরও দেখবে।

অমিত বলিল : তাই তো, আশা। দেখবার মতো নতুন কিছু নেই জানলে তো জেলেই থাকা ভালো।

তবু তো শোনো নি, বলিও নি কিছুই---

চার

কালিঘাট বালিগঞ্জের মধ্যস্থলে একটা নতুন পাড়ার নতুন রাস্তায় ব্রজেন্দ্র রায়ের এই নতুন বাড়ি 'সবিতা-সদন'। ছোট্ট বাড়ি, গুছানো, বাহুল্যহীন। উপরতলায় অনেকটা খোলা ছাদ, আর বাড়ির পিছনে খানিকটা খোলা আঙিনা---সবুজ ঘাস ও ফুলের গাছের একটু শ্যামলতা। কিন্তু সে সব অমিতের দেখিবার সুযোগ হইল না। একটি কিশোর বালক মাসীর আগে আগে সংবাদ দিল দাদুকে। বিজয়---বড় দিদির ছেলে---উহারা এলাহাবাদে থাকে, ছুটিতে এসেছে---এই তথ্যটা অমিত গ্রহণ করিতে না করিতেই আহ্বান শুনিল---

কোথায় অমিত? এদিকে---

দোতালার খোলা বারান্দায় অনেকক্ষণই ব্রজেন্দ্র রায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। অমিত আগাইয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। বেতের আসনে দেহ টান করিয়া বসিয়া আছেন ব্রজেন্দ্র রায়। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ স্নেহমাখা। দীর্ঘ দেহে শীর্ণতা আসিয়াছে মাংসপেশী শিথিল হইয়াছে, দেহকান্তি একটু চিক্কণতা হারাইয়াছে---কিন্তু সেই ব্রজেন্দ্র রায় যে তাহাতে ভুল নাই, সে আলোক-শিখা নিবিয়া যায় নাই।

কোথায়?---অমিতের উদ্দেশ্যে হাত বাড়াইয়া দিলেন ব্রজেন্দ্র রায়---কাছে এসো, অমিত!

টানিয়া অমিতকে ব্রজেন্দ্র রায় বুকের কাছে লইলেন! কোনো দিন তো এমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেন না ব্রজেন্দ্র রায়। সেই ক্লাসিক্স-গঠিত মানুষের বাক্য-আচরণে বাহুল্য, আবেগ-প্রবণতা কোনো দিন অমিত শত পরিচয়, শত সান্নিধ্য, স্নেহ প্রীতির শত নিদর্শন সত্ত্বেও পূর্বে চক্ষে দেখে নাই। পরিমিত প্রকাশের মধ্যেই তাঁহার অপরিমিত অনুভূতির ও উপলব্ধির ইঙ্গিত থাকিত। আজও অমিত তাহাই আশা করিয়াছে। সেই চিরাগত সংস্কারকে ভাঙিয়া দিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু অমিতকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন!---যেন রবিশঙ্কর দত্তের মতো হইয়া উঠিলেন ব্রজেন্দ্র রায়। জীবনের নিয়মে, প্রাণের কবোষ্ণ প্রেমপ্রীতি স্নেহমমতার তাপে, ইতিহাসের ছাত্র ও ক্লাসিক্স-গঠিত বুদ্ধিবাদী একইরূপে মানুষ হইয়া পড়িতেছেন!

অমিতকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া, অমিতের মুখ নিজের চোখের সামনে ধরিয়া, বৃদ্ধ ব্রজেন্দ্র রায় এমন হাস্যহীন ঔজ্জ্বল্যহীন চোখে তাকাইয়া রহিলেন কেন?

ব্রজেন্দ্র রায় বলিতেছেন : কোথা অমিত? তোমার মুখ দেখতে চাই, কিন্তু ভাল করে দেখতে পাই না আর। চোখ বড় বাদ সাধল যে অমিত।---

বিষাদমাখা হাসি বৃদ্ধের সেই সুন্দর পাতলা ঠোঁটে।

এইবার অমিতের মনে পড়িয়া গেল---যাহা শুনিয়াছিল, জানিত, অথচ চেতনায় যাহা জাগ্রত হইয়া থাকে নাই, তাহা এইবার বিদ্যুৎ-লেখার মতো দাগ কাটিয়া তাহার মস্তিষ্কে বসিতে পারিল। একটি বারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও তাই শত পরোক্ষ জ্ঞানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! গ্লোকুমায় আজ প্রায় দৃষ্টিহীন ব্রজেন্দ্র রায়। অমিতকেও স্পষ্ট দেখিতে পান না, তাই বুকের কাছে টানিয়া আনেন অমিতের মুখ। আবার পুরাতন শিক্ষাদীক্ষা সংযম-সভ্যতার বাধায় তাহাকে একেবারে বুকের মধ্যেও গ্রহণ করিতে পারেন না। ক্লাসিক্সের বুদ্ধিবাদী মানুষ হইলেও তিনি আত্মহারা মানুষ নন। বার্ধক্যশীর্ণ দুইটি জীর্ণ বাহু দুইটি যৌবনপ্রান্তিক শক্ত বাহুর স্পর্শে তথাপি শিহরণে কাঁপিতেছে। অমিতের দেহেও সেই স্পর্শ বহিয়া আনিতেছে পূর্বসঞ্চিত আবেগ মমতার ইতিহাস---তাঁহাদের প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশা।

সবিতা বলিল: উনি আরও রোগা হয়ে গিয়েছেন, বাবা। আরও ম্লান হয়েছেন কড়া রৌদ্রে, চুলও উঠে গিয়েছে কপালের খানিকটা---

অমিত ব্রজেন্দ্র রায়ের পার্শ্বে বসিতে বসিতে বলিল: অর্থাৎ বয়স বেড়েছে এই ছ-বৎসরে---যেমন করিয়া হউক অবস্থাটাকে অমিত আপনার কাছে ও সকলের কাছে সহজ করিয়া লইতে চায়। দৃষ্টিহীন ব্রজেন্দ্র রায়ের চক্ষু দেখিতে চায় তাঁহার পুত্রপ্রতিম বন্ধু অমিতের মুখ আর তাহা দেখিতে পায় না। বেদনায় অমিতের মন ভরিয়া উঠিতেছে। সেই মুখের দিকে অমিত তাকাইতেছে.. সাড়া আছে কিন্তু দৃষ্টি নেই।

সেই পুরাতন ঈজি-চেয়ারের উপর বর্ষীয়ান মূর্তি---দুই হাত দুই দিকের হাতলে; ভাঙিয়া-পড়া আনত দেহ; জিজ্ঞাসা-ভরা বিভ্রান্ত দৃষ্টি যেন কি বুঝিতে চাহিতেছে, বুঝিতে পারে না . 'অমি?---অমি...এলে?---এলে কখন?'

অমিত দেখিতেছিল কিছুক্ষণ পূর্বে দেখা সেই পিতৃমূর্তি।

স্নেহপ্রীতির ভাবাবেগ ও দৃষ্টিহীনতার বেদনা, এই দুইয়ের সমাবেশে ব্রজেন্দ্র-নাথের মুখের মাংসপেশী ক্ষীণভাবে একটু কাঁপিতেছে।

সেই ব্রজেন্দ্র রায়। তাঁহার দেহে জরা আসে নাই, মনেও জড়তা লাগে নাই। তবু সেই চিরদিনকার অধ্যয়ন নিরত, জিজ্ঞাসা-নিরত চক্ষু আজ যখন চিরসন্ধ্যার ছায়ায় আচ্ছন্ন, মনও কি তখন আপনার পরাজয় মানিয়া না লইয়া পারে? অবসন্ন আয়ুর কাছে মানবশক্তির আত্মসমর্পণ। 'হোয়াট এ পীস্ অব ওয়ার্ক ইজ ম্যান! তবু শেষ পর্যন্ত মাত্র 'কুইন্টিসেন্স অব ডাস্ট'!---তথাপি মানবশক্তির আরও শোচনীয় পরাজয় কিন্তু সেই ঈজি-চেয়ারের বোধবিলুপ্ত পিতৃ জীবন---'অমি? অমি এলে? কখন এলে?

কেমন আছ 'অমি? চোখে না দেখি, কানেই শুনি---তাতেও খানিকটা বুঝতে পারব।' ---সবিষাদ হাস্যে ব্রজেন্দ্র রায় বলিতেছিলেন।

ইচ্ছা করিয়াই সানন্দ-সজীব কণ্ঠে অমিত বলিল : ভালো আছি। ছ বৎসরে পৃথিবী যত বদলেছে, এরা যত বদলেছে, আমি তত বদলাই নি, প্রায় একই আছি।

খুব ভুগেছো তো?

সবিতা নিচে চলিল, মনুকে একটু নিম্নকণ্ঠে বলিল : তোমরা গল্প করো মনু : আমি চা করছি। অমিত বুঝিল---সবিতা আতিথেয়তার অবকাশ খুঁজিয়া লইতেছে। একটু পরেই আবার মনুরও নিচে ডাক পড়িল; হয়তো সবিতা একেবারে একাও থাকিবে না। কিংবা, ইচ্ছা করিয়াই বুঝি দুইজনাতে অমিতকে ব্রজেন্দ্র রায়ের নিকট একা রাখিয়া গেল---সমরুচির দুই ভিন্ন বয়সের সুহৃদ চিরদিনের মতো তেমনি গল্প করিবার যেন অবকাশ পায়। ওদিকে নিচের ঘরে ক্ষণে ক্ষণে শুনিতে পাওয়া যায় মনুর হাসির সহিত আর দুইটি সমরুচির সংগত অনুচ্চ হাসির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুভ্র তরঙ্গ।

ব্রজেন্দ্র রায় বলিতেছিলেন খুব ভুগেছ অমিত, না?

অমিত হাসিয়া উত্তর দিয়েছিল আপনারাই কি আপনারা কম ভুগেছেন?

...সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় দেবেন ঘোষ নিরঞ্জন শশাঙ্কনাথ বারীন নন্দী... সুনীল দত্ত :---পীড়ায় দেহক্ষয়, অবহেলায় মৃত্যু, অসুস্থতায় অবসাদ, ব্যর্থতায় বিমূঢ়তা, ব্যাহত যৌবনের হতাশা, রুদ্ধাবেগ যন্ত্রণার আত্মনাশ :---এসবকে তুমি তুচ্ছ করিও না; ইহাদের প্রতি অন্যায় করিও না, অমিত। অন্যায় করিও না... "আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে। কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে॥"

অমিত বলিল . আর জেলখানা তো জেলখানাই জেঠামশায়।

অমিতের মুখে এই আত্মীয়সম্ভাষণও এই প্রথম ফুটিল। ব্রজেন্দ্র রায় ইহার অর্থ বুঝিলেন; দৃষ্টিহীন চোখ একবার নিমীলিত হইল। মুখের পেশী স্বল্প একটু কাঁপিল। তারপর তিনি বলিলেন, যাক, তবু এসেছ। আমরা যে তোমাদের প্রতীক্ষায় বেঁচে আছি। তোমাদের প্রত্যাশায় এখনো দিন গনি।

..'প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশা'---সেই শব্দ দুইটি। ব্রজেন্দ্র রায়েরই কথা তাহা, তাঁহার নিজের কথা---এবং তাঁহার ব্যক্তিসত্তায় আলোকিত এই ঘর-দুয়ার সকলের কথা।

অমিত শান্ত বিস্ময়ে বলিল, আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করেন, আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন?

ব্রজেন্দ্র রায় বলিতেছেন : হাঁ, প্রতীক্ষা করি, প্রত্যাশা করি;—তোমার কাছে হয়তো তা অদ্ভুত শোনায়; কিন্তু হয়তো এরূপই জীবনের নিয়ম। পরজীবনকে খুব বড় করে না মানতে পারলে মন হয়তো এ জীবনকেই কেবল আঁকড়ে থাকতে চায়। আর, ওই পরজীবনের উপর তেমন করে নির্ভর করতে ভুলে গিয়েছি আমরা—ইংরেজি শিক্ষিতরা।

...সেই ব্রজেন্দ্র রায়, অমিত, সেই ব্রজেন্দ্র রায়! তাঁহার চোখ তোমাকে দেখিতে

না থাক, তাঁহার মনের চক্ষু তেমনি দৃষ্টিমান, বুদ্ধি-উজ্জ্বল। সেই ব্রজেন্দ্র রায়—আর তুমিও সম্মুখে সেই অমিতই—ছয় বৎসরের পূর্বেকার সেই পুত্র-প্রতিম বন্ধু। কিন্তু তুমি যে অন্য দিনের অন্য মানুষও।...

ব্রজেন্দ্র রায় বলিতেছেন : অনেক গেল, অনেক গিয়েছে। তবু ভাবতে পারি না সেই ছেদগুলিই সব। ভাবি---যারা আসছে তারা এই ছেদগুলি ভরে দিতে পারবে। তাই প্রতীক্ষা করি, প্রত্যাশাও ছাড়ি না। হয়তো এও ছলনা। কিন্তু নইলে থাকি কি নিয়ে—"অ্যাণ্ড সো ফ্রম আওয়ার টু আওয়ার উই রাইপ্। অ্যাণ্ড ফ্রম আওয়ার টু আওয়ার উই রট্ অ্যাণ্ড রট্।"

'উই রট্ এ্যাণ্ড রট্'—আবার সবিষাদ আবৃত্তি করিলেন ব্রজেন্দ্র রায়।

একই কালে পিতার স্মৃতি ও ব্রজেন্দ্র রায়ের কন্ঠস্বর অমিতের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া তাহাকে ঝাঁকিয়া দিয়া বলিতে লাগিল : উই রট্ অ্যাণ্ড রট্?

অমিত জোর করিয়া তাহা গায়ে না মাখিয়া বলিতে গেল : তা হলে পৃথিবীতে পচ ধরে যেত, জ্যেঠামশায়।

প্রসন্নভাবে অমনি ব্রজেন্দ্রনাথ হাসিলেন : পৃথিবী অত মিথ্যা নয়, অমিত। একদল যায়, আর দল আসে। আমাদের পালা অনেক দিন শেষ হয়েছে; তবু আঁকড়ে আছি, তাই পচ ধরছে। আব তাই আরও বেশি করে তোমাদের প্রত্যাশা করি—আমাদের প্রতিশ্রুতিকে তোমবা রূপ দেবে।

সেই 'বুড়োদের কাজ হাতে তুলে নাও, অমিত'।---

কিন্তু সেই শক্তি অমিতের কই? সে অবসর কোথায়, অমিত? পৃথিবীর এই ভাঙা গড়ার মুহূর্তে তুমি শত-সহস্রের সঙ্গে মিলিয়া সেই মহাযজ্ঞে যোগ দিবে, না, বসিয়া বসিয়া এই মিছিলের মুখেব ছবি আঁকিবে? .

অমিত বলিল : আমাদের পালা, জ্যেঠামশায়, ছিল কর্ম-কোলাহলের পালা; চিন্তা-ভাবনার দাবি আমরা মানি নি। কাজের মধ্য দিয়েই আমরা বেঁচেছি, আয়ু-ক্ষয় করেছি। ইতিহাস যা নেবাব নিংড়ে নিয়ে সঞ্চয় করে নিচ্ছে। এবার বাতিল হয়ে যাব,---ইতিমধ্যেই বাতিল হয়ে যাচ্ছি ভদ্রশ্রেণী থেকে।

ব্রজেন্দ্র রায়ের যুগের সেই প্রশস্তকাল এদেশ ফিরিয়া পাইবে না; বাঙালী ভদ্রলোকের অনুদ্বিগ্ন সেই জীবন-যাত্রা অমিতও ফিরিয়া চাহিবে না; তাহার দৃষ্টি কেবলি আগামী দিনের আকাশে।

ব্রজেন্দ্র রায় বলিতেছিলেন : ভদ্রশ্রেণী থেকেও ভদ্রতা বাতিল হচ্ছে, অমিত। আসলে ভদ্রসমাজই আজ বাতিলের দিকে। আগেও তুমি এ কথা বলতে, অমিত। তখনো তা বুঝতাম, কিন্তু মানতে চাইতাম না। এখনি কি সব মানি?---তবে আর মানি না ভদ্রলোকের মোহ। খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা, আচার-ব্যবহার, দেনা-পাওনা---এ সব নিয়েই তো ভদ্রলোকেরা ভদ্রলোক! কিন্তু কতদিনের এসব? মনুষ্যত্বের কতটুকুই বা সে সব?---সবিতাকে তাই বলি, 'এসব কিছুই টেকে না, দেখছো তো ইতিহাসের সাক্ষ্য।' ওর সঙ্গে বসে আমাদের প্রাচীন ইতিহাস পড়ি।

আমার চোখ গিয়েছে, মোহও গিয়েছে; ওর চোখ আছে, মোহও তাই আছে। সে চোখে সবিতা দেখে—উপনিষদ, বৌদ্ধযুগের সুন্দর স্বপ্ন, অশোকের ধর্ম-বিজয়, গুপ্ত যুগের বিরাট মহিমা; দেখে অজন্তা, ইলোরা, দেখে প্রাম্বনন, বরোবুদোর, আঙ্করভাট। আর দেখে আবার রঁলার আলোকে বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী। এসব দেখে, আর সে বিশ্বাস করে ভারতের সাধনা সত্যের একটা সনাতন প্রকাশ। আমিও এ কথা একেবারে না মেনে পারি না, অমিত। কুমারস্বামী পড়ি,—রবীন্দ্রনাথ পড়ি—সবিতাই শোনায়,—দেখি তাঁর মনের জিজ্ঞাসা; আবার জওহরলালের 'আত্মজীবনী'তে দেখি তোমাদের মুখ—

অমিত নিবিষ্টচিত্তে শুনিতেছিল। ব্রজেন্দ্র রায়ও অনেককাল পরে মনের মতো শ্রোতা পাইয়াছেন। একটা যুগের আত্মবিচার অমিত শুনিতেছে; সবিতার নাম, সবিতার মন ও সবিতার জীবনদৃষ্টির একটা আভাস পাইয়া সে আরও উৎসুক হইয়াছিল।...ঠিক ইহাই স্বাভাবিক, ইহাই প্রত্যাশিত। জীবনকে মানিয়া না-মানার প্রয়াসে সবিতা এই ভাবেই আপনাকে খর্বিত করিতে বাধ্য হইয়াছে। নিজেকে খর্বিত করিয়া চলিবে। তাহার পক্ষে এইটাই হয়তো আত্মরক্ষার পথ—এই আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া লওয়া। তাই আজও সমস্ত দিন কেমন পলাইয়া আপনাকে বাঁচাইতেছে।...নিচের তলায় একটা সংক্ষিপ্ত স্বচ্ছ হাসি অর্ধপথে থামিয়া গিয়াছে, অমিতের তাহা কানে গিয়াছে মনুর সান্নিধ্যেই সে হাসি ফুটিয়াছিল, ফুটিতে পারে সহজে; কিন্তু আবার অমিতের কথা মনে পড়িতেই বুঝি তাহা আত্ম-সম্বরণ করিল...মনু শুধু সবিতার পক্ষে বাঁচিবার মতো আড়াল নয়, সবিতার পক্ষে বাঁচিবার মতো আশ্রয়ও . বাঁচিবার মতো বন্ধুও।...ওদের বাঁচা চাই।

...কি ভাবিতেছ অমিত? ব্রজেন্দ্র রায় কি বলিতেছেন শুনিতেছ কি? 'জওহরলালের আত্মজীবনী'তে দেখি তোমাদের মুখ'---অমিত একটু চমকিত হইল।

আমাদের মখ?

হাঁ, অমিত তোমাদের মুখ---তোমরা যারা আমাদের পরে এসেছ, আমাদের বংশধর—অথচ ভাগ্যচক্রে হ্যাম্‌লেটস্ অব্ দি এজ্...

অমিত চমকিত হইল। না, সে কিছুতেই ইহা মানিবে না। তাহারা হ্যামলেটের মতো জীবনসংগ্রামে ভীত ব্যাহত নয়, তাহারা আত্ম-সংগ্রামে ছিন্ন-ভিন্ন মানবাত্মা নয়; তাহারা ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনায় উদ্বুদ্ধ; কর্মের মধ্য দিয়া আপনাদের সার্থকতার পথ তাহারা আবিষ্কার করিতেছে। ইহা শুধু সত্য নয়—'হোয়াট এ পীস অব ওয়ার্ক ইজ ম্যান।' সত্য বরং 'আঃ, হাউ ম্যান মেক্‌স্ হিমসেলফ্!'

কিন্তু শুধু তাহাই কি সত্য? সর্বাংশে সত্য?..সৃষ্টি মথিত সেই হ্যামলেট আত্মার দ্বন্দ্ব-বেদনা কি অমিতের বক্ষতলে কান পাতিলে শোনা যায় না?..

অমিত আবার সচকিত হয়---ব্রজেন্দ্র রায় কি বলিতেছেন শোনে নাই। সে শুনিতে লাগিল: আমরা কেউ বড় হইনি, কিন্তু আমরা মোতিলালের কালের

মানুষ। না, তাঁকে আমরা চিনতামও না, জানতামও না। কিন্তু তেমন মানুষ আমরা অনেক দেখেছি। আশ্চর্য হয়ো না---ওসব প্রদেশে মোতিলাল বা সাপ্রু ছিলেন দুই-একজন। আমাদের বাঙলা দেশে তখন দশ-বিশজন অমন ব্যক্তিত্ব-বান সাপ্রু-মোতিলালের অসদ্ভাব হত না। আর পেতে মানসিকতায় তাঁদের সহধর্মী মানুষ শত শত। তুমি যাকে 'বিলিতী বুর্জোয়া' বলো তাদের শিক্ষাদীক্ষা আমরা গ্রহণ করতে চেয়েছিলাম। তাদের সাহিত্য, তাদের ইতিহাস, তাদের রাষ্ট্রচিন্তা, তাদের আইন-বোধ, তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতাবাদ, তাদের জাতীয় মুক্তিবাদ, তাদের গণতান্ত্রিক বিশ্বাস---এসব সুদ্ধ আমরা গড়ে উঠেছি। দ্যাখো না, এখনো রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ওদের আইন-কানুনে নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি যে সম্মান আছে এতদিন সেই নীতিকে আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখেছি। এই সভ্যনীতি আমরা পেয়েছি ইংরেজের কাছ থেকে।'---এ কথা বললে, সবিতা ও মনু তর্ক করবে, 'আমাদের বনিয়াদ ছিল, আত্মার বল ছিল ইতিহাসে তার প্রমাণ রয়েছে,---আর তাই আমরা সভ্যতার এই নীতি বিদেশীয়দের কাছ থেকে গ্রহণ করতে পেরেছি।' এ কথাটাও মিথ্যা নয়। প্রদীপ ছিল, সলতে ছিল, কিন্তু তৈল বোধহয় ফুরিয়ে এসেছিল,---অন্তত আগুন ছিল না। এই বিলিতী বুর্জোয়া নিয়ে এল সেই আগুন, একটু তৈলও মিলল। ওদের প্রদীপেই আমাদের মনের প্রদীপ জ্বলল। কিন্তু তৈল তাতে বেশি মেলে নি। আর আজ ওদের প্রদীপও নিভছে, তার কদর্য ধোঁয়ার গন্ধ আমার নাকেও আসছে। আমাদের প্রদীপও সঙ্গে সঙ্গে জ্বলতে না জ্বলতেই ধোঁয়াতে শুরু করেছে। তাই তাকাই তোমাদের দিকে---তৈল আহরণ করতে পেরেছ কি তোমরা? কি জানি, বুঝি না। বড় অস্থিরতার যুগ আজ, বড় অশান্ত, বড় আলোড়িত জটিল কাল। অনেক দেশের সভ্যতায় আগুন লেগেছে। আমরা বুঝতেই পারি না তোমাদের এ কালের মুসোলিনি-হিট্লারদের কাণ্ড। রবীন্দ্রনাথের পীড়ার কথা শুনে তাই চক্ষে ঘুম ছিল না। হঠাৎ এমনি সময়ে পেলাম জওহরলালের 'আত্মজীবনী'। মনে হল যেন আমাদের আত্মজীবনীরই পরার্ধ,---তাতে দেখলাম তোমাদের রূপ, তোমাদের মুখ, তোমাদের মন---আর আমাদের প্রতিশ্রুতির পরিণতি।

অমিত শুনিতেছিল, কিন্তু বুঝিতে পারিতেছিল না---ইহাই কি সত্য?---তাহারা কি ব্রিটিশ বুর্জোয়ার একটা ঔপনিবেশিক সংস্করণ মাত্র,---আর তাই তাহারাও পণ্ডিত জওহরলালের মতো একটা অর্ধেক হ্যামলেট-এর ভূমিকাবিলাসী অভিনেতা-মাত্র? এই কারণেই কি ব্রজেন্দ্র রায়রা অমিতদের মনে করেন হ্যামলেটস্ অব্ দি এজ? এই কারণেই কি অমিতেরও বারে বারে মনে পড়ে হ্যামলেটের উক্তি? না, তাহারা র‍্যাল্‌ফ ফক্স, কর্নফোর্ডের মতো একালের শ্রেষ্ঠ প্রেরণার বীর্যময়, বুদ্ধিময় অভীপ্সা? 'ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের' স্বয়ং-সৈনিক? হয়তো দুই-ই। আর তাই অমিত জওহরলালের কথায় লেখায় তাঁহার কাব্যবিলাসিতায় বিমুগ্ধ হয়, ---আবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে অবিশ্বাস করে; অবিশ্বাস করে তেমনি নিজেকেও।...

অমিত ব্রজেন্দ্র রায়কে বুঝাইয়া বলিতে গেল---না, তাহারা শুধু জওহরলাল নয়। আশ্চর্য বটেন পণ্ডিত জওহরলাল। কিন্তু ওইখানে তাঁহার থামিয়া গেলে চলিবে না। আরও এক ধাপ নামিয়া, আরও এক পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে স্বাধীনতার পথে সকলের সঙ্গে একত্র হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। কিন্তু দাঁড়াইতে হইবে ক্ষেতের কৃষকের পার্শ্বে, কারখানার মজুরের সঙ্গে, বঞ্চিত মানুষের সহিত একাত্ম হইয়া---যাহাদের ক্লান্ত দেহ আর শ্রান্ত দৃষ্টি দেখিয়া তাঁহার লেখায় কাব্যরস জমে, আর যাহাদের কালো দেহের, ময়লা কাপড়ের, গায়ের ঘামের গন্ধে পণ্ডিত জওহরলালের 'হ্যারোভিয়া়ন্' নাসারন্ধ্র কুঞ্চিত হইয়া যায়..

তোমরা কমিউনিস্ট অমিত, না?---কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ব্রজেন্দ্র রায় ধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন।

অমিত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। . কি বলিবে অমিত? হাঁ? কিন্তু তাহা তো সত্য নয়। তবে বলিবে কি, না? কিন্তু তাহাই কি সত্য? সে তো জানে শোষণই মানব-সমাজের প্রধান অভিশাপ। অমিত সত্য কথাই বলিল: ঠিক জানি না। তারপর বলিল, কাজের মধ্যে পরীক্ষা হলে বুঝব---কী সত্য, কী মিথ্যা, আমিই বা কী, আর কী নই।

ব্রজেন্দ্র রায়ের মনে পড়িল: কাজ ছাড়া আর কিছুকে তুমি প্রামাণ্য বলে মানো না, না অমিত? কিন্তু কাজ কি শুধু বাহ্য ঘটনা? চিন্তায় কাজ, বুদ্ধির কাজ, ভাবনার মুক্তি, রস-পরিবেশন,---এসব কি কাজ নয়, অমিত?

এবার অমিত বলিবার মতো কথা পাইল: কেন নয়? তবু একদিন ভাবতাম ---এসব অবসর-স্বপ্ন। আজ জানি---এসব সৃষ্টির সংগ্রাম। আর সৃষ্টিতেই ---জীবন ও জগতের নিগূঢ় সত্যের প্রকাশ। তা ছাড়া যা স্বপ্ন, যে কলা-কৌশল, ---আর্ট ফর্ আর্ট'স্ সেক্---তা তো বিলাস!---বড় জোর খেলা,---ভাব নিয়ে, ভাষা নিয়ে একটা ক্রস্ওয়ার্ড ক্রীড়া।

ব্রজেন্দ্র রায় অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন, হয়তো নিজের মনে কথাটা বিচার করিতেছিলেন। কিন্তু তারপর বলিলেন: আমিও তাই বলেছি---তুমি সোশ্যালিস্ট বা কমিউনিস্ট হবে। কিন্তু সবিতা-মনু মনে করে---তুমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্নে পাগল। ভারতবর্ষের বাণীমূর্তি তোমাকে পাগল করেছে, তার শিল্প, তার দর্শন তার সাধনায় তোমার মনপ্রাণ অভিষিক্ত।

নিতান্ত কি তাহারা ভুল? ভারতবর্ষ কি এখনো তোমার ধ্যান নয়?...

অমিত হাসিয়া বলিল; হয়তো সে কথা অতটা ঠিক নয়। স্বাধীনতা আমি চাই। আর, ভারতবর্ষকে একেবারে মিথ্যা বলি কি করে?

সবিতা চা ও খাবার লইয়া আসিল। আগুনের তাপে সবিতার মুখ লাল হইয়া গিয়াছে; কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম; একটু অগোছাল দুই এক গুচ্ছ চুল কপালের পাশে। আপনার অনুপস্থিতির উত্তর যেন তাহার সমস্ত রূপে, আয়োজনে-স্পষ্ট। ইহারও মধ্যে তবু মনুর সঙ্গে হাসিবার, পরিহাস করিবার সময় পাইয়াছিল।

দেরি হল। কিন্তু সন্ধ্যা হয়েছে, হিম লাগবে বাইরে, বাবা। ঘরে বসবে এবার?

ব্রজেন্দ্র রায় আপত্তি করিতে চাহিলেন, কিন্তু অমিত শুনিল না। চাকরকে লইয়া চাকা বারান্দায় সবিতা বেতের কেদারা-টীপয় সাজাইতে লাগিল।

ব্রজেন্দ্র রায় বলিলেন, কিন্তু মনু কোথায়?

সবিতা জানাইল: বসবার ঘরে। সেখানে ডাক্তার দেব এসেছেন। বিজয় নেই, তাই মনুকে বললাম, 'তুমি ডাক্তার দেবের সঙ্গে একটু গল্প করো।'

এখানে ডাকবে না ডাক্তার দেবকে?

ওখানেই ওদের চা দিয়েছি। ডাক্তার দেব আসতে চাইছেন না—তোমরাই কথা বলো, তোমাদের অনেক দিন পরে এই প্রথম দেখা হল।

ব্রজেন্দ্র রায় পরিচয় জানাইলেন—ডাক্তার দেব তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহকারী ছিলেন। পর্বে বিলাতে ছিলেন, এখন এখানে ট্রপিকাল মেডিসিন্-এ না কোথায়। বড় কাজ লইয়া আসিয়াছেন। গবর্নমেন্ট সার্ভেন্ট। অমিত বুঝিল চাক্‌রেদের মহলে রাজনৈতিক সাস্‌পেক্টদের সহিত সম্পর্ক বিপজ্জনক বিষয়। অনিল দত্ত চাকরি হারায় সুনীলের দাদা বলিয়া। তাই, যাঁহারা ব্রজেন্দ্র রায় বা রবিশঙ্কর দত্তের মতো অমিতের পরিচয় স্বীকার করিতে পারেন, তাঁহাদের ছাড়া আর কাহারও সহিত অমিতও পরিচয় স্বীকার করিবে না। ডাক্তার দেবের কথা তাই অমিত আর উল্লেখও করিতে চাহিল না। চা ও খাবার খাইতে উদ্যোগী হইল।

ব্রজেন্দ্র রায় চা পান করিতে করিতে বলিলেন: বলছিলাম না অমিত, উই রট্ অ্যাণ্ড রট্। মানুষের চিন্তা কত এগিয়ে চলেছে, আর আমরা কোথায়? হয়তো সব বুঝব না, কিন্তু শুনতে চাই সব। কি কাণ্ড করেছে রুশিয়া জানি না। কিন্তু এ কালের মানুষ তার জনশ্রুতি শুনেই পাগল হয়ে গিয়েছে।

একটা বলিবার মতো কথা পাইয়াছে অমিত। সে উৎসাহ বোধ করিল। বলিল: তা শুধু জনশ্রুতি তো নেই আর, এখন যে প্রতিশ্রুতিরও বেশি—সৃষ্টি! দ্বিতীয় 'পঞ্চবার্ষিক সংকল্পও' শেষ হতে চলেছে।

সবিতা কখন অমিতের চক্ষু হইতে আপনাকে এক কোণে সরাইয়া লইল। অমিতের তাহা একবারমাত্র চোখে পড়িল, কিন্তু কথার উৎসাহে তাহা তখনি বিস্মৃত হইল—কোথায়, সবিতা, কে জানে? এ যুগের মহাপরীক্ষার কথা ব্রজেন্দ্র রায়ের সঙ্গে আলোচনা করিতে কত আনন্দ।

পৃথিবী জুড়িয়া নানা তর্ক আজ এই সোভিয়েট ব্যবস্থা সম্পর্কে। কিন্তু সে তর্ক অনেকটা নিরসনও হইয়া যাইতেছে। আসল কথা, ইতিহাসে আবার সৃষ্টির যুগ আসিয়াছে; আর তাহা আনিয়াছে সোভিয়েট্‌স্। 'পঞ্চবার্ষিক সংকল্পকে' পরিহাস করিয়া ছাড়িয়া দিয়া, এখন মার্কিন ও জার্মান শাসকেরা পর্যন্ত উহার বিকৃত অনু-

করণ করিতে ব্যস্ত। অর্থনীতিক বিচার আজ আর সোভিয়েট ইকোনমির পথ ছাড়া বাঁচিবার অন্য পথ খুঁজিয়া পায় না। সমাজ-বিজ্ঞানের একটা নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যও পাওয়া গিয়াছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমাজ-বৈজ্ঞানিক বিয়েট্রিস ও সিডনি ওয়েবের গবেষণা নিশ্চয়ই প্রামাণ্য জিনিস। তাঁহাদের কথা ব্রজেন্দ্রবাবু নিশ্চয়ই জানেন।

ব্রজেন্দ্র রায় বলিলেন : তাই তো বলি---কিছু বুঝতে পারি না আমরা। ওয়েবদের মতো বৈজ্ঞানিকদের প্রতারণা করা সহজ নয়। আবার এদিকে দেখি ---লেনিনের সহকারী রথী-মহারথী সকলকে স্টালিন সরালেন। কেমন এ বিচার, কেমন সেই আসামীদের স্বীকারোক্তি! সব গুলিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মনে পড়ে রিভোল্যুশন ঈটস্ আপ ইটস্ চিলড্রেন।

অমিত তাহা মানিবে না। কোথায় কী প্রমাণ সে সংগ্রহ করিয়াছে, কী তফাত এই রুশ-বিপ্লবে আর অন্য বিপ্লবে, ব্রজেন্দ্র রায়কে তাহা বঝাইতে সে মাতিয়া যায়। জানেও না---সবিতা কোথায়, কোথায় মনু, কখন বিজয় আসিয়া দাঁড়ায়, সবিতাকে কী ইঙ্গিত করে, তারপরে নিচেকার ঘরে একবার চাপা হাসি শুনা যায় মনু ও বিজয়ের, আর সবিতার অস্ফুট শাসনের বাধা তাহারা মানে না। তারপব বারান্দায় একে একে ফিরিয়া আসে সবিতা, মনু আর বিজয়।

অমিত একবার থামিতেই মনু বলে; আমি এখন যাই, দাদা। মেহতাদের ওখানে ঘুরে আসি। তুমি বাড়ি যেয়ো, আটটার আগেই বরং যেয়ো---সন্ধ্যায় অধ্যাপক দত্তের স্ত্রী আসতে পারেন, আর অনুও একা রয়েছে।

ওঃ!---ব্রজেন্দ্র রায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন---তাইতো বড় অন্যায়, বাড়িতে অনু রয়েছে একা বসে---এতদিন তুমি ছিলে না, অমিত, অনু একাই থাকত। কিন্তু আজও তোমার সঙ্গে কথা বলতে না পারলে অনুর চলবে কেন? আচ্ছা কবে আসবে আবার তুমি? কাল? পরশু? বলতে ইচ্ছা করে 'প্রতিদিন'। বুঝি তা অন্যায়। তবু ভাল লাগে---আরও শুনতে চাই, আরও জানতে চাই, আরও বুঝতে চাই---

সবিতা একটু হাসিয়া বলিল : তা হলে আর রেডিওর দরকার হবে না না বাবা?

ব্রজেন্দ্র রায় হাসিয়া বলিলেন : মানুষ পেলে আর যন্ত্র দিয়ে কি কাজ? দ্যাখো, আজ খুলি নি। তবে পৃথিবীর সংবাদ আর সঙ্গীতকে যত পাই ততই পেতে চাই। জানি লাভ নেই, তবু বুঝতে চাই, অমিত, বুঝে যেতে চাই তোমাদের পৃথিবীকে।

For we must endure our going hence e'en
as our coming hither,
Ripeness is all.

অল, অল...তবু কি জানো অমিত?---তোমার বাবারই কথা---তোমার মা যখন মারা গেলেন তখন আমাদের কথা হয়েছিল। বড় সত্য কথা বললেন তোমার

বাবা, 'আমরা এ জাতি সংসারের পোকা।' মায়া-মমতা-ভরা মানুষ। পুত্র-কন্যা-আত্মীয়-স্বজন সকলকে নিয়ে জড়িয়ে না থাকলে আমরা স্বস্তি পাই না—এমনি পরিবার-তন্ত্রী জাতি। মরবার সময়েও কানে শুনতে চাই ডাক 'বাবা'! 'দাদু'! কেউ বলুক 'যেতে নাহি দিব।'—তাতেই বুঝি আমাদের রাইপনেস্—সকলকে নিয়ে জড়িয়ে থাকা।—এ শুধু তোমার বাবার কথা বা তোমার মায়ের আকাঙ্ক্ষা নয়, সকল বাবার সকল মায়ের। তাই এত প্রতীক্ষা এত প্রত্যাশা—

বিদায় লইবার জন্য অমিত দাঁড়াইয়াছিল। অন্যেরা নিচে নামিয়া গিয়াছে, তাহাদের এক-আধটি হাসির টুকরাও আবার এখানে পৌঁছিতেছে। কিন্তু অমিতের পা যেন আর উঠিতে চায় না। এ শুধু ব্রজেন্দ্র রায় নয়, শুধু সেই জীবন-জিজ্ঞাসু পরম সুহৃদ্ নয়, শুধু একটা পরিবারতন্ত্রী একান্নবর্তী জাতির সপরিচিত আকাঙ্ক্ষাও নয়; ইহার মধ্য দিয়া এই পিতৃ-সুহৃদ্ অমিতের স্বর্গীয় জননীর ব্যর্থ সাধ, তাহার জীবন্মৃত পিতার জীবনের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা, আর তাঁহার আপনার জীবনের সাক্ষ্যও অমিতের সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছেন। অমিতের নির্বাসিত যৌবনের আশা-সংশয়-মাখা স্বপ্নস্রোত আরও সংশয়ে-সমস্যায় আলোড়িত হইয়া উঠিল।...কী 'প্রতীক্ষা,' কী 'প্রত্যাশা' অমিত?...

অমিত দাঁড়াইয়াই ছিল। আবার হাসি শোনা গেল নিচে।...আর অমিত দেরি করিল না।

সিঁড়ির গোড়ায় মনু দাঁড়াইয়া সকৌতুকে কি বলিতেছে, আর তাহাতে আপত্তি প্রকাশ করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও সবিতা হাসি গোপন করিতে পারিতেছে না। অমিতকে দেখিবামাত্র সে হাসি এক মুহূর্তে সংকোচে ভয়ে ঝরিয়া গেল। মনুও একটু সংযত হইল। সত্যই অমিতকে বুঝি বড় গম্ভীর দেখাইতেছে—তাহাকে দেখিয়া সবিতার হাসি নিবিয়া যায়, যে সবিতা মনুর সম্মুখে সহজে হাসিতে পারে, তাহার শান্ত অনাবিল অস্তিত্ব মনুর চপল হাস্যের আঘাতে ঘোষিত হইয়া পড়ে অনুচ্চ মধুর হাস্যে।

অমিত বড় গম্ভীর হইয়া গিয়াছে বুঝি। হাসিয়া অমিত সবিতাকে বলিল: কি নিয়ে এত হাসি, শুনতে পাই না?

সবিতা লজ্জিত হইয়া উঠিল। তাহার দুই চক্ষু যেন অসহায়। মনু আরও কৌতুক বোধ করিল। বলিল: বলব?

শাসন ও মিনতি দুই-ই সবিতার চক্ষে। নিম্নস্বরে বলিল: না, না। ভর্ৎসনার দৃষ্টি যেন বলিল—বাজে ইয়ার্কি অমিতের সম্মুখে!

মনুর ঠোঁটে হাসি। অর্থসূচকভাবে ঘাড় নাড়িয়া সে বলিল: চলো দাদা, ভেবে দেখি। তোমরা ভয়ানক সীরিয়াস্ মানুষ—'স্বদেশী'। তোমাকে তো বাজে কথা বলা যায় না।

সবিতা ফটকে দাঁড়াইল। অমিত নমস্কার করিয়া বলিল: চলি।

সবিতা প্রতি-নমস্কার করিল। একটু পরে বলিলঃ কাল আসছেন তো? বাবা বলছিলেন না?

অমিত কথা দিতে পারে না। এখনো অন্য কাহারও সহিত দেখা করা হয় নাই।

মনু বলিল : তুমিই কাল এসো না, সবিতাদি।

আমি!—বিস্ময় কাটাইয়া হিসাব আরম্ভ হইল মনে মনে।—সম্ভব হবে কি? কখন?

মনু বলিল : যখন পার। দুপুরে? দাদার সঙ্গে আমাদেরও এখন পর্যন্ত কিছু কথা হয় নি। তুমিও তা হলে কাল দুপুরে এসো। না-ই বা পড়লে কাল দুপুরে অশ্বঘোষের অশ্বডিম্ব।

সবিতা বলিল : তোমার ইন্‌সিওরেন্‌স দালালের অশ্বমেধ আর অশ্বশিকারের কাহিনীও কিন্তু তুমি বলতে পারবে না।

হাসিল দুই জনেতে। একটু কথা কাটাকাটি করিল। অমিত সস্মিত মুখে সচেতন চক্ষে দাঁড়াইয়া তাহা উপভোগ করিতে লাগিল, উপলব্ধিও করিতে চাহিল। অমিতের সম্মুখেই সবিতার কুণ্ঠা—ভয়ে-ভক্তিতে। না হইলে সবিতাও কৌতুক পছন্দ করে, স্বচ্ছন্দ হইতে পারে, কৌতুক করে স্বচ্ছন্দ হয়।

সবিতা অবশ্য কথা দিল না, কিন্তু বোঝা গেল কাল দুপুরে সে আসিবে।

অমিত ও মনু পাশাপাশি ফুটপাতে চলিল। এ দিকের ফুটপাত হইতে মনু বালিগঞ্জের বাস ধরিবে; ওদিকের ফুটপাত হইতে অমিত বাস ধরিয়া বাড়ি যাইতে পারিবে তো? চলিতে চলিতে মনু আর পারিল না, আরম্ভ করিল :

এতক্ষণ যে মজার ব্যাপার ঘটল, দাদা, শুনবে? বিজয় থাকলে ভালো হত। কিন্তু সবিতাদিকে বোলো না। তুমি বললে বেচারীর আর লজ্জার সীমা থাকবে না। তোমরা উপরে কথা বলছিলে, বিজয়কে বাইরে পাঠিয়েছেন সবিতাদি কি কাজে। আমাকে বললেন ডাক্তার দেবকে ঠেকাতে।

ঠেকাতে?

হাঁ, তাই। শোনো মজাটা।

মজাটা দাদাকে না বলিলে মনুর চলে না—যতই সবিতা নিষেধ করুক।

'ডক্টর ডেভ' বৎসর দেড়েক পূর্বে কলিকাতা আসিয়াছেন। এই পাড়াতেই বাড়ি ভাড়া করিয়াছেন। বয়স বেশি নয়। পঁয়তাল্লিশ হইতে পারে, কিন্তু মনে করেন পঁয়ত্রিশ ছাড়ান নাই। অন্তত ছাড়ানো যায় না—যখন বৎসর দুই পূর্বে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। দুটি ছেলে তাহাদের মাতামহীর কাছে আছে শ্যাম-বাজারে, বৎসর দশ-বারো তাহাদের বয়স,—পনেরও হইতে পারে। সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ে। ব্রজেন্দ্র রায়ের সঙ্গে পুত্রের বন্ধু হিসাবে, আর দাদার বন্ধু হিসাবে সবিতার সঙ্গে, ডাক্তার দেব মাঝে মাঝে,—অর্থাৎ প্রায়ই, —দেখা করিতে আসেন। মিস্টার রায় প্রাচীন হইতেছেন; সবিতা একা তাঁহাকে দেখে,; এইরূপ স্থলে ডাক্তার হিসাবেও

ডাক্তার দেবের কর্তব্য ব্রজেন্দ্র রায়ের খোঁজ-খবর করা। অন্যেরা অবশ্য আরও বেশি জানে, সবিতাও বোঝে। বোঝে বলিয়াই সবিতা আপনার গাম্ভীর্য, আপনার দূরত্ব আরও একটু বেশি করিয়াই ঘোষণা করে। কিন্তু ডাক্তার দেবকে কর্তব্য পালন করিতে আসিতেই হয়। আজও ডাক্তার দেব সেই কর্তব্যবশেই আসিয়াছিলেন। এদিকে বিজয় বাড়ি নাই; সবিতাও অতিথিদের চায়ের আয়োজনে ব্যস্ত। পিতার সহিত অমিতের আলাপে আজ অন্য কেহ বাধা দেয়, তাহা সবিতা সহ্য করিবে না। অগত্যা মনুর উপরই বসিবার ধরে ডাক্তার দেবের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার ভার পড়িল। সবিতারই এই ব্যবস্থা। পরের বাড়িতে মনু কি করিয়া ডাক্তার দেবের আপ্যায়নের ভার গ্রহণ করে? সবিতা কিন্তু এই আপত্তি শুনিবে না। বলিল---'আমি ডাক্তার দেবকে বলে আসছি'—মনুকে নিচে লইয়া গেল।

এক কথাতেই সবিতা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল। ডাক্তার দেব বিশিষ্ট ভদ্রলোক। তৎক্ষণাৎ বলিলেন! 'নিশ্চয়, নিশ্চয়, সবিতা। আমি বসছি। না, না, মিস্টার রায় তাঁর বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করুন---ডোন্ট ডিস্টার্ব দি ওল্ড ম্যান। তাঁকে বিরক্ত করো না। হি রিকোয়ারস্ রেস্ট—এ্যাট্ হিজ্ এজ, ইউ নো।' মনুকে রাখিয়া সবিতা মৃদু হাসিয়া পালাইল।

মনু ডাক্তার দেবের একেবারে অপরিচিত নয়—'সবিতার সহপাঠী সেই ছোড়াটা'। এই বাড়িতে মনুকে আরও তিনি দেখিয়েছেন। কি করে ছোঁড়াটা? ডাক্তার দেব মনুর সহিত আলাপ শুরু করিলেন।

মনু জানাইল : ইন্সিওরেন্সের দালালি।

ইন্সিওরেন্সের দালালি!—ডাক্তার দেবের কেমন অবজ্ঞা মিশ্রিত ঔদাসীন্য জন্মিল। শেয়ার মার্কেটের দালাল হইলেও বা আগ্রহ জন্মিত, শ্রদ্ধা জন্মিত, বার্মা কর্পোরেশনের অবস্থাটা খোঁজ করা যাইত। কিন্তু ইন্সিওরেন্সের দালালি! অর্থাৎ ছোঁড়াটা আসলে 'লোফার'। আগেই তিনি তাহা বুঝিয়াছিলেন। এই বাড়িতে জুটিয়াছে। ---হুঁ, ভালো কথা নয়। তবে ভয়ের কারণও নাই।

ডাক্তার দেব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কেমন কাজ চলছে। কোন্ কোম্পানির কি হাল; মার্কেটের 'ভাও' কিরূপ। মনও সকৌতুকে দেখিতে লাগিল—কোঁকড়ানো কালো চুল সত্ত্বেও ডাক্তার দেবের মাথার পিছন দিকটায় একটা কলপহীন ধূসরতা রহিয়া গিয়াছে, অপরাহ্নের শেষ আলো ঠিক সেইখানটাতেই যেন চক্রান্ত করিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। কালো দোহারা চেহারায় সযত্নে আঁটা স্যুট, তাহার বটন হোলে সযত্নে একটি ফুল গোঁজা; স্তিমিত চক্ষে মনুর প্রতি অবজ্ঞা, কালো ঠোঁটে তাচ্ছিল্য—পায়ের উপর পা দোলাইতেছেন ডাক্তার দেব। রূপ-যৌবনে যা হউক, পরিচ্ছদে অর্থগৌরবে, যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসবান মানুষ 'ডক্টর ডেভ্'। হয়তো ছাদের উপরে অমিতের কণ্ঠও তাঁহার কানে যাইতেছিল। তাই খানিক পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মিস্টার রায়ের নিকট কে আসিয়াছেন?

মনু জানাইল : দাদা।

তোমার দাদা? মিস্টার রায়ের বন্ধুরা কেউ নন? সবিতা যে বললে 'বাবার একজন বন্ধু এসেছেন অনেক দিন পরে।' কত বয়স তোমার দাদার? বয়স্ক লোক বুঝি? মিস্টার রায়ের বন্ধু তিনি? কি করেন তোমার দাদা?

এখনো কিছু না।

কেন?

আজই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন তো।

'জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে',---চমকিয়া সিধা হইয়া বসিলেন 'ডক্টর ডেভ' গদি মোড়া কোমল আসনে। মনুর চোখে পড়িল তাহার ব্যস্ততা ও উদ্বেগ। মনু মজা পাইল। ডাক্তার দেব আগ্রহে উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর সে নিস্পৃহ ভাবে উত্তর দিতে লাগিল।

ডাক্তার দেব বলিলেন : জেলে ছিল।---তার মানে? কি করেছিল? ডেটিন্যু ছিল?—কি তার নাম?

উদ্বেগ ও ত্রাস এক সঙ্গে ডাক্তার দেবের চক্ষে ফুটিল—তার মানে যার কথা এরা এই বাড়িতে প্রায়ই বলে সেই 'অমিত'?

এরা বলেন নাকি? তা হবে।---মনু উত্তর দেয়, যেন কিছুই জানে না।

হুঁ।---একবার পিছনে হেলান দিয়া বসিলেন ডাক্তার দেব। গম্ভীর হইলেন। খানিক পরে বলিলেন : তোমার দাদা, বললে না?

আজ্ঞে।

কত বয়স বললে যেন?

ইতিপূর্বে মনু বয়সের প্রশ্নটার উত্তর দেয় নাই। এবার বলিল—অমিতের বয়স নয়, ডাক্তার দেবের কামনানুযায়ী অমিতের বয়স।

তা, পঞ্চাশ হবে বোধ হয়।

এ বয়সে তোমার দাদার এ ছেলেমানুষি কেন? ছেলে-পিলে—সে কি, বিয়ে করেন নি! কেন, বিয়ে করেন নি কেন?

...রায় সাহেব অম্বিকাচরণ সরকারের প্রশ্ন। অমিতের মনে পড়ে।

ডাক্তার দেব মনুকেও ছাড়িলেন না : তুমিও বিয়ে করো নি—না?

উত্তর পাইয়া আবার বলিলেন : তোমারও থানা-পুলিশ আছে নাকি?

কিছু তো থাকতেই পারে দাদার পরিচয়ে।

কেন?

তাই থাকে যে। ওঁদের সঙ্গে যাদের একটুমাত্র চেনাশুনা তাদেরও পুলিশ বাদ দেয় না; আমি তো ভাই।

'ডক্টর ডেভ্' টান হইয়া উঠিয়া বসিলেন : চেনাশুনা থাকলেই পুলিশ পিছনে লাগে?

লাগবে না?

এখনো লাগছে?

নিশ্চয়ই। সেই সকাল থেকেই-তো আজ বাড়ির কাছে স্পাই ঘুরছে। তাতেই তো আমরা বুঝলাম—দাদা আসবেন।

স্পাই ঘুরছে! কোথায়?

যেখানে দাদা যাবেন—সেখানে।

একেবারে পাংশু হইয়া গেল ডাক্তার দেবের মুখ—আর সেই 'ডক্টর ডেভ্' নাই। নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, এখানেও এসেছে?

আসবার কথা।—নির্বিকারভাবে মনু জানাইল।

ডাক্তার দেব দেয়ালের এদিকে ওদিকে তাকাইতে লাগিলেন। কি বলিবেন, তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে চা আসিল। আসিল বিজয়ও।

চা? এখন?—না; আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে আজ।

বিজয় বলিল: চা-টা খেয়ে নিন। দাদুর সঙ্গে দেখা করে যাবেন।

নিজের চা আনিবার নামে মনু একবার ছুটিয়া সবিতাকে গল্পটা বলিয়া আসিতে গেল।

ডাক্তার দেব চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া দাঁড়াইলেন। মুখ রাস্তার দিকে—কি যেন খুঁজিয়া দেখিতেছেন।

বিজয় বলিল: গাড়ি দেখছেন? চাবি দিয়ে এসেছেন তো?

গাড়ি? না, গাড়ি না। কিন্তু ও লোকটা দাঁড়িয়ে কেন?

তার ঠিক কি?

ডাক্তার দেব বিরক্ত হইলেন: তোমরা কিছু বোঝো না, বিজয়। আচ্ছা দ্যাখো তো,—দ্যাখো তো,—কি নাম সেই ছোঁড়াটার?—কোথায় গেল?—

মনু কাকা?—মনুজ। ডেকে দিচ্ছি।

মনু আসিয়া গিয়াছিল। বসিয়া পড়িল। ডাক্তার দেব বলিলেন: হাঁ, মনু,—তুমি দ্যাখো তো—ওই লোকটা, ওই যে দাঁড়িয়ে—দেখছো? কি করছে বলো তো?

মনু বসিয়া বসিয়াই দেখিল, একবার বিজয়ের সঙ্গে চোখাচোখি করিল; বলিল: হাঁ, হবেও বা স্পাই।

হবেও বা?—তুমি দেখতে পেয়েছ? দ্যাখো নি। না, না, উঠে এসো। এখান থেকে দ্যাখো—দেখছো?

মনুর উঠিয়া গিয়া তাকাইতে হইল। তারপর সে বলিল: হুঁ—লোকটাকে ভালো মনে হচ্ছে না।

চায়ের পেয়ালা লইয়া মনু আবার আসনে বসিল। বিজয় ততক্ষণ ব্যাপার বুঝিয়া লইয়াছে। সে এবার পুরাপুরি মজা পাইল। বলিল: চা জুড়িয়ে যাচ্ছে, ডক্টর ডেভ্।

· এ্যাঁ। চা? হাঁ—ফিরিয়া আসনে বসিলেন ডাক্তার দেব। চায়ের পেয়ালা ঠোঁটে তুলিলেন। তাঁহার দৃষ্টি বিভ্রান্ত।

বিজয় বলিল: ওটা দেখুন—মাছের চপ। এইমাত্র ছোট মাসী ভাজলেন।

ওঃ, চপ। বেশ, চমৎকার হয়েছে।—তোমার দাদা যেখানে যাবে, মনু, সেখানেই ও লোকটা যাবে?

মনু জানাইল : শুধু ও লোকটা কেন? লোক বদল হয়। আবার যেই দাদা এ বাড়ি থেকে চলে যাবেন, তখন অন্য লোক হয়তো স্পাইং করবে—এ বাড়িতে কে কে আসে-যায় দেখবে। আবার, ফিরে তাদেরও উপর স্পাই বসাবে।

গড্! আমাদেরও দেখবে?

আপনাদের ব্যাপারে তো অসুবিধা বেশি নেই। গাড়ির নম্বর নেবে, স্পাইদের রিপোর্ট মেলাবে। তারপর গবর্নমেন্ট গোপনে আপনাদের ডিপার্টমেন্টে ইনকোয়ারি করবে—

বলো কি?—আপিসেও ইনকোয়ারি হবে?

তা আর হবে না? তবে আপনি তা জানতেও পারবেন না। তেমন খারাপ কিছু হলে অবশ্য চাকরি নিয়ে গোলমাল হবে। তখন তো জানবেনই।

বলো কি?—ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেলেন ডাক্তার দেব। একটু পরে সাহস সঞ্চয় করিতে চাহিলেন : তা অত সহজ নয়,—গবর্নমেন্ট সার্বিসে গোলমাল করা।

গবর্নমেন্ট সার্বিস বলেই তো সহজ।

ভরসা নিবিয়া গেল। ডাক্তার দেব আবার দাঁড়াইয়া উঠিলেন, কি দেখিতে চাহিলেন। বলিলেন : এখন তো নেই। দ্যাখো তো, সে লোকটাকে দেখতে পাচ্ছ কি?

বিজয় বলিল : এদিকে সেদিকে ঘুরছে হয়তো।

মনু বলিল : তা ছাড়া লোকটা স্পাই নাও হতে পারে। স্পাইরা তো পা ঢাকা দিয়ে চলে,—কে স্পাই আপনি জানতে পারবেন না; চিনতেও পারবেন না।

ডাক্তার দেব বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার অসহায় বিভ্রান্ত দৃষ্টি একবার মনুর একবার বিজয়ের দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বিজয় বলিল : চা জুড়িয়ে গিয়েছে? আর এক কাপ নিয়ে আসছি।

না, না।—ডাক্তার দেব তাড়াতাড়ি আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আর তো তিনি দেরি করিতে পারেন না। একটা জরুরী কেস আছে। আচ্ছা। নিশ্চয়ই মিস্টার রায় ভালোই আছেন। আর একদিন ডাক্তার দেব তাঁহাকে দেখিবেন—

মাসীমা আসবেন এখনি, কাকাবাবু।

আসবেন?—একটু থামিলেন ডাক্তার দেব।—থাক, হয়তো কাজ করছে, দেরি হবে। আমার তাড়া আছে আজ—

কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে, আমি তাঁকে ডেকে দিচ্ছি—বিজয় ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। ডাক্তার দেব বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন,—দেরি হয়ে যাবে... থাক না হয় আজ।—টুপি হাতে লইয়া তিনি দাঁড়াইলেন। কিন্তু সবিতার সঙ্গে দেখা না করিয়া যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

সবিতা নামিয়া আসিল। বলিল : আর একটু বসবেন না?

না। বড় তাড়া আছে—জরুরী একটা কেস। তা ভালোই তো আছেন মিস্টার রায় ? বেশ, আর একদিন দেখব'খন। আজ চলি তবে ? না, না, আজ আর উপরে যাব না...

বিদায় লইতে গিয়া আজ আর দেরি হইল না ডাক্তার দেবের। বিজয় তাহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেল—নিচেকার ঘরে মনু ও সবিতা তখন হাসি চাপিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। আবার জানালা দিয়া গোপনে গোপনে দেখিতেছে ডাক্তার দেবের কাণ্ড। ডাক্তার দেব গাড়ির দিকে ভয়ে ভয়ে পা বাড়াইতেছেন—এদিক ওদিক তাকাইতেছেন। তারপর গাড়ির সামনে গিয়া গাড়ির আড়ালে দাঁড়াইলেন, হাঁফ ছাড়িয়া একবার চারিদিকে তাকাইলেন, বিজয়কে আবার বলিলেন : ও লোকটাকে দেখছ—সন্দেহজনক মনে হয় না ?

বিজয় চিন্তিতভাবেই বলিল : হাঁ, কেমন একটু ঠেকছে।

ডাক্তার দেব তাড়াতাড়ি গাড়ি খুলিয়া গাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া বসিলেন—আর তাঁহাকে লোকটা দেখিতে পাইবে না। একবার তাড়াতাড়ি গাড়ি ছাড়িয়া দিতে পারিলেই হয়। স্টার্ট দিতে দিতে তিনি বিজয়কে বলিলেন : তোমাদেরও কিন্তু সাবধান হওয়া দরকার। আর, এইসব লোকের সঙ্গে অত খাতিরে কাজ কি ? বাড়িতে ডাকতে হবে, গল্প করতে হবে—কেন ?

ছোট মাসী তা শুনবেন না। দাদুও শুনবেন না।

শোনা দরকার। তুমি বলো,—আমার নাম করেই বলো—

গাড়ি স্টার্ট লইয়াছে, একবার মুখ বাড়াইয়া ডাক্তার দেব এদিকে সেদিকে দেখিলেন—বলিলেন, কোথাও কেউ আছে নাকি দ্যাখো তো ?

দেখা যায় না। গা-ঢাকা দিয়ে আছে হয়তো।

গাড়ি লাফাইয়া ছুটিল।

কিন্তু বিজয়ের হাসি আর থামে না। হাসি কি সবিতারই কম পাইয়াছিল ? কিন্তু করে কি ? অমিতের সম্মুখে কোনোরূপ চাপল্য প্রকাশ পাইলে যে ভয়ানক অন্যায় হইবে। বারে বারে তাই সে মনুকে বিজয়কে শাসন করিতেছিল।

...সেই পৃথিবী তেমনি আছে, অমিত,—ওখানেও এখানেও। আছে যেমন খাঁ সাহেব ফতে মহম্মদ্ তেমনি আছে 'ডক্টর ভি-ভি ডেভ্'।...

মনু বলিল : দেখলে তুমি আসছ তাই সবিতাদি কেমন আরও ভয় পেয়ে গেলেন—পাছে তুমি এসব বাজে কথায় রাগ করো।

কেন, আমি কী ?

ওর ধারণা—তুমি কী নও ! বেয়াদবি হয়ে যাবে তোমার সামনে হাসলেও।... আমি এখান থেকে বাস ধরি তবে। তুমি ওপার থেকে বাস নিয়ো,—চলি।

মনু বাস ধরিল। অমিত একটু দাঁড়াইয়া দেখিল—কেমন সহজ গতিতে মনু চলিয়া গেল। আর কেমন সরস এখনো রঙ্গপরিহাসে সে। মনুর কৌতুকবোধ আছে, হয়তো সবিতারও তাহা আছে। অন্তত মনুর মতো বন্ধু-সাহচর্যে সবিতাও একেবারে তাহা গোপন করিতে পারে না। কিন্তু অমিত ?...অনেক বড় সে সবিতার

চক্ষে, অনেক উঁচু সে; অনেক মহৎ আদর্শের আসনে সে অধিষ্ঠিত।...সেখানে সবিতার হাসিবার সাধ্য নাই। সাধ্য কি সে সেখানে স্বচ্ছন্দে চলে, স্বচ্ছন্দে কথা বলে—স্বচ্ছন্দে বাঁচে? তবু মনুর সাহচর্যে তাহারও হাসি বারে বারে ঝলকিয়া উঠে,—বাঁচিবার তাগিদেই সে বাঁচিয়া উঠিতে পারে,—এ গৃহে, ও গৃহে, হয়তো কলেজে, লাইব্রেরিতে, সর্বত্র। মনুই বুঝি ওর জীবন-মুখিতার অবশিষ্ট আশ্রয়।...

রাস্তা পার হইয়া অমিত ওপারের বাস স্টপের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

'অমিত!'

অমিত চমকিয়া উঠিল—কাহার কণ্ঠ!

'অমিত!'

...অমিত, তোমার নিয়তি কি তোমার সম্মুখে!

পথচারী

এক

'অমিত !'

নিয়তি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, ইন্দ্রাণী !

ইন্দ্রাণীই। আর কেহ নয়, আর কেহ হইতে পারে না, আর কেহ হইতে পারিত না। এই ছয় বৎসরের সমস্ত সচেতন চিন্তা, সুপরিজ্ঞাত আবেগ-কল্পনা, স্বপ্ন-সাধনা—মানস-লোকের আলো-ছায়া বিচিত্রিত মায়া-মধুর রঙ্গমঞ্চের সমস্ত সেই পটাবরণ—সব বিদীর্ণ করিয়া, প্রেক্ষাগৃহের নির্বাসিত অবলুপ্ত কোণ হইতে, নটনটী প্রহরী কথাকার সকলের সমস্ত সযত্ন পরিকল্পনা এক নিমেষে উল্‌টাইয়া দিয়া,—এমন করিয়া কে আবির্ভূত হইতে পারিত আর নিয়তি ছাড়া? অমিতের জীবনে কে আর এইরূপে আবির্ভূত হইতে পারিত ইন্দ্রাণী ভিন্ন?

শ্যামশষ্পাচ্ছাদিত সুপরিচিতা পৃথিবী পায়ের তলা হইতে ঘোষণা করিল—জীবনের বহ্নিমান, কম্পমান, ঘূর্ণ্যমান আন্তর্দাহে ভূগর্ভ ফাটিয়া যাইতেছে। একমুহূর্তে একটি শব্দের বিস্ফোরণে ছয় বৎসরের বিচার উড়িয়া গেল। চোখের সম্মুখে অগ্নিগর্ভা ধরণীর কণ্ঠস্বর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে : 'অমিত!'

'ইন্দ্রাণী!'—'ইন্দ্রাণী বউদি নয়, 'ইন্দ্রা বউদি নয়, শুধু ইন্দ্রাণী।' অমিতের চক্ষু হইতে, মুখ হইতে পৃথিবীর অনন্ত বিস্ময়, অনন্ত সুখ ও অনন্ত ভীতি ঝরিয়া পড়িল—স্বতস্ফূর্ত এই সম্বোধনে। আজ অমিত নিয়তির মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছে। সাধ্য কি নিজেকে ভুলাইবে। সাধ্য কি না জানিয়া পারে নিজেকে? মন্ত্রচালিতের মতোই অমিত হাত বাড়াইয়া দিল, আর বলিল, 'ইন্দ্রাণী!'

অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত বাহু যেন অগ্রসর হইয়াই ছিল। দীর্ঘ সুকোমল করাঙ্গুলি অমিতের শীর্ণ কঠিন হাতকে এক মুহূর্তে নিজের করমধ্যে সাগ্রহে গ্রহণ করিল... কে বলে সত্য স্থির অনির্বাণ জ্যোতির্লেখা? অমিত বুঝিতেছে সত্য শুধু একটা তীব্র অপূর্ব শিহরণ—বাহুতে, বক্ষে, দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠে চৈতন্যের তটে তটে, আত্মার শিখরে শিখরে বিদ্যুৎচ্ছটা।

তোমার আশায় দাঁড়িয়ে আছি, অমিত—

'তোমার আশায়'।—শুধু 'আশায়'। এই কলিকাতা শহরে সন্ধ্যার পথ-প্রদীপের ছায়ায়, 'বাস্ স্টপের' তলায়, বাসযাত্রী পথচারীর ভিড়ের মধ্যে এমন একটা সামান্য কথায় এতখানি অসামান্যতা আছে—অমিত কি তাহা জানিত?...

অমিত তখনো শুনিতেছে : তুমি আসোই না আর, অমিত।

কোনো প্রতীক্ষার মধ্যে কি এমন সত্য থাকে? প্রত্যাশার মধ্যে থাকে এমন আশা নিরাশার কলস্বর?

অমিত বলিল—স্থির কন্ঠে বলিতে পারিল না, তাই কৌতুকের কন্ঠেই বলিল। আর যাহা বলিতে চাহিত না তাহাই আপন অজ্ঞাতে বলিয়া ফেলিল: যেখানেই বাঘের ভয় সেখানেই রাত্রি হয়।

অমিত ইহা ইন্দ্রাণীকে বলে নাই। কিন্তু এ তো ইন্দ্রাণী নয়, এ যে তাহার নিয়তি। ছয় বৎসর দেহ-মন চেতনার প্রচেষ্টায় যে নিয়তিকে অমিত জানিত সে পরাস্ত করিয়াছে, অবলুপ্ত করিয়াছে, যাহার সক্রিয় অস্তিত্ব আর তাহার জীবনে থাকিবে না বলিয়াই সে স্থির করিয়াছে,—সেই নিয়তি।

ইন্দ্রাণী চমকিত হইল, হয়তো আহতও হইল। বলিল: বাঘ আমি অমিত?—তুমি তাই পালিয়ে বেড়াচ্ছ বুঝি?

...'হোয়েন মি দে ফ্লাই, আই অ্যাম দি উইংস্'...কাহাব নিকট হইতে পলাইতেছ, অমিত, তোমার নিজের নিকট হইতে ছাড়া? সাধ্য কি, অমিত, সাধ্য কি পলাইবে? এযে তোমার নিয়তি

কৌতুকের কন্ঠে অমিত বলিল: বাঘ তুমি, না, আমি?...কিন্তু তুমি এখানে, কলকাতায়?

কেন, তাও জানতে না?—প্রশ্ন ও একটা গভীর অব্যক্ত অভিমান ইন্দ্রাণীর চক্ষে।

কি করে জানব?—অমিতের কন্ঠে সহজ নিরুপায়তার স্বীকৃতি। ইন্দ্রাণীও তাহা সহজেই মানিয়া লইল। হাত ধরিয়া বলিল: চলো।

কোথায়?—ইন্দ্রাণী পা বাড়াইতেছে, অমিতও সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়াইল।

জানার দরকার আছে?

নেই?—অমিত চলিতে লাগিল।

আমার তো দরকার হয় নি তোমার সঙ্গে চলতে। তোমার দরকার হল?

হবে না? রাত্রি নটার পূর্বে বাড়ি না পৌছলে আমার জন্য ভারতেশ্বরের রাত্রিতে ঘুম হবে না।

তা জানি। আমার মনে আছে।

কি করে জানলে?

বাড়িতে শুনলাম সব।

আমাদের বাড়ি গেছলে না কি তুমি? কখন?—আগ্রহ অমিতের স্বরে।—কেন?

ইন্দ্রাণী হাসিল। বলিল: কেন? আমার দায় বলে। নইলে তুমি ছাড়া পেয়েছ, সে খবর পেতে আমার বিকাল চারটা! আর পেতে হল অন্যের মুখে।

কার থেকে পেলে—আশ্চর্য! আমি জানি তুমি এখানে নেই।

পৃথিবীতে আছি বলেই কি আশ্চর্য হচ্ছ না?

না। সে বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তুমি আমার খবর পেলে কার থেকে?

বেশ, শুনবে এসো।

কিন্তু যাচ্ছি কোথায় ?

পি ৩৭/২/২ জি, লেক নিউ ভিয়্যু।—একটু রঙ্গ করিয়া সংখ্যাগুলি বলিল ইন্দ্রাণী।

অমিতও হাসিয়া বলিল, মোটে 'জি' ? হিজি-বিজি নয়? কিংবা একস্ বাই ওয়াই বাই জেড ?...

গেলেই তা দেখবে। বরং ততক্ষণ পথ দেখে চলো। পালিয়ে আসতে হলে যেন পথ চিনে পালিয়ে আসতে পার।

পথ হারাবারই কথা। এ কোন পাড়া কলকাতার।—অমিত সত্যই বুঝিতে পারিতেছে না।

চিনতে পারছ না ? যেখানে তোমাদের বড়লোকেরা তখন জমি কিনেছিলেন, এখন সস্তার দিন বাড়ি করছেন।

কিছুই চিনিবার উপায় নাই। একদিন এই অঞ্চলে অমিত ঘুরিয়াছে, নানা কারণে আসিয়াছে। ছিল ডোবা, ছিল নারিকেল বাগান, ঝোপ ঝাড়, এঁদো স্যাঁতসেঁতে নিচু জমি, মাঝে মাঝে হোগলা পাতার ঘর,—তখনো এখানে দরিদ্র পরিবার ও নিম্ন-বিত্ত বাঙালীরা ছেলেমেয়ে পরিবার পরিজন লইয়া বাস করিত। রাসবিহারী এভিন্যুর বাহু বিস্তারে ও লেক রোডের সর্পিল প্রসারে তখনি তাহারা অস্বস্তিবোধ করিতেছিল। আজ তাহারা নাই, সেই বাড়িঘরের চিহ্নও নাই। একটা আনকোরা নতুন শহর, নতুন পালিশ, নতুন ঐশ্বর্য ও নতুন শ্রীহীনতা অমিতের চোখকে একই কালে কৌতূহলে শাণিত ও চিন্তায় উন্মনা করিয়া তুলিল। কুঁড়ে ভাঙ্গিয়া প্রাসাদ মাথা তুলিতেই 'ট্যারেসের', 'প্লেসের' পার্শ্বে পুরাণের 'মহর্ষিরা' ও নবাবিষ্কৃত 'সর্দার-সেনাপতিরা' পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছেন। জাতীয়তা ও ইতরতা একই সঙ্গে জাঁকিয়া বসিতেছে,—যেমন জাগে বুর্জোয়ার জন্ম-লাভের সঙ্গে সঙ্গে। ইহাও অমিতের পক্ষে জানা কথা। কিন্তু একদিনকার সযত্ন-সঞ্চিত স্বপ্ন অন্য দিন যখন ধূলিসাৎ হয়, তখন তাহার বাস্তব আঘাতে মন চমকিত হয়—যাহা সত্য তাহা কি এমনি স্থূলভাবেই সত্য হইল? নিয়তির এই দুর্নিবার্য ব্যবস্থা হইতে অমিত কোথায় পলাইবে? পলাইয়া কাহাকে সে ফাঁকি দিবে?...হোয়েন মি দে ফ্লাই, আই অ্যাম দি উইংস্...

এসো—চলিতে চলিতে একটি নতুন বাড়ির আঙিনায় পা দিয়া ইন্দ্রাণী থামিল : এসো। এই সেই '৩২/২/২ জি ?'—অমিত আপনাকে গুছাইয়া লইতে চায়।

নম্বর মিলিয়ে দ্যাখো—বিশ্বাস না হলে।

মেনেই নিলাম।

দোতলা, তেতলা,—আরও ? না, আর নয়। ইন্দ্রাণী দুয়ারে করাঘাত করিল। বলিল : নাম লেখা দেখছ। এই আমার 'ফ্ল্যাট'।

ফ্ল্যাট!—এক মুহূর্তে অমিত যেন ভাবিবার মতো একটা কথা পাইল। ফ্ল্যাট। অহা হইলে বাঙালীর জীবনে নতুন হাওয়া লাগিয়াছে। আগেই লাগিয়াছিল। আর 'বাড়ি' থাকিবে না, থাকিবে ফ্ল্যাট, হোটেল। অর্থাৎ 'বারোয়ারিতলা';—তখন দুঃখ করিয়া অমিতের পিতা ও ব্রজেন্দ্রবাবু বলিতেন। এখন তাহা বলিবে হয়তো

সবিতা। কিন্তু ইন্দ্রাণী? ইতিমধ্যেই সে গ্রহণ করিয়াছে এই নতুন সত্যকে, হয়তো অভিনন্দনই করিয়াছে। ইন্দ্রাণী নতুনকে চায়, গ্রহণ করে। মনের বলে দুর্বার শক্তিতে গ্রহণ করে সে নতুনকে।—দুয়ারে আঘাত করিতে হইল—কলিং বেল নাই কলিকাতার ফ্ল্যাটে। হয়তো গ্যাসও থাকিবে না। —সেই পঞ্চাশটি পরিবারের পঞ্চাশবারে ধরানো পঞ্চাশটি কয়লার উনুন সকাল হইতে রাত্রি দুপুর পর্যন্ত প্রত্যেক বাসিন্দাকে বারে বারে অতিষ্ঠ করিবে। না, 'বারোয়ারিতলার' পুরাতন কর্তব্যবোধও এক্ষেত্রে আর পাওয়া যাইবে না। পরস্পরের পরিত্যক্ত আবর্জনায় এখানে ইহারা পরস্পরকে মারিবে। কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েডের বারোয়ারিতলা হইয়া উঠিবে এই বাড়িগুলি। ...অমিত আপনাকে আশ্বস্ত করিয়া লইতে লাগিল—এই বেতালা প্ল্যানহীন বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রার ইহাই নিয়ম, ইহাই দণ্ড। ইহাই কলিকাতার নিয়তি।...

দ্বার খুলিতেই কাঠের পার্টিশানে ঘেরা ছোট একটি ঘরে ইন্দ্রাণী দাঁড়াইল। বাহিরের লোকের বসিবার ঘর হয়তো। ছোট একটি টেবিল, খানকয় কেদারা রহিয়াছে, আর কিছু ছবির বই, সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র। পার্শ্বের ঘষা কাঁচের দুয়ারের হাতল ঘুরাইয়া ইন্দ্রাণী বলিল : এসো।

অমিত দেখিল, সামনে ছাদে-ঢাকা ছোট আঙিনা। সেখানকার টেবিল-চেয়ারে একটি এগারো-বারো বৎসরের ছেলেকে মাস্টার পড়াইতেছেন বুঝি।

'মা'—ছেলেটি ছুটিয়া আসিল। দুই হাতে ইন্দ্রাণীকে জড়াইয়া ধরিল।

'এতক্ষণেও আসছ না'—অভিমান অভিযোগ বালকের কণ্ঠে মায়ের বিরুদ্ধে। অমিত! সত্যের দক্ষিণ মুখ দেখিতে পাইতেছ...স্নেহ-সুন্দর ইন্দ্রাণী বালকের কপোল চুম্বন করিতেছে; বলিতেছে : দ্যাখো, কাকে নিয়ে এসেছি। বলো তো কে?

ছেলেটি একটু দূরে দাঁড়াইয়া অমিতকে ভালো করিয়া দেখিতে লাগিল। পরে ইন্দ্রাণীর গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, বলব?

আশ্চর্য সুন্দর মুখ! যে কোনো শিশুর, যে কোনো বালকের মুখই অমিত আজ তৃষিত নেত্রে না দেখিয়া পারে না। কত বছর এত কাছে এমন করিয়া কোনো বালকের মুখ সে দেখে নাই। তাহার দুই চোখে আপনা হইতেই মাধুর্য জমিয়া উঠিতেছে—এই ইন্দ্রাণীর সেই শিশুপুত্র। ইন্দ্রাণীর বিদ্রোহী-সত্তার কবচকুণ্ডল।

ইন্দ্রাণী বলিল : বলো তো কে?

নিম্নস্বরে ছেলেটি বলিল : জেল থেকে এলেন না?—বলিয়া অনভ্যস্ত হস্তে অমিতকে প্রণাম করিল। অমিতের বাক্‌স্ফূর্তি হইল না—তাহাকে চিনিল কি করিয়া! দুই হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়া তাহার ললাট চুম্বন করিল। এক নিমেষের মধ্যে অমিত বুঝিল, ইন্দ্রাণী সত্যের সুদৃঢ় আশ্রয় পাইয়াছে। পৃথিবীতে তাহার পা আর পিছলাইয়া যাইবে না, ভূমিকম্পে ধ্বসিয়া যাইবে না তাহার জীবন, অমিতকেও আর গ্রাস করিবে না নিয়তি।...নিয়তি, অলঙ্ঘ্য নিয়তি, সংসারের নিয়মে তুমিও আবদ্ধ।

চিনলে?—প্রশ্ন করিল ইন্দ্রাণী।

অমিত বলিল : না চেনাই অসম্ভব।

ইন্দ্রাণী বুঝিল। ছেলেকে বলিল, আরও একটু পড়োগে, মানু। তারপর ছুটি। এখনই চলে যেতে হবে কিনা অমিতের। আমরা ততক্ষণ একটু কথা বলি।

একপ্রান্তে একটি ঘরের দিকে চলিল ইন্দ্রাণী—একখানি ঘর ছাড়াইয়া। প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, কি নাম রেখেছি ওর, জানো?—নিজেই সগর্বে বলিল, মানব।

অমিত বুঝিল, কিন্তু সকৌতুকে বলিল : নামের কিন্তু অর্থ থাকে না।

থাকে—যে রাখে তার কাছে। আর তাই যার নাম তার কাছে। বিশ্বাস না করলে জিজ্ঞাসা করো অমিতকে।—সুন্দর কটাক্ষে পিছনে তাকাইয়া ইন্দ্রাণী বলিল।

নামের অর্থ তো দূরের কথা, নিজেরই কোনো অর্থ সেই অমিত পায় না।—দুষ্টু হাসি হাসিয়া অমিত বলে।

পায়। পায় বলেই সে 'অমিত'—এবং 'অমিতাভ'। তাই সে 'মিতা' নয়—রবীন্দ্রনাথের মন্ত্রণাসত্ত্বেও।—ইন্দ্রাণীর কন্ঠে এবার প্রচ্ছন্ন বিষাদের সুর। সে শুধুই 'অমি'। কবির প্ররোচনা সত্ত্বেও কেউ তাকে বলবে না 'মিতা'।—অমিতের কন্ঠ পরিহাস স্বচ্ছ।

তাই? তাই বুঝি কখন থেকে দাঁড়িয়ে ছিলাম 'বাস স্টপে'?—আসোই না আর।

অমিতের মনে পড়িল, বলিল : আচ্ছা, কি করে বুঝলে ওই বাসস্টপে আমাকে এখন পাবে?

না বুঝলে চলে না বলে।—বিষণ্ণ মধুর হাস্য ইন্দ্রাণীর। কিন্তু উত্তরের অবকাশ না দিয়াই আবার বলিল,—বসো, আসছি।

আঙিনার অন্য দিকে ইন্দ্রাণী সম্ভবত চায়ের জল চাপাইয়া দিতে গেল।...না, গ্যাস নাই। ঘরবাড়ি গিয়াছে, ফ্ল্যাটের জীবন আসিতেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের যেটুকু দান, হতভাগ্য 'ঔপনিবেশিক' দেশের চাপা-পড়া সমাজ তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না।...ঘরের বিলাসবাহুল্যহীন পরিচ্ছন্ন উপকরণের দিকে তাকাইয়াও যেন অমিত তাহা এই পর্যন্ত দেখিতে পায় নাই। ইন্দ্রাণী নতুনকে চায়। নতুন কালকে সংবর্ধনা করিতে চাহিলেই কি সংবর্ধনা করিতে পারিবে তুমি? ...গ্যাস নাই, সেই কয়লার উনুন ও ঝুল লইয়াই তোমাকে চলিতে হইবে।

ইন্দ্রাণী ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল : বিকালে মিনতি এসে বললে প্রথম।...

অমিত শুনিল, মিনতির ছাত্রী এক জেল-কর্মচারীর কন্যা। সেই তাহার মিনতিদিকে জানাইয়াছে, অমিতবাবু আজ ছাড়া পাইবেন। স্কুল সারিয়া মিনতি আজ বিকালের 'টিউশনি'তে যায় নাই। বিকালের আগে ইন্দ্রাণীদিকেও সে পাইত না। স্কুল হইতেই মিনতি ইন্দ্রাণীর কর্মস্থলে ছুটিল। সরাসরি তাহারা দুইজনে অমিতের বাড়ি যায়। জানিত সে বাড়িতে কেহই তাহাদের স্বাগত করিবে না। কিন্তু সেই অনাদর ইন্দ্রাণী গায়ে মাখিবে না। আর, ইন্দ্রাণীদি যদি সঙ্গে থাকে তবে তাহা স্পর্শ করিবে না মিনতিকে। অনাদর কিন্তু তাহারা লাভ করে নাই। অবশ্য আপ্যায়নও বেশি হয় নাই। দাদার পর্বত-প্রমাণ বইপত্র লইয়া অনু ব্যস্ত ছিল। সে-ই জানায়,

ব্রজেন্দ্র রায় অমিতকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন ; এবং 'সবিতাদি' আসিয়া দাদাকে তাঁহাদের বাড়িতে লইয়া গিয়াছেন। সবিতার সঙ্গে যে ইন্দ্রাণীর পরিচয় না আছে তাহা নয়। অনাহূত যাইবার মতো সাহসও ইন্দ্রাণীর আছে। সেই শিক্ষিত শান্তশিষ্ট মেয়ের ভদ্রতার কঠিন অস্বীকৃতিও তাহাকে ঠেকাইতে পারিত না। ইন্দ্রাণী তবু ব্রজেন্দ্র রায়ের গৃহে গেল না। অমিতের চায়ের আলাপে বাধা দিবে না বলিয়া মিনতি স্বগৃহে চলিয়া গেল। কাল সকাল সকাল বাহির হইয়া 'অমিতদার' সঙ্গে প্রথমেই সে দেখা করিবে, না করিলে চলিবে কি করিয়া মিনতির ? মিনতির চলিবে না, কিন্তু ইন্দ্রাণীর চলিবে। কারণ, তাহার দেখা করিতে হইবে আজই, এই সন্ধ্যায়, নটার পূর্বে—এই 'বাস স্টপে'—না পাইলে অমিতের বাড়ির রাস্তার মোড়ে। সেখানে না পাইলে অমিতের বাড়িতে।—নিশীথ রাত্রির দেয়াল টপকাইয়া, দুয়ার ভাঙিয়া, অমিতের আজিকার এমন রাত্রির স্বচ্ছন্দ নিদ্রা কাড়িয়া লইয়া—

স্ফুরিত অধরের হাসির সঙ্গে আয়তদীর্ঘচক্ষের সেই দীপ্তি।—এই হাসি, এই দীপ্তি অমিত কতবার দেখিয়াছে, জানিয়াছে তাহার অর্থ—আপনার গৌরবে গর্বে সাহসে সত্যে অপরাজেয়, অপরাজেয় সেই ইন্দ্রাণী। প্রশস্ত ললাটে সেই ঔজ্জ্বল্য, জোড়া ভ্রূ তেমনি সুকৃষ্ণ, নাসিকাতটাগ্র তেমনি স্পন্দমান। যৌবনের মধ্যাহ্ন আর নাই ; কিন্তু জীবনের মধ্যাহ্ন বুঝি ইন্দ্রাণীর চিরন্তন,—আর চক্ষুর এই অপূর্ব কমনীয়তা।

তবু দেখা করতে, না ?—অমিত সকৌতুকে বলিল।

নিশ্চয়। একদিন দেখা না করে ভুল করেছি, আবার সে ভুল কবি আমি ?

ছয় বৎসর পূর্বে সেদিন ইন্দ্রাণী বাবে বারে অমিতকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিল শঙ্কিত, ব্যাকুল, উৎকণ্ঠিত প্রাণ লইয়া। কেমন করিয়া সে বুঝিয়াছিল ?—যেমন করিয়া বুঝে—মানুষের বুদ্ধি নয়—মানুষের প্রাণ, তেমন করিয়াই বুঝিয়াছিল,—সেদিন অপরাহ্ণে যে ঘটনা ঘটিয়াছে অমিত তাহার পরে আর নিরাপদ নয়। অমিতকে কোথাও না পাইয়া রাত্রিতে ইন্দ্রাণী সেদিন আপন গৃহে ক্লান্ত দেহে ফিরিয়া যায়। ভাবিয়াছিল—অমিত হয়তো সে ঘটনার পরে সাময়িকভাবে আত্ম-গোপন করিতেছে, ইন্দ্রাণীই তাহাকে অন্বেষণ করিয়া বিপন্ন করিয়া ফেলিবে। সে আর বসিয়া রহিল না অমিতের গৃহে, অমিতের অপেক্ষায়—তাহার পিতার উদ্বিগ্ন দৃষ্টি ও মাতার ব্যাকুল জিজ্ঞাসার সম্মুখে মুখোমুখি। এক-একটি পলকই যে তাহাতে মনে হয় এক-এক যুগ। তারপর—ভোরের আলো দিনের আকাশে জাগিল, প্রভাত মধ্যাহ্নে পৌঁছিল। কর্মচঞ্চল জীবনের মধ্যেও ইন্দ্রাণী তবু যেন এক অস্থিরতায় ব্যাকুল। অপরাহ্ণে কিন্তু ইন্দ্রাণী আর পারিল না, অমিতের কর্মস্থলে সংবাদপত্র আপিসে ফোন্ করিবে—অমিতের খোঁজ পাওয়া যাইবে নাকি ? খোঁজ মিলিল : অমিত তাহাদের দৃষ্টি-সীমানার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। রাত্রি-শেষেই পুলিশ তাহার গৃহে হানা দিয়াছিল আর ভোরের আলো না জাগিতেই অমিত পৌঁছিয়া গিয়াছে তাহাদের দৈত্যপুরীতে। তবু ইন্দ্রাণী এই দুর্বার সত্য মানিয়া লয় নাই—অমিত তাহার দৃষ্টিরও বাহিরে।

মানি নি, এ কথা চূড়ান্ত—বলিতে বলিতে ঘোষণা করিল সেই এক জোড়া চক্ষু।

জোড়া ভ্রূর নিচে সেই চক্ষু দুইটি বড় হইয়া উঠিল এখনো বলিতে বলিতে—থানায় গিয়েছিলাম সেদিন তখ্খুনি। গোয়েন্দা আপিসে ধরণা দিয়েছিলাম—তোমার মায়ের নাম করে। কোনো খোঁজই পেলাম না। কিন্তু মেনে নেব না তা, যখন সংকল্প করেছি তখন আমিই কি পরাজয় মানব?

ইন্দ্রাণী খুঁজিয়া লইল অমিতের বন্ধুদের—খুঁজিলে খোঁজ পাওয়া যায়ই। আর তারপর?—

এই তোমাকে নিয়ে এলাম তোমার অনিচ্ছায়ও পথে গ্রেপ্তার করে।

আমার অনিচ্ছায়?—প্রশ্ন করিল অমিত হাসিয়া।

ইচ্ছায়?—হাসি উত্তর দিল হাসির।—ছ-বছর এক ছত্র চিঠিও লিখতে পারতে না, অমিত, ইচ্ছা থাকলে?—ভ্রূভঙ্গে কথাটা সমাপ্ত করিয়া আবার ইন্দ্রাণী উঠিয়া পড়িল। —এখনি আসছি, জল হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ।

অমিত জানে, অনেকের মতোই ইন্দ্রাণীও পরে একদিন চলিয়া যায় কারাভ্যন্তরে। আবার বৎসর দুই তিন পরে একদিন বাহির হইয়াও সে আসিল—হয়তো মিনতির সঙ্গে, কিংবা তাহার একটু পূর্বে বা পরে। এই সব সংবাদ যে ইন্দ্রাণী অমিতকে না দিতে চাহিয়াছে তাহা নয়; অবশ্য সেন্সরের হাত ছাড়াইয়া তাহা অমিতের নিকট পৌঁছিত না। তাহা অমিত জানে। গোয়েন্দা-চক্রের প্রশ্ন সূত্রেই অর্মিত বুঝিয়া লইয়াছে—কোথায়, কে তাহাকে এখনো ভুলিতে পারে নাই, আর গোয়েন্দা-দৃষ্টিও তাই তাহাদের ভুলিতে চাহে না। এই দৃষ্টির ফলে সুরোকে থামিতে হইল—স্বামী ও শ্বশুরের শঙ্কিত পীড়াপীড়িতে। কিন্তু ইন্দ্রাণী থামিল না—কারাগৃহের অন্তরালেও সে চাপা পড়িবে না। সেই খবরের নানা টুকরা নানা সূত্রে নানা মুখে ঘুরিয়া অমিতের নিকটে আসিত। নিরাসক্তভাবে অমিত ইন্দ্রাণীর খবর শুনিত। খবর সে ভুলিত না, তবু সে ভুলিতে চায় ইন্দ্রাণীকে। নির্জন কারা-কক্ষের অর্ধচেতন দিনরাত্রির শেষে অমিত ইন্দ্রাণীকে ভুলিবেই স্থির করিয়াছিল। আর স্থির যখন করিয়াছে অমিত, তখন সাধ্য কি নড়চড় হয়? অমিত ইন্দ্রাণীকে ভুলিয়া গেল—সত্যই ভুলিয়া গেল। ইহাতে ভুল নাই, অমিত ভুলিতে চাহিল ইন্দ্রাণীকে। তবু জানিত ইন্দ্রাণীর সংবাদ—জেলখানা ফেরৎ অনেকের মতো ইন্দ্রাণীও লেখাপড়া করিয়াছে, এই বয়সে পরীক্ষা দিয়াছে, পাশ করিয়াছে—কথাটা সকলেরই জানিবার মতো, মনে রাখিবার মতো অমিতের। যখন ইন্দ্রাণী মুক্তি পায়—তাহার পুত্র তখন সঙ্কটাপন্ন রোগে পীড়িত, শ্বশুর শেষ শয্যায়। পত্নীত্যাগী স্বামী ফিরিয়া আসে, পত্নী-পুত্রের উপর অধিকারও দাবী করে; কিন্তু ইন্দ্রাণী অস্বীকার করে—অমিত সব শুনিয়াছে। তারপর?—শ্বশুর যথানিয়মে মারা গিয়াছেন; স্বামী যথাপূর্ব ফিরিয়া গিয়াছেন রেঙ্গুনে না সিঙ্গাপুরে; ইন্দ্রাণী সপুত্র কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে; আপনার সংকল্প, না, সম্পত্তির জোরে দিল্লী না জামশেদপুরে ইন্দ্রাণী চলিয়া গেল—আর তাহা অমিত জানে না। ইন্দ্রাণীকে অমিত ভুলিয়া গিয়াছে, আর এই দুই বৎসর তাহার সংবাদ শোনে নাই। শুনিতে চাহে নাই; অনেক অনেক কারণে তাহাকে ভুলিতে চাহিয়াছে…।

—দিল্লী গিয়েছিলাম নার্সিং পড়তে। সার্টিফিকেট পেয়েছিও।—ইন্দ্রাণী জানায়।

নার্সিং?—সচকিত হয় অমিত।

হাঁ। কি, অমিত নাক সিঁটকাতে ইচ্ছা করছে? করবেই তো। আশ্চর্য আর কি? তুমি তো দেখো নি, আমাকে যে দেখতে হয়েছে। সইতে হয়েছে এই অবজ্ঞা ও অপমান—তোমাদের পদস্থ ভদ্রলোকের চক্ষু থেকে, আর বাক্য থেকে:—'নার্স'। কিন্তু কেন নার্স হলাম? মুক্তি যখন পেলাম তখন খোকা প্রায় মৃত্যুমুখে টাইফয়েডে। তখন যা করবার ছিল তা নার্সিং। তারও প্রধান পর্ব তখন শেষ হয়ে গিয়েছে,—ভাগ্যক্রমে চলছে তখন সংকট-শেষের আরোগ্য-পর্ব! সেবা-শুশ্রূষা চিরদিনই জানতাম, অমিত। কিন্তু সে-জানা দেখলাম প্রয়োজনের তুলনায় অসম্পূর্ণ। আর খোকার রোগশীর্ণ চক্ষুর সেই নীরব মিনতির দিকে তাকিয়ে বুঝলাম—আমি অসম্পূর্ণ, বড় অসম্পূর্ণ আমি, অমিত। তাই একটি প্রতিজ্ঞাও গ্রহণ করলাম মনে মনে। আর যার কাছে বসে আমি এই শেষ পর্বের সংকল্প নিলাম, আর নিতে নিতে শুনলাম তার জীবন—হয়তো সে জানলও না, অমিত, সে আমাকে তোমার মতোই পথ দেখাল। তোমার থেকেও আমাকে সে স্বাধীনতার—স্বাধীন জীবিকার পথে এগিয়ে যাবার প্রেরণা বেশি দিল। তোমার মতোই সত্য সে আমার জীবনে। অথচ সে আর তুমি পৃথক জগতের মানুষ দুজনা। সাধারণ সামান্য মানুষ সে—অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে। তার স্বামী ছিল, এখনো আছে—কাকে না কাকে নিয়ে। আর সে আছে তার পুত্রকে নিয়ে। খুব সতী সাধ্বী সেও নয় তা বলে। কিন্তু এও সে জানে—সে মা। আর জানে নিজের নারীত্বের মর্যাদা। আত্মনির্ভরশীল নির্ভীক মানুষ সে; লেখাপড়া শিখিয়ে ছেলেকে মানুষ করবে। এই স্বাধীন মানুষের রূপ কি ইতিপূর্বে আমি দেখেছি?—স্বাধীনতার জন্য তো মাথা খুঁড়েছি আমরা—ভাবতে পেরেছি কি স্বাধীন মেয়ে-মানুষের রূপ? জেলে বসে বসে পড়েছিলাম 'দি সোল এন্‌চ্যান্টেড'। ভাষাজ্ঞান বেশি নেই, কিন্তু ভাব অনুভব করতে পারি, তা জানি। পড়েছিলাম 'এ্যানেৎ সিল্‌ভি' থেকে 'মাতা পুত্র' পর্যন্ত। নিজেকে ভুল করবার আর পথ রইল না। হাঁ, অমিত আমি নিজেকে দেখলাম বই-এর মধ্যে। আর বেরিয়ে এসে দেখলাম আমার সেই পড়া-সত্যের আরও স্বাক্ষর—সামান্য এক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নার্স, সম্ভবত সে নিজেকে নিজেও চেনে না। জেলে দেখেছি—আমার মতো অতি-সচেতন শিক্ষিতা রাজনৈতিক 'মহিলাদের' দেশোদ্ধারিণী নাম-কীর্তি নিয়ে আমরা কত যত্নে 'অর্ডিনারিদের' ছোঁয়া বাঁচিয়ে আপনাদের 'পোলিটিক্যাল' পবিত্রতা বাঁচাতাম। সেই 'মহিলাদের' মধ্যে তো অকুণ্ঠ মেয়ে-জীবনের এমন সহজ সমস্যা-বোধ দেখিনি। আর এমন স্বাধীনতারও জীবন্ত উপলব্ধি দেখিনি। আমরা পদস্থ পরিবারের কন্যা-বধূ—হয়তো বা পদবীস্থ পরিবারের। জীবিকার্জন আমাদের নিকট একটা অবান্তর প্রশ্ন, অথবা লজ্জাজনক দুর্ভাগ্য। তাই তোমাদের নতুন শাস্ত্র বুঝলাম যা জেলেও বুঝি নি—জীবিকার স্বাধীনতা না পেলে জীবনেও স্বাধীনতা রূপ গ্রহণ করতে পারে না। এই অর্থশাস্ত্র

মানলাম, বুঝলাম এই আমার জীবন-শাস্ত্র। তারপর দিল্লীতে ছুটলাম নার্সের ট্রেনিং নিতে।

ডাক্তারিও পড়তে পারতে—তুমি তো আই-এ পাশ করেছ।

পারতাম। তোমরাও তা হলে আমার জন্য কম লজ্জা বোধ করতে। অবশ্য 'লেডি ডাক্তার'ও তোমাদের চক্ষে এখনো কতটা শ্রদ্ধার, তাও আমি জানি। তবু 'নার্স'—না, সে প্রায়...হাত তুলছ? তোমার শালীনতা বোধ নষ্ট হবে আমার মুখের স্থূল শব্দটায়। হাসছ? যেন মিথ্যা কথা। কিন্তু নার্সিংই পড়লাম। কেন জানো? আমার বয়স হয়েছে,—চোখ মেলে দেখছ কি? হাঁ, আমার বয়স হয়েছে। এদেশের কোনো মেডিকেল স্কুলে কলেজে এমন ধাড়ী ছাত্রীর স্থান নেই। আমারও অত টাকা নেই নিজের পড়ার খরচ করি যা ছেলের পড়ার জন্য তার বাপ দিয়েছে। তাই নার্স হলাম। এখানে এসেছি ক'মাস আগে—একটা হাসপাতালের কাজ পেয়ে। চাকরিই নিয়েছি, খোকাকে ফেলে যেতে হয়, তাই বাইরে 'কলে' যেতে চাই না বিশেষ।

আবার ইন্দ্রাণী উঠিল। তাহার অপ্রচুর গৃহশয্যার দিকে এবার অমিত ভালো করিয়া তাকাইল। ইন্দ্রাণী আজন্ম স্বাচ্ছন্দ্যে অভ্যস্তা। স্বাচ্ছন্দ্য কেন, ঐশ্বর্য না হইলে তাহার চলে না। সকলের পক্ষে যাহা বাহুল্য ইন্দ্রাণীর পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক। অপরিমেয়তার মধ্যে ছাড়া সে আপনাকে প্রকাশ করিতেই পারে না। সকলকে দিয়া-থুইয়া, খাওয়াইয়া-পরাইয়া দুই হাতে বিলাইয়া দিয়া আপন হৃদয়-প্রাবল্যের প্রকাশ করিতে না পারিলে সে শান্তি পায় না। সেই ঐশ্বর্যের পথে আপনাকে মেলিয়া দিতে না পারিলে ইন্দ্রাণী শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়া যাইবে। ঐশ্বর্য তাহার চাই—আপনার ভোগতৃপ্তির জন্য নয়; ঐশ্বর্যই ইন্দ্রাণীর সত্তার স্বাভাবিক রূপ, তাহার আত্মার আশ্রয় বলিয়া। কি করিয়া সেই ইন্দ্রাণী এই সাধারণ, বাহুল্যহীন কঠিন জীবনে আপনাকে পোষণ করিবে? কি প্রয়োজন ছিল তাহার—স্বামী ও শ্বশুরকুলের সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে পরিত্যাগ করিবার? শুধু উন্মাদ আত্মঘোষণা—আত্মস্বাতন্ত্র্যকামীর? বক্র বিদ্রোহ সমাজ নিষ্পিষ্ট বিদ্রোহিণীর?—না, দৃপ্ত দারিদ্র্য-গর্ব-দর্পিতা নারীর?— হয়তো সবই। কিন্তু যাহাই হউক—কঠিন জীবনসংগ্রামে ইন্দ্রাণী সেই সুস্থ, জীবনছন্দ আর ফিরিয়া পাইবে কি?

ডিশে আসিল ডিমের তপ্ত পোচ্, আর পেয়ালায় চা। এমন সামান্য আয়োজন লইয়া আসিতে হইলে ইন্দ্রাণী আগেকার দিনে লজ্জায়, ক্ষোভে আত্মধিক্কারে মরিয়া যাইত।—শুধু ডিমের পোচ্, আর চা—অমিতের জন্য! কিন্তু আগেকার মতোই সেবা-সুন্দর হাতে তাহা অমিতের সম্মুখে ছোট টীপয়ে রাখিয়া ইন্দ্রাণী বলিল: পরের হাতের খাবার তোমাকে আজ খাওয়াতে পারব না অমিত। তোমার জন্য তৈরি করব কিছু আপন হাতে তাও হল না—সাধ ছিল, কিন্তু সাধ্য কি? তোমার সময় নেই যে। কিন্তু অমিত, তোমার এই 'আসা' তুমিও মঞ্জুর করো না,—আমি তো মঞ্জুর করিই না। কারণ আসলে তুমি আসো নি—দায়ে পড়ে এসেছ।

দায়ে পড়ে এসেছি?—এক পেয়ালা চা খাইয়া অমিত বলিল: দায়ে পড়ে বরং

আসতাম না, বউদি।—অমিতের চোখে পুরাতন দিনের মতো রঙ্গময় কৌতুক আসিতে গিয়াও সাবধান হইল।

'ইন্দ্রাণী' নয়, পুরনো ডাক 'বউদি'।

ইন্দ্রাণী ঈষৎ গম্ভীর হইল সম্বোধনে। অমিতের চোখের হাসিতে সাড়া না দিয়া বলিল : সম্বোধনটা সংশোধন করে নিলে, না?

অমিত বুঝিল। হাসিয়া সহজ করিবার জন্য বলিল : দায়ে পড়ে।

ইন্দ্রাণী হাসিল না। বলিল দায়ে পড়ে মিথ্যার শরণ নিলে—না?

একটু একটু করিয়া অমিতও পরিহাস-আবরণ ছাড়িয়া ফেলিতে লাগিল : না, বউদি, মিথ্যা বলে মিথ্যার শরণ নিতে চাই না। কিন্তু মিথ্যাকে মিথ্যা হয়ে যেতে দোব না, সত্য করে তুলব, এই ঠিক করেছিলাম।

তারপর?

শুনতে চাও? প্রয়োজন আছে?—আজ এক মুহূর্তে এই কলকাতা শহরের পথের উপর—সহস্র লোকের ভ্রূক্ষেপহীন ভিড়ের মধ্যে—দেখলাম—আমার নিয়তি।

নিয়তি?—দীপ্তি নাই, কৌতুক নাই, কৌতূহলও নাই—ইন্দ্রাণীর দুই আয়ত-নেত্রের মধ্যে অতলস্পর্শী গভীরতা। হয়তো আত্ম-জিজ্ঞাসা।

অমিত আপনার স্থির দৃষ্টি সেই দুই চক্ষের উপরে স্থাপিত করিয়া শান্ত স্থির বিষাদে কহিল : হাঁ, দেখলাম আমার নিয়তি। একটি শব্দ হয়ে, একটি আহ্বান হয়ে প্রথম সে জেগে উঠল—যেন আমার বুকের তলা থেকে জেগে উঠল ঘুমন্ত স্মৃতি—তারপর সে সম্মুখে দাঁড়াল—মথিত সমুদ্রের উপরে সেই সমুদ্রোত্থিতা দেবীর মতো। আট বৎসর পূর্বে যে কণ্ঠ শুনে, যে মূর্তি দেখে আমি শিহরিত হয়ে উঠেছিলাম পুরীর ঢেউ-ভাঙা সমুদ্র-সীমান্তে নিমজ্জমান কণ্ঠের প্রার্থনা আর জাগিয়ে ধরা আমার স্খলিত কম্পমান আত্মসমর্পণের সম্ভাষণ—তারপর ফিরে গিয়েছিলে তুমি দুর্বার প্রয়াসে নিজেকে সংহত করে, সংবৃত করে নিয়ে তোমার সিক্ত বেশবাস,—আজ পথের উপরে শুনলাম সেই ডাক; 'অমিত'—মুখোমুখি দেখলাম সেই মূর্তি। নিয়তি ছাড়া আর কি নাম দোব, বলো?

ইন্দ্রাণী অবনতশিরে বসিয়া আছে, দৃষ্টি মেঝেয় নিবদ্ধ, চোখ দেখা যায় না। দেখা যায় অর্ধাবগুণ্ঠিত সীমন্ত-চিহ্নিত ঘন কেশরাশি, একটি আনত মস্তকের রেখা, নারীদেহের বঙ্কিম বিন্যাস। হয়তো ছাদের বাতাসে তাহার বসন কাঁপিতেছে; হয়তো বা বুকের ভিতরেও বহিতেছে কোনো ঝড়; কাঁপিতেছে সেই ছন্দিত নারী দেহ।... চুলে পাক ধরিয়াছে তাহারও তোমারও, অমিত। মাথার চুলও পাতলা হইয়া আসিতেছে—তোমারও তাহারও। এই প্রাণোদ্বেল দেহেও আসিতেছে যৌবন অপরাহ্নের প্রথম শ্রান্তি-রেখা; অধরের কোণে প্রথম স্বাক্ষর-লেখা বয়সের; সুচিক্কণ গৌরবর্ণে প্রথম তাম্রতা, সুডৌল চিবুকের তলায়, কণ্ঠের নিকটে প্রথম শিথিলতা চর্মের; আর সেই সুন্দর দীর্ঘবাহুতে চাঁপার কলির মতো সুদীর্ঘ অঙ্গুলিতেও একটি ম্লান মন্থরতা।...এই দেহের প্রত্যেকটি ছন্দকে, প্রত্যেকটি ভঙ্গিমাকে, প্রত্যেকটি আবেগ সুন্দর সুষমাকে অমিত মনে মনে চিনে, ভালোবাসে। আর তার সেই প্রাণপ্রাচুর্যময় অঙ্গের কোথাও

কোনো নিষ্প্রভতার ছায়া কোনো কালে লাগিতে পারে তাহা যেন অমিত ভাবিতেই পারে না। আপনা হইতেই তাহার মন সেই চিন্তাতে ফিরিয়া যায়—জীবন নিঙড়াইয়া লইতেছে—শুধু তোমার পিতাকে নয়, অমিত, শুধু ব্রজেন্দ্র রায়কে নয়,—তোমাদেরও, তোমাকেও, ইন্দ্রাণীকেও। এই তো নিবিয়া আসিতেছে তাহার প্রাণোচ্ছ্বাস, হারাইতেছে এ দেহ তাহার ছন্দ-সুষমা, চক্ষু তাহার অফুরন্ত বিস্ময়ের আনন্দ; মসৃণ সুচিক্কণ মুখ, নাক, ওষ্ঠ, চিবুক, কপোল—তাহার সুচিক্কণ মসৃণতা ...

হঠাৎ ইন্দ্রাণী মুখ তুলিল। জিজ্ঞাসা করিল : কি দেখছিলে অমিত?

অমিত সবিষাদ হাস্যে কহিল : তোমাকে।

ইন্দ্রাণী হাসিল, বলিল : কি বুঝলে?

বুঝলাম?—না, বুঝলাম না—তুমি কি দেহময়ী, না, প্রাণময়ী?

কাকে তোমার বেশি ভয়, অমিত—দেহকে, না, প্রাণকে?

'ভয়'?—না, ভালোবাসা? জানি না কাকে।

ইন্দ্রাণী আবার নীরব হইল। একটু পরে কহিল : দূরে রাখতে চাও আমাকে তুমি অমিত?

কি উত্তর দোব, 'বউদি'?—হাঁ এবং না।—বুঝেছ নিশ্চয়।

বুঝলাম। কিন্তু কি উত্তর দিতে 'ইন্দ্রাণীকে'?

'ইন্দ্রাণী' তা জানে। জানে না কি 'বউদি'?

জানে। জানে বলেই সে তোমাকে জানাচ্ছে—মিথ্যা নিয়ে মুক্তি পাবে না অমিত। আমি পাই নি, তুমিও পাবে না। আমি জানি—আমি ইন্দ্রাণী, কারও ভার্যা নই, বউদিও নই। আমি ইন্দ্রাণী—তোমার অন্তরাত্মাও তা স্বীকার করেছে স্বতোচ্ছ্বাসে সেই প্রথম মুহূর্তেই আজ পথের উপরে।

তা পথের স্বীকৃতি। সে আহ্বান পথের, সে স্বীকৃতিও পথের। আর তোমার গৃহে স্বীকৃতি এই, বউদি এ আহ্বান তোমার স্বরচিত সৃষ্টির, মাতা-পুত্রের সংসারের।

কথা শেষ হইতে পারিল না। স্পষ্ট দৃঢ় কন্ঠ ইন্দ্রাণীর : আমার 'স্বরচিত' নয়—অন্যের নির্ধারিত। তবে তার যেটুকু আমার স্বকীয় তাকে আমি স্বকীয় করে তুলব, আর সৃষ্টি করব নিজের হাতে প্রকৃতি-ঈপ্সিত পরিচয়।

বলিতে বলিতে সোজা হইয়া বসিল ইন্দ্রাণী। চোখে আলো ফুটিল, স্বপ্ন ফুটিল, ফুটিল বুঝি জ্বালাও। ইন্দ্রাণী আপনার ভাগ্য জয় করিবার অধিকার পায় নাই। আপনার সাধনায় পায় নাই সে স্বামী, গৃহ, সংসার। পাইয়াছে পিতামাতার ইচ্ছায়, সমাজের গতানুগতিক বিধানে। এই ইচ্ছা, এই বিধান তাহাকে জীবনে বন্ধন দিয়াছে, মুক্তি দেয় নাই। তবু ইহারও মধ্যে তাহার আপনার অন্তরের কামনা অজ্ঞাতেই রূপ লইয়াছে তাহার সন্তানের আকারে, এবার সেই প্রকৃতি প্রেরিত দানকে ইন্দ্রাণী সজ্ঞানে অর্জন করিবে আপন শক্তি দিয়া। তাহার মাতৃত্বকে করিবে স্বকীয়, আর তাহার পুত্রকে করিবে স্বাধীন। তবেই না ইন্দ্রাণী বলিতে পারিবে—সে সৃষ্টি করিয়াছে আপন সংসার। সেই সৃষ্টির স্বচ্ছন্দ প্রকাশে তাহার পুত্রও জানিবে—সে মানুষ, এই পরিচয়ই

তাহার পরম পরিচয়। তাহার মা মানবী, এই পরিচয়ই পুত্রেরও পরম গৌরবের। আর এই শিক্ষা, এই সত্যই সে জানিবে,---জীবনে এই মানুষের দাবিকে নির্ভয়ে মানিয়া লইত তাহার মাতা। তাই ইন্দ্রাণী এই মাতা-পুত্রের সংসার মানিয়া লইয়াছে—এই কন্টকাকীর্ণ মুক্তির পথ, পৃথিবীর সত্যকারের দাবি। ইন্দ্রাণী বঞ্চনা করিবে না—নিজেকেও না, পরকেও না।

আপনাকে ফাঁকি দেওয়া যায় নাকি অমিত?—বলিতে বলিতে আবার ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করিল।

অমিত চমকিত হইল। সেই একই প্রশ্ন এই কোন কণ্ঠ হইতে আবার তাহাকে আক্রমণ করিল---ঘিরিয়া ফেলিল, গ্রাস করিল? সত্য এক, কিন্তু কত বিচিত্র আবরণ, কত দেহ দেহান্তরের মধ্য দিয়া তাহা রূপলাভ করে।...বিস্ফারিত দুই চক্ষু অমিতের মুখের উপর স্থাপিত। অমিত ভালো করিয়া কথা বলিতে পারে না! কি করিয়া বুঝাইবে? কোনটা ফাঁকি কোনটা সত্য, তাহাই যে বলিবার উপায় নাই। এই তো, কত দিন-মাস ধরিয়া অমিত আপনার মনে আপনি একটি মায়া-প্রাসাদ সযত্নে গাঁথিয়া তুলিতেছিল,—মাত্র দুইটি শব্দ ও তাহার পিছনকার একটি অস্পষ্ট আবেগের আবেদন লক্ষ্য করিয়া: 'প্রতীক্ষা' ও 'প্রত্যাশা'। অমিত কী করিয়াছিল? নিশ্চয়ই ভুল করিয়াছিল। এই মাত্র একটি দিনেই আজ এই সন্ধ্যায় সে বুদ্বুদ ফাটিয়া গেল। কিন্তু ভুল করিয়াছিল সবিতাই বেশি। আর তাহার ভুল এখনো ভাঙে নাই, ইহাই আশ্চর্য। অমিত তো ভুল করিতেই পারে। কারণ, সে ভুলিতে চাহিয়াছিল আরো গভীরতর সত্যকে, চৈতন্যের অতলবাসী সত্যকে—আপনার নিয়তিকে।—অমিত চাহিয়াছিল তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে। তাই, সবিতা কেন, যে কোন বালিকা বৃদ্ধা প্রৌঢ়ার সামান্যতম স্নেহ সহায়তাকেও অমিত সে দিন—সেই কঠোর কারাবাসের বিক্ষিপ্ত চেতনার মধ্যে—আঁকড়াইয়া ধরিত, আত্মরক্ষার বর্ম হিসাবে তাহা গ্রহণ করিতে চাহিত। ইহাই তাহার শিক্ষা-দীক্ষা; আজন্ম সাধনার-ও সমর্থিত, আপনারও অজ্ঞাতে আপনার ছলনা। অমিত ফাঁকি দিয়াছিল তাই সেদিন নিজেকে, আর 'নিজেকে ফাঁকি দেওয়া যায় নাকি, অমিত?' সমাজকে যায়, বিধাতাকে যায়; ফাঁকি দেওয়া যায় না তবু নিজেকে। কারণ, সে-ই তো আসল নিয়তি। "Our character is Fate. Fate is our own selves." কিন্তু তাই বলিয়া অমিত কি ফাঁকি দিবে না নিজেকে—'ইন্দ্রাণী'কেই স্বীকার করিলে এখন? এরূপে অস্বীকার করিলে ইন্দ্রাণীর সংসার, তাহার সামাজিক পরিচয়, তাহার এই মাতৃমর্যাদা? ইন্দ্রাণীও সমাজের ফাঁকি মিটাইয়া দিতে গিয়া আপন জীবনের মাঝখানে বিদ্রোহের ঔদ্ধত্যের দুর্জয় আত্মাভিমানের ফাঁকি সৃষ্টি করিয়া বসিবে না, কে বলিবে? এক বিভ্রান্তির জাল ছিঁড়িয়া তাহারই দায়ে আর এক জটিলতর বিভ্রান্তির জাল যে অমিতও এইখানে এই সন্ধ্যাতেই বুনিতে বসিতেছে না তাহার নিশ্চয়তা কি?—বস্তুর বনিয়াদ হারাইলে কল্পনা কতখানি ছলনাকে গড়িয়া তুলিতে পারে, আবার ছলনা কত ছলনা হইয়া যায় জীবনের সহজ সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি হইবা মাত্র, কাহাকে বুঝাইয়া বলিতে পারে অমিত এই জটিল

তত্ত্ব? এই সত্য-মিথ্যার, আত্ম-ছলনার ও আত্মান্বেষণের দুর্বোধ্য তথ্য?—কে আছে এমন যাহাকে বলিতে পারা যায় অমিতের, সবিতার, মনুর কথা—যাহাকে সব কথা বলা যায়?—

'যাহাকে সব কথা বলা যায়'—সেই শশাঙ্কনাথের আকুতি। এই কি,—অমিত নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল, এই কি সেই লোক? ইন্দ্রাণী? সেই বন্ধু, নারীপ্রাণ, সে অন্তরের অন্তরবাসিনী? অমিত অনুভব করিল—এই শতপাকে জড়ানো তাহার সমস্যার কথা। ইন্দ্রাণীকে বলিতেই হইবে। অনুভব করিতেছে—ইন্দ্রাণীকেই তাহা বলা যায়, ইন্দ্রাণী ছাড়া আর কে বুঝিবে?

অমিত বলিতে লাগিল, ইন্দ্রাণী শুনিল।

...নির্জন কারাকক্ষের সেই দিন রাত্রিগুলি অমিতের নিকট চেতন-অচেতন নানা বেদনা-অনুভূতির প্রবল তাড়নায় প্রমত্ত, বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। স্থৈর্য ও উন্মত্ততার কত সূক্ষ্ম ও কত স্বাভাবিক ক্রীড়াক্ষেত্রই না মানুষের মন। কত সামান্যই না প্রভেদ সুস্থ চেতনার সঙ্গে উন্মত্ত চেতনার! এখনো অমিত শপথ করিয়া বলিতে পারে না—সেদিন সে এই প্রকৃতিস্থ অমিত ছিল, না, হইয়া গিয়াছিল বিক্ষিপ্ত-চিত্ত, বিচ্ছিন্ন-সত্ত, উন্মাদ অমিত। কিন্তু সে জানে—অমিতের সেদিনের দিনরাত্রির স্বপ্ন-স্মৃতি কল্পনার সহায়ে, অসংখ্য বার অসংখ্য রূপে—অসংখ্য সূত্রে—এক মায়া-ইন্দ্রাণী তাহার লীলায় লীলায়, রূপে, মাধুর্যে, নির্মম অমিতকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল। বিশৃঙ্খল চেতনার সেই নিষ্ঠুর বিকৃতি হইতে অমিত রক্ষা পাইল হয়তো কঠিন দৈহিক পীড়ায়। দেহের অতি বাস্তব ব্যাধি তাঁহাকে উদ্ধার করিল মনের অতি-কাল্পনিক বিশৃঙ্খলা হইতে। তারপর বহুজনের সাহচর্যে অমিত যখন আপনাকে ফিরিয়া পাইল সেদিন তাহার স্থির শুভবুদ্ধি আপনার প্রয়োজনেই বুঝিল—ইন্দ্রাণী মায়া নয়, অমিতের জটিলতম সত্য; এবং সেই জটিলতা হইতে আত্মরক্ষা না করিলে অমিত খান-খান হইয়া যাইবে। দায়ে পড়িয়া,—সত্যই 'দায়ে পড়িয়া'—অমিতের মন আপনাকে বাঁধিয়া লইল; প্রাণের দায়ে, সুস্থ চেতনার দায়ে, ইন্দ্রাণীরও সুস্থির জীবনের দাবিতে। মন স্থির করিল—ইন্দ্রাণী, অমিতের জীবনের দূর অতীতেই ইন্দ্রাণী একদা ছিল। সেখানকারই স্বপ্ন সে, এখন আর সে সত্য নয় অমিতের পক্ষে, অমিতের জীবনে। সত্য সে কোনো দিন অমিতের জীবনে হয় নাই, কোনো দিন সত্য হইতে পারিবে না। অমিতও কোনো দিন সত্য হইতে পারে না ইন্দ্রাণীর জীবনে। আত্মরক্ষার বুদ্ধিই এই নিশ্চিত বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া তুলিল। সত্যই তারপর একটা অলীক স্থিরতা, ভঙ্গুর সান্ত্বনা অমিতের নির্বাসিত দিনরাত্রিতে আসিয়াছিল। ইন্দ্রাণীও নির্বাসিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অবরুদ্ধ জীবনের জন্য বুঝি কল্পনার এক ফালি আকাশের প্রয়োজন হইল। তাহা সবিতা। আজ গৃহে ফিরিয়া দ্বিপ্রহরে আর সন্ধ্যায় সেই আকাশের তলাকার বাস্তব ভিত্তিভূমিখানিকে একটু করিয়া অমিত দেখিল। দেখিল আর অচিরে বুঝিল—সেই আকাশও ছলনারই বাষ্পে ছাওয়া। তারপর এইমাত্র পথের উপর একটি নামের দমকা হাওয়ায়, এক জোড়া চক্ষুর আলোকে সেই কুহেলিকার

শেষ সংশয়ও অমিতের দৃষ্টি হইতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। অমিত জানে সে বাষ্প এখনো সবিতার মন ও মনুর বুদ্ধিকে ছাইয়া আছে। একদিন অমিতের সঙ্গে সবিতার জীবন-বন্ধন সম্ভব ছিল, শুধু এই তথ্যটুকুকে আশ্রয় করিয়াই হয়তো অমিতের মাতা-পিতাও হয়তো ব্রজেন্দ্র রায় এই কুয়াশা ঘনতর করিয়াছেন। হয়তো তাই আরও সন্তর্পণে, সঙ্গোপনে, সবিতার কল্পনা ইহার পোষকতা পাইয়াছে। আর সবিতার মন দূরান্তরে চক্ষুর অগোচরে অমিতকে গঠন করিবার সুযোগ পাইয়াছে আপন কল্পনা মতো, আপন আদর্শ মতো, আপন সাধনা মতো। অমিত তাহার কাছে অমিত নয়, ভারতীয় আদর্শ; জাতীয় আত্মবিকাশের একটি প্রতীক। মনুর সঙ্গে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস পড়িতে পড়িতে মনুর সৌহার্দ্য হইতে সবিতা সেই দেবমূর্তির পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়াছে। এক সঙ্গে পড়িতে পড়িতে, এই আদরের ও আদর্শের মূর্তিকে দুজনার মধ্যখানে রাখিয়া ভ্রাতৃগর্বিত মনু ও আদর্শ-তৃষিতা সবিতা দুইজনায় পরস্পরের স্বচ্ছন্দ সুহৃদ হইয়া উঠিয়াছে, হইয়া উঠিয়াছে প্রীতিপ্রেমভরা বন্ধু। তাহারা জানেও না তাহাদের জীবনে অমিত একটা উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ তাহারাই পরস্পরের। আনন্দ, প্রেম, পরিহাস, জীবনের সহজ বিনিময় সম্ভব শুধু তাহাদের পরস্পরের মধ্যে, 'দাদার' সঙ্গে নয়---সে অনেক উচ্চ বেদির উপরকার দেবতা, মনের স্পর্শাতীত আদর্শ—সেখানে পা ফেলিতে পা কাঁপে, স্বচ্ছন্দ হইবার সাধ্য কি সেখানে সবিতার? অথচ মনুও জানে না, 'সবিতাদি' তাহার কে, আর সবিতাও জানে না 'মনু' তাহার কতখানি। তাহা ছাড়া আরও যাহা জটিলতা আছে তাহা কাটাইয়া উঠিতে না পারা অবশ্য মূঢ়তা।

কিন্তু বুঝি না---এ জটিলতার সমাধান হবে কি করে, 'বউদি'।

ইন্দ্রাণী শুনিতে শুনিতে শান্ত স্থির হইয়া বসিয়া ছিল। হয়তো এই শেষ সম্ভাষণেই তাহার দেহে একটা কাঠিন্যের সাড়া জাগিল। স্থির দৃঢ়কণ্ঠে সে বলিল: মিথ্যার জালকে ছিঁড়ে ফেলে।

কে ছিঁড়ে ফেলবে তা?

সবিতা, মনু,—আর তুমিও, অমিত। হাঁ, তোমাকেই দিতে হবে প্রথম টান; কারণ তুমিই সচেতন। কি বলো, সত্য নয়?

অমিত নীরব ছিল। বলিল: সত্য। এ সত্য নিজের মনেও বুঝেছি। কিন্তু জীবন বড় জটিল, ইন্দ্রাণী।

তাই ফাঁকির জাল রচনা করবে, অমিত,---না? কিন্তু ফাঁকি কাকে দেবে, অমিত? নিজেকে ফাঁকি দেওয়া যায়?

যায়। কতজনা জীবনকে আজন্ম ফাঁকি দিয়ে যায়। মসৃণ নিরুদ্বেগ। সহজ তাদের দিনরাত্রি।

আর অতি কৃপার পাত্র তারা। তাই না, বলো?

সম্ভবত।

নীরবে বসিয়া রহিল দুই জনা। পান-শেষ চায়ের পেয়ালার পানাবশিষ্ট চায়ের

দিকে ইন্দ্রাণীর চিন্তাচ্ছন্ন দৃষ্টি। সেই আনত মুখের চিন্তা-সুস্থির রেখার দিকে অমিতের চিন্তাচ্ছন্ন চক্ষু।

হঠাৎ ইন্দ্রাণী চোখ তুলিয়া বলিল : ওঠো, অমিত, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। রাত্রি ন'টার আগে বাড়ি পৌঁছতে হবে।

অমিত চমক ভাঙিয়া দাঁড়াইল। বলিল : তাও মনে আছে?

নিশ্চয়। নইলে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে ইন্দ্রাণী—যাকে কেউ নোয়াতে পারে নি,—স্বামী নয়, পিতৃকুল-শ্বশুরকুল নয়, লোকের বক্রকটাক্ষ তো নয়ই, তোমার সযত্ন-রক্ষিত দূরত্বও নয়। কিন্তু এই আমার শেষ পরীক্ষা—খোকার আর আমার মধ্যে বন্ধুত্ব-রচনা। —বসো একবার তুমি পাঁচ মিনিটের মতো, ওর সঙ্গেও একবার পরিচয় করো।

ইন্দ্রাণী বাহিরে গেল। সকুতূহলে অমিত বসিয়া রহিল। সে কি কথা এই বালকের সঙ্গে বলিবে?—যে বালকও নাই, কৈশোরের তীরে আসিয়া পড়িয়াছে। জীবনের এই পুলক-শিহরিত প্রথম পাদে অনুভূতি-প্রবণ তাহার নমনীয় নতুন চেতনায় কেমন করিয়া অমিত কোনো ঔজ্জ্বল্যের, সৌন্দর্যের রেখাপাত করিবে? কেমন করিয়া? এমন পরীক্ষায় যে অমিত পড়িবে সে কি তাহা জানিত? এই তাহার প্রথম পরীক্ষা—আর পরীক্ষার প্রারম্ভ মাত্র এখনো।

তোমরা কথা বলো, আমি ততক্ষণ ওর খাবার সাজাই। তারপরে তোমারও ছুটি, অমিত। নইলে দেরি হবে।

ছেলেকে অমিতের সম্মুখে পৌঁছাইয়া দিয়া ইন্দ্রাণী বিদায় হইল প্রাঙ্গণের অন্য প্রান্তে।

কি বলিবে অমিত? এত বৎসর যে শিশুমুখ দেখে নাই, বালকের সঙ্গে কৌতুক-ক্রীড়ায় যোগ দেয় নাই, কোনো তরুণ কিশোরের হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভরা মাধুর্য আস্বাদন করে নাই। তাহার বঞ্চিত হৃদয়ের এই সুদীর্ঘ তৃষ্ণা এই অভাবনীয় মুহূর্তে অমিতকে যেন আরও বিমূঢ় করিয়া তুলিতে চাহিল। কি বলিবে, অমিত? কি বলিবে? কিন্তু কিছু না বলিলে এক-একটি নিমেষের নিস্তব্ধতায় যে ভারাক্রান্ত হইবে ভবিষ্যৎ—তোমার, ইন্দ্রাণীর, এই কিশোর বালকের।

কোথায় পড়ছ তুমি?—এক নিমেষও দেরি না করিয়া অমিত জিজ্ঞাসা করিল মামুলী প্রশ্নটাই।

একটি বিলাতি স্কুলের নাম করিল মানু। মামুলী কথার পথ বাহিয়া চলিল পরিচয়। দিল্লীতে এইরূপ স্কুলেই পড়িতে হইয়াছে। পরে পড়িবে বাঙালী স্কুলে। কারণ, এইসব বিলাতী স্কুলে বাঙলা পড়ায় না। তবে মানু মায়ের কাছেই বাঙলা পড়ে—মায়ের সঙ্গে। পড়ে বাঙলা সংবাদপত্র, পড়ে গল্পের বই। কত বই ঠিক আছে? না, রাক্ষস, রাজা-রাজড়া, ভূত-পরীর গল্প পড়তে দেন না মা। 'রামের সুমতি', 'বৈজ্ঞানিকী', এসব পড়েন মা; পড়েন আরও কত কি? এখন তাহারা কি পড়িতেছে? আজ রাত্রিতে পড়িবে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমাইবার আগে—'গোরা'।

হাঁ, মা বলেন সে 'গোরা' বুঝিবে—নিজের মতো করিয়াই মানু বুঝিবে।—কিন্তু

আজ অমিতবাবু এখানে থাকিলে মানু শুনিত তাঁহার জেলের গল্প। থাকিতে পারিবেন না তিনি? বেশ, কবে আসিবেন আবার? কাল? কালও না? কবে তবে? অমিতের যে মানুকে শুনাইতেই হইবে তাঁহার কথা। অমিতের কথা মায়ের মুখে এত শুনিয়াছে মানু। হাঁ, কতবার শুনিয়াছে।---মা বলেন---আপনি নাকি তাঁদের কমিউনিজম্-এর মাস্টার।

আমি! মাস্টার কমিউনিজমের!

হাঁ, মা বলেছেন।

ইন্দ্রাণী ফিরিয়া আসিয়াছিল। অমিতের বিস্ময়-বিমূঢ়তা এবার রঙ্গ-পরিহাসে রূপান্তরিত হইল। মানুকে অমিত বলিল, তোমার মা একটি বদ্ধ পাগল।

সম্পর্কটা সহজ হইয়া উঠিয়াছে, ইন্দ্রাণী তাহা বুঝিল। সহজ সুরে সেও উত্তর দিল, দ্যাখো, মায়ের নামে যা-তা বলো না ছেলের কাছে। খোকা ভাববে অমন দুর্ধর্ষ 'স্বদেশী' তুমি, তুমি কি আর বাজে কথা বলবে—চলো, খোকা, খাবে। এসব আর শুনতে হবে না---বলিয়া ইন্দ্রাণী যাইতে যাইতে অমিতকে বলিল, পালিয়ো না যেন অমিত। এনেছি যখন, ---তুমি পথও চিনবে না,---পৌঁছে দিয়ে আসব আমিই তখন বড় রাস্তার মোড়ে।

ঘরের মেঝের দিকে তাকাইয়া অকারণে আপনার মনে হাসিতে লাগিল অমিত। তাহা হইলে জীবনের একটা পরীক্ষায় সেও উত্তীর্ণ হইয়া গেল। অবশ্য মাত্র প্রথম দিনের পরীক্ষা। কিন্তু প্রথম দিনই প্রধান দিন। হয়তো পরীক্ষাও ক্রমে আর পরীক্ষা থাকিবে না। কিন্তু অমিতের কি পরীক্ষায় বসিতে হইবে—বার বার? এই তাহার ভবিষ্যৎ?

ইন্দ্রাণীর দেহচ্ছায়া ঘরে পড়িল, অমিত মুখ তুলিল। ইন্দ্রাণী বলিল: হাসছিলে যে, কি ভাবছিলে?

অমিত উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, ভাবছিলাম ভবিষ্যৎ।

কি ঠিক করেছ?

জানি না।

ইন্দ্রাণী স্থিরভাবে দাঁড়াইল· এত দিনেও জানতে পার নি—তবে জেনেছ কী?

যা জানতাম তাও অসামান্য—আমি ইতিহাসের পথিক। আর যা জানতাম না তাও জানলাম, পথের উপরে আজ, এই সন্ধ্যায় এক মুহূর্তে—দেখলাম তা আরও অসামান্য—আমি শুধু পথিক, আমি মানুষ—

এর বেশি কী জানতে চাও?

অমিত স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল ইন্দ্রাণীর চক্ষের দিকে।

চলো,—বলিয়া ইন্দ্রাণী সুইচ টিপিয়া আলো নিবাইয়া দিল। বাহিরের আলোর কোমল আভা ঘর ছাইয়া দিয়াছে। বাহিরের দিকে পা বাড়াইয়া ইন্দ্রাণী বলিল, দ্যাখো, আমার চল্লিশ টাকার ফ্ল্যাটের এই ছাদ---আশ্চর্য নয়? ঘরের থেকে কি কম এর দাম? যদি কোনো রাত্রিতে উঠে আসতে, বুঝতে। দেখতে এই ছাদের দাম

আলায় করে তারার আলো মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—কে, চিনতে পারতে তাকে? না, তোমার নিয়তি নয়, সে আমার নিয়তি। সে পথের বাঁকে অপেক্ষায় থাকে না—ঘরের কোণে, ছাদের সীমানায়, অনন্ত রাত্রি ধরে সে আমাকে জানায়—কী জানায় জানো? বড় ভাগ্যবতী তুমি, ইন্দ্রাণী। আনন্দ করো—এমন পৃথিবীর সীমানায় তোমরা আজ এসেছ যখন মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় বন্ধনহীন গ্রন্থিতে বাঁধবার দিন সমাগত। জানো, অমিত, কি বলে আমাকে আমার নিয়তি-নক্ষত্র?

শুনি?

ঘরের বাঁধনে বাঁধবার মানুষ নও তুমি, অমিত। তুমি, পথের বন্ধুত্বে পাবার মতো মানুষ।

অমিত চমকিত হইল: কি করে জানলে তুমি?

জানলাম,—হাসিল ইন্দ্রাণী,—আমার পোড়াকপাল বলে। তোমাকে দেখেছি, চিনেছি, বুঝেছি আর ছাড়তে পারব না বলে। পথে বেরিয়ে পড়লাম বলে। জানলাম—ভালোবাসা শুধু গৃহের নিভৃতিতে একান্ত উপভোগের মধ্যে একালে আর সীমাবদ্ধ থাকবে না, পথে পথেও আজ জীবন-রচনা করবার দিন এল পথচারী শতাব্দীর মানুষের।—চলো এখন।

কোথায়? পথে?

পথের বাঁধনেই ইন্দ্রাণী তোমাকে গ্রহণ করবে। তোমার গৃহের পথে কাঁটা হবে না। কথার মধ্যে যে ইঙ্গিত তা অমিতকে বিমূঢ় করিল।

ইন্দ্রাণী দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সে স্বল্পপরিসর বাহিরের ছোট ঘর। বলিল: কোনো আয়োজন নেই তোমার জন্য। হগ সাহেবের বাজারে যাবার সময় ছিল না। জগুবাবুর বাজারই তোমার মর্যাদা রাখুক—বাঙালী ফুলের বাঙালী মালা দিয়ে।

কাগজের মোড়ক খুলিয়া ইন্দ্রাণী এক গাছি যুঁই ফুলের মালা বাহির করিল। অমিতের বুক অপূর্ব আনন্দে দুলিতেছে। ইন্দ্রাণী বলিল: শুকিয়ে যাবে মালা কাল সকালে। আজকের মতো তবু এ নিয়েই পথ চলো, কাল ফেলে দিয়ো পথের ধুলোয়।

সময় নাই, ভাবিবার সময় নাই, আত্ম-পরীক্ষার কোনো অবসর নাই। অভাবনীয়া ইন্দ্রাণী, অনিবার্য তাহার গতি। তাহার দুই সুন্দর বাহু ঊর্ধ্বে উঠিয়া আসিয়াছে—অমিতের দুই চক্ষু নিমীলিত হইয়া গিয়াছে, কন্ঠে মালার স্পর্শ লাগিল। রূপে, গন্ধে, অদ্ভুত ইন্দ্রিয়ানুভূতির মোহে অমিতের সমস্ত চেতনা মথিত উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। ভালো করিয়া আপনার কথাকে সে রূপ দিতেও যেন পারে না আর। বলিল: তোমার কাছেই জমা রইল আমার এই সত্য। এ জীবনে অমিতকে আত্মস্বীকৃতির অবকাশ তুমি দিয়েছ; আমাকে মুক্ত করেছ আমার আত্মাভিমান থেকে।

কম্পিত কন্ঠে, কম্পিত করে অমিত ইন্দ্রাণীর গলায় সেই মালা পরাইয়া দিল, আর দুই হাতে তুলিয়া লইল তাহার দুইখানি কোমল কর।

নিজের নির্দেশে নিজেকে তুলে দিলাম আমি আজ, অমিত দিলাম তোমার হাতে অন্যের নির্ধারণে নয়—এই আমার গর্ব।—শান্ত নিরুদ্বেল কণ্ঠে বলিল ইন্দ্রাণী।

এতদিনকার নারীসম্পর্কহীন জীবনের সমস্ত বিস্ময়, চক্ষুর সমস্ত আকুতি, হস্তের, ওষ্ঠের হৃদয়ের সমস্ত কামনা অমিতের ব্যাকুল বিপর্যস্ত দেহের তটে তটে জোয়ার তুলিয়া দিল। স্মৃতির গহন তল হইতে গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল প্রাণলীলার শাশ্বত স্বীকৃতি।

কোনো ভাষা, কোনো বাণী বুঝি অমিতের অন্তর্বেদনাকে প্রকাশ করিতে পারে না।...ইন্দ্রাণী, আমার গৃহে চলো, শুধু পথে নয়—গৃহস্বামিনী...

ইন্দ্রাণী চমকিত, নীরব। কহিল—আর মানু?

—সে তোমার, সে আমার...।

ইন্দ্রাণী অশ্রু মুছিয়া একটু পরে কহিল—বাড়ি যাও—তোমার বাবা অপেক্ষায় আছেন। বাড়িতে বসে আছে তোমার সহোদর-সহোদরা—ইন্দ্রাণীর স্থান নেই সেখানে—আজ রাত্রে কিম্বা কোনো রাত্রে,—বিবাহের সূত্রে ছাড়া।

অমিত জানে, আজ অপরাহ্নে তাহার গৃহদ্বার হইতে ইন্দ্রাণী ফিরিয়া আসিয়াছে কেন, কেন সে বাসরাস্তায় দাঁড়াইয়াছিল তাহার জন্য।—'গ্রন্থনহীন বন্ধন' পিতার চোখে অগ্রাহ্য। অগ্রাহ্য না হোক বিসদৃশ অনু-মনু এমনকি বন্ধুদের কাছেও। রাজনৈতিক জীবনেও হয়তো বাধা হবে—নীতি-হীনতা বলে।

অমিত বলিল—একসাথে কি আমাদের থাকা অসম্ভব?

একটু স্থির হইয়া ইন্দ্রাণী বলিল : কে বলে—যখন চাও—দিনে-রাত্রে ইন্দ্রাণীর গৃহদ্বার মুক্ত—গৃহের সবকিছু,—অভাগিনী ইন্দ্রাণীও।

ইন্দ্রাণীর দুই চক্ষুতে স্বপ্নচ্ছায়া...প্রাণ গঙ্গার উদ্বেলিত তরঙ্গের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে তাহাদের জীবন। মাথার উপরে ভাঙিয়া পড়িতেছে দুর্দান্ত যুগের অমৃত-ফণা আলিঙ্গন।...'অমিত'—

যেন কন্ঠস্বর নয়, রক্তকণার সম্ভাষণ।

অতীত ও ভবিষ্যতের-তরঙ্গের মধ্যখানে দুইজনায় দাঁড়াইয়া আছে চোখে চোখ রাখিয়া...জীবন তাহাদের মিলাইয়াছে, কাল তাহাদের ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে...

কি বলিতে চাহিতেছে অমিতের স্ফুরিত অধর?—হয়তো কবিতা, হয়তো কবিতা নয়, জীবনের বেদমন্ত্র। ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি তাহার মুখের উপর হাত রাখিল,—না, কথা নয়—শুধু এই দেওয়া আর পাওয়া—দেওয়া আর পাওয়া।—সে মাথা রাখিল অমিতের বুকের উপর। ঘন নিঃশ্বাসে তাহার বুক দুলিতেছে—ইন্দ্রাণী আত্মসমর্পিতা —সজ্ঞানে, স্বমর্যাদায়। মুহূর্তের পর মুহূর্ত জন্মমৃত্যুর মতো রহস্যময়...তারপর মাথা তুলিয়া দুই হাত ধরিয়া বলিল, চলো।

দ্বার খুলিয়া সিঁড়িতে পা বাড়াইবে দুইজনা—ইন্দ্রাণী খুলিয়া লইল গলার মালা

পুরিয়া লইল জামার অভ্যন্তরে বুকের কাছে। প্রাণের মাদকতা ছাপাইয়া পড়িতেছে অমিতের দেহ ও চেতনায়...

My desire and thy desire
Twining to a tongue of fire,
Leaping live and laughing higher.
Thro' the everlasting strife
In the mystery of life.

অমিত বলিল : ইন্দ্রাণী, নিয়তি কে বাধা দিতে পারে।

ইন্দ্রাণী বলিল : নিয়তি নয়, জীবন। এই সত্যই ইন্দ্রাণীর নিয়তি জানিয়েছে সেই দর্পিতা হতভাগিনীকে।...

চলো!—স্বপ্নময় নীরবতা ভাঙিয়া সিঁড়িতে ইন্দ্রাণীই প্রথম পা বাড়াইল। অমিত অনুসরণ করে।

কোথায়? পথে?...জীবনে...

Thro' the everlasting strife
In the mystery of life.

হাত তখনো ইন্দ্রাণীর হাতে। অমিত বলিল : আবার কবে দেখা হবে, ইন্দ্রাণী?

ইন্দ্রাণী বলিল : যখন সময় হয়—অসংখ্য সহযাত্রীর পথের ভীড়ে, তারা-ভরা নিঃসঙ্গ রাতে—আমার এই ছাদে।

সম্মুখে ফুটপাত। একবার দাঁড়াইল দুইজনা। ফুটপাতে পা বাড়াইল অমিত। এবার সে প্রথম বলিল : আর না, এবার যাও, ইন্দ্রাণী।

যাব?—ইন্দ্রাণী শান্তকন্ঠে কহিল।—আচ্ছা। ইন্দ্রাণী দাঁড়াইয়া পড়িল। হাত ছাড়িয়া দিল। একমুহূর্ত চোখের উপর চোখ রহিল।

যাও, অমিত।

আর ফিরিয়া তাকাইল না অমিতও। একজোড়া চক্ষু যে তাহার পশ্চাতে অপলক দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া রহিয়াছে, তাহা সে জানে।

দুই

আকাশের নক্ষত্র হইতে পথের ধূলিকণা পর্যন্ত সমস্ত ভুবন আজ মুখ বাড়াইয়া দিয়াছে অমিতের দিকে, মাথা হইতে পা পর্যন্ত দেহের প্রত্যেকটি অণুকণায় তাহাদের নৃত্যোল্লাস। দেহময় ঘোষণা 'শোনো, শোনো, বিশ্বজন, তমসা পারের সেই পুরুষকে আমি জানিয়াছি।' 'আর জানিয়াছি সে ভালোবাসা'। অমিত চিৎকার করিয়া বলিতে পারে 'শোনো, শোনো, পৃথিবীর মানুষ, সূর্য-চন্দ্র-তারকাকেও যে সত্য সমুজ্জ্বলতা দেয় আমরা অমৃতের পুত্র-আমরা ভালোবাসি। পৃথিবী তাই সুন্দর, মানুষ অপরূপ।'

কিন্তু এই পৃথিবী বড় ছোট,—অমিত আবার নিজেকে না বলিয়া পারে না—

ভালোবাসার এই সত্যের পক্ষে এই পৃথিবী বড় ছোট, অমিত। সপ্ত-সমুদ্রের বন্ধনে-বাঁধা এ পৃথিবী বড় সীমাবদ্ধ। তাহার দিগ্‌দিগন্তকে ভাঙিয়া ছিঁড়িয়া উড়াইয়া দিতে পারে এই সত্য 'ইন্দ্রাণী অমিতকে ভালোবাসে'। তাহার কূল ছাপাইয়া সেই সত্য মহাশূন্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবে, তারায় তারায়, নব-নব গ্রহনক্ষত্রের মালায় কাঁপিবে। অনন্ত মহাশূন্যের বায়ুতরঙ্গের মধ্যে বহিবে এই বাণীতরঙ্গ : 'ইন্দ্রাণী তোমাকে ভালোবাসে।' এই প্রাণে প্রাণে বলা কথা রহিয়া যাইবে নিখিলের কানে।...বায়ুতরঙ্গ হইতে কী শুনিতেছে ওই লোকগুলি বেতারের বক্তৃতা! জানে না আকাশে আজ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে কী গুঞ্জরণ—'ইন্দ্রাণী অমিতকে ভালোবাসে'। কোটি কোটি যুগের শেষেও বায়ুতরঙ্গে কান পাতিয়া মানুষ এই সত্য শুনিতে পারিবে। আর পথযাত্রী মানুষের চোখের পরে চোখ রাখিয়া এমনি করিয়াই এই নক্ষত্রলোক বলিবে,—এমনি করিয়াই ধরণীর অবলুণ্ঠিত ধূলিজাল সেই যাত্রী-মানুষের পদচুম্বন করিয়া বলিবে, 'তোমাদের ভালোবাসার পথ তৈরি করিয়া গিয়াছে অমিত ইন্দ্রাণীও—কলিকাতার এক পথপ্রান্তে এক শরতের সায়াহ্নে, চোখের দৃষ্টিতে, করের কম্পিত স্পর্শে, আর জীবন-স্বীকৃতির সানন্দ সাহসে তাহারা তোমাদের আচ্ছাদন করিয়া গিয়াছে।'...মানব-প্রেমের একালের এই নীহারিকা-স্রোত একদিন তারপর জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররূপে দানা বাঁধিয়া উঠিবে মানুষে মানুষে ভালোবাসার সর্বময় সম্পর্কে।—সেই দিন কেহ জানিবেও না—উহার মধ্যে এই আবর্তিত দুইটি জ্যোতিঃকণাও মিশিয়া আছে, ধন্য হইয়াছে, পূর্ণ হইয়াছে।...

কেহ জানিবে না, কেহ জানে না। জানে না বাসযাত্রী ইহারা, জানে না পথের অপরিচিত এই পথিকেরা। জানে না এই গলির বহু পরিচিত প্রতিবেশীরা কেহ। একটি সন্ধ্যার দুইটি মানুষের এই জীবন-স্বীকৃতি গৃহ বন্ধন ছাড়াইয়া অসীমের অঙ্গীকারের মধ্যেও রহিবে এমনি করিয়াই ব্যাপ্ত হইয়া, আপনাদের মিলাইয়া গিয়া—শাশ্বত হইয়া, পূর্ণ হইয়া।...

* * *

এত দেরি করছিলে কেন, দাদা,—দুয়ারে না পৌঁছিতেই দুয়ার খুলিয়া গেল। অনু পথ চাহিয়া বসিয়া ছিল। মুক্ত দ্বারপথে এক ঝলক আলোক আসিয়া পড়িল অমিতের চোখে-মুখে। আলোকে ও অনুর সম্বোধনে অমিত চমকিত হইয়া উঠিল। তাই তো, কখন যে কলিকাতা শহরের দীর্ঘপথ ও ছোট গলি, পথের নানা মানুষের ভিড় ও বাসের নানা মানুষের মুখ, সব পিছনে ফেলিয়া অভ্যাসমতো বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; আর দুয়ার খুলিয়া দিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে—মা নয়,—অনু। মায়ের মতো একটু উদ্বেগ, একটি অনুযোগ তাহার কন্ঠেও।—এত দেরি করছিলে কেন, দাদা!

দেরি? হাঁ, দেরি হয়ে গেল।

ততক্ষণ অনু গৃহালোকে দেখিতেছে তাহার দাদার স্বপ্নাবিষ্ট মুখ—চক্ষু উদ্‌ভ্রান্ত, মুখ আরক্ত, কন্ঠস্বর সদ্য সুপ্তোত্থিত।

কি, দাদা, কি হয়েছে?—অনুর মুখ হইতে এই উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা বাহির হইয়া পড়িল।...

কে বলিল, কেহ জানে না? জীবনের স্বীকৃতি শুধু দুইটি মানুষের বক্ষ তলেই সীমাবদ্ধ, ইহা কে বলিবে? এই তো, অনু সেই সত্যের সংকেত পড়িয়া ফেলিয়া অমিতের সম্মুখে এখনি দাঁড়াইয়াছে।...কিন্তু অমিতের এখন একান্ত নিভৃতির বড় প্রয়োজন! সে ভাবিতে চায়, অনুভূতিকে বুঝিয়া লইতে হইবে। আপনাকে সংহত করিবার, সংযত করিবার শক্তিও তো দরকার। গৃহে পা না বাড়াতেই তাহার পথিক প্রেম সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছে।

অমিত আগাইয়া আসিয়া বলিল: কেন, অনু? খুব ভাবছিলে, না—'দাদা আবার শুরু করলে আগেকার মতো?'—বলিতে বলিতে অমিতের কথা সহজ হইতেছে।—পথে একজন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, অনু।

আর অমনি বাড়ির কথা ভুলে গেলে।

দূর! তোরা আমাকে তাই মনে করিস্-না?

নিজের উৎকন্ঠা ও অনুযোগে অনুই এইবার লজ্জিত হইল। বলিল: না, না! বাবা অবশ্য দুবার তোমার খোঁজ করেছিলেন। এক-একবার কি ভেবে এ ঘরে তাকান, আবার ভুলে যান। পরে আবার বলেন, 'আপিসে গিয়েছে অমি', না? থাক, থাক। কিছু বলিস না অমিকে। ওর অনেক কাজ। বাধা দিস না। বাধা দিস না।—অমি রাগ করবে।' বাবা ধরে বসে আছেন সেই আগেকার দিনের কথা—খবরের কাগজে তোমার দুপুর থেকে কাজ। তোমায় বেশি খোঁজ করলে তুমি বিরক্ত হবে।

সিঁড়ি দিয়া দুইজনে উঠিতে লাগিল।...স্বপ্ন কল্পনা, উড্ডীয়মান চেতনা যেন এইবার পরিচিত পৃথিবীতে প্রবেশ করিতেছে। এখানকার বায়ু, এখানকার আলোককেও অমিত কম সত্য বলিয়া অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু সাধ্য কি যে সৌরলোকের আলো ও সুর সে বুক ভরিয়া লইয়া আসিয়াছে তাহাও সে গ্রহণ না করিয়া পারে। সেই সুতীব্র অনুভূতি এখনো তাহার হৃদয়ে স্পন্দিত হইতেছে; আবার, এই আজন্মের অনুদ্বেল মমতাও তাহার চোখে মুখে এ সংসারের সহজ মায়া মাখাইয়া দিতেছে। অসামান্য অভিজ্ঞতার জন্য অমিতের নিভৃতি চাই; আবার সহজ সাধারণ কথাও চাই অভ্যস্ত পৃথিবীর জন্য।

সহজ সুরে অমিত বলিল: বাবা জেগে আছেন?

এইমাত্র খাইয়ে দিয়েছি। শুয়ে পড়েছেন।

কিন্তু, এই পুরাতন পিতামাতা ভ্রাতা ভগ্নীর পৃথিবীতে অমিত-ইন্দ্রাণীর জগতের নতুন সত্যকে অমিত কেমন করিয়া ঘোষণা করিবে? কাহার নিকট ঘোষণা করিবে? কি করিয়া বুঝাইবে,—'তোমাদের পৃথিবী আমি ছাড়াইয়া চলিয়াছি,—অস্বীকার করিয়া নয়, নতুন সৌরলোকের বাণী শুনিয়াছি বলিয়াই।' কিন্তু অমিতের 'বিদ্রোহে', 'বিচ্যুতিতে' আহত হইবার মতো হৃদয়ই বা কোথায়? মাতা নাই, পিতা জরাগ্রস্ত,—কে আহত হইবে? মনু? অনু?

অনু বলিল : সন্ধ্যায় অনেকে এসেছিলেন দাদা, সকলে চলে গিয়েছেন। তথাপি বসে আছে শুধু শ্যামল—তোমার বইপত্র দেখছে, তোমার সঙ্গে দেখা না করে যাবে না। এখনি যেতে হবে ওকে ভবানীপুরে ফিরে।

কে শ্যামল? ওঃ, সেই তোমাদের ছাত্র সমিতির নেতা। চলো, চলো।

অমিত নিভৃতি চাহিয়াছিল। অনন্ত আকাশ ও অনন্ত অনুভূতির মধ্যে আজ এই সন্ধ্যায় অমিত ডুবিয়া থাকিতে চায়। কিন্তু শ্যামল বসিয়া আছে—সেই শ্যামল, অনুর যে বন্ধু। আর অমিতের মনে নতুন ঔৎসুক্য উঁকি মারিল, এক টুকরা নতুন আলো যেন চিন্তাচ্ছন্ন চেতনার দুয়ারে।

অনু জানাইতেছিল, মোতাহের সাহেবও রয়েছেন। আরও অনেকে কিন্তু চলে গিয়েছেন দাদা। কানাইর মা এসেছিল কালীবাড়ির নির্মাল্য নিয়ে, তোমার ঘরে রেখে গিয়েছে। রাতে চোখে দেখে না, বাসে যাবে কি করে? মিনতিদি আর ইন্দ্রাণী বউদি কাল সকালে আবার আসবেন। যুগল গুপ্ত আর তার বোন বুলু—খবর পাঠিয়েছেন। সুধীরাদি জানতে চেয়েছেন—আসা ঠিক হবে কিনা, না, পুলিশের উৎপাত আছে। মৈত্রেয়ীটা আর বসলো না—হস্টেলে থাকে কিনা।—অমিত শুনিতে শুনিতে ঘরে প্রবেশ করিল।

অনু ঘর গুছাইয়া ফেলিয়াছে। এ যেন অন্য ঘর। কিন্তু তাহা দেখিবার সময় জুটিল না। মোতাহের আগাইয়া আসিয়াছে—মুখে সংযত হাস্য। পুরাতন বন্ধুর মতো অমিত তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। রোদে-পোড়া সেই ময়লা রঙের বাঙালী যুবক। একদিন খিদিরপুর ডকের মজুর আপিসে তাহাদের আলাপ-আলোচনা হইত। বন্ধুত্ব হয় নাই; কিন্তু মোতাহেরকে বুঝিবার মতো অবকাশ অমিতের তখনও হইয়াছিল। তাহা সকলেরই হয়—মোতাহের স্পষ্ট মানুষ। তাহার মনে দ্বন্দ্ব সংশয়ের অবকাশ নাই, শ্রেণীশত্রু বুঝিলে নির্বিকার চিত্তে তাহাকে আঘাত করিতে পারে। হয়তো সেই ঐকান্তিকতার জন্যই তাহাকেও অমিতের মতো অবরুদ্ধ হইতে হইয়াছিল।

অনু বলিল : শ্যামল,—এই দাদা। —আর দাদাকে অনু জানাইল : এই শ্যামল রায়।

ছিপছিপে গড়নের একটি যুবক দুই হাতে অমিতকে নমস্কার করিল। রঙ ফরসা নয়। কিন্তু দেহে চোখে মুখে নাকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সক্রিয় চিত্তের ছাপ আছে; বেশভূষায় রুচিবোধ আছে; আর হাস্যে ও কথায় এখন ফুটিল সপ্রতিভ আত্মীয়তা।

অমিত কেমন চমকিত হইল। এমনি বয়সের যুবক ছিলো সুনীল...

অমিত সবলে নিজেকে সংযত করিল। পথ নয়, ইহা তাহার গৃহ;—ইন্দ্রাণী-অমিতের জগৎ নয়,—পুরাতন পৃথিবী; এবং সেই সঙ্গে যেন আরও একটি নতুন পৃথিবীও। চিরদিনের মধ্যে একটা অন্যদিন...আবার।

অমিত সস্নেহে শ্যামলকে সম্ভাষণ করিল : এখনি যাবে? আচ্ছা, দু মিনিট বসো। তারপর মোতাহেরকে বলিল : খবর পেলে কি করে, ভাই মোতাহের?

এঁরাই বলেছেন—এই শ্যামলবাবু।

বেশ। তুমি কিন্তু বসবে মোতাহের। আগে শ্যামলের সঙ্গে পরিচয় করি, তাড়াতাড়ি এ যাবে। তোমার সঙ্গে কথা আছে—আর কাজও। হয়তো আজ তা শেষ হবে না—বলিয়া অমিত মোতাহেরকে বসাইল।

শ্যামলই প্রথম কথা কহিল : কেউ আমরা জানিই না আপনারা মুক্তি পেয়েছেন—

অমিত তাড়াতাড়ি তাহার এ ভুল দূর করিতে চাহিল : 'আপনারা' কোথায়? বহুবচন নয়, একবচনই।

শ্যামল অপ্রতিভ হইল না, বলিল : আমি আপনার কথাই বলছি। আরও অনেকে জেলে রয়েছেন, আপনি সেই জন্য ভাবছেন। আমরা কিন্তু ভাবি না—এবার আসবেন তাঁরাও সকলে।

সকলে আসবেন? তারা কিন্তু এ ভরসা তত পাচ্ছে না।...

সকলেই কি আসিবে?...আসিবে সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়?...আসিবে সুনীল দত্ত?...

ইন্দ্রাণী-অমিতের জগতের পরে আর-একটা জগতও আবার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল কাঁটাতারের ও উচ্চ প্রাচীরের, সান্ত্রীতে ঘেরা আর শ্রান্তিতে বিষাক্ত ; বহু বহু হৃদয়ের রক্তে ও প্রতীক্ষায় গম্ভীর। প্রতিদিনের নানা আদান-প্রদানে তাহাও অমিতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য।...

আমরা তাদের আনবই—শ্যামল সগর্বে বলিল, যেন কোনো একটা সভায় তাহাদের প্রস্তাব ঘোষণা করিতেছে।

তোমরা?—একটু হাসি ফুটিল অমিতের চোখে। ফজলুল হক নয়, নাজিমুদ্দীন নয়, গান্ধীজীও নয়—ইহারা! অমিত একবার মোতাহেরের দিকে তাকাইল। কিন্তু মোতাহের হাসিল না।

হাঁ, আমরা ছাত্ররা। বিশ্বাস করছেন না? কিন্তু দেখবেন। আপনাদের মুক্তির দাবিতে আরও বড় 'ডিমোনস্ট্রেশন' বের করব, আরও বড় সভা আমরা অর্গ্যানাইজ করব। এ্যাসেমবলি ঘিরে বসব, না হয় আরম্ভ করব 'ম্যাস্ অ্যাক্শন'। বাঙলা দেশের জনমত আমাদের পিছনে। ছাত্রশক্তিকে রুখতে পারে এমন সাধ্য কারো নেই।

অমিতের মুখে হাসি ফুটিল না। 'ডিমোনস্ট্রেশন', 'অর্গ্যানাইজ', 'ম্যাস্ অ্যাকশন' তাহার কাছে এ শব্দের মধ্য দিয়ে এই জগৎটা নতুন প্রকাশিত হইতেছে। সমস্তটা অদ্ভুত ঠেকিল—এই ভাষা, বক্তব্য বলিবার ভঙ্গি, সবই নতুন। পরিচ্ছদে এমন রুচিশীলতা, এমন বাকপটুতা, এমন উচ্চকন্ঠে জোর দিয়া মত জাহির করা—এইসব ইহার পূর্বে এই দেশের তরুণ সমাজে কোথায় ছিল? সেদিন ছিল মন্ত্রগুপ্তির যুগ। শুধু মৃদু ভাষণ নয়, মৌনতাই ছিল সেদিন সংকল্পের, দৃঢ় চরিত্রের পরিচায়ক।...আজ অন্য দিন, সত্যই অন্য দিন। কেমন স্পষ্ট, সরল, সতেজ ইহাদের কথা। একটু বক্তৃতাভঙ্গি ...একটু বেশি আত্মঘোষণাপর, একটু বেশি অনভিজ্ঞ সরলতা—না? তা হউক, তবু ইহা নতুন যুগ,—অমিতের যুগের তুলনায় কেন, সুনীলের যুগের তুলনায়ও নতুনতর এই যুগ। আর, অমিতের এই যুগকে বেশ লাগিতেছে। সকৌতুহলে অমিত দেখিতেছিল,

বলিল : শক্তিকে কেউ রুখতে পারে না। কিন্তু আসল কথা—শক্তিটা তোমাদের শক্ত হয়েছে তো ?

দেখবেন? কাল যাবেন আমাদের কলেজে? কাল পারবেন না? বেশ, পরশু যাবেন। ওঃ, ছাত্রদের সভায় যাওয়া আপনার পক্ষে নিষেধ!—শ্যামল শুনিয়া সোল্লাসে বলিল : দেখছেন ওদের যত ভয় ছাত্রদের। বেশ, তা হলে আপনারা সবাই বেরিয়ে আসন আগে। আপনাদের অভিনন্দন দোবই—দেখি কে বাধা দেয়। কলেজের কর্তারা? কেন, কলেজ কার? আমাদের, না 'গভর্নিং বডির' ওই উকিল আর ফড়েদের? প্রিন্সিপাল আপত্তি করবেন? কেন? কলেজ কি তাঁর, না, আমাদের? 'প্রোপাইটার' ও 'কলেজ বোর্ডের' সম্পত্তি কলেজ, না, সম্পত্তি দেশের ও জাতির ছাত্রের ও শিক্ষকের?

বাঃ, চমৎকার একটা নতুন জগতের নতুন ধারার যুক্তি। অমিত কলেজে পড়িয়াছে। কলেজে পড়াইয়াছেও। এতদিন জানিত—সেখানে স্বাধীনতার কথা ইতিহাসে পড়া চলে, কিন্তু সে সম্পর্কে দেশের কথা আলোচনা করা চলে না। কারণ, স্থানটা শত্রু শিবির, সাম্রাজ্যবাদেরই 'গোলাম-খানা'। কিন্তু আজ দেখিতেছে ইহারা ধরিয়া লইয়াছে কলেজ কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়; পুলিশের খাশমহল—নয়; তাহা জাতির ও জাতির ছাত্রদের।.. অন্যদিন আজ, অন্যদিন...এযুগের দৃষ্টির কথা ভাবিতেছিল না অমিত দূরে বসিয়া? কে বলিল তাহা মিথ্যা? এই তো এই যুগের দৃষ্টি—এই যুগের মানুষের চক্ষে। ইহারা আরও একটু অগ্রসর হইবে, এই যুক্তিসূত্রেই আরও একটু আগাইয়া যাইবে, আর জানিবে—কলেজ তাহাদেরই সম্পত্তি আসলে যাহারা কলেজের ত্রিসীমানায়ও পা দিতে পারে না, তাহারাই জোগায় তোমাদের লেখাপড়ার খরচ, লেখাপড়া হইতে পুরুষানুক্রমে যাহারা বঞ্চিত।

স্বাভাবিক আনন্দ কৌতূহলে আবার অমিত স্বাভাবিক কৌতুকস্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া পাইতেছে...। অমিতের পদদ্বয় তাহার আপনার জগতের সেই পরিচিত মৃত্তিকা স্পর্শ করিতেছে।

অমিত বলিল : এ যুক্তি কর্তারা মানে—বিশ্ববিদ্যালয়ে?

মানতে হবে। আসুন আপনারা ছাড়া পেয়ে, দেখবেন।

শ্যামলের উৎসাহ নিবিবার নয়। কিন্তু রাত্রি হইতেছে, অনুই তাহা মনে করাইয়া দিলে শ্যামল বিদায় লইবে—মোতাহের সাহেবও বসিয়া আছেন। বিদায় লইতে লইতে শ্যামল বলিল, আপনার বইপত্র দেখছিলাম দাদা, আমরা। একটা ইউনিভার্সিটি খুলে বসেছিলেন দেখছি।

অমিত পুলকিত হইল। হাসিয়া বলিল : ফর জেল বার্ডস্‌। প্রিন্সিপ্যাল, গভর্নিং বডির বালাই নেই। একেবারে কমপ্লিট ছাত্র-অটোনমি বলতে পার। যত খুশি পড়ো—অবশ্য পড়তে না চাও তাতেও আপত্তি নেই।

শ্যামল হাসিল। বলিল : তাহলে তো আপনারাই আমাদেরও পথ দেখাবেন এখানে। এবার লীড্ দিন।

'লীড্ দিন'...সুনীল দত্ত বলিত 'দায়িত্বভার নাও'...তাহারা জানিত রাজনীতির আসল কথাটা 'নেতৃত্ব' নয়—দায়িত্ব... '

শ্যামলকে বিদায় দিতে অনু নিচে নামিয়া গেল।

অমিত মোতাহেরকে বলিল : তারপর? বলো ভাই খবর।

মোতাহেরের বিড়িটা শেষ হইতেছিল, নিবাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। ঘরে একটু ছাই পড়িল। মোতাহের তাহা দেখিয়াও দেখিল না। বলিল: আমি বলব কি? আমি খবর শুনতে এসেছি।

আমি খবর কি করে জানব? রইলাম জেলখানায়।

খবর তো এখন সেখানেই। কি হচ্ছে, বলো সব।

অমিত আজ এইমাত্র তাহার জীবনের একটা বড় মোড়ে আসিয়া পেঁছিয়াছে। সে চাহিতেছিল সেই নতুন জগতের প্রান্তে বসিয়া একবার দেখিবে, বুঝিবে, উপলব্ধি করিবে। কিন্তু মোতাহেরকে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মন সেই আত্মমুখিতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া সজাগ হইয়া উঠিতেছিল। মোতাহেরের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বদিনের বৃহৎ কর্মজগৎ যেন অমিতের চতুর্দিকে আবার প্রকাশিত হয়—সেই খিদিরপুর ডক, তাহার মজুর আপিস, মোতাহেরদের চঞ্চল অধীর সংগ্রামশীলতা। এতক্ষণে শ্যামলের সহিত কথা বলিতে বলিতে সে জগতের পথের দিকেই আসিয়া গিয়াছে।...পূর্বে সে দেখিয়াছে সেদিনের সুনীলকে, দীনুকে, মোতাহেরকে। মোতাহেরও বুঝি তাহার ছয় বৎসর পূর্বেকার পৃথিবীটার সঙ্গে একটা সেতু-বন্ধনের সুযোগ করিয়া দিল। আর, নিজে না জানিয়াও অমিতের অন্তরের কৃতজ্ঞতাও সে অর্জন করিল।

অমিত বলিল : জেলের খবর তো জানো। তোমার সামনেই তার সাক্ষ্য—বই, নোট্, লেখা, তর্ক, আলোচনা, দলবাঁধা, দলভাঙা—দলাদলি। জয় তোমাদেরই। যেই-ই যা করুক, সবাই মেনে নিয়েছে তোমাদের তর্ক—সন্ত্রাস-বাদের দিন ফুরিয়েছে।

এই মাত্র। তা হলে তো জয় আমাদের নয়, জয় এণ্ডারসনের গভর্নমেন্টের।

না, না, আরও আছে। কিন্তু সেও তোমাদেরই জয়। আই-বি আপিস আজই জানাল—'সব কমিউনিস্ট হয়ে গিয়েছে'।

আই-বি'র কথা আমি শুনতে চাই নি। তুমি কি বলো, শুনি।

অমিত পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিল না।—হাঁ, অনেকেই বলে তারা কমিউনিস্ট।—অন্তত মতবাদে। কেউ কেউ দল হিসাবেও। আরও অনেকে মনে করে—'ম্যাসের' মধ্যে কাজ করতে হবে।

মোতাহের আর-একটা বিড়ি ধরাইবার আয়োজন করিল। বলিল: তাহলে তো জয়টা তোমার অমিতদা।

আমার?—অমিত সবিস্ময়ে বলিল।

মোতাহের জানাইল—সে অমিতের আগেকার কথা বিস্মৃত হয় নাই। বাঙলার বিপ্লবী যুবকদের এইরূপ পরিণতির সম্ভাবনা অমিত পূর্বেই অনুমান করিয়াছিল। জোর দিয়াই সে নিজের সেই মত মোতাহেরের মতো শ্রমিক কর্মীদের নিকট প্রকাশ করিত। কিন্তু তখনো তাহাতে মোতাহেরদের সংশয় দূর হইত না—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই রোম্যান্টিক যুবকেরা আপনাদের শ্রেণীগত স্বার্থ-সম্পর্ক বিসর্জন দিতে পারে কি? অমিতের সঙ্গে শেষ যেদিন দেখা মোতাহেরের—সেদিনও এই কথাই দুইজনার হইয়াছিল। তারপর দিনই অমিত বন্দী হয়, তাই সে কথাটা মোতাহের বিস্মৃত হয় নাই। অমিতের সেদিনের অন্য মতটাও বিস্মৃত হয় নাই—'স্বাধীনতার প্রশ্নে সকলের সম্মিলিত আয়োজন চাই।' সেদিন মোতাহের তাহা মানে নাই। আজ মোতাহেরও জোর দিয়া বলে—সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সম্মিলিত মোর্চা গঠন করিতে হইবে, ডিমিট্রভের নিবন্ধের পরে ইহাই তাহাদের কর্তব্য। সেদিন অমিত কংগ্রেসের পক্ষভুক্ত ছিল; মোতাহের ছিল কংগ্রেসের বিরোধী। অবশ্য আজ কংগ্রেস গণ-সংগঠনে রূপান্তরিত হইতেছে; আর ফৈজপুরের পরে তাহার দৃষ্টি এখন বঞ্চিত শ্রেণীর আর্থিক স্বার্থকেও স্বীকার করিয়া লইতেছে। অমিতের আশা ছিল, এইরূপই হইবে। তাহার আশা ফলবতী হইতেছে, নিরর্থক ছিল মোতাহেরদের সন্দেহ। তাই মোতাহের বলিল। অমিতের জয়।

অমিত শুনিয়া উৎফুল্ল হইল। তবু বলিল: এখনো ওসব মনে করে বসে আছ নাকি? তারপরে যে অনেক কাল কেটে গেছে। যুগান্তর ঘটেছে অনেক দেশে। জেলেও অন্যেরা অনেক এগিয়ে গিয়েছে!—শুধু কৌতুক নয়, একটা বিষাদও অমিতের কণ্ঠস্বরে।

কি রকম?—মোতাহের গম্ভীর সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করিল।

তারা অনেকে আজ মতে কমিউনিস্ট। কেউ কেউ কাজেও।

আর তুমি?—এটাই প্রশ্ন—তুমি কি করবে?

...সুনীল দত্ত যেন অমিতের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে...

কি করে জানব? রইলাম তো জেলে,—অমিত স্পষ্ট উত্তর জানে না।

মোতাহের আরও স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল: সেখানে তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দাও নি?

...সুনীল দত্ত ইহাই দাবি করিয়াছিল...অমিত বলিল: তুমি কি জানো না—আমি কোনো বিশেষ পার্টিতেই 'নাম লিখাই' নি?

জানি। আর তাই শুনতে চাই, কেন?—মোতাহেরের কথা স্পষ্ট। তাহাতে সৌহার্দ্যের দাবি আছে, কিন্তু আছে সেইরূপ দলানুবর্তিতার সুস্পষ্টতা। ইহাই

বিভূতিনাথের ভদ্র সুকৌশল আলাপে থাকিত না। কিন্তু এই স্পষ্টতা মোতাহেরের প্রকৃতিগত। এই বস্তু দিয়াই মোতাহেরের চরিত্রেরও পরিচয়।

অমিত মোতাহেরের দিকে তাকাইয়া একবার উত্তর দিল : কেন লেখাব নাম, তাই বরং তুমি বলো। এটা কি কংগ্রেস, সকল দলের প্লাটফর্ম? চার আনা দিয়ে সই করলেই সভ্য হয়ে গেলাম, সারা বৎসর আর কিছু করি বা না করি যায় আসে না। মুখে একটা 'ইজম্' বললে কি হয়? কাজের মধ্য দিয়ে টিকি কি না-টিকি বাইরে না এলে তা জানা যায় কি?

মোতাহের বুঝিল। একটু নীরব থাকিয়া বলিল, বুঝলাম, অমিতদা। কিন্তু সবাই তোমার এ কথা বোঝে নি—অন্ততঃ জেলে। অমিত সবিষাদে হাসিতে চেষ্টা করিল।...বুঝিতে চাহে নাই। সুনীলও বুঝিতে চাহে নাই—ইহাই বরং সত্য কথা। হয়তো তাহাও সেই বন্দিশালারই একটা গুণ—কাজের অধিকার যেখানে নাই, কর্মশক্তি সেখানে এইরূপ কাজের স্বরূপ লইয়া তর্ক করিয়া করিয়া আত্মক্ষয় করে।

মোতাহের অমিতকে নীরব দেখিয়া বলিল, যাক সেসব। বাইরে তো এলে, এখন তুমি কি করবে—কি ধরনের কাজ?

যার আমি যোগ্য এবং যার সুযোগ আমি পাই।

অর্থাৎ লেখাপড়ার?

অমিত হাসিয়া ফেলিল।—অন্য কিছুর পক্ষে অযোগ্য আমি—তুমিও একথা বলো? আমি কিন্তু মানি না। যে মেয়ে রাঁধে সে মেয়ে চুলও বাঁধে। তোমাদের যে লেনিন মজুর ক্ষেপায় সে-ই কলম চালায়,—এ কাজ এত অসম্ভব মনে করো না।

মোতাহের হাসিয়া বলিল, প্রমাণ পেলেই তা মানব। তুমি ভুলে গেলেও আমি তোমার কথা ভুলি নি, তা তো দেখলে। তবে বোমা পিস্তল নিয়ে আমাদের কাজ নয়, কলমই আমাদের বড় হাতিয়ার।—কলম, গলা, দুখানা পা। তুমি কলম চালাতে চাও ; তাতেও চলবে। তার উপরে গলা আর পা-ও যদি চলে, তাহলে তো কথাই নেই।

কি চলবে, কি চলবে না, তাও বোঝা যাবে কর্মক্ষেত্রে নামলে। পেটও চালাতে হবে তো। কিন্তু তোমার এখন কাজ কি মোতাহের? এবারকার চটকলের ধর্মঘটের সম্পর্কে কাগজে তোমার নাম দেখছিলাম একবার।

কোথায় কোন কাগজে?—মোতাহের জানিত না।

মোতাহের জানাইল—ল্যান্সডাউন হইতে জগদ্দল এলেকা, দুই পায়ের জোরে চষিয়া ফেলা, আপাতত ইহাই তাহার কাজ। তবে সুযোগ পাইলে মুখ খোলে, গলাও নিনাদিত করে, কথার বীজ বুনিতে চায় সেই পায়ে-চষা ক্ষেতে। অমিত যখন ধরা পড়িল তখন মোতাহের খুঁজিতে লাগিল অমিতের দলের মানুষদের। খুঁজিয়া পাইলও দুই একজনকে। সম্ভবত কেহই তাহারা অমিতের দলের নয়, কিন্তু সবাই বিপ্লববাদী। কে সাচ্চা কে ঝুটা, মোতাহের তাহা জানিত না। কিছুদিনের মধ্যেই তাই তাহাকেও যাইতে হয় অন্তরীণে। বৎসর দুই পূর্ব-বাংলায়

একটা দ্বীপে কাটাইয়া যখন আবার মোতাহের ফিরিল তখন 'জাহাজীদের' নেতা শরফুদ্দীন জেনেভা হইতে ফিরিয়াছে। ডক মজুরদের আপিসে আর মোতাহেরকে সে জায়গা দিল না। হাওড়ার দাস সাহেব তাহার পূর্বেই একবার পুলিশের জেরায় তটস্থ হইয়া কলিকাতা ছাড়েন। এখন কানপুর না গোরখপুরে একটা চিনির কলের তিনি স্যুগার টেক্‌নোলজিস্ট—চিনির কল এই কয় বৎসর উত্তর প্রদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। একমাত্র বাঙলা দেশেই তাহা সামান্য। কিন্তু শরফুদ্দীন তখন মোতাহেরের বিছানাপত্র মজুর আপিস হইতে দালাল লাগাইয়া টানিয়া বাহিরে ফেলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল। জাহাজীদের বলিয়া দিল—মোতাহের 'টেররিস্ট-দের' সঙ্গে পিস্তল চালানির কারবার করে। তারপর মোতাহের ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঠাঁই লইয়াছে নারকেলডাঙার একটা ঘরে। কাজ করে এই সেখান হইতে শুরু করিয়া জগদ্দল হাজীনগর পর্যন্ত চটকলের চক্রে।

খাওয়া-পরা?—অমিত জিজ্ঞাসা করিল।

নিজেরই যোগাড় করতে হয়।

অমিত বলিল, পার্টি থেকে পাও না?

টাকা থাকলে পেতাম।

মোতাহের মিথ্যা বলিবার মতো লোক নয়, তবু অমিতের বিশ্বাস করিতে কষ্ট হয়। অর্থাভাবে 'স্বদেশী বিপ্লবী'দের ডাকাতির পথ ধরিতে হয়,—অমিত সে পদ্ধতি অবশ্য অনুমোদন করিতে পারে নাই। কিন্তু বলিতেও পারে নাই অন্য কোথা হইতে টাকা আসিবে। সংগঠনের জন্য মস্কো টাকা পাঠাইলেও তাহাতে অমিত আপত্তির কারণ দেখিত না। না হইলে কি এই সংগঠকরা ডাকাতি করিবে? শ্রমিক-সংগঠকদের যদি শ্রমিকের পার্টি বা শ্রমিকের সংগঠন ভরণ-পোষণ না করে তাহা হইলে কি উপায়ে কর্মীরা কাজ করিবে?

মোতাহের জানাইল: করবে না। কাজ যদি করতে হয় খেয়ে বা না-খেয়ে করবে। যাদের সংগঠন তারাই ক্রমে তাদের সংগঠকের ভরণ-পোষণ করবে, এখনো পার্টির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে লাভ হবে না। 'মস্কো গোল্‌ডের' প্রত্যাশা যে করে সে দূরে থাকাই ভালো। বরং ব্রিটিশ গোল্‌ড সে পাবেও সহজে, নেবেও দুহাতে।

অমিত বুঝিল মোতাহের তাহার ও অন্য অনেকের সুপরিচিত সন্দেহের উত্তর দিতেছে। অমিত অবশ্য মানিত না—মস্কো গোল্‌ড ছুঁইলেই কর্মীদের জাত যাইবে। কিন্তু সাধারণের সন্দেহ তাহাতে বদ্ধমূল হইত। এমনিতেই কি তাহা বদ্ধমূল নয়? মোতাহের হয়তো সত্যই বলিতেছে। অন্তত সে যাহা জানে তাহাই বলিতেছে, ইহা অমিতের দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু কে মোতাহেরের কথা বিশ্বাস করিবে? আর কর্মীরা খাইতে পরিতে না পাইলে ইহাদের পার্টির কাজ কি করিয়া চলিবে?

অমিত বলিল: তা হলে 'স্টার্ভ এ্যাণ্ড ওয়ার্ক', এই তোমাদের মতো?

মোতাহের উত্তর দিল : না। 'ওয়ার্ক—স্টার্ভ অর নট।' ওয়ার্ক ছাড়া চলবে না।

অমিত চুপ করিয়া রহিল। মোতাহের হাসিয়া বলিল : কি অমিতদা, পছন্দ হল না কথাটা?

অমিত হাসিয়া বলিল, কি করে হবে? এতদিন ছিলাম জেলে—মানে, ঘর-জামাই। দ্যাখো, একঘর জিনিস সঙ্গে এসেছে, দেখে কার না হিংসে হয়? তখন শুনেছি সরকারী হুকুম, 'খাও। তুমি কাজ করো আর না করো, খাও।' অবশ্য জেলের নিয়মে যা খেতে পেতাম দুর্মূল্য হলেও তা অখাদ্য, তবু পরিমাণে অভাব ছিল না। আর তখন না-খেলে? তারই নাম 'হাঙ্গার স্ট্রাইক'। জেল কোডের মতে তা 'বিদ্রোহ'। না খেয়েছ কি পেয়েছ শাস্তি। এখন তোমরা একেবারে উল্টো হুকুম দিচ্ছ—'ওয়ার্ক—স্টার্ভ অর নট।' আর 'ওয়ার্ক' বলছ, কিন্তু সে 'ওয়ার্ক' যে কি তারই ঠিকানা নেই।

মোতাহের পরিহাস বোঝে। জানাইল : আছে। প্রথম ওয়ার্ক,—ঘোরো,—ভোঁ-ভোঁ, টো-টো,—দুপায়ের পরীক্ষা। তারপরের ওয়াক—বকো, মানুষ পেলেই মুখ খুলবে, বকবক করবে। তৃতীয় ওয়ার্ক—বৈঠক বসাও, সওয়াল তোলো, সভা মিলাও, ভাষণ দাও। চতুর্থ ওয়ার্ক—মিছিল করো—দাবি তোলো। পঞ্চম ওয়ার্ক—ইশ্‌তেহার লেখো, ইশ্‌তেহার বাঁটো। আর সব ওয়ার্কের সেরা ওয়ার্ক—হরতাল বাধাও, স্ট্রাইক চালাও। হাঁ স্ট্রাইক এখন বাধে অমিতদা, মজুরেরও মাথায় সে খেয়াল জুটেছে। নিজেকেই তারা প্রশ্ন করে—তার 'নাফা' কি হল? বাবুলোকেরা ভোটের জন্য দৌড়াদৌড়ি করে 'স্বরাজ' আনছে, কিন্তু তাতে মজুরের ফয়দা কি?

মোতাহেরেরও বুঝি মুখ খুলিল, সে ভুলিয়া গিয়াছে এটা চটকলের বৈঠক নয়। অমিত সাগ্রহে, সকৌতুকে শুনিল—মজুর কেন্দ্রের মজুর-ভোটদাতার নানা বাধা। তাহাদের নাম ভোটারের তালিকায় ওঠে না, ভোটের কেন্দ্রেও তাহাদের ঢোকা প্রায় দুঃসাধ্য। অবশ্য ভোটের বাকস দিয়া মজুরের মুক্তি আসে না, আসে শাসক শ্রেণীর ক্ষমতা ভাগাভাগি, তাহা আর অমিতকে বলা নিষ্প্রয়োজন। তবু ভোটের ফাঁকটাও ফাঁক। আর সেই ফাঁকেও এবার যেটুকু হাওয়া বহিয়াছে, তাহাতেও উড়িয়া গিয়াছে কয়েকটা পুরাতন শকুনি। শরফুদ্দীনকে হটানো যায় নাই, আরও দুই-একজন রহিয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নাম ভাঙাইয়া খায় যে বাস্তুঘুঘুগুলি সেই সুবিধাবাদীরাও এই সুযোগে কিছু কিছু আসিয়াছে। কমিউনিস্ট পার্টি তো বে-আইনীই। মীরাট মামলার পরে এখনো তাহাদের দাঁড়াইবার মতো অবস্থা হয় নাই। মজুরের নিজের পার্টি প্রকাশ্যে এখনো মজুরের কাছে তাই উপস্থিত হইতে পারে না। তবু মানুষের চেতনায় নতুন নতুন বোধ জাগিয়াছে। আর তাই এ অসম্ভব প্রতিকূল অবস্থা ঠেলিয়াও এখানে-ওখানে মজুরের খাঁটি প্রতিনিধিও দেশের সামনে আসিয়া এবার দাঁড়াইয়াছেন। ইহা শুধু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, ইহা বাঙলার মজুর আন্দোলনের ইতিহাসেরও এক নতুন সূচনা। মজুর আপনাকে চিনিতে শুরু করিল, তাহার পার্টিকেও চিনিতে শুরু করিবে।...

সেই দৃঢ় স্পষ্টভাষী মোতাহের, বিন্দুমাত্র যাহার মনে সংশয় নাই।...কত প্রভেদ তাহার সঙ্গে সেই অস্থির, অশান্তচিত্ত সুনীলের। সত্যই কি সে 'কমিউনিজম'-এর জটিল তত্ত্ব ও রোমাঞ্চকতাহীন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারিত? না, তাহা আভিজাত্যগর্বিত পরিবারের ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে সুনীলের বিদ্রোহ, অমিতের সংযত বিচার-বুদ্ধির বিরুদ্ধে অভিমানের উগ্র বিক্ষোভ? না, আকৈশোর প্রিয়-বান্ধবী সেই নিরপরাধা ভ্রাতৃবধূ ললিতার আত্মধিক্কৃতি? শত ইজমও ললিতার অপেক্ষা বড় নয় সুনীলের পক্ষে।

মোতাহের জানাইল—মজুরের মনেও প্রশ্ন জাগিয়াছে। বছরের পর বছর বাজার মন্দা গেল, কলকারখানার কাজ কমিল। চটকলে তো মজুরের দুর্দশার একশেষ গিয়াছে। তাঁত বন্ধ, কাজের ঘন্টা সংক্ষিপ্ত, ছাঁটাই বেপরোয়া। এইভাবে মজুরিও যাহা দাঁড়াইল তাহাতে মানুষ ছার, ইঁদুরও বাঁচিতে পারে না। মজুরেরাও আসলে বাঁচে নাই, মরিয়াছে। যাহার বাঁচিবার কথা ষাট বছর সে ইহার ফলে মরিবে পঞ্চাশে। আর তাহার ছেলেপিলে মরিবে তাহার চোখের উপরে—তিনটা জন্মিলে একটা বাঁচিবে। ইহাকে বাঁচা বলে না—স্লো-ডেথ বলে। কিন্তু আজ তো সেই মন্দার বাজারও মালিকরা কাটাইয়া উঠিয়াছে—তখনো তাহাদের অবস্থা অবশ্য সে তুলনায় খারাপ ছিল না। কাহারও পুত্র পরিবার মরে নাই, বেশি হইলে বিলাসের বহর কমাইতে হইয়াছে। এখন মালিকের অবস্থা আরও ভালো হইতেছে; তাহা হইলে মজুরের অবস্থা এখন ফিরে না কেন? ফিরিবে না, সংগ্রাম না করিলে ফিরে না। সংগ্রাম করিলেই কি সহজে ফিরে? না। এই তো চটকলের এত বড় ধর্মঘট গেল। গঙ্গার এপারে ওপারে আড়াইলক্ষ তিনলক্ষ মজুরের এমন ব্যাপক আয়োজন—কেবল মোতাহেরের মতো কর্মীদের উসকানিতেই কি তাহা জ্বলিয়াছে? না, অনেক আগুন মজুরের মনে জ্বলিতেছে বলিয়াই জ্বলিল এই মজুর হরতাল। অবশ্য নতুন শাসনতন্ত্র, নতুন মন্ত্রিত্বের কথা আগুনের ফুলকির মতো ইহাদের মনে আসিয়া উড়িয়া পড়িয়াছিল তাহা ঠিক। কিন্তু খপ করিয়া নিবিয়াও গেল সব। কারণ সংগঠন নাই, মোতাহেররা কাজ করে নাই। সংগঠন থাকিলে মজুরদের প্রতারণা করা বা এই হরতাল বানচাল করা মালিকদের পক্ষে এত সহজ হইত না। প্রধানমন্ত্রী হক সাহেবের কথা দিতে কোনো দিন বাধে না। কোনো দেশের কোনো শাসকই কথা রাখিবার জন্য মজুরের নিকট কথা দেয় না। হক সাহেবও দেন নাই, ঠক সাহেবও দিতেন না। তাই এমন আম হরতালেও কী যে চটকলের মজুরেরা পাইল তাহার ঠিক নাই। মজুরেরা বড় রকমের ভুল করিয়াছে। উপায় নাই; এখনো তাহাদের চেতনা অনেকটা আচ্ছন্ন। এখনো তাহারা কথায় ভোলে, চালে ভোলে, কংগ্রেসের নাম শুনিলে আশা পায়, বড়লোকের ভরসা পাইলে নিঃশঙ্ক হয়;—এমন কি দুর্বৃত্ত ডাকাত যাহারা শরফুদ্দীনের মতো দালাল, তাহাদের হাতেই আত্মসমর্পণ করিয়া স্বস্তি চায়। দেবতা না পাইলে ভাবে দৈত্যও সহায়তা করিতে পারে। অর্থাৎ বাঁচিবার পথ নয়, তাহারা ফিকির খোঁজে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চেতনায় এই বোধও আসিয়াছে—

সংগ্রামেই মজুরের বাঁচিবার পথ। তাই শুধু বড়-কথার দালালদের ভোট দিয়া মজুরেরা নিশ্চিন্ত হয় না, ধর্মঘটও করে। মজুরের এই বোধকে দৃঢ় করা, ব্যাপক করা, তীব্র করা,—এই তো মোতাহেরদের কাজ। ল্যানসডাউন হইতে জগদ্দল পর্যন্ত সকালে বাহির হইয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘোরা, কথা বলা, বক্তৃতা করা—এই তাই মোতাহেরের রুটিন।

যাবে অমিতদা?—

সময়ের হিসাব না থাক অমিতের আহারের প্রস্তাব লইয়া অনু যে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে, না বলিলেও তাহা বুঝিবার মতো চক্ষু মোতাহেরের আছে তাই 'বক্তৃতা' শেষ করিল। তাই নিজেই বিদায় লইবার জন্য সে দাঁড়াইল। আর বলিল: যাবে অমিতদা?

নিশ্চয়।—অমিত দাঁড়াইয়া উঠিল। জানাইল, কিন্তু আপাতত কলিকাতা শহরের বাইরে পদার্পণও নিষিদ্ধ।

নিষিদ্ধ রাত্রি নটার পরে বাইরে থাকাও, আর আমার মতো রাজনৈতিক সন্দেহভাজনের সঙ্গে বাক্যালাপও। সে হুকুম জানি। গোপনেই এসেছি। শ্যামলের সঙ্গে দেখা হল, শুনলাম তুমি এসেছ, আর থাকতে পারলাম না। তোমাকে দেখতে আসি নি, শুনতে এলাম তোমার কথা—কেন তুমি মজুরের পার্টিতে নাই? বলতে এলাম তোমাকে মজুরের কথা—একদিন ডকের এলাকায় আমাদের মতো তুমিও মজুরের আন্দোলনে ঝুঁকেছিলে। বলতে এলাম,—বসে নেই সে মজুর—নতুন দিন আসছে—মজুর পা বাড়িয়েছে পথে—

'পথে!'—অমিত দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল, চমকিত হইল, 'পথে'। নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমিও তো পথেরই মানুষ অমিত—তা তো ইন্দ্রাণীরও কথা। তাই না?

বেশ, মোতাহের, আমি পথের মানুষ। পথেই তবে আমাকেও পাবে। মোতাহের হাত বাড়াইয়া দিল। সবলে হ্যাণ্ডশেক করিয়া বলিল, তা-ই চাই, কমরেড অমিত।

জগৎ হইতে জগদান্তরের স্পর্শ যেন সঙ্গে সঙ্গে বহিয়া আসিল।

মনে পড়িতেছে সুনীলের মুখ।...

* * * * * * * *

সমস্তটা দিনের এলোমেলো দুর্বার ঘটনারাশি এবার কি একটা পরিণতিতে গিয়া পৌঁছিতেছে?—সমস্ত দিনের প্রশ্ন ও ঘটনারাশির তলে—সমস্ত তীব্র অনুভূতি ও সহজ কৌতুক কৌতূহলের মধ্যেও—একটা অনুক্ত শপথ, একটা আত্মপ্রতিশ্রুতি—তাহার এই পরিপূরণই দাবি করিতেছিল কি? এইবার কি অমিত অন্য দিনের নিশানা পাইবে? অমিতের পৃথিবী নানা গ্রহ-উপগ্রহ আর নীহারিকা স্রোতের মধ্য হইতে গড়িয়া উঠিবে—গড়িয়া উঠিতেছে;—অমিত সেই আশা, সেই আশ্বাস পাইতেছে।

সদর বন্ধ করিয়া অমিত ফিরিয়া আসিল। বসিল, বসো অনু। মনু আসুক, একসঙ্গে খেতে বসব তিনজনা। ততক্ষণ বসো কথা বলি—

এক মুহূর্তও সময় পেলাম না দাদা, তোমার সঙ্গে কথা বলি—অনু বলিল।

তাই তো অমিত ভাবিয়া পায় না সারা দিনে কি করিল...অনুর সহিতও ভালো করিয়া কথা বলিবার সময় হইল না। আশ্চর্য মানুষ তুমি, অমিত। দিনের জোয়ার-ভাঁটায় একেবারে ভাসিয়া গিয়াছ। যাইবেই তো, উপায় নাই। এত কাল তোমার একান্ত জগতের যত সত্য আর যত মিথ্যা লইয়া তুমি খেলা করিতেছিলে, সেই খেলাঘর আজ ভাসিয়া যাইতেছে। পৃথিবীর দিগ্‌দেশের জোয়ার এবার তোমার জীবন-গঙ্গায় আসিয়া গেল ; তোমার স্বপ্ন ও সত্যকে উহার অন্তস্থলে টানিয়া লইল। ইহা সাধারণ জোয়ার নয়। কোটালের বান ডাকিতেছে আজ ইতিহাসে—তোমার জীবন-গঙ্গায়—তোমার গৃহাঙ্গনেও।

কিন্তু অনু বসিয়া আছে—আর কী কাণ্ড অমিত নিজের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেছে। অথচ অনু অপেক্ষা করিতেছে—দাদা কি তাহাকে কিছু বলিবেন না? সারাদিন দাদা কিছু বলেন নাই। বলিবার সময় পান নাই, অনুও যাচিয়া সময় চাহে নাই, —চাহিবেই বা কেন, দাদা কি অনুর এই আশাটুকু বুঝেন না? হয়তো বুঝিলেও এতক্ষণ অবকাশ পান নাই। কিন্তু এখনো কি দাদা কিছু বলিবেন না? কিছু বলিবেন না—শ্যামলের বিষয়েও?...একটি প্রশ্ন, একটি সহজ জিজ্ঞাসা, একটি পরিচ্ছন্ন শুভ্র ইঙ্গিত?—এইরূপ কিছুই কি করিবেন না, দাদা?

অমিত বুঝিল আপন মর্যাদায় ও ধৈর্যে অনু অপেক্ষা করিতেছে। অমিত তাহার দাদা,—হোক সে অমিত, আজ আনন্দ-উন্মাদনা স্মৃতিতে ভাবনায় আবর্তিত, তবু সে-ই অনুর অগ্রজ।

অমিত বলিল, তোমরা ছাত্ররা আজকাল সবাই কমিউনিস্ট, অনু?

না, দাদা। কেউ এ-দল কেউ ও-দল। দলের শেষ নেই।

তুমি কোন দলে, অনু?—সস্নেহে অমিত প্রশ্ন করিল।

অনু আস্তে আস্তে মন খুলিল। সে কোনো দলে নয়। দল কি খেলা করিবার মতো জিনিস? দেখিতে হইবে, ভাবিতে হইবে, বুঝিতে হইবে—তারপর পরীক্ষা করিতে হইবে—নিজেকে ও দলকে। তবেই তো দলে যোগ দিতে পারা যায়।

এ কি অনুর নিজের ভাবনা? না, মোতাহেরের সঙ্গে দাদার আলোচনা সে শুনিয়াছে, ইহা দাদার অনুগামিতা? অমিত প্রশ্ন করিল : তা হলে এই সভা মিছিল রাজনীতি এসব ততক্ষণ বর্জন করেই চলতে হয়, কি বলো।

বর্জন করলে আর বুঝব কি করে, জানব কি করে, পরীক্ষা করব কি করে।

না অনুর কথা দাদার প্রতিধ্বনি নয়।—তা হলে কি করছ? ধরি মাছ না ছুঁই পানি?—পরিহাস-সহজ কণ্ঠে অমিত বলিল।

হাসিয়া সহজ কণ্ঠে অনু বলিল, না। ধরি মাছ, না ঘোলাই জল। মাছ

ধরার জন্য জল ঘোলাবার দরকার নেই। সাঁতার না শিখে ডোবায়ও ডুবব না সমুদ্রেও ভেসে যাব না—

অমিত খুশি হইতেছিল। বলিল, কিন্তু জলে তো নামতে হবে—

নিশ্চয়। আমি বিজ্ঞান পড়ছি.. প্র্যাক্‌টিস-এ কষে বুঝব কোন থিওরি কত সত্য,—নইলে বিজ্ঞান পড়লাম কেন?

অমিত পুলকিত হইল।—এই তো নতুন যুগ, নতুন যুগের মেয়ে। মেয়েরা শুধু আর 'মেয়ে' নয়। সুরোর মতো শুধু মেয়ে নয়—ভালোবাসিয়াই যাহারা শেষ হয়। কিংবা ভালোবাসিতেই যাহারা পারে নাই, সমাজের চিরাগত প্রথায় পত্নীত্ব মাতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে, গ্রহণ করিয়াছে সংসার, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা। ইন্দ্রাণী সত্য কথা বলিয়াছে, তাহারা গ্রহণই করিয়াছে, কিন্তু অর্জন করিতে শিখে নাই—ইন্দ্রাণীর এই বিচার সত্য। অনায়াসলব্ধ সে সংসার জীবন, নিরুদ্বেগ সে গৃহ-জীবন,—লতা-পাদপের মতো সরল আর সহজ। কোথায় তাহাতে মানুষের জীবনের অপার বিস্ময়;—বেদনা, জটিলতা, সংগ্রাম, আত্ম-জিজ্ঞাসা—আর সর্বশুদ্ধ সত্তার প্রসারতা। কিন্তু সেই যুগ আসিয়াছে—অন্য দিন আজ। শুধু সমাজ-জিজ্ঞাসার সত্য-জিজ্ঞাসার, আত্ম-জিজ্ঞাসার দিন নয়; স্বীকৃতির যুগ, সৃষ্টির যুগও। জিজ্ঞাসার যুগ ছিল অমিতের যুগ। অনুদের যুগ শুধু জিজ্ঞাসার নয়, স্বীকৃতির যুগও। তাহারা হৃদয় দিয়া শুধু গ্রহণ করে না; বুদ্ধি দিয়াও বিচার করে। আর গ্রহণ যাহা করে, গ্রহণ করে মানুষের মতো। আজ অন্যদিন—সেদিন আর নাই—নাই বিচারহীন সেই অধীর আত্মদানের দিনও—সুনীলদের অধীরতার দিন...

অমিত আবার বলিল: কিন্তু শ্যামল? সেও কি কোনো দলে নেই?

দলে ঠিক নেই এখনো, তবে সে কাজ করছে কমিউনিস্টদের মতো। আর কাজই সে চায়। বিচার-বিশ্লেষণ নয়, কাজেই বরং ওর আগ্রহ।

...কাজই সব, অমিত; কাজই সকল চিন্তার প্রমাণ; তাই না?...

অনু শ্যামলের কথা বলিতে লাগিল। কোথাও কুন্ঠা নাই, আত্ম-বিস্মৃতি নাই, সহজ সৌহার্দ্যকে অকারণে জটিলতাময় করিয়া তুলিবার মতো কোনো কারণ নাই। অমিত শুনিতে শুনিতে আবার কখন শুনিতেও ভুলিয়া যায়। সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না—ইহা কি এই যুগের তরুণ-তরুণীদের সহজ বন্ধুত্ব? না, বন্ধুত্বের আবরণে ইহা চির-যুগের তরুণ-তরুণীদের অনুরাগ ভালোবাসা। হয়তো এই সৌহার্দ্য,—অকপট আর সংশয়-লেশহীন—যেমন মনু ও সবিতার প্রীতি-সম্পর্ক।... কিন্তু তাহাও কি শুধুই প্রীতি? দুই সহপাঠীর সহজ প্রীতি? প্রাণাবেগের আলোড়ন জাগে নাই মনু ও সবিতাকে ঘিরিয়া?—জাগে নাই অনু শ্যামলকে জড়াইয়া?—অমিত কি এই কথা অনুকে জিজ্ঞাসা করিবে? অনু ছাড়া আর কে বুঝিতে পারিবে মনু ও সবিতার এই প্রীতি-সম্পর্কের নিগূঢ় রহস্য? মনু না বুঝিতেও পারে। সংসারকে মনু সহজ প্রাণবান্ মানুষের মতো গ্রহণ করিয়াছে। হাসিবে, গল্প করিবে, নিজ শক্তিতে জীবিকা অর্জন করিবে, নিজের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া

সবল সতেজ পুরুষের মত জীবনযাপন করিবে; তাহাদের অভাবের সংসার মনুকে —অন্তর্মুখী হইবার অবকাশ দেয় নাই। আত্ম-বিচারের ও মনোবিশ্লেষণের সময় মনুর নাই, সেই প্রকৃতিও হয়তো তাহার বিশেষ ছিল না। কিন্তু অনুর জীবনে এইরূপ বহির্ব্যাপ্তির সুবিধা ঘটে নাই। মাতৃহীন গৃহে সে গৃহের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। আপনা হইতেই পিতার ভার লইয়াছে, নিজের ভারও লইয়াছে। সে দেখে, চিনে, জানে, বোঝে, বিচার করে,—আর তারপরে তেমনি কুয়াশাহীন দৃষ্টিতে গ্রহণও করে সুস্থ মনে। অনু কি তবে সবিতাকে মনুকে দেখে নাই? অথবা, অনুও এতদিন মনু ও সবিতাকে দাদার আদর্শ ছায়ায় সমাশ্রিত সহযাত্রী ও সহযাত্রিনীরূপে দেখিয়াছে? মনে করে মনু ও সবিতা অমিত-তীর্থের দুই সতীর্থ মাত্র। তা হলেও অনু এবার দেখিবে, অবিলম্বে দেখিবে, অমিতের মতোই অনুও দেখিবে,—আপনাদেরই অজ্ঞাতে মনু ও সবিতা কোন নিগূঢ় সত্যকে সপ্তপাকে ঘিরিয়া গ্রহণ করিয়াছে। অনু নিশ্চয় বুঝিবে— এই সত্যকে অস্বীকার করা যায় না, আপনার অজ্ঞাতেও কোনো সত্যকে এড়ানো সম্ভব নয়। অস্বীকার করিতে করিতে, এড়াইয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ কোনো বাঁকের মুখে...কোন এক বাস স্টপের ছায়ায় হয়তো—সত্যের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াইতে হয়। আর সেই এক নিমেষে সকল জীবন এই কথা উপলব্ধি করে—হয়তো একটি আহ্বানে, একটি চাহনিতে—ইহাই নিয়তি। মিথ্যা দিয়া আপনাকে আবৃত করা কত মিথ্যা, কত অসম্ভব। সত্যের সেই প্রলয়দীপ্তির সম্মুখে সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক আলো কত নিষ্প্রভ। সত্যের সেই বজ্রালোকে তখনই আবার বুঝা যায়—পৃথিবী কত সুন্দর, মানুষ কত সত্য, আর জীবন কত বড় এক জয়যাত্রা। সেই রূঢ় জাগরণ তবে মনু ও সবিতার চেতনায় আসুক—যাহা আজ অমিতের জীবনে আসিয়াছে!

অমিত বুঝিল তাহার চিন্তামগ্ন দৃষ্টি অনুর চোখ এড়ায় নাই—শ্যামলের কথা অমিত কখন ভুলিয়া গিয়াছে। অমিত তাই বলিল—শ্যামলের সম্বন্ধে আপনার আগ্রহ বুঝাইবার জন্যই বলিল :

শ্যামল কাল আসবে তো, অনু?

না। কাল তোমার কাছে অনেকে আসবেন। মিনতিদি, 'ইন্দ্রাবউদি'...

ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছে অনু!—অমিত সহজভাবে জানাইল।

'ইন্দ্রাণী'—। 'ইন্দ্রাবউদি'?—বলিল অনু।

অমিত 'ইন্দ্রাবউদি' বলে নাই, অমিত বলিয়াছে 'ইন্দ্রাণী',—অনুর তাহা কান এড়ায় নাই। কিন্তু সত্যের সেই বজ্রাগ্নি-লেখা এই গৃহে পড়ুক,—অমিত তাহা আর আচ্ছাদন করিতে চাহে না। অনু তারপর সবিস্ময়ে বলিল : তিনি যে তোমার খোঁজে এখানে এসেছিলেন।

অমিত স্থিরভাবে বলিল, তাও বললেন। দেখা হল বাস স্টপের নিকটে, লোকের ভিড়ে। তাঁর ফ্ল্যাটে গেলাম, তাই দেরি হল,—কিছুই জানতাম না তাঁর খবর।

অমিত আর কিছু বলিতে চাহে না এখন। আজিকার মতো ইহাই যথেষ্ট।

অনুর পক্ষে যথেষ্ট। আর অমিতের পক্ষে আজ যথেষ্ট হইবে এমন কথা কোথায়, বাণী কোথায়? কোথায় তেমন একখানা খেয়াল কিংবা ধ্রুপদ সেই শূন্যে শূন্যে অনুরণিত বিশ্বস্পন্দনের প্রতিধ্বনি?.

অনু তথাপি একটু অপেক্ষা করিল। তারপর বলিল: আমরাও তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারি নি। তাঁর বাবা-মা সিঙ্গাপুরের ব্যারিস্টার স্বামী সেবার এখানে এসে তোমাকে দোষ দিয়ে গেলেন—তুমিই তাঁর মাথায় রাজনীতি ঢুকিয়েছ।

অনু চুপ করিল। অমিত হাসিতে লাগিল। পরে বলিল: কথাটা মিথ্যা। কিন্তু একেবারে মিথ্যা নয়, অনু। ওঁর মাথা ছিল, তাই রাজনীতির খেয়াল ওঁর মাথায় ঢুকল। নইলে ঢুকত অন্য খেয়াল—হয়তো 'ভারতী' মাতা কিংবা 'মহানন্দী' স্বামী; কিংবা ফ্যাসান ও ফিল্ম, নইলে 'নারীস্বাধীনতা সংঘ'।

অনু প্রীত হইল না। একটু নীরব থাকিয়া বলিল: 'ইন্দ্রাবউদি'। আপনার খেয়ালেই আপনি চলেন। ভাবেন উনি একাই যথেষ্ট, 'উম্যান্ কোশ্চেন' মিটিয়ে দেবেন একাই। উনি যা করবেন তা হবে দৃষ্টান্ত, অন্যেরা অনুসরণ করবে। বড় 'ইনডিভিডুয়েলিস্ট'।

অমিত চমকিত হইল। 'দর্পিতা ইন্দ্রাণী' আপনার ভাগ্যজয়ের উন্মাদনায় উন্মাদ, ইহা অমিতও ভাবিয়াছে। তবু খানিক আগে ইন্দ্রাণী অমিতকে নিজের জীবনে স্বীকার করিয়াছে। তাহাকে 'দর্পিতা' বলিবে কি করিয়া কেহ? অমিত ইতস্তত করিতেছিল। কিন্তু অনু তাহার সংশয়কে যেন ছিন্ন করিয়া দিল।—ইন্দ্রাণী আপনাকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না, দশজনের সঙ্গে নিজেকে কোনো ব্যাপক আয়োজন সংযুক্ত করতে পারে না। ইন্দ্রাণীর আত্মনির্ভরতা কি আত্মম্ভরিতায় পৌঁছিতেছে? শেষে কি উগ্র অ-সামাজিকতায়, সমাজদ্রোহিতায় গিয়া সে পৌঁছিবে?...ইন্দ্রাণী জানে না তাহার আসল শত্রু স্বামী নয়, সংসার নয়,—অমিত নয়,—সে নিজে, তাহার অস্থির আত্মস্বাতন্ত্র্য। উহা তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিবে, সার্থক হইতে দিবে না। নিজেকে না দিলে নিজেকে মানুষ হারায়। কিন্তু নিজেকে কি ইন্দ্রাণী দিতে পারে না, অমিত? দেয় নাই আজ সন্ধ্যায় কাহারও হাতে?...

প্রশ্ন অমীমাংসিত রাখিয়া অমিত হাসিয়া বলিল, ঠিক, অনু। কিন্তু অন্যদের সে আগ্রহও নেই। তাঁরা আসলে নারী সমস্যা মিটিয়ে দিতেও চান না, শুধু চান নিজেদেরই।...

অনু আপত্তি করিল না, সম্ভবত স্বীকারও করিল না। একটু পরে বলিল: যাই যিনি চান দাদা, চান তো নিজে—কিন্তু তোমাকে দোষ দেওয়া কেন? দ্যাখো, সুরোদির স্বামী পশুপতিবাবু সেবার কি কাণ্ডই বাধালেন। তিনি বিলিতি কোম্পানির অফিসার। মানী লোক, অনেক প্রোস্পেক্ট। তবু কিনা সুরোদি তোমাকে জেলে চিঠি লিখতেন। পুলিশ সে চিঠির সূত্র ধরে এসে খোঁজ করেছিল পশুপতিবাবুর বাড়িতে। এ করলে আর তাঁর মান থাকে? লোকেই কি ভাল

বলবে সুরোদিকে? একটা অফিসারের ওয়াইফ, মেয়েও আছে তাঁর,---ইত্যাদি। পশুপতিবাবুর কথাবার্তা বিশ্রী---স্থূল দাম্ভিকতা। সুরোদিও দুমড়ে মুষড়ে গিয়েছেন—সে মানুষ আর নেই। কিন্তু বলো তো দোষ কার?

একটা করুণ আখ্যায়িকা সাধারণভাবেই শেষ হইতেছে—সুরো আর সেই সুরো নাই। অমিত তাহা অনেকদিনই অনুমান করিয়াছিল। সেন্সরের মসীলিপ্ত পত্র সুরোর নিকট হইতে, বহুদিন অমিতের নিকট আসে নাই। অথচ তাহাদের সম্পর্কটুকু কত সরল ও অকৃত্রিম ছিল। বয়ঃকনিষ্ঠা অনুজার সগর্ব ভক্তি দাদার উদ্দেশ্যে—দাদার গৌরবে ভগিনীর গৌরব-বোধ। অন্য কেহ উহার মূল্য দিবে না—শত্রুও না, মিত্রও না! কারণ, সুরো অমিতের সহোদরা নয়... অতীত-প্রায় পৃথিবীর আর-একটি বলি সুরো। এমনিতরই মধ্যযুগের সমাজের নারীর পূজা। তাহারা কাব্যের উপেক্ষিতা নয় তাহারা মর্ত্যের উপেক্ষিতা। কিন্তু অনু একালের মেয়ে কি করিয়া তাহাতে সান্ত্বনা পাইবে? মাতৃহীনা, ভ্রাতৃগর্বিতা এই বালিকাকে যে অকারণে দাদার এই অপমান একা-একা সহিতে হইয়াছে।

অমিতের বন্ধুদের কথা অনু ক্রমে জানাইল। সুধীরা প্রথম প্রথম আসিতেন পরে তাঁহার ছেলে হইল, আর সুধীরা সময় পান না।...অমিত জানে—এমনি হয়। আর তাই মনে মনে হাসিল। শুনিল, সুহৃদ্‌ও ফিল্ম লইয়া মাতিয়াছে, দক্ষিণ কলিকাতায় তাহাদের বাড়িতে গান বাজনা লাগিয়াই আছে। সুধীরারও ঝোঁক সেদিকে গিয়াছে। আশ্চর্য মানুষ অপূর্বদা—অনু বলে। কিন্তু অমিত আশ্চর্যের কিছুই দেখে না। অপূর্ব আপনার গুণেই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করিয়াছে—এখন তাহার উঠিবার সময়। যতই সে অমিতকে ভালোবাসুক, পুলিশকে সে বড় ভয় করে। কিন্তু এরূপ মানুষ সাহিত্য লেখেন কি করে?—অনু তাহা বুঝিতে পারে না।

অমিত হাসিয়া বলে: মানুষটা লেখক-মানুষ বলে।

লেখাই কি সব? তার থেকে বড় আর কিছু নেই?

হঠাৎ অমিতের মন আবার চমকিত হইয়া উঠিল।—সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল দত্ত, জ্যোতির্ময়, তোমরা সত্য করিয়া বলো তো লেখাই কি মানুষের সব? চিন্তাই কি জীবনের ভাষা? না, তাহা জীবনের শুধু বক্রোক্তি? কীট্‌সেরও জীবনদর্শনে ফাইন রাইটিং আসে নেকস্ট্‌ টু ফাইন ডুইং। কীট্‌সের তুলনায় কে তুমি তবে অপূর্ব, আর কিই-বা তবে তুমি অমিত?—

অনু বলিতেছে: তার চেয়ে বিকাশদার কথাও বেশি বুঝি। ছবি বিক্রি হয় না, ঘরে নিদারুণ অভাব। তাঁকে পাগলামোতে পেয়েছে। বলেন—'সব ফাঁকি। আর্ট নয় বুজরুকি।' মদ খেতে শুরু করেছেন। কোথা থেকে তোমার খবর পেয়ে তবু আজই ছুটে এসেছিলেন। কাল হয়তো সে কথাও ভুলে যাবেন নিজেই। আজ কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে আমাকে বললেন, 'এবার আমাদের আসর জমবে আবার, অনু।'

জীবনের খাতার এক-একটা ছেঁড়া পাতা যেন উড়িয়া উড়িয়া যাইতেছে। কিছুই মিথ্যা নয়, অসঙ্গত নয়, কিন্তু খাতার বাঁধন খুলিয়া সবই যেন ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

আবার কি ইহাদের সাজাইয়া, গুছাইয়া অমিত বাঁধিয়া লইবে আপনার জীবনের কাহিনীতে? আবার আসর জমিবে—সুহৃদের সঙ্গে গান লইয়া অমিত মাতিয়া উঠিবে, ছবি লইয়া মাতিয়া উঠিবে বিকাশের সঙ্গে। সাহিত্য লইয়া, কাব্য লইয়া অপূর্বর সঙ্গে অমিত রসাস্বাদনের আনন্দে যোগ দিবে?...কিন্তু 'লেখাই কি সব?' গতিময় পৃথিবীর জীবন ততক্ষণে দুর্বার দুর্জয় হইয়া উঠিবে,—স্পেনে, চীনে, ভারতে। প্রতি দেশের মাঠে-মাঠে কারখানায়-কারখানায়, স্কুলে-কলেজে! এ দেশের ছেলেরা যখন শ্যামলের মতো জনশক্তির পুরোধা হইয়া উঠিতেছে, মেয়েরা যখন পুরুষের সহযাত্রিনী হইয়া উঠিতেছে—ঘরে, বাহিরে, পথে,...গান-ছবি-লেখা? পথে পথে যখন অমিতের জন্য আহ্বান নতুন মিছিলের, পথে পথে যখন অমিতের জন্য অপেক্ষা তাহার নিয়তির—এ যুগের দৃষ্টির, এ যুগের সৃষ্টির...

মনু আসিয়াই উৎসাহভরে জানাইল—মিস্টার মেহতা পরশুদিন অমিতকে চায়ে নিমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। তিনি জানিতে চাহিয়াছেন—এবার অমিতবাবু কি করিবেন? তাঁহার মতো লোকদেরই চাই আজ দেশগঠনে। গবর্নমেন্ট্ অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট্ দিয়া কি হইবে? চাই স্যর বিশ্বেশ্বরায়ার মতো লোক। মিস্টার মেহতার হয়তো ইচ্ছা তাঁহার সামাজিক-আর্থিক সাপ্তাহিক পত্র ইণ্ডিয়ান ইকোনোমিস্ট্-এর ভার এখনি কিছুটা অমিতকে দেন।

অমিত শুনিতেছিল। অযাচিত ভাবে এই মুহূর্তে সুযোগ আসিতেছে!—ইহার পরে তাহা সুলভ হইবে না। দেশগঠন, শিল্পোন্নয়ন, ফাইব্‌ইয়ার-প্ল্যান— আর অমিতের ভগ্ন সংসারের কোনোরূপে আবার পুনর্গঠন, কোনোরূপে অমিতের, মনুর, অনুর গৃহজীবনের প্রতিষ্ঠা; তাহারও আত্ম-প্রতিষ্ঠা...অমিত আপাততঃ মেহতার কাগজের ভার লইলে হয় না? তাহাকে উপায় করিতে হইবে—নিজের জন্য, সংসারের জন্য।—ওয়ার্ক এণ্ড লিভ, না, 'ওয়ার্ক---স্টার্ভ অর নট্?' ইহার কোন্ পথ গ্রহণ করিবে, অমিত—কোন পথ?...

সে দেখা যাবে পরে---বলিয়া অনু---দুইজনাকে ডাকিয়া লইল।---এখন সকলে আহারে বসবে, এখন আর গল্প নয়।

অর্থাৎ গল্পই। যে গল্প এতক্ষণ এ বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল, তাহাই এবার ভাই-বোনের একান্ত সংসারের মধ্যে এখন নামিয়া আসিতে পারিল। মনু এখনো পুরাতত্ত্ব বিভাগে চাকরি পাইতে পারে। সে বিভাগ তাহার ভালোই লাগিবে। তবে মনু কলিকাতা ছাড়িতে চাহে না। এতদিন ছাড়া সম্ভব ছিল না। নতুন নতুন আবিষ্কারের সাধ তাহার মনে। সবিতার মতো সে শুধু ভারতীয় সভ্যতার আধ্যাত্মিকতায় বা রূপসাধনায় মুগ্ধ হয় না। সে সব অপেক্ষা মনু পুরাতত্ত্বেই আনন্দ পায়—আনন্দ পায় মানুষের জীবনযাত্রার উপকরণ বুঝিতে। তাহা যে মূলত বস্তু-প্রধান, ভাব-প্রধান নয়, অমিতের এই কথায় মনুর আপত্তি নাই। কিন্তু সকলে ইহাতে নিঃসংশয় নয়। সবিতা তো নয়ই...

খাওয়া শেষ হইতেই অনু ঘোষণা করে---আর আলোচনা নয়। আজ এখন

বিশ্রাম করবে, দাদা, বিশ্রাম তোমার চাই,—তোমার মুখ দেখেই তা বুঝতে পারা যায়—বিশ্রাম তুমি চাও।

অমিত হাসিল, কিন্তু তর্ক করিল না। ঠিক মায়ের মতো, তাহার মুখ দেখিয়া অনু বুঝিতে পারে সে বিশ্রাম চায়।...আরাম কেদারায় দেহ এলাইয়া দিয়া অমিত ঘুমাইবে, বিশ্রাম করিবে। অনু ঠিকই বুঝিয়াছে—সে বিশ্রাম চায়। কিন্তু অমিত জানে এখনো সে ঘুমাইতে পারিবে না এই রাত্রে—আজ, এখন।

তিন

এই অমিতের পুরাতন ঘর। কাঁচের আলমিরায় এখনো অমিতের পুরাতন বই রহিয়াছে, নতুন বই সেখানে এখনো স্থান পায় নাই। ছয় বৎসর ধরিয়া তাহার নয়নের স্পর্শ মাগিয়া অপেক্ষা করিতেছে সেই 'ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউসে'র জাপানী কাগজের 'কাব্য-গ্রন্থাবলী', আর সচিত্র সংস্করণ শেক্স্পীয়র। ইতিমধ্যেই বন্দী অমিতের মন দিনে দিনে যে সুরে গাঁথা হইয়া উঠিয়াছে—উহার সহিত এই তাহার আলমিরার বন্দী বন্ধুরা—আবার সেই সহজ সম্পর্ক পাতাইয়া লইতে পারিবে কি অমিত!

অমিত চোখ ফিরাইয়া লইল। এই ঘরের দেয়ালের মধ্যে যে অমিত আর যে পৃথিবী পরস্পরকে দেখিত, চিনিত, আজও অমিতের পক্ষে তাহা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। শেক্স্পীয়র ও রবীন্দ্রনাথ তাহাকে পথ দেখাইয়াছেন কত নিস্তব্ধ নিশীথে, কত দুঃসহ ক্লান্তির মধ্যে। আজও তাঁহারা নির্ভয় হাসি লইয়া অমিতের অপেক্ষায় আছেন। এই প্রাচীর ও পৃথিবীর সঙ্গে অমিতের মায়ের নিরাশা, তাঁহার ভগ্ন প্রাণের নিঃশ্বাসও নিথর হইয়া আছে,—অমিতকে জড়াইবার জন্য দুই অদৃশ্য বাহু বিস্তার করিয়া দিতেছে।...মায়ের প্রাণের সমস্ত কামনা ও সমস্ত মমতা এই অন্ধকারের প্রতিটি সুপরিচিত শব্দের সঙ্গে ও নৈঃশব্দের সঙ্গে জীয়াইয়া উঠিতেছে।—এই গৃহের প্রতিটি উপকরণ স্পর্শের সঙ্গে, ও প্রতিটি জিনিসের স্পর্শহীন অপেক্ষার মধ্য দিয়াও তাহাই নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। আলো হইতে, অন্ধকার হইতে, বাতাস হইতেও যেন অমিত মায়ের নিঃশ্বাস শুনিতে পাইতেছে।...

পরিচিত একটা গন্ধ ক্রমশ অমিতের চক্ষুকে শয্যাশিয়রের দিকে টানিয়া লইল। অন্ধকারেও সে বুঝিতে পারিল একটা পরিচিত ঘ্রাণ সেখানে প্রাণ লাভ করিতেছে। অমিত বুঝিতে পারে না কী তাহা, কী? স্তিমিত চেতনার মধ্যে কী যেন জ্বলি-জ্বলি করিয়া আবার জ্বলিতে পারিতেছে না। শুধু কৌতূহল নয়, একটা অস্বস্তি তাই অমিতের মনে দেহে জাগিয়া উঠিল। কী ওখানে, কী?...অমিত হাত বাড়াইল, শিয়রের তলে হাতে যেন কী ঠেকিল—কোমল, মসৃণ, মৃদুস্পর্শ। তারপর এক মুহূর্তে সেই ঘ্রাণ তাহার চেতনায় জাগিয়া উঠিল—নির্মাল্যের ফুল, কানাইর মায়ের আনা নির্মাল্যের ফুল। এবাড়ির সে বৃদ্ধা প্রায়-অশক্তা পুরাতন ঝি, অমিতের জন্য

বসিয়াছিল, অমিতের উদ্দেশ্যে বালিশের তলায় এই নির্মাল্য রাখিয়া গিয়াছে। মোহগ্রস্তের মতো অমিত তাহা হাতে লইয়া বসিয়া রহিল।

শুধু তাহাও নয়, শুধু তাহাও নয়। অমিতের চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এবার স্মৃতি বিজড়িত অনুভূতির প্রস্রবণ শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।...

দূর-মরুভূমিতে যাত্রার পূর্বক্ষণে বাহু-নিবদ্ধ অমিত জেলখানায় মায়ের আশীর্বাদ-পুষ্প, মায়ের শেষ দেওয়া সেই নির্মাল্যের ফুল দুইটি ফেলিয়া দিতে পারে নাই। গোপনে মুঠোর মধ্যে লইয়া কারাকক্ষে ফিরিয়াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই গন্ধ মায়ের আকুল প্রার্থনার মতো মরুবক্ষের বন্দিশালায় গিয়াছিল—জেলখানার বুকের মধ্যে সেই গন্ধ আর স্পর্শ নিজের বুকের কাছে লইয়া অমিত মাকে শেষবার দেখিয়াছে—এই পৃথিবীতে শেষবারের মতো বিদায় দিয়াছে।...দূর-মরুভূমিতে মায়ের সেই নির্মাল্যের ফুল কবে বাক্সের এক কোণে শুকাইয়া গেল। গ্রন্থ ও বস্ত্রের মধ্যে তাহা চাপা পড়িয়াছিল, নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে অবরুদ্ধ পেটিকার মধ্যে কাঁদিয়া মরিয়াছে। কনক-চাঁপার একটা নিষ্পিষ্ট সুবাস বাক্সের কোণটিতে তবু জাগিয়া ছিল; কোনো একটা বই-এর মধ্যে, কোনো একটি পরিধেয়ের ভাঁজে মাঝে মাঝে তাহার আভাস মিলিত। তারপর মরুভূমির শুষ্ক বায়ুতে শুকাইয়া গুঁড়াইয়া বাক্সের সেই অন্ধকার কোণে বাঙলার সেই কনক-চাঁপা নিঃশেষ হইয়া গেল, অমিত তাহা জানেও নাই। তবু উহারই মধ্যে তাহার মায়ের শেষ দীর্ঘশ্বাস ও শেষ প্রার্থনা মিশিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মাতৃবিয়োগের বেদনা তাহার মনের মধ্যে একটু একটু করিয়া যখন রূপ গ্রহণ করিল, তখন অমিত মায়ের স্মৃতিচিহ্নও একটি-একটি করিয়া খুঁজিতে লাগিল। খুঁজিতে গিয়া অমিত তখন কিছুই তেমন খুঁজিয়া পায় না। অর্ধশিক্ষিত শিথিল হাতের বাঁকা-চোরা অক্ষরের দুই-একখানি চিঠি, তাহা ছাড়া আর কিছু কোথাও নাই। হঠাৎ এক মুহূর্তে বাক্সের কোণের বস্ত্রমধ্য হইতে সেই অর্ধবিস্মৃত আঘ্রাণ জাগিয়া উঠিল। অমিতের স্নায়ুতে স্মৃতিতে মায়ের কোমল মমতার স্পর্শখানি সেই ঘ্রাণ জীয়াইয়া তুলিল। মনে হইল মা যেন শিরশ্চুম্বন করিলেন—অমিত তাঁহার দেহঘ্রাণ লাভ করিল।...এখন কানাইর মায়ের নির্মাল্য-গন্ধও অমিতের চেতনার অন্ধকার হইতে আজ এক মুহূর্তে মরুভূমির সেই মরিয়া-যাওয়া নির্মাল্যের সুবাস টানিয়া তুলিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই মরুভূমির স্মৃতির সহিত আবার জাগিয়া উঠিল কানাইর মায়ের মমতার স্পর্শ, অমিতের মাতৃ-দেহের শেষ আঘ্রাণ।...

অমিত অস্থির হইয়া উঠিল। সেই দেবদারু-ছায়ায় শেষ মাতৃমুখ এবার অমিতের মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছে। সেই শ্বাস, সেই বুকের দোলা, সেই চোখের দৃষ্টি, সেই দেহের আঘ্রাণ—সমস্ত দিয়া অমিতের চেতনা পরিবৃত, তাহার সত্তা বিজড়িত, তাহার ইতিহাস আজন্ম-আমৃত্যু পরিব্যাপ্ত।...কে বলিল তুমি এ গৃহের নও—তুমি শুধু পথের মানুষ? মানুষের, বিশ্বলোকের পথযাত্রী? এই গৃহ, অনাত্মীয়া কানাইর মায়ের এই মমতা শুভকামনা আর মায়ের গড়া রক্তমাংসে এই নাড়ীতে নাড়ীতে

গাঁথা অচ্ছেদ্য বন্ধন,—ইহা ছাড়াইয়া তুমি কোথায় যাইবে, অমিত? কোন্ পথে, প্রবাসে, মায়া-মিছিলে, ছায়া-সৃষ্টিতে আশ্রয় পাইবে?...

এক অদৃশ্য সত্তার উপস্থিতিতে অমিতের সমস্ত দেহ ভরিয়া গিয়াছে। অমিত আর স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছে না। একবার সে বাইরে গিয়া দাঁড়াইবে।...বড় গুমোট। বাঙলা দেশের আশ্বিনের রাত্রিতেও আজ ভাদ্রশেষের গুমোট এই ঘরে জমিয়া উঠিয়াছে।

ঘরের সঙ্গেই ছাদ। সেই ছাদে গিয়া অমিত দাঁড়াইল।

অবারিত পৃথিবীর স্পর্শ অমিতের গায়ে লাগিল। দেহ শীতল হইল। মস্তিষ্ক শান্ত হইল। ছোট একটি ছাদের টুকরা, তবু মনে হয় ইহার মধ্যে প্রশস্ততা আছে। কাছেই উঁচু বাড়ি এদিকে-সেদিকে, কিন্তু উপরে আছে আকাশ-ই। আবরণ নাই, ঊর্ধ্বে মহাকাশের সঙ্গ লাভ করিবার পক্ষে কোনো বাধা নাই। আর আকাশ যেন একটা অসীম আহ্বান—মানুষের আত্মীয়। পৃথিবীর বন্ধন মানুষকে বাঁধিয়া ধরে; তাই সে বন্ধন একদিন শিথিলও হইয়া যায়। কিন্তু আকাশের বন্ধন যেন মুক্তির আহ্বান, তাই কোনো মানুষই তাহা কাটাইতে পারে না।...অমিত চোখ মেলিল, দেখিল—সেই তারা, সেই আকাশ, সেই মহাশূন্যের ঘূর্ণমান জ্যোতিষ্কপুঞ্জ, শান্ত শূন্যলোকের অগণিত নক্ষত্ররাজি,—যাহাদের আলোক পৃথিবীতে এখনো আসিয়া পৌঁছে নাই, যেই নীহারিকা-স্রোত এখনো আবর্তিত হইয়া ঘনায়িত নক্ষত্রে পরিণত হয় নাই।...

সে নীহারিকার স্তরে অমিতেরও কালের প্রাণবীজ অঙ্কুরিত হইবার প্রয়াসে এমনও পাখা ঝাপটাইতেছে।

কেমন সুদৃঢ় ও সুনিবদ্ধ আস্থায় আবার অমিতের বুক ভরিয়া উঠিল...সেই অনাগত আলোকের আগমনী সঙ্গীত কি তুমি শুনিতে পাও, অমিত?—নিজেকে অমিত জিজ্ঞাসা করিল।—লক্ষ লক্ষ আলোক-বর্ষ ধরিয়া যাহারা যাত্রা করিয়াছে মহাশূন্যে? জ্যোতির্ময় নীহারিকা-প্রবাহে যে নক্ষত্রের জন্মক্ষণ নিমেষে নিমেষে সন্নিকট, সুস্থির ও অনিবার্য হইয়া উঠিতেছে, সেই নক্ষত্রের বার্তা কি তুমি পড়িতে পারিতেছ না, অমিত? একালের বাষ্পাচ্ছন্ন দিনরাত্রির মধ্য দিয়া মানব-প্রেমের ঘূর্ণ্যমান, ভ্রাম্যমান দুই জ্যোতিঃকণা ইন্দ্রাণী-অমিতের বিচ্ছেদ-মিলনের ইতিহাসও রচিত হইতেছে। তাহার মধ্যেও কি দেখিতে পাইতেছ না আগামী দিনের মানব-মহানক্ষত্রের সম্ভাবনা, চিরন্তন বিরহ-মিলনের নবতন অভিসার? ইতিমধ্যে পৃথিবীতে কত কত তুহিন ও উষ্ণ মন্বন্তর আসিল গেল,—কত প্রাণের কত বুদ্বুদ, ফুটিল, ফাটিল—ক্ষুদ্র পৃথিবীর সুখদুঃখ-ঘেরা গৃহকোণের কত অফুরন্ত বিস্ময় শিহরিত, কণ্টকিত হইল। উহারই মধ্যে ইতিহাসের অচেতন যাত্রা হইতে সচেতন আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সন্ধি-সীমানায় আজ সন্ধ্যায় জন্মিয়াছে ইন্দ্রাণী-অমিত। প্রাগৈতিহাসিক পর্ব হইতে মানব-ইতিহাসের অন্য এক পর্ব-প্রবেশের শুভসাক্ষী তাহারা,—তাহারা সঙ্গী, তাহারা সহযাত্রী, মোতাহেরের—ও আরও অগণিত মানুষের...

ইন্দ্রাণী এখন কি করিতেছে?

অমিতের মাথার উপরকার এই আকাশের আবরণ তাহারও মাথার উপর বিস্তারিত। নিশ্চয় ইন্দ্রাণীও তাহার চল্লিশ টাকা ভাড়ার ফ্ল্যাটের ছাদে, আকাশের তলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেখানকার আকাশ তবু আরও একটু উদার, আরও কম্পমান, স্পর্শকাতর—সে যে ইন্দ্রাণীর মাথার উপরকার আকাশ। ওই তারার সঙ্গে ইন্দ্রাণী দৃষ্টি-বিনিময় করিতেছে, উহারই মধ্য দিয়া এই রাত্রিতে, এমনি নিদ্রাহীন নয়নে দাঁড়াইয়া দৃষ্টি-বিনিময় করিতেছে অমিতের সঙ্গেও। সেই চোখ, সেই মুখ, সেই ছাদের আলিসায় ভর দিয়া দাঁড়ানো দেহ অমিত দেখিতেছে। দেহের সেই দর্পিত সতেজ ঋজুতা এখন স্বপ্নে-কল্পনায়-ধ্যানে আবেশশ্লথ হইয়া আসিয়াছে। কর-ন্যস্ত মসৃণ সুডোল চিবুকের দৃঢ়তা আবার নম্রসুকোমল হইয়া গিয়াছে। আকাশের তারার দিকে চাহিয়া দীপ্ত, উজ্জ্বল নেত্র স্বপ্নে জিজ্ঞাসায় শান্ত, ধ্যানস্নিগ্ধ। আর ইন্দ্রাণীর প্রাণ আনন্দে আশঙ্কায় থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দুঃসাহসিকা অভিসারিকার মতো বাহির হইয়াছে এই শরতের আকাশের তলে—সংকট-কন্টকিত এই পৃথিবীর দুর্নিরীক্ষ্য পথে...

পিছনে কী একটা শব্দ হইল,—পিতার ঘরের দিক হইতে। অমিতের চেনা শব্দ—পিতার পায়ের শব্দ। একটির পর একটি পা এখনো তেমনি সুনিশ্চিত নিয়মে পড়ে—কিন্তু পড়ে একটা ভারী শব্দ করিয়া, যেন পদতলের পৃথিবী সম্বন্ধে আর তাহার স্থির নিশ্চয়তা নাই। তথাপি এই পদশব্দ ভুল করিবার নয়।

অমিত চমকিত হইল। তাকাইয়া দেখিল সত্যিই বাবা গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রাচীর ধরিয়া ধরিয়া সেই মূর্তি অমিতেরই ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অমিতের দুয়ারে পার্শ্বে একবার প্রাচীর ধরিয়া সে দেহ স্থির হইল। সন্তর্পণে দুয়ারের বাহির হইতে মুখ বাড়াইয়া একবার গৃহাভ্যন্তরে তাকাইল, আবার দাঁড়াইল দুয়ারের বাহিরে, বুঝি অতি অস্ফুটকন্ঠে একবার ডাকিলও—'অমিত!' তারপর আর দাঁড়াইল না, তেমনি সন্তর্পণে পা ফেলিয়া দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া ফিরিয়া গেল আপনার গৃহে। আপনার শয্যায় আবার নিঃশব্দে শুইয়া পড়িলেন বুঝি পিতা।

অমিত নির্বাক নিস্পন্দ। গভীর নিশীথে লুপ্তস্মৃতি সেই পিতৃ-হৃদয় বুঝি আপন চেতনায় একটা ক্ষীণরেখাকে দেখিতে পাইয়াছে, আর অমনি জরানিয়মের বন্ধন-মধ্যেও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। অদ্ভুত তাহার নীরব আকুতি—এই সশঙ্ক গোপন ব্যাকুলতা। অদ্ভুত মৃত্যুর তীরেও মানব-মমতার এই মৃত্যুহীন আত্ম-প্রকাশ!

অমিতের মাথা নত হইয়া পড়িল। অমিত ছুটিয়া আপনার গৃহমধ্যে চলিয়া গেল, শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। কে জানে হয়তো বাবার জাগরণের শব্দ পাইয়া অনুও জাগিয়া উঠিবে। হয়তো এমনিভাবে অমিতের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইবে, কান পাতিয়া অমিতের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনিবে—আসিতেন যেমন অমিতের মা।

অমিতের বুকের মধ্যে একটা আবেগের আলোড়ন। শয্যায় সে মুখ লুকাইল।

একটি নিমেষের জন্য মনে হইল এই জীবন্মৃত মানুষের মায়ামোহের সম্মুখে তাহার সমস্ত দিনের অভিজ্ঞতা, সমস্ত সন্ধ্যার আবেগ-উদ্বেলতা ও সাধনাদর্শ, সবই অগভীর, অসার, অযথার্থ।

বহু বৎসর পরে এইবার অমিতের চোখে অশ্রু ছাপাইয়া উঠিল—আর, সেই ধারায় তাহার জ্ঞাত ও অজ্ঞাত চিত্তের অনেক স্মৃতি, অনেক বেদনাভার মুক্তি পাইল।

অপরূপ! অপরূপ!—আর বড় আপনার!

মন শান্ত স্থির হইতেছিল। কিন্তু কাহার পদশব্দ আবার? অভ্রান্ত পদশব্দ, ছোট দুইখানি পায়ের আত্ম-পরিচয়। তাহারও পদশব্দ অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সত্যই অনু আসিয়া দাদার ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইল। অমিত নিদ্রার ছলনা করিয়া আছে। তাহার নিদ্রায় বাধা না জন্মাইয়া দুয়ার হইতে আবার অনু ফিরিয়া গেল। পিতার ঘরে কি-কি কথা যেন হইল। সম্ভবত অনু তাঁহাকে জল আগাইয়া দিল, শরৎ-রাত্রিতে কোনো একখানি মোটা চাদরে তাঁহার পা ও দেহ ঢাকিয়া দিল। উৎকর্ণ হইয়া অমিত সে গৃহের সামান্যতম শব্দটুকু শুনিতে চায়। প্রত্যেক কর্ম, প্রত্যেক দৃশ্য অনুমান করিতে লাগিল। বুদ্ধিমতী, বিচার-কুশলা, বিজ্ঞানের ছাত্রী তাহার বোন অনু—সে সুরো নয়, সবিতা নয়, ইন্দ্রাণীও নয়।—কেমন করিয়া সে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল, শান্ত মমতায় ফিরিয়া গেল।

মনে মনে অমিত একটু খুশিও হইল, অনুকে সে ফাঁকি দিয়াছে—যে অনু বিজ্ঞানের ছাত্রী, আর মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারে দাদার আজ বিশ্রাম চাই, সে অনু জানে না দাদার আজ বিশ্রাম নাই।

বিশ্রাম নাই, অমিতের বিশ্রাম নাই। অমিত ধীরে ধীরে শয্যায় উঠিয়া বসিল, ধীরে নামিয়া গিয়া ঘরের চেয়ারে দেহ এলাইয়া দিল। চোখ শুষ্ক, মন শান্ত। একটু মৃদু কৌতুকও অনুভব করিতেছে—সে কাঁদিল কি করিয়া? অশ্রুমুক্ত দেহে এখন শ্রান্তি আসিতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া নিদ্রা কি আজ অমিতের পক্ষে সহজ? সে জেলে নাই, নিজ গৃহেই পৌঁছিয়াছে। কিন্তু কোথায় তাহার চোখে ঘুম? অথচ হয়তো নাক ডাকিতেছে জেলের বিছানায় নিত্যকারের মতো লক্ষ্মীবাবুর। জ্যোতির্ময়ও ঘুমাইতেছে। আবার ঘুমাইতে পারে নাই সম্ভবত নিরঞ্জন...হয়তো শশাঙ্কনাথও। কি-ই বা করিতেছে রঘু ওড়িয়া? একশ জনের লম্বা ওয়ার্ডে পাশাপাশি শুইয়া থাকে সেই কয়েদীরা। রঘু সেখানেই শোয়, গোপনে বিড়ি খায়-এক-আধবার। দুই ঘন্টা পরে পরে পাহারার ডাকে জাগে আর রাত্রি শেষ না হইতেই আবার 'গিণতির' তাড়নায় উঠিয়া বসে।—ইহারই মধ্যে ঘুমায়, জাগে, বিশ্রাম করে, জুয়া খেলে রঘু ও তাহার বন্ধুরা। রাত্রির কুৎসিত রূপকে কর্মহীন দুষ্কৃতির সঙ্গে মানিয়া লয়। তাহারা বিশ্রাম করে...বিশ্রাম করিবে কী করিয়া অমিত? জেলখানার এই কত কত সতীর্থের মুখ অমিতের মনে আসিয়া ভিড় করিতেছে, অমিতের কানে ডাক দিতেছে—'অমিত, তুমি আমাদের, তুমি আমাদের।'

শুধু মুখ নয়, নিরবয়ব অন্ধকারও তাহাকে ডাকিতেছে। নির্জন কারাকক্ষের সেই ক্রুর অন্ধকার এই গৃহের পরিচিত অন্ধকারের সঙ্গে গা মিলাইয়া আছে। এই ঘরের অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে তাহা কাঁপিতেছে।...গোপনে হউক, প্রকাশ্যে হউক, কোনো কথা অমিত বলিবে না। এই একটি সংকল্পই সেই কারাকক্ষের অন্ধকারের কানে কানে সেদিন অমিত বলিয়াছে,—'কোথায়, সুনীল কোথায়?'—অমিত তাহার আশ্রয় স্থির করিয়াছে। 'অন্ধকার' তুমি তোমার অঞ্চলতলে সুনীলকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিও, আশ্রয় দিও। বলিও তাহার কানে কানে—'অমিত তাহাকে ভোলে নাই—অমিত তাহাদের ভুলিবে না'...

দুই বৎসর দণ্ড ভোগের পরে সেই সুনীলও অবশেষে অমিতের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল---'এসে গেলাম অমিদা'—

মরুভূমির উত্তপ্ত বায়ুতে তখন আঁধি উঠিয়াছে। আকাশের দেখা নাই। নতুন প্রাণের আশ্বাস নাই। বন্দিশালায় যৌন-মনোবিজ্ঞান ও সাম্যবাদের ঝড় বহিতেছে। জ্যোতির্ময়---অমন তেজীয়ান জ্যোতি---সেও কমিউনিস্ট?---সুনীল দত্ত উপস্থিত হইয়াই এই কথা শুনিল। আর শুনিয়াই বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। কে মার্কস? কে এঙ্গেলস? হউক তাহারা বিশ্ববিজয়ী পণ্ডিত, ভারতবর্ষের তাহারা কে? ভারতবর্ষ চায় স্বাধীনতা। তাহাদের এই অভিযানের সেই সারথিপদ অমিতদা কি লইবে না?

'যুক্তি-বিচার থাক, দায়িত্ব নাও অমিতদা।'

কিন্তু অমিত ইতিহাসের ছাত্র---রাজনৈতিক রথীসারথি নয়।

অভিমান-আহত হৃদয়ে সুনীল এস্রাজ লইয়া বসিল। গানের আসরে জমিয়া গেল। শ্রান্ত মানুষের দলে সুনীলের মতো উৎসাহী যুবক আসিয়া পড়িয়াছে—তাহার কান আছে, গান বোঝে, এস্রাজেও আছে বেশ মিষ্টি হাত। আসর জমিল। অমিতকেও সে দূরে থাকিতে দিল না। সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সঙ্গীতকে ভয় করিত অমিত। ভালো সঙ্গীতের মধ্য দিয়া সে যেন বিশ্ব রহস্যের বক্ষস্পন্দন শুনিতে পায়। ফৈয়জ খাঁর সেই খেয়ালখানা। বায়ুস্তরের বিচিত্র এক আলোড়ন মাত্র সেই খেয়াল, বলিবে পদার্থ-বিজ্ঞান। কিংবা, উহার মধ্যে দিয়াও এক সামাজিক সত্য আপনাকে প্রকাশিত ও বিকশিত করিয়া চলিয়াছে, বলিবে সমাজ-বিজ্ঞানী। অমিত ভাবিয়া পায় না, কী সেই সত্য। শুধুই সামন্ত যুগের একটা আলস্যবিনোদন মাত্র ধ্রুপদ ও খেয়াল? ইহার এই যুগান্তরে কোনো আবেদন নাই—আজ ও আগামীকালের সঙ্গে এই মল্লারের দ্বন্দ্ব।

সুনীল নিরঞ্জনকে নিজ পক্ষে পাইল। কিন্তু সুনীল বই পড়িতে চাহিল না। কি হইবে তর্ক পড়িয়া? যুক্তিশক্তিতে সুনীলের কোনো বিশ্বাস নাই। তর্ক তো তাহার ছোট দাদা অনিল দত্তও করিতে পারেন;—তিনি অমিতের সহপাঠী বন্ধু। 'সন্ত্রাসবাদ' যে মধ্যবিত্ত বেকার-সমস্যারই একটা বিসদৃশ রূপ, এই কথা তাঁহার মতো ইকোনমিক্সের এম-এ'রা অমিতদার মতো ইতিহাসের এম এ'দের নিকটে

সহজেই প্রমাণ করিতে পারে। তর্ক করিতে কি কম অপটু সুনীলের বউদিরা—ফিল্‌ম ও ভয়েল ছাড়াইয়া যাঁহাদের বিদ্যা কলেজের পথে বিপথগামী হয় নাই? অথচ তর্ক করিয়া, লেনিন পড়িয়া, প্রস্তুত হইতে হয় নাই তাহার ছোট বউদি ললিতাকে। গাম্ভীর্য-গভীরতা-হীন চঞ্চল ললিতা আপনার সহজ বুদ্ধির বশেই তবু সুনীলের প্রেরিত ছেলেটিকে পুলিশের ফাঁদ হইতে সেবার বাঁচাইল। অনিল দত্তের মারফত সংবাদ পাইয়াও পুলিশ তাহাকে ধরিতে পারিল না। অবশ্য অনিল দত্ত ললিতাকে এ জন্য ক্ষমা করে নাই। গুম হইয়া গিয়াছিল ক্রোধে। এবারও গোপনে-গোপনে সুনীলের দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ললিতাই আপীলের ব্যবস্থা করে, তাই সুনীলের দ্বীপান্তরও ঠেকানো গিয়াছে। ললিতাকে এইজন্য 'ক্যাপিটেল' পড়িতে হয় নাই—বাঙালী সমাজের নানা অপমান সহিতে হইয়াছে। কখনো সত্য বলিয়া কখনো মিথ্যা বলিয়া হাসিয়া উড়াইতে হইয়াছে আত্মীয় পরিজনের বাধা, স্বামীর গঞ্জনা, শ্বশুরকুলের শাসন। হিটলারী বিচারগৃহে ডিমিট্রভের সবল আত্মপক্ষ-সমর্থনই কি একালের ইতিহাসের মহা-দুঃসাহসিক কাজ? বাঙালী মেয়ে, বাঙালী বধূর এই সরল প্রতিরোধ, স্বাধীনতার পক্ষ নীরবে সমর্থন কিছু নয়? অতএব—

নিরঞ্জনের বাঙালী 'স্টর্ম ট্রুপার' সুনীল ও শেখর অদম্য উৎসাহে প্যারেড চালাইয়া যায়। জীয়াইয়া রাখে ওস্তাদি সঙ্গীতের আসর।

সুনীল জানিত—সুনীলের জন্যই অনিল দত্তের চাকরি লইয়া গোলমাল বাঁধিয়াছিল। কিন্তু দাদারাই কেহ জানাইলেন—'ছোট বউমা' বরাবরই অবুঝ। বরাবরই অনিলকে বলিতেন—'চাকরি ছাড়ো, তুমি ব্যারিস্টার হয়ে এসো।' চাকরিটা অনিল রাখিতে পারিল না—শেষ পর্যন্ত বউমা'র বাড়াবাড়িতে। বাধ্য হইয়াই সে ব্যারিস্টার হইতেই বিলাত যাইতেছে। ততদিন ললিতা পিতৃগৃহেই থাকিবে। তবে ললিতাকে লইয়া দত্তদের আরও কত ভুগিতে হইবে তাহার ঠিকানা নাই। 'ছোট বউমার' জন্যই অনিলের চাকরি গেল।

সুনীলের মনে একটা অস্বস্তি জাগিয়া উঠিল। তাই মাত্রা বাড়ে প্যারেডের ও সঙ্গীতের।

অমিতই সুনীলকে একদিন বলিল সঙ্গীতই কি চরম কথা? পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষের মুক্তি-সমস্যায় কত গৃহ-সংসার ভাঙিয়া যায়;—আর সঙ্গীতে সেই সত্য চাপা দিবে সুনীল?—সংশয় ও প্রশ্ন জাগে ক্রমে সুনীলের মনে। অমিত জানাইল—কাজের কষ্টিপাথরে যাহা গ্রাহ্য হয় তাহাই না হয় পরে সুনীল গ্রহণ করিবে। কিন্তু ততক্ষণ সুনীল ও শেখর দেশের মূল সমস্যাটা চিনিয়া বুঝিয়া লউক।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে কষ্টিপাথরে সেই দাগ পড়িল। দাগ পড়িল এবার শেখরের চিত্তে—এবং পুরাতন বন্ধন ছিঁড়িয়া গেল।

'শেখরকেও বর্জন করিলাম—বর্জন করিলাম', তখন সুনীল স্থির করিল। অসহিষ্ণু সে? হাঁ, সে অসহিষ্ণু, কারণ সে স্বদেশে বিশ্বাসী।

বন্ধুর বন্ধন ছাড়া যে বন্দিশালায় আর কিছু নাই, সেখানে এই বন্ধু বিচ্ছেদ রক্তাক্ত ভয়ঙ্করতায় বিকৃত হইতে বাধ্য।

'প্রতিশ্রুতি দাও, আমরা ভারতবর্ষের বিপ্লবী।'—সুনীল অমিতের নিকটে দাবি করিল।—কোনো সম্পর্ক নেই শেখরের সঙ্গে—'

অমিত জানায় : অন্যায় হবে এমন প্রতিশ্রুতিদান—কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়ে দেখি না কে কী করে।

সুনীল তাহা মানিবে না, অমিত শেখরকে বর্জন করিবে না, সুনীলকে প্রতিশ্রুতি দিল না। সুনীল তখন অভিমান করিল। শেষে আরও দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর হইল খেলায়, গানে, প্যারেডে।

বন্দিজীবন তখন পর্বান্তরে চলিয়াছে। প্রত্যেকটি বন্দি-চিত্তে নানারূপ প্রশ্ন আসিয়া হানা দিয়াছে। অনিশ্চিত অবরোধ আর ফুরায় না, ফুরায় শুধু দিন মাস বৎসর। ফুরায় শুধু পিতা-মাতার আয়ু, ভ্রাতা, বন্ধু, প্রিয়জনের আয়ু। ফুরায় নিজের আয়ু, নিজের যৌবন; স্বপ্ন, কামনা, কল্পনা, দুঃসাহসিক জীবনের দাবি। আর ফুরায় বিরাট পৃথিবীর সংগ্রামে সহযোগী হইবার শুভদিন।...রোগ-জর্জর দেহে, শক্ত সবল কারাবদ্ধ যৌবন পঙ্গু হইয়া পড়ে। যক্ষ্মা বন্দিশালার কোটরে কোটরে আসিয়া বাসা বাঁধে। পিত্ত, অম্ল যকৃতের শূলে-শেলে দেহ ছিন্নভিন্ন করিয়া আনে।...তারপর ভাঙিয়া পড়ে সেই মন্দির—সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো। অস্ত্রোপচারের শেষে রক্ত বমন করিতে করিতে শেষ হইয়া গেল দেবেন ঘোষ। রোগের জ্বালায় হাসপাতালের কক্ষে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল যতীন সেন। নরেশ বোস আত্মহত্যা করিল—কেন? পুলিশের অত্যাচারে না, বিশ্বাসঘাতকতার অনুশোচনায় বোঝা গেল না। ফণী চাটুজ্জে পাগল হইয়া গেল—শুধু এটেব্রিনের সামতিক প্রতিক্রিয়ায়? কিন্তু এবার মুখ থুবড়াইয়া পড়িতেছে ব্যাহত-শক্তি যৌবন—একে একে উন্মাদ হইয়া গেল বিনোদ লাহিড়ী, সুরেশ চন্দ; তারপর তাসের চ্যাম্পিয়ান হরেনদা, জিমনাস্টিকের চ্যাম্পিয়ান সুবল সেন। প্রতি সপ্তাহে নতুন দুঃসংবাদ। এখানে-ওখানে প্রতি চক্ষে আশঙ্কা কাঁপিতেছে। নিজের সুস্থ মস্তিষ্কের উপর কাহারও আর নিজের বিশ্বাস নাই।

কিন্তু বিশ্বাস চাই। বিশ্বাস চাই নীতিতে, বিশ্বাস চাই আপন শক্তিতে। তবে বিশ্বাসের সেই ভিত্তিতে চাই যুক্তি, বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তা, প্রমাণ, সাক্ষ্য। অমিতের এই কথা সুনীল এবার স্বীকার করিল। সুনীলও তাই এবার বই লইয়া বসিল অমিতের সঙ্গে। কিন্তু শেখরকে সে ক্ষমা করিবে না।

সুনীলও বুঝিতে বসিল কালের সমস্যা। সে সমস্যার যে স্বরূপ বোমা বিধ্বস্ত গুয়েনির্কা, বার্সিলোনার মধ্য দিয়া স্পেন তাহার সম্মুখে ধরিয়াছে, তাহাই কি শেষে সুনীলের আপন সমাজ, আপন সংসারও তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল—ললিতার নির্যাতনের আকারে।

নিরঞ্জনের সঙ্গে এবার সুনীলের তর্ক বাধিল। দূর হইতে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিল

শেখর, জ্যোতির্ময়। তীক্ষ্ণ, তীব্র, উগ্র সুনীল—হাঁ, সে অস্থির, কারণ সে বিশ্বাসের মধ্যে ফাঁকি সহিতে পারিবে না।

আবার সে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল—নিরঞ্জনকে বর্জন করিতে হইবে। বন্ধুবিচ্ছেদের বিকৃতি আরও বুঝি উগ্র হইয়া উঠিতেছে। অমিত কিন্তু নিরঞ্জনের বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করিবে না।

'তোমার এ আত্মছলনা। আমি তা প্রত্যাখ্যান করি।' অসহিষ্ণু সুনীল তীব্র কণ্ঠে অমিতকে জানায়। যুক্তিতে, নিষ্ঠায়, আগ্রহে ফাঁক রাখিবে না সুনীল। 'আবিরার্বিম এধি'। হে রুদ্র, তোমার দক্ষিণ মুখ দেখিতে চাহে না সুনীল দত্ত, সে পরিত্রাণ চাহে না। হিরন্ময়পাত্র দূর করিয়া চূর্ণ করিয়া, এ মর্তের সত্যকে সে দেখিবে, —দেখিবে—দেখিবে।

'দি ইন্টারন্যাশনাল ইউনাইটস্ দি হিউম্যান রেস'—সুনীল দত্ত ঘোষণা করিল। অমিতকে বলিল, সভায় চলো। জেলে বা যুদ্ধক্ষেত্রে যায় আসে না—চলো, আমরা সেই সংঘ গড়ব—ইন্টারন্যাশনালের নামে শপথ নিয়ে।

অন্যায় হবে তা কর্মক্ষেত্রে না নামলে।

কর্মক্ষেত্র সর্বত্র—এখানেও বিস্তৃত।

না, অমিত কোনো দলে যোগ দিবে না।

তুমিও তবে আমাদের নও, অমিদা?—আহতের আর্তনাদের মতো কথাটা বাহির হইয়াছিল সুনীলের মুখ হইতে।

অমিতদার অভাবেই ভাঙিয়া গেল তাহাদের দল গঠনের আয়োজন। সুনীলের স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। ভাঙিয়া গেল—ভাঙিয়া গেল, ভাঙিয়া গেল।...

ঠিক সেই সময়ে ক্ষুদ্র একটি পত্র আসিয়া অকস্মাৎ সুনীলকে আঘাত করিল। স্টোভ-এর আগুন কেমন করিয়া শাড়িতে ব্লাউজে লাগিয়া যায়; তারপর আর ললিতা নাই।

চিড় খাইয়া গেল সুনীলের আকাশ। অমিত স্তব্ধ হইয়া গেল।

একটি সুন্দর শুভ্র প্রভাত যেন অমিতের চক্ষের উপরে মধ্যাহ্ন হইতে না হইতেই মিলাইয়া গেল। প্রভাতের কলকণ্ঠ কাকলির মতো ছিল ললিতা। ঝর্ণার জলের মতো স্বচ্ছ, স্বতঃপ্রবাহিতা। হাসিতে কথায় আপনি ফুটিয়া উঠিতেছে, পৃথিবীর সব কিছুতেই খুশি হইয়া উঠিতেছে। ললিতাকে অমিত ভালোও বাসিয়াছিল—যেমন ভালোবাসে অমিত ঝর্ণার জল, তরাইর উড়িয়া-যাওয়া প্রজাপতি, প্রাণোজ্জ্বল জীবন-রসের স্বচ্ছতা। সেই ভালোবাসা আনন্দ হইতে মত্ততায় পরিণত হইতে পারিত কি? সেই প্রীতি-কৌতুক কি যৌবন-বেদনায় রূপান্তরিত হইতে পারিত না? কিন্তু কি হইতে পারিত, তাহা কল্পনা করাই চলে। কারণ সত্য যাহা তাহা এই—সহজ নিশ্চিন্তচিত্তা সেই তরুণী সুনীলের ও অমিতের সরল মমতাময়ী বান্ধবী ছিলেন। আজিকার ধ্বংসধর্মী কাল তাহাকে সহ্য করিতে পারে না,—ইহাই বুঝিবার মতো কথা তাহাদের পক্ষে।

অমিত সুনীলকে সান্ত্বনা দিতে গেল। সুনীল শুনিল, কথা বলিল না, স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর এস্রাজ লইয়া বসিল। বাজাইতে বাজাইতে তাহার মধ্যে ডুবিয়া যায় সুনীল। কেহ তাহাকে বাধা দিল না—কাহারও দিকে সে ফিরিয়া তাকাইল না,—রাত্রি বাড়িয়া চলিল। অমিত বুঝিল আজ সুনীল নিজেকে খুঁজিতেছে, তাই তাহাকে আজ সঙ্গীতে পাইয়াছে। সঙ্গীতই বুঝি বিশ্বের পরম সান্ত্বনা। অমিত সন্ধ্যায় শুইয়া পড়িল।

তারপর? শুধু এস্রাজটা রহিয়াছে অমিতের ঘরে, সুনীল নাই। আজ দড়িতে লম্বমান সেই সুন্দর যৌবন-পুষ্ট দেহের শেষ বিকৃত চিহ্ন। অমিত তাহা দেখিতে চাহিল না। একটি পংক্তি কোথাও কাহারও উদ্দেশে লেখা নাই। একটি অভিযোগ কোথাও কাহারও প্রতি নাই একটি অনুরোধ নাই কোথাও কাহারও নিকট। অমিতের উদ্দেশেও নাই কোনো অভিমানের আঘাত।

যেখানে পুষ্করের জলে সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিতাভস্ম মিশিয়াছে, মিশিয়াছে আরও কত জনের—সেখানে মিশিয়া গেল সুনীলের দেহ-শেষ। আর রাখিয়া গিয়াছে সেই প্রশ্ন—তুমি কাহাদের অমিত? সুনীল তাহাকে এই প্রশ্ন ভুলিতে দিবে না।

সুনীল দত্তের নাম অমিত আর মুখে আনে নাই—নাম করিত না অমিত যেমন ইন্দ্রাণীর। হৃৎপিণ্ডের সংকোচ-প্রসারের মধ্যে সেই অস্থিরপ্রাণ অনুজের জীবনের সাক্ষ্য জীবন্ত হইয়া ছিল ; হৃৎপিণ্ডের আর-এক কোঠায় বসিয়া অজ্ঞাতসারে ইন্দ্রাণীও ছিল অমিতের প্রাণকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া।—সাধ্য কি অমিত তাহাদের জীবনের এই সাক্ষ্য না শুনিয়া পারিবে? সেইসঙ্গে...তুমি আমাদের, 'তুমি আমাদের'—কত মুখ এই অন্ধকারে ভিড় করিয়া আসিতেছে। আজিকার সমস্ত দিনের অতিব্যস্ত দৃষ্টিতে দেখা সেই বন্ধু-মুখগুলি অন্ধকারে এখানে ফুটিয়া উঠিতেছে...শশাঙ্কনাথ ও নিরঞ্জন, ভুজঙ্গ সেন ও বিভূতিনাথ, রঘু ও গফুর, সেই কাঠে-বাঁধা বারীন নন্দী ও উন্মাদাগারের বিনোদ লাহিড়ী, পুষ্করের জলে মিশিয়া-যাওয়া সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় আর সুনীল দত্ত...

আবার, অমিত অনুভব করিতেছে তাহার চারিদিকে তাহার আপন জীবনের অপরিহার্য দাবি—ঘরে, বিছানায়, প্রাচীরে আজন্মের পরিচিত স্বর, মায়া-মমতার স্পর্শ, মৃত্যুপারের দেহাঘ্রাণ, জীবন্মৃত জীবনের মূঢ় অকুতি, ভ্রাতা-ভগিনীর স্নেহ-শ্রদ্ধায় মধুময় এই পৃথিবীর রজঃ এই গৃহ-পথ। এই গৃহের প্রত্যেকটি ধূলিকণায়ও কি সেই প্রশ্ন নাই—'তুমি কি আমাদের নও, অমিত?'

তথাপি ব্যক্তিজীবনের বাহুবন্ধন যেন শিথিল হইয়া গিয়াছে—'কাব্য-গ্রন্থাবলী'র পাতায় আর তেমন করিয়া অমিতের চোখে পড়িবে না। সেখানকার অক্ষরের মধ্যে এখন শশাঙ্কনাথের অনুভূতি, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিবে। শেক্‌স্‌পীয়রের পাতা খুলিয়া জীবনের সেই বেদনা-মহৎ রূপ দেখিয়া আর মাতিয়া উঠিবে না অমিত। মানবমহাবিদ্যালয়ের মূর্তিমালা সেখানে বসিয়া যাইবে...রঘু ওড়িয়ার শ্রীহীন দৃষ্টি...বিনোদ লাহিড়ীর উন্মত্ত প্রলাপ। কিন্তু অমিত ইতিহাস খুলিবে আর অমনি দেখিবে লাইফ মার্চেস্, আর বেত্রারক্ত বাঙালী বালকের ঘোষণা :

'আই চ্যালেঞ্জ দি ব্রিটিশ এম্পেয়ার !'...তবু পাখা ঝাপটাইতেছে তাহার এক কালের ব্যক্তি-প্রাণের আশা আনন্দ স্বপ্ন কল্পনা,—এই বদ্ধ কাঁচের আলমিরার মধ্যে পড়িয়া পাখা ঝাপটাইতেছে। তাহার অতীত হইতে তাহার বর্তমানের মধ্যে প্রবেশ-পথ উহা পায় না। কাঁদিয়া ডাকিতেছে, "অমিত, তুমি আমাদের, তুমি আমাদের ;—আমরা তোমার স্বপ্ন, তোমার প্রাণের প্রাণ, তোমার আত্মার আত্মীয় ।"

অসহ্য যন্ত্রণায় অমিত বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মহাকাশের মুখামুখি দাঁড়াইয়া আপনার পরিচয় সে নক্ষত্রালোকে পড়িয়া লইবে।

শান্ত স্তব্ধ আকাশের আশীর্বাদ, উন্মুক্ত পৃথিবীর আলিঙ্গন অমিতকে ঘিরিয়া ধরিল। তাহার আলোকে অমিত আপনার অতীতকে ভবিষ্যৎকে পাইতে চায়। ছয় বৎসরের জীবনের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠে : 'ধরণীর বিকৃত দুঃস্বপ্নকেও দেখিয়াছি। দেখিয়াছি ব্যর্থ প্রয়াসের মধ্যে সার্থক মনুষ্যত্ব,—ভাঙা দেউলের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় দেবতার অধিষ্ঠান। ধূলিধূসরিত পথের মোড়ে দেখিয়াছি অনির্বাণ আবির্ভাব প্রেমের দেবতার, মানব-মহাতীর্থের দিকে যাত্রার আহ্বান, অনন্ত সংঘাতের মধ্য দিয়া জীবনের পরম পরিণতির ইঙ্গিত'।

—আপনার মধ্যে আপনি সে শ্রদ্ধায় প্রেমে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, বলিতে চাহে : 'অপরূপ, অপরূপ !' রাত্রিশেষের তারার উদ্দেশ্যে অমিত বলিতে থাকে, 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গুরুগৃহ হইতে আমি অমিত আজ নতুন সংসারে এই সত্য লইয়াই আসিয়াছি—বড় সুন্দর, বড় সুন্দর মানুষের মুখ—অপরাজেয় এই মানুষের মহাঅভিযান... ।

কিন্তু শুধুই কি 'অপরূপ' ? মরুভূমির বুকের উপরেও এমনি করিয়া তাকাইয়া থাকিত রাত্রিশেষের তারা—নিদ্রাহীন অমিতের দিকে—সুনীলের দিকে। কি কহিত সেই তারা ? কি কহে আজ : "তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ ?"

দূরেকার কোনো দেবালয়ে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—কোনো দেবতার জাগরণের। প্রভাত আরতি। আরও দূরে গঙ্গার বুকে স্টিমারের বাঁশি বাজিল—স্রোতের বুকে মানুষের জীবনযাত্রা জাগিতেছে। পূর্ব সীমান্তের কোনো কারখানায়—হয়তো বা ল্যান্সডাউন জুট মিলেই—সাইরেন্ চিৎকার করিয়া উঠিল...বিশ্বকর্মার সৃষ্টিশালার দুয়ার খুলিতেছে। অমিত ফিরিয়া তাকায়—চিমনির মুখে ধোঁয়া উঠিতেছে। কালো একটা বক্রকুণ্ডলী শরতের উষাকাশকে কুৎসিত করিয়া চলিয়াছে।...

অমিত তাকাইয়া থাকে, অপলক চক্ষে তাকাইয়া থাকে। আকাশের পার হইতে তেমনি সেই নক্ষত্রের প্রদীপ্ত জিজ্ঞাসা নামিয়া আসিতেছে পৃথিবীর দিকে মানুষের মাথায়, অমিতের মুখের কাছে :

"তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ ?"

অসংখ্য মুখের অসংখ্য প্রশ্ন জ্বলিতেছে এই দীপ্তিতে, এই একটি প্রশ্নে। আর জ্বলিতেছে অমিতের কত দিন কত রাত্রির জাগরণে চিন্তায় অনুভূত, আহরিত সত্যও...

'ইতিহাস ক্ষমাহীন, কারণ, ইতিহাস সৃষ্টিশীল। আমি অমিত ইতিহাসের ছাত্র; ইতিহাসের অস্ত্রও। ক্ষমা করিলেও ক্ষমাহীন বন্ধুর পথের পদাতিক আমি, স্বাগত করি ইতিহাসের সৃষ্টিশক্তিকে।'

রাত্রিশেষের পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে কারখানার বাঁশির ডাকে কারখানার মানুষ।

আর একদিন

উৎসর্গ—

কবিকিশোর

সুকান্ত ভট্টাচার্যের

উদ্দেশে

এক

নিস্তব্ধ রাত্রির বুকের উপর দিয়া সবুট পদধ্বনি আগাইয়া আসিল।

—অমিতবাব—অমিতবাবু—

ঘুমের ঘন পর্দাটা ধরিয়া কে যেন টানাটানি করিতেছিল, এবার বুঝি নখাঘাতে তাহা ছিঁড়িয়া গেল। শয্যায় উঠিয়া বসিতে বসিতে অমিত বলিল,—কে?

খোলা দুয়ার হইতে টর্চের আলো আসিয়া শয্যায় পড়িতেছিল।

থানা থেকে আসছি আমরা।

বিস্মৃত একটা বাস্তব। অপ্রত্যাশিত এই আবির্ভাব। মন তখনো তাহা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। তথাপি অভ্যাস মত শিয়রের নিকটস্থ সুইচটা টিপিয়া দিতে দিতে অমিত আবার বলিল,—কে?

পরমুহূর্তেই আলোকিত গৃহের দ্বারে তাহার অস্পষ্ট ধারণা ও সেই অর্ধগৃহীত তথ্য এক রূঢ় জীবন্ত সত্য হইয়া উঠিল: রাইফেলধারী একজোড়া গুর্খা পুলিশ; দুইজন পুলিশ...কর্মচারী—একজন খাকী-পরা থানার দারোগা, অন্যজন সাদা পোশাকে শার্টের উপরে, কোট পরা যুবক, গোয়েন্দা সাব-ইন্‌সপেক্টর।

উন্মোচিত আবার রাইফেলের রাজত্ব? ঝুটা হইয়া গিয়াছে তবে'-৪৭ এর স্বাধীনতা স্বপ্ন?—অমিতের মন আপনাকেই আপনি জানাইয়া দেয়।

—নমস্কার, স্যার। ঘরের মধ্যে পদার্পণ করিতে করিতে বহু পরিচিত শিষ্টাচারের সঙ্গে বলিল গোয়েন্দা বিভাগের যুবকটি।—সার্চ করতে হবে একবার—

অন্যরা আসিয়া দাঁড়াইল তাহার পার্শ্বে ও পিছনে।—আমাদের সার্চ করে নিন। —এই পিস্তলটা আছে; আর জামা, পকেট দেখবেন নিশ্চয়ই—

প্রয়োজন নেই,—জানাইল অমিত।

প্রিয়দর্শন যুবক। স্বাস্থ্যবান, বুদ্ধিও সম্ভবত আছে। গোয়েন্দা পুলিসের কাজ করে; হয়ত আজ কুণ্ঠামুক্ত:—স্বাধীন দেশের 'দুষ্কৃতি বিমর্শ বিভাগে'র কর্মচারী যুবক বলিল, আসতে পারি ত? মানে, আপনি ত একা—ঘরে আর কেউ নেই—

জানা কথাটাই সে সুনিশ্চিত করিয়া লইবে—নিজের সংশয় আছে বলিয়া নয়; নিজের বুদ্ধি ও কালচার আছে, তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য। অমিত তাহা বুঝিল; তাই হাসিল, বলিল,—হ্যাঁ, আমি একাই থাকি।

আর জিজ্ঞাসা করিল নিজেকে: তুমি একা, অমিত? একা তুমি?...ইন্দ্রাণী সবিতা—অথবা অনু, মনু...তাহারা কেহ তোমার নয়? কোনো জীবন-সঙ্গিনীর সঙ্গে জীবনের নব-রস আস্বাদন করিয়া লও নাই তুমি, তাই না? কিন্তু তাই বলিয়া একা? কি তুমি...আগামী দিনের মানবসন্ততির সঙ্গে যে-তুমি তোমার সত্তার সান্নিধ্য তোমার কর্ম ও চেতনার মধ্য দিয়া অনুভব করিতে চাও,—উপলব্ধি করিতে চাও তোমার

দেহের রক্তধারায়, তোমার বাহুর পেশীতে ভবিষ্যৎ মানুষের সে আলিঙ্গন-আভাস...সেই তুমি একা?

আপনার বোন অনু—মানে, মিসেস রায় ও মিস্টার রায়, অর্থাৎ ইয়ে শ্রীঅনুজা রায় ও শ্রীশ্যামল রায়—তাড়াতাড়ি নাম দুটিতে স্বাধীন রাষ্ট্রের পরিভাষা-সম্মত মর্যাদা যোগ করিয়া একটু আত্মপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাইল স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের যুবক। তারপর বলিল,—তাঁরা কোন ঘরে থাকেন?

মুহূর্ত মধ্যে অমিত সতর্ক হইয়া উঠিল : কি চাই এই পুলিশদের? কাহাকে চাহে ইহারা? অনুকে ও শ্যামলকে? অমিতকে চাহে না নাকি তবে?...'সার্চ'ও নয় শুধু তবে?—মনে মনে অমিত জিজ্ঞাসা করিল : এ স্পেক্টর ইজ হন্টিং দি ওয়ার্ল্ড?... হাঁ, এ স্পেক্টর ইজ হন্টিং দি ওয়ার্ল্ড।

কোথায় তাঁরা?

অমিত বলিল, তাঁরা কেউ এখানে নেই।

যুবকের আত্মতৃপ্ত দৃষ্টি চকিত, সন্দিগ্ধ, শাণিত হইয়া উঠিল।—নেই কেমন? নিশ্চয়ই আছেন—আমরা জানি।

অমিতের সন্দেহ রহিল না। সে হাসিল।

—একটু ভুল জানেন। আগে থাকতেন—এখন নেই।

কোনটা তাঁদের ঘর?

পাশের ঘরে ছিলেন।

ঘরটা দেখতে হচ্ছে। আসুন,—বলিয়া অমিতকে সে ডাকিল।

একজন রাইফেলধারী অমিতের ঘরে পাহারা রহিল। অন্যেরা তাড়াতাড়ি চলিল পার্শ্বের ঘরের উদ্দেশ্যে। দুয়ার বন্ধ। বাহির হইতে তালা দেওয়া।

অমিত ডাকিল,—সাধু।

ফ্ল্যাটের প্যাসেজের ছায়া হইতে উত্তর হইল,—দাদা।

চাবি দিয়ে ও ঘরটা খুলে দে।

ফ্ল্যাটের দুয়ার খুলিয়া দিয়া এতক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল সাধুচরণ। ভীতপদে সে অগ্রসর হইয়া আসিল; কম্পিত হস্তে তালা খুলিয়া দিল। ঘর অন্ধকার। তথাপি বোঝা যায় ঘরে কেহ নাই। স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের যুবক কিন্তু গৃহদ্বারে ইতস্তত করিতে লাগিল; ঝুঁকিয়া মাথা বাড়াইয়া দিল ঘরের মধ্যে। কাহার হাতের টর্চও জ্বলিয়া উঠিল। তীব্র আলো ঘরে খানিকটা অংশকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল, অস্বাভাবিক করিয়া তুলিল ঘরটাকে।

চেয়ার, টেবিল, তাক-ভরা বই, আর তোরঙ্গ, সুটকেশ, ছোট তক্তাপোষ, বিছানাপত্র—মানুষের ব্যবহার্য সবই আছে। মানুষ এই ঘরে থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু নাই এ মুহূর্তে, তাহাও নিঃসন্দেহ।

অমিত উত্তেজনাহীন হস্তে আলোর সুইচ টিপিয়া দিল।

বিক্ষুব্ধ হইল যুবক গোয়েন্দা কর্মচারী। পরক্ষণেই অমিতের দিকে তাকাইয়া স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিতে গেল,—কেউ নেই তারা, না?

দেখতে পাচ্ছেন।

কিন্তু এ ঘরেই থাকেন তাঁরা। আপনার বোন অনুজা দেবী আর তাঁর স্বামী শ্যামলবাবু। আমাদের সেইরূপই খবর। আর দেখছিও—ওই রয়েছে মেয়েদের কাপড়চোপড়, পুরুষেরও জুতোজামা।

বলেছি, থাকতেন। জিনিসপত্র সব নিয়ে যাননি এখনো।

ততক্ষণে বাড়িটা দেখিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে ভদ্রলোক। তাহার গতিতে একটা ব্যস্ততা; কিছুতেই চেষ্টা করিয়াও সে তাহা গোপন করিতে পারে না। অথচ গোপন করা তাহার প্রয়োজন;—তাহা শোভনও বটে। কিন্তু গোপনতা সেজন্য প্রয়োজন নয়। বেশি ব্যস্ততা দেখাইলে, শিকার যদি বা এখনো শিকারীদের আবির্ভাব না জানিয়া এই বাড়িতে কোথাও রাত্রিশেষের নিদ্রায় এখনো নিশ্চিন্ত থাকিয়া থাকে, এখনি তাহাদের শব্দ পাইয়া সচকিত হইয়া উঠিয়া পলাইবে;—'চিড়িয়া' ভাগিয়া যাইবে। গোয়েন্দা কর্মচারীটি সঙ্গেকার সিপাহীকে ওদিককার দুয়ার খুলিয়া ফেলিতে বলিল।

পিছনে বারান্দা আছে না? বারান্দা দিয়ে কোথাও যাওয়া যায় নাকি?—সন্দিগ্ধ ব্যস্ত কণ্ঠস্বর তাহার।

...না, ১৮৪৮ নয়, আজ ১৯৪৮। শুধু আর ইউরোপ নয়, এ স্পেকটার ইজ হন্টিং দি ওয়ার্লড। সারা পৃথিবী জুড়িয়া আজ এই জুজুর ভয়—ভাবিয়া অমিত স্মিতহাস্যে বলিল,—আপনারাই দেখুন তা। কিন্তু আমাকে যদি দরকার না থাকে তাহলে আমি যাই। ঘুমোইগে।

না, না; আপনি সঙ্গে থাকুন। এখখুনি সার্চ শুরু করে দোব। বারান্দা আর ছাদট্যাদগুলো একবার দেখে আসছি তার আগে।—'এনটায়ার প্রেমিসেজ' সার্চের হুকুম রয়েছে কিনা।

ফ্ল্যাটের বাড়ি; বড় না হউক ছোট ছোট গুটি পনের ফ্ল্যাট বাড়িটায়। বলা যায় কি কিছু কোথাও পালাইয়া আছে কিনা অনু বা শ্যামল?

বারান্দা হইতে অমিত দেখিল পথেও চারদিকে পাহারা, ফটকে জনা দুই রাইফেলধারী গুর্খা আর জন দুই লাঠিধারী পুলিশ ও জমাদার। তাহারা আগেই নির্দেশ পাইয়াছে —'কিসিকো ইয়ে মকান সে বাহার যানে মৎ দো'। 'হুজুর'—স্যালুট ঠুকিয়া জানাইয়াছে গুর্খা সিপাহীও।

এদিকে সেদিকে দেখিয়া পুলিশের দল ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল আবার অমিতের ফ্ল্যাটের দ্বারে।

—অন্য ফ্ল্যাটের লোকদের আর তা হলে বিরক্ত না করলাম, কি বলেন অমিতবাবু? আপনাদের ফ্ল্যাটের ত কেউ নেই, সেসব ফ্ল্যাটে?

খুঁজে দেখতে পারেন।

না, না; আপনার কথাই যথেষ্ট। তবে আমাদের উপর অর্ডার ওই রকমই কিনা,

'সমস্ত বাড়িটা সার্চ করো'।—লোককে আমরা বিরক্ত করতে চাই না, অমিতবাবু। বিশ্বাস করবেন এ কথাটা,—আপনি পুরনো লোক। তখনো করতাম না, এখনও না। আর এখন ত সেদিন নেই,—আর-এক দিন—আমাদের নিজেদেরই দেশের গবর্নমেন্ট।

তল্লাশীর সাক্ষীদের ডাকিয়া লইয়া ঘরে আবার প্রবেশ করিল সমস্ত দলটি।

'আর-এক দিন' সন্দেহ নাই;—হাসিতে কুঞ্চিত হইল অমিতের ওষ্ঠাধর। অনেকটা নিজের মনেই বলিল,—আপনাদেরই গবর্নমেন্ট বটে।

কেন? আপনার নয় নাকি? আপনারাই ত সংগ্রাম করে এনেছেন স্বাধীনতা।—একটু পরিহাসের রেশ পুলিশী ওষ্ঠে ও চক্ষে ফুটিয়া উঠিতেছে কি? মুখে কিন্তু অটুট গোয়েন্দা-গাম্ভীর্য।—আমাদের অবশ্য সৌভাগ্য,—স্বাধীন গবর্নমেন্টকে সার্ভ-করতে পারছি। দেখছেন ত, এখন মীরা সোম জাতীয় পতাকা তুললেন আমাদেরই গোয়েন্দা অফিসে পনেরই আগস্ট,—

...জাতীয় পতাকা আর মীরা সোম আর পনেরই আগস্ট—

কিন্তু শেষ হইতে পারিল না ভদ্রলোকের কথা। অমিত গম্ভীর কন্ঠে থামাইয়া দিল তাহাকে: সে বুঝেছি—এখন আর-এক দিন—আর-এক পালা—। কিন্তু আপনারা এখানে কি চান আজ বলুন ত?

ভদ্রলোক একবার নীরব হইল, তারপর বলিল—কাজের মানুষের মত কাজের কথা এইবার,—সার্চ ওয়ারেন্ট দেখবেন কি? এই যে—সার্চ করতে হবে, ফর আর্মস, এক্সপ্লোসিভস।

* * *

'সার্চ ফর আর্মস এক্সপ্লোসিভস'—অমিত নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারে না। কাগজ হইতে মুখ তুলিল না অমিত, নিষ্পলক হইয়া রহিল তাহার চক্ষু। বাঙলা ছাপা ওয়ারেন্টের মধ্যে কার্বোন কাগজের দাগে দাগে সেই ইংরেজী অক্ষরগুলি সত্যই ক্রমে চোখের সম্মুখে ভূতপ্রেতের মত নাচিতে লাগিল। তারপর—

...তরুণ সুন্দর দীর্ঘ গৌরবর্ণ এক যুবকের মুখ;—এই গৃহে, ওই আসনেই অমিত সুবীরকে দেখিয়াছে কতদিন। মাদুরের উপর ওখানটিতে বসিয়াছিল—এই সেদিনও। দীর্ঘ দেহ, নব কিশলয়ের সুচিক্কণতা তাহার গৌর তনু-সুন্দর দেহে, দীর্ঘ ভ্রু-যুগলের নিচে চঞ্চল চক্ষু, উন্নত নাসা, পাপড়ির মত ওষ্ঠাধর।

যদুসেন লেনের ওই ঠাকুর দালানে অমিত কতবার গিয়াছে।—নারায়ণ রাও ব্যাসকে বোধ হয় অমিত প্রথম দেখিয়াছিল এইখানেই। না, 'শঙ্কর উৎসবে'? কিন্তু এইখানেই সে দেখিয়াছে একবার গোলাম আলী খাঁকে—আর ফৈয়াজ খাঁকে; শুনিয়াছে আলাউদ্দীন খাঁর সরোদ আর অনোখে লালের তবলা। এইখানে সঙ্গীতের মধ্য দিয়া তেমন দুই-একটি মহামুহূর্তের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছে অমিত, যখন মনে হইয়াছে জগৎ ও জীবন-প্রবাহের নিগূঢ় সত্যের কাছাকাছি গিয়া বুঝি সে পৌঁছিতেছে;—বিশ্বভুবনের কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রময় নিবিড় রহস্যের দ্বার বুঝি খুলিয়া যাইতেছে ধ্রুপদে পাখোয়াজের

কোন একটি বোলে খেয়ালের আলাপের মায়াগুঞ্জরণে,—আপনার অবগুণ্ঠিত দল মেলিয়া দিয়া জীবন-সত্য আপনার মর্মকোষ উদ্‌ঘাটন করিয়া দিতেছে তাহার সম্মুখে। এই গৃহতল, এই দালান, ওই অঙ্গন, সঙ্গীতের সেই অপূর্ব সত্যের সাক্ষী।...

অতিথিরা ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ সমুত্তীর্ণ হইয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছে। হাস্যমুখর, পুষ্পামোদিত আসরে তাহাদেরই অপেক্ষায় কে সেতারে আলাপ করিয়া চলিয়াছে। কুশলপ্রশ্ন ও পরিচয় শেষে অমিতও অতিথিদের পশ্চাতে চলিতেছে। বিদেশীয় অতিথি তাহারা,—তরুণ যুবক, আর তাহাদের মতই তরুণী বিদেশিনী। বিশ্ব-বন্ধুত্বের ও মুক্তি-অভিযানের যুক্ত সংকল্প লইয়া তাহারা আসিয়াছে ভারতের দ্বারে; এশিয়ায় ইউরোপে আমাদের আতিথেয়তার মধুর স্মৃতি, সানন্দ বাণী দেশে লইয়া যাইবে। প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ হইয়া অমিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—হঠাৎ বাহিরে দুড়ুম করিয়া কী শব্দ হইল? বোমা? পিস্তল, স্টেন-গানের আওয়াজ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। কি ব্যাপার?—অমিত চমকিত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল দ্বারের দিকে; কিন্তু কাহার দেহ দুয়ার হইতে ছিটকাইয়া পড়িল তাহার গায়ে? রক্ত ফিনকি দিয়া উঠিতেছে কপাল হইতে,—কে? সুবীর না?

বাহিরে বারুদের গন্ধ, বোমার ধূম্ররাশি, ক্রমাগত পিস্তল বন্দুকের শব্দ, আর তাহার ফাঁকে অট্টহাসি। আরও কে একজন পড়িয়া গেল অমিতের সম্মুখে। বিমূঢ়, ত্রস্ত নরনারী বালক বালিকা ছুটাছুটি করিতেছে চারিদিকে। আপনারই অজ্ঞাতে প্রাচীর ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আপনাকে আড়াল করিতেছে অমিত। আর তাহারই সম্মুখে পড়িয়া আছে সুবীরদের রক্তাপ্লুত দেহ—নবকিশলয়ের মত গৌরবর্ণ সুবীরের সুন্দর মুখ রক্তে আচ্ছাদিত। পড়িয়া আছে সুবেশ, সরল, সঙ্গীত শ্রবণে সমুৎসুক আরও একটি নিষ্প্রাণ যুবক...

অতিথিদের এই সম্বর্ধনার আসরে সুবীরকে সংবাদ দিয়াছিল অমিতই। সুবীর গান গাহিবে; সঙ্গীতের জলসার ব্যবস্থা করিয়াছে তাহার গানের দলের বন্ধুরা এই উপলক্ষে। গান বাঁধিবার, গান গাহিবার নেশাতেই সুবীর অমিতদের সঙ্গে আসিয়া জুটিয়াছিল। বিধবা মায়ের সন্তান হিসাবে সে অনেক কষ্টে পাশ করিয়াছে। তারপর দিনের বেলা কোন্ বাঙালী যুদ্ধ-কন্ট্রাকটারের আপিসে কেরাণীগিরি করিয়া রাত্রিতে আই. কম্ পড়িয়া তখন সে উঠিয়া গিয়াছিল বি. কমের কোঠায়। কিন্তু বাড়িতে আছে বিধবা মাতা, অনূঢ়া ভগ্নী, ও যক্ষ্মা-সন্দিগ্ধ রুগ্ন অনুজ। তাই যুদ্ধের কঠোর দিনে তাহাদের সংসার খরচ আর কুলায় না। মুনিবের সঙ্গে মাগগী ভাতার দাবি দ্বন্দ্বে তাহার যে চেতনা ফুটিয়া উঠিতেছিল—গান বাঁধিবার ও গান গাহিবার নেশায় সে তাহার সেই ক্ষোভকে চাপা দিত। আর গানের আনন্দে ভুলিয়া যাইত তাহার বিধবা মা, অনূঢ়া বোন আর পীড়িত ভ্রাতাকে। কিন্তু একেবারে ভুলিতেও পারিত না। তাই দশটি বন্ধুর সঙ্গে সুবীরও আসিয়া বসিত কখনো সেই কেরাণী ইউনিয়নে, কখনো তাহাদের ক্লাবে। শুনিত কখনো 'পাঠচক্রে' অমিতবাবুর কথা, দেখিত কখনো তাহাদেরই আসরে অমিতবাবুদের নাট্যাভিনয়, গীতোৎসব।

তাহাই দেখিতে দেখিতে ও শুনিতে শুনিতে নিজেও গান বাঁধিবার আগ্রহে এক-একবার সে চঞ্চল হইয়া পড়িত; এবং গান গাহিতে গাহিতে নতুন কালের গানের টানে মাতিয়া উঠিত—এমন গান সে গাহিবে যে গানে আর মানুষ ভুলিয়া যায় না তাহার বিধবা মাকে, অনূঢ়া বোনকে, অচিকিৎসিত ভাইকে। এমন গান তাহাকে রচনা করতে হইবে যাহাতে হরিপদ কেরাণী জানে সে হরিপদ কেরাণীই, সে আকবর বাদশাহ্ নয়।...কে আকবর শাহ? সে? সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়? জীবনের অমৃতভাণ্ড ত তাহার মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে জন্মের পূর্ব হইতেই সমাজ আর রাষ্ট্রশাসকরা। তাহার বিধবা মাতা তাই চল্লিশের তীরে না পৌঁছিতেই শীর্ণ-বিশীর্ণা,—শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিগতদীপ্তি, বিলুপ্ত সমস্ত জীবনাশা। তাহার চৌদ্দ বৎসরের অনূঢ়া ভগ্নী শিক্ষাবঞ্চিতা,—পাড়ার দশটি ক্ষুধার্ত দৃষ্টির আর সমাজের সর্বাঙ্গীণ গঞ্জনার তলায় সে তরুণী আপনার অন্তরে আপনি নিষ্পিষ্টা, আবার আপনার দেহমনে নব-যৌবনের পীড়নের তাড়নায় একই কালে সংকুচিতা আর দুঃসাহসিনী, কুণ্ঠিতা আর চপলা প্রগল্ভা। বারো বৎসরের তাহার কনিষ্ঠ ভাইটি অভাবের সংসারে তাহার কচি মুখখানি আর নবাঙ্কুরিত স্বপ্ন লইয়া দাদার-দেওয়া বই-এর মধ্যে হইতে খুঁজিয়া ফিরে আপনার শয্যাশ্রয়ী আয়ুহীন দিনগুলির সান্ত্বনা।—এই কি আকবর বাদশাহ?—থাক্, আকবর বাদশাহ! জীবনের নির্মম সত্য ভুলিয়া সুবীর ভাবিতে পারে কি জীবনের অমৃতপাত্রে তাহার ও তাহার মুনিব ইণ্ডিয়ান্ প্রোডাক্শ্যানের কর্তা যুদ্ধকন্ট্রাক্টার মিস্টার গাঙ্গুলীরই সমতুল্য অধিকার? হরিপদ কেরাণী আর আকবর বাদশাহ কি কোনো খানে কোনো কারণে এক? আর্ট কি এমনি এক রঙীন মিথ্যার মায়ালোক? যে-মিথ্যা এমন করিয়া মানুষকে প্রতারণা করে—ছলনা করে সুবীর কেরাণীকে আর হরিপদ কেরাণীকে,—তাহা যদি গান হয়, কবিতা হয়, নাটক হয়, চিত্রকলা হয়, বিশ্বসৌন্দর্যের যে-কোনো বাহন হয়, তাহা হইলে,—হাঁ, সত্য কথাই বলেন অমিতবাবু,—সে গান, সে কবিতা, সে নাটক, সে চিত্রকলা, সে শিল্পবস্তুতে আর মজুর বস্তির মদের দোকানে বা তাড়ির দোকানে কী তফাৎ?

—না, না, আমাদের শিল্পকলা আপনাকে ভুলবার জন্য নয়—দুঃখদৈন্যকে ভুলবার জন্যও নয়। না, আর্ট কখনো ড্রাগ নয়, আফিম নয়, তাড়ি নয়। সে বরং সত্যকে মনে করিয়ে দেবে, —মনে করিয়ে দেবে জীবনের বাস্তবকে—দুঃখকে দৈন্যকে ;—আর মনে করিয়ে দেবে জীবনের অপ্রতুল সম্ভাবনাকেও,—মনে করিয়ে দেবে আপনাকে আপনার কাছে,—মনে করিয়ে দেবে মানুষকে মানুষ বলে—আর জাগিয়ে দেবে মানুষের এই মহান্ আত্মোপলব্ধি—'ম্যান মেক্স হিমসেলফ্।'

সুবীরের সঙ্গে অমিতের সেই পরিচয়ের দিনটি ঝাপসা হইয়া যাইত; মুছিয়াও যাইত একদিন দুইজনার অনেক-অনেক দিনের স্বচ্ছন্দ পরিচয়ের মধ্য দিয়া। অমিতেরও মনে থাকিত না বেলেঘাটার কোন-একটি আসরে একদিন এই সুন্দর সুচিক্কণ-দেহ তরুণ আপনার প্রত্যয়ভরা যৌবন-দৃষ্টি লইয়া অমিতকে বলিয়াছিল,—

'সত্য কথাই বলেছেন আর্ট আফিম নয়। কিন্তু একথাই আমাদের ভুলিয়ে রাখেন আর্টবাদীরা।' অমিতও ভুলিয়া যাইত বেলেঘাটার সেই স্বল্পালোকিত ঘর, সেই জন ত্রিশ কেরাণী ও মধ্যবিত্ত সাহিত্যাকাঙ্ক্ষী যুবকের আসর, আর সেই দীপ্তশ্রী যুবকের এই প্রথম কথা কয়টি। কিন্তু অমিতকে তাহা ভুলিতে দিল না এই দিনের সম্বর্ধনা-সন্ধ্যা—সেই রক্তমাখা তরুণ মুখ—সেই বারুদের গন্ধ, বন্দুকের শব্দ. আর গৃহ প্রাঙ্গণে আততায়ীদের সেই উৎকট অট্টহাস্য!

যুদ্ধান্তর পৃথিবীতে ক্ষুদে হিট্‌লারী-গ্যাংরা জাগিয়া উঠিতেছে দেশে দেশে—অমিত তাহা জানে। 'অহিংস' কংগ্রেসী নিবাচন সে দেখিয়াছে, সে দেখিয়াছে কলিকাতার বুকের উপরে ভ্রাতৃরক্তে পরস্পরের সেই ক্লেদারক্ত তাণ্ডব! কিন্তু কে জানিত আজ এইখানে এই অন্য দেশীয় অতিথিদেব সম্বর্ধনার আসরে—যেখানে সঙ্গীতের উৎসব সন্ধ্যাটিকে আনন্দে মাধুর্যে সুমধুব করিয়া তুলিবে—যেখানে সে কত দিন জীবন-রহস্যের কাছাকাছি গিয়াছে—সেখানে,—ঠিক তাহারই পায়ের কাছে, তাহারই চোখের তলে,—এমন করিয়া সুবীর লুটাইয়া পড়িবে রক্তাপ্লুত মুখে। আর একটি-বারও গান ফুটিবে না তাহার কন্ঠে, চোখে ফুটিবে না একটি চাহনি।

অমিত আর সুবীরকে দেখে নাই। রক্তপতাকার তলে সেই রক্তমোক্ষণে নিষ্প্রভ দেহ, অর্ধনিমীলিত নেত্র চলিয়া গিয়াছে মৌন শোকযাত্রায়—ক্ষুব্ধ, নিষ্ফল ক্রোধে হতবাক্ সহকর্মীদের স্কন্ধে—শ্মশান ঘাটের দিকে,—মিলাইয়া গিয়াছে শ্মশানভস্মে। অমিত আর দেখে নাই সুবীরকে। অনুরা খোঁজ করিয়াছে তাহার মায়ের, তাহার বোনের, ভাইয়েব। কিন্তু অমিত আজ দেখিল—এখনো দেখিতে পাইতেছে—তাহারই মেজের মাদুরে যেখানে কত দিন সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় বসিয়াছে—ঠিক সেইখানটিতেই এই পুলিশ পার্টি আর—সেই নব-কিশলয়ের মত সুচিক্কণ গৌরাভ মুখ—উচ্ছৃত বক্তে তাহা সমাচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে,—আব বাইরে সেই বন্দুকেব শব্দ ও ধোঁয়া, আর সেই বিকট 'গ্যাংস্টারি' উল্লাসের অট্টহাস্য—সম্মুখে সেই গ্যাংস্টার চক্রের এই সাক্ষীরা...

আকন্ঠ বিক্ষোভে অমিতের বুক ভরিয়া উঠিল। ত্রিবাঙ্কুর, ত্রিচিনাপল্লী, শোলাপুর, অমলনের হইতে এই যদুসেন লেন—এতগুলি দবিদ্র মানুষের রক্তের রেখা কি এই কাবোন কাগজের মিথ্যা অক্ষবগুলিতে ঢাকা পড়িয়া যাইবে?—'আর্মস্ এণ্ড এক্স্প্লোসিভ্স্'-এর এই ধুয়া তোলা ত সেই উদ্দেশ্যেই।

হুকুমের কাগজটা ফিরাইয়া দিয়া অমিত বলিল,—যদুসেন লেনের খুনের এটাই বুঝি পুলিশী সাফাই, না?—কন্ঠস্বর শান্ত, হাসিতে অন্তরের ঘৃণা যথাসম্ভব সংগোপিত। অমিত বলিল, দেখুন তা হলে, স্টেনগান, ব্রেনগান, কি পান এ ঘরে।—বুক ঠেলিয়া উঠিতেছিল অদম্য ঘৃণা আর বিদ্বেষ—নিরপরাধ সুবীরদের রক্তকেই যেন ব্যঙ্গ করিতেছে এই সাচওয়ারেন্ট মিথ্যার জয়পত্র!

না, না;—গোয়েন্দা যুবক হাসিল।—আপনার কাছে ওসবের খোঁজে আমরা আসিনি। তবে ঘরগুলো দেখতে হবে একবার।

কী দেখবেন, দেখুন।

বইভরা শেলফ্ আলমারি, টেবিলের উপরকার বোঝাই করা বই সাময়িকপত্র, ঘরের কোণে জমা-করা অজস্র কাগজপত্রের দিকে তাকাইয়া ভাবিত হইয়া পড়িল গোয়েন্দা যুবক। বিপন্ন নিরুপায় বোধ করিল থানার দারোগা—সবই দেখিতে হইবে নাকি?

গোয়েন্দা অফিসার অমিতকে বলিল,—আপনার ত সবই বই;—ঘর-বোঝাই বই।

বই কে বললে? একস্‌প্লোসিভ্‌স্। সরকারের মতে বই যে বোমা।

ঠিকই বলেছেন—উৎফুল্ল হইল কর্মচারীটি।—বইই ত বোমা। কিন্তু তাতে আমাদের কি? আমরা জানি,—বই বোমা নয়, বই-ই। আপনাকে বলতে কি,—পারলে এক আধটুকু আমরাও ওসব পড়ি, আনন্দও পাই। পুলিশ হয়েছি, কলেজের বিদ্যা গুড়িয়ে খেয়েছি অনেক কাল। তা বলে বইপত্রও পড়ব না, আনন্দ পাব না, একেবারে মুক্‌খু হয়ে থাকব—এমন কি পাপ করেছি? অত বড় চাকরিও করি না যে, পড়াশুনো না করলেও চল্‌বে।

বেশ মজা ত। মানুষটার একটা মজাব দিক উঁকি দিতে শুরু করিয়াছে তাহার কথার মধ্য দিয়া। অমিত কুতূহলী হইল।

কাচের ভিতর দিয়া আলমারিগুলির অভ্যন্তরস্থ বাঁধানো বইয়ের নাম কিছু কিছু পড়িবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিয়া চলে গোয়েন্দা যুবক:—আপনাদের এই মস্কোর বইগুলি কিন্তু অদ্ভুত। এত সস্তায় ওরা দেয় কি ক'রে? এমন ছাপা, এমন বাঁধাই!—'সোভিয়েট শর্ট স্টোরি'র সংগ্রহটা কিন্তু আমিও কিনেছি,—তার মানে আমার স্ত্রী কিনিয়েছেন তাঁর ভাইকে দিয়ে—আমার মিসেস গ্রাজুয়েট্—

শুধু নিজের নয়, স্ত্রীরও সংস্কৃতির পরিচয় দিবার সুযোগ উপেক্ষা করিবে না সে। এবার অমিত মনে মনে কৌতুক বোধ করিতেছিল—মানুষের কত তুচ্ছ লোভই না আছে। 'আমি কাল্‌চারওয়ালা—আমার স্ত্রী কাল্‌চারওয়ালী'—সহজবোধ্য এই দুর্বলতা। কিন্তু ঔদ্ধত্য বা ইতরতা নাই লোকটার।—অমিত তাহার প্রয়াস বুঝিতে পারিতেছিল; তাই একটু আশান্বিতও হইতেছিল—লোকটা তল্লাশীর নামে বইপত্র তছনছ করিবে না; অন্তত ঘর-দুয়ার লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিয়া যাইবে না। তোরঙ্গগুলি নিশ্চয় দেখিবে,—বইপত্রে তাহা বোঝাই। দেখুক তাহা। বেশি বাড়াবাড়ি না করিলেই হইল।

অমিত জানাইল,—একটা সুটকেসে আছে জামা কাপড়; আর অন্য বাক্স পেঁটরায় বই-ই আছে। আপনার স্ত্রী হয়ত পেলে খুশী হতেন, কিন্তু আপনি যখন পাচ্ছেন তখন আমার থেকে এসব নিশ্চয়ই 'সীজ' করবেন।

সহাস্য গর্বে উত্তর হইল,—একবার খুলে দেখি। আপনাকে নামাতে হবে না কিছু, উপর থেকে দেখলেই হবে। শুধু দেখা, বুঝলেন না? নইলেই ত দোষ হবে—,ডিউটি' পালন করা হয়নি।

অমিত লক্ষ্য করিতে লাগিল ততক্ষণ—বিছানাটা উল্টাইয়া দেখিয়া লইল থানার দারোগা ও পুলিশে—কিছু নাই।

সত্যই বাক্স উপর উপর দেখিয়াই যুবকটি প্রায় নিরস্ত হইল। অবশ্য পেঁটরার কোণগুলিতে তবু হাতড়াইয়া দেখিল—কিছু হাতে ঠেকে কিনা, পিস্তল বা বোমা।

টেবিলের উপর ছোট বড় নানা সাময়িক পত্র, বই। এখান হইতে ওখান হইতে দুই একসংখ্যা বই, দুই একখানা চিঠি, দুই একটি মাসিকপত্র সে টানিয়া বাহির করিয়া লইতে লাগিল। দেখিয়া আবার রাখিয়া দিল তাহা। ইচ্ছা করিয়া অযত্নে রাখিল না, কিন্তু যেখানে ছিল তেমনটিও রাখিল না। অমিত অস্বচ্ছন্দ বোধ করিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহা পূর্বেকার মত সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। একবার সতর্ক দৃষ্টিতে সে দেখিল টেবিলের সামনেকার ফিকে নীল খামখানা গোয়েন্দা যুবকটি হাতে লইয়াছে। কেমন অস্বস্তি বোধ করিল অমিত। ইন্দ্রাণীর সেই পত্রখানা ইহাদের হাতে পড়িবে—কে জানিত? কিন্তু একবার চোখ বুলাইয়াই যুবক সে পত্রখানা খামে বদ্ধ করিল—বুঝিল ব্যক্তিগত চিঠি। একটা শোভনতা বোধ সত্যই আছে তবে লোকটির। দেরাজের চিঠিপত্র একমুঠা তুলিয়া লইয়া সে বসিল, উল্টাইয়া পাল্টাইয়া আবার তাহা মুঠা ভরিয়া দেরাজে রাখিয়া দিল।

অমিত হাতমুখ ধুইয়া আসিল।

যুবক বলিল, দিল্লী যাবেন না কি?

অন্যান্য চিঠির সঙ্গে নীল খামটা দেরাজে রাখিয়া দিতে দিতে অমিত বলিল, হাঁ। একটা সাহিত্য-সভা আছে দোলের ছুটিতে। পারি কি না দেখি। তাড়াতাড়ি শেষ হলে হয় এখন আপনাদের এই তল্লাশীর পর্ব।

তল্লাশী আর কতক্ষণ? কিন্তু—

কি একটা কথা বলিতে বলিতে অনুচ্চারিত রহিয়া গেল। যে অনুমান অমিত প্রথম মুহূর্তেই করিতেছিল সে অনুমান আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল তাহার নিজের নিকটে এই উত্তরে। অমিত বলিল, তল্লাশীর পরেও কিছু আছে নাকি? কি ব্যাপার—বলুন না? 'কিন্তু' কি?

একবার থানায় যেতে হবে আমাদের সঙ্গে—

সাধারণ কথার মতই কথা কয়টি যুবক বলিল। ঠিক যেমন সাধারণ কণ্ঠে অমিতকে বলিয়াছিল আঠারো বৎসর পূর্বে এমনি এক প্রভাতে এমনি আর এক গোয়েন্দা কর্মচারী। বলিয়াছিল তাহারও পূর্বে আরও কতজনকে, তারপরে আবার কতজনকে কতবার কত গোয়েন্দা অফিসার। কতখানে তাহারা বলিয়াছে এই কথা কয়টি এত বৎসর;—বলিল আবার আজও—সেই নির্লিপ্ত মার্জিত মামুলী কণ্ঠে সেই অতি সাধারণ কথা কয়টি। সেদিনকার সেই গোয়েন্দা অফিসার ছিল প্রৌঢ়, সমুন্নত দেহ, গম্ভীরকণ্ঠ গম্ভীর প্রকৃতি; এদিনকার এই কর্মচারীটি যুবক, সুদর্শন, আলাপে উৎসুকও—যাহার স্ত্রী সোভিয়েট শর্ট স্টোরিজ পড়েন। দুই যুগের

দুই বয়সের দুই জীবনের দুই চরিত্রের দুই মানুষ। কিন্তু দুই যুগের পারের সেই দুই বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন কণ্ঠস্বর---এই গোয়েন্দাবিভাগের একই সূত্র 'একবার থানায় যেতে হবে আমাদের সঙ্গে'---। উচ্চারণ করিতে করিতে কেমন দুইজন অভিন্ন হইয়া যায়!—যেন তাহা দুইটি মানুষের স্বর নয়, উক্তি নয়—কোন একটা অ-মানবীয় যন্ত্রের অপরিবর্তনীয় ধ্বনিমাত্র। দুইটি সুদূর বিভিন্ন কালের কোনো বৈচিত্র্যের চিহ্নমাত্র তাহাতে নাই। মাঝখানে এতগুলি বৎসর যেন ইতিহাসে অস্তিত্বহীন ; সমস্ত যুগটা অস্বীকৃত এই অপরিবর্তনীয় সূত্রাবৃত্তিতে---'একবার থানায় যেতে হবে আমাদের সঙ্গে'—

আজ...আজ...ইহারা আজই আসিল থানায় লইয়া যাইতে। আজ!

'আর-একদিন' আজ?...থাকুক জাতীয় পতাকা আর মীরা সোম—আর 'পনেরই আগস্টে'র স্বপ্নের কুয়াসা; অপরিবর্তিত আছে সেই ব্রিটিশী গোয়েন্দার পাঠ, 'একবার থানায় যেতে হবে আমাদের সঙ্গে!'

তাই বলুন—বলিয়া হাস্যমুখর কণ্ঠে উঠিয়া দাঁড়াইল অমিত। ডাকিল—সাধু, চা তৈরি কর। রুটি-টুটি কি আছে দ্যাখ্‌। স্নানও সেরে নিই তা হলে—সারা দিনে আজ আর নাওয়া-খাওয়ার আশা ত নেই।

না, না ;---ব্যস্তভাবে যুবক বলিল,---আধ ঘণ্টার মধ্যে চ'লে আসবেন।

অমিত চমকিত হইল---গ্রেফ্‌তার! আমার যে কথা আছে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে... পরমুহূর্তে হা, হা, হা,---অমিতের হাসি উচ্ছ্বৃত হইয়া উঠিল। সেই পরিচিত বুলি! এমনি শুনিয়াছিল অমিত, ঠিক এই কথাও---এমনি নিয়ম-বাঁধা এই শব্দ কয়টি! এমনি নিয়ম-বাঁধা আগ্রহের আতিশয্য ছিল সেই প্রৌঢ়কণ্ঠে—আঠার বৎসর আগেকার সেই লর্ড সিংহ রোডের গোয়েন্দা সাব ইন্‌স্পেক্টারের মুখে;—'জাতীয় পতাকা' ছিল না সেদিন---ছিল না তখনো 'পনেরই আগস্ট'। আচরণে সেই নিয়ম-বাঁধা ইতরতার মত এই নিয়ম-বাঁধা ভদ্রতা; নিয়ম-বাঁধা নিস্পৃহতার মত নিয়ম-বাঁধা আগ্রহ। এই আঠার বৎসরেও তাহা তেমনি আছে; নিয়ম-বাঁধা সেই নিষ্প্রয়োজনীয় তুচ্ছ মিথ্যা কথাটিও বদলায় নাই। ইতিহাস উল্টাইয়া গেল চোখের সম্মুখে, কত হিটলার-মুসোলিনি-তোজো তলাইয়া গেল; ভাঙ্গিয়া গেল ভারতবর্ষ আর বাংলা দেশ—কিন্তু বদলায় নাই বাংলা দেশের গোয়েন্দা ইতিহাস, বদলায় নাই, অমিত, তোমাদের ভাগ্য,—বদলায় নাই তাই সাম্রাজ্যবাদের গোয়েন্দাদের এই অর্থহীন সামান্য মিথ্যা-ভাষণের অভ্যাসটুকু পর্যন্ত।

এই কথা কয়টাও ছাড়তে পারলেন না আপনারা—এত বৎসরে? এই মিথ্যা কথাটুকুও?

যুবক অপ্রতিভ হইল।—আমরা আর কতটুকু জানি বলুন? আমাদের যতটুকু ইনস্ট্রাকশন্ থাকে ততটুকুই মাত্র বলতে পারি।

বেশ ত, ততটুকুই বলুন না? বলুন, গ্রেপ্তার করতে এসেছেন। কেমন, ঠিক ত?

হ্যাঁ। তবে আমাদের বলা হয় না ত কাকে কর্তৃপক্ষ ছাড়বে, কাকে ধরে রাখবে।

তা হলে না বললেই পারেন—'আধঘণ্টার মধ্যে চলে আসবেন'। আজ সমস্ত দিনে যে আর নাওয়া-খাওয়া হবে না, একথাটা অন্তত আমরা বুঝতে পারি।

না, না; ওসব ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে।

হবে?—হাসিল অমিত—বেশ হোক্। কিন্তু গ্রেপ্তারের ওয়ারেণ্ট আছে, তা বলুন না।—না, তা নেই?

জানেনই ত, ওয়ারেণ্ট এখন আর লাগে না।

ওঃ! অমিত হাসিল। হাঁ, ছয় মাসও দেরি করিতে পারে নাই 'স্বাধীন রাষ্ট্র'। আমাকেই চাই, না অন্য কাহাকে চাই, সে প্রমাণেরও দরকার নাই। সত্যই ত পারিবে কি করিয়া দেরি করিতে? আজ ১৯৪৮ সাল, পৃথিবীর দেশে দেশে বিপ্লবের পদধ্বনি!

আপনি জানতে চান, দেখাতে পারি—পকেট হইতে গোয়েন্দা যুবক কাগজ বাহির করিল। টাইপ করা কাগজে গ্রেপ্তারী নামের তালিকা। প্রসন্ন হাস্যে যুবককে প্রীত প্রফুল্ল করিয়া নিজের নামটা অমিত দেখিয়া লইল। সেই সঙ্গে দেখিয়া লইল চকিতে অন্য আরো দুই একটি নাম—সৈয়দ আলি, দিলীপ দত্ত, শ্যামল রায়...তবু কিন্তু দুইপাতা জোড়া নামের তালিকার অধিকাংশ নামই দেখিবার মত সময় পাইল না।

শ্যামলকে সংবাদটা কি করিয়া দিবে?—দ্রুত বিদ্যুৎগতিতে এই চিন্তা অমিতের মস্তিষ্কে খেলিতে লাগিল। অমিত বলিল,—কত নাম আছে তালিকায়? শ' খানেক হবে, না? 'না' বলছেন কেন, নইলে আমাকে পর্যন্ত আপনাদের খোঁজ পড়েছে।

অমিত সত্য কথাই বলিল। সে ভাবিতে পারে নাই—আজ, এই ১৯৪৮ সালে—পৃথিবীর কোনো সক্রিয় প্রয়াসের উদ্যোক্তা বলিয়া গণ্য হইবার মত তাহার কোনো শক্তি আছে, যোগ্যতা আছে, আছে কর্মতৎপরতা। বয়সের অনিবার্য নিয়মেই সে আজ বিচার-বিশ্লেষণ, চিন্তা ও ভাবনার রাজ্যের অধিবাসী হইয়া উঠিয়াছে—কর্মী নেই, জার্নালিস্ট। যৌবনের যে-দুর্বার প্রাণচঞ্চল অস্থিরতা দিনরাত্রি পথে পথে শত কর্মের, শত উদ্যমের মধ্যে আপনাকে ঢলিয়া দিয়াও নিঃশেষ হইতে চাহিত না, বিশ বৎসর ধরিয়া যাহা গ্রামে নগরে সহস্র-মিছিলে সভায় আপনাকে পরম আনন্দে সমুৎসারিত করিয়া দিয়াছে—যুদ্ধান্তের জন-জাগরণের মধ্যে যে আপনার জীবনস্বপ্নকে মূর্ত দেখিতে চাহিয়াছিল, আর শেষে বিমূঢ় বেদনায় দেখিয়াছে ভ্রাতৃমেধ; দেখিয়াছে বিভক্ত দেশ, জাতীয় বিভ্রান্তি, জাতীয় ট্রাজিডি;—যৌবন-উপান্তে সেই অমিত পরিণত জীবন-সাধনার পথে একটু একটু করিয়া উদ্যমের সঙ্গে চিন্তার, কার্যের সঙ্গে কল্পনার, আবেগের সঙ্গে আত্মবিচারের মিলন ঘটাইতে ঘটাইতে চলিয়াছে। যৌবনান্তে আজ সে আপনারই অজ্ঞাতে আপনার জীবন-চাঞ্চল্যকেও যেন একটা ছন্দোনিয়মের মধ্যে গ্রথিত করিয়া লইয়াছে। যৌবনের প্রাণ প্রাচুর্য স্থিরতর হইয়াছে এবার পরিণত জীবন-দৃষ্টিতে, নিশ্চিততর আস্থায়—ইতিহাসের মহালগ্ন আর দূরে নাই—পূর্বে পশ্চিমে কোথাও। এই যুগের রূপশালায় সে আর তাই শুধু কর্মোন্মাদ রূপকার নাই; সে অনেকাংশে রূপমুগ্ধ জীবন-শিল্পীও, চোখে তাহার নিখিল মানুষের জন্য মমতার মায়াকাজল আর

মনে কৌতুকবোধের সরসতা ;—দেহে ক্রমস্ফুট ক্লান্তির সঙ্গে ক্রমস্পষ্ট তাহার আয়ুর ক্ষীয়মাণতা, মনে একটা বিদায়ের শান্ত অপেক্ষা—'এবার মোরে বিদায় দেহ ভাই—সবারে আমি প্রণাম করে যাই।'

...এ স্পেকটার ইজ হন্টিং দি ওয়ার্লড।—ভুলিয়া যাই কেন সেই কথা? ইতিহাসের এই উজান স্রোতে এই ছেঁড়াপাল, ভাঙাহাল আমার জীবনতরীকেও খুঁজিয়া পায় বুঝি ইহারা এখনো একালের যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে সকল ঝটিকার মুখে তেমনি অগ্রগামী?—অথচ ভাবিতেই চাই নাই একথা আমি, অমিত।...'চাঞ্চল্য কোথায় আমার ডানায়?' নিজেকে যে এতদিন কেবলি জোর করিয়া সাহস দিয়াছি—সহস্র মানুষের জীবনে আজ জোয়ার নামিয়াছে—আকাশের তারায়-তারায় নব-জাতকের আশ্বাস বাণী—'ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।' —পাখা বন্ধ করিও না ঝড়ের পাখি। চলো ঝড়ের মুখে। সেই ভাঙা-হাল ছেঁড়া-পাল, যাত্রী অমিত, ধন্য আমি তবে, সহযাত্রী আমি এখনো দুঃসাহসী যৌবন-যাত্রীদের, অনু ও শ্যামলের, ক্ষেতের মানুষের আর কারখানার মানুষের। ইন্দ্রাণী কি বুঝিবে ইতিহাসের এ অভিযানে আজও অগ্রগামীদেরই সঙ্গে আমার স্থান? আমার পর্যন্ত খোঁজ প'ড়েছে আজ, খোঁজ পড়েছে—কারণ, এ স্পেকটার ইজ হন্টিং দি ওয়ার্লড। আর আমি অমিত, আই হ্যাভ্ বিন এভার এ ফাইটার...

নূতন করিয়া গর্বে অমিতের বুক ভরিয়া উঠিল।

গোয়েন্দা যুবক বলিল,—আপনার খোঁজ পড়বে না, অমিতবাবু? আপনার বে ন, কার যে না পড়ছে তা জানি না। রাত্রি ন'টা থেকে কাল আফিসে তৈরী হ'য়ে এসে বসেছি।—কিন্তু বলিতে বলিতে কি তাহার মনে পড়িল, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—বসুন, শ্যামলবাবুর ঘরটা শেষ করি।—তারপর নিরাসক্ত অমায়িক কন্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—ওঁরা গিয়েছেন কোথায়?

অমিত আত্মসংহত হইয়াছিল। বলিল,—অনু আর শ্যামল গিয়েছে শ্যামলের মায়ের কাছে পাকিস্তানে।

কথাটা মিথ্যা, কিন্তু এইরূপ সময়ে সত্য বলিবার মত মূঢ়তা অমিতের কোনো কালে ছিল না। এখনও হইল না। ভাবনা-কল্পনা দূরে সরাইয়া সে সতর্ক হইল।

অনুর ঘরে এবার তল্লাশী আরম্ভ হইল। সতর্ক দৃষ্টিতে জিনিসপত্র যাচাই চলিল।

ভোরের পাখি ডাকিতে শুরু করিয়াছে অনেকক্ষণ। আলো জাগিয়া উঠিতেছে বাহিরের সড়কে। পূর্ণিমা রাত্রির চন্দ্র নিষ্প্রভ হইয়াছিল, কখন অস্ত গিয়াছে। এ বাড়ির ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটেও জাগ্রত জাগ্রত মানুষের গুঞ্জন শোনা যায়—'পুলিশ আসিল কাহার ফ্ল্যাটে'?—ওপারের ফুটপাতে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে প্রতিবেশী ও পথচারীরা দেখিতেছে এপারের বাড়ির ফটকে রাইফেলধারী পুলিশের সজ্জা। সকৌতুহল, বিমূঢ় এক সশঙ্ক দৃষ্টি এদিকে-সেদিকে চারিদিককার মানুষের চোখে। তাহারা মনে করিতেছে—সেই পুলিশরাজ আর বন্দুক-রাজ আজও কি তাহা হইলে অব্যাহত?

কত ছোট্ট টুকরা টুকরা চিঠি,—কি তার অর্থ, কি তার ইংগিত কে জানে;

কত সামান্য তুচ্ছ কাগজপত্র—অনু ও শ্যামলের শতদিনের সহস্র কাজের নিদর্শন; দেশ-বিদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির নানা বিচার, নানা প্রশ্ন, নানা বিতর্ক ও বিশ্লেষণ;—এগুলির কি সার্থকতা আজ আছে? ভুলত্রুটির, সত্য-মিথ্যার সাক্ষ্যমাত্র। অথচ ইহাদের লইয়াই কাল আপনারই অগোচরে নবজন্মের তোরণে গিয়া পৌঁছয়...

—পাকিস্তানে ওঁরা কতদিন থাকবেন?-নিরাসক্ত গোয়েন্দা কণ্ঠের প্রশ্নে অমিত আবার চমকিত হইল।

নিরাসক্ত কণ্ঠেই স্ফুটিল অমিতেরও উত্তর,—শ্যামল পাকিস্তানেই থাকছে। অনুও সেখানে চাকরী পাচ্ছে। তবে এখানকার স্কুলের চাকরীটা সে এখনো ছাড়েনি, ছুটি নিয়েছে।

অমিত লক্ষ্য করিল, শ্যামলের মায়ের ঠিকানা পুরানো চিঠি-পত্র হইতে পুলিস সাবধানে সংগ্রহ করিয়া লইতেছে। কে বলে সাধারণ আপ্যায়ন-অভিলাষী কালচার-অভিমানী যুবক সে—স্ত্রী যাহার গ্র্যাজুয়েট্? সে সুচতুর গোয়েন্দা কর্মচারী।

আপনার ভাই মনুজবাবু দিল্লীতেই আছেন বুঝি? যাচ্ছিলেন তাঁর কাছে?

অমিত সতর্ক হইল। সহজ সুরে বলিল,—হাঁ, আজই যাবার কথা—কাল স্টেশনে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে সে।

এই কথাটা মিথ্যা নয়। অমিত দেখিতেও পাইতেছে—অনেকের মত মনুর গর্বিত উৎসুক দৃষ্টি দাদার প্রতীক্ষায়। দিল্লীর সন্ধ্যালোকের বসন্ত বাতাসে মনুর সুন্দর কপালের চুল চোখেমুখে আসিয়া পড়িয়াছে। মনের উপরে আনন্দের প্রীতির স্ফুরণ। কিন্তু অমিত কোথায় গাড়িতে? তারপর চিন্তিত নিরাশ দৃষ্টি লইয়া ফিরিয়া যাইবে মনু—তাহার দাদা আর তাহাকে আপনার বলিয়া স্বীকার করে না; স্বীকার করে না মনুকে পৃথিবীর দশজনের অপেক্ষা অমিতের নিকটতর বলিয়া, আপনার ভাই বলিয়া। ভাইবোনের মধ্যে সে স্বীকৃতি অনুই বরং আদায় করিতে পারিয়াছে; অমিতের জীবনের ধারার সঙ্গে নিজের জীবনের ধারাকে মিশাইয়া দিয়া অনু দাদাকে আপনার সহোদররূপে লাভ করিয়াছে—লাভ করিয়াছে শ্যামলকে। কিন্তু মনু দাদাকে লাভ করে নাই—মনু কাহাকেও লাভ করিতে পারিল না। মনু নিজেকে অভিযুক্ত করে সেই অপরাধে; অমিতের অনুর জীবনের ধারা হইতে তাহার জীবনের ধারা পৃথক। সে ইতিহাস গড়িতে পারে না, সে ইতিহাস খুঁজিয়া পাইতে চায়। এ সত্য মনে করাইয়া দিবার জন্যই বুঝি এইবারও অমিত আসিল না, মনুকে কথা দিয়াও অমিত তাহা রাখিল না। এই বসন্ত পূর্ণিমার সাহিত্য-সভায় দিল্লীর এতগুলি ভদ্রলোকের আহ্বানেও দাদা আসিলেন না।—ম্লান মুখে ভাবিতে ভাবিতে মনু ফিরিয়া যাইবে দিল্লী স্টেশন হইতে। আহ্বায়কদের অনুযোগ ও প্রশ্নের মধ্যে সে স্টেশন হইতে বাহির হইবে অপরাধীর মত—কথা দিয়াও অমিত কথা রাখিল না—দুঃখিত ব্যথিত অপমানিত মনে ফিরিয়া যাইবে মনু।.. কিন্তু ভুল, আমার প্রাণের সঙ্গে তোমার প্রাণ গাঁথা; কর্মের না হউক মর্মের

বন্ধনে। তুমি না হইলে কে দিতে পারিত অমিতকে তাহার গ্রাসাচ্ছাদন? সাথী আমরা জন্মাবধি আর মৃত্যু পর্যন্ত।—শুনিতে পাইবে কি মনু কাল দিল্লী স্টেশনে তাহার দাদার এই মুহূর্তের এই অস্ফুট গুঞ্জন?...

সাধু চা আনিল। সঙ্গে খান দুই টোস্টও। অভ্যস্ত প্রথায় অমিত বলিয়া ফেলিল,—এক পেয়ালা? আর করিস নি?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভিতরে যেন একটা অস্বস্তিকর প্রতিবাদও শুনিতে পাইল : সে কি অমিত? এ তুমি কি করিতেছ?—ভদ্রলোকের ভদ্রতা? একটা জঘন্য শাসকচক্রের জঘন্যতর জীবগুলিকে আদর-আপ্যায়ন করিতে যাইতেছ তুমি, অমিত?—তুমি, যে জানো ইতিহাসে এই বর্গের পরিচয় 'ট্রেটর ক্লাস,' বিশ্বাসঘাতক বলিয়া? দেখিয়াছি তোমার দেশের ইতিহাসও রক্তাক্ত হইয়া উঠিতেছে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের স্বদেশী গদীয়ানরা এতদিনকার স্বাধীনতা সংগ্রামকে তছনছ করিয়া ফেলিল; আর এই গুপ্তচর জীবগুলি? ইহারা নিজেদের নখদন্তকে আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া নিশ্চিন্ত নিষ্ঠুরতায় দেশের প্রত্যেকটি মানুষের উপর ব্যবহার করিতে দ্বিধা করে নাই,—এখনও দ্বিধা করে না তাহাদের দংশন করিতে,—দংশন করিবে অনুকে, শ্যামলকে, এই মুহূর্তে আরও তোমার শত সহকর্মীকে, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ছোটবড় সৈনিককে। আর তুমি চা টোস্ট দিয়া আতিথেয়তা করিবে ইহাদেরই? এত আত্মবিচার ও কঠোর বর্গ-সংঘর্ষের বিশ্লেষণের পরেও! কেন, অমিত, কেন? ইহারা ধোপ-দোরস্ত পরিচ্ছদ পরিয়া বেড়ায় বলিয়া? তোমারই মত ভদ্রলোক-শ্রেণীর বলিয়া? তাই বুঝি ভদ্রলোকের এই ভদ্রতা?...

সাধু বলিতেছিল,—আরও দু পেয়ালা আনছি।

হাতের কাগজের গুচ্ছ রাখিয়া দিয়া গোয়েন্দা যুবক বলিয়া উঠিল,—না, না, আমাদের দরকার নেই। আপনি খান, অমিতবাবু, খেয়ে নিন; জানেনই তো কখন ছাড়া পাবেন ঠিক নেই।

পশ্চাতে পশ্চাতে থানার পুলিশ কর্মচারীও সঙ্কুচিত কণ্ঠে বলিল,—আমি চা খাই না। বুঝা গেল, কথাটা সত্য নয়, ভয়ের ও ভদ্রতার কথা মাত্র। এই পক্ষেও ভদ্রলোকের ভদ্রতা। দ্বন্দ্বখণ্ডিত চিত্তে শুষ্ককণ্ঠে অমিত বলিতে চাহিল, খান, করেছে যখন। কিন্তু আত্মদ্বন্দ্বে আরও খণ্ডিত হইয়া পড়িল সেই সঙ্গে সঙ্গে।. .ইহারই নাম ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রলোকের মত ব্যবহার। কিন্তু 'মানুষের সঙ্গে মানুষের মত' ব্যবহার, কি ইহা? কোথায়, ময়লা পোশাকের, ছোট উর্দি'র ওই ছোট মানুষের সঙ্গে ত আপ্যায়ন করি না? ঐ গুর্খা সিপাহীকে—সবল, সাধারণ মানুষকে ঐ চা দিয়া আপ্যায়ন করিবার কথা ত ভাবি না? কি মূল্য এই ভদ্রলোকের ভদ্রতার? ধোপ-দোরস্ত পোশাকের সঙ্গে ধোপ-দোরস্ত পোশাকীদের আত্মীয়তা : তাহা কি সত্য বলিয়া গ্রাহ্য দেখিয়াছ ইতিহাসের নিকটে? কিম্বা সত্য তোমার নিজের নিকটে তা আজ, অমিত?...

সাধু চা লইয়া ঢুকিতেছে। অমিত বলিল,—সিপাহীজীকে দিয়েছিস? আগে ওঁদের দে।

একবারের মত অমিত আপনার মনে সুস্থ বোধ করিল—মানুষকে সে অস্বীকার করে নাই। মানুষকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করা, ইহাই ত সত্যকার ভদ্রতা। সে ভদ্রতায় মানুষকে, সাধারণ মানুষকে, অস্বীকার করিতে হয় না ; বর্গ-বিভেদের নীতিতে তাহা প্রণীত নয়। অমিত যেন আপনার মধ্যে স্বস্তি পাইল।...হিংস্র জটিল চক্রান্তে ঘেরা সমাজের ও সভ্যতার গতিপথ।—তবু ইহারও মধ্যে মানুষকে 'মানুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, হউক সে মানুষ এই গুর্খা সিপাহীর মত আপনার অজ্ঞানতায় আপন শত্রুর হাতিয়ার—আপনার অচেতনতায় আপনার শত্রু। তবু সে মানুষ—তবু সে মানুষ! আর 'সবার উপরে মানুষ সত্য।'...

হাম্ ?—বিস্মিত গুর্খা সিপাহীর কণ্ঠে অবিশ্বাসের প্রশ্ন, হাম্ পিয়েঙ্গে ?

অমিত বলিল, পিজিয়ে। গুর্খালোগ চায় পিয়েঙ্গে নেহি তব কৌন পিয়েঙ্গে চায় ?—তাঁর মজুর-মহলের এই হিন্দীতে অমিত বন্ধুত্ব জমাইতে পারিবে না কি ইহার সঙ্গে ?

তবু গুর্খা সিপাহী বিশ্বাস করিতে পারে না। একবার অমিতের দিকে, একবার পুলিশের কর্তৃপক্ষের দিকে বিস্মিত জিজ্ঞাসায় তাকাইয়া বলিতেছে, হাম্ ? কাঁহে ? কাঁহে ?

পি লাও—একটুখানি চোখ তুলিয়া তাকাইয়া বলিল গোয়েন্দা অফিসর ; অর্থাৎ অনুমতি দিল। অমিতের ভদ্রতার সম্মান রাখিল ; কারণ, সেও নিজে ভদ্রলোক। 'পি লাও' লক্ষ্য করিল অমিত, 'পিজিয়ে' নয়।

আপলোগ পিয়েঙ্গে নেহি ? —গুর্খা হিন্দীতে সিপাহী প্রশ্ন করিল পুলিশ কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে।

উত্তর না দিয়া কাজে মন দিল তাহারা।

কেমন সন্দেহ ফুটিয়া উঠিল গুর্খার বিস্মিত দৃষ্টিতে। নিশ্চয়ই একটা চক্রান্ত আছে কোথাও ইহার মধ্যে। লেখাপড়া-জানা বাবুলোগদের মতলব হইল—তাহার মত সরকারের গরিব সিপাহীদের বিপদে ফেলা।

নেহি।—গম্ভীর কঠিন ভাবলেশহীন মুখ।—হাম্ ডিউটিমে হ্যায়।—রাইফেলের উপরে গুর্খা হাতও যেন শক্ত কঠিন হইয়া উঠিল সঙ্গে সঙ্গে।

...এই হাত, এই মুখ, এমনি ভাবলেশহীন কঠোরতায় এখনি তুলিয়া ধরিবে ওই রাইফেল তোমার বুক লক্ষ্য করিয়া—যদি সেই হুকুম করে উহার আপনার শ্রেণীশত্রু। মানুষের হাত—ওই সাধারণ মানুষের রক্তমাংসের হাত—কাঁপিবে না একবারও মানুষের বন্ধু—সাধারণ মানুষের কোনো মমতাময় বন্ধুকে নিহত করিতে,—তাহার বুকে জাগিবে না তোমার জন্য একটি মমতার দীর্ঘশ্বাসও।...এণ্ড হোয়াট্ ম্যান্ হ্যাজ মেড্ অফ্ ম্যান্।...

কিন্তু সাধু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকাইয়া আছে যে। অমিত বলিল,—তুই খেয়েছিস, সাধু ? নে, খেয়ে নে।

নিজের পেয়ালা হাতে তুলিয়া লইল অমিত।

...ভদ্রতা-অভদ্রতার দৈনন্দিন এইরূপ ছোট জিজ্ঞাসার তুচ্ছ দ্বন্দ্বের ধূলি ধোঁয়ার মধ্যে

আমি শেষ পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিব নাকি আসল সত্যের ঠিকানাও? চায়ের পেয়ালায় ঝড় তুলিব—হইব উইণ্ড মিলের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ ও ব্যাপৃত?...

কৌতুকের হাসি উঁকি দিল এইবার অমিতের মনের কোণে : তোমরা হ্যামলেট, না, ডন কুইকসো, অমিত? সর্বদেশের সর্বকালের প্রিন্স অফ্ ডেনমার্ক, না, পৃথিবীর স্বকালচ্যুত শ্রেষ্ঠ নাইট-এরান্ট? হয়ত দুই-ই;—এ কালের পরিহাস—এবং আগামী দিনের আশ্বাসও। তবু এখনতো পরিহাসই.. ।

—না, না; আমাদের দরকার নেই, আমাদের দরকার নেই—চা সম্মুখে; পুলিশের অফিসার দুইজন তখনও আর-একবার ভদ্রতা করিতেছেঁ।

—সে বুঝবেন আপনারা,—আপনাদের ডিউটিতে কি হারাম আর কি হালাল।

চায়ে চুমুক দিল অমিত। ঠোঁটে হাসির রেখা দেখা দিল। পৃথিবীর প্যারাডক্স তাহার কৌতুকবোধ এবার জাগাইয়া তুলিতেছে...পরিহাস ও আশ্বাস।

তল্লাশী শেষ হইয়াছে। এখন তালিকা তৈরী হইবে। একজন হিন্দুস্থানী পানওয়ালা, একজন পাড়ার নিষ্কর্মা যুবক, আর অপরিচিত তেমনি একটি সাধারণ পথিক—তালিকায় স্বাক্ষর করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিল। হোলির আবিরে ও রঙে রঞ্জিত তাহারা, কতকটা হোলির নিশি-শেষের শ্রান্তিতেও তাহাদের দেহ অচল,—সকৌতুকে অমিত তাহাদের দেখিল।...আশ্চর্য এইসব তল্লাশীর সাক্ষী সংগ্রহ ইহাদের। ঠিক কোথা হইতে প্রত্যেক সময়েই তল্লাশীর জন্য জুটিয়া যায় এমনি পানওয়ালা, এমনি অকর্মণ্য মানুষ আর এমনি অপরিচিত পথিক। বিশ বৎসর পূর্বেও জুটিত, আজও জোটে। তখনো যেন সে পাড়ায় আর অন্য মানুষ বাস করিত না, আর আজও যেন এ বাড়ির অন্য ফ্ল্যাটে আর কোনো মানুষ নাই।

সকৌতুকে অমিত দেখিতে দেখিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, আমি তা হ'লে স্নান সেরে নিই। ছোট একটা সুটকেশে কিছু কাপড়-জামা সজ্জিতই রহিয়াছে, হোল্ডঅলেও মোটামুটি প্রয়োজনীয় বিছানাপত্র গোছানো আছে—আজ মধ্যাহ্নেই দিল্লী যাইবার কথা ছিল।

...খবরটা পাইবে কি করিয়া আজ শ্যামল? কি করিয়া পাইবে তাহা অনু? শ্যামল এখন দানাপুরে, না মোগলসরাইতে? রেলওয়ে শ্রমিকের কোন্ কেন্দ্রে সে এখন? ধরা পড়িবে কি সেখানে? সারা দেশ জুড়িয়া আজ হানা দিতেছে সরকার। কোথায়ই বা অনু? আসানসোলে না গিরিডিতে? শ্রমিক মেয়েদের জীবনের তথ্য সংগ্রহ করিবে তাহারা—কোথায় পৌঁছিয়াছে সে এখন? খনিতে, না, রেল কলোনিতে? হোলির সময় বলিয়া যদি না গিয়া থাকে অনুরা শ্রমিক পল্লীতে, খনিতে বা রেল কোয়ার্টার্সে, তাহা হইলে হয়ত অনু এখনও আছে বারাণসীতে তাহার শাশুড়ীর কাছে। হয়ত শ্যামলও এখনো লাইনে বাহির হইয়া পড়ে নাই। আর তাহা হইলে সম্ভবত আর তাহাদের একজনারও খোঁজ পাইবে না পুলিশ। তাহারা সময় পাইবে। আর সময় পাইলে শ্যামল নিশ্চয় পালাইবে। সন্দেহ নাই সে আত্মগোপন করিয়া কাজে নিযুক্ত হইবে—যেমন অমিতরা করিয়াছিল যুদ্ধের প্রথমদিকে সেবার। শ্যামল পালাইবে, কিন্তু অনু কি করিবে? সেও কি

পালাইবে? কোথায় পালাইবে? পালাইয়া থাকিতে পারিবে অনু? বড় দুঃখের, বড় কষ্টের যে সেই পলাতক জীবন—অমিতের অভিজ্ঞতায়ও তাহা একটা কঠোর পর্ব। কঠিন পরিশ্রমের সে জীবন। অশনে বসনে বিষম সংকোচে ব্যাহত সে জীবন; খাঁচায়-পোরা মানুষের অবরুদ্ধ সীমাবদ্ধ সে জীবন। নিস্তব্ধ গতিবিধি, নিঃশব্দ হাসি, নিশ্চল প্রতীক্ষা; আর দিনরাত্রি সর্বক্ষণ সর্ব অবস্থায় একটা ক্লান্তিহীন সতর্ক পাহারা; সে জীবন 'স্নায়ুযুদ্ধের' একটা অন্তহীন একটানা অধ্যায়। অথচ তাহাতে স্নায়ু সংগ্রামের তীব্রতা নাই, তীক্ষ্ণতা নাই, আর নাই পৌরুষের পরীক্ষা। আছে শুধু আপনার অচপল স্থৈর্যের ও ধৈর্যের পরীক্ষা। পরীক্ষা বিশেষ করিয়া তাহাদের যাহাদের জীবন এখনও সরস গতিময়; যৌবনের অফুরন্ত আশা আর সাহসে যাঁহারা অস্থির গতিচঞ্চল; কর্মচঞ্চল দিনরাত্রির মধ্যে পৃথিবীকে যাহারা আকণ্ঠ পান করিতে চায়—অনুর মত। সেই কঠিন পরীক্ষা অনুর সম্মুখে। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে তোমাকে, অনু।—আর তাহার পূর্বে ধরা পড়া চলিবে না তোমাদের, অনু ও শ্যামল।...একই সঙ্গে মমতা ও কর্তব্য নির্দেশের গাম্ভীর্যে অমিতের মন ভরিয়া উঠিয়াছে—পিতৃহীনা অনুর সে দাদা, বন্ধু।

সংবাদটা তাহাদের দেওয়া চাই। অনুকে শ্যামলকে কি ভাবে জানানো যায় এই কথা? কে পারিবে এ সংবাদ তাহাদের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে? কে দিবে তাহাদের এসময় আশ্রয়? কে? কে?...

স্নানঘরের দ্বার খুলিতেই দণ্ডায়মান গুর্খা সিপাহী তাহার চোখে পড়িল। আর চোখে পড়িল সেই গুর্খার চোখের আশ্বস্ত দৃষ্টি—স্নানঘর হইতে অমিত তাহাকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করে নাই। অমিত হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—চিড়িয়া নেহি ভাগা।

এক মুহূর্তের জন্য সেই গুর্খার মুখেও হাসি ফুটিল। সলজ্জ হাসিতে সেই গুর্খা মুখের সমস্ত সারল্য ও মানবীয়তা যেন আর একবার আত্ম-ঘোষণা করিল অমিতের সম্মুখে। আর রাইফেল-উর্দি নোকরি-নিমক, বাস্তব ও ভাবলোকের সমস্ত বন্ধনের মধ্য হইতে যেন ফুটিয়া উঠিল সেই দার্জিলিং-কালিম্পং-এর চা বাগানের কর্মক্লান্ত মানুষ: 'হট-বাহারে'র গৃহহীন গুর্খা মেয়ে-পুরুষ।—এই ত মানুষের অনির্বাণ আত্মার জয়পত্র—সহজ মানুষের সহজ হাসি।—সিপাহীজী হাসিতেই এই সহজ স্নান-স্নিগ্ধ দেহে অমিত এক মুহূর্তে যেন আবার পাঠ করিল সেই চিরদিনের ঘোষণা—'সবার উপরে মানুষ সত্য'।

চায় নেহি পেয়েঙ্গে আপ?—জিজ্ঞাসা করিল অমিত।

হাসি-ভরা মুখ এবার লজ্জারক্ত হইল।—বাবুলোগ পিলিয়া।

আপ নেহি পিয়েঙ্গে?—এবার উত্তর নাই। কিন্তু মুখের হাসি মিলাইয়া যায় নাই। অমিত গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল,—সাধু আর দু পেয়ালা—এক পেয়ালা সিপাহীজীকে আর এক পেয়ালা আমাকে। হ্যাঁ, একটু ভালো ক'রে কর—কি জানি আবার তোর হাতে চা কবে খাব? আর খাব কিনা তারই বা নিশ্চয়তা কি?

ভদ্রতার রীতি-নিয়মে গোয়েন্দা কর্মচারী বলিল,---না, অমিতবাবু, কি আর হবে? হয়ত ক'ঘন্টা ব'সে থাকতে হবে, বড় বড় সাহেব কর্তারা কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

অমিত হাসিল, হয়ত ক' ঘন্টা, হয়ত বা ক' বৎসর, বেশি হলে বড়জোর বাকী জীবনটুকু---

ভদ্রতার নিয়মে গোয়েন্দা কর্মচারী বুঝাইতে চাহিল---তাহা নয়।

অমিত হাসিল। এ কি নিয়তির পরিহাস? আজ আর ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তাহার দেখা হইবে না।

অমিত সুটকেশ ভরিয়া লইয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল।...কয় ঘন্টা না কয় বৎসর। ঠিক কি তাহার? ইতিহাস মুখর হইয়া উঠিয়াছে ইতিমধ্যেই। সংগ্রামের উদ্যোগপর্ব আজ আর অনিশ্চিত নাই। বিপ্লবের জোয়ার জাগিয়াছে সপ্তসাগরের সকল তীরে। দুঃসাহসের নেশায় তোমরাও তাহাতে ভাসাইয়াছ তোমাদের নতুন পালের নতুন তরী। পাড়ি দিতেছ এই তুফানের মুখে---মুক্তি-মহাতীর্থের উদ্দেশ্যে। আর নয়াদিল্লী আজ নিউ ইয়র্ক-লণ্ডনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধিয়া বসিয়া গিয়াছে নানকিং-এর মত। ভারতের মহামালিকেরা পারমিটের দালালিতে আজ মারোয়াড়ীর বাড়া।...

জেলের অভ্যন্তরে বসিয়া দশ বৎসর পূর্বে ভুজঙ্গ সেন বলিয়াছিল অমিতকে, 'অমিত বাবু, এ দেশটাকে আমরা রুশিয়া বানাতে দেব না। আপনাদের সর্বহারাদের না হয় হারাবার মত কিছু নেই---শৃঙ্খল ছাড়া। আমাদের 'স্বদেশীদের' কিন্তু হারাবার মত মহৎ সম্পদ আছে: এই ভারতবর্ষ, তাহার সভ্যতা, আর আমাদের ত্রিশ বৎসরের এই তপস্যা।'

সেদিনও অমিত জানিত ভুজঙ্গ সেনের কথাটা সত্য নয়। আসলে ভুজঙ্গ সেন হারাইতে রাজী নয় তাহার ভদ্রশ্রেণীর স্বার্থ, উপদলীয় নেতৃত্ব, তাহার আপন ক্ষমতাপ্রিয়তা। তাই ভুজঙ্গ সেনরা সেই ভারতবর্ষ ও তাহার সভ্যতা লইয়া আজ চোরাকারবার ফাঁদিতেছে দিল্লীর কন্স্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্ব্লির লবিতে।

'বার্সিলোনার পতন হয়েছে'—'বটে?' তর্ক চলিতেছিল। বন্দী অমিত সঙ্গী বন্ধুদের তর্ক শুনিতেছে। সাধারণত ভুজঙ্গ সেন এইসব যুবকদের দিকে তাকান না। ভ্রমণ করেন নিজের নিয়মে—অবশ্য কোন কথা তাঁহার কান এড়ায় না। কিন্তু তাই বলিয়া—তিনি ভুজঙ্গ সেন—ইহাদের কথাবার্তা যে তাঁহার কানে যায়, তাহা স্বীকার করিবেন নাকি? জাতীয় জীবনের বৃহত্তম সমস্যা তাঁহার ধ্যানের বিষয়, ছোকরাদের কথাবার্তা নয়। কিন্তু কথাটা বলিতেছে কে? তাঁহারই দলের দক্ষিণা না? দাঁড়াইলেন ভুজঙ্গ সেন।

'পতনটা কাকে বলে দক্ষিণা? বার্সিলোনার পতন হয়েছে, না, উদ্ধার হয়েছে?'

দক্ষিণা ভীতভাবে দাদাকে বলিল, 'ওঁরাই বলছিলেন শব্দটা—আমি অবশ্য মানি না 'পতন'।'

দক্ষিণার প্রতিপক্ষীয় তার্কিক ছেলেটি বলিল, 'কেন রিপাব্লিকান্ গবর্নমেন্টের হাতে ছিল বার্সিলোনা,—জনমতের দ্বারা নির্বাচিত গবর্নমেণ্ট তারা—'

অমিত শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু ভুজঙ্গ সেন উত্তর দিবার জন্য দাঁড়াইলেন না। এইসব ছেলে-ছোকরার সঙ্গে কথা বলা তাঁহার পক্ষে অসম্মানজনক। যত বিড়ি-সিগারেটের দোকানদারদের না হয় গবর্নমেন্ট এখন ডেটিন্যু করিতেছে! তাই বলিয়া ভুজঙ্গ সেনও তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিবে নাকি!

'জনমত'। দক্ষিণাকে ভুজঙ্গ সেন বলিলেন,—'যেন জনতার মন আছে! মত দিবার যোগ্যতা জন্মায় যেন দুটো হাত থাকলেই।...'

অমিত মানিতে পারে ভুজঙ্গ সেন বুঝিতেন না ইতিহাস। ১৯১৫-এর কোন একটি দিনে তথাপি যুবক ভুজঙ্গ কি পারিতেন না ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করিয়া গাহিয়া যাইতে জীবনের জয়গান? অমিতও জানে—তখন ভুজঙ্গ সেনের যৌবনের উন্মাদনা তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছে দেশের এক কোণ হইতে অন্য কোণে,—শহরে, গ্রামে, বনে-বাদাড়ে। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর রূপে তখন ভুজঙ্গ আগুন লইয়া খেলিতে এক নিমেষের জন্যও দ্বিধা করেন নাই।

কিন্তু ভুজঙ্গ সেনের কোনো শ্রদ্ধা নাই প্রাণ-চঞ্চল যুব শক্তির প্রতি, জনশক্তির প্রতি;—'ভেড়ার পালের তুলনায় মেষপালকের সংখ্যা কমই হয়।' আসলে ভুজঙ্গ সেন সাধারণ মানুষকে শ্রদ্ধা করিতে জানে না; মানুষকেই সে অস্বীকার করে।

অমিত মনে মনে বলে: ঘৃণা করিতে হইলে সেই মানুষকেই ঘৃণা করিতে হয় মানুষকে যে ঘৃণা করে। আর মানুষকে যে ঘৃণা করে সে কি ভালোবাসিতে পারে তাহার দেশকে? 'মানুষের অধিকারে' যাহার বিশ্বাস নাই—ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ পর্যন্তও পৌঁছে নাই তাহার চিন্তা,—সে কেমন করিয়া চাহিবে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র? হতভাগ্য এ দেশের স্বদেশীনেতারা, ক্ষমতার ছিটেফোঁটা এত অল্প পরিমাণে ও এত বিলম্বে তাহাদের ভাগ্যে মিলিতেছে যে, স্থিরভাবে একটা ভদ্রোচিত স্বদেশী ধনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবার সাহসও তাহাদের নাই। ইতিহাসের পাতায় ইহারা কোনো ট্রাজিডির নায়কও নয়; কোনো হিটলার গোয়েবল্ নয়; বড় জোর চিয়াং কাইশেক, কিংবা 'বাচ্চাই সাক্কো'।

অমিতের মনের কোণে ঘৃণা সঞ্চারিত হইবার পূর্বেই তাহার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়া উঠিল—'বাচ্চাই সাক্কো।'

হাসি পাইল আবার অমিতের। আর পরক্ষণেই তাহা ক্লিষ্ট হাসিতে পরিণত হইতে চলিল।...'মীরা সোম জাতীয় পতাকা তুলেছেন আমাদের আফিসে পনরই আগস্ট।' কেন, আই সি এস পত্নীরা ছিলেন, কংগ্রেস মন্ত্রীদের পত্নীরা বা উপপত্নীরা ছিল, ওই গোয়েন্দাশালায় তাহারা কি পতাকা তুলিতে পারিত না? মীরা সোম, তুমি কেন? উহাই কি তোমার 'ভারতের অধ্যাত্ম সত্যে'র সাধন-পীঠ?

অমিত দুঃখে লজ্জায় হাসিল—মীরা সোম জাতীয় পতাকা তোলেন গোয়েন্দা দপ্তরে,

ভুজঙ্গ সেন বিধান-পরিষদে নুন-তেলের পারমিট লইয়া কেনা-বেচা করেন; লাটপ্রাসাদে হয় কীর্তন গান;—আর বাহিরে চলে লাঠি ও গুলি।...

সকৌতুক হাস্যে চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল অমিতের,—স্বাধীন দেশকে সার্ভ করতে আর কতক্ষণ লাগাবেন?

যবক একটু অপ্রতিভ হইল। পরে বলিল,—আপনার জন্যই ত দেরী করছিলাম। জিনিসপত্র নিয়েছেন সব?

আমার জিনিসপত্র গুছানো হ'য়ে গিয়েছে। এক আধখানা বই এবার নিয়ে নোব, যদি নিতান্ত পড়তে সাধ যায় কখনো।

অমিত বই-এর শেলফের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

আর কতদিন হয়ত ইহাদের সঙ্গে দেখাও হইবে না। দৃষ্টি বিনিময়ও হইবে না একটিবাব দিনান্তে।—অমিতের মনেব মধ্যে একটা বেদনা ও কৌতুক উঁকি দিল: এতদিন এতরাত্রি তোমরা আমারই প্রতীক্ষায় বুক বাড়াইয়া ছিলে—আমি ফিরিয়া তাকাইতেও পারি নাই। আর আজ? তোমরা কে দিবে অমিতকে তাহার কর্মহীন দিনরাত্রিতে বেলাশেষের সাহচর্য?

...সমুদ্র আব শেক্সপীয়র: নির্বাসিত আত্মার পক্ষে চিরন্তন এই দুই আত্মীয় বলিয়াছেন ভিক্তর উগো। বন্দীশালার চতুর্দিকে নিশ্চল নিস্তব্ধ পাহাড় প্রহরীর মত দণ্ডায়মান; কিংবা মরুভূমির প্রসারিত প্রান্তর:—সমুদ্র নাই কোথাও; কিন্তু ছিল শেক্সপীয়র। মার্কস নয়? বন্দীশালায় বহু বহু মানুষের চিন্তা ও ভাবনায় শত আঁধি ও ঝড় উঠিত। বারে বারে অমিত তখন এই পুরাতন গ্রন্থখানির পাতা খুলিয়া বসিয়াছে; আর সাক্ষাৎ পাইয়াছে সমুদ্রের;—মানবসমুদ্রের জীবনের অপার বিস্ময়ের; মানুষের অফুরন্ত বৈচিত্র্যের। জীবনের যে অর্থ দিনরাত্রির ঘটনার সংঘাতে সে গুলাইয়া ফেলে, এক মুহূর্তে তাহা স্পষ্ট হইয়া ওঠে মহাকবির সৃষ্টিলোকে; ইতিহাসের বিরাটবাণী যেন নিটোল শব্দমালায় মূর্ত। আর ইতিহাসের সেই বাণী জীবন্ত, সমুদ্রের নয়, জনসমুদ্রের রচনা।

জনসমুদ্র আর শেক্সপীয়র—চিরন্তন আত্মীয় জাগ্রত মানবাত্মার।

জীবন-সংগ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন অবরুদ্ধ কারাজীবনেই বা ভয় কিসের—যদি শেক্সপীয়রের বসলোকে আমি মানুষের সাহচর্য লাভ করিতে পারি,—কিংবা বিংশ শতকের তরঙ্গাবর্তময় জটিল প্রবাহে দেখিতে পাই ইতিহাসের গতিরেখার রূপ?... ব্রজেন্দ্র রায়ের সঙ্গে আলোচনাকালে এই কথা অমিতের মনে হইয়াছিল। দশ বৎসর পূর্বে বৃদ্ধ ব্রজেন্দ্র রায় মহাভারত লইয়া তখন ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ-বিচারে অগ্রসর হইয়াছেন। একক নির্বাসিত নিঃসঙ্গ জীবন যদি তাঁহার ভাগ্যে জুটিত, আর একখানি গ্রন্থমাত্র গ্রহণ করিবার অধিকারই শুধু তাঁহার থাকিত, তাহা হইলে ব্রজেন্দ্র রায় গ্রহণ করিতেন মহাভারত—যে ব্রজেন রায় উনবিংশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী হিসাবে শেক্সপীয়র মিলটন লইয়া আজীবন মাতিয়া ছিলেন।—আর অমিত গ্রহণ করিত—গ্রহণ করিবে—শেক্সপীয়র,—যে অমিত বিংশ শতকের বাঙালী

স্তবকরূপে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাঠ করিয়াছে মার্কস-এঙ্গেলস-এর পাতায়, লেনিনের স্তালিনের বিচারে কর্মে। শুনিয়া পিতৃ-বন্ধু ব্রজেন্দ্র রায় সেদিন সস্নেহে হাসিয়াছিলেন, দুইজনেরই চিন্তার ও কার্যের অসংগতি তাঁহাকে কৌতুকদান করিয়াছিল। ব্রজেন্দ্র রায় বলিয়াছিলেন, 'উপায় নেই অমিত। জীবন এমনি অসংগতিতেই ভরা। তোমরা তাতে অসহিষ্ণু হ'য়ে ওঠ। কিন্তু আমরা হই না, আমাদের চোখ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে।' পিতার কথা শুনিয়া সবিতাও সলজ্জ চোখে হাসিয়াছিল।...

...সেই শেক্সপীয়রই তবে আজও হোক্ আমার সাথী জন-সমুদ্রের দর্শন-বঞ্চিত পারদের অবরুদ্ধ নিঃসঙ্গতায়। অসংগতি আছে নাকি ইহাতে?...

দুয়ার জানালা বন্ধ হইল। ফ্ল্যাটের বাহিরে আসিতেই গোয়েন্দা যুবক বলিল, —দাঁড়ান। তালাচাবিটা জমাদারের কাছে রয়েছে, বন্ধ ক'রে ফ্ল্যাটটা সীল করতে হবে।

'সীল' করতে হবে?—অমিত বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।—কেন?

ওরূপই হুকুম। আপনার এ ফ্ল্যাটে আপনাদের কমিউনিস্ট পার্টির সভা হত।

কে বললে?

আমাদের তা'ই রিপোর্ট। শ্যামলবাবু এ শাখার সেক্রেটারি। তাই ফ্ল্যাটটা তালাবন্ধ ক'রে দিয়ে যাবার হুকুম আছে।

অমিত এবার ক্ষুব্ধ হইল,—হলই বা সভা কমিউনিস্ট পার্টির।—তারপর আবার বলিল,—কোন আইনে আপনারা বাড়ি তালাবন্ধ করছেন? শ্যামলই বা কি বেআইনী কাজ করেছে? একটা আইন-সংগত পার্টির যদিবা কোনো বৈঠক বসত এখানে, তা অপরাধ হবে কি ক'রে? আমার ফ্ল্যাট বন্ধ করবার কোন্ কারণ আছে তাতে? পার্টি বন্ধ নয় আর ফ্ল্যাটটা তালাবন্ধ হবে?

যুবক বলিয়া ফেলিল, পার্টিও বন্ধ হচ্ছে—

কে বললে? কোথায় শুনলেন?

কিন্তু অমিতের উদ্দেশ্য এবার সফল হইল না। যুবক আর উত্তর দিল না, বলিল,—আমাদের ত এসব হাই পলিসির ব্যাপার জানবার কথা নয়। আদেশ মত কাজই করি মাত্র। আপনি বরং অফিসে ডিপুটি কমিশনারের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন।

হোক সে কালচার-লোভী যুবক, স্ত্রী যাহার গ্র্যাজুয়েট, সে গোয়েন্দা কর্মচারীও; প্রতারিত হইবার মত মানুষ সে নয়।

সীলমোহর হইয়া গেল। সাধু তাহার জিনিসপত্র লইয়া বাহিরে দাঁড়াইল। সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া চলিল অমিত। সম্মুখে পশ্চাতে পুলিশ, ফটকে পুলিশ দাঁড়াইয়া; পুলিশের খোলা বড় ট্রাক্ অমিতের অপেক্ষায় প্রস্তুত। প্রতিবেশীরা অনেকেই জাগিয়াছে। নিজ নিজ বাড়ি ও ফ্ল্যাটের চৌহদ্দী হইতে দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে অমিতবাবু আবার গ্রেপ্তার হইয়া চলিলেন। সবারে আমি প্রণাম ক'রে যাই—সকলের উদ্দেশ্যে অমিত হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

সাধু বলিল, আমি কোথায় যাব, দাদাবাবু?

কোথায় যাবি?—অমিত কি বলিবে সাধুকে? কোনরূপে খবরটা অনু ও শ্যামলকে পৌঁছাইয়া দেওয়া চাই।—একটা খবর দেওয়া দরকার মনুকে, ছোট দাদাবাবুকে ছোট দিদিদের। ইন্দ্রাণী? না তোমাকে বাড়িতে পাওয়া যাইবে না।

সাধুই বলিল, কালীঘাটের দিদিদের বাড়ি যাই না?

এক মুহূর্তে অমিতের মন সচকিত হইল। 'কালীঘাটের দিদি?' ঠিক স্থানই অনুমান করিয়াছে। অমিত তাহা জানিয়াও নিজের মনের কাছেই এতক্ষণ স্বীকার করিতে পারিতেছিল না—সবিতা ছাড়া এই সময় হয়ত আর কাহারও সাহায্য পাওয়া যাইবে না, অন্তত আর কাহারো কাছে সাহায্য চাওয়াও যাইবে না। অমিতের জীবনে বন্ধুবান্ধবের অভাব নাই; সে সৌভাগ্য সে অপ্রতুলভাবেই লাভ করিয়াছে। যাঁহারা সহযাত্রী বন্ধু তাঁহাদের কে আজ পুলিশের খর্পরে, কে বাহিরে ঠিক কি? তাহাদের নিকটে কাহাকেও পাঠানো নিরাপদ নয়। আর যাহারা অন্য পরিচয়ে সুহৃদ, বন্ধু হইলেও তাঁহাদের নিকটে এদিকে সাহায্য চাহিতে অমিত প্রস্তুত নয়। সত্য সত্যই কার্যকরী কোন সাহায্য দিতেও তাহারা জানে না। তাহারা কে বুঝিবে অনুকে ও শ্যামলকে সাবধান করা এখনি দরকার।

পুলিশ লরী স্টার্ট দিতেছে। অমিত বলিল,—আচ্ছা, বলিস তাঁকে দাদাবাবুদের, দিদিমণিকেও যেন খবরটা দেয় যে ক'রে হয় আজই।

স্পষ্ট হল কি কথাটা?—অমিত নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল, কথাটা বুঝিবে কি সবিতা? সম্ভবত সে বুঝিবে—অবশ্য সবিতা ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিবে কিনা বলা যায় না। সবিতা বড় 'ভালো মানুষ'। 'বহুজন হিতায় চ বহুজন সুখায় চ' তাহার জীবন—নিজের জন্য ত তাহা নয়। শুধু ভালো মানুষ নয়, সবিতা আত্ম-প্রকাশে কুণ্ঠিত, আর তাই সবিতা 'ভাল মানুষ'। অর্থাৎ মানুষ হইতে সে পারিল না। আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও অনুকে শ্যামলকে তাই সে এখন সাহায্য করিতে পারিবে কি না কে জানে? তবু সে-ই বুঝতে পারিবে অবস্থাটা। আর বুঝিতে পারিত নিঃসন্দেহে ইন্দ্রাণী।—কিন্তু অনেক দূরে আজ ইন্দ্রাণী—অনেক দূরে সে—হাঁ, অনেক দূরে। অবশ্য তাহার নীল খাম এখনও অমিতের টেবিলের উপরে—আর সেই কয় ছত্রও অমিত কেন, নিশ্চয় পৃথিবীর যে কোন মানুষকে স্পষ্ট আত্মসচেতনভাবে জানাইতে পারে—সে ইন্দ্রাণী, সে কোন দিন দূরে নয়, বিশ বৎসরেও সে অবিস্মৃত স্মৃতি; জীবন-যাত্রার শত পরিবর্তনেও সে অপরিবর্তনীয়া। অনেক দূরে তবু সেই ইন্দ্রাণী, অনেক দূরে।...কাল সন্ধ্যায় এই অনুচ্চারিত সত্য স্বীকার করিয়াছি দুইজনাই আমরা,—সে ইন্দ্রাণী, সে তার একার; আর আমি অমিত কারও একার নই,—অনেকের, অনেকের—অনেক মানুষের—

পুলিশবেষ্টিত হইয়া অমিত সমাসীন। মনে মনে বলিল: 'যাত্রা হল সুরু।' লর্ড সিংহ রোড? তারপর কোথায়? লালবাজার হাজতে? না, জেলে? না কোন বন্দীশালায় মোকদ্দমার আসামী? না, বিনা বিচারে বন্দী? কিছুই ঠিক নাই—জানি না। এই শুধু স্থির জানি, যাত্রা সুরু হইল। এই সকাল বেলাকার

ধৌত মসৃণ রৌদ্রস্নাত কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীটের উপর দিয়া যাত্রা সুরু হইল আবার; বীডন স্ট্রীট শেষ হইল। চিত্তরঞ্জন এভেন্যুর প্রশস্ত রাজপথ দিয়া যাত্রা সুরু হইল আর-একদিনের। নতুন এক দিনের যাত্রা সুরু হইল আমাদের—যখন এ স্পেকটর ইজ হন্টিং দি ওয়ার্ল্ড..... চৈত্রের এমন সুন্দর প্রভাতে এই পথে আর ফিরিয়া আসিবে কি, অমিত? এই অমিত এমন করিয়া দেখিবে এই বাড়িঘর—এই যাত্রী মানুষের মুখ, নব জাগ্রত কলিকাতার সুন্দর স্বচ্ছন্দ ছবি? কলিকাতার পথ, কতদিনের সহচর, কত রাত্রির বন্ধু, আর আমার কত মিছিল জলুসের সাক্ষী সে, কত জনতার নব-জীবনের জন্মস্থল—শত পরিচয়েও যেন তাহার রূপ পুরাতন হয় না। শতবার দেখেও যেন এ দেখার শেষ নাই। ...কলিকাতার পথ, কলিকাতার মানুষ,—এই পৃথিবীর আশ্চর্য যুগের আশ্চয মানুষ—তোমরা আমাকে পরমাশ্চর্যের পাথেয় জোগাইয়াছ—তোমাদের সকলকে আমার প্রণাম। আমি অমিত, তোমাদের সকলের উদ্দেশে এই পথ ও আকাশকে সাক্ষী করিয়া আমার অন্তরের প্রণাম রাখিতেছি: তোমরা আমাকে ধন্য করিয়াছ—আমাকে আজও গ্রহণ করিয়াছ এ দেশের মানব অভিযানের পুরোভাগে—কবিয়াছ আমাকে আগামী কালের উদ্‌গাতা, করিয়াছ আহ্বায়ক 'অব দি সিঙ্গিং টু-মরোজ'। গীতময়, উৎসবময়, আনন্দময়, সেই আর-এক-দিনের সংগ্রাম-সংঘর্ষময় সূচনা আজ দেশে দেশে,—এ দেশেও কি নয়?

অমিতের মনে হয় সে একা নয়—আমিও তার অঙ্গ—মহামানবের।

আমি 'বড় আমিকে চাই—সেখানে এও সত্য, ইন্দ্রাণী, 'তুমি আছ, আমি আছি।'

'সকল সংঘাত মাঝে করিতেছি আজ অনুভব আমার আপন মাঝে এ বিশ্বের সত্তার উৎসব—শুধু জানি সুরু তোর যেথায় আমার এককের শেষ হলো ওঠাপড়া, বারতা পেল সে সমগ্রের।'......'এককের' ও 'সমগ্রের'......

* * *

চৌদ্দ নম্বরের ফটক খুলিয়া গেল। সেই পুরাতন বাড়িটা। এখন ঝিমন্ত যেন বাড়িটা। অযত্নের চিহ্ন উহার সর্বত্র পরিস্ফুট। সে জৌলুষ ও চমক নাই। অগ্রসর হইয়া যাইতে যাইতে অমিত দেখিল ঘরে আরও অনেকে আসিয়াছে—কে-কে? ঘরের অভ্যন্তরে প্রভাতের আলোক তত স্পষ্ট নয়। কিন্তু দিলীপ, অজয় ও আরও বহুকন্ঠের অভিনন্দন সমুত্থিত অমিতের উদ্দেশ্যে।

অমিত দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে দ্বার-প্রান্তে। বিস্মিত চমকিত মুখ হইতে ফুটিয়া উঠিল একটি শব্দ: 'মঞ্জু'!

দুই

সকাল বেলাকার এক ঝলক আলো আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়াছে—মঞ্জু : গোয়েন্দা আপিসের প্রায়-অন্ধকার গৃহতলে একটি প্রাণ-চঞ্চল তরুণী।

পরিচিত অনেক কন্ঠ সমস্বরে অমিতকে সংবর্ধনা জানাইতেছে—আসুন, আসুন, আসুন। প্রত্যেকটি মুখ ও কন্ঠস্বরকে চিনিয়া লইবার মত অমিতের সময় হইল না। সমবেত আনন্দধ্বনির মধ্য হইতে একটি কন্ঠ স্বতোচ্ছ্বসিত প্রাণ-ছন্দে অমিতের কানের উপরে ঝর্ণা-ধারার মত ছুটিয়া আসিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে; 'অমি' মামা! 'অমি মামা!'...

আয়ত চক্ষু, উৎফুল্লাধর একটি স্বচ্ছন্দ সজীব কন্ঠ বিশ বৎসরের পার হইতে ডাক দিল অমিতকে, 'অমিদা'!'

সুরোকে অমিতের ভুলিবার সাধ্য নাই। কাহাকেই বা ভুলিতে পারে অমিত?

সেই শেষ দেখা হাসপাতালে..জীবনের এপারে দাঁড়াইয়া যেন জীবনের ওপারের মানুষ। সেই মুখ চোখ কন্ঠ চক্ষু; তবু সে সুরো নয়—চুপ করিয়া যে সুরো শুনিতে বসিত অমিতদের সেদিনের তর্ক গল্প, 'বলাকা'র কবিতা পাঠ। হাসপাতালে যাহাকে শেষ দেখিল অমিত সে যেন তখন সেই সুরো নয়, সুরোর ভগ্নাংশ;—অথবা ভগ্নস্তুপ। জীবন ইতিহাসের ভগ্নস্তূপকে তবু পুনরাবিষ্কার করিতে পারে নাকি একটি নিমেষে অমিত, ইতিহাসের যে ছাত্র..আর জীবন-রসের যে রসিক?...

বহু আত্মীয় বন্ধুর মত সুরোও প্রত্যাশা করিত অমিত বড় হইবে, গুণী মানী অমিত, সমাজের গুণী মানীদের আসরে আপনার বিধাতৃনির্দিষ্ট স্থান সগৌরবে গ্রহণ করিবে। তাহার বিদ্যার খ্যাতির সঙ্গে আসিবে যশ, আসিবে সম্পদ, আসিবে সৌভাগ্য। আর সেই সম্মান-সম্পদের বরমাল্য গলায় লইয়া অমিত আপনার গৃহে সমাজে পরিণত জীবনের সমস্ত প্রতিষ্ঠায় শোভা পাইবে : আত্মীয়দের আশ্রয়, বন্ধুদের আনন্দ, অনুজদের আশা। কোথায় গেল সে অমিত আজ?

সুরোর সে অমিদা যে হারাইয়া গিয়াছে,—জীবনের মহামহোৎসবে সে যে কোথায় ছিটকাইয়া পড়িয়া গিয়াছে,—দশ বৎসর পূর্বেই সুরোর সে বিষয়ে আর কোনো সংশয় ছিল না। দশ বৎসর কেন? বিশ বৎসর পূর্বেই কি সুরো জানিত না—অমিত,—সুরোর 'অমিদা,—তাহার আত্মীয়-বর্গের এই পর্যায়ের অনেক আশাস্থল—আপনার চিন্তা ও অধ্যয়নের শান্ত সমাহিত আশ্রয় ছাড়িয়া জীবনের নির্দয় কঠিন ঝঞ্ঝা-বিধূনিত ভয়ঙ্কর পথেই যাত্রা করিয়াছে। তাহার পিছনে পড়িয়া যাইতেছে পিতার স্বপ্ন, মাতার আশা—অমি তাঁহাদের গৃহকে সমুজ্জ্বল করিবে; সুরোর মত স্নেহমুগ্ধ আত্মীয়দের নিষ্ফল অনুযোগ,—'তুমি পি-আর-এস্ হবে হচ্ছ না কেন, দাদা?' অমিতের আপনার অফুরন্ত কৌতূহলের, উজ্জীবিত ঔৎসুক্যের যত প্রশ্ন, যত তথ্য,

ও যত অজ্ঞাতপূর্ব উত্তর—সপ্তম হইতে নবম শতকের ভারতের ইতিহাস খুঁজিয়া দেখিবে না? উনবিংশ শতকের বাঙালী জাগৃতি কি শুধুই একটা প্রতিক্রিয়া, না, নবযুগের পূর্বাভাস? ভারতীয় ইতিহাসের প্রাগ্‌আর্য বনিয়াদ কোথায় আছে লুক্কায়িত—সিন্ধুর উপত্যকায়? না, নর্মদা-তাপ্তির মর্মর-মণ্ডিত তীর-কন্দরে?—তখনি পিছনে পড়িয়া যাইতেছে, শুকাইয়া যাইতেছে; ঝরিয়া পড়িতেছে অমিতের আত্মীয়-বর্গের আশা, আপনার বিদ্যা-বিমুগ্ধ অন্তরের নিভৃত স্বপ্ন। আর সেই বিশ বৎসর পূর্বে সেই তথ্য কি বুঝিতে পারে নাই সুরো?

সেদিন এই নবজাত মঞ্জুর চোখের উপরে চোখ রাখিয়া সুরো নিজের মনে-মনে বলিয়াছে, 'মণি আমার, তোমার নাম রাখবে অমিদা'; অমিদা ছাড়া কেউ রাখতে পারবে না তোমার নাম। কে বা আর রাখতে জানে নাম?' সঙ্গে সঙ্গে সুরো বুঝিয়াছিল—অমিত আর সুরোর অমিদা নাই, থাকিবে না। তাহার কন্যার নাম বাছিয়া দিতেও অমিত ভুলিয়া যায়! সুরো বুঝিয়াছিল, তাই সুরোর সমস্ত সহাস্য ঔৎসুক্য ও সমস্ত সনির্বন্ধ অনুযোগের মধ্যে অমিত দেখিতে পাইত একটি ব্যথিত, ঈষৎ কুন্ঠিত মনের স্পর্শও। অমিতের কর্মমুখর দিন রাত্রির মধ্যে কোনো স্থান নাই কি তাহার আত্মীয় বন্ধুর, তাহার এই আত্মীয়া ভগিনীর স্নেহ-সমৃদ্ধ আশা ও স্বপ্নের? স্বামি-সন্তান পরিবৃত সুরোর সাধারণ জীবনের সাধারণ কথার ও সহজ ঘটনার কি সেখানে প্রবেশ নাই—অমিতের জীবন-পরিধিতে?

না, সুরো জানিত ইহাও সত্য নয়, অমি'দা সুরোকে অবজ্ঞা করে নাই; কিন্তু সে অমিত, শুধু সুরোর অমি'দা নয়, আরো অনেকের সে; এমনি মানুষ যে সে।

বিশ বৎসর কেন, পঁচিশ বৎসর পূর্বেও ইহা সুরো বুঝিয়াছিল। তখনো ত সুরো প্রায় বালিকাই। প্রথম কৈশোরের নূতন দীপ্তি আসিয়াছে তাহার চেতনায়, জীবনে; চলায়, বলায়, চোখে, মুখে, দেহে মনে সর্বত্র একটা সপ্রতিভ ঔৎসুক্য। চোখে উগ্রতা নাই, আছে কোমলতা, একটু লজ্জার সঙ্গে সচকিত কৌতূহলের মিশ্রণ। সেই নবার্জিত দৃষ্টি লইয়া অমিতের স্নেহ ও আদর-মিশ্রিত আশ্রয়ে সুরো তখনি চিনিয়া ফেলিয়াছিল অমিতকে—যে-অমিত সকলের বন্ধন মানিয়াও বাধা মানিবে না, যে অমিত তাহার গৃহকে, পরিবারকে বন্ধুদের আড্ডাকে, সুরোকে, শান্তিকে, বিদ্যাকে, বুদ্ধিকে,—সঙ্গীতের অনুরাগ ও শিল্পকলার অনুভূতিকে,—আপন কল্পনাকেও পরম গরিমা বলিয়া মানিবে না; মানিবে না সে আপনাকেও। আপনার স্বস্তি ও আরামের মধ্যেও সে চিরদিন অস্বচ্ছন্দ, চিরদিন অধীর চঞ্চল, উচ্চকিত-গতি।

কিশোরী সুরো তখন তাহার বধূ-জীবনে প্রবেশ করিতেছে—আশা আনন্দ স্বপ্ন সৌন্দর্যে তাহার মন থর'-থর'।

অমিতের নিকট হইতে সেদিন সে উপহার পাইয়াছিল তখনকার দিনের 'বলাকা'। 'বলাকা' বুঝিবার মত বয়স নয় তখন সুরোর, সে বিদ্যা নাই, সে বুদ্ধি নাই। কিন্তু তবু সেদিন অমিতের মুখে কবিতা পাঠ শুনিয়াছে তাহারা,—সে, তাহার ভাই মনু,—বোন শিশু অনু, ইন্দ্রাণী বৌদি। আর কী একটা রহস্য যেন সুরো বুঝিয়াছিল—ইন্দ্রাণী শুনিতে

চাহিতেছিল অমিতের পড়া......অমিত যেন কোন্ শব্দময়ী অপ্সর রমণীর সঙ্গে ছুটিয়াছে পরিচিত জগতের ওপারে ঝঞ্ঝা-মদমত্ত-পাখা হংস-বলাকার মত, আপনার ডানা ছড়াইয়া দিতেছে আকাশের পথে পথে : জীবনেরে কে রোধিতে পারে?

গর্জিয়া উঠে যেন ঘরের বাতাসও : হে রুদ্র আমার, মার্জনা তোমার গর্জমান বজ্রাগ্নি শিখায়—

থর থর কাঁপিতে থাকে সুরোর-ও মন : একি শুধু ইন্দ্রাণীর কথা? না, অমি'দারও কথা। না, তাদের সকলের কথা...।

ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে—নহেরে সন্ধ্যার দীপালোক, নহে প্রেয়সীর অশ্রু চোখ। পথে পথে অপেক্ষিছে কাল-বৈশাখীর আশীর্বাদ শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ।

* * *

স্বামিগৃহ হইতে প্রথম ফিরিয়া অমিদা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিল সুরো। প্রথম-প্রণয় অনুরাগ আনন্দের অভাব ছিল না মনে—জীবনের প্রথম সেই বিস্ময়, তাহা আবিষ্কারের উত্তেজনায় তখনো সুরোর কিশোরী প্রাণ অনুরণিত। তবু হাসির মধ্য দিয়া সুরোর দুই চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে চায়,—চাহিবে না? শুধু সুরো একা ত নয় আজ, স্বামীও সঙ্গে আসিয়াছেন। পশুপতি পরিচয়-আলাপ জমাইতে উৎসুক অমিতের সঙ্গে। কিন্তু কোথায় সুরোর অমি'দা? এই নবপরিণীতা চকিত-চক্ষু, চকিত-চিত্তা বধূর মুখে তাহার নাম ও খ্যাতি ইতিমধ্যেই বার বার সে শুনিয়াছে—নানা প্রসঙ্গে শুনিয়াছে, কুতূহলী হইয়াছে, আগ্রহান্বিত হইয়াছে; সেই অতি-প্রশংসিত কুটুম্বটির বিরুদ্ধে একটু মৃদু প্রতিকূলতাও বোধ করিয়াছে। অমিতের পিতার সঙ্গে বসিয়া কত আর গল্প করিবে পশুপতি? কিংবা বালক মনুর সঙ্গেই বা গল্প করিবে কতক্ষণ? অমিত কি জানিত না তাহারা আসিবে? জানিত বৈ কি? তাহাদের আগমনের অপেক্ষায় সকাল হইতেই অমিত সাগ্রহে বসিয়াছিল। তারপর? মা বলিলেন, বন্ধুরা কে আসিল ডাকিতে। কে আসিল? না, না, পড়াশুনার বন্ধুরা কেহ নয়—যদিও পরীক্ষা অমিতের নিকটেই। না, সুহৃদের গানের মজলিসের ব্যাপারও নয়। বিকাশের শিল্পী-বন্ধুরা কেহ নয়। না, হয়ত কংগ্রেসের কেহ হইবে, কিংবা অমনিতর কোনো একটা দশ-জনার কাজ—কিছু একটা। হয়ত মিছিল আছে, কিংবা কোনো একটা কন্‌ফারেন্‌স্ বা সভার আয়োজন করিতে হইবে। অথবা বন্যা বা দুর্ভিক্ষের চাঁদা তোলা প্রয়োজন। কিন্তু কোথায় অমিত? অমিতের মা দুঃখিত হইলেন, বাবা বিরক্ত হইলেন—একটা দিনও কি অমিত তাহার 'খেয়াল' বন্ধ রাখিতে পারে না?

পশুপতি সানুকম্প হাস্যে তাঁহাদের সংশয় ও লজ্জাকে উড়াইয়া দেয়,—'হয়ত কোনো কাজে পড়ে গিয়েছেন অমিতবাবু; আসতে পারলেন না। দেখা হবে আর একবার আমরা কলকাতা এলে।' আর সুরো? তাহার সমস্ত গর্ব ও উল্লাস যেন মাটিতে মিশাইয়া যাইতেছে। সে বলিয়াই তখনো তাহার মুখে হাসি আর

কথা লাগিয়া আছে। চোখ ফাটিয়া জল পড়িতে বাকী ছিল; সেটুকুও বুঝি টিঁকে না আর ফিরিবার পথে গাড়িতে।

—খুব ত তোমার অমি'দা! তুমি ত অমি'দা বলতে পাগল, আর দেখাই নেই তার একটিবারও।—বলিল পশুপতি।

সুরো আপনাকে রক্ষা করিল, অমনি রক্ষা করিল অমিতের সম্মান। কিছু মাত্র অপ্রতিভ না হইয়া হাসিয়া গর্বের সহিত সে বলিল '—ওই ত অমি'দা অমনি। কোথায় কোন কাজ পড়ল কার; আর তখন তাঁর নিজের কাজ, বাড়ির কাজ, সব রইল পড়ে।

এইরূপই অমিতের স্বভাব; আর তাহা বলিয়াও যেন সুরোর গর্ব।

যাঁদের নিমন্ত্রণ করেছেন তাঁদের কথাও ভুলে গেলেন,—না?

মাথা নাড়িয়া সুরো বলিল, ভুলে যাবেন কেন? ওর কি কাজের ঠিকানা আছে, না আছে ঝোঁকের শেষ?—হাঁ, সরো সত্যই জানে অমিত ভুলিবে না। ভুলিবে না সে—কিছুই।

সুরো অশ্রান্তস্বরে বলিয়া চলিয়াছে কত কাজ অমিতের। তারপর সুরো পিতৃগৃহে ফিরিয়াই পত্র লিখিতে বসিয়াছে অমিতকে। পত্র ত নয়, অভিমানাহত সুরোর দুই-চোখ-ফাটা চোখের জল। অথচ চোখের জলের চিহ্নও নাই। আছে শুধু হাসির রেখা।—'কাজ ত তোমার যা তা খুব জানি। কোথাও বুঝি আড্ডায় বসে গিয়েছিলে? না, ভালো রেঁধেছিল কেউ?' কিন্তু হাসি ছাড়া অমিত কি আর কিছু পড়িতে পারে নাই সুরোর সেই চিঠিতে?

গাড়ি ছাড়িবার বেশ পূর্বেই স্টেশনে আসিয়া অমিত অপেক্ষা করিতেছিল—পশুপতিবাবুর সঙ্গে আলাপ করিবে। আর সেই কয় মিনিটেও মোটের উপর সুরোর হাসিতেই পরিচয় সুসাধিত হইয়া গেল। সুরোর অভিমানও বুঝি ঘুচিল। কারণ, সুরো জানে অমিতের নিকট এই সব 'বাজে কাজ' কত প্রলোভনের বস্তু। কিংবা, সুরো বিস্মিত হইল না—কাজই এখন বড় হইয়া উঠিতেছে অমিতের জীবনে। বিস্মিত সে হয় নাই, কিন্তু ব্যথিত হইয়াছিল, অনেকখানি ব্যথাতেই ব্যথিত হইয়াছিল। তাহার সহজ হাসিতেই সে ব্যথা, সে দুঃখকে সেদিন সে সহজ করিয়া দিল পৃথিবীর সম্মুখে। কিন্তু আগামী দিনের অনেক অজানিত ব্যথাও তাহার নিকট তখনি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল।

দিনমাস বৎসরের স্রোতে সেই আগামী দিনও ছুটিয়া আসিল দেখিতে না দেখিতে। জীবন ভাসাইয়া লইয়া চলিল সুরোকে, তাহার ছোট সংসারের সংকীর্ণ খাতে। আর জোয়ার লাগিল অমিতের দুরন্ত জীবনে। তবু সুরো দাবি জানাইল—অমিদা সুরোর প্রথম-জাত শিশুর একটা নাম ঠিক করিয়া দিক। 'ভালো নাম সুন্দর নাম, মধুর নাম।' আর, 'সাত দিনের মধ্যে চাই উত্তর। না হয় একটু বন্ধই রইবে তোমার ইতিহাসের গবেষণা, কিন্তু আমার পত্রের উত্তর দিতে হবে দেরি না করে।'

সাতদিনের স্থলে তিন সপ্তাহ শেষ হইল। অভিমানী সুরোর দ্বিতীয় পত্রের পরে তৃতীয় পত্র আসিল;—না, প্রয়োজন নাই অমিতের সুরোকে আর পত্র লিখিয়া। শুধু

অমিত সুরোকে জানাক কোন নামটা তাহার পছন্দ—'ক্ষেন্তি, পুঁটি, পদি, কোনটা মঞ্জুর?' হাসিতে ও অভিমানে মিশানো সে পত্রের পিছনে দুইটি ব্যথিত আয়ত-চক্ষু দেখা যায়। অমিত এবার তাড়াতাড়ি জানাইয়াছিল ফেরৎ ডাকে,—সব নামমঞ্জুর, মঞ্জুর কেবল মঞ্জু। কিংবা 'মঞ্জুশ্রী'—হোক তাহা বোধিসত্ত্বের নাম।

আজিকার মঞ্জু জানেও না হয়ত তাহার নামের এই ইতিহাস,—পৃথিবীতে আর কেহ তাহা জানেও না। অমিতেরও আজ মনে থাকিবার কথা নয়। একুশ বাইশ বৎসর কোথায় গিয়াছে ভাসিয়া। কোটালের বান ডাকিল এই দেশের জীবনেও,—অমিত সেই উজান বাহিয়াই ছুটিয়াছে। তবু অমিত দেখিতে পায়—আজও দেখিতে পায়...সেই বাঁধা-পড়া সংসারের বাঁধা-ধরা জীবনের মধ্য হইতে ভয়ে ভয়ে আশঙ্কায় উদ্বেগে এক-একবার গ্রীবা বাড়াইয়া সুরোর দুই চক্ষু সন্ধান করে অমিতের পথ। পত্র আসে অমিতের কোলাহল-মুখর দিনরাত্রির তীরে—'তুমি তুমি কি করছ, দাদা? পি-আর-এস্ আর দেবেনা তুমি?'—স্নেহার্থিনী গর্বিতা ভগ্নির সহজ সনির্বন্ধ এ তাড়না। হাসিরও অভাব তাহাতে নাই। তবু একটি ব্যথা ও সংশয়ের সুর ইহার তলায় তলায় বহিতেছে, অমিতের চোখেও তাহা পড়ে না? কিন্তু পড়িলেও তাহা দেখিবার মত সময় কই তখন অমিতের?—অমিতের পৃথিবীতে সময় তখন গতি-উন্মাদ।

'বিনয় রায় এখানকার ইতিহাসের অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয়ে তার পি-আর-এস-এর থিসিস্ই নাকি এবার গ্রাহ্য হয়েছে। অমিত দিয়েছিল নাকি তার থিসিস্?'—পশুপতির এই জিজ্ঞাসার পিছনে যে বক্র খোঁচাটা রহিয়াছে তাহা অমিতকে কেহ বলে নাই। কিন্তু নীরবে নতমুখে অশ্রু গোপন করিয়াছে সুরো। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়াছে চেঁচাইয়া,—'দ্যাখো, দ্যাখো, মঞ্জুটা কি মুখে দিলে! পাজি মেয়ে'—অকারণে তারপর সুরো দিয়াছে বালিকাকে চড়।

ছোট ঠোঁট দুইখানি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল—আনন্দ উজ্জ্বল শিশু-চক্ষু ছাপাইয়া গেল অশ্রুতে।

অকারণ---অকারণ---অকারণ...

সমস্ত পৃথিবীর বেদনা-সমূহের যে কারণ নাই, শিশু মঞ্জু এই বুঝি তাহা প্রথম বুঝিল। আর কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল ভূমিতে অভিমানে হতাশায়।

কিন্তু উপায় ছিল না সুরোর। আপন গৃহে বিনয় রায়কে আপ্যায়ন করিতে পশুপতি তাঁহাকে লইয়া আসিলেন। নতুন পি-আর-এস্ তিনি, বিদেশে বাঙালীর পক্ষে ইহা কি কম গর্বের কথা? সুরো লুচি ভাজে, নিখুঁত হাতে থালা সাজাইয়া দেয়—নিখুঁত কাটিয়া যায় অপরাহ্ণ। তারপর সন্ধ্যায় মেয়েকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঘুম পাড়ায় সুরো। অশ্রুমোচন করিয়া বিহ্বল জাগ্রত স্বপ্নে আপনার আহত অন্তরকে শান্ত, বিক্ষোভ-মুক্ত করিয়া লয়...যদি 'সুরো' ফিরিয়া যায় এখন কলিকাতায়,—খোকা আসিতেছে এখানে—কাল খোকা ফিরিয়া যাইবে কলিকাতায়।...

কিছু না বলে একেবারে অমিদা'র সামনে গিয়ে যদি আমি দাঁড়াই—। দু'হস্তের ক্ষিপ্র তাড়না না মেনে মাথায় তুলে নোব তাঁর পদধূলি। তাঁর চমকিত চক্ষুর

সামনে দাঁড়িয়ে বল্‌ব—'এই আমি সুরো'। আমি এসেছি, এসেছি আমার ঘর ছেড়ে, সংসার ছেড়ে...হাঁ, ঘর ছেড়ে, সংসার ছেড়ে, না, না, কিছুই ছেড়ে আসিনি। এসেছি সব নিয়ে,—ঘর নিয়ে, সংসার নিয়ে, আমার এই দিন রাত্রির সমস্ত কাজ আর জঞ্জাল নিয়ে;—কিন্তু এসেছি, এসেছি তা জেনো। আর জানো কি—এসেছি যে তার কারণ কী? তার অর্থ বোঝ কি?' 'কী কারণ?' 'কারণ'?—না, না, কিছুতেই বলব না বিনয় রায়ের কথা। কিছুতেই বলব না ওঁর এই ব্যঙ্গ, এই স্থূল খোঁচা। বলব না তাই কারণ। বলব, 'এসেছি; কারণ তুমি—তুমি আমাদের অমিদা'—যে ইচ্ছা করলে কী না করতে পারে—কেন ইচ্ছা করো না তুমি?—কেন ইচ্ছা করো না তোমার বিদ্যাকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে? প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ কি? কী তুমি না করতে পার?'—হাসবে নিশ্চয় অমিদা'—হাসবে।......'হাসছ? বুঝছ না তুমি—কিছুই বুঝছ না আমাদের কথা। বুঝতে চাও না, বুঝতে পার না কি? নিশ্চয়ই বুঝতে পার, কিন্তু বুঝতে চাও না। আর আমি সুরো, তোমাকে এই কথাই বুঝাতে এসেছি—হাঁ, বুঝাতে এসেছি তোমাকে—তোমার সাধ্য কি আমার কথা তুমি না বুঝে পারবে? পাঁচশ-মাইল দূর থেকে আমি এসেছি—অনেক জ্বালা আর জঞ্জাল সত্ত্বেও এসেছি, তোমাকে বুঝতে হবে—তুমি বুঝবে আমার কথা, অমিদা'। বুঝবে, বুঝবে'...

ক্ষান্ত হয় সেই অন্তরের ব্যথা—শেষ পর্যন্ত একখানা ছোট চিঠির মধ্যে। সুরোর অশ্রুধৌত মন আপনার হাসি আর দাবি লইয়া আপনার কথা বুনিয়া তোলে একটি একান্ত প্রশ্নে, 'তুমি পি-আর-এস দিচ্ছ না কেন, দাদা?'

সুরোর চারিদিকে জীবন নিস্তরঙ্গ। ইংরেজ বণিকের আপিসে পদ-মর্যাদা আর ভালো দক্ষিণা লাভ করিতেছে তখন পশুপতি, কেন অমিতের নামের সঙ্গে অকারণ নিজেকে বিজড়িত করিবে সে? আপনার ঘরে স্বাচ্ছন্দ্য আর সৌন্দর্য কি ফুটাইয়া তুলিবে না সুরো? তুলিবে বৈ কি। তুলিতেছেও। কিন্তু সুরোর হাসি আর সহজ নাই। কোল আলো করিয়া আসিল পুত্র, আর কোল অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেল সে শিশু একটু পরে। সুরোর চোখ অন্ধকার হইল। একটা গভীর কঠিন ব্যাধি তাহার দেহের মধ্যে অতি ধীরে, অতি অগোচরে বাসা বাঁধিল। কেহ জানিল না; কাহাকে সে বলিবে আপনার কথা?—অমিতও নাই নিকটে। তবু অমিতকেই লিখিতে হয়—আপনার লোক আর কোথায় সে ছাড়া? পীড়া-বেদনার কোনো কথা না বলিয়াই সুরো লিখিবে। অমিতকে ছাড়া কাহাকে আর লিখিতে পারে সুরো? কে তাহা বুঝিবে?

কিন্তু কেমন যেন কলম কাঁদিতে চাহে। সংসারে সে ভাগ্যবতী;—কাঁদিবে কেন তাহার কলম? ভাগ্যবতী সুরো। তাহার শ্বশুর, শাশুড়ী ও আত্মীয়দের অনেকের চক্ষে প্রায় অন্যায়রূপেই সে ভাগ্যবতী। কি আছে সুরোর যোগ্যতা যে, সে কানপুরের ব্রিটিশ ইনডাস্ট্রীজ্ লিমিটেডের অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার মিস্টার পি. পি. গাঙ্গুলীর স্ত্রী হয়? লাভ করে এই গৃহের গৃহলক্ষ্মীর পদ—এত সম্মান, এত

সম্পদ, এত সৌভাগ্য? অযোগ্যই সুরো তাহার স্বামীর, অযোগ্যই সে এই সৌভাগ্যের।

শুধু অযোগ্য নয়, সে অপরাধিনীও। এই সম্পদ-সম্মানের মধ্যে কোথায় তাহার গম্ভীর মর্যাদাময় কর্ত্রীত্বপনা ও স্থিরগর্বিত পদবিক্ষেপ? হাঁ, সুরো তাহার এক কালের মমতাভরা কন্ঠ হারাইয়া ফেলিয়াছে; উৎফুল্ল হাসি ভুলিয়া গিয়াছে; সেই অকারণ ঔৎসুক্য, সকলের জন্য সহমর্মিতা সংহত করিয়াছে। না, আগেকার মত চঞ্চল নাই আর সেই সুরো। তাহার চোখের চঞ্চল দৃষ্টি ভারী হইয়াছে, চরণের চঞ্চল গতি সংযত হইয়াছে, উৎফুল্ল ওষ্ঠের হাসি এখন ম্লান হইয়াছে। সে গৃহিণী হইয়াছে সংসারের স্বাভাবিক নিয়মকে সে অস্বীকার করিবে কি করিয়া? উহা অস্বীকার করিবার প্রশ্নও তাহার মনে উঠে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া এই সংসারের বিশিষ্ট অভ্যুদয়ের পক্ষে যে সে আপনাকে উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পারিয়াছে, তাহা নয়। সে যোগ্যতা কোথায় সুরোর? এ সংসারে লক্ষ্মী নূতন করিয়া আবির্ভূত হইতেছেন। সেখানে হাস্যমুখে আগু বাড়াইয়া তাঁহাকে সাদরে আপ্যায়ন করিবার মত গৃহিণী না থাকিলে কি চলে? সুরো যেন সেই লক্ষ্মীকে স্বাগত করিতেও জানে না, শুধু তাঁহাকে মানিয়া লয়। নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম মনে তাঁহার আসন পাতিয়া তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করে। গৃহের ভৃত্যদিগকে সে প্রভুত্বের সহিত হুকুম করিতে পারে না। প্রতিবেশিনীর সঙ্গে আলাপ করিতে আগাইয়া যায় আপন হইতে। আবার পিছাইয়া আসে সংশয়ে। একটা বড় অফিসারের পরিবারের মত আত্ম-সচেতন গর্ব কোথায় তাহার অন্যদের সঙ্গে মেলামেশায়? সে 'খেলো' করিয়া ফেলিবে নিজেকে পরের সঙ্গে মিশিতে গেলেই; নষ্ট করিয়া ফেলিবে 'গাঙ্গুলী সাহেবের' প্রেস্টিজ।

নির্বাক প্রয়াসে নিজেকে সুরো তাই সঁপিয়া দেয় গৃহ-প্রয়োজনে। ত্রুটি ঘটিতে দিবে না;—না, ত্রুটি ঘটিতে দিবে না সে এই সংসারে নিজের আয়োজনে, তাহার অভিপ্রেত-অনভিপ্রেত দিন-রজনীর এই কঠিন, নিরর্থক ব্রতে।

ত্রুটি তবু ঘটিয়া যায়। ঘটিবে না কেন? নিজেরই অগোচরে হঠাৎ মাথা তুলিয়া বিদ্রোহ করিবার স্বপ্নও দেখে সুরো।—পশুপতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে স্থির চক্ষে স্থির কন্ঠে আজ বলিবে—'তোমার এ সংসার, এ সম্পদ, এ তোমার 'নতুন কপাল'। এর থেকে আমাকে মুক্তি দাও, ছুটি দাও। আমাকে আমি হতে দাও, আমি হতে দাও।' ... চমকিয়া উঠে সুরো—কাহার কথা সে আবৃত্তি করিতেছে? কাহার কথা? ইহাতো তাহার উক্তি নয়। বুঝি অমিতের নিকট শোনা কোনো গল্পের নায়িকার। বুঝি ইন্দ্রাণীর—যে ইন্দ্রাণীকে সুরোও ভালোবাসে—জানে তাহার মন বড় সুন্দর, আর বড় প্রশস্ত। তবু সুরো মানিতে পারে নাই এই ইন্দ্রাণীর বিদ্রোহ। মানিতে পারে নাই ইন্দ্রাণীর আস্ফালন, পুরুষের সমাজে অত কুন্ঠাহীন দৃপ্ত আচরণ; মানিতে পারে না ইন্দ্রাবৌদি'র আত্ম-প্রকাশের নামে আত্মপীড়ন।

'প্রগল্‌ভা, অন্তঃসারশূন্যা, আত্মসর্বস্বা ইন্দ্রাণী'—সুধীরা ইহাই বলিবে। 'আপনার জিদ, আপনার বাহাদুরি ছাড়া কি আছে তার বিদ্রোহের কারণ?'

সুধীরা কি করিয়া জানিবে সংসারের দুর্ভোগ,—ও জীবনের দুর্যোগ?—যে দুর্যোগে সুরো আহত, ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়িতেছে, তাহাই কি পৃথিবীতে কেহ জানে?—জানে সুধীরা? জানে ইন্দ্রাবৌদি? সুরো ক্ষতবিক্ষত হইতেছে; তাই বলিয়া তাহা জানিবে কেহ কেন? সুরো ক্ষতবিক্ষত হইতেছে; তাই বলিয়া সুরো বিদ্রোহ করিবে নাকি? না, আত্মসর্বস্ব নয় সুরো। এত স্বার্থপর দর্পিতা কেন হইতে যাইবে সুরো? সুরো কি নিজেকে সঁপিয়া দিতে পারে নাই সংসারের কাছে?

মঞ্জুকে সুরো কাছে টানিয়া লয়। সুরো জানে তাহার ভাগ্যলিপি: মানে তাহার গৃহ-কর্তব্যের পবিত্র ব্রত; বোঝে—নিজেকে বুঝাইতেও পারে—সংসারে সে অনেক পাইয়াছে,—অনেক পাইয়াছে। পাইয়াছে পশুপতির মত স্বামী—কর্মী মানুষ, সম্মানিত মানুষ সে, পুরুষের মত আপনার ভাগ্যকে সে আপনি আয়ত্ত করিতেছে—বুদ্ধি দিয়া, পরিশ্রম দিয়া, কৌশল দিয়া আপনার উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া লইতেছে। কিন্তু সুরো তাঁহাকে সেইখানে সাহায্য করিতে পারে নাই। তাঁহার গতিপথকে মসৃণ করিয়া তুলিতে পারে নাই সে। না, পশুপতির এই প্রয়াস প্রচেষ্টাকে, সাহেবদের প্রতি আনুগত্যকে, যেন ঠিক-মত সুরো বুঝিতেও পারে নাই। সে ভাবে—এতটা তোষামোদ উহাদের না করিলেই বা কি? কিন্তু তোষামোদ কোথায়? ইহা যে কৌশল; ইহা যে অফিসের ডিসিপ্লিনও। না হইলে কে দেখে না—কী রকম কড়া মেজাজ কঠিন প্রেস্টিজ-বোধ গাঙ্গুলী সাহেবের? সুরো তাই এইদিকে পশুপতিকেও বুঝিতে পারে নাই। সুরো মানে—মনে মনে মানে, বুঝিতে অক্ষম বলিয়াই সে স্বামীকে বুঝিতে পারে নাই। বুঝিতে পারে নাই স্বামীর ভালোবাসার প্রকৃত রূপও—যে ভালোবাসা তাহার তরুণী জীবনে প্রথম বিস্ময় আর রোমাঞ্চ সঞ্চার করিয়াছিল, তাহার কাছে পৃথিবীর রূপ বদলাইয়া দিয়াছিল—সে ভালোবাসা যে কত অপরিমেয় তাহাও সুরো এই অভ্যস্ত দিন-রাত্রির মধ্যে বুঝি ভুলিয়া যায়। কাহার জন্য পশুপতির এই দুর্জয় সাধনা? পুরুষ মানুষ পশুপতি,—উচ্চাকাঙ্ক্ষী উন্নতিশীল পুরুষ। পার্টিতে, মাইফেলে তাহার ডাক পড়িবে বৈকি। ঠিকাদার ব্যাপারী বণিকদের খানাপিনা, নাচ গানের আসরে তাহার না গেলে চলিবে কেন? তাই বলিয়া পশুপতি কি আত্মবিস্মৃত হইয়াছে? না বিস্মৃত হইয়াছে তাহার স্ত্রী, কন্যা, সংসারকে, আপনার লোকদের? সুরো সংশয়ান্বিত হয়, কিন্তু তখনি আবার বুঝিতে চাহে,—এবং বুঝিতে পারেও—কি জন্য স্বামীর এই প্রয়াস প্রচেষ্টা; নানা বাজে লোকের সহিত এত খাতির আপ্যায়ন? সুরোর জন্যই ত, মঞ্জুর জন্যই ত, তাহার পরিবারের সুখ সম্মানের জন্যই ত। সুরোর মন কৃতজ্ঞতায় পরিপ্লুত হইতে চাহে।

আর সেই কৃতজ্ঞতার বশেই আবার সুরো লিখিতে চাহে—কাহাকে লিখিবে?

অমিত বড় একা, বড় দূরে এখন, রাজ-বন্ধনে জর্জরিত। সুরোর এই সুখের দিনে অমিদা'কে সে ভুলিয়া থাকিলে বড় অন্যায় হইবে সুরোর। বন্ধন-ব্যথার মধ্যে একটুকু সুখের স্বাদ অমিত গ্রহণ করিতে পারিবে—সুরোর এই সুখ-সৌভাগ্য জানিলে।

সুরো চিঠি লিখিতে বসে,—আপন সৌভাগ্যের কথা লিখিতে বসে। কোথা দিয়া লিখিতে লিখিতে মনে পড়ে এই সৌভাগ্যের মধ্যে তাহার কোল-শূন্য-করা সেই শিশুকে।—আর কি সে আসিবে না? কেন সে আসিল, কেন সে গেল?... কোথা দিয়া আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথায় যেন কি কঠিন ক্ষোভের ও আবেগের তীক্ষ্ণ ঝটিকাঘাত আসিয়া লাগে। সুরো আপনাকে সামলাইয়া লয়—আপনাকে ফিরাইয়া লয় অশ্রুসজল কথার ধারা হইতে। অমিতের কথা, তাহার কুশল-অকুশলের প্রশ্নে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সুরো নিজের ক্ষোভকে, তাহার উদ্বেগ-বেদনাকে চাপা দেয়।—আর উহারই ভারসাম্য রাখিতে গিয়া অমিতের জন্য, তাহার শুভাশুভের জন্য সুরোর ভ্রাতৃ-মমতা, উৎকণ্ঠা, আবেগ হয় বন্ধন-মুক্ত।

গোয়েন্দা অফিসারের বহু ছাপ খাইয়া সে চিঠি অমিতের হাতের পরিবর্তে ফিরিয়া আসিয়া পৌঁছায় পশুপতির কাছে। হতাশ বিমূঢ় সুরোর উপরে সমস্ত শ্বাপদ-সমাকুল সংসার এবার ঝাঁপাইয়া পড়ে। শুধু সুরো অযোগ্য নয়, সুরো অপরাধিনী; সংসারেই সে শুধু মর্যাদাহীন নয়, সুরো তাহার পাতিব্রত্যেরও মর্যাদানাশিনী।

তারপর? ভগ্ন বিপর্যস্ত অবসন্ন হইয়া ভাঙিয়া যায় সুরো আপনার দেহে-মনে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধটা তখন বাগ্‌যুদ্ধের পর্বে। মেডিকেল কলেজের ক্যাবিনে সুরোকে দেখিতে গেল অমিত। যাইতে সে চাহে নাই। পূর্বেই সে জানিয়াছিল পশুপতির মায়ের অপমানকর ইঙ্গিত, বুঝিয়াছিল সুরোর অসহ্য গঞ্জনা। তবু গেল; বারে বারে সুরো জানাইয়াছে,—একটা কঠিন অস্ত্রোপচার তাহার প্রয়োজনীয়, অমিত কি তৎপূর্বে একবার দেখা করিতে আসবে?

কিন্তু কাহাকে দেখিল অমিত? সুরো কোথায়? মন্দির ভাঙিয়া পড়িয়াছে, আর কোথায় বা সেই ভাঙা-মন্দিরের দেবতা? একদিন যাহার চক্ষু ছিল সরল বিশ্বাসে সুন্দর, প্রাণের স্বচ্ছতায় নির্মল অতল, সে চক্ষু তাহার কোটরগত, ক্লান্ত বিবশ, হাসিতে গিয়া শংকায় ত্রস্ত। সে রঙ নাই, সে রূপ নাই। সেই উৎফুল্ল অধর হাস্যহীন, রঙহীন, রক্তহীন। সর্বোপরি সেই ঝর্ণা-স্রোতের মত কণ্ঠ কেমন যেন চিরিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। মন্দির ভাঙিয়া গিয়াছে; কোথায় বা সেই ভাঙা-মন্দিরের দেবতা?

সুরো কিছুই বলিতে চাহিল না, তবু অমিত বুঝিল অনেক। অস্ত্র করিবার কি প্রয়োজন আর? অনেক ক্ষতই ত তাহার জীবনে ফুটিয়াছে, এই দেহটাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া আর লাভ কি তবে? মিঃ গাঙ্গুলী আসেন নাই, আসিবেন অস্ত্র যেদিন হইবে সেইদিন। তিন দিনের বেশি থাকিবার উপায় নাই তাঁহার।

যুদ্ধের সময়, অনেক কাজ এখন কোম্পানির। সাহেবরা নাই, যুদ্ধে গিয়াছেন ; তিনিই বড় ইঞ্জিনীয়াব। কাবখানায় মজুরদের গোলমালও লাগিয়াই আছে। সুরোকে একটু নিরাপদ দেখিলেই তিনি ফিরিয়া যাইবেন। 'মঞ্জু?' একটু হাসি ফুটিল সুবোর। মঞ্জু আসিতে চাহিয়াছিল, সুরোবও ইচ্ছা ছিল লইয়া আসে। কিন্তু শ্বশুরেব তাহা মত নয়—এই সব কাটা-ছেঁড়াব ব্যাপাবে অতটুকু মেয়ের থাকা উচিত নয়। পশুপতিরও তাহাই মত। বিশেষত সুবোও বোঝে ক্লাশে মঞ্জুব পড়া-শুনাব ক্ষতি হইবে। পড়িতেছে বৈকি। মঞ্জু বড় হয নাই? পনের পাব হইতেছে যে। মিশন স্কুলের উঁচু ক্লাশে উঠিতেছে সে, সিনিয়র ক্যাম্ব্রিজ দিবে এক বৎসর পরে।

'আমরা ত দেশের কোনো কাজেই লাগলাম না। ওবা যদি তবু তোমাদের কাজে লাগে।' ক্ষীণ ম্লান হাসি সুবোব অধরেব কোণে। যেন একটা অসম্ভব আশাব সুবও কাঁপিতেছে।

একটা জীবনেব ইতিহাস কি পড়িতে পাবা যায় না? পড়িতে কি বাধা ছিল তোমাব, অমিত?

ভাঙা-মন্দিব দেখিযাছ, অমিত। ইতিহাসের ছাত্র তুমি। নালন্দা, তক্ষশীলার ভগ্নস্তূপ হইতে পুনর্গঠিত করিতে পাবা যায় সে দিনেব মন্দিব। মেডিকেল কলেজের মেয়ে-ওয়াডের এই 'বেড্ নম্বব ৭৩' হইতে পুনর্গঠিত কবিতে পারিবে কি তুমি অতীতের সুবোকে? .

ডাক্তার অস্ত্র যথাযথ নিয়মে কবিযাছিলেন, শুধু সুবোর স্বাস্থ্যই গোল ঘটাইল ; তাই একটা বৎসব ঘুবিয়া না আসিতেই সে অতি সহজে সংসাব হইতে বিদায় লইল, চুকাইয়া দিল গাঙ্গুলীদেব সংসারের একটা দায়।

শ্বাশুড়ী তখন নাই, বৃদ্ধ শ্বশুর গৃহে রহিয়াছেন, আব আছেন কর্মব্যস্ত স্বামী, —এক মুহূর্তও তাহাব নিঃশ্বাস ফেলিবাব অবসব কোথায়? বিশেষত যুদ্ধ তখন ঘনাইযা উঠিয়াছে। কোম্পানিব চাকরি কবিতেই যুদ্ধেব দুই একটা ছোটখাটো বিজ্‌নেসে বেনামীতে পশুপতি টাকা ঢালিতেছে। গোপন হইলেও সেই দিকে দৃষ্টি বাখিতে হয়, মারোয়াড়ী অংশীদারকে বিশ্বাস আছে না হইলে? কিন্তু কে পশুপতিকে দেখে, কে দেখে সংসাব? কে তাহার বৃদ্ধ পিতাকে কবে সেবা? মঞ্জু? সে পারিবে কেন? সেভাবে সে পালিতা হয় নাই। দুরন্ত, চপল, মেয়ে সে। তাহা ছাড়া পরীক্ষাও দিতে হইবে তাহাকে কিছুদিন পরে, পড়াশুনা না করিলে তাহার চলে?

বড় বিপদ হইল পশুপতির। কিন্তু বিজ্‌নেস্ ত বিজ্‌নেস্ই।

যুদ্ধের বাজার জমিতেছে। বোমা-পড়া কলিকাতায়ও আবার ভিড় বাড়িতেছে। চাকরি ছাড়িয়া পশুপতি আসিয়া উপস্থিত হয, বিজ্‌নেসে সে নামিতেছে প্রকাশ্যে। বালিগঞ্জের বাড়িতে পশুপতি একা, মঞ্জু রহিল ঘাটশিলায় বোমার এলেকার বাহিরে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই সে পরীক্ষা দিবে। তাই মঞ্জুকে বাঙলা ও অংক শিখাইবার

জন্য টিউটর প্রয়োজন। 'অমিত মামার' কথা বাবাকে মঞ্জুই মনে করাইয়া দিল। অমিত? পশুপতির বিশেষ মনঃপূত হইল না। অমিত লোকটা লক্ষ্মীছাড়া, সন্দেহজনক চরিত্রের। পশুপতির সংসারে অবশ্য গোলযোগ সে ঘটায় নাই। সে দোষ সুরোরই। কেমন মস্তিষ্ক-বিকৃত ছিল সুরোর বরাবরই, মাত্রাজ্ঞান যেন কিছুতেই জন্মে নাই। শরীরও ছিল তেমনি তাহার অক্ষম—যেন ব্যাধিগ্রস্ত হইতেই জানিত; পশুপতির সংসারে সে না দিতে পারিয়াছে শান্তি, না দিতে পারিয়াছে মর্যাদা। 'শী মেন্ট নো বিজ্‌নেস।' মাথা-ভর্‌তি ছিল ননসেন্‌স্। না, সে দোষ অমিতের নয়। তবে মন্দ না হউক, অমিত লোকটারও মাথা-ভরা নন্‌সেন্‌সে। কিন্তু মঞ্জুর জন্য একজন টিচার খুঁজিয়া দিতে সে পারিবে। না, পুরুষ টিচার নয়। একা বাড়িতে বৃদ্ধ পিতা মাত্র থাকেন, সেখানে মঞ্জুর জন্য পুরুষ টিচার পিতারও পছন্দ হইবে না। পশুপতিরও মতে মেয়ে-টিচারই চাই। পশুপতি পয়সা খরচ করিতে গররাজী নয়; কিন্তু ভালো ঘরের মেয়ে হওয়া প্রয়োজন। তাহার মেয়ের শিক্ষার ভার পশুপতি যে-সে মেয়ের হাতে দিতে পারে না। চাই ভালো টিচার—সেও কলিকাতার বোমার ভয় হইতে বাঁচিবে, অধিকন্তু পাইবে ঘাটশিলায় গবর্নেসের মত খাদ্য ও বাসস্থান।

শোভাকে মঞ্জু নিজেই স্থির করিয়া ফেলিল, তাহাদের স্কুলও বোমার ভয়ে ঘাটশিলায় বসিয়াছে। আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট হইলেও অঙ্ক ও বাঙ্‌লায় মঞ্জুকে শোভা সাহায্য করিতে পারিবে, অনুমাসীও তাহা লিখিয়াছেন।

'আপনি অমিত মামা, না?'—সভার শেষে একটি মেয়ে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। এ কে? এমন সচকিত চক্ষু, এমন ওষ্ঠাধর, এমন স্বতোচ্ছ্বসিত সানন্দ কন্ঠস্বর—বলে কি?

—আপনার কথা অনেক শুনেছি মায়ের মুখে—

তথাপি অমিত বুঝিতে পারে না কে এই তরুণী।

আমি মঞ্জু।

মঞ্জু! কিশোরী কোমল দৃষ্টি, বুদ্ধিমতী সুরোকে মনে পড়িল অমিতের। বুঝিতে বাকী রহিল না—হাঁ, সে মঞ্জু! সুরোর সেই চোখ, সেই ওষ্ঠাধর, সেই কন্ঠস্বর, সব—যাহা ভস্মশেষে মিলাইয়া যাইতেছিল যখন শেষবার অমিত সুরোকে দেখে হাসপাতালের ক্যাবিনে,—অনেক দিনে তিলে তিলে উহার সব কিছু তখন লুপ্ত হইয়াছে। সুরো কিছুই না বলিলেও তাহার সেই শ্মশান-শেষ রূপ দেখিয়াই অমিত বুঝিয়া ফেলিয়াছিল একটি অকথিত জীবনের কাহিনী; বুঝিয়া ফেলিয়াছিল সেই ভগ্ন মন্দিরের কথা। দেখিতে পাইয়াছিল এদেশের সমস্ত বন্দিনী নারীজীবনের বহু বহু শতাব্দী-জোড়া ইতিহাসের একটি ছত্র। কত পরিচিত সে ইতিহাস অমিতের! কত গৃহে না সে দেখিয়াছে—কত চকিতে দেখা বেদনাতুর নারী-মুখে, কত অবসন্ন, ক্লান্ত নারীদেহে আবার কত সালঙ্কারা শৃংখল-গর্বিতা ফ্যাসন-সর্বস্বার দম্ভে।

সেই সুরো যেন সম্মুখে।—কিন্তু বিশ-পঁচিশ বৎসরের কালস্রোতের এই পারে সে আর সে নাই। ইস্কুলে কলেজে বাহিরে বিদেশে স্বচ্ছন্দ বিচরণের মধ্য দিয়া সেই

এখনকার সুরো—বা সুরোর তনয়া মঞ্জু—আর সেই হাস্যময়ী বাঙালী মেয়েটি নাই। সেই চক্ষু আছে, কিন্তু সে কোমল দৃষ্টি নাই। সেই উৎফুল্ল অধর আছে, কিন্তু হাসিতে সেই স্নিগ্ধ ছটা নাই। সেই কণ্ঠ আছে, কিন্তু নাই তাহাতে মমতার আন্তরিকতা। সেই মুখ, সেই দেহ, কিন্তু নাই সেই লজ্জানম্র সরলতা, জীবনের সেই গভীরতা। এই মঞ্জু! চঞ্চলা, প্রখরা, চকিত দৃষ্টি, চকিতগামিনী, তরুণী নয়—বালিকা মঞ্জু!

এই মঞ্জু! আরও ষোল বছর পরে এদেশের নারী-নিয়তির বিধানে অমিত হয়ত আবার তাহাকেও দেখিবে ভাঙা-মন্দির। হয়ত বা এমন মন্দির যেখানে দেবতার প্রতিষ্ঠাই হয় নাই কোনদিন—যেখানে পূজা হয় নাই, দেবতার আহ্বান ধ্বনিত হয় নাই—উঠিয়াছে শুধু ফ্যাসানের স্তব। শুধুই পলে পলে নব-নব বিলাসে ফ্যাসানে ভাসিয়া যাইবে চঞ্চলা এই অগভীর-অন্তরা বালিকা।...

মঞ্জুকে সেই প্রথম দেখিল অমিত ঘাটশিলায় সভাশেষে। খুশি হইল, দুঃখিতও হইল। তারপর মনে মনে একটা দ্বিধাও বোধ করিল—পশুপতি লোকটা 'ভাল্‌গার'। না, তাহার গৃহে অমিত যাইতে চাহে না। অতএব মঞ্জু শুনিল—অমিতের গাড়ির সময় হইয়াছে। এখন যাওয়া সম্ভব নয় কাহারও বাড়ি।

দিন তিনেক পরে মঞ্জুই উপস্থিত অমিতের গৃহে কলিকাতায় · 'আমি মঞ্জু!'

শোভাদিকে নিয়ে চলে এলাম—আপনার সঙ্গে দেখা করতে। অনুমাসী নেই বুঝি? বালিগঞ্জের বাড়িতে যাওনি? হাঁ, গেছলাম। দেখলাম বাবা নেই। তিনি নাকি গিয়েছেন দুদিনের জন্য যশোরে,—সেখানে কি এরোড্রোম তৈরি করছেন। বেয়ারা আর ঠাকুরকে বললাম,—লোকজন আরও কে-কে ছিল চিনি না,—বলো 'মঞ্জুদি' এসেছিলেন। রাত্রিতে ফিরে যাবেন আবার ঘাটশিলা। দিনের বেলা আজ খাবো যেখানে হয়। বেশ, আপনাদের এখানেই খাবো—কলকাতায় ঘুরব। আপনি ত আর গেলেন না। আমিই এলাম আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে, অনুমাসী আসবেন কখন? শ্যামলবাবু?

তাহার পরে অনর সঙ্গে মঞ্জুর ও শোভার কথা শেষ হয় না।

সেই মঞ্জু পাস করিল, কলিকাতার বোর্ডিংএ থাকিয়া কলেজে পড়িতে লাগিল। পশুপতি তখন যুদ্ধ কন্ট্রাক্টের এভারেস্ট-অভিযানে অগ্রসর হইতেছে। বাড়িতে নানা লোক, বিজ্‌নেসের নানা ধরনের মানুষ সেখানে সর্বদা আসে যায় ; কেহ কেহ থাকেও। মঞ্জু একা থাকিবে কি করিয়া? মঞ্জু বাঁচিল। বোর্ডিংএর বহু ছাত্রীর মধ্যে সে আপনার স্বচ্ছন্দ স্থান করিয়া লইয়া মহোৎসাহে কলিকাতা শহরে ঘুরিয়া বেড়াইতে পায়।

কয়মাস পরে অনু একদিন জানাইল, মঞ্জুর বাবা আবার বিবাহ করিতেছেন ; —সেই শোভা রায়কেই বিবাহ করিতেছেন। কি করিবেন পশুপতিবাবু? তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে দেখিবার লোক নাই। তাঁহাকেই বা কে দেখে? তাহা ছাড়া পিতা ও আত্মীয়-স্বজনও চাহেন বংশে একটি পুত্রসন্তান থাকুক।

নিশ্চয়ই—হাসিয়া বলিল অমিত।

হাসিল অনুও। বলিল,—আমরা যখন ইস্কুলে, শোভাদি তখন নতুন টিচার। তারপরে কলকাতার ইস্কুলে ছাত্রী আন্দোলন গড়তে নেমেছি। শোভাদিকে বলেছি—কাজে আসুন। শোভাদি কান দিতেন সব কিছুতে,—কিন্তু মন দেবেন না। দেবেন কি করে? ওঁর জীবনের আদর্শ আরও অনেক বড়—মহতের সংসর্গে তিনি জীবনকে বাঁধবেন। আদর্শ এত উচ্চ বলেই তিনি বিয়ে করতেও চান না। না, বিয়ে করতে তাঁর আপত্তি নেই, মা হতেও আগ্রহান্বিতা। কিন্তু বিয়ে করলে বিয়ে করতেন তিনি হিট্‌লারকে কিংবা আইন্‌স্টাইনকে ; গান্ধীজীকে কিংবা রবীন্দ্রনাথকে ;—তিনি তখনো বেঁচেছিলেন।

অমিত হাসিল, সুভাষ বোস্ জওহরলাল পর্যন্ত নামতে রাজী ছিলেন না বোধ হয়?

না—অনু হাসিতে লাগিল।

আগা খাঁ?

বলা যায় না,—হাসিতে লাগিল অনু।

সো, এখন পশুপতি গাঙ্গুলী—সকলের সমাহার দ্বিগু—না গান্ধীজী, না রবীন্দ্রনাথ, না হিট্‌লার না আইন্‌স্টাইন্—কিন্তু ওয়ার কন্ট্রাক্টের অ্যাডভানচারার। কিন্তু মঞ্জু করছে কি?

কি করবে? খবরটা তোমাকে দিতে এসেছিল। একটু বিশ্রী লাগছে হয়ত তারও ; কিন্তু ভাবে তা বুঝলাম না। কোষ্ঠীতেও নাকি মিলে গিয়েছে পশুপতিবাবুর ও শোভাদি'র। মঞ্জুই বললে, বিজ্‌নেস্ এখন খুব ভালো চলছে পশুপতিবাবুর। 'বিয়েতেও দু'দিনের বেশি সময় দিতে পারবেন না, বাবা।'

কে বলল এসব? মঞ্জু? অমিত হাসিল : মঞ্জুও দেখছি বিজ্‌নেস্-লাইক্।

...সুরোর মত তাহার চোখ, মুখ, গলা ; কিন্তু সে ত সুরো নয়। বরং মঞ্জু পশুপতিই, সে বিজ্‌নেস্-লাইক্। বাপের বিবাহও 'বিজ্‌নেস্-লাইক্' রীতিতে সে গ্রহণ করিতেছে—যেন ইউরোপ-আমেরিকার মেয়ে। আশ্চর্য দেশ। যার পিণ্ডদানের জন্য বংশরক্ষার দাবিও শেষ হয় নাই ; কোষ্ঠী মিলাইয়া প্রাগ্ দাম্পত্য পূর্বরাগকেও পাকা করিতে হয় ; আবার দুইদিনের বেশি সময়ও আর বিবাহে দেওয়া সম্ভব নয়—বিজ্‌নেসের তাড়া যে বড় প্রবল।—একই সঙ্গে, খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতক, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক আর একবারে বিংশশতকও,—সব তালগোল পাকানো। মঞ্জুও একই সঙ্গে সুরো আর পশুপতি ; আর সব তালগোল পাকিয়ে—শেষ পর্যন্ত কি সে? দিনে দিনে তুষানলে ভস্মীভূত সুরো, কিংবা—ললিতা?...সংসারের দাহে দগ্ধ, তিক্ত, বিরক্ত সদা-খেঁকানো শিল্পী বিকাশের একদা-তন্বী, অধুনা শাঁখচুন্নী প্রেয়সী—পূর্ণিমা? হাকিম স্বামীর ঐশ্বর্যবাহিনী, শৈলেশের পদ-গর্বিতা, মেদবর্ধিতা স্ত্রী পুঁটু—এখন যে 'প্রতিভা'? কিংবা, খুব বেশি হইলে বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠা শিকারিণী প্রচার-কামিনী মিসেস সেনরায়? ...অথবা সব ছাড়াইয়া সব হারাইয়া পেটি-বুর্জোয়ার বিদ্রোহের উন্মাদনায় উন্মত্তা বিক্ষুব্ধ-চিত্তা, বিক্ষিপ্তচেতনা ইন্দ্রাণী?...

কিন্তু আপাতত শুধু scatter-brain বিক্ষিপ্ত-বুদ্ধি! কথা বলিতে গেলে চেঁচাইয়া উঠে, চলিতে গেলে ছুটিয়া চলে, হাসিতে গেলে ঢেউ-এর মত লুটাইয়া পড়ে।...

বলিতে গেলে চেঁচাইয়া ওঠা, চলিতে গেলে ছুটিয়া চলা, আর হাসিতে গেলে ঢেউ-এর মত লুটিয়া পড়া এই মঞ্জু অমিতের চোখে তবু প্রশ্রয়ই পাইয়া গিয়াছে,—সুরোর মেয়ে সে। বালিকা, নিতান্ত বালিকা। হাসির, কথার, চলার-বলার তুফানে চড়িয়া সে যে অমিতের-অনুর কর্মক্ষেত্রের কাছাকাছিই ফিরিতেছিল, অমিতের তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর হয় নাই। কিন্তু একদিন পশুপতি আসিয়া উপস্থিত হইল অমিতের নিকট —মঞ্জুকে একি প্রশ্রয় দিতেছে—অমিতেরা?

কি ব্যাপার?

কেন জানা নাই নাকি তাও তোমার?

লোকটা এমনি পাকা বদমায়েস। ঠিক সুরোর সঙ্গে সম্পর্কেও সে এমনি একটা সরলতার ভান করিত। পশুপতি মনে মনে জ্বলিয়া গেল, কিন্তু সে কাজ পণ্ড করিতে আসে নাই। 'আই নো মাই বিজ্‌নেস্'! এত লোককে ম্যানেজ করি, আর তুমি অমিত?

পশুপতি একবারে আত্মীয় হইয়া গেল: 'ফাইব ফাইব ফাইব' সিগারেটের কৌটা খুলিতে খুলিতে বলিয়া চলিল: জানোইত ওর মাথায় কিছু নেই; ওর মায়েরও ছিল না। মানে, ভালোমানুষ ছিলেন আমার ফাস্ট ওয়াইফ্। সতীলক্ষ্মী সিম্পল্,— এড্‌ভানটেজ নিত সকলে। তারই মেয়ে ত মঞ্জু। ন্যাচারলি, তাকে দশজনে যাতে নাচিয়ে না দেয় তা দেখা—এজমাচ আমার ডিউটি, এজ ইওর্‌স।

অমিত সে বিষয়ে একমত। কিন্তু কাণ্ডটা কি?

ওসব ফুলিশনেস থেকে মঞ্জুকে দূরে রাখো ত—এই ছাত্রীদল, ছাত্রদল, পুত্রদল, কন্যাদল,—কত কি যে সব তোমাদের দল হয়েছে! তুমি পলিটিক্‌স করো, সে এক কথা—লেখাপড়া শিখেছ, নামটামও করেছ, এ্যাসেমব্লিতে যাবে, কর্পোরেশনে ঢুকবে; —হাঁ, তুমি একটা লাইন ধরেছ। ছোকরারা যে হৈ-চৈ করে, বুঝি তাও। কিন্তু মেয়েদের কেন ও হুল্লোড়? আর ইয়ংগার্লসদের? একটা বিপদ ঘটলে?

ঘটবে—অমিত এবার অবলীলাক্রমে বলিল।

ঘটবে! বিস্ময়ে প্রায় হতবাক হইতেছিলেন পশুপতি গাঙ্গুলী। তারপর আবার সামলাইয়া লইলেন। হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন: যাক, একবার একটু সীরিয়াস হও ত। সীরিয়াসলি—বলো ত কি করি? তুমি তোমার বোন—কি নাম তার? অনু? অনুজা?—সে বিয়ে করেছে বুঝি তার ক্লাশ মেটকে? ক্লাস মেট নয়, সহকর্মী? এনি ওয়ে, ভিন্ন জাতের ছেলে সে, তা যাক। তোমরা কলকাতা আছ, তাই আমি একরকম নিশ্চিন্ত। নইলে কলকাতায় কে কাকে চেনে? সাংঘাতিক জায়গা। তোমাদের থেকে মঞ্জুর আপনার আর কে আছে? আমি তাকে দেখি কখন? বিজ্‌নেসই দেখে উঠতে পারি না। আমার ওয়াইফ্, মানে মঞ্জুর নতুন মা, কি শোনেন কার কাছে, তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। বলেন, 'বোর্ডিংএ থেকে কি করে না-করে মঞ্জু জানি না। এখন নানা রকমের দল আর পলিটিক্‌স্।'

মঞ্জু নাকি জুটেছে কমিউনিস্টদের দলে।' আমিই বা এ-সব কি জানি? তবে জানি—ঠিকই হচ্ছে। যুদ্ধে তোমরা কো-অপারেট করছ, গবর্নমেন্টও তোমাদের ব্যাক্ করছে। এন্ড ইউ আর ডুয়িং গুড্ বিজ্‌নেস্। তা ছাড়া তুমি যখন আছ কমিউনিস্ট—তখন মঞ্জুর জন্য আমি কেন ভেবে মরি? কিন্তু দ্যাখো, এ শহরে যখন তখন যেখানে সেখানে মেয়েদের ঘুরে বেড়ানো আমি ভালো মনে করি না। এ কথাই বলেছি কি সেদিন অমনি চটে উঠে মঞ্জু বাড়ি থেকে চলে গেল। কিন্তু আমরা হিন্দু ; সমাজ, সংসার আছে, দুদিন পরে ওর বিয়ে হবে, বাজে মেয়ের মত পথে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ালে ভালো ঘরে বিয়ে হবে আর ওর? কেমন, ঠিক্ না?

অমিত জানাইল যে, ঠিকই।

তাহলে—নাউ কম টু বিজ্‌নেস্। কি করবে তুমি?

অমিত বুঝিতে পারিল না বিজ্‌নেসটা কি।

হাসিয়া পশুপতি বলিলেন, আই লিভ্ হার টু ইউ। তুমি আর তোমার বোন—কি নাম যেন তার? অনু, না? বেশ তোমাদের উপর ভার রইল মঞ্জুর।

অমিত আপত্তি করিল, এ অন্যায় কথা, মিস্টার গাঙ্গুলী। মঞ্জু আপনার মেয়ে, তার দায়িত্ব অন্যের উপর চাপাতে চাইলে হবে কেন? কিন্তু পশুপতি তাহার আপত্তি কানেই তুলিল না। হাসিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল : ওসব আমি ভাবতেই টাইম পাব না। বেশি কথা বলেই বা কি হবে?

অমিত আর অনুকেই মিঃ গাঙ্গুলী মঞ্জুর 'ভার' দিবেন। কোনো কথা শুনিবেন না।

নিজের পরিচয়-পরিধি হইতে মঞ্জুকে আরও দূরে রাখিয়া দিল অমিত। তাহাতে অসুবিধা ছিল না। কলিকাতার কোন এক কলেজের ছাত্রী মঞ্জু ; আর কোথায় নানা কাজে, গ্রন্থপ্রচার ও সম্পাদনায়, নানা আড্ডায়, গল্পে, সভায় সমিতিতে সদা ব্যস্ত অমিত। এক আধবার সিডিসনে জেল খাটিতে হয়। তবু মাঝে মাঝে সেই ত্বরিত-চরণা বালিকা অমিতের কার্যক্ষেত্রের সীমায় আসিয়া পড়িত, জানাইয়া দিত—মঞ্জু বেশি দূরে নাই। অনুর কার্য ও কার্যক্ষেত্রের মধ্যে ত তাহার স্থান আছেই, অমিতের কার্যক্ষেত্রের মধ্যেও সে আপন অধিকারেই আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু অমিত তাহার সম্বন্ধে খোঁজ রাখিত অল্পই। ছাত্র ও ছাত্রী সমিতিতে বরং উগ্র সংবর্ধনার দিন আসিয়াছে 'বিয়াল্লিশী বিপ্লবীদের'। যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। দেশ 'স্বাধীন' হইতেছে। আন্দোলনের ধাপে ধাপে পা ফেলিয়া ফেলিয়া মঞ্জু কোথায় দাঁড়াইয়াছে হয়ত অনুর মুখে অমিত তাহা শুনিতে পারিত, কিন্তু সেদিকে তখন তাহার দৃষ্টি নাই। ইতিহাস যে এই দেশে জোর কদমে পা বাড়াইতেছে। হঠাৎ পথে অমিত দেখিল ২৯শে জুলাই মিছিলের মধ্যে এম. এ. ক্লাশের ছাত্রীদের নেত্রী মঞ্জু। চুল উড়িতেছে, মুখে চোখে অক্লান্ত উদ্দীপনার সঙ্গে শ্রান্তির কালো দাগ ; অজস্র হাসির মধ্যে তাহা এখনো মিলাইয়া যাইতেছে তবু একেবারে তাহা

অদৃশ্য থাকিবে না, যেমন অদৃশ্য নাই আজ তাহা অনুর চোখে, অনুর মুখে—এই ২৯শে জুলাই'র বিরাট-জনস্রোতের মধ্যে। পৃথিবীর কাছে অনু পরাজয় না মানিয়া অনমনীয় তেজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। কে চিনিবে তাহাদের সেই শ্রী, তাহাদের তেজোদ্দীপ্ত মনের মহিমা, তাহাদের ক্রমক্ষয়িত রূপ ও স্বাস্থ্যের ইতিহাস? ইতিহাসের কি ঐশ্বর্য কিনিতে গিয়া কি মূল্য দিতে হয় জানে কি তাহা তাহারা—এই চঞ্চলা, অগভীর-চিত্তা এ-কালের মঞ্জুরা?

...ইতিহাসের কোন মূল্য কি ভাবে আদায় হয়, তাহা কি তুমিই জানিতে সেদিন, অমিত? —আপনাকে চকিতের মত জিজ্ঞাসা করিল অমিত।—জানে ইন্দ্রাণী? না থাক এ ভাবনা—ইন্দ্রাণী .পনের দিন শেষ হইতে না হইতে ভ্রাতৃরক্তেব স্রোতে ডুবিয়া গেল কলিকাতার সেই বৈপ্লবিক ভ্রাতৃত্ব। তারপর নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাব; আর ইতিহাসে সমস্ত সত্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া খণ্ডিত হইয়া গেল তোমার বাঙলা, অমিত!—আর তুমি—তোমরা? বলিতে পারিলে না তোমরা 'মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা!' এই মাউন্টব্যাটনী স্বাধীনতায় শুধু ভারত বিভক্ত হইল না—ভারতীয় গণ-আন্দোলনও বিভক্ত হইয়া পঙ্গু হইয়া গেল। অমিতের বুক জ্বলিতে লাগিল ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গাতে দেশবিভাগের ক্ষতে—কোথায় তখন মঞ্জু, কোথায় তখন পশুপতি? অমিত নিজের স্থির চেতনা হারাইয়া ফেলিতেছে।

মাস দুই পরে আবার পশুপতি আসিলেন। এবার কথাটা পরিষ্কার করিয়া না লইয়া তিনি যাইবেন না। গেলেনও না। অমিতের কাছে কথাটা তিনি পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে চান—মঞ্জু কি তাহার পিতার কথা শুনিবে, না, শুনিবে অমিতের কথা? না, না; অমিত কথাটা এড়াইয়া যাইতে পারিবে না। এই প্রশ্নের উত্তর দিক সে, স্পষ্ট করিয়া উত্তর দিক। মঞ্জুর বয়স হয় নাই নাকি? তাহার বিবাহ হইবে না? সে বিষয়ে কি ভাবে না কিছু মঞ্জু? এখনো যে যত নাম-না-জানা ছোকরাদের সঙ্গে সে নাচিয়া বেড়ায়? অমিত নাকি ইহার কিছুই জানে না। পশুপতি এই কথা কখনো বিশ্বাস করেন নাই। চিরজীবনই অমিতের নীতি 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি', 'ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাওয়া'। কিন্তু পশুপতি সমাজ সংসার মানেন, বিবাহ মানেন, সতীত্ব মানেন, মেয়েদের লজ্জা-সরমের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করেন। আজ ইহার সঙ্গে, কাল উহার সঙ্গে প্রেম করিয়া বেড়ানো এই দেশের মেয়েদের আদর্শ নয়;—রুশিয়ায় চলিতে পারে, ভারতবর্ষে চলিতে পারিবে না। অন্তত পশুপতি ইহা চলিতে দিবেন না। মঞ্জুকে হয় তাহাব কথা শুনিতে হইবে, না হয় পিতার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করিতে হইবে।

অমিত বিরক্ত হইতেছিল, তথাপি বুঝিতে চাহিল ব্যাপারটা কি?

কেন, অমিত জানে না নাকি? ন্যাকা সাজিতেছে যে! অবশ্য ন্যাকা সাজা তাহার পক্ষে নূতন নয়। পশুপতি আপনার উষ্মা গোপন করিল না। কিন্তু থামিল, অমিতকে বলিল—মঞ্জুর জন্য তিনি পাত্র স্থির করিয়াছেন। কথা এখনি পাকা হইতে পারিত।—চা বাগানে অগাধ সম্পত্তির মালিক তাহারা। কৌলীন্যেও

পাল্টা ঘর, কোষ্ঠীতেও মিলে। বি. এ. পাস করিয়া ছেলেটি বিজ্‌নেস্‌ দেখে—না হয় বিলাত ঘুরিয়া আসিবে। কিন্তু মঞ্জুকে বিবাহের বিষয়ে বলিতেই সে ক্ষেপিয়া যায়—সে বিবাহ করিবে না। যেন বিবাহ না করিয়া কেহ থাকিতে পারে? পশুপতি তবু ভাবিয়াছিলেন মেয়েকে একটু সময় দিবেন—মাথা ঠাণ্ডা হউক মঞ্জুর। কিন্তু ইতিমধ্যে কি কনফারেনস হইতেছে অমিতদের—বিদেশের মেয়ে-পুরুষ আসিতেছে। তাহাতে মঞ্জু কয়েকটা ছোকরার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পশুপতির বাড়িতেই একটা আপিস খুলিয়া বসিতেছে। পশুপতি আসামে ছিলেন—বৎসর দুই পূর্বে যুদ্ধ থামিতেই একটা ভারী লস্‌ দিতে হইয়াছে বিজ্‌নেসে। এখন যুদ্ধ নাই; সে নানা দিকে তাল সামলাইতে ব্যস্ত। তাঁহার ওয়াইফ থাকেন বালিগঞ্জের বাড়িতে, তাঁহার মাদার ইন্‌ল'ও এখন আছেন সেখানে। তাঁহাদের কাহাকেও বলা-কওয়া নাই; আপনার খুশি মত মঞ্জু বাড়িতে সভার ব্যবস্থা করিতেছে! বলে, "তোমাদের মহলে হাত দিচ্ছি না। ভেতরের দিকের এ দুটো ঘরেই আমাদের হবে,—আমাদের আলোচনার কথাবার্তার জন্য একটা গোপন জায়গা চাই।" পশুপতি শুনিয়া সন্ত্রস্ত রুষ্ট হইয়াছেন, এই বাজারে গবর্নমেন্ট কন্ট্রাক্টগুলিও যাইবে পুলিশের খাতায় নাম উঠিলে। না, গোপন জায়গা যেখানে খুশি হোক্‌, কিন্তু পশুপতির বাড়িতে নয়। ওয়াইফের নিকট হইতে খবর পাইয়া পশুপতি তাই আসিয়াছিলেন। ওই দুই-তিনটা ছোকরার সঙ্গে মঞ্জুর কি সম্পর্ক, তাহা জানিতে চাহে পশুপতি। অমিত কিছু জানে না? মানে, বলিবে না? সে না বলুক খুব বিশ্বাসী লোকের নিকটেই পশুপতি সব কথা জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু একটা নয়, দুটা নয়, গুচ্ছের ছোকরার সঙ্গে যে মেয়ে ইয়ার্কি-ফক্কুরি করিয়া বেড়ায়, কোন ছেলে জানিয়া শুনিয়া তাহাকে বিবাহ করিবে? তাহা ছাড়াও অনেক কথাই ভাবিতে হয় পশুপতির,—তিনি ত সমাজে থাকেন। কাল যদি মঞ্জুর একটি ভাই হয়—সে সম্ভাবনা যখন হইয়াছে—

অকস্মাৎ অমিত কৌতুক বোধ করিল: তাই নাকি? তা হলে খাওয়াবার ব্যবস্থা করুন আমাদের।

কিন্তু পশুপতি পথভ্রষ্ট হইলেন না: বিধাতার হাত। যখন মঙ্গল মত সব হইবে, তখন সবই পশুপতিকেও করিতে হইবে,—তিনি সমাজে থাকেন। পরিবারে অন্য দশজন আছে। এই সব কথাও মঞ্জুকে তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পারিলেন না। অমিতকেই তাই পশুপতি জানাইতেছেন—অমিত বোঝাক মঞ্জুকে। না হইলে আর পশুপতি কি করিবেন? মঞ্জু যদি ইহার পরেও বাড়ি ছাড়িয়া যায় যাইবে। সেজন্য বাড়িটাকে ত কমিউনিস্টদের কেলিকুঞ্জ করিয়া ফেলিতে পারিবেন না পশুপতি। বিশেষত তাঁহার স্ত্রীর অবস্থাও এখন ডেলিকেট—একবার গোলমাল হইয়া গিয়াছে। এইবারও এখন বাড়িতে ছোঁড়াছুঁড়িদের হুল্লোড়। এসব এক্‌সাইট্‌মেন্ট্‌, নার্ভাস স্ট্রেন্‌ তিনি স্ট্যাণ্ড করিতে পারিবেন কেন?

অমিত বুঝিল, জিজ্ঞাসা করিল, মঞ্জুকে তাহলে কোথায় দিচ্ছেন?—বোর্ডিংএ?

তা দেব কেন? বাড়িতেই সে থাক না। তবে দশটা মেয়ের মত থাকবে। বৈশাখেই বিয়ে হয়ে যাবে তার। কিন্তু কথাটা বুঝে রাখুন আপনি—'আই মিন বিজ্‌নেস্‌'।

আবার পশুপতি বুঝাইলেন—তিনি মেয়েকে গৃহত্যাগ করিতে বলেন নাই—আর অমিতরা মঞ্জুকে সেই প্ররোচনা দিয়াও ভালো করে নাই। কত মঞ্জুর বয়স? প্রয়োজন হইলে পশুপতি পুলিশের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন অমিতদের বিরুদ্ধে ফর এনটাইসিং এওয়ে এ মাইনর্‌ গাল।

এবার অমিত হাসিয়া কথা শেষ করিয়া দিল: তা হলে তাই নেবেন, পুলিশ তো ভালো আশ্রয়। কিন্তু তার পূর্বে এম-এ পরীক্ষার্থিনী মাইনর্‌ গার্লটিকে সসম্মানে বাড়িতে রাখ্‌তে চেষ্টা করুন। অবশ্য মেয়ের যদি সত্যই সম্মান বোধ থাকে তাহলে আপনার বাড়িতে সে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ।

পশুপতি অমিতের স্পর্ধায় বিমূঢ় হইল। বলিল, কেন?

সে উত্তর তাকেই জিজ্ঞাসা করবেন। স্ত্রীকে সম্মান করতে জানেন নি; কিন্তু মেয়েকে সম্মান করতে এখনো শিখুন। সেদিন আর নাই।

ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন পশুপতি। ইতরের মত চীৎকার করিতে গেলেন, এত বড় স্পর্ধা তোমার, অমিত! ভেবেছ তোমাদের বজ্জাতি আমি জানি না—

অমিত উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, বাস্‌! থামুন মিস্টাব গাঙ্গুলি। জানেন—আমি নামকাটা সেপাই—পুলিশকেও ভয় করি না। আমাকে সম্মান করতে না চাইলে আমি তা আপনাকে শেখাতে পারব।—আর একটি কথা বলেছেন ত তা বুঝবেন।

আশ্চর্য সুফল ফলিল এই স্থূল বক্তৃতায়।

অমিতেব দ্বিধা ছিল—এই ত তাহাব দেহ, এই ত তাহার বয়স,—কড়া কথা বলিতেও সে জানে না। এইরূপ একটা হুম্‌কিতে এই স্থূল স্বভাব লোকটা থামিবে ত! কিন্তু আশ্চর্য রকমের কাজ দিল তবু তাহার এক কালের জেল-খাটা খ্যাতি। মনে মনে একবার কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিল অমিত তাহার সেই জেল-জীবনের দীর্ঘ বৎসরগুলিব জন্য, নিতান্ত অর্থহীন 'স্বদেশী' নামটার জন্যও।

ক্রুদ্ধ পশুপতি এবার নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন। অমিত বাঁচিল। এতদিনে তাহার চক্ষে সুবোর স্মৃতি যেন ক্লেদমুক্ত হইল।...

তারপর সেই মঞ্জু অমিতের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল এখন একেবারে গোয়েন্দা আপিসের এই প্রায়ান্ধকার ঘরে—'অমি' মামা।' আর বহু বৎসরের ওপারের সেই কিশোরী হাস্যমুখী স্নেহার্দ্র-হৃদয়া সুরো-কে যেন অমিত দেখিতে পাইল। শুনিতে পাইল তাহার আত্মীয়তা ভরা কন্ঠস্বর 'অমি' দা।'..দেখিতে পাইল পঁচিশ বৎসরের একটা দ্রুত চলচ্চিত্র।...ঝড় বহিতেছে চারিদিকে তখন অমিতের—চিন্তার, আলোচনার, তর্কের,—আর নতুন সংকল্পের। মঞ্জুকে দেখিতেই পায় নাই অমিত। পাইলে হয়ত মঞ্জুর অপরিণত উৎসাহের বিরুদ্ধে অমিত তাহাকে সাবধান করিত। অন্তত যাচাই করিয়া দেখিত—চঞ্চলা উচ্ছ্বাসপ্রবণা বালিকা জানে কি কোথায় চলিয়াছে সে?

কমিউনিজম আর এখন জওহর-জ্যাকেট ও জওহর-লালী বাক্য-বিলাস নয়। কিন্তু অমিতের সে সময় হইল না। একেবারে এখানে দেখিতে হইল মঞ্জুকে।

'মঞ্জু'! আর কথা সরিল না অমিতের মুখে। হাত ধরিয়া মঞ্জুর চোখের দিকে সে তাকাইয়া রহিল।—সে চোখ ছাপাইয়া আনন্দের কৌতুকের হাসি উপছাইয়া পড়িতেছে।...কিন্তু সে চোখের মধ্যে কি নাই সুরোর গভীর সুন্দর বেদনা-ভরা মিনতি —সেই ট্র্যাজেডিরও পুনরাভাস?

মঞ্জু, তুমিও এখানে!—বিস্ময় যেন শেষ হয় না। সত্য আছে কি এই বালিকার এই দুর্বার পথযাত্রায়? না, ইহা তাহার চাপল্য.—নিছকই একটা বাহাদুরি?

আর আপনার আগেই—হাসিতে মাথা দোলাইয়া বলিল সেই বালিকা মঞ্জু। বালিকা?—'এম-এ পরীক্ষার্থিনী মাইনর্ গার্ল!'...

কিন্তু তুমি এলে কি করে?

ওরা ট্যাক্‌সি নিয়ে এসেছিল;—সকাল বেলায় একটু হাওয়া খেতে এলাম। —হাসিতেছে দুষ্টু মেয়ে। অপরিণত বুদ্ধি বালিকা। গুরুত্ব বুঝিতে পারিতেছে না বোধ হয়।

* * *

সকলে অমিতকে ঘিরিয়া ধরিতেছে। অমিত যে একেবারে জিনিসপত্র লইয়া আসিয়াছে। হাসিয়া অমিত বলিল, কিছুদিন শান্তিতে বসবাস করবার আশা রাখি। তোমরা কি খালি হাত পায়ে এসেছ নাকি? যাও তাহলে, বিদায় হও। আমি হাত পা ছড়িয়ে বসি একবার।

জন বিশেক ইতিমধ্যেই আসিয়া গিয়াছে। প্রত্যেককে দেখিয়াই অমিত বিস্মিত হইল। মেয়েরাও যে—মঞ্জু, সুজাতা, টুনু। ইহাদেরও এখানে দেখিবে, এই কথাটা যেন অমিতের মনে ইতিপূর্বে উদিত হয় নাই। মেয়েদেরও এখনি গ্রেপ্তার করা আরম্ভ করিল—

তুমিও যে, সুজাতা?

কি করব, অমিদা'?

তোমাদের মেয়েদের ধরলে? মনে মনে ভাবিল অমিত—অনুও নিস্তার পাইবে না।

ওটাও আর আপনাদের একচেটিয়া রইল না, না?—বলিল কিন্তু সেই মঞ্জু।

অমিত তখনো আসন গ্রহণ করে নাই। মঞ্জুকে হাত দিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া অমিত বলিল, না, আর বসা হল না। বলো মঞ্জু, তোমরা থাকবে, না, আমরা? এখনি চলে যাচ্ছি নইলে,—আর বসব না।

কোথায় যাচ্ছেন?

বাড়ি ফিরে।

সকলে হাসিয়া উঠিল।

মঞ্জু বলিল, জিনিসপত্র নিয়ে এসেছেন দু-চার দিন থাকবেন বলে—

তখন কি জানি তোমাকেও ধরেছে ওরা? না, এখনি ওদের ভি-সিকে গিয়ে বলছি, 'এবার আমাদের পেন্‌শন দিয়ে দিন, আর কেন?'

বলে দেখুন না।

অমিতও হাসিতেছে। তোমাকেই যদি ধরে তাহলে আমি 'বণ্ড' লিখে দিয়ে যাব। এই চ্যাংড়া ছেলেমেয়েদের পাল্লায় থাকব নাকি আমি?—সকলে হাসিয়া উঠিল—কথার অপেক্ষাও কথা বলিবার ধরনে।

তবু নিছক পরিহাস নয়। অমিত যেন মঞ্জুকে এখানে,—এই ঘর, এই আবেষ্টন, মঞ্জুর সম্ভাব্য ভবিষ্যতের সঙ্গে মানাইয়া লইতে পারে নাই।—মঞ্জু নিতান্ত বালিকা। ছেলেমানুষ। সুরোর মেয়ে।

...হাঁ এম. এ. পড়ে মঞ্জু। বয়সও একুশ-বাইশ হইবে। হইলই বা,—বালিকা সে এখনো চোখে মুখে, কথায়, হাসিতে, অকারণ আনন্দে। এত ছেলেমানুষ সুরোও ছিল না এই বয়সে। —এ বয়সে কেন, ইহার পূর্বেও ছিল না। যখন সে সত্যই কিশোরী বালিকা হিসাবে আমাদের নিকটে কারণে অকারণে গল্প শুনিতে বসিত, তর্ক শুনিত আমাদের বন্ধুদের, নানা কথা শুনিত তখনকার দিনের, —বাবার সঙ্গে আমাদের, বাবার বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুদের। শুনিত আমাদের কলেজের গল্প, অধ্যাপকদের গল্প, বন্ধুদের গল্প, শুনিত খেলার গল্প, পড়ার গল্প, সাহিত্যের গল্প...তখনকার দিনের সেই সুরো তথাপি এতটা বালিকা ছিল না। আরও অনেক কম ছিল তখন তাহার বয়স—তাহার চোখ এমনি ছিল, এমনি মুখ, এমনি কন্ঠ।—কিন্তু তাহার চোখে তখনি ছিল আরও একটু সংকোচ নম্রতা; তাহার মুখে ছিল আরও একটু সরল ধীরতা; আরও একটু স্বচ্ছ সুস্থিরতা ছিল তাহার গতিতে, তাহার কন্ঠস্বরে। না, সুরো তখনো এত ছেলেমানুষ ছিল না—অথচ সত্যই সে তখনো বালিকা। কত ছিল তাহার বয়স? হয়ত পনের বছর। পনের বছরের বেশি নয় নিশ্চয়ই। সকলেই তখন জানিত তাহার বিবাহের দেরি নাই। সুরোও জানিত তাহার পিতৃগৃহের দায়িত্বমুক্ত জীবন আর বেশি দিন নাই। তাহার পনের বছরের কন্ঠে আর শোভা পায় না বালিকার উচ্চহাস্য, ব্যবহারে অকারণ চাঞ্চল্য, চোখে মুখে অমন ঔজ্জ্বল্য আর উচ্ছ্বাস। ছিঃ, সে যে বড় হইয়াছে। অশোভন তাহার বয়সে—পনের বছর বয়সে—বাঙলা দেশের মেয়ের পক্ষে অমন অকুন্ঠিত উচ্চকিত হাসি, অবাধ মুক্তগতি, আচরণ—'ইন্দ্রাণী বৌদির মত'। সুরো নিজের বয়সের ও স্বভাবের অপেক্ষাও নিজের সমাজের ও সংসারের প্রচলিত মতামত, বিধি-বিধানকে বেশি মানিয়া লইয়াছিল। মানিয়া লইয়াছিল চিরাগত সংস্কারের বশে তাহার ধরা-বাঁধা জীবনকে, ভাগ্যকে—আর তাই এদেশের সমস্ত নারীজীবনের ট্রাজিডিকেও।...তাই বিবাহের পরে সেও তেমনি গতানুগতিক নিয়মে জীবনানন্দের প্রথম আস্বাদনে, প্রণয়-শিহরিত প্রাণে পৃথিবীকে দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া খুশি হইয়া উঠিয়াছিল। ...মনে পড়ে প্রথম

সেই হাওড়া স্টেশনে দেখা সুরো ও পশুপতিকে...ট্রেন ছাড়ার দেরি নাই, মালপত্রও কম নয়, চারিদিকে লোকজনের ছুটাছুটি। পিতৃগৃহ হইতে বিদায়ের ব্যথায় চোখ সজল, তবু নতুন জীবনের স্বাদ, নতুন সৌভাগ্য সুরোর চোখে মুখে উপচীয়মান।

সংসারের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ তুচ্ছতায় সুরো আহত হইত না। মধ্যবিত্ত সংসারের মেয়ে, সে জানে এমনি তুচ্ছতা লইয়াই মেয়েদের সংসার চলে। শ্বশুরগৃহের শাসন কঠিনতায়ও সুরো চমকিত হইত না। বাঙালী মেয়ে আশৈশব উহার জন্য প্রস্তুত থাকে। প্রতিদিনের অজস্র ঝঞ্ঝাট, স্বামী পুত্র পরিজনের নির্ভুল নিরন্তর পরিচর্যায়ও সুরো ক্লান্ত কাতর হইত না। ইহা লইয়াই নারীজীবনের গর্ব গৌরব, আনন্দ-উৎসব। ইহা দিয়াইত তাহাদের পরিচয়। সংসারের গতানুগতিক ঘটনাজালে কোনোখানে তাই সুরোর ছটফট করিবার কথা নয়। আশ্চর্য যে, তবু ছটফট করিয়া সুরো মরিল।...

আশ্চর্য কেন? নিজেরই মধ্যে কি, আমি অমিত, জানিতাম না এই হইবে, এই হইতেছে, এই পৃথিবীর সুরোদের জীবন বহু-বহু শতাব্দীর নিয়মেই এখানেই আসিয়া ঠেকিবে, মধ্যযুগের এই সংসার-বিন্যাসের ইহাই অনিবার্য ফল...মধ্যযুগ যখন টিকিয়া নাই...।

অমিত নিজেকেই আবার বলিল...হাঁ, মধ্যযুগের ব্যবস্থা স্বীকার করিলেও এ দেশের মেয়ের জীবন ট্রাজিডি। এ ব্যবস্থা অস্বীকার করিলেও তাহা ট্রাজিডি। সুরোর ট্রাজিডি মানিয়া চলার ট্রাজিডি; তাহা স্বীকৃতির ট্রাজিডি। আর বিদ্রোহের ট্রাজিডি—মধ্যযুগের দাসপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ট্রাজিডি—তাহাও কাল দেখিলাম, —ইন্দ্রাণীর ট্রাজিডি!...অথচ মানবতীর্থের মহা-মাঙ্গলিকের বাণী আজ পৃথিবীর ধূলিতে ধূলিতে অনুরণিত!—কিন্তু মঞ্জু? স্বীকৃতির, না, বিদ্রোহের ট্রাজিডি,—কোন্ জালে তোমাকে জড়াইয়া ধরিতেছে মঞ্জু?...চঞ্চলা বালিকা, তুমি কি আরও সম্মুখে যাইতে পারিবে—আরও দূরে—নবজীবনের তীর্থপথে? স্বীকৃতির জন্য মাঝপথে নয়, বিদ্রোহের অন্ধমার্গেও নয়, মানবতীর্থের সম্মিলিত অভিযানে এযুগে পথ গড়িতে হইবে।...

নূতন একদল আসিয়া গেল। মজদুর এলেকা হইতে তাহাদের ধরিয়া আনিয়াছে। সকলে সে কাহিনী সাগ্রহে শুনিতে লাগিল। মঞ্জুও সোল্লাসে তাহার গ্রেপ্তারের বিবরণ বলিতে লাগিল অমিতকে।

পুলিশ শেষ রাত্রিতে আসিয়া হানা দেয়। 'ছাত্রী সমিতি'র আপিস ছিল সেই বাড়িতে। বাড়িটাতে কন্‌ফারেন্‌সের সময় বিদেশিনী প্রতিনিধিরাও ছিলেন দুই-একজন—নিজেদের বৈঠক আলোচনাও হইত। মঞ্জু খুশি মনে বলিতেছে: আপিসের কাগজপত্র নিয়ে পুলিশ অস্থির। এ-কাগজ নিয়ে ওরা দেখতে বসে ত, আমরা তখনি ও-কাগজ ফেলি জানালা দিয়ে বাইরে—যেন কত গোপনীয় কাগজ তা। পুলিশও ছুট্, ছুট্ বাইরে। তৎক্ষণে ও-কাগজটাকে ফেলি ছিঁড়ে—যেন কত ভয়ংকর কথাই তাতে ছিল। 'হাঁ, হাঁ,' করে ছুটে আসে ওরা—'রাখুন, রাখুন, রাখুন।'

তারপর শুনি, 'ছিঃ, ছিঃ, কি লজ্জার কথা! আপনারা লেডিজ্—একটা ভদ্রতা সম্ভ্রম আছে। আপনারা এ রকম করলে চলে?' সত্যই চলে না।—কিন্তু চলে না কার? ওদের, না আমাদের?

হাসিতে কৌতুকে মঞ্জু বারে বারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—পুলিশকে সে ভারি নাকাল করিয়াছে। অমিত হাস্যমুখে শুনিয়া যাইতেছে, দেখিতেছে তাহার চোখ মুখ অকুণ্ঠিত দেহের স্বচ্ছন্দ উচ্ছাস।...কিন্তু কোন্ জালে তোমাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে মঞ্জু? বুদ্ধিহীন চপলতা? না, দৃষ্টিহীন বিদ্রোহ?—কোন্ জালে?... কোন্ জালে?...

অমিত বলিল: এইভাবে পুলিশের জালে জড়িয়ে পড়লে, মঞ্জু? কিন্তু তুমি রাত্রিতে নিজেদের বাড়িতে ছিলে না কেন?

মঞ্জু এইবার বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইল,—সরল, শান্ত সেই দৃষ্টি।

...পনের বছরের সুরোর দৃষ্টিই যেন...

মঞ্জু তখন বলিয়া চলিয়াছে, তুমিও জানো না নাকি, অমি' মামা? ওঃ! আমি ত ভাবতাম—জেলে থেকেছ, তুমি জানো সব। কিন্তু তুমি দাঙ্গা আর দেশবিভাগ নিয়েই ক্ষেপে গিয়েছ। তোমাকে কি বলতে এসে বাবা একেবারে গুম হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। কংগ্রেসের লোকদেরই উপর তখন বাবার ভরসা। তাঁর ভয় হয়েছে—কমিউনিস্টরা তাঁকে মারবে। তুমি নাকি শাসিয়েছও মারবে বলে। তাই বাবা কংগ্রেসে নাম লিখিয়েছেন; চাঁদা দিচ্ছেন; ভুজঙ্গ সেনের সঙ্গে গিয়ে পরামর্শ করছেন;—কমিউনিস্টদের শায়েস্তা করতে হলে তাদের ছাড়া আর কে আছে? ও পাড়ায় একটা 'জাতীয় রক্ষীদল' গঠিত হবে। বাবা তাতে টাকা দিতেও রাজী হয়েছেন—আবার হাসিতে ফাটিয়া পড়ে মঞ্জু।

অমিত বুঝিল পশুপতি কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছে।...

এইরূপ কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলে ইহারা। একটা স্বার্থবুদ্ধি ইহাদের থাকে। তাহাকেই ইহারা বলে কাণ্ডজ্ঞান। আর আছে ভীতি। এ অভাগা দেশে আছে ভীতি, রাষ্ট্রভয়, লোকভয়, শাস্ত্রভয়, 'ভূতের ভয়'...আর এখন ত এ স্পেকটার ইজ্ হন্টিং দি ওয়ার্লড্। পশুপতির আর দোষ কি?

একদিন পুলিশের নামে, গোয়েন্দার নামে, 'স্বদেশীর' নামেও সে এমনি কাণ্ডজ্ঞান হারাইত—সুরোর গঞ্জনার তাহাই মূল কারণ। তাহাই কারণ? না, তাহা উপলক্ষ?—ইহাদের সমস্ত জীবনযাত্রাই মধ্যযুগের। একদিকে ছিল সামন্ততন্ত্রী সংসার, মানুষ সেই জাঁতাকলে গুঁড়াইয়া যায়। তাহার সঙ্গে জুটিল সাম্রাজ্যতন্ত্রী যুগের এই কাঙালী বিদায়। আস্তাকুঁড়ের আগাছার মত তাই মাথা তুলিয়া উঠিতেছে এদেশে 'বড়বাবু' আর 'ছোট সাহেবে'র প্রেস্টিজবোধ। ইহাই কলোনির কেরানী জীবন। সহজ সাধারণ বুদ্ধি, সহজ সাধারণ জীবনযাত্রা এখানে থাকিবে কি করিয়া? পশুপতির দোষ কি? পুলিশ, 'কংগ্রেসী' ও 'স্বদেশী', এই তিনে আজ এক হইয়া গিয়াছে। পশুপতি বুদ্ধিমান লোক; কে তাহাকে কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে? আমরা? যাহাদের

কাণ্ডজ্ঞানের প্রমাণ ত এই যে কিছু না করিয়াই লর্ড সিংহ রোডের এই ঘরে আসিয়া পৌঁছিলাম—আগামী দিনের মানব-মহাভিযানের পথে পা বাড়াইতে না-বাড়াইতে পা বন্ধ হইল কি...।

অমিত বলিল, কিন্তু মঞ্জু? কেন তোমাকে নিয়ে এল?—

অমিতের কানে গেল: আপিসে তল্লাসী যখন শেষ হয়, আপিস তালাবন্ধ করবে, তখন বললে 'আপনাকেও একবার যেতে হবে। গাড়ি রয়েছে।'

তাই চলে এলে?

হাঁ, ওরা বললে, 'আধঘন্টার মধ্যে চলে আসবেন আবার।'

এবার হাসিয়া উঠিল অমিত। সেই অভ্যস্ত অনাবশ্যক মিথ্যা। বিশ বৎসর পূর্বেও যাহা, এখনও তাহা। অমিতের নিকটেও, মঞ্জুর নিকটেও—পুলিশের নিয়মে সমান প্রয়োজন।

আধঘন্টার আর কতক্ষণ বাকী এখন মঞ্জু?

আধঘন্টা কি? একঘন্টা হয়ে গিয়েছে।

তাহ'লে ফিরে যাওনি যে?

কেন? থাকিই না—দেখে যাই আপনারা কে-কে এলেন। ততক্ষণ গল্প করি।

তা বেশ। চা-টা খেয়ে এসেছ? আর শাড়ী জামা নিয়ে এসেছ?

বাঃ! তা আনব কেন?

এসেছ যখন, গল্প করো—দু'চার দিন, দু'চার মাস, কিংবা দু'চার বৎসর থেকে যাবে,—বিশেষত যখন নিরাপত্তা আইনটা সবে চালু হয়েছে।

সূর্যনাথ নিকটে আসিয়া বসিল। নিরাপত্তা আইন সম্বন্ধে সে বিশেষজ্ঞ। আইন পড়িয়াছে, প্র্যাকটিসও করিবে, কিংবা হইবে এটর্নি। সূর্য বলিল, তা ত কথা নয়। এ আইন চোরাবাজারীর জন্য, মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছেন। অবশ্য জানি চোরাবাজারীদের কখনো ধরা হবে না। চোরাবাজার যদি বন্ধ হয় তাহলে বড়বাজার বিদ্রোহ করবে, লালবাজারও চটে লাল হবে, লালদীঘিও তখন শুকিয়ে যাবে। তবু এই গবর্নমেন্ট আমাদের বিরুদ্ধে এই আইন প্রয়োগ করবে না—এত শীগ্‌গির।

অমিত হাসিল, বিশ্বাসের জোর আছে দেখছি খুব; এখানে এনেছে কেন আপনাকে-আমাকে? মন্ত্রীমশায়ের নির্বাচনে আমাদের না হলে চলত না, এখন তাই বুঝি আমাদের নিমন্ত্রণ লর্ড সিংহ রোডে? ওঁরা মিষ্টিমুখ করাবেন?—কিন্তু খেয়ে এসেছেন কিছু? সঙ্গে এনেছেন কিছু কাপড়-চোপড়?

আই. বি. অফিসার জিনিসপত্র নিতে নিষেধ করলে, বললে, 'দু'ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসবেন।'

দু'ঘন্টা? তাহলে আপনার ত টাইম এখনো হয়নি। মঞ্জুর অবশ্য টাইম হয়ে গিয়েছে, তার টাইম ছিল আধঘন্টা। তবে সে একটু গল্পসল্প করবে, শীগ্‌গির ফিরে যেতে চায় না। কতদিন গল্প করবে, মঞ্জু? কত বছর?

'বছর!—বিস্ময়েব পবেই মুখে কঠিন হাসি!

সূর্যনাথ হাসিল, বলিল, আইনই ত মাত্র এক বৎসরের, অমিদা'।

কিন্তু কমিউনিজমের আয়ুও কি এদেশে এক বৎসর? তা যদি না হয় তাহলে আইনের আয়ু বাড়াতে বাধবে কেন?

কৌতূহল সত্ত্বেও সকলেরই মুখ একটু গম্ভীর হইল।—আপনার কি মনে হয়, অমি'দা, সত্যিই আমাদের আটকে রাখবে ওবকম?

নইলে এতগুলো লোককে এ সময়ে কি উদ্দেশ্যে মহামান্য পুলিস-মন্ত্রী নিমন্ত্রণ করেছেন এখানে—এই দোলপূর্ণিমার শেষ-রাত্রিতে? চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী পুরনো বন্ধুদের নিয়ে লাটপ্রাসাদে বাঙালী কীর্তন শুনবেন বলে?

আলোচনাটা আগাইয়া চলিল। জমিয়াও উঠিল। অনেকে কাছাকাছি বসিয়া গেল। মঞ্জু ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—শুনিতেছে সূর্যনাথের যুক্তি, বিজয়ের তর্ক, দিলীপের অর্থনৈতিক ভাষ্য। অমিত বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল মঞ্জুর একান্ত নিবিষ্ট মূর্তি, আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়া দেহের সেই সাবলীল ভঙ্গি, বিজয়ের চক্ষুর দিকে তাকাইয়া-থাকা তাহার চোখের সপ্রশংস চাহনি,—হাতের উপরে রাখা সেই সুশ্রী চিবুক, তরুণ সুন্দর মুখের কোমলতা, তাহার উপর চিন্তা ও কল্পনার আলোছায়াব খেলা, ক্ষণে ক্ষণে বুদ্ধি ও কৌতুকের বিদ্যুৎস্ফুরণ ..

সংসারের আঁচ লাগে নাই তাহাব গায়ে, মুখে চোখে, মনেও। ও জানেও না তাহা, জানেও না কেমন করিয়া ওর মা সেই আঁচে জ্বলিয়া গিয়াছেন...মমতায় মন ভরিয়া যায়...মঞ্জু এখনো সুখী, এখনো বালিকা। পৃথিবীর কোনো কণ্টক রেখা এখনো মঞ্জুর গায়ে লাগে নাই। এই দুঃসহ কালেব কোনো তাপ এখনো ওর দেহে মনে ছাপ আঁকিতে পারে নাই—অথচ আঁকিবে নিশ্চয়, যেমন আঁকিয়াছে তাহা ইতিমধ্যে অনুর মুখে।...অমিত না ভাবিয়া পারে না।

অনু বুদ্ধিমতী, আত্মসচেতনা বোন অমিতের। মাতৃহীন সংসারে সে কৈশোরে লইয়াছিল জরাগ্রস্ত পিতার দায়িত্ব,—দায়িত্ব গ্রহণে সে অভ্যস্তা। পিতৃহীন জীবনে সে-ই আবার অমিতের আশ্রয়, তাহাকে ঘিবিয়াই অমিতের নিজ জীবন। জীবন-সংগ্রামে অনু মূল্য দিতে জানে—দ্বন্দ্বলেশহীন চিত্তে। সে মূল্য দিবে বলিয়াই যে এই বিপ্লবের যুগে অগ্রসব হইয়া আসিয়াছে বিপ্লবের পথে। বিদ্রোহিণীর মত আত্ম-দর্পে নয়, ব্যর্থতার তাড়নায় নয়, আসিয়াছে জীবনকে জানিয়া, বুঝিয়া। সেই অনুরও কর্মব্যস্ত মুখে আসিয়াছে শীর্ণতা, চোখে তীব্রতা, কণ্ঠে ক্লান্তি-জনিত দুর্বলতা। অমিত দীর্ঘ নিশ্বাস চাপিয়া যায়—শোধ গ্রহণ করিবেই ত দেহ,—এত পরিশ্রম, এত অবিশ্রান্ত ছুটাছুটি, এত রৌদ্রবৃষ্টির অতি-প্রাচুর্য—ইহার মূল্য দিতে হইবে না অনুকে? নিয়মিত কর্মের, নিয়মিত পরিশ্রমের, নিয়মিত জীবন-পদ্ধতির মধ্যে যে-দেহ যে-মন আপনার লালিত্যে, লাবণ্যে আপনাকে পোষণ করিতে পারিত, এই পথে—এই দুঃসাধ্য কর্মে, বিপ্লবের নানামুখী স্রোতে—তাহার স্বস্তি, মনের দেহের স্বাস্থ্য দেখিতে না দেখিতে নিঃশেষ হইয়া যায়। অনুরও তাহা শেষ হইতেছে—মঞ্জুরও শেষ হইবে। মঞ্জুর এই

স্বচ্ছন্দপালিত দেহের সৌকুমার্য কোথায় মিশাইয়া যাইবে। কর্ম-ব্যস্ততা—রৌদ্র, জল, বৃষ্টি, ছুটাছুটি, চেঁচামেচি এই কোমল মুখশ্রী হরণ করিবে; এই উজ্জ্বল ললাটে ক্রমে শ্রান্তি-ছায়া আঁকিয়া দিবে; তারপর উৎফুল্ল অধরের কোণে, চোখের তলে, মুখের উপরে অকালে কালো রেখা ফুটিয়া উঠিবে; আর এই ঝরনার মত উচ্ছল কলকণ্ঠ—পথে, সভায় মিছিলে চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া হইয়া উঠিবে তীব্র, কর্কশ, কঠিন।...এই পথে এই তোমার নিয়তি, মঞ্জু,—জানো কি তাহা? তোমার শীর্ণ মুখচ্ছবি, কর্মক্লান্ত দেহ, তোমার বিমলিন লাবণ্য তখন আর মানুষের দৃষ্টিকে এমন করিয়া বিমুগ্ধ করিবে না। নারী হইয়া, তরুণী হইয়া, কে সহ্য করিতে পারে পুরুষের দৃষ্টির সেই অবজ্ঞা? পারিবে তুমি মঞ্জু?...তন্বী তরুণী এখনো মঞ্জু। সে চলিয়া গেলে পৃথিবীর মানুষ তাহাকে আজ মুগ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া দেখে; তাহার সমস্ত অঙ্গ দিয়া মঞ্জু তাহা জানে; অচেতন মন দিয়াও সে অনুভব করে সেই বিমুগ্ধ দৃষ্টির অভিষেক। অনুভব করে, এবং তৃপ্তি পায়। বিরক্তও হয় কখনো কখনো। কিন্তু পুলকিত হয়, তৃপ্তি পায়, তাহাতে ভুল নাই। তাহার এই দেহ-মন প্রাণ-লীলায় চঞ্চল, যৌবনের নতুন ঐশ্বর্যে উচ্ছ্বসিত, হিল্লোলিত।... সহ্য করিতে পারিবে কি তুমি, মঞ্জু পুরুষ-চক্ষের অবজ্ঞা, বক্র হাস্য, তোমার রূপ-যৌবনের প্রতি উপহাস? না মঞ্জু, এই নিয়তি তুমি কল্পনাও করিতে পার না। তোমার অসহ্য তাহা। সুন্দর স্বপ্নময় দিনগুলি সবে তোমার জীবনে আসিতেছে—নতুন যৌবনের মাদকতাময় এই দিনগুলি, তাহাতে ভাসিয়া চলিতেছিলে তুমি। সুরোর মত সংসারের কারাগারে তুমি ত নিষ্পিষ্ট হও নাই—দুর্যোগের দিনে হও নাই তেমনি স্থৈর্যে বুদ্ধিতে সংহত। অনেক সহজ, অনেক স্বচ্ছন্দ দিনরাত জুটিয়াছে তোমার জীবনে। ইস্কুলে, কলেজে, বন্ধুগোষ্ঠীতে, জনাকীর্ণ সভায়, পথের ভিড়ে তোমার স্বতোচ্ছ্বসিত জীবন পূর্বাপর আনন্দে বহমান। দায়িত্বের কোনো ভার তোমার মনে ঠাঁই পায় নাই। না জানিয়া, না বুঝিয়া পথ চলিয়াছ; আর না জানিয়া, না বুঝিয়া পথের মিছিল হইতে এবার চলিয়া আসিয়াছ জেলখানার অন্ধগলিতে। কী সে অবরুদ্ধ বন্দিনী-জীবন—জানোই না, ভাবিতেও পার না।...প্রাচীরের মধ্যেও প্রাচীর, ফটকের ভিতরেও ফটক, জেনানা ফটকের অপ্রশস্ত আঙিনার অপরিচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠ। দিনের পর দিন যায়, রাত্রি আসে, অন্ধ ঘরে অন্ধকার ঘনাইয়া উঠে। আবার দিন, আবার রাত্রি। আর কী সেই দিন, কী সেই রাত্রি। অথচ প্রতি দিনে বাড়িয়া যাইবে তোমার বয়স। বসিয়া বসিয়া সময় কাটে না, অথচ জীবন ফুরায়। যৌবন ম্লান হয়, প্রাণ মাথা ঠোকে। অবরুদ্ধ নিশ্চল দিনরাত্রি পাষাণের মত নিথর হইয়া ওঠে। ক্লান্তি পুঞ্জিত হইয়া ওঠে কখন চক্ষে, আর তার পরে বক্ষের তলায়। যৌবনের কামনা ও কল্পনা দেয়ালে দেয়ালে পাখা ঠুকিয়া ঠুকিয়া শেষে মেঝেয় লুটাইয়া পড়িবে...তোমার কৌতুক চঞ্চল ঋজু দৃষ্টি ততক্ষণে খরধার হইয়া উঠিতেছে। তির্যক হইতেছে, বক্র হইতেছে, শাণিত ছুরিকার মত তাহা তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। তাহা ব্যর্থতার আক্রোশে পৃথিবীকে টুকরা টুকরা করিতে চাহিবে। অন্য-কাহাকেও আঘাত

করিতে না পারিলে, নিজেকেই শতবার শত স্থলে বিদ্ধ করিবে—রক্তাক্ত করিবে, ছিন্নভিন্ন করিবে।...না মঞ্জু, এই নিয়তি তুমি ভাবিতেও পার না, কল্পনাও করো নাই।...

মঞ্জু!—অমিত ডাকিল।—কণ্ঠ যেন ব্যথায় ভার।

গল্পের মধ্যে চমক ভাঙিল মঞ্জুর। গল্প ছাড়িয়া সাগ্রহে অমিতের নিকটে আসিয়া সে বসিল।

কি, অমি' মামা?

তুমি এ পথে আসতে গেলে কেন, মঞ্জু?—পরিহাসের কণ্ঠ নয়।

হতবুদ্ধি হইয়া গেল মঞ্জু। সে কি এতই অযোগ্য অমিত মামার চক্ষে, অমিত মামার বিচারে?

'বড় জড়িয়ে পড়লে যে—অমিত বুঝাইয়া বলিতে গেল।

মঞ্জু প্রথম অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল, পরে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল : ওঃ! তাই।

না, না, সত্যই ভাবা উচিত ছিল তোমার।

ভাবিনি, কি করে বুঝলে?—কিন্তু ভাববারই বা কি অত?

ভাববার নয়? অমিত বুঝিল, সত্যই মঞ্জু এখনো গুরুত্ব বোঝে না তাহার কাজের।

মঞ্জু কিন্তু স্বচ্ছন্দে বলিল, না। তবে কেন এলাম এ-সবে শুনবে?—তোমার জন্য।

আমার জন্য?—এরূপ আক্রমণের জন্য অমিতও প্রস্তুত ছিল না।

হাঁ। মা বরাবর বলতেন দুটি কথা—'আমাদের মেয়েদের দিয়ে কিছু হবে না।' আর শুনতাম—'তোমরা ছেলেরা নাকি মস্ত বড় কাজ করছ।' ঠিক করেছিলাম—মাকে দেখাব সে কাজ মেয়েরাও করতে পারে।...

অমিত যেন আবার শুনিতে পাইতেছে বিশ বৎসর পূর্বেকার খেদ 'আমরা ত দেশের কোনো কাজেই লাগলাম না।' আর শুনিতে পাইতেছে কি বিশ বৎসর পরে উহার উত্তরও—'সে কাজ মেয়েরাও করতে পারে'?

মঞ্জু হাসিয়া বলিল, কি ভাবছ, অমি মামা? মায়ের দ্বিতীয় কথাটা শুনবে? শোনো তবে। মা বলতেন, 'বিয়ে যখন করবে, করবে তুমি। কিন্তু আমি তোমাকে কখনো বিয়ে করতে বলব না, মঞ্জু।'

চমকিয়া উঠিল এবার অমিত।

...না, না। সংসার ছলনা করিতে পারে না—সহজ মানুষকে, প্রাণবান মানুষকে ঠকাইতে পারে না পৃথিবী। এই ত একটা জীবনের অভিজ্ঞতা দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে সুরোর এক অতি-সহজ উক্তিতে। মাত্র এই একটি কথার মধ্য দিয়া সুরো তাঁহার একমাত্র সন্তানের কাছে উৎসারিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে তাহার প্রবঞ্চিত জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা। সমস্ত মধ্যযুগের আদর্শের প্রতি,—পরিবারের প্রতি, পাতিব্রত্য ও গৃহধর্মের প্রতি—এই ত জীবন্ত ধিক্কার সুরোর—এবং সুরোর মত আরও অনেক জীবনের। বোঝে, কিন্তু কথায় বুঝাইতে জানে না। ব্যর্থতায়-ভরা যুগে ব্যর্থতায়-ভরা তাহাদের পারিবারিক বন্ধন ও জীবন-যাত্রা।...

কথা বলছ না যে, অমিত মামা ?

অমিত বলিল : আমি যে ও কথা মানি না, মঞ্জু।

সত্যি ? তবে বিয়েটাকে অমন তোমরা বাঘের মত মনে করেছ কেন ?

কে বললে আমি তা মনে করি ?

করো না ? ও! তা হ'লে পলিটিক্স্ করলে বিয়ে করতে নেই, বুঝি ?

অমিত হাসিয়া ফেলিল। বলিল, একদিন তা'ই ছিল, মঞ্জু। কিন্তু আজ আর-এক দিন। লোকে বলে, আজ আমরা পলিটিক্সই করি বিয়ে করার জন্য।

কিন্তু, তোমার মত বিয়ে না পেলে।

মনের দুঃখে বনে চলে যাই---অর্থাৎ আসি জেলে। তাই ত এত বলছি---তুমি এখানে এলে কেন, মঞ্জু ?

বিয়ে পাই নি বলে,---বলিয়া হাসিতে অমিতের সামনে প্রায় লুটাইয়া পড়ে মঞ্জু।

না, বড় ফাজিল, বেয়াড়া হইয়াছে সুরোর মেয়েটা। তথাপি অমিত রাগ করিতে পারিল না, হাসিল।

কোলাহল আবার বাড়িয়া গেল—কাহারা আসিল ? সাংবাদিক বন্ধুবা বুঝি।

তিন

এই শেষ সংখ্যা সংবাদপত্র :—সকলে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে তাহার উপব। কাগজের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছে। প্রেস-শুদ্ধ আপিস তালাবন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।---আর এই কাগজ বাহির হইবে না---জনতার প্রতিবাদ বন্ধ হইল।

তপনকে পাশে বসাইল অমিত। সে ইহাদের মধ্যে আজ কেমন করিয়া আসিল ?

ফিলজফিতে এম. এ. পড়িতে গিয়াছিল তপন। অধ্যাপকদের প্রিয় ছাত্র সে। নিজেও পণ্ডিত বংশের ছেলে—অধ্যাপক ব্রাহ্মণের বংশ। সেদিনও বাড়িতে ছিল চতুষ্পাঠী, পিতা অধ্যাপনা করিতেন। ছাত্র ছিল; অথচ ব্রহ্মোত্র সামান্য, বৃত্তি ও সাহায্য সামান্যতর, কি করিয়া চলিবে চতুষ্পাঠী ? কিন্তু মহাপ্রভু নিকটের শ্রীপাট হইতে গঙ্গা পার হইয়াছিলেন। তখনকার দিনে এখানে তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছিলেন এই বংশের পূর্বপুরুষ—পণ্ডিত ও ভক্ত। তাহার পর হইতে অবিচ্ছিন্ন ধারায় সে ঐতিহ্য তাঁহারা বহিয়া চলিয়াছেন। দারিদ্র্যে অভাবে চতুষ্পাঠী এদিনে চলে না ; তবু একেবারে তুলিয়া দিতে পারেন নাই গোলোক ভট্টাচার্য। আঁকড়াইয়া পড়িয়া ছিলেন। কিন্তু মনে মনে পরাজয়ও স্বীকার করিতেছিলেন—বাহিরে না হউক, গৃহে। তাই তপনকে ইংরাজি পড়িতে দেন—গৃহিণী যে কিছুতেই আর ছেলেকেও এই দারিদ্র্যভার গ্রহণ করিতে দিবেন না। তারপর ক্লাশে ক্লাশে পারিতোষিক ও বৃত্তিলাভ করিয়া চলিল তপন। খরধার বুদ্ধির সঙ্গে দীপ্ত

অভিমান :—ইংরেজি বিদ্যা, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান কোনো কিছুরই নিকট আত্ম-বিক্রয় করিবে না তপন। বিচার করিয়া বুঝিবে কোথায় কাহার শ্রেষ্ঠতা। পড়িতে গেল সায়ন্স। ফিজিক্সে ফার্স্ট ক্লাস পাইয়া সে গবেষণায় লাগিল। জীন্স, এডিংটনের বাক্‌-বৈদগ্ধে, তখন লেবরেটরির অধ্যাপকেরাও বিমুগ্ধ। তপনও পরিতৃপ্ত চিত্তে অগ্রসর হইয়া গেল গণিতের পথে। বিশ্ব ত একটি আঁকের সুবৃহৎ সমীকরণ। নিয়মনীতি, বিজ্ঞানের বিধি-বিধান সবই অনিশ্চিত, সবই রহস্য; চরাচর তাবৎ বস্তু শুধুই আপেক্ষিক। জানিয়া পরিতৃপ্ত হইলেও কিন্তু কেমন বাধা পাইল তপন এই সবে। এত ঘটা করিয়া এই কথাটা বলিবার মত কি আছে জীন্স্ ও এডিংটনের? যাহা তাঁহাদের বিবেচনায় গভীর চিন্তার ফল তাহা ত দর্শনের প্রায় প্রাথমিক পাঠের বিদ্যা। দর্শন পড়াই তবে প্রয়োজন। ভারতীয় দর্শন নয়, ইউরোপীয় দর্শনই পড়িতে হইবে তপনকে। পর বৎসরে বি. এ'র ছাড়পত্র লইয়া ফিলজফির ক্লাশে গিয়া উদিত হইল তপন।

বন্ধুরা বলিল, কি পাগলামোতে পেয়েছে তোমাকে? অমিতও তপনকে বুঝাইতে গেল। তপন উত্তরে বলিয়াছে, শীঘ্র গিয়েছেন কোনো দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে? শত দুই সম্ভবত প্রোফেসর আমাদের। দেখেই বুঝা যায় দেশের অধ্যাপক সমাজের তাঁরা ইম্পীরিয়াল সার্ভিস। অন্য কলেজের অধ্যাপকদের তুলনায় খান ভালো, পরেন ভালো; এবং আরো বেশি ভালো কি করে খাবেন, কি করে আরো বেশি পরবেন তা ছাড়া অন্য চিন্তা নেই;—ইকোনমিক ইন্টারপ্রিটাশেন অব্‌ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রোফেসারশিপ্‌ শুনবেন? পরীক্ষার দক্ষিণা ও পাঠ্য-পুস্তকের মুনাফা, এই দুই প্রকাণ্ড ইনটেলেকচুয়াল প্রয়াসের ভিতর দিয়ে ক্লাশের পড়ানো কাজটা কোনো রকমে পার করে দিয়ে তাঁরা বসেন—কোষ্ঠীবিচারে, জমির দর হিসাবে; শেষে হিটলার-হিন্দু মহাসভার মাহাত্ম্য-কীর্তনে। দর্শনের অধ্যাপকদের কথা বলছেন? বিদ্যার অভাব নেই কারও। যাঁর বিদ্যার অভাব, তাঁরও অন্তত বুদ্ধির অভাব নেই। আর কী চমৎকার ইংরেজীতে অধিকার সবার সর্বপল্লীর! ফার্স্ট ক্লাশ বক্তা, সেকেণ্ড ক্লাশ লেখক, থার্ড ক্লাশ অধ্যাপক, আর ফোর্থ ক্লাশ দার্শনিক। তাঁর প্রাঞ্জল ইংরেজি শুনবার জন্য নিশ্চয় টিকেট কিনেও তাঁর ক্লাসে বসা চলে। কিন্তু এক বৎসরের বেশি কত দিন তা শুনতে ভালো লাগবে? বিশেষ করে আমরা টোলে চতুষ্পাঠীতে মানুষ হয়েছি। চার শ বৎসর ধরে ভাগবত আর ষড়্‌দর্শনের চর্চায় পুরুষানুক্রমে আমাদের মমজ গঠিত হয়ে উঠেছে। বেশ বুঝতাম, ভারতীয় দর্শনের এ ব্যাখ্যা বিলাতে চলতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে তা ফাঁকা। গভীরও নয়, সত্যও নয়। আসলে এর উদ্দেশ্যও হচ্ছে—বিলাতের মনের মত করে আমাদের মনের কথাকে তুলে ধরা। তাতে অন্যায় কি, বলছেন? অন্যায় এই যে—যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁদের কথা এ ব্যাখ্যায় নেই; আমাদের মনের কথাও তাতে নেই। অন্যায় তাই এই যে, তা সত্যই গঙ্গার জল নয়, টালা ট্যাঙ্কের জল।

এ যুগের উপযোগী গঙ্গার জল ত তাই।

'এ যুগের উপযোগী' করে যদি সে যুগের দর্শনকে না নিলেই নয়, তা হলে সে যুগের দর্শনকে নিয়ে টানাটানি করা কেন? এ যুগের দর্শনকেই বরং সরাসরি গ্রহণ করব। আর আগামী যুগ আসতেই তা হলে এ যুগের দর্শনকেও বিদায় দোব। কারণ যুগটাই তা হলে বড় কথা।

কিন্তু কী এই যুগ?—তপন যে তাহাই বুঝিতে পারে না।

পাণ্ডিত্যের ধূম্রজালে দশদিক সমাচ্ছন্ন করিয়া অধ্যাপক গুপ্তশাস্ত্রী ক্লাশের অধ্যাপনা শেষ করিয়া উঠিয়া যান। ছাত্ররা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে—কি শুনিল, কি বুঝিল তাহারা? সত্য, অনেক কথা শুনিয়াছে। এবং আরও সত্য কথা প্রত্যেকে স্বীকার করে নিজেদের মধ্যে—কিছুই বোঝে নাই। বুঝাইয়া বলিতে জানেন না যে অধ্যাপক; তাঁহার বাক্-বৈদগ্ধ নাই। পাণ্ডিত্যের মেঘ-মণ্ডিত শিখর হইতে তিনি নিচে নামিতে জানেন না। কিন্তু তপন বলে, শুধু শিখর কেন, ভিত্তিটাও মেঘ-মণ্ডিত —পাণ্ডিত্যের ধোঁয়ায়। পৃথিবীর মাটি-জলের কোনো বালাই নাই তাতে। একবার সেই কুয়াশার প্রাসাদ থেকে যেই পা দেন এযুগের কোনো তত্ত্ববিচারে, এ যুগের দর্শন বিশ্লেষণে, বিদ্যার বেলুন অমনি একেবারে ফাটিয়া যায়।

একজন অজ্ঞাত-পরিচয় সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র গুপ্তশাস্ত্রীয় 'আধুনিক জড়বাদের' প্রবন্ধটাকে তীক্ষ্ণ শরাঘাতে ফুটা করিয়া দিয়াছে সেবারকার শারদীয় সংখ্যার 'দেবালয়ে'। পড়িয়া গুপ্ত-শাস্ত্রী রাগিয়া খুন হইতেছেন। তপনও ভাবে কেন এমন হয়? একটা সাধারণ বাস্তব সত্যের আলোচনায় কেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এত বড় অধ্যাপকেরা এমন হাস্যকর কাণ্ডজ্ঞান হীনতার পরিচয় দেন?

তপন দেখিতেছিল—এদেশের দর্শনের অর্থ আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান। সেই আত্মতত্ত্ব আশ্চর্য সরলতার সহিত জগৎকে বাতিল করিয়া লইত। আর জগৎ বাতিল হইল বলিয়া ধরিয়া লইয়া অতি নিষ্ঠার সহিত তারপর যুক্তি, বিচার, পাণ্ডিত্য ও মহদভিপ্রায়ের জাল রচনা করিত।—উহার সহিত জগতের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, জীবনের অভিজ্ঞতায় সেই তত্ত্ব টিকিল কিনা, এই প্রশ্ন তোলাও তাঁহাদের নিষ্প্রয়োজন। তাঁহাদের গৃহীত প্রতিজ্ঞার সূত্র ধরিয়া তাঁহারা যুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদের সীমাবদ্ধ জগৎ-দৃষ্টির মধ্যে প্রমাণ অনুমান আপ্তবচনের চকমকি ঠুকিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইয়াছিলেন। মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শনের মতই এই ভারতীয় দর্শনও ধর্মের দোহাই ও স্কোলাস্টিসিজম্। কিন্তু জগৎ তাহাতে এই দেশেও মিথ্যা হয় নাই, ইউরোপেও প্রত্যারিত হয় নাই। আজ বরং এই চার-পাঁচ শতাব্দীর বিজ্ঞান আসিয়া জগৎ ও জীবনের জটিলতর সত্যরূপ এই দেশের মানুষের চক্ষের সম্মুখেও তুলিয়া ধরিয়াছে। সেই শূন্যচারী ভারতীয় দর্শনের ভিত্তিই আর তাই টিঁকিয়া নাই। যে যুগ, যে জগৎ-বোধ অবলম্বন করিয়া এই সৌধনির্মাণ চলিয়াছিল, সে জগৎ-বোধই এই বিজ্ঞানের যুগে অচল। তাই যতক্ষণ এই প্রাচীনবাদী দার্শনিকেরা আপনাদের পুরাতন বনিয়াদ আশ্রয় করিয়া পুরাতন পরিধির মধ্যে বিচরণ করিতে পারেন, ততক্ষণই তাঁহারা পাণ্ডিত্যে পরিতৃপ্ত। যতক্ষণ বিজ্ঞানের তথ্য আনিয়া

দর্শনের তত্ত্ব স্থির করিতে না হয়, ততক্ষণই ভারতীয় দর্শন অপরাজেয়। কিন্তু বিজ্ঞানকে না মানিয়া এ যুগে ভূত বা ভগবান কিছুই তৈয়ারী করা যায় না। তাহাই বুঝিতেছেন এডিংটন, জীনস্ ও অলিভার লজ।—আর তাই যখন বিজ্ঞান-নিষ্ঠ এযুগে দার্শনিক বিচারের ক্ষেত্রে ভারতীয় এই দার্শনিক-অধ্যাপকদের ডাক পড়ে তখন মহা-মহা-অধ্যাপকেরা একেবারে হতবুদ্ধি দিশাহারা। 'আধুনিক জড়বাদের' কথা তুলিতেই এখন গুপ্তশাস্ত্রী মনে করেন, ছাত্ররা তাঁহাকে উপহাস করিতেছে। কিন্তু তপন তর্ক করে—যুগকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই, দর্শন শুধু আত্মচিন্তা নয়। দর্শন আজ বিজ্ঞানের ভিত্তিতে জগৎ-বিচার,—জীবন-দর্শন, জীবন-রচনা।

কোথায় এই যুগের সেই দর্শন?—তপন খুঁজিতে থাকে।

টোলের অধ্যাপক পণ্ডিতদের কথা তপন বুঝিতে পারে। সে আপন পরিবারে তাহার পিতাকে দেখিয়াছে। অবশ্য উপায় নাই, তাঁহাকেও মানিতে হইতেছে নৈহাটি-ভাটপাড়ার কলকে, উহার মজুর ও সাহেবদের। তাঁহাদের অধ্যাপক-পাড়ার সীমানাতেই আজ জুয়ার আর মদের আড্ডা। ন্যায়ের তর্ক অপেক্ষা মাতাল মজুরের হল্লায় তাহা এখন মুখরিত।

ভাঙিয়া গিয়াছে তাঁহাদেরও অন্তরের বিশ্বাস। যাইবেই ত? ভাসিয়া গিয়াছে কবে তাঁহাদের সেই যুগ, সেই জীবন-বিন্যাস, গৃহদেবতাকে কেন্দ্র করিয়া সেই গৃহ রচনা,—শান্ত সদাচার পূজা নিয়ম, সম্মানিত অনুগত লইয়া সেই সমাজপালন। রেল বসিল, তার আসিল, ডাক চলিল; কল-কারখানার চাপে পল্লী-শ্রী পরিণত হইয়াছে ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার কুশ্রীতায়। মজুর, মালিক, মাড়োয়ারী, কাবুলী, আর সর্বোপরি ইংরেজ ছাঁকিয়া ধরিয়াছে শ্রীপাট খড়দহের নিকটস্থ এই পল্লীপ্রান্তকে। ইংরেজের চাকরি, ইংরেজের শিক্ষা, তাহার শাসন, তাহার আদর্শ—ইহার মধ্যে তাঁহাদের ভাটপাড়া-নবদ্বীপের সেই সমাজ আর কতটা টিঁকিয়া থাকিবে। সেই গৃহ আর কি করিয়া রহিবে দৈন্যের মধ্যেও শ্রীময়, সম্মানিত? গোলোক ভট্টাচার্য তপনকে ইংরেজি পড়িতে দিয়াছিলেন পত্নীর তাড়নায়। ভাস্করও পাশ করিয়া বিজ্ঞান পড়িতে চলিল। অংশুমানই বা কেন সংস্কৃত পড়িতে চাহিবে? গোলোক ভট্টাচার্যই বা আর কি করিতে পারেন? আত্মরক্ষায় যে সমাজ আপনাকে সাতশত বৎসর ধরিয়া গুটাইয়া লইতে শিক্ষা দিয়াছে, সে সমাজেরই অভ্যস্ত শিক্ষায় আরও আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া লইতেছেন এবার তপনের পিতা। জীর্ণ গৃহের দৈন্যের মধ্যে তাঁহার শেষ আশ্রয় নিজের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা, আচরণ, কর্তব্যনিষ্ঠা, আত্মমর্যাদাবোধ। লোভকে অস্বীকার করিবার সদাজাগ্রত চেষ্টা—তবু অস্বীকার করিতে পারেন কই? তপনের আয়, তপনের উন্নতির দিকে তাঁহার সংসারের সকলে চাহিয়া আছে।—তিনিই কি নাই? কিন্তু তবু তিনি অস্বীকারও করিতে চাহেন আবার।—না, বিলাতী বণিকের বেতন লইয়া না করিল তপন দাসত্ব। বেতন যদি লইতেই হয় অধ্যাপনাই তপন করুক। গোলোক ভট্টাচার্য বাঁচিয়া থাকিতে অন্তত তাঁহার পুত্রেরা যেন এইটুকু ঐতিহ্যও অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাইতে পারে। তপন বোঝে তাহার পিতার আপনার সহিত

আপনার এই আপোস-রক্ষা। বোঝে ইহার ভিতরকার দুর্বলতা; বোঝে ইহার ভিতরকার সত্যপ্রিয়তা, আর বোঝে ইহার পিছনকার করুণ বেদনাটুকুও। কিন্তু সে বুঝিতে পারে না,—ইংরেজি-জানা "ভারতীয় বিদ্যার" অধ্যাপকদের এই বাগাড়ম্বর, এই দম্ভ, আর এই প্রতারণা। জীবনে কোনো স্বার্থকেই, কোনো সুবিধাকেই ইঁহারা ত্যাগ করিতে রাজী নন। ভারতের প্রাচীন আচার নিয়ম, কোনো কিছুতেই ইঁহাদের আস্থাও নাই। জগৎকে তাঁহারা দশ জনের মতই মানেন, বেশ স্থূলভাবেই মানেন,—হয়ত বা দশ জনের অপেক্ষাও একটু বেশি করিয়াই স্থূলভাবে ভোগ করেন। কোনো উদ্বেগ আগ্রহও নাই ;জীবনে এই 'জড়বাদগ্রস্ত' সভ্যতার বিরুদ্ধে মুখামুখি দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিবার—কোন সত্যেরই সহিত মুখামুখি দাঁড়াইবার মত নাই সাহস বা সংকল্প। সত্য ইঁহাদের নিকট স্বার্থ। তথাপি ইঁহারা অতি গম্ভীর কথায় ভারতীয় ত্যাগাদর্শের, তাহার দর্শনের পশরা সাজাইয়া বসেন। প্যারিস হইতে হনুলুলু পর্যন্ত অধ্যাত্মবাদের মুষ্টিযোগ ফেরি করিয়া ফিরেন; উদ্দেশ্য—সাহেবদের প্রশংসায় ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার পথটিকে মসৃণ প্রশস্ত করিয়া তুলিতে হইবে।—'হাক্স্টার্স্।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলের সীমারেখায় ঘুরিতে ঘুরিতে তপন ক্ষেপিয়া উঠে। এমন স্থূলচরিত্র, বিনয়-বিবেক বর্জিত, আত্মসন্তুষ্ট মানুষ বুঝি এ দেশের আই-সি-এস্‌রাও নয়। তাহাদেরও স্থূলতা এমনিতর, কিন্তু এমনিতর ক্ষুদ্র ঈর্ষা ও-লোভ বোধ হয় তাহাদের মধ্যেও নাই। 'হাক্স্টার্স্'!

অমিত শুনিয়া হাসিয়াছে!—অত রাগ করো কেন? অধ্যাপক বলেই কি তাঁদের অপরাধ? তাঁরা অন্যদের থেকে কেন স্বতন্ত্র হবেন? তাঁদের সহপাঠী, স্বজন, বন্ধু, স্বশ্রেণীর লোকদের জীবন, আদর্শ কেন এই অধ্যাপক বেচারীদের গ্রহণ করা চলবে না, বলো? তাঁরা অন্য কিছু না-পেয়ে ছাত্র-পড়ানোর ব্যবসা নিয়েছেন বলে?

ব্যবসা?

হ্যাঁ, অধ্যাপনাও ব্যবসাই। যুগটাই ব্যবসায়ীর। বৃত্তি বলিতে চাও বলো, কিন্তু সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম পর্যন্ত মার্কেট-নিয়মে চলে।

তপন অত না জানিলেও বোঝে, যুগকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই; তাহার পিতার মতই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি অধ্যাপক উহার প্রমাণ।

কিন্তু কী এই যুগ যাহাকে অস্বীকার করা যায় না? কী সেই যুগ যাহা আবার আপনা হইতেই এইরূপে অস্বীকৃত হইয়া যাইতেছে? বিজ্ঞানের ছাত্র তপন স্থির করে—বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানের আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রসারই উহার কারণ। হাঁ, এই যুগ বিজ্ঞানের যুগ,—ইহাই এই যুগের পরিচয়। কিন্তু তাহা হইলে এই যুগেই বা কেন এই পাশ্চাত্য জাতির বৈজ্ঞানিকদের মনে এমন সংশয় জাগিল? তাঁহারাই ত আজ চীৎকার করিতেছেন—'তফাৎ যাও, তফাৎ রহ, সব ঝুটা হ্যায়?' বৈজ্ঞানিকদল কেন রহস্যবাদী হইলেন? বস্তুবাদীরা অ-বাস্তবের সন্ধানী হইলেন?—বের্গস্ঁ প্রাণ-বিজ্ঞানকে প্রাণ-রহস্যের নামে যুক্তিপ্রবণতার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছেন, তাহাতে

তপন বিস্মিত হয় না। কারণ, বের্গসঁ আসলে বৈজ্ঞানিক নন। কিন্তু বারট্রাণ্ড র‍্যাসেলের সংশয়বাদ কেন হইয়া উঠিল বিজ্ঞানের প্রতি সংশয়বাদ? কেন হোয়াইট-হেডের গাণিতিক মনীষা ক্রিয়া-চঞ্চল বহির্জগৎকে গ্রহণ করিতে গিয়াও ফিরিয়া আসিয়া আন্তরিন্দ্রিয়ের আশ্রয় লয়? এই বৈজ্ঞানিক যুগের মধ্যখানে কেন এত দ্বন্দ্ব, কেন এই সংশয়? 'যুগ-সন্ধিক্ষণ' আজ, এই কারণে কি? কিন্তু কোন্ যুগের সন্ধিক্ষণ তবে ইহা? বিজ্ঞানের যুগ ত সমুদিত হইয়াছে অনেকদিন, আজ চার শতাব্দী ধরিয়াই। এখন আবার কোন্ যুগের সন্ধিক্ষণ তবে?

অস্পষ্টভাবে এইসব চিন্তা যখন তপনকে অস্থির করিতেছে তখন অমিতের সঙ্গে পরিচয়টা তপনের ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল। আলাপটা এখন জমিল বই-এর দোকানে। ইতিহাসের ছাত্র অমিত। সে জানাইল, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই তপনকে বুঝিতে হইবে ভারতীয় দর্শনের মূল্য ও বিজ্ঞানের কথা।

বিজ্ঞানই ত বাতিল করিয়া দিয়াছে, মধ্যযুগ আর প্রাচীনযুগকে—তপন বলে।

অমিত বলিল, 'বিজ্ঞান বাতিল করেছে' এ কথা অনেকটা সত্য? কিন্তু এই বিজ্ঞানই বা এল কোথা থেকে, তপন?

সেই উত্তর জানা আছে তপনের। সে বিজ্ঞানের ইতিহাস পড়িয়াছে। হাঁ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের গ্রন্থ না পড়ুক, অন্তত বিনয় সরকারের গ্রন্থ দেখিয়াছে। তাই জানে, ভারতবর্ষেও বস্তুবিজ্ঞানের একটা গোড়াপত্তন হইয়াছিল। জানে—মিশরে, ব্যাবিলনে, গ্রীসে, আরবে একদিন বিজ্ঞানের অনুশীলন হইয়াছিল। আরও জানে বিজ্ঞানের নব-অভ্যুদয় ব্রুনো-গ্যালিলিও-বেকনের সঙ্গে, নিউটন হইতে। আসলে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটেনেই বিজ্ঞানের প্রারম্ভ।

অমিত প্রশ্ন তুলিয়া দেয়—কিন্তু কেন অন্য সব দেশে, অন্য সব যুগে বিজ্ঞান জন্ম লইতে-লইতেই বারে বারে মরিল? আর কেন এই অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ইংলণ্ডে তাহার মৃত্যুভয় কাটিয়া গেল? কেন তাহা ইংলণ্ড ছাড়াইয়া দেশে দেশে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিল?

ইহার উত্তরে তপন জানিত পূর্ব পূর্ব যুগে মানুষ জন্মায় নাই,—অর্থাৎ প্রতিভাবান মানুষ জন্মায় নাই। তপনের ধারণা—জ্ঞান-বিজ্ঞান যেন আকাশের বিদ্যুৎ। প্রতিভার মত কনডাক্টার না পাইলে পৃথিবীর মাটিতে নামিয়া আসিতে পারে না। নিউটনের মাথার মধ্য দিয়া অকস্মাৎ ঝিকিমিকি খাইয়া উঠিল সেই বিজ্ঞানের বিদ্যুৎ।

তপন এবার নূতন করিয়া শুনিল কথাগুলি : সমাজব্যবস্থা বিজ্ঞানের উদ্ভব-প্রসার তারস্বরে কেন দাবি করিতেছিল তখন, তাহা কি সে খুঁজিয়া দেখিবে? তপন কি দেখিবে—বিজ্ঞানের সাধনা কি? সোবিয়েত বিজ্ঞানের জয়যাত্রাই বা সুসম্ভব কেন?

অমিতের বই-এর দোকান হইতে বের্নল-ক্রোথরের বই লইয়া সেদিন বাড়ি ফিরিল তপন। তখন যুদ্ধের প্রথম যুগ। বিজ্ঞান কলেজের চারিদিকে ধর্না দিতেছে যুদ্ধরত শাসকেরা : 'ধনং দেহি, খাদ্যং দেহি, অস্ত্রং দেহি, দ্বিষো জহি।' মানুষের মুখে মুখে বিজ্ঞানের আসুরিক বিভীষিকার কথা। একই লোকের মুখে জড়বিদ্যামূলক

বিজ্ঞানের ব্যর্থতার প্রচার, আবার বৈজ্ঞানিকের সামাজিক কর্তব্যেরও অঙ্গীকার। কথার ও কাজের এই ধোঁয়ার জালের প্রতি তপনের যে উপেক্ষা ছিল উহার ঊর্ধ্বে উঠিতে-উঠিতেই এইসবের অর্থও যেন সে বুঝিতে পারিল।

দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ এই যুগে বিজ্ঞান আজও সাবালকত্ব লাভ করে নাই। মুনাফার দাস আজও বিজ্ঞান।—চাই এই মুনাফার শাসনের পরিসমাপ্তি। ইহাই তবে 'যুগ-সন্ধি' —মুনাফার নাগপাশ হইতে বিজ্ঞানের মুক্তি?—আর সঙ্গে-সঙ্গে মুক্তি সংশয়মুক্ত চেতনার ও দ্বিধা—সংকুচিত চিন্তার। মুক্তি মানুষের মনবুদ্ধিচেতনার, মানব আত্মার।

অমিত বলিল, তা'ই—তোমার চক্ষে আর বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে। কিন্তু শিল্পীরা সাহিত্যিকরা,—তাঁরা বলবেন কি?

তাঁদের বলবার কি আছে? দু'হাজার বছর ধরে চাঁদের সুধা, কোকিলের ডাক কিংবা প্রেমের কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে তাঁরা বলছেন। বিজ্ঞান ত অনেকদিন ধরেই তাঁদের কাব্যের সে বনিয়াদ উপড়ে ফেলে দিয়েছে। আর কেন?

আমরা শুনতে চাই বলে, শুনতে চাইব বলে—

অর্থাৎ আপনারা বিজ্ঞানকে মানবেন না?—বিদ্রোহীর স্বরে জিজ্ঞাসা করে অমনি তপন।

ঠিক উল্টো। বিজ্ঞানই হবে তখন কাব্যেরও বনিয়াদ, যেমন দর্শনের আশ্রয় হচ্ছে তা এখনই।

তপন নীরব রহিল। কথাটা ভাল বুঝিল না। কিন্তু আপত্তি করিবার কিছু পাইল না ইহাতে। দ্বন্দ্বটাই এখন প্রশ্ন; এই দ্বন্দ্বের স্বরূপ কি?

শাণিত-বুদ্ধি তপনের সেই জিজ্ঞাসা-উন্মুখ মুখ চোখ অমিত ভুলিতে পারে নাই। অকুতোভয়ে তপন অগ্রসর হইয়া গেল যুক্তির বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া। দ্বন্দ্বের মূলের যখন সন্ধান পাইল তখন একটা স্থির সীমানায় সে পৌঁছিয়াছে। এবার আরও আগাইয়া চলিল। যুক্তি দিয়া খণ্ডন করিতে লাগিল সংস্কারকে; ভাবনা দিয়া কাটিতে লাগিল ভাববাদকে; বুদ্ধি—নিছক বুদ্ধি দিয়া—মার্জিত করিতে লাগিল চেতনাকে। মনে মনে সে সুনিশ্চিত—বিজ্ঞানের দিক হইতে সে জগৎকে দেখিয়াছে হলডেনের, লেভির যুক্তি আর বিজ্ঞানের সাহায্যে; সে খুলিয়া ফেলিয়াছে আপনার অ-বৈজ্ঞানিক গ্রন্থিকে; তাহাকে আবার আটকাইবে কে? দর্শনের দিক হইতেও আর তাহাকে কেহ বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না; এঙ্গেলসের লেনিনের বিচার বিশ্লেষণে সে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তত্ত্বকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে। আর তাহাকে কে বাধা দেয়? অমিত তাহার দৃপ্ত আত্মবিশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়াছে, কৌতুকও বোধ করিয়াছে। সস্নেহে ভাবিয়াছে—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশের ছেলেটা সত্যই ক্ষ্যাপা। কিছু করানো যায় না তপনকে দিয়া—পজিটিভ লেখাপড়া কিছু? জীবনে অমিত যাহা করিতে পারে নাই তাহা অপরকে দিয়া করাইবার চেষ্টায় অমিত তখন অনেককেই লিখিবার উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়া বেড়ায়। বৈঠকে, আসরে, তর্কে তপনেরও এখন কুলাইল না। তপন কলম হাতে লইল। সে কলমে যেমন ধার, তেমনি ক্ষিপ্রতা। আরও আগাইয়া

চলিল তপন। দুর্ভিক্ষ মন্বন্তরের মানুষ বাঁচানোর চেষ্টায়ও আগাইয়া গেল অমিতের মতো, তাহাদের সঙ্গে। আর আগাইয়া গেল অমিতদের পার্শ্বেই মজুতদারীর বিরুদ্ধে অভিযানে। মুনাফা-শিকার তাহার চোখের সম্মুখেই পরিণত হইয়াছে যে মানুষ শিকারে!

কলেজের চাকরিটা তখন একবার যাইতে যাইতে টিকিয়া গেল। টিকিল, কারণ যুদ্ধের দিন, বিজ্ঞানের অধ্যাপক পাওয়া দুর্ঘট! তাহা ছাড়া কর্তৃপক্ষের ধারণা কমিউনিজম্-এর সপক্ষে লেখা তখন সম্ভবত ব্রিটিশ গবর্নমেন্টেরই মনঃপূত। সরকারের সাহায্যও হয়ত পায় তপন—প্রিন্সিপাল নিজে কথাটা বিশ্বাস না করিলেও কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকদের, এমন কি ছাত্রদেরও তাহা বিশ্বাস করিতে বাধা হইল না। এদিকে এক-আধখানা ছোট বইও তপনের বাহির হইল অমিতদের প্রকাশন আগ্রহে—ভারতীয় দর্শন, বিজ্ঞানের তথ্য ও প্রবন্ধ। ধারাল, তীক্ষ্ণ লিপিকুশলতার জন্য নাম হইল, যুদ্ধের বাজারে বিক্রয়ও হইল বেশ। আরও দুই-একখানা বই-এর পরিকল্পনা করিতেছিল তপন, এমন সময় তপন লেখা ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল।

আবার ক্ষেপিয়া গেল নাকি তপন?

অমিতকে সে বলিল : কোথায় আটকে যাচ্ছিল বার বার। মনে পড়ল শেষে আপনারই কথা প্রথম আলাপের দিনে—'ইন দি বিগিনিং দেয়ার ওয়াজ ডীড। চিন্তায় নয়, কর্মেই জীবন।'

...'চিন্তায় নয়, কর্মেই জীবন'—অনেক দিন অমিতেরও মনে পড়ে নাই এই আবিষ্কার। অমিত চমকিত হইল। শুনিয়া মনে পড়িল অনেক কথা...'চিন্তা নয়, কর্মেই আমাদের জীবন।' জীবন-জিজ্ঞাসা যেদিন তাহাকে আকুলিত করিয়াছিল সেদিন জীবন-জিজ্ঞাসায় সেও উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিল। আপনাকে কিছুতেই শান্তি দেয় নাই, নিঃশ্বাসও সে ফেলিতে পারে নাই। পথ হইতে পথে, বই হইতে বইতে সে খুঁজিয়াছে উত্তর। ক্ষ্যাপার মত খুঁজিয়াছে—দুই হাত দিয়া কেবলই একটার পর একটা যবনিকা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে : 'আবিরাবির্ম এধি'। প্রকাশিত হও, প্রকাশিত হও, হে সত্য, আমার নিকটে প্রকাশিত হও। তারপর অকস্মাৎ উন্মত্ত প্রার্থনা সার্থক হইল কর্মোন্মাদনায়। জীবন-জিজ্ঞাসা ঠেলিয়া লইয়া গেল অমিতকে পিপাসা-নিবৃত্তির দিকে—অকূল সমুদ্রের মধ্যে, মানব-মহাসমুদ্রের তীরে,—এ কালের মানব-সাধনার পরম সমারোহের ক্ষেত্রে। আর অমিত প্রাণ ভরিয়া—সমস্ত প্রাণ ভরিয়া বলিয়া উঠিল : 'শোনো, শোনো, অমৃতের পুত্ররা, তোমরা যাহার ধ্যান করিতেছ, তাহাকে আমি জানিয়াছি।—না, না, শুধু জানি নাই—আমি তাহাকে পাইয়াছি—শত সহস্রের মধ্যখানে। সমবেত জীবনের স্রোতে, জীবনে জীবন ঢালিয়া।' আর সে দিন মহদুন্মাদনায়, পরম উত্তেজনায় অমিত বলিয়াছিল, 'না, না, চিন্তা নয়। চিন্তা নয়, থট্ ইজ অ্যাট্ বেস্ট রিপ্রেস্ড্ অ্যাকশন্ —কর্মেই জীবন, —কর্মেই জীবন।' অনেকখানি সত্য ছিল অমিতের ঘোষণায়,—অনেকখানি অসত্যও। তবু সেদিন চিন্তাকে অস্বীকার করিবার দিকেই ছিল তাহার সমস্ত

ইচ্ছাশক্তি।—বহুদিনের চিন্তাজ্বর-তপ্ত অমিত সেদিন চিন্তাকে অস্বীকার না করিলেই সুস্থ বোধ করিত না।

...তেমনি মুহূর্ত আসিয়াছে কি এবার তপনেরও জীবনে? তেমনি ভয়ংকর মুহূর্ত যখন আত্মবিস্মৃত হইতে না পারিলেই মানুষ আত্মভ্রষ্ট হয়?...

ও কথাটা আমার নয়, তপন।—অমিত বলিল।

জানি। এঙ্গেলসের; কিংবা তারও পর্বেকার কারও। হয়ত গ্যয়টের। কিন্তু কথাটা আমার কাছে পৌঁছেছিল আপনার মুখ থেকে। আর, কথাটা সত্য।

অমিত ম্লান হাসিয়া বলিল—এবং অর্ধসত্য। কথাটাও তো অ্যাকশন্—প্রকাশের প্রয়াস—কাজেরই ভূমিকা—কাজেরই সোপান। একটু তর্ক হইল দুইজনায়। পুরাপুরি না মানিলেও অমিতের কথাটা তপন মোটামুটি মানিয়া লইল।

তুমি কি করবে, তপন?—জিজ্ঞাসা করিল তখন অমিত।

কি করছি, তা তো জানেন।

তপন দেখিয়াছে পুলিশের হাতে পথে পথে কমিউনিস্ট ছেলেরা মার খাইতেছে; মেয়েদের অপমান করা হইতেছে; মা-বোনের নামও আর পবিত্র নয় শাসন কর্তাদের ভক্তদের নিকট। সে কমিউনিস্ট নয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক, মার্কসিস্ট; ইহার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনা করিতে হইবে। আর প্রতিরোধ রচনা করিবে কিরূপে—জনতার মধ্যে ছাড়া? অতএব—

কিছুটা মজদুর আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার,—বলে অমিত।—জিজ্ঞাসা করো আমাদের শ্রমিক কর্মীদের।

নির্বাচনের ঝড়ে গাল খাইয়া, ঢিল খাইয়া, শেষে মাথা কাটিয়া রক্তাক্ত দেহে ফিরিয়া আসিল তপন। সন্দেহ নাই কংগ্রেসের জয় হইবে,—ভোটের বাক্সগুলি কংগ্রেসী বাবুদের না ভাঙিলেও চলিত। তাই বলিয়া তপন নিবৃত্ত হইবে না। কিন্তু করিবেই বা কি এখন?

হিন্দু-মুসলমানের মহাযুদ্ধে ভাসিয়া দেশ তখন 'আগস্টীয় স্বাধীনতার' দিকে চলিয়াছে। দাঙ্গার দিনে একমুহূর্ত অবকাশ নাই। কিন্তু দাঙ্গা থামিলেও তপনের ডাক পড়িল। অধ্যাপক ও বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের সমিতি গঠন করিতে চান। বিলাতে ঐরূপ সায়েন্টিফিক্ ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন আছে, ট্রেড্ ইউনিয়নের পদ্ধতিতে চলে, এখানেই বা তবে তাহা হইবে না কেন? তপনের মত বৈজ্ঞানিক কর্মী ছাড়া কে করিবে ইহার প্রাথমিক কাজ? এবার মাতিয়া উঠিল তপন। বিজ্ঞানের মুক্তি-স্বপ্ন আর সুদূর নয়। এইত, বৈজ্ঞানিকেরাও আজ নিজেদের বিজ্ঞান সেবার স্থানেই সংঘবদ্ধ হইতেছেন—শ্রমিকের সংঘ-সংগঠনের পদ্ধতিতে। মহা উৎসাহ বিলিতী মার্কার মহামহোপাধ্যায় ও মহোপাধ্যায় অধ্যাপকদের। তপন কলেজ হইতে ছুটি লইল। বিজ্ঞানের মুক্তির একটা সোপান এবার তাহারা অন্তত রচনা করিবে। তপন ছয় মাস ঘুরিয়া ঘুরিয়া, সমস্ত ভারতবর্ষ-ব্যাপী বৈজ্ঞানিকদের বঝাইয়া পড়াইয়া, পত্র লিখিয়া যখন দিল্লীতে সমিতি গঠন করিতে গেল, তখন

ওয়াভেলের মন্ত্রি-প্রধানেরাই হইয়া বসিলেন এই সমিতির ভাগ্যবিধাতা; সমিতির পরিচালনা ভার রহিল তাঁহাদেরই মনোনীত অধ্যাপক ও উপকর্তাদের হাতে। অবশ্য তপনও উহাতে রহিল, থাকিবেও। সে কর্মী; উদ্যোগ, পরিশ্রম করিবে, সে ইয়ংম্যান। ছিট আছে তাহার মাথায়, কাজ সে করিবে। সমিতির কর্তৃপক্ষ তাহা বেশ বোঝেন। অবশ্য বেশি বিশ্বাস তাহাকে করা যায় না—কমিউনিস্ট তো। কিন্তু আপাতত ইহাকে ছাড়া কাজ করিবার লোকই বা পাওয়া যায় কোথায়? হাঁ, কর্তৃপক্ষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন। কারণ, বিশ্বাস করা যায় না, তপন যখন কমিউনিস্ট।

সমিতিটা কুক্ষিগত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন ভাগ্যবান ও ভাগ্যান্বেষী বিজ্ঞান-সেবিরা। দরিদ্র, হীনাবস্থা, মন্দভাগ্য বৈজ্ঞানিক কারিগর, মিস্ত্রি, কর্মীরা তপনকে তখনি শুনাইয়া শুনাইয়া গজগজ করিতে করিতে জানাইয়া গেল, 'ডা'নের হাতে পুত্র সমর্পণ। যাঁরা বরাবর আমাদের আধ-পেটা রাখছেন সেই মন্ত্রী আর মালিকদেরই করলেন আমাদের এই সমিতিরও কর্ণধার।' সমিতি অবশ্য বাঁচিয়া রহিল। রাজতিলক পরিতেছে কংগ্রেস নেতারা; রাজছত্রের ছায়ায় তাই 'ভারতীয় বৈজ্ঞানিক কর্মী সমিতি' নিশ্চিন্ত আয়ু লাভ করিল। উহার খাতা রহিবে, দপ্তর রহিবে, বড় বড় "ডোনার" মিলিবে। না,—আর হৈ রৈ-এর কোনো বালাই নাই; দ্বিতীয় কোনো অনুরূপ সমিতি গড়িবারও উদ্যম বৈজ্ঞানিক কর্মীরা কেহ করিবে, এমন সম্ভাবনাও নাই। নিশ্চিন্ত হইলেন মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকেরা,—মন্ত্রী-মুরুব্বিদের নেক-নজরে পড়িবার মত আরও-একটা সোপান তৈয়ারি হইয়াছে তাঁহাদের জন্য। অধৈর্য হইবার কারণ কি ছোকরা বৈজ্ঞানিক কর্মীদের, আর যুদ্ধের বেকার যত কারু-কর্মীদের? "সায়েন্স্ তো চায় না এরা, চায় পলিটিক্স—এরা সব কমিউনিস্ট।"

তপন বলিল, আর না। বিজ্ঞানের মুক্তির সোপান খুব তৈরী হয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এড্ভানস্মেন্ট্ অব লার্নিং'-এর মুখ্য উদ্দেশ্য যেমন 'এ্যাড্ভানস্-মেন্ট্ অব আর্নিং',—ছাত্রদের পক্ষে কেরানিগিরি, অধ্যাপকদের পক্ষে পরীক্ষার কাগজ ও পাঠ্য-পুস্তক বিক্রয়;—এও তেমনি। বিজ্ঞানের অধ্যাপকদেরও এখন একটা ব্যবস্থা হল মন্ত্রী-মহারাজের ছত্রতলে। একটা রাজকীয় খেলাত—শাঁসাল দুই-একটা চাকরি, বিদেশে ডিপুটেশন, এখন কারো কারো ভাগ্যে জুটবেই। আর সে আশা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ বিজ্ঞানের এ মুক্তি ও এ মুক্তি-সোপান এখানেই শেষ।

অমিত বলিল: তা হলে তুমি করবে কি?

এবার কমিউনিজম্। অর্থাৎ ছোটলোক মজুরই আমার ভালো—বাবু কর্মচারীরা থাকুন। থাকুক্ ইন্টেলেক্চুয়াল্ ফ্রন্ট্।

কেন? কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ ওয়ার্কস ফেডারেশ্যান গড়ার চেষ্টা হচ্ছিল। তোমাকে এখনও চাইছিলেন ইস্ট এশিয়ার কেমিস্ট ছোকরারা—

আর সেসবে নয়। বরং চটকলে। জন্ম অবধি দেখছি—এই চিমনির ধোঁয়া, কিন্তু জীবনে কারখানার ভেতরটা দেখিনি। জানি না কি-ই বা তাঁত-ঘর, কিই বা ফুড়ন, কিই বা কী? অধ্যাপক পণ্ডিতের পরিবার; অমিতও জানে, কত সন্তর্পণে ইঁহারা আপনাদের পবিত্রতা এই কল এলেকার মধ্যে রক্ষা করিয়াছে। অমিত তাই বলিল, আর এখন চট্ করে তা জেনে ফেলবে? বিশেষত চটকলের যে অবস্থা।

কিন্তু জানিতেই হইবে। মোতাহেরেব সঙ্গে জুটিয়া গেল তপন। কিন্তু চটকল যেন অচল। বহু হরতালেব মধ্য দিয়া উহার মজুরদের পরীক্ষা হইয়াছে; অর্থাৎ জ্ঞান হইয়াছে,—'বাবুরা সবাই চোর।' আর তপনই বা 'বাবু' ছাড়া কি? তবু যাতায়াতের, সাধসাধনার ফলে সাড়া মিসিল নিকটস্থ সুতাকলে। সেখানে ইউনিয়নও গড়িয়া উঠিল। দুঃখ ও অভাব অসন্তোষ রূপ-গ্রহণ করিতে লাগিল ঐক্যে। কথা ফুটিল বাক্যহারা মানুষের মুখেও : —মাগগী ভাতা কমাইলে চলিবে না। কথায় কথায় জরিমানা, বাড়তি খাটুনি কেন? তাঁতঘর বন্ধ রাখিলেও তাহা মজুর সহ্য করিবে না।

সহ্য করিবে না? খুব কথা বলিতে শিখিয়াছে দেখি এই মাদ্রাজী মাগীটাও। দু'টাকার জন্য কাহারও অংকশায়িনী হইতে উহাদের আপত্তি হয় না—সে মাগী-দেরও এত কথা। গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিবে---রুক্‌মিনী মারিয়াম্মাকে সেকেণ্ড ফোরম্যান চক্রবর্তী। চক্রবর্তী ছোকরা নয়, যথেষ্ট সে দেখিয়াছে; কাজও জানে। কিন্তু মেয়েমানুষ লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি সে করে না। তাই মেয়েমানুষের ঢং, ভড়ং, মুখে মুখে কথাও কাজের সময় বরদাস্ত সে করে না। ওসব ফষ্টি-নষ্টি করুক্ তাহারা রায় বা সিং-এর মত ফক্কর আর ফক্করদের সঙ্গে। সে বি. বি. চকবর্তী—সেকেণ্ড সিনিয়ার ফোরম্যান। হি উইল স্ট্যাণ্ড নো নন্‌সেন্‌স্।

কিন্তু 'নন্‌সেন্‌স্' নয়, গোলমাল বাধিয়া গেল। কোথা হইতে রুখিয়া আসিল বিলাসপুরী মেয়েটা, মংগলী। উঠিয়া মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল—সেই বাঙালী মেয়েটিও—সাত চড়ে যার মুখে রা সরিতে দেখে নাই কেহ, বিলুর মা সেই পার্বতী। আর কোথা হইতে তারপর ভিড় করিয়া আসিতে লাগিল মাদ্রাজী, ওড়িয়া, বাঙালী, হিন্দুস্থানী নানা জাতের পুরুষ! শেষে ইঞ্জিন ঘরের রশিদ, মামুদ পর্যন্ত। সকলে কাজ বন্ধ করিয়া দিল।

হরতাল! দেশলক্ষ্মী মিলে হরতাল!

দেশলক্ষ্মী মিলে হরতাল? দেশের একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান, বাঙালীর নিজস্ব কাপড়ের কল,—তাহাতে হরতাল! দেশের প্রত্যেকটি সংবাদপত্র উহার বিরুদ্ধে লিখিল।

কিন্তু ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে উহাতে তপন।

আকস্মিক উদ্দীপনা ও দুইদিনের সতেজ সংগ্রামের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসিল বাঙালী রশিদ মিঞা আর হিন্দুস্থানী সুখারী, 'বিলাসপুরীয়া' মংগলী আর

বাঙালী পার্বতী। জান মহম্মদ সর্দার আর জাফর আলী বিক্ষুব্ধ হয়। লোকগুলার স্পর্ধা বাড়িয়াছে। সর্দারকে বলা নাই, কওয়া নাই, হরতাল করিয়া বসে। জাফর আলী শেখ মুখ ফিরাইয়া লয়—সুখারীকে দেখিলে। হাঁ, বিহার মুলুকের মানুষ তাহারা দুইজনেই। তাঁতঘরের 'জাফর চাচাকে' না জিজ্ঞাসা করিয়া তবু বাহির হইয়া গেল সকলে? আর সুখারীও গেল তাহাদের আগে আগে? ইমান বলিয়া একটা জিনিস আছে। এই সুখারীকে কারখানায় ছোট ফোরম্যান সাহেবের ক্রোধ হইতে জাফর চাচাই সেবার বাঁচায় নাই কি? সকলকেই 'চাচা' আপনা ব্যাটার মত দেখে। সতের' বছরের কাজ তাহার। আগে ছিল মেটিয়া বুরুজের কেশোরাম মিলে। শেঠী সাহেব লইয়া আসেন তাহাকে 'দেস্লক্স্মীতে'। এই কলের প্রথম দিন হইতে এখানে আছে জাফর আলী। কী-না দেখিয়াছে সে এই কলের, কী না করিয়াছে? প্রথম দিনে ম্যানেজার সাহেব আসিয়া বলিলেন, 'কারখানা আপনাদের হাতে, শেখ সাহেব। আমরা সবাই মিলে এ কারখানা গড়ছি।' সেই জাফর আলী শেখ কি এখন পাইতেছে? বেইমান মালিক! এখন উনিশ বছরেও তাহার অভাব যায় নাই। কিন্তু তাঁহার তাঁতখানার মানুষেরা কেহ বলিতে পারিবে না 'চাচা' কাহাকেও সাহায্য করে নাই। ম্যানেজারকে সে বলিলে কবে জাফর শেখের কথা সাহেব না রাখিয়া পারিয়াছে? কিন্তু এইবার জাফর চাচার সেই মাথা তাহারা হেঁট করিল। একটা বার জিজ্ঞাসা করিল না তাহার তাঁতঘরের লোকেরা তাহাকে; অমনি হরতাল করিয়া বাহির হইয়া গেল। আর কাহার কথায় করিল হরতাল?—এই একাউন্টের কেষ্ট মল্লিক, আর এই বাহিরের তপন ভটচাজ্জি বাবুর কথায়। এইসব 'বাবু'দের চিনিতে দেরি আছে মজুরদের। কেন সুখারীরা হরতাল করিয়াছে? সেই মাদ্রাজী আওরাৎকে মারপিঠ করিয়াছে চক্রবর্তী? 'বুরা কাম।' কিন্তু কলের আবার আওরাৎ?—জাফর ঘৃণায় মুখ বাঁকায়—আধা-কসবি, আধা-জানোয়ার। 'বিলাসপুরীয়াকে' কি নতুন দেখিতেছে জাফর? কামারহাটির কলে ছিল এই মংগলী পাঁচ বৎসর। তখনো 'ছুকরি' ছিল। এখনো কপালের দাগ রহিয়াছে 'বিলাস-পুরীয়ার'—ওর মরদের মার। ফিরিঙ্গি সাহেবটার পেয়ারের হইয়াছিল তখন ছুকরি মংগলী; চোখে মানুষ দেখিত না সেই কলে। তারপরে লাগিল উহাদের সর্দারের সঙ্গেই, শাহাবাদের এলাহি বক্সের সঙ্গে। তারপরে 'বিলাসপুরীয়া' পলাইয়া আসে এপারের চটকলে। সেখান হইতে আবার এই পাঞ্জাবী গেন্দা সিং-এর সঙ্গে জুটিয়া এখন দেশলক্ষ্মীর সুতাকলে আসিয়াছে। ইতিমধ্যেই এখানে মংগলী কতজনের সঙ্গে কত কাণ্ড করিয়াছে তাহার ঠিক নাই। হাঁ, হাঁ, বাঙালী আউরাৎকে দেখিয়াছে জাফর আলী; —ওই পার্বতী। বাঙালী আউরাৎ—ভালো হইলে কলে আসে কভি বাঙালী জেনানা? হঁ, আসিতেছে আজ কাল? আকাল দেশে পড়িয়াছে, জানে জাফর আলী। কিন্তু জানে—আসেও তেমনি আউরাৎই। আসিবে এই মথুরার বউ? হাঁ, গ্রামের বাড়ি বাড়ি যায়, ঘরে দুয়ারে কাজ করে, ধান ভাঙে, আপনা পেট গুজ্রায়—তবুভি কলে

আসিবে না। ইজ্জত থাকিলে বাঙালী আউরাৎ কলে মজদুরনী হইবে না। আর, এই মাগীদের কথায় নাকি এখন মামুদ, রশিদের সঙ্গে মিলিয়া সুখারী এই কারখানায় গোল পাকাইতেছে---'চাচাকে' একবার 'পুছলও' না।

তথাপি তৃতীয় দিনে হরতালের জয় হইল। তখন সেকেণ্ড ফোরম্যান নাই। তাহার পদচ্যুতি হইয়াছে কিংবা ছুটি মিলিয়াছে। কিন্তু সর্দার, দরওয়ান, ফোরম্যান, কাহারও নিকটে আর মাথা নিচু করে না---পনের শত এই খড়দ' পেনেটির দেশলক্ষ্মী কাপড়ের কলের মজুরেরা---মেয়ে বা পুরুষ। ইউনিয়ন জাঁকিয়া উঠিল। সভ্য হইবার জন্য আফিসে ভিড় লাগিয়া গেল। শিফ্‌ট শেষ হইতে না হইতে সভ্যের ফরম-এ টান পড়িয়া যায়। চাঁদায় ইউনিয়ন ফন্ড ভরিয়া উঠে।

লাল ঝাণ্ডা উড়াইয়া ফ্যাক্‌টরিরই সামনে একটা চালের দোকানে দোতলা টিনের ঘর ভাড়া লইয়া বসে ইউনিয়ন আপিস। সেখানে নির্ভয়ে আসিয়া কাজের শেষে মজুরেরা জটলা করে। দাবি-দাওয়ার কথাই আলোচনা করে, কারখানার সমস্ত অন্যায়ের হিসাব লইয়া বসে, কল্পনা করে আগামী দিনের হরতালের---একাউন্টের মল্লিক বাবু আর ইউনিয়নের তপনের সঙ্গে। মজুরেরা কারখানায় যখন যায়, যায় বিজয়ীর মত। কারখানাটা যেন আর ম্যানেজার ও মালিকের নয়। চালাইতে পারে নাকি তাহারা কল এক রোজও? সে ত দেখাই গেল। মজুরেরাই কল চালায়, উহাদেরই জিনিস কারখানা। কল উহাদেরই জিনিস যখন, উহাদেরই বাঁচিবার দাবিও মানিয়া লইতে হইবে প্রথম তখন;---মালিকদের লুঠ ও খুন-শোষণ আর আগেকার মত চলিবে না।

সত্যই সুখারী আর রশিদ মিঞা, মংগলী আর পার্বতী একটা তোলপাড় বাধাইয়া দিয়াছে দেশলক্ষ্মী মিলে। কেষ্ট মল্লিককে হাত করিবার চেষ্টায় লাগিলেন ম্যানেজারেরা। অনেকখানি বেতন বৃদ্ধি আর প্রমোশনের প্রলোভন: মল্লিকের নিকট উহা তুচ্ছ করিবার মত জিনিসও নয়। মধ্যবিত্ত চাকরের সংসারে অভাব অনটনের অন্তত অভাব নাই। কিন্তু তাহা শেষও হইবে না কিছুতে, তাহাও জানে কেষ্ট মল্লিক। ছোট বোনের বিবাহ দুই দশ টাকা বেতন বাড়িলেও সম্ভব হইবে না। পিতার চোখের দৃষ্টিও তাহাতে ফিরিয়া আসিবে না। কেষ্ট মল্লিককে ম্যানেজাররা পক্ষে পাইলেন না। তপনকেও পাওয়া গেল না---না কলেজের মারফতে, না তাহার আপন আত্মীয়দের মারফতে। তাহাকে পাইবার কথাও নয়, লোকটা ক্ষ্যাপা। তাহা ছাড়া পাকা কমিউনিস্ট। এ দেশের কমিউনিস্ট অর্থাৎ ছিল ইংরেজের পুষ্যি পুত্র। তাই উহাকে এই অঞ্চল হইতে সরাইতে হইবে; এখানে ঢুকিলেই মার দিতে হইবে। অবশ্য একটু দেরি করা প্রয়োজন। সুখারী আর রশিদ আলিও যে এত পাজি হইবে তাহা ম্যানেজার সাহেব বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বিলাতে টেক্‌স্‌টাইল ইন্‌জিনীয়ারিং শিখিয়াছেন; ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্টের পক্ষপাতী। মনে মনে তিনি নিজেই ত স্যোশ্যালিস্ট। আর '৪২-এও জহরপ্রসাদ তাঁহার বাড়িতে দুইদিন ছিলেন। অর্থাৎ থাকিবার কথা ছিল।---কিন্তু সুখারী রশিদের কাণ্ডটা দ্যাখো? ব্যাটাদের

ভারী গুমোর হইয়াছে,---"নেতা" হইতে চায় নিশ্চয়। সেরূপ ব্যবস্থাই করিতে হইবে জানু সর্দার আর জাফর মিঞাকে দিয়া। কিন্তু তাহাতেও আবার একটু দেরি করিতে হইবে, তারপর ব্যবস্থা। শেষ পর্যন্ত না হয় জবাব দিতে হইবে দুই-একজনকে; একটা গোলমাল বাধিয়া উঠিবে তাহাতে। সেই সম্পর্কেও তাই আগেই ব্যবস্থা করা চাই,---সেইরূপ কথাও হইয়াছে মন্ত্রীদের সঙ্গে। তাঁহারা চান--- মিলের মধ্যে কংগ্রেস মজদুর সংঘের ঢুকিবার মত সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। না, সোশ্যালিস্ট মজদুর সঙ্ঘা-টঙ্ঘা মন্ত্রীরা পছন্দ করেন না; উহাতে কাজ হইবে না। নিকটেই একটা ভালো ঘর ভাড়া লইয়া কংগ্রেস মজদুর সংঘের আফিস খুলিয়া দিবেন মিলের মালিকেরা। ম্যানেজার, দরওয়ান, সর্দার, সবাই উহার সভ্য হইবে; পুলিশ ত আছেই। মজদুর সংঘের লোকেরা সেখানে বসিতে আরম্ভ করিবে।---আপিস খোলা হইল।

একটু দেরি করিতে হইবে তথাপি এই সবে ..

একটু দেরি করিতে হইবে, একটু দেরি করিতে হইবে।...যাহাই করিতে চাহেন ম্যানেজার সাহেব---'একটু দেরি করিতে হইবে।' কিন্তু দেরি করিবার মত সময় যে নাই। প্রতিদিন সভা, প্রতিদিন মিছিল, নতুন নতুন দাবি---'রেশন কাটা চলবে না,' 'খুন-চোষা চলবে না'---চারিদিক যে গরম। কলের মেয়েগুলি পর্যন্ত আর ভয় করে না কর্তাদের।

সাত চড়ে কথা সরিত না মুখে সেই মেয়েটার---পার্বতী। বাঙালী মেয়ে। বলে ভদ্রঘরেরই মেয়ে, ভালো কায়স্থ। ভাই চাকরী করিত বেলুড়ের এলুমিনিয়ম কারখানায়। আকালের দিনে পার্বতী পূর্ব বাঙলার বাড়ি ছাড়িয়া আসে। স্বামী রুগ্ন, দেশে খাতা লিখিত কোনো মহাজনের ঘরে। অভাবে ও অসুখে চলচ্ছক্তিহীন, বাতে অচল। ছেলে ও মেয়ে লইয়া পার্বতী প্রথম আসিয়াছিল বেলুড়ে ভাইয়ের নিকটে। কোনো ভদ্রলোকের সংসারে গৃহকর্ম পাইবে না কি? কিন্তু তখন চালের মণ চল্লিশ টাকা; 'রেশনের'ও ব্যবস্থা হয় নাই। ইচ্ছা থাকিলেও অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের আর খাওয়া-পরা দিয়া ঝি-দাই রাখিবার সাহস বিশেষ নাই। তাহার উপরে যাহার দুইটি ছেলেমেয়ে আছে, তাহাকে কে গৃহে স্থান দিবার কথা একালে ভাবিতে পারে? ভাই-এর চেনায় ও চেষ্টায় পার্বতী আসিল 'দেশলক্ষ্মী মিলে' কাজ করিতে। ভয়ের অন্ত ছিল না। কিন্তু আর উপায়ও নাই। দেশে স্বামী আছে কি নাই, জানে না। কিন্তু এখানে ছেলে-মেয়েদের আর বেশি দিন বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, তাহা বোঝে। দাদা ভরসা দিলেন, 'দেশলক্ষ্মী মিলে মল্লিক আছে।' সে দাদার পরিচিত, তাঁহার শ্বশুর বাড়ির দেশের লোক, একটু জানাশুনাও ছিল গ্রামে। 'স্বদেশী' করিত মল্লিক এক সময়ে। তারপর এখন কি হইবে সেই মল্লিক, তাহা কে জানে? কিন্তু আপাতত পার্বতী দেখিল কারখানায় রেশন দেয়; নিজে ও ছেলেমেয়েরা তাহাতে বাঁচিবে; এমন কি দুই এক টাকা স্বামীকেও পাঠানো সম্ভব হইতে পারে। পরে অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা হইবে।

কিন্তু তাই বলিয়া এখন বাঁচিবার চেষ্টাও করিবে না কেন। অন্তত যাহাই থাকুক পার্বতীর অদৃষ্টে, ছেলেমেয়েদের সে না খাইয়া মরিতে দিবে না।

না, পার্বতী কিছুতেই ভয় পাইবে না। যে করিয়াই হউক বাঁচিবে, ছেলেমেয়েদের বাঁচাইবে। যত অপমান থাকুক কলের কাজে, যত ভয় থাকুক ইজ্জতের, সে নিজে যদি ভালো থাকে, কাহাকে তাহার ভয়?

পার্বতী নিজে বাঁচিয়াছে, ছেলেমেয়েদের বাঁচাইয়াছে, স্বামীকেও এখন দেশ হইতে আনাইয়াছে। কারখানারই লেবর কোয়ার্টার্সে তাহাদের স্থান করিয়া দিয়াছেন ম্যানেজার সাহেব নিজে। হাজার হোক, বাঙালী তিনি; বাঙালী মেয়ে-মজুরের জন্য একটু 'সিম্প্যাথি' না রাখিলে চলিবে কেন? তাহা ছাড়া মেয়েটি মুখে রা কাড়ে না, কাজেও নিয়মিত আসে। স্বভাব চরিত্রও নাকি ভালোই, মানে, যতটা ভালো হইতে পারে কারখানায় কাজ-করা এই সব মেয়ের। কতই বা ভালো হইবে? কি করিয়াই বা কেহ ভালো থাকিতে পারে? যে সংসর্গ!—একদিকে এই সর্দার, বাবু, ফোরম্যান মিস্ত্রিগুলির প্রলোভন উপদ্রব, অন্যদিকে ওই মাদ্রাজী, বিলাসপুরী প্রভৃতি মেয়েগুলির সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করা: ইহার মধ্যে ভালো থাকিতে চাইলেই বা ভালো থাকিতে পারিবে কেন কেহ? কোনো দেশেই থাকে না,---বিলাতেই কি থাকে? নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা মনে পড়ে ম্যানেজার সাহেবের। তাহা ছাড়া পার্বতীর বয়সও এমন কিছু নয়। শরীর দুঃখে তাপে বেদনায় ক্লান্ত, ম্লান হইলেও ভাঙিয়া পড়ে নাই। অবশ্য তাহার ছেলে-পিলে আছে; ঘরে একটা স্বামীও আছে---যদিও পক্ষাঘাতগ্রস্ত, আর নিজেও দেখিতে পার্বতী ময়লা। যাহা হউক, ম্যানেজার সাহেব বোঝেন---পাবতী কিছুটা বুঝিয়া-সুঝিয়া চলিলেই যথেষ্ট।

সেই পার্বতী ম্যানেজারের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। কথা এখনও বেশি বলিল না। কিন্তু যাহা বলিল, বলিল স্পষ্ট—গুছাইয়া। কেহ লিখাইয়া-পড়াইয়া তৈয়ারী করিয়া দিলেও ম্যানেজার অবাক হইতেন। কিন্তু সেরূপ সুযোগও পাইবার কথা নয়। একেবারে কাজ হইতে হঠাৎ ডাকাইয়াছেন তিনি পার্বতীকে। মেয়েটা কিছুতেই মানিবে না— তাহার ভাগ্য ভালো। সে মরিতে বসিয়াছিল, এখন ছেলে-পিলে স্বামী লইয়া খাইয়া পরিয়া আছে; এই সত্যটা যেন একটা সামান্য কথা। উলটা বলিতে চাহে, পরিশ্রম ও গঞ্জনার মূল্যে যাহা পাইবার তাহাই সে পাইয়াছে। তাহার স্বামীর চিকিৎসা হয় না; দুইজনে রেশনের চালে আধা পেটা খায়; ছেলেমেয়ে দুটিকে খাওয়াইতে হয়; বিলুকে পাঠশালায় পাঠাইবার পয়সা নাই; নিজের অসুখ বিসুখ থাক, ছেলেটার জ্বর হইলেও একবেলা কামাই করিবার তাহার জো নাই। অথচ কারখানায় এই কয় বৎসর কাজ কি কম হইয়াছে? যুদ্ধের সময় ত মালিকেরা পাঁচগুণ মুনাফা লুটিয়াছে। পার্বতী অবশ্য সব হিসাব জানে না; কিন্তু যাহারা জানে তাহাদের নিকট হইতে শুনিতে পায়। তাহা ছাড়া নিজের চক্ষে দেখিতেও পায়—কি ছিল তখন কারখানা, চোখের উপর বাড়িয়া তাহা কি হইয়াছে এখন।

কেউ ত জোর করে তোমাকে এ মজুরিতে খাটতে বলে না। তোমরা নিজের ইচ্ছায় কাজ নিয়েছ। এখানে কাজ না পেলে তখন কি হত, মনে পড়ে?

মরতাম!

তবে?—বিজয়ীর মত ম্যানেজার সাহেব প্রশ্ন করিলেন।

হয় না খেয়ে শুকিয়ে মরো,—নয় খেটে মুখে রক্ত উঠে মরো,—মোটের উপর মরতেই হবে। এর মধ্যে তা হলে আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কি আছে?

কথা তো নয়, ছোটখাটো একটা বোমা। সাহেব একেবারে হতভম্ব।

ইউনিয়ন আপিসে কথাটা শুনিতে শুনিতে সেদিন সন্ধ্যায় তপন প্রায় লাফাইয়া উঠিয়াছিল। 'ফ্রিডম্ টু স্টার্ভ অর্ বী এ ওয়েজ্ স্লেভ্' :—এমন পরিষ্কার রূপে কি করিয়া বুঝিল এই অশিক্ষিতা বাঙালী মজুর-মেয়ে বুর্জোয়া ফ্রিডমের এই স্বরূপকে? আপনার অভিজ্ঞতা হইতে? তপনের উৎসাহদীপ্ত সেই মুখ অমিতের মনে আছে। তপন অতি উৎসাহী; হয়ত পার্বতীর কথাও বাড়াইয়াই বলিতেছে। পার্বতীর কথায় চমকিত হইল, কিন্তু তপনের জন্য তার ভাবনাও হইল।

বেশ সেই বিলাসপুরীয়া মংগলীর? তার কথা ত সবাই জানে।

ম্যানেজার তাহাকে ডাকিয়া পাঠায় নাই। 'পাঠাত'—মংগলী বলিয়াছে,—'একবার দেখে নিতাম।' কতকটা তাচ্ছিল্য, কতকটা ক্ষোভে মিশাইয়া সে এমনি ভাবে কথাটা বলিল যেন তাহা হইলে একটা মজাদার ব্যাপার হইত। সে সেই সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, পৃথিবীও বঞ্চিত হইয়াছে। কি করিত সে?

সে তুহারা না শুনিলে—তুহারা ভাল মানুষ আছিস—থাক্। মংগলী ত আর ভালো নেহি।

কি করিত মংগলী ঠিক নাই, কিন্তু তাহার ভ্রূভঙ্গির সঙ্গে কালো দেহের মধ্যে এমন একটা তরঙ্গ খেলিয়া যায় যাহাতে অদ্ভুত রহস্যময় সম্ভাবনায় ভরিয়া উঠে তাহার উক্তি। তপনের কল্পনা যেন একটা উত্তেজনা পায়—সেই কথাটি আশ্রয় করিয়া নানা কল্পনায় মাতিতে। হাস্যকর ঔদ্ধত্যের কল্পনা, অসংযত ইয়ার্কির কল্পনা, আর অসংকুচিত লাস্যবিলাসের কল্পনা,—কোনোটাই যেন বিলাসপুরীয়ার কথা, চক্ষু, অনতিব্যক্ত দৈহিক ভঙ্গি হইতে কল্পনা করিতে কষ্ট হয় না। কষ্ট হয় না এই বলিয়াই বোধ হয় যে, সে 'বিলাসপুরীয়া'। শুধু দেহের ভঙ্গিই নয়, তাহার ইতিহাসও এইরূপ রহস্যের পরিপোষক। কিছুতেই তাহার সংকোচ নাই, কিছুতেই তাহার শংকাও নাই। এই কলের যে মিস্ত্রি-ফোরম্যান গেন্দা সিংকে সে সত্য সত্যই ভালো লাগিয়াছে বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকেই আবার অবলীলাক্রমে ব্যঙ্গ করিয়া, অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিতে জানে হরতালের প্রারম্ভে। আবার তাহারই জন্য হরতালের শেষে ইঞ্জিনীয়ার 'কোয়ার্টারের' আনাচে-কানাচে সে ঘুরিয়া মরিতে পারে।

মংগলী বলিবে যে, যখনকার বিরোধ তখন গিয়াছে, এখন তাহার জের টানা কেন? 'তুহার আপনকার লোক আসবে; পরিবার আনিবি; বহু আসবে,—তখন

কি মংগলী আসবে তুহাকে ডাকতে, সিং? আসবে না। তুহার ইজ্জত আছে, তুহার বহুরও ইজ্জত আছে। সে তুহার যেমন আপনার; মংলীর ইমান, মংলীর ইজ্জত, উভি ঐসা মংগলীর আপনার। তখন হরতালের রোজ ছিল। তুহার সকলেরই সাথে হামাকার লড়াই। মালিক ম্যানেজার অফ্‌সার ইঞ্জিনীয়ার—সকল গোষ্ঠীর সাথে লড়াই তখন হামাকার গোষ্ঠীর, মজুর-মজুরনী সবাইকার। দু'জাতের লড়াই,—তুহার জাতের, হামার জাতের। তু হামাকে তখন ছুঁবি? হামার জাত নেহি? হামার জাতের ইজ্জত নেহি? দুশ্‌মনের জাত, লড়াইর ওক্‌তে আস্‌বি আমাকে ছুঁতে? তু দালালি করতে বলছিলি—'তেরী ভারী তলব মিলেগা, তুমকো খুশি কর দেগা মালিক লোক'। থুঃ! থুঃ। তুহার ইমান আছে, সিং; তুহার জাতের ধরম তুই রাখছিস। আর হামাকে বলছিলি হামার জাতের ধরম হামি ছেড়ে দিই।

বিলাসপুরীয়ার এই যুক্তি শুনিয়াছে সুখারী, শুনিয়াছে কেষ্ট মল্লিক, তাহাদের মুখেই উহা শুনিয়াছে তপনও। তাই ত বিলাসপুরীয়াকে লইয়া মুশকিল। ভয় পায় না সে কিছুতেই। লড়াই বাধিলেই খুশি। কিন্তু তাহার পরে?—যে-কে সেই। কাহার সঙ্গে ভাগিয়া পড়িবে হঠাৎ, কোথায় মদ খাইয়া গানে নাচে মাতিবে; তারপর বেহুস হইয়া দিন কাটাইয়া দিবে। একেই ত মিলের এলেকা; বিলাসপুরীয়া মেয়েগুলি এইসব দিকে লজ্জা, শরম, নিয়ম-নীতি বিশেষ মানিতেও চাহে না। ইউনিয়নের কাজে উহাকে দৈনন্দিন পাইবার জো নাই; অথচ সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিলাসপুরীয়া আসিয়া দাঁড়াইবে সর্বাগ্রে। যেমনি সাহস—তেমনি বুদ্ধি।

সেই সাহস, সেই বুদ্ধিই উহাকে টানিয়া লইয়া যায় যৌন-পিপাসার ও উৎকণ্ঠ বিলাসলাসোর দিকে; তপনের তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। প্রাণশক্তি মংগলীর প্রবল। আপনাকে উচ্ছ্রিত করিতে না পারিয়া আপনার মধ্যে গুমরাইয়া গুমরাইয়া মরিবে, সভ্যতার এমন সংযম-শিক্ষা ত মংগলীর ভাগ্যে জোটে নাই। কিছুই মংগলী মানেও না। তবু কাজের মধ্যে, মজুর আন্দোলনের বিপুল উত্তেজনার মধ্যে একবার যদি উহাকে ডুবাইয়া ফেলা যায়—তাহা হইলে? তাহা হইলে এই সংকোচ-শংকাহীনা মেয়ে নতুন মানুষ হইয়া উঠিতে পারে না কি? দেশলক্ষ্মী মজুর ইউনিয়নের মধ্য হইতে উত্থিত হইতে পারে নাকি সত্যকারের ভারতীয় মজদুরনী নেত্রী বিলাসপুরীয়া মংলী, আর বাঙালী পার্বতী?—তপন স্বপন দেখে।...

তপন তাহাদের ডাকিয়া পাঠায় ইউনিয়নের কাজে। বুঝাইতে বসে তাহাদের, —হাঁ, একদিন তাহাদের ইউনিয়নের চিঠিপত্র হিসাব সবই তাহাদের নিজেদের রাখিতে হইবে। স্থির হয়—রশিদ, সুখারী আর বিলাসপুরিয়া ও পার্বতীকে লইয়া সে এজন্য রাজনৈতিক ক্লাশ করিবে।

প্রাণপণ চেষ্টায় তপন উহার সহজ পাঠ তৈরি করিতেছে। কোথা হইতে আরম্ভ করিবে সে?—কোথা হইতে? ইতিহাসের ধারা প্রথমাবধি অনুসরণ করিয়া? না, এই দেশলক্ষ্মী মিলের প্রত্যক্ষ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হইতে? বিদেশের মজদুর

আন্দোলনের পাঠ্যতালিকা দেখিয়া তপন সিলেবাস প্রণয়ন করিতে থাকে, মনে মনে বক্তৃতা ভাঁজে। তারপর কেরোসিন তেলের ডিবা জ্বালাইয়া বসে রাত্রি সাতটায় প্রথম ক্লাশ খুলিয়া। তাহার উৎসাহের অন্ত নাই। কিন্তু ন'টা বাজে যে! চঞ্চল হইয়া উঠে প্রথমে মংগলী। অনেকক্ষণ সংযত হইয়া বসিয়া আছে সে। অনেকক্ষণ শুনিয়াছে সে তপনের কথা। হাঁ, ভালো বুঝে নাই: তবে শুনিয়াছে, সব শুনিয়াছে। কিন্তু ন'টা বাজিয়া গেল নাকি? তাহা হইলে হাজিগঞ্জের কলের একটা পুরানা দোস্ত আসিবে। দুয়ার বন্ধ দেখিয়া ফিরিয়া যাইবে হয়ত। আজ ভালো একটা আচ্ছা ছবি আছে : 'বন্দুকওয়ালী'। সাড়ে আটটা না বাজিতেই তাই তপনের সেদিন ক্লাশ শেষ করিতে হয়। আর দ্বিতীয় দিনে ন'টা বাজিল, তবু আর মংগলী আসে না। পরদিন আসিয়া জানাইয়া যায়—সন্ধ্যায় সারাদিন খাটিয়া আবার পড়াশুনা, মংগলী তাহা পারিবে না। আসলে অন্যরাও বেশি পারে না। সুখারী ঝিমাইতে থাকে। পার্বতী ঘরে গিয়া রাঁধিয়া সকলকে খাওয়াইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তবু সারাদিনের পরে এই সময়টাতেই ছেলে মেয়ে স্বামীর সঙ্গে তাহার কথা বলিবার সময়। তাহাও ছাড়িতে হইবে কি? না, সপ্তাহে দুই দিনের বেশি তাই পার্বতীও আসিতে পারিবে না। আবার ইউনিয়নের মেয়েদের মেম্বর করিবার জন্যও তাহাকেই ঘুরিতে হইবে—মংগলী স্পষ্টই বলে, উহা তাহাকে দিয়া হইবে না।

মজদুরদের ক্লাশ যেন কিছুতেই জমে না। একা রশিদই শুনিয়া যায়, বুঝিতে চাহে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসাও করিয়া বসে। সে ইস্কুলে পড়িয়াছিল; উচ্চ প্রাইমারি পাশ করিয়া মাইনরও পাশ করিয়াছিল। নিকটে উচ্চ ইংরাজি ইস্কুল নাই। তাই কাজের খোঁজে সে তখন আসে কলকাতায়। এখানে ইঞ্জিনীয়ারিং রুমে তাহার কাজ মিলিয়াছে---সাত বৎসর যাবৎ। লেখাপড়া সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন---হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি পাইয়া যেমন শুষ্ক মাঠের ঘাস মাথা তুলিয়া উঠে,---রশিদের মনের সমস্ত চিন্তা যেন সতেজে বাড়িয়া উঠিতে চাহিল। পাকিস্তান-হিন্দুস্থান : সে পাকিস্তানের মুসলমান, জীবিকার দায়ে হিন্দুস্থানে। এই জীবিকার শর্তটা কি? কি তাহার বর্তমান, কি তাহার ভবিষ্যৎ? পাকিস্তানে কল-কারখানার পত্তন হইলেই বা রশিদের ভরসা কি? 'ইসলামী রাষ্ট্রের' মালিকদের আরও মুনাফা জোগাইবে রশিদ মিঞারা, আরও সস্তায় বুকের রক্ত ইঞ্জিন-রুমের আগুনে-জলে বরাবর এমনি করিয়া নিঃশেষ করিয়া ধন্য হইবে।

'মজদুরের দেশ নাই, মজদুরের জাতি নাই।' কিন্তু ইহাও আবার রশিদ জানিয়াছে, আজ মজদুরের নিজস্ব রাষ্ট্র আছে। পৃথিবী-জোড়া মজদুর কিসান তাহাদের ভাই-বোনদের এই নাড়ীর টানও আজ অনুভব করিতেছে।

তপন খাড়া হইয়া বসে রশিদের জিজ্ঞাসায়। জিজ্ঞাসা করে, শুনবে তোমরা সোভিয়েত দেশের কথা?

শ্রমিক এলেকায় দেখাইবার সাধ্য নাই সোভিয়েত ফিল্ম। তাই দেখিতে

পাইবে না উহারা 'রোড্ টু লাইফ্', কিংবা 'রেন্‌বো'। যাহাদের আপনার কথা, তাহারাই দেখিবে না। তপন চটিয়া যায়, বড় জোর উহা দেখিবে মধ্যবিত্ত শৌখীনেরা, আর নিম্ন-মধ্যবিত্ত ছাত্র-ছাত্রীরা। কিন্তু যাহারা দেখিলে বুঝিবে, মানিবে, আর তাহাতে পৃথিবীর নতুন শক্তির সঞ্চার হইবে, তাহারাই দেখিতে পায় না। কোনো ছবিঘরের মালিক সেইসব ছবি দেখাইতে দিবে না নিজের ঘরে। অগত্যা ছবির বই লইয়া আসে তপন। ডাকিয়া আনে ইউনিয়নের আফিস ঘরে মজুরদের। পার্বতী লইয়া আসে মাদ্রাজী ও বাঙালী মজুরনীদের। বিলাসপুরীয়া মংগলীও শুনিয়া দেখিতে আসে; দেখিয়া লাফাইয়া উঠে—'বাহাদুর, মজদুর মেয়ে! অমন তাহাদের বেশভূষা, হাসি, রং! আর এদেশে তুমরা বাবুরা কিনা আমাদের 'বলো প্যাঁচা হয়ে থাক্'। 'যেমন তুমরা সব, তেমনি হামরা সব।'—এমন করিয়া তপন ও মল্লিকের দিকে দেখাইয়া পার্বতী ও অন্য মেয়েদের দিকে মংগলী হাত বাড়াইল যে তাহার উপহাসে হাসির রোল পড়িয়া গেল।

তপন বলিল, ঠিক। তবে আগে মুলুকটা ও-রকম করে না নিলে মেয়েরাই বা ও-রকম হবে কোথা থেকে?

তা কর না, বাবু? তা কই? তুমরা তো সব পণ্ডিত বানাবে, ইস্কুল খুলবে, ভালো মানুষ হবে, গরিবের ভালাই করবে।—দাঙ্গা-ফ্যাসাদ, হরতাল, ইন্‌কেলাব্ করবে কেনে?

তপন বোঝায়, ইন্‌কেলাব-ই তো করতে হবে—তৈরি করো, তৈরি হও। লড়াইতে লাগো।

মংগলী বলিল, সে তুমরা করো। ওসব হামাকের দিয়ে হয় না,—গজর-গজর বকুনি—লড়াই লাগুক্, হামিও লাগ্‌ব কামে।

...'কর্মেই জীবন'—ওনলি ইন অ্যাকশন ত্যু উই লীভ।

কিন্তু কী কর্মে? কী ধরনের অ্যাক্‌শন-এ? ক্লাশ করিবার, মজুরদের 'ভালাই করিবার' কাজেই কি মজুরদের সত্যকারের ভালো হয়? কয়জন তারা? এ যে অদ্ভুত দেশ, সাধারণ মানুষকে সচেতন করা চাই যে—তপনের নিকট এ কথা এখন নিরর্থক। মংগলীর উপহাসে তাহার অর্ধসুপ্ত আত্ম-সমালোচনা তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল।

দেশলক্ষ্মীর বিজয়ী শ্রমিকদের,—এতগুলি সংগ্রামমুখী সেই শ্রমিকের উদ্যম উৎসাহকে জুড়াইয়া দিতেছে না ত তাহারা? ইউনিয়ন গড়িবার ঝোঁকে, দাবির হিসাবপত্র পাকা করিবার নামে, শ্রমিকের 'একাই', সংগঠন, সুদৃঢ় করিবার অজুহাতে, ভাবী সংগ্রামের জন্য 'ফণ্ড' তুলিবার প্রয়োজনে,—এই যে দেশলক্ষ্মীর ইউনিয়ন-নেতারা সময় কাটাইল,—তাহাতে ছোটখাটো অসন্তোষগুলিকে অবশ্য ইতি-মধ্যে দানা বাঁধিবার সময় দিল, দাবিগুলিকে মজুরদের মনে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিল,—কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া কি মজুরদের এই বিজয়প্রবুদ্ধ উৎসাহ

স্তিমিত হইতেছে না? না, সহজলব্ধ এই জয়ফলকে মজুরেরা আয়ত্ত করিয়া, আপনার করিয়া তুলিতেছে—আগামী দিনে নূতনতর, কঠিনতর, সংগ্রামের পাথেয় হিসাবে?—তাহাদের সভা মিছিল, জলুষ—এই সবের মধ্য দিয়া উৎসাহ উদ্দীপনা বাড়িতেছে কি? না, উল্টা ইহার মধ্যে আসিয়া যাইতেছে মজুরদের মনে একটা একঘেয়েমি?—তর্ক বিচার বাধিয়া গেল ইহা লইয়া তপনের সঙ্গে অন্যান্য অভিজ্ঞ সহকর্মীদের। মোতাহের বলিল, ধীরে, তপন, ধীরে। আকস্মিক আঘাতের ফলে একবার না হয় বিজয় সহজে লাভ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে মাতাল হইয়া উঠিয়ো না। কি তোমাদের সংগঠনের জোর? কি আছে তোমাদের ফাণ্ডে? ট্রাইব্যুনাল, আরবিট্রেশনের পথটাও দেখা উচিত নয় কি?—তপনের শ্রমিক-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা নাই। প্রথম বিজয়ের আস্বাদনে তাহার পুঁথিপড়া ক্ষ্যাপা-মন মাতিয়া উঠিয়াছে, বিপদ্ ঘটাইবে হয়ত সে 'দেশলক্ষ্মীতে', আর ঐ এলেকার সমস্ত মজদুর আন্দোলনে—ওই 'লুম্পেন' বিলাসপুরীয়াকে বড় করিয়া দেখিয়া। সমগ্র পরিস্থিতি ভুলিয়া কেবল একটা খড়কুটায় আগুন ধরাইয়া।

অমিতেরও মনে হইল—বড় উগ্র, বড় ধৈর্যহীন তপন। কর্মকে চিন্তার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া লইবারও যেন সময় নাই; তথ্য ও তত্ত্বের অঙ্গাঙ্গিত্ব বুঝিবার মত অভিজ্ঞতা সে লাভ করে নাই। এইরূপই হইবার কথা, পুঁথিপড়া পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী কর্মীদের মধ্যে অধীরতা, অতিবিপ্লবী কর্মোন্মাদনা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।—তাহার নিজের পক্ষেও তাহা ঘটিত। চিন্তার পর চিন্তার গ্রন্থি খুলিতে গিয়া ধৈর্য হারাইয়া কর্মে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে সে নিজেও—ঠিক কাজই অবশ্য সে করিয়াছে।—কিন্তু চিন্তার গ্রন্থি কি তাহাতে খুলিয়া গিয়াছে?... টু বি অর নট টু বি—কই, হ্যামলেটেরও সংশয় ত ঘোচে না। সংশয়-তাড়িত বলিয়াই না হ্যামলেট ঝাঁপাইয়া পড়ে উগ্রতম উন্মাদনায় কর্মক্ষেত্রে। হোক সে পোলিনিয়স্, হোক সে ওফিলিয়া, হোক সে রোজেনক্রাট্জ, কারো নিস্তার নাই তাঁহার নিকটে। এই হ্যামলেট। আর তাই কি আমরা অমিতেরা, তপনেরাও 'হ্যামলেটস্ অব দি এজ!'—পুঁথিপড়া মধ্যবিত্ত সমাজের মহৎ-কল্পনার ও মহৎ-প্রয়াসের ঘূর্ণিপাকে জড়িত বাঙালী বুদ্ধিজীবী আমরা—আমি অমিত, তপন,...আরও, আরও কত পরিচিত সমকর্মী—হ্যামলেটস্ অব দি এজ্?...

আজ অমিত জানে, সেদিন সে হ্যামলেটের চিন্তা-উদ্বুদ্ধ কর্মী চরিত্রকে চিনিতে পারে নাই। ভুল করিয়াছে, ভুল দেখিয়াছে কোলরিজ-এর মত কর্মশংকিত চোখে দেখিয়া হ্যামলেটকে। বুঝে নাই হ্যামলেট্ কর্মবীর আর চিন্তাবীর। তপনও নয় ক্ষ্যাপা বুদ্ধিজীবী, অমিত নয় ক্লান্ত কর্মী। সেই 'হার্স ওয়ার্লডও' শেষ হইতেছে, আসিতেছেন আর-এক দিন:—এইরূপই তাহার হ্যাম্লেটস্ অব্ দি এজ্—চিন্তাবীর ও কর্মবীর, সংগ্রাম-প্রবুদ্ধ 'নতুন মানুষ।' কর্মই চাই প্রথম, কর্ম—ক্ষেতে, মাঠে, গ্রামে, শহরে, কলকারখানায়—সর্বত্র, সর্বত্র। হ্যাঁ, চাই চিন্তাও; কিন্তু চাই সংগ্রাম।...

বুদ্ধিজীবী তপনের জন্য নয়, বুদ্ধিজীবী মালিক 'ম্যানেজারদের চেষ্টাতেই দেশ-

লক্ষ্মীতে সংগ্রাম বাধিয়া গেল। ইউনিয়নের দাবি ও নোটিশ মাত্র পেশ হইয়াছে, অমনি সুখারীকে লইয়া গোলমাল বাধিল সর্দারের সঙ্গে। তাহার তলব কাটা যাইবে। তাঁত-ঘরে কাজ নাই বলিয়া নোটিশ হইল কিছু মজুরের উপর। নোটিশ হইল কিছু মেয়ের উপর; আর তাহাদের মধ্যে পার্বতীও আছে। ইউনিয়ন নেতাদের মধ্যে শুধু রশিদেরই কিছু হইল না। সে পাকিস্তানের মুসলমান, তাহাকে বিদায় করিতে পারিলে ম্যানেজার খুশি হইতেন। কিন্তু ইঞ্জিনের কাজ এই নোয়াখালী-চাঁটগাঁয়ের মুসলমানদের ছাড়া চলে না। অতএব, তাহাকে তোয়াজ করিয়াই রাখা উচিত। সে ভার জাফর আলী শেখের উপর। চেষ্টার ত্রুটি করিবে না জাফর আলীও। কিন্তু নোটিশ হইতেই মেয়ে মজুরগুলি প্রথম কাজ বন্ধ করিল। মংগলী বিলাস-পুরীয়া রুখিয়া দাঁড়াইল। তিনজনার উপর, 'লুটিশ' হইয়াছে। তাহারা তিনজনাই কিন্তু তাহা শুনিবে না;—'লুটিশ তুলে নাও সাহেব, নইলে দেখি কে কাজ করে এ ঘরে।' কাজ বন্ধ হইল। মংগলী আসিয়া দাঁড়াইল, আঙিনায় ডাকিল তাঁতঘরের মজুরদের, 'তুহারা শুনস নাই লুটিশ দিয়েছে পার্বতীকে, মাদ্রাজী মারিয়াম্মাকে, বুড়ী লছমনিয়াকে?' বাহির হইয়া আসিল তাঁতঘরের লোকেরা।

তারপর বিপুল উত্তেজনা।

রশিদ আসিয়া ম্যানেজারকে জানাইল, ইঞ্জিন-ঘরও কিন্তু বন্ধ হইবে—যদি ম্যানেজার নোটিশ তুলিয়া না লন।

দেখিতে না-দেখিতে হরতাল। সম্পূর্ণ বন্ধ কারখানা দুপুরের পরেই! বুদ্ধি, পরামর্শ, সংগঠন, ফণ্ড—কোনো কিছুরই পরোয়া না করিয়া দেশলক্ষ্মীর মজুরেরা দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে মিলের সমস্ত কাজ বন্ধ করিয়া ঘোষণা করিল, 'লুটিশ উঠা লও', 'ম্যাঙ্ পুরী করো।'

আগুন চোখে জ্বলিতেছে মংগলীর। আর তেমনি প্রদীপ্ত অগ্নি চারিদিকে। আলাপ, চেতনা, অভিজ্ঞতা—ইহার মধ্য দিয়া কখন পরিচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে রশিদের মন। নিজের মনের আগুন পার্বতীই বা কতটা চাপিয়া রাখিবে?

কিন্তু এবার ম্যানেজার ও মালিকেরাও আসলে প্রস্তুত ছিল।...চিরদিনই প্রস্তুত থাকে সেই বিষ-কুটিল চক্রান্তকারী রাজা ও লেইরটিস্—হ্যামলেট্ ঝাঁপাইয়া পড়ে দুঃসাহসে, জানে অমিত। আধঘণ্টার মধ্যেই আসিয়া গেল এক লরী গুর্খা পুলিশ। তখনো ইঞ্জিনঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া রশিদ,—ইঞ্জিন তখনো চলিতেছে। সেখানে দাঁড়াইয়াই দেখিল বড় দারোগা হুকুম করিল, কাজ না করিলে মজুরেরা মিল ছাড়িয়া যাক্। তারপর এক-একটা ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইল বন্দুকধারী গুর্খা; মিলের ফটক বন্ধ হইল। উহার বাহিরে পাহারা দিতে লাগিল দুইজন গুর্খা, ভিতরে দরওয়ানরা। রশিদ ও মামুদের আর কাজ করা হইল না। ইঞ্জিনঘরের দুয়ার হইতে আসিয়া দাঁড়াইল তাহারা সকলের সঙ্গে আঙিনায়। বড় দারোগা হুকুম করিতেছে—মজুরেরা মিল খালি করিয়া দিক্, শান্তভাবে বাহির হইয়া যাক্। না হয়, নিজ নিজ কাজে লাগুক প্রত্যেকে।

আগুন এবার বুঝি জ্বলে। চারিদিক থমথম...

মিল চালাবে কে রে হামরা মিল খালি করে দিলে—ওই মোটকা ম্যানেজার?—মংগলী হাসিয়া খুন। উত্তেজনায় স্তব্ধ চারিদিক; হঠাৎ এই হাসিতে ফাটিয়া পড়িল মজুরেরা সকলে।

চালাবি তুহারা? চালা না দেখি—কত তুহাদের তাগদ। কেমন তুহাদের বাপের জন্ম—কথাটা আরও একটু অশ্লীল হইতেছিল। কিন্তু মংগলীর চোখ ছিল অন্য দিকেও—ঘেরাও করিতেছে চারিদিক হইতে সিপাহি-দরওয়ানে মিলিয়া তাহাদিগকে। মিলের ফটকও খোলা নাই যে। কী খেয়াল হইতেই মংগলী বলিল: আচ্ছা চালা না তুহারা, চালা। দেখব হামরা।—চল্‌লো, চল্...দেখি উহারা কল চালাক, হামরা যাচ্ছি ঘরে।...উহারা কল চালাক...পুলিশ আর দরওয়ানে মাকু চালাক,...হামরা ঘরে বসে শুনি...

"চল্ চল্।" মংগলীর সঙ্গে সাড়া পড়িয়া গেল—চল্-চল্। বাহির হইয়া চলিল সকলে। ম্যানেজার সাঙ্গ-পাঙ্গ লইয়া এবার নিজের আপিসের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাই ত, মিলের আঙিনায় আর কাহাদের ঘেরাও করিয়া চড়াও করিবে পুলিশ-দরওয়ান?

ফটকের বাহির হইতে মংগলী আবার হাঁকিল ম্যানেজারের উদ্দেশে,—দেখিস সাহেব, বাপের ব্যাটা যদি হোস বে-ইমানি করবি না—কল চালাবি তুহারা।

কিন্তু এদিকে ইউনিয়নের আপিসের লাল ঝাণ্ডা বাহির করিয়া লইয়া আসিয়াছে পার্বতী আর কেষ্ট মল্লিক। দেখিবা মাত্রই উত্তেজনায় আগুনের মত মজুরেরা জ্বলিয়া উঠিল। অমনি লাল ঝাণ্ডার সভা বসিল, লাল ঝাণ্ডার শপথ লইল—বস্তি ছাড়িয়া ছেলেমেয়ে তখন আসিয়া জড় হইতে লাগিল। আগুন ছড়াইয়া পড়িতেছে শ্রমিক বস্তিতে, নিকটের পথে, দোকানে, লোকের মুখে, কথাবার্তায়: 'বাহাদুর মজদুর, দেশলক্ষ্মীর।'

কলেজের ল্যাবরেটরি হইতে ইউনিয়নের আপিসে নিত্যকার মত আসিতেছিল তপন; দেখিয়া অবাক। দেখুক মোতাহের ও অমিত—তাহার উগ্রতা, তাহার বামপন্থী বাড়াবাড়ির কোনো প্রয়োজন হয় নাই। জানে কি অমিত আপনাদের সংগ্রাম-বুদ্ধিতেই আগাইয়া গিয়াছে দেশলক্ষ্মীর মজুর?

এক মাসের নোটিশের সময় পার হয় নাই। ট্রাইব্যুনালে আবেদনের চেষ্টাও করে নাই মজুরেরা।—সাবধানে মজুরদের জানায় একবার তথাপি তপন।

উঃ, তুহরা বাবুরা করগে—জানাইল মংগলী। মামলা, মোকর্দ্দমা তুহাদের ভালো লাগে, তুহরা কর। হামরা যা জানি, তা'ই করি।

অমিতও মনে মনে স্বীকার করে—ভাঙিবে কি এবার হরতাল? হয়ত ভাঙিবে। 'হ্যামলেট্' এই হার্শ ওয়ার্লডে বলি যাইবে।—দেশলক্ষ্মীর মজদুরও হয়ত এবার হারিবে। শেষ সংগ্রামে ছাড়া কোন সংগ্রামে জিতে আবার কবে মজদুর? তবু সংগ্রামটাই আসল কথা। আর তাই 'বাহাদুর মজদুর দেশলক্ষ্মীর।'

আগুন জ্বলিতে লাগিল। বন্ধ হইয়া যাইতেছে ইঞ্জিন-ঘর। সমস্ত মিল যেন একটি

মৃত্যুপুরী। রাক্ষস পড়িয়াছে দেশে। পাড়ায় পাড়ায় শ্রমিকের উত্তেজিত পদধ্বনি, দৃঢ় পদক্ষেপ। সপ্তাহের পর সপ্তাহ শেষ হয়। তলব মিলে নাই। মালিকেরা মিলের সস্তা রেশন বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহা না পাইলে শীঘ্রই খুনাখুনি হইবে। শুনিয়া কেমন চিন্তিত হয় অমিত। মল্লিক ছুটিতেছে দিনরাত্রি। কলেজ আর বেশিক্ষণ করা চলে না তপনের। বাড়িতেও কিন্তু ফেরা সম্ভব নয় সব সময়ে। তিনজনে বাসা বাঁধিয়া লয় ইউনিয়নের আফিসে, ছোটে কলিকাতার শ্রমিক দপ্তরে। রেশনের কার্ড যদি বা আদায় করিল রেশন কিনিবে কি দিয়া মজুরেরা? হপ্তার তলব অল্পই বাকি ছিল। যাহা পাওনা তাহাও মিলে নাই। দোকানীরা আর বাকি দিবে কি তেল নুন?

জাফর সর্দার নিষেধ করিয়া দিয়াছে তাহাদের—সাবধান! সব মারা যাইবে। এবার আর খেলা নয়। মালিকেরা আগেই এই সব বুঝিয়াছিলেন। তাই এবার আর মালিকেরা আপোস করিবেন না।

মজুরদের কাহারও ঘরে চাল ডাল নাই। ইউনিয়নের ফণ্ড হইতে কতটুকু সহায়তা হইবে? নিকটের গ্রামে যাও, কৃষক বস্তিতে যাও, গৃহস্থদের বাড়ি যাও। যে করিয়া পার সাহায্য সংগ্রহ করো। অন্তত জনসাধারণকে মিলের অবস্থা বুঝাইযা বলো—কেন তাহারা কাপড় পায় না। তাঁতে এত কাপড় বুনিতেছে মজুরেরা, কেন তবু দেশের লোক কাপড় পায় না বুঝাইয়া বলো। খুদকুঁড়া যাহা পার সংগ্রহ করিযা আনো তাহাদেব নিকট হইতে।

কলিকাতার মধ্যবিত্ত বন্ধুদের বাড়ি ছোটে অনুরা, সুজাতারা, মঞ্জুরা, বুলুরা।

মিলের কাছাকাছি গ্রামে যায় পার্বতী। প্রথম প্রথম গেল অনুকে লইয়া। কি বলিতে হইবে পার্বতী বুঝিতে পারে না। তারপব একা-একাই চলিল পার্বতী; অনু ইস্কুলের কাজে যায়, উহা শেষ করিয়া আসিতে দেরী হয। তারপব মজুর-মেয়েদেরও দুই একজনকে পার্বতী সঙ্গে লয়—গ্রামে চাঁদা তুলিতে হইবে। হরতালের ফণ্ড শূন্য হইতেছে। বাড়ি বাড়ি যাইতে হইবে, অন্তত ছেলেমেয়ের খাদ্য জুটাইতে হইবে। পার্বতীর ও স্বামীরও খাদ্য চাই অন্তত দিনে এক বেলা। বেলুড়ে দাদাব নিকটে পাঠাইয়া দিবে ছেলেটাকে। হাঁ, যেমন করিয়া হোক এক সপ্তাহ, দুইটা সপ্তাহ দাদা উহাকে বাঁচাক। মেয়েটাকে নিজেই লইয়া ফিরিবে পার্বতী; যেমন পায় খাওয়াইবে, না পায় খাওয়াইবে না। তবু কাজ করিতেই হইবে,--হাঁ, কাজ করিতেই হইবে। ধার এখনো জোটে কেষ্ট মল্লিকের? তপনেরও জোটে—একেবারে না দেখিলে চলিবে কেন এতগুলি মজুরকে।

দোকানী পশারীকে কিছু নগদ দিতে পারিলে কিছুটা তাহারা বাকি দেয় এখনো। কারণ তাহাদের বরাবরকার ক্রেতা মজুর-মজুরানীরা। জানু সর্দারকে না হয় দোকানীরা বলিবে—বাকি দেয় নাই। এখনও সাহায্য না করিলে ভবিষ্যতে মজুরেরা কিনিবে কেন আর তাহাদের দোকান হইতে? আর একেবারে 'না' বলিবার উপায় কি আছে? লুঠ হইয়া যাইবে না দোকান? মংগলীর চোখ দেখিলেই বুঝা যায়—

বেশি আপত্তি করিলে এখনি আগুন লাগিবে এই দোকান-পত্রে। অসম্ভব নয় কোনো কাজ এই হরতালীয়া মজুরদের। অসম্ভব আরও নয় এইখানে মংগলীর মত ভয়ঙ্কর মেয়ে থাকায়। মানুষ লইয়া খেলিতে জানে এই বিলাসপুরীয়া মেয়েমানুষটা, আগুন লইয়াও খেলিতে জানে। কেমন করিয়া সে পাহারা বসাইয়াছে জানু সর্দারের বিরুদ্ধে! জাফর শেখের দালালি কেমন করিয়া সে ধরিয়া ফেলিতেছে। চারিদিকে তাহার দৃষ্টি, চারিদিকে তাহার গতি। কলে ও সাহেবটা কে আসিয়াছিল? 'লেবর আফিসার' সরকারের লোক? যেই হোক মালিকদের কেহ। দালালির একটা না একটা ফন্দিতে সে ঘুরিতেছে। মংগলী চিনে ওই তিলিতলা চটকলের খুনী ইউনিয়ন বাবুদের। হাঁ, হাঁ, লম্বা লম্বা কথা; লম্বা দৌড়। সাবধান! এই পাড়ার কোনো চায়ের দোকানীর ঘরে তিলিপাড়ার ওইসব লোকদের দেখিলে কিন্তু দেশলক্ষ্মীর মজুরেরা দোকানীকে ক্ষমা করিবে না।

গেল দুই সপ্তাহ। মিলে তালা বন্ধ করিবে এবার মালিকেরা। তবু জাফর সেখ ও জানু সর্দারের সাধ্য হইল না কাহাকেও হরতাল ভাঙিতে মুখ খুলিয়া বলে। গেল তিন সপ্তাহ। সত্যই তালা বন্ধ হইল মিলে। যেন এক বারের মত জিতিল ইউনিয়ন। চোখে মুখে দর্প মংগলীর :—কোথায় ম্যানেজার সাহেবের সাঙাৎরা, কল চালাইল না তাহারা? মজুরদের ত খুব কল হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। কল চালাইল না তারপর?

কিন্তু চার সপ্তাহও গেল। কল না চলিলে মজুরদেরও যে দিন চলে না। ওড়িয়ারা বাড়ি গিয়াছে কেহ কেহ—দেশে শীঘ্রই ধান উঠিবে। হিন্দুস্থানীরাও সকলে নাই। বাঙালীরা আশপাশের গ্রাম হইতে কাজে বেশি আসিত; তাহারাও এখন নানা খানে চাষের কাজ করিতেছে। কিন্তু মাদ্রাজীরা করিবে কি?

কোয়ার্টারে যাহারা আছে তাহারা আরও উদ্বিগ্ন হইল। ঘর ছাড়িবার নোটিশ দিয়াছে মালিকেরা। পার্বতী জানাইয়া দেয়—ঘর ছাড়ার কথাই নাই। আসুক মালিকেরা যদি পারে সিপাহি লইয়া, তারপর দেখা যাইবে।

মারামারি হইবে, লাঠি চলিবে, হয়ত বন্দুকও—ভয়ে কাঠ হইয়া যায় পার্বতীর পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্বামী। ভয় কি পার্বতীও পায় না? কিন্তু ভয় পাইলেই বা করিবে কি? সংগ্রাম করিবে না? তাহা ছাড়া আর উপায় আছে কাহারও বাঁচিবার? দাদা ছেলেটাকে রাখিতে চাহেন না। মেয়েটাকেই বা আর কত দিন না-খাওয়াইয়া না-পরাইয়া রাখা যাইবে? নিজের আর স্বামীরই বা এভাবে চলিবে কিরূপে? তবু ত পার্বতীর নিজের অবস্থা তত সঙ্গিন নয়। দোকানী এখনও তাহাদের ধারে তেল নুন দিতে অস্বীকার করে নাই। পার্বতী নিজেও বোঝে না—তাহারা আর কত দিন ঐরূপ ধার দিবে। কিন্তু নিজেও জানে না আর কোথায় তাহারা যাইবে? অন্য কোনো কলে? অন্য কোনো কাজে? কোথায় তাহারা কাজ পাইবে? সেখানেও ত সংগ্রামই করিতে হইবে। তাহা হইলে এই সংগ্রামই বা ছাড়িয়া যাইবে কেন? সংগ্রাম ছাড়া বাঁচবার পথ কই?

পার্বতীর স্বামী দেশে ফিরিয়া যাইবার কথা বলে। তপনকে পাইয়া, অমিতকে পাইয়া সে কথা বলিবার সে সুযোগ পাইল। দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা মন হইতে তাহার এখন মুছিয়া গিয়াছে। তাহার চক্ষে এখন বরং একঘেয়ে, অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে এই কুলি-কোয়ার্টারের জীবন। নানা জাতির ঘর, নানা ধরণের মানুষ, বাঙালী এখানে আর কেহ বিশেষ নাই। পার্বতী কাজে চলিয়া গেলে দীর্ঘ সময় সে কোনরূপে উঠিয়া আসিয়া বসে বাহিরের আঙিনায়। দেখে এই কোয়ার্টারের জীবন-যাত্রা। তাহার সঙ্গে কথা বলিবার কেহ নাই, কেহ কথা বলিতে আসেও না। কুলিদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলে তাহার ছেলেমেয়ে। একটা কায়স্থ সন্তান সে, ভদ্রলোক। কি ভাষায় তাহার ছেলেমেয়ে কথা বলে, কি ভাষা শিখিতেছে তাহারা? লজ্জা হয় তাহার। কি রকম চাল-চলন এই মাদ্রাজী ও হিন্দুস্থানী মেয়েগুলির! যদি দেখিত অমিত! বিশ্রী! চরিত্রই বা ইহাদের কিরূপ? কাহারও যে লজ্জা নাই, শরম নাই, চরিত্রের বালাইও নাই,—তাহা পার্বতীর স্বামী বুঝিতে পারিতেছে। সর্বদাই ত দেখে এই বিলাসপুরীয়া মংগলীকে। এ কি মেয়েমানুষ? অথচ ইহাদের সহিত একত্র কাজ করিতে যায় পার্বতীও। কাজ করে, গল্প করে, একসঙ্গে মিটিং করে—বক্তৃতাও দেয় পার্বতী। পুরুষের মধ্যে, নানা জাতীয় পুরুষের সঙ্গে গা ঘেঁষিয়া বসে, পুরুষের পাশাপাশি মিছিলে চলে; এই বিলাসপুরীয়ার মতই হয়ত পুরুষের সঙ্গে হাসে, হয়ত পরিহাসও করে। অন্তত সভায় উঠিয়া নাকি উহার মতই সে বক্তৃতা দেয়—বলে তাহা পার্বতীর মেয়ে। বলে অন্যান্য সকলে—'পার্বতী, তুই খুব ভালো বলিস। কিন্তু মুখ বটে বিলাসপুরীয়ার! কিছু আটকায় না মুখে!—মুখেও না চরিত্রেও না। আশ্চর্য মেয়ে!'

অস্থির হইয়া উঠে পার্বতীর স্বামী। না, জবাব যখন হইয়াছে তখন পার্বতীর এখানে আর পড়িয়া থাকিয়া কি হইবে? দেশে চলুক পার্বতী। দেশে দুই মুঠা তাহারা নিশ্চয়ই খাইতে পাইবে। অবশ্য ঠিক বলিয়াছে অমিত, 'পাকিস্তান' হইয়াছে দেশ। দেশের মানুষও দেশ ছাড়িয়া এদিকে আসিতেছে। অনেকে নানাস্থানে ভিড় করিতেছে। কেহ কেহ আশ্রয়কেন্দ্রে স্থান লইয়াছে। বেশ, চলুক পার্বতী না হয় টিটাগড়ের এই আশ্রয়কেন্দ্রেই,—দেশের লোক আছে সেখানে। হাঁ, আপাতত সেখানেই চলুক। তবু এই কারখানার ত্রিসীমানায় আর নয়। এখানে মানুষ থাকে? মানুষ ইহারা?—কিন্তু পার্বতীকে আসিতে দেখিয়াই চুপ করে তাহার স্বামী ভয়ে। পার্বতী ক্ষেপিয়া যাইবে আশ্রয়কেন্দ্রের কথা শুনিলে। সে কি ভিখারী, না, সমস্ত মান ইজ্জৎ খোয়াইয়াছে? নিজের পরিশ্রমে রোজকার করে সে। 'নিজের জোরে খাই। আমি কেন যাব আশ্রয়কেন্দ্রে? কাজ করব খাব, খাওয়াব ওদের। অন্যের ভাবনা কেন আমার জন্য, এই হরতালের জন্য? আমি ত ভাবি না।'

কিন্তু ভাবে না কি পার্বতী? অমিত পার্বতীকে দেখিতেছে, সে জানে—পার্বতীর চোখে মুখে ভাবনা। না, শুধু পরিশ্রম ও ঘোরাফেরার শ্রান্তি তাহা নয়, সংসার ও ভবিষ্যতের ভাবনাও আছে। তবু উহার সহিতই আছে সেই মুখে একটা সংকল্পের

দৃঢ়তা ; এই চেতনা—সে পার্বতী, দেশলক্ষ্মী মিলের মজুর ইউনিয়নের সে একজন। নিজের পরিশ্রমে সে পরিবার বাঁচাইয়াছে, নিজের মান বাঁচাইয়াছে। কাহারও নিকট হাত পাতে নাই সে এই কলে কাজ পাইবার পর হইতে। অমিত দেখিয়াছে তাহার শান্ত গর্ব—'কারও কাছে হাত পাতি নি আর—কাজ পেয়ে অবধি।' কাহারও গলগ্রহ সে নয়—দাদার নয়, স্বামীর নয়, সমাজেরও নয়। সঙ্গে সঙ্গে আরও বলিয়াছে পার্বতী, 'দোকানী তাই আমাকে তেল নুন ধার দেয় বিনা প্রশ্নে। কিন্তু বুঝি ওদেরও কেমন এখন সংশয় আসছে—আমি ধার শোধ করতে পারব ত শেষ পর্যন্ত? আমি বলি, 'না, না, ভয় করো না। বেঁচে থাকলে কাজ করব, ধার শোধ করব।' 'না, না', বলে তারা, 'না,—তোমার কথা ভাবছি না পার্বতী মা। ভাবছি এই মাদ্রাজীদের কথা—।' 'কারও কথা ভাবতে হবে না—ইউনিয়ন যখন আছে, ইমান তখন থাকবে।'...

কিন্তু পাঁচ সপ্তাহ ছাড়াইয়া ছয় সপ্তাহও শেষ হয় যে। কলও খোলে না, কাজও শুরু হয় না। জাফর মিঞা বলে, আর আমরা কতদিন বসে থাকব? বালবাচ্চা নিয়ে মরছি যে।

কথাটা নীরবে শোনে, পরে সমর্থনও করে ওড়িয়ারা। তারপর হিন্দুস্থানীরা। তারপর আরম্ভ হয় মল্লিক ও তপনকে প্রশ্ন। মজুর মেয়েপুরুষের ডিপুটেশন সঙ্গে করিয়া তাহাদের আশা উৎসাহকে জীয়াইয়া রাখিতে কলিকাতা যায় তপন ও মল্লিক। হতাশ হইয়া তাহারা ফিরিয়া আসে। তপন শোনে—শ্রমিক মন্ত্রী হস্তক্ষেপ করিবেন না। তিনি ট্রাইব্যুনালও বসাইবেন না। এই শ্রমশিল্পের বিরোধিতাকারী ও 'শিশুরাষ্ট্রের' বিরুদ্ধে নানা কুৎসা-রটনাকারীদের কথায় দেশলক্ষ্মীর মজুরেরা নাচিতেছে। আগে হরতাল ছাড়ুক সেই মজুরেরা, তবে মন্ত্রীবাহাদুর শুনিবেন তাহাদের কথা।

জাফর পরামর্শ দিল, 'ইউনিয়নে ডেকে আনো মন্ত্রী-বাহাদুরকে। তাকে প্রেসিডেন্ট বানাও। ওর সাকরেদ এই কথাই বলেছেন। মজদুর সঙ্ঘের দফতরে কাল এই কথা হচ্ছিল।'

'দেশলক্ষ্মী ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হবে ওই কানকাটা মন্ত্রীটা?'—রসিদ ক্ষেপিয়া উঠে। মংগলী হাসিয়া বলে, 'ওর মুরদ্ কত? আস্তে বলো না উহাকে এখানে জাফর চাচা, দেখবে তাকে মংগলী বিলাসপুরীয়া'—মাদ্রাজী, ওড়িয়া, হিন্দুস্থানী, বাঙালী কেহ মংগলীর কথার প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না। কিন্তু উপায় কি? দুইমাস চলিতেছে হরতাল, তিলিতলার চটকলের ইউনিয়নের 'বাবুরাও' ঘন ঘন আসা যাওয়া শুরু করে এইদিকে। হিন্দুস্থানীদের তাহারা বলে, 'এ ইউনিয়ন তোমাদের ফাঁসাচ্ছে, বুঝছ না? কমিউনিস্টদের এমনি নিয়ম—হরতাল বাধিয়ে দেশওয়ালী মজুরদের ফাঁসিয়ে দেওয়া।'

খড়দহ-পানিহাটির গ্রামের মেয়েরাও ইদানীং বলে পার্বতীকে, তা তোমরা এখন মিটিয়ে ফেলো না? মিলটা আমাদের বাঙালীদের; ওটায় কেন হরতাল?

মনে মনে পার্বতী ক্রুদ্ধ হয়—ওদের সব কিছুতে বাঙালী আর মাড়োয়ারী। মুখে পার্বতী বলে, কিন্তু আমরা বাঙালী মজুরেরাও না খেয়ে মরছি যে, দিদি। আমাদেরও যে জবাব দিচ্ছে কাজে।

তোমরা কমিউনিস্ট হতে গেলে কেন?

'কমিউনিস্ট!' সে আমরা হব কি করে? সে সব বিষয় জানি কি? বুঝি কি আমরা?

তবে হরতাল করছ কেন? এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে; হরতাল কে করে এখন কমিউনিস্টরা ছাড়া?

হরতাল করলেই দোষ আর ছাঁটাই করলে দোষ হয় না? হপ্তা কাটলে দোষ হয় না? বেতন কাটলে দোষ হয় না? আধ-পেটা খাইয়ে মানুষকে মারলে দোষ হয় না? কলে তালাবন্ধ করলেও দোষ হয় না?

গিন্নীরা আশ্চর্য হন। সেই মুখচোরা মেয়েটাও ফোঁস করে। সহজ কথা বোঝেন—পার্বতী আর সেই ভদ্রমেয়েটি নাই। সেই শ্রীছাঁদ লজ্জা সহবৎও তাহার আর নাই?

গিন্নীরা বাড়িতে মেয়েদের-বউদের বলেন, ওর সঙ্গে এত গল্প কি তোমাদের? তারপর পার্বতীকে জানান, ওগো ভালোমানুষের মেয়ে, যাও। তোমরা কলে কাজ করো—কলের কথা আমরা বুঝি না। তোমাদের কাজও আমরা ভাল বুঝি না, তোমাদের এসব কাণ্ডও আমাদের ভালো লাগে না।

কলিকাতার নারী সমিতির মেয়েরাও আবার আসিল দুইদিন। দেশে-গ্রামের ভদ্রলোকেরা এবার উদাসীন। গৃহিণীরা বসিয়া বসিয়া সবই শুনিল। কিন্তু চুপচাপ।

তপন ও অমিত অন্যান্য পরামর্শদাতাদের লইয়া কলিকাতায় বাহির হয়। বাহির হইয়া পড়ে কলিকাতার ট্রেড্ ইউনিয়নের কর্তারাও। কলিকাতায় কাহাকেও মধ্যস্থ খুঁজিয়া বাহির করা চাই। এদিকে মালিকেরাও এখন কথা চালাইতে চায়। কারণ মালিকেরাও বুঝে—ক্ষতি বড় বেশি বাড়িতেছে; একটা মিটমাট হইলে মন্দ হয় না। শুধু মন্ত্রীর উপর ভরসা করিলে জয় হইবে মন্ত্রীর, কলের যে ক্ষতি হইবে তাহা উহাতে পূরণ হইবে না। মালিকদের ইঞ্জিন-ঘর নিবিয়া গিয়াছে; কারখানার আঙিনায় ঘাস গজাইতেছে; মরিচা পড়িতেছে লোহা-লক্কড়ে। কারখানা একদিন খুলিতেই হইবে, সেদিন এই ক্ষতি পোষাইবে কিরূপে? কতদিনে তাহা তখন পূরণ হইবে?

আরও এক সপ্তাহ তবু কথাবার্তায় কাটে, তারপর মিটমাট হয়। ঠিক হয়, কেহ ছাঁটাই হইবে না; কাহারও হপ্তা কাটা যাইবে না; হরতালের সময়কার বেতন ও দাবিদাওয়ার বিচার হইবে পরে ট্রাইবুনালে।

জিতিয়াছে কি ইউনিয়ন? নিশ্চয়ই জিতিয়াছে।

শুধু শেষ যুদ্ধ নয়, সাময়িক খণ্ডযুদ্ধেও আবার জিতিয়াছে দেশলক্ষ্মীর বাহাদুর মজদুর।

তেষট্টি দিন পরে কল খুলিল। লাল ঝাণ্ডা লইয়া, মিছিল করিয়া, গলায় মালা পরিয়া, সকলের আগে চলিল ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি কেষ্ট মল্লিক; তারপরে পার্বতী আর মংগলী, রশিদ আর সুখারী, আর জঙ্গী কর্মীরা। মুখে লাল ঝাণ্ডার জয়; ইন্‌কেলাবের ঘোষণা; জয় জয়কার দুনিয়া কী মজদুরের। জীবনে এমন দৃশ্য আর দেখে নাই তপন। জোয়ারের জল যেন শুষ্ক নদীর খাতে জাগিয়া উঠিল। কানায় কানায় ভরিয়া গেল কারখানার মরা চড়া। আর কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে মজদুরদের প্রাণ। 'বাহাদুর মজদুর দেশলক্ষ্মীর।' অমিতের মনও সেদিন স্বীকার করিয়াছে—বাহাদুর মজদুর! আর হারিলেই বা ক্ষতি ছিল কি?—তপন তাহাকে জানায়, —সংগ্রাম বাদ দিলে শ্রেণী-সংগ্রামের থাকে কি?

দুইমাস মাত্র। কারখানায় মজুরের রাজ্য বুঝি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অন্তত অমিতদেরও মনে সংগ্রামশীলতা উগ্র হইতেছে। ট্রাইব্যুনাল বসিবে—মন্ত্রী কিন্তু সেই হুকুম দেন না। হঠাৎ বরং জবাব হইল এইবার রশিদের, আর মংগলীর। তেমনি হঠাৎ হরতালও আবার সঙ্গে সঙ্গে। অমনি আসিল লরী-ভরতি পুলিশ। আসিল তিলিতলার কলের ভাড়াটে দরওয়ানরা, আসিল বারাকপুরের 'জয়হিন্দ' বাবুরা। এবার তাহারা দেরি করিল না—প্ল্যান ঠিক ছিল মালিকের ও মন্ত্রীদের। এক-যোগে কারখানার মধ্য হইতে পুলিশে-দরওয়ানে মজুরদের লাঠি চালাইয়া বাহির করিল। মাথা ফাটিল মংগলীর ও কেষ্ট মল্লিকের; আর আরও দুইজন মজুরের। আবার তালাবন্ধ, লক-আউট। কিন্তু তারপর দিনই পাল্টা-আক্রমণ মজুরদের। ফটকের দরওয়ানদের গায়ের জোরে ঠেলিয়া ফটক ভাঙিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল বারশ' মজুর। সকলের আগে পার্বতী, সুখারী, রশিদ। নিজেরাই তাহারা কাজ চালু করিয়া দিল, মজুরেরা কারখানা দখল করিয়া বসিল। দুপুরে বাহির হইতে খাবার আনাইল। তখন মংগলী আসিল, মল্লিকও আসিল। দুপুর গড়াইয়া যায়—কিন্তু কেহ কারখানা ছাড়িল না, ছাড়িবে না। কারখানা কাহার যে তালাবন্ধ করে ম্যানেজার বা মালিক? একটা তাঁত যাহারা চালাইতে পারে না তাহাদের কেন এত মালিকানার বড়াই? যাহারা কল চালু করিয়াছে তাহারাই কল চালু রাখিবে; কারখানা ছাড়িবে না। লরী-লরী গুর্খা নামিল দুয়ারে, কিন্তু কারখানার ফটক ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া বসিয়াছে মজুরেরা।

অমিত শুনিয়া ভাবে,—কি হইবে? এখন আর উপায় কি?

সন্ধ্যা গেল, রাত্রি গেল। কেমন অসোয়াস্তি বাড়ে মজুরদের—এইভাবে আর কত বসিয়া থাকা যায়—কারখানার মধ্যে? সকালে মিলের বস্তিতে কোয়ার্টারে ফিরিয়া গেল একদল—বাহিরের নানাবিধ ব্যবস্থা চাই। তপন বাহির হইতে খাবার পাঠাইতেছে, উহার কিছু ভিতরে যায়, কিছু পুলিশে ধরিয়া রাখে। আর পারে না ভিতরের মজুরেরা। বেলা বাড়িতেছে। বাহিরে পুলিশের কর্তা ও মিলের কর্তাদের ব্যবস্থাও ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়িতেছে। ভিতরে? তপন খবর পায়, ভিতরেও এখন যুদ্ধের জন্য সাজিতেছে মজদুর। আর বসিয়া নাই কেহ। মংগলী আবার ব্যস্ত কাজে। সে-ই

বুঝাইতেছে কোন্ পথে আসিবে পুলিশ, কোথা হইতে তাহারা লাঠি চালাইবে; কোথা হইতে গুলি ছুঁড়িবে; কিভাবে বাধা ও ব্যারিকেড্ তুলিতে হইবে প্রত্যেকটি ঘরের দুয়ারে; প্রত্যেকটা ঘরের ভিতরে—তুলার বস্তার আড়ালে আড়ালে। একটা নূতন উত্তেজনা তাই ভিতরে।

অপরাহ্ণ যখন শেষ—তখন শুরু হইল গুর্খা পুলিশের অভিযান। লাঠি চলিল, কাঁদুনে বোমা ফাটিল, তারপর গুলি।...

দেখা গেল সাতজনের খোঁজ নাই। আহত মংগলী ও মল্লিকেরও খোঁজ নাই। কিন্তু গুলিতে আহত রশিদ, পার্বতী প্রভৃতিকে পুলিশ গ্রেফ্তার করিয়াছে। কোথায় তাহারা? তিনদিন ধরিয়া তপন তাহাদের সংবাদ সন্ধান করিতেছে। কেহ বলে তাহারা সম্ভবত পুলিশ হাসপাতালে; পার্বতী হয়ত মেডিকেল কলেজেই। শোনা গেল কে একজন মরিয়াছে হাসপাতালে। হয়ত মিথ্যা গুজব; কিন্তু সংবাদটা পাকা করিয়া জানা যায় না। তপনের নিজেরও ঘুরাফিরি বেশি করা সম্ভব নয়। তাহার নামে গ্রেফ্তারি পরোয়ানা সম্ভবত নাই; কিন্তু পুলিশ তাহাকেও খোঁজ করিতেছে। কিছুদিন বাড়িতে না থাকাই তপনের পক্ষে ঠিক। সে কলেজে যায়, সন্ধ্যায় মিলের নিকটস্থ মজুর বস্তিতে গিয়া বসে। কারণ হরতালটাও চালু রাখিতে হইবে ত—পুলিশের দাপটে ত্রাসগ্রস্ত হইয়া যেন মজুরেরা না ভাঙিয়া পড়ে।

মালিক-মজুরের সংগ্রাম যথা নিয়মে মজুর আর পুলিশ-রাজের সংগ্রাম এখন।

তপনকে গোয়েন্দা আপিসে দেখিয়া অমিত তাই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই---তপন কি করিয়া কলিকাতায় আসিল ও এখানে ধরা পড়িল। কলিকাতায় সে আসিয়াছিল কবে? দেশলক্ষ্মী মিলের সমস্ত সংগ্রাম, তপনের এই কয় বৎসরের ক্ষ্যাপামি-ভরা অক্লান্ত প্রয়াস, ছবির মত তাহার মনে ভাসিয়া উঠিতেছিল। কোথায় সেই বিলাস-পরীয়া মংগলী? দুর্বার প্রাণলীলা যাহার দেহের তটে তটে খেলিয়া বেড়ায়, দুঃসাহসের ঐশ্বর্যে যাহা মূর্তি না পাইলে আছাড়িয়া মরে সুরার পিপাসায়, দৈহিক কামনার সংকোচহীন নির্লজ্জতায়। কোথায় বা পার্বতী—'সাত চড়ে মুখে কথা ফুটিত না' যেই বাঙালী মেয়ের? যে কাজ করে, আর গর্বও বোধ করে কাজ করিতে। কোথায় বা কেষ্ট মল্লিক, আর সেই রশিদ—স্পষ্টভাষী, বুদ্ধিমান্, মুসলমান যুবক —যে পড়াশুনার নূতন আস্বাদন পাইয়া উৎসাহিত, কথায় কাজে বিচারশীল কিন্তু দৃঢ়সংকল্প, পৃথিবীকে নূতন চোখে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে।—এ সকলকে ফেলিয়া —দেশলক্ষ্মীর হরতালের সমস্ত দায়িত্ব যখন তপনের মাথায়—সে ধরা পড়িল?

তপন, ধরা পড়লে কি করে?—অমিত জিজ্ঞাসা করিল।

তপন জানাইল, কারখানার কাছে যেখানে রাত্রিতে থাক্তাম সন্ধ্যায় সেখানে কাল সংবাদ এল---থানার লোকেরা সাজছে, রাত্রিতে হানা দেবে নানা জায়গায়। বুঝলাম হয়ত এ অঞ্চলটা ঘিরে খোঁজাখুঁজি করবে মল্লিক আর মংগলীর জন্য। মল্লিক তখনি চলল অন্যত্র। মংগলীর ভাবনাই নেই---সে ওপারে চলে যাচ্ছে। কাল আবার হোলির রাত্রি। তার ত রাত্রি কাটবে হল্লায় সেখানে। আমি ভাবলাম বাড়ি গিয়ে ঘুমোই, বাড়িতে গিয়েছিলামও; কিন্তু কেমন ভালো লাগল না। দোলের রাত্রিতে বাড়িতে

একটু উৎসবও আছে। পুলিশ অনেক খোঁজ করে গিয়েছে দু'দিন আগে। তপন আজ বাড়ি ফিরেছে, তা নিশ্চয় জানবে, সকালেই এসে হয়ত পুলিশ হানা দেবে।... বাড়ি থেকে তাই না খেয়েই চলে এলাম, রাতটা কলকাতা গিয়ে থাকব। আপনাদের ওখানে গিয়ে দেখি আপনি বাড়ি নেই। সংবাদপত্রের আপিসে প্রথম খোঁজ নিলাম ---রশিদদের কোনো সংবাদ পাওয়া গিয়েছে কিনা, হাসপাতালের কোনো খবর আছে কিনা। কিছু জানা গেল না। বললাম, কাল বোধহয় আমাদের কারখানা অঞ্চলে পুলিশের একটা তোড়জোড় চলবে। কে একজন বললে, এ রকম কত গল্পই শোনা যায়। ট্রেড ইউনিয়ন আপিসে গেলাম না আর। কাগজের আপিসও তখন বন্ধ হচ্ছে। বারান্দায় অগত্যা তখন ঘুমিয়ে পড়লাম। শুনলাম---আপনারা নাকি আগেই জেনেছিলেন আজ কলকাতায় এত বড় একটা হানা হবে।

'আমরা জানতাম? কে বললে তোমাকে?

শুনলাম। সকালবেলা কাগজ আপিসের এদের কানাঘুষো---কারা কারা নেই, কারা রাত্রেই সরে গিয়েছে।

কথাটা অমিতও এখানে আসিয়া বার কয় শুনিয়াছে। যাহারা কাল সন্ধ্যায় ওসব আপিসে গিয়াছিল তাহারা কোনোরূপ আভাস সংগ্রহ করিয়াছিল। তাই রাত্রিতে নিজ নিজ স্থানে তাহাদের থাকিবার কথা নয়—হয়ত তাহারা গ্রেপ্তার হইবে না।

আমি যে কাল এদিকে আসিইনি, তপন। বলিল অমিত হোলির দিন। দোকান ত নেই, দেরিও হয়ে গেল যেখানে গেছলাম। ভাবলাম বরাবর বাড়ি চলে যাই।...

কে জানিত ভাগ্যের এমন চক্রান্ত? জানিত কি তাহা ইন্দ্রাণী, জানিত কি অমিত? জানিলে আজ হয়ত তুমিও ধরা পড়িতে চাহিতে না, অমিত।

তপনও বুঝি ইহাই ভাবিতেছিল। হাসিল, বলিল, দেখুন, ভাগ্য মানবেন ত? কি মানবেন—'লাক'? না, 'ফেট্'? দৈব, না, নিয়তি?

অমিতও হাসিল।—সবই মানি। আরও বেশি মানি—মঘা, অশ্লেষা, বারবেলা, দিক্‌শূল, হাঁচি, টিকটিকি, মাকুন্দোচোপা।—আর মনে মনে বলিল, আসলে মানি—ইন্দ্রাণী, সত্যই নিয়তির মত যার আবির্ভাব। নিয়তিই যেন। কে জানিত? এতদিন পরে দেখা, গল্প-তর্ক ত হইবেই। আর কে জানিত গল্পে-তর্কে আমার জন্যই এই বন্ধন-রজ্জু রচনা করিতেছিল বসিয়া ইন্দ্রাণী। কিন্তু শুধু ইন্দ্রাণী কেন? অমিতও। তর্ক ছাড়িয়া, গল্প ছাড়িয়া উঠিতে সেও চাহে নাই কাল সন্ধ্যায়। অমিতের অন্য কাহারও সঙ্গে কাল দেখা হইল না আর একেবারেই।

কার মুখ দেখেছিলেন আজ সকালে?

সকালে আর কাকে দেখব? এস-বি সাব্-ইন্‌স্পেকটারকে। সুদর্শন যুবক *ইনটেলিজেন্ট, কালচারড্ ম্যান, সোভিয়েত শর্টস্টোরিজ-পড়া স্ত্রী!*

তপন হাসিয়া উঠিল: এত খবর জানলেন কি করে?

না জানিয়ে পারেন নি তিনি। ভদ্রলোক ভদ্রলোককে ধরতে এসেছেন, একটা

কালচার আছে ত আমারও।—একই শ্রেণীর একই শ্রেণী-কালচারের আঁতাত। আমিই কি তা জানতে পেরে খুশি না হয়ে পারি? 'না', লোকটা ভদ্রলোক।—স্ত্রী গ্র্যাজুয়েট্।'

তপন হাসিল। কিন্তু কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হইল এবার দৃষ্টি।

অন্যদিকে আলোচনা চলিতেছিল, যাই বলো অমন লাইব্রেরিটা! কত কষ্টের বই, কত যত্নে সংগৃহীত। কত দুষ্প্রাপ্য বই রয়েছে যা এদেশে আর পাওয়া যাবে না,—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রথম দিককার লুণ্ঠনের কত প্রমাণ-পত্র, আর সংগ্রহ করা সম্ভব নয় এইসব। মঞ্জু অমিতকে বলিল, বইগুলি ওরা কোনো পাবলিক লাইব্রেরিতে দিয়ে দিলেও পারে ত? নয় রাখত ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে—

অমিত হাসিল, বলিল, বলে দ্যাখো না।

...এক একটা বইএর সঙ্গেও এক একটা ইতিহাস জড়িত। সে ইতিহাসই কি ভুলিতে পারি কেহ আমরা? ভাবো সেই 'সী কাস্টমস্ অ্যাক্‌ট' ফাঁকি দিয়া আনা পামে দত্তের 'ইণ্ডিয়া টু-ডের' কথা। খান দুই কপি মাত্র আসে তখন কলিকাতায়। দুই জন বিলাতের ছাত্র জাহাজ হইতে তাহা হাতে করিয়া নামে যেন ডিটেকটিব্ উপন্যাস।...ভাবো—সেই মার্কিন সৈনিক বন্ধুদের দেওয়া মার্কিনী সেট্ লেনিনের সিলেক্‌টেড্ ওয়াব্‌স।...ক্লাইব ব্রানসনের দেওয়া কড্‌ওয়েল-এর 'ক্রাইসিস্ ইন ফিজিক্‌স্'...স্পেনের গৃহযুদ্ধে যোগ দিতে না দিতেই মারা গেলেন যে কড্‌ওয়েল। আর ক্লাইব এখান হইতে আরাকানে পৌঁছতে না পৌঁছতেই জাপানী বোমায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইলেন। দীর্ঘদেহ, সুপুরুষ, একহারা চেহারা ক্লাইব্—একটা নিজস্ব সচেতনতা ছিল তাহার চেহারায়—সম্ভ্রম হইত সকলের, সম্ভ্রমও ছিল সকলের প্রতি। ওয়াভল্ ভুল করিয়াছিলেন সে অভিযান পরি-কল্পনায়। কিন্তু কর্নেল ভুল করেন নাই ক্লাইব্‌কে উহাতে মনোনয়নে। কমিশন না লইয়া যে লোক সাধারণ সৈনিক থাকে আর ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের সাহিত্য পড়ে, আর শিল্পকলা বোঝে, তাহাকে তাড়াতাড়ি মৃত্যুক্ষেত্রে পাঠাইয়া দেওয়াই কর্নেলের পক্ষে উচিত। সেই লাইব্রেরিতে ক্লাইবও কত সময় কাটাইয়াছে। গুদামের মত ঠাসা বই—উহার মধ্যে বসিয়া দেখিয়াছে এই দেশের নানা রিপোর্ট, নানা তথ্য ও নানা গ্রন্থ। 'ক্রাইসিস্ ইন্ ফিজিক্‌স্' তখন দুর্লভ গ্রন্থ। তাই সাধ করিয়া তাহা উপহার দেয় ক্লাইব্ বিদায় লইবার দিন সন্ধ্যায়। সাত দিনের মধ্যে বুথিডং-এর সীমানায় তার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায়।

দীর্ঘ দেহ, শান্ত চক্ষু আশ্চর্য মানবীয়তায় বলিষ্ঠ মন ক্লাইব।

চিন্তাস্রোত হইতে জাগিয়া অমিত শুনিল...অত কষ্টের প্রেস্, অত গর্বের কাগজ...গরিবের চাঁদায় গড়িয়া তোলা গরিবের সম্পদ...

কিছু যায় আসে না;—তপনের শক্ত কণ্ঠ শোনা যায়,—দি প্রোলিটেরিয়েট হ্যাভ নাথিং টু লুজ্ বাট্ দেয়ার চেনস্। শিকল ছিঁড়তে গেলে এ সব হারাতেই হবে অনেক কিছু।

কিন্তু সেই শিকল কি ছিঁড়িতেছে? একদিনের জন্যও বন্ধ করিবে কি প্রোলিটেরিয়েট তাহার সব কাজ—তাহার নিজের পার্টির নামে? আর ইহার যদি প্রতিবাদ না হয়—মজুরদের পক্ষ হইতে, ছাত্রদের পক্ষ হইতে...

কেমন সংশয় ফুটিয়া উঠে সূর্যনাথের কথায়।

লাফাইয়া উঠে তপন,—তাহলে বুঝবে এসব জিনিস সত্যই শিকল হয়েছিল প্রোলিটেরিয়েটের পার্টির পক্ষে। এ মোহ ভঙ্গ না হলে আমাদের সর্বনাশ হত—আমরা কাগজ আর লাইব্রেরি আর নিম্নমধ্যবিত্তের রাজনীতিতে ডুবে যাচ্ছিলাম।

...দীর্ঘদেহ, শান্তচক্ষু, ক্লাইব,—মহাযুদ্ধের অসংখ্য বীরপ্রাণের মধ্যেও ছিল মানবীয়তায় বলিষ্ঠ বীর। কিন্তু কে মনে রাখিয়াছে তোমাকে যুদ্ধের শেষে? প্রোলিটেরিয়েটের এই সংগ্রাম না বাধিতেই আমরাও তোমাকে ভুলিতে বসিয়াছি—বিদেশী বন্ধু ভারতীয় স্বাধীনতাবাদীদের...ক্লাইব...

অমিত ভাবনায় ডুবিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ সে শুনিল তপন জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'দেশলক্ষ্মীর' ওরা জেনে যাবে নিশ্চয় আমি ধরা পড়েছি, কি বলেন? কিন্তু সংবাদটা 'কলেজে' দিতে পারা যাবে কি?

তাকাইয়া দেখিল আলোচনা অন্যপ্রান্তে চলিয়া গিয়াছে। আড্ডা ও আমোদপ্রিয় সৈয়দ আলীকে ঘিরিয়া বসিয়াছে সকলে। গল্প জমিতেছে। উহারই এই প্রান্তভাগে বসিয়া তাহারা দুইজনেই উন্মনা, অমিত আর তপন। তপনের কথা শুনিয়া অমিত বলিল : শক্ত কথা। কেন? কামাই-এর কথা ভাবছ? দ্যাখা যাক না—কতদিন রাখে, কি করে ওরা আমাদের নিয়ে!—

তপন চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল, বাড়িতে ওরা বুঝে নেবে দু-একদিন পরেই। অবশ্য, কলেজে খবর দিলে ভাস্কর তা জেনে যেত, বাড়িতেও আর ভাবত না বেশি।

একটা নূতন বাতায়ন খুলিতেছে, তাহারই যেন আভাস পাইতেছে অমিত। দেশলক্ষ্মীর হরতালের যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে নয়। যেখানে খড়দহ-পেনেটির অধ্যাপক ব্রাহ্মণ গোলোক ভট্টাচার্যের স্নেহ-সদাচার-ঘেরা সাধারণ সংসার—সেই একান্ত পরিচিত আর অমিতের অতি-সামান্য পরিজ্ঞাত জীবন-যাত্রার দিকে এবার বুঝি তপনের মনের বাতায়নটি খুলিয়া যাইতেছে—এখানে, এখন, প্রোলেটেরিয়েটের সংগ্রাম যখন বাধিতেছে—এই গোয়েন্দা আপিসের নূতন করাঘাতে। সচকিত সহজ কৌতুকের সঙ্গেই এই অ-সহজ প্রসঙ্গটাকে স্বাভাবিক, সহজ করিয়া তুলিতে হইবে অমিতের। সে তো জানে—দেশলক্ষ্মীর শ্রমিকরা শুধু নয়—তপনের অন্তরেরও অন্তরে, কাহার স্থান—অমিত জানে—জীবন দিয়াই জানে।

অমিত বলিল, একটু ভাবুনই না ওঁরা।

তপন ক্ষীণ হাসি হাসিল। কথা বলিল না।

অমিত বলিল, কে বেশি ভাববেন বলে তোমার এত ভাবনা, তপন?

এবার তপনও সলজ্জ স্নিগ্ধ হাসি হাসিল। অমিতের নূতন লাগিল সেই

কর্মোন্মাদ তপনের মুখে এই সলজ্জ হাস্য। মনে হইল তপন বুঝি তাহার অপরিচিত—আবার তাহার অংশীদারও। জোর করিয়াই কৌতুকের কণ্ঠে আবার তপন বলিল, সংসারে আমাদের 'ভাববার লোক আছে, অমিত দা'। আমরা ত বাউণ্ডুলে লক্ষ্মীছাড়া নই। স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, মা আছেন, বাবা আছেন, চাই কি বাড়িতে গাইগরু পর্যন্ত আছে—না হয় গোবিন্দ-মূর্তির কথা ছেড়েই দিলাম—তিনি ভাবনার অতীত বলে।

অমিত একটা বহু পরিচিত পৃথিবীর রসোপভোগ করিতেছে শত অভিজ্ঞতার কৌতুকে।—হাঁ, গোবিন্দ ঠাকুরের কথা ছেড়ে দাও। তাঁর ভাবনা নেই, তুমি না থাকলেও তাঁর পুজো নৈবেদ্য ঠিক চলবে—যতদিন অন্যেরা আছেন। দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র-বিপ্লবে তাঁর যাবে-আসবে না। বরং তুমি থাকলেই তাঁর অসুবিধা হবার কথা। গরুটারও জুটবে কিছু; কারণ, তিনি ত গো-মাতা। মুশকিল হবে আর তাই ভাবনাও বাড়বে বরং স্ব-মাতার; এবং পিতার; আর যখন মূর্খের মত নিজের দাসখত লিখে দিয়েছ, তখন তোমার শ্রীচরণের দাসীই বা ছাড়বেন কেন? তারপরে ছেলে আছে একটি? না, ইতিমধ্যে সেদিকে আরও সৌভাগ্য লাভ ঘটেছে?

কোথায় আর সে সম্ভাবনা হল? পড়ে গেলাম এসব পাল্লায়, আর না হল ধন-লাভ, না হল জন-লাভ।

ধন-লাভের ত্রুটিটাই কিন্তু বড় ত্রুটি। সেই বিচ্যুতিটা কত দূর গড়িয়েছে?

অমিতের কৌতুকের সুরেও এবার একটু উদ্বেগের রেশ আসিয়া লাগিয়াছে। তেমনি ভাবনার রেশ ফুটিয়া উঠিতে চাহে তপনেরও উত্তরে।...কেমন করিয়া তাহার সংসার চলিবে।

...এইরূপই নিয়ম। হাল্‌কা কথায় কতটুকু হাল্‌কা করিতে পারি আমরা মনের গভীর চিন্তাকে? পারি না, কিছুতেই পারি না। নিতান্ত স্থূল-প্রকৃতি ছাড়া কেহ ভুল করিবে না আমার কথা, তপনের কথা। তবু হাল্‌কা সুরেই বলা ভালো এই গভীর কথা। হাঁ হাল্‌কা সুরেই বলা চলে গভীর সত্য। কিন্তু সত্যই বলা যায় কি তাহা? লিয়ারের সামনে ফুলের কথা কি পরিহাস? জাকুস্ এর কথাই কি হাল্‌কা? না, ভোগ-শ্রান্ত জীবনের তা বিরাগ? কিংবা ফলস্টাফই শেষ পরিচয় সেক্‌সপীয়রের? হ্যামলেটে নয়? প্রোসপেরোতে নয়? এইত দেখিতে না-দেখিতে তোমার চিন্তা কেমন গম্ভীর হইতেছে। কেমন গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে তপনের কথাও।...

তপন বলিতেছিল, একটু বিচ্যুতি ঘটেছে বৈকি? মা ভেবেছিলেন—ছেলে হাকিম হবে। বাবা জোর করলেন—হবে অধ্যাপক। শ্বশুরমশায় এসে সিন্‌হেসিস্ করলেন—'ডি. এস-সি' হোক, সরকারী কলেজে ভালো মাইনের প্রোফেসর হতে পারবে। হাঁ, তখন গবেষণায় নেমেছি; অনেক ছিল তাঁদের স্বপ্ন। আমারও তাই অদৃষ্টে পত্নীলাভ তখনি ঘটে। শ্বশুরমশায় আমাদের সমাজের; তবে প্রোফেসারি ছেড়ে ইনস্পেকটরি লাইনে গিয়েছেন। বরাবরই বিদেশে থেকেছেন।

কাজেই, দেশের বাড়িতে তিনি অর্থোডক্স্ 'ব্রাহ্মণ মহাসভা', বিদেশের জীবন-যাত্রায় 'লিবারল' হিন্দু, মানে, একালের 'হিন্দুমহাসভা।' বিদেশেই মানুষ হয়েছে গৌরী। হাঁ, তিনিই শ্বশুর মহাশয়ের কন্যা। বিদেশে সে ইস্কুলে পড়েছে, কিন্তু কলেজ পর্যন্ত যায়নি। পাসও করেনি,—পাছে আমাদের সমাজে বিবাহে অসুবিধা ঘটে। জুতো পায়ে দেয় না আমাদের বাড়িতে। তুলে রাখে বাক্সে—ট্রেন ছাড়লেই পরবে বাপের কাছে যেতে। আজকাল কোন্ ভদ্রলোকের মেয়ে খালি পায়ে চলে পথেঘাটে? সকালে উঠে আমাদের বাড়িতে স্নান সারে, চা খায় না, ঠাকুরের ভোগ সাজায়। কিন্তু গোবর ছুঁতে তার হাতের আঙুল কেমন রি রি করে। অন্তত সেমিজ পেটিকোট না হলেই তার নয়। এদিনে তা একটু ব্যয়সাধ্য; কিন্তু শ্বশুর মশাই তা চালিয়ে দিতেন প্রথম দিকে। আর এত দিনে ব্রাহ্মণ সমাজেও ওসব পোশাক আর নিষিদ্ধ নয়। না, আমাদের বাড়িতে তা নিয়ে কোনো কথাই ওঠে নি। উঠবে কেন? মায়ের বরং একটু গর্বও ছিল—তাঁর ছেলে ইংরেজি শিখে বড় লোক হচ্ছে; বউমা বিদেশে মানুষ হয়েছে; চাল-চলনে সভ্যভব্য; ছেলের উপযুক্ত সে বউ না হলে হবে কেন? বাবার আপত্তি হয়ত ছিলই না। তা ভাঙতে শুরু করেছিল আমাদের যখন ইংরেজি পড়তে দিলেন তখনই। শ্বশুর মশায়কে বলেছিলেন, 'ওসব কিছু থাকবে না, জানি। সবই পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, কালে। তাই নিয়ম।' তবু তাঁর কালের যতটুকু নিয়ম বাড়িতে চলছে গৌরীর তা পালন করতে হত। পালন করতে গৌরীর কষ্টও হয়নি। কয়দিনই বা এঁরা? আর কয়দিনই বা সেও এই গৃহে? আমি ডি এস্-সি হব—শ্বশুর মশায়ের ধারণা,—কলকাতায় বা অন্যখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি চাকরি নিয়ে চলে যাব; কোনো একটা শহরে থাকব,—গৌরীও পাবে আপনার অভ্যস্ত জীবনযাপন করবার মতো সুযোগ। আপনার মন-মতো করে ঘর সাজাবে, বিদেশে সংসার করবে,—সেই যা বলে 'মনে ছিল আশা'। হ্যাঁ আশাটা আমারও ছিল। 'অন্যায় নয়?'...তারপর, ওলট-পালট। জন্মাল স্বপন। আর, স্বপন জন্মাবার পর থেকেই গৌরীর শরীর খারাপ, কি সব অসুখ-বিসুখ জুটেছে। আমার সময়ও নেই, পারিও না। মা রাগ করেন। শ্বশুর মশাই একবার গৌরীকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করালেনও কয়েকমাস। কিন্তু চিকিৎসার কথা ত নয়; টাকা-কড়ি অভাব-অনটনের কথাও শুধু নয়। অভাব-অনটন আছে। কিন্তু একটা বড় কথা—বাড়িতে এমন একজনও লোক নেই যার সঙ্গে গৌরী মন খুলে কথা বলে। আমিতো সারাদিন কাজে ঘুরি। গৌরী বলে, 'বড় একা-একা'। অথচ আমিই বা করি কি? বললে বুঝবে না, কলেজ আছে, দশটা কাজ আছে। গৌরী শুনলে রাগ করে।—'আমি বুঝি নেই, না?' ভাবে আমি ওকে উপেক্ষা করছি—'কাজটাই বড়, আমরা কিছু নই'। কেমন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন; মেজাজও ক্রমশই বিগড়ে যাচ্ছে। ছেলেটাও একটা প্রোবলেম্ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মা কেন অমন করে থাকে, সে বোঝে না। যত এমন বড় হচ্ছে তত দাদা-দিদির কাছে ঠাঁই নিচ্ছে; মাকে এখন কেমন ভয় ভয় করে। হাঁ, আমাকে অবশ্য পসন্দ করে। 'তুমি বাড়ি থেকে যেয়ো না বাবা।'

করিই বা কি? এই ত দু'দিন বাড়ি যাই নি। কাল গিয়েছি সন্ধ্যায়, দেখলাম গৌরীও দু'দিনে এমন গুম হয়ে রয়েছে যে, তাকে দেখলে আমারই ভয় হয়। স্বপন বললে চুপে চুপে, 'তুমি থাকবে না, বাবা? মা বড় রাগ করছেন।' ওদিকে দেখা হতেই বাবা ব্যথার সঙ্গে বললেন, 'পুলিশ তোমার খোঁজ করছে। তুমি বাড়ি নেই, বৌমারও বাড়াবাড়ি হচ্ছে।' মায়ের সঙ্গে ত শেষে ঝগড়াই করে চলে এলাম। মা রাগ করছিলেন, 'কী পেয়েছ তুমি? সংসারের কথা ভাবতে চাও না। বেশ, তা না হয় না ভাবলে। কিন্তু বউটার, ছেলেটার উপর এমন অত্যাচার কেন তোমার? পরের মেয়ে, শেষটা পাগল হবে নাকি?' তপন থামিল...অমিতকে বলিল সেসব কিছু হবে না, না অমিতদা?...

অনেক দূরে, অনেক দূরে সরিয়া যাইতেছে গোয়েন্দা আপিসের সেই প্রহরী-পরিবৃত গৃহের এই বন্ধু-বান্ধবেরা, সেই তর্ক-আলোচনা, অতীত ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। সরিয়া গিয়াছে 'দেশলক্ষ্মীর' সেই মজদুর আন্দোলনের উদ্বেল তরঙ্গ, সেই জন-তরঙ্গের শিখর-বাহী তপন ও কেল্ট মল্লিক রসিদ ও সুখারী; মংগলী ও পার্বতী। উন্মুক্ত দুয়ারের বাহিরে ছায়া-পরিবৃত বৃক্ষ-সমাচ্ছন্ন মধ্যাহ্নের লর্ড সিংহ রোডের আঙিনা ও প্রাচীর। তাহা ছাপাইয়া, তাহা আচ্ছাদিত করিয়া উদিতা হইয়াছে এক স্বল্প পরিচিত সংসারের কোনো একটি তরুণী বধূ গৌরী—যাহাকে অমিত চক্ষে দেখে নাই, হয়ত দেখিবেও না; যাহাকে তপনের সহকর্মীরা কেহ জানে না, গণনার মধ্যেও আনে না; ফিজিক্সের ফার্স্ট ক্লাশ, ফিলজফি-পড়া ভাবোন্মাদ তপনের উন্মত্ত জীবন-সাধনার মধ্যখানে সেও যে আছে, তাহা তপনের বন্ধুরা মনেও রাখে না।

...'কাব্যের উপেক্ষিতা' নও তুমি, তুমি জীবনের উপেক্ষিতা। ইতিহাসের ট্রাজিডি তুমি নারী, বাঙালী মধ্যবিত্তের, বাঙালী বিদ্রোহীর মাতা, ভগ্নী, জায়া। তোমারই প্রতিনিধি যেন এই সামান্য বাঙালী বধূ, তপনের তরুণী পত্নী।.. হয়ত সত্যই গৌরী, সে গৌরবর্ণা, সুন্দর মুখশ্রী...অমিত তাহাকে কখনো চোখে না দেখিলেও এখন দেখিতেছে। দেখিতেছে—তাহার চোখেও আহত অভিমানের ব্যথা, নিষ্ফল স্বপ্নের ক্ষোভের জ্বালা; জ্বালা অবজ্ঞাত যৌবনের। কিন্তু তাহা কি তপন শোনে নাই? না শুনিলে উহার প্রতিধ্বনি অমিতের কানে এ মুহূর্তে বহন করিয়া আনিল কে, গৌরী?...কাহার মুখের হাসির ওপারেও আমি অমিত দেখিলাম চোখের ওই ব্যথিত অনুশোচনা? দেখিলাম; আর উহার মধ্য হইতেও পাঠ করিলাম তোমার কাহিনী, তোমার মুখচ্ছবি, গৌরী। দেখিলাম, আর জানিলাম ইতিহাসের ট্রাজিডি। সেই ট্রাজিডি তুমি নও, সেই ট্রাজিডি বরং তপনই; ইতিহাসের সৃষ্টি-শতদলে যাহার হৃদয়-নিংড়ানো রক্তের ছোপ লাগিতেছে, লাগিবে, আরও লাগিবে। আর তোমার অশ্রুতে, তোমার দীর্ঘশ্বাসে, তোমার উচ্চারিত সাধ ও অনুচ্চারিত অভিশাপে মিলিয়া যাহার সেই সৃষ্টির একাগ্র পরম তপস্যা গোপনে গোপনে ব্যাহত হইবে, বারে বারে বিক্ষিপ্ত হইবে, বরাবর যাহার আত্মদান তাই থাকিবে অসম্পূর্ণ।

তপনের উপেক্ষিতা গৌরী, তুমিই কি তপনের জীবনেরও অসম্পূর্ণতা নও?

একালের জীবনের উপেক্ষিতারা, তোমরাই কি সহিতে পার একালের জীবনের সম্পূর্ণতা ?..

অমিত বলিল, তাই ত তপন, ভাবনার লোক শুধু জোটাওনি, ভাবনাও জুটিয়ে নিয়ে এসেছ।...তুমি একা নও...আমরাও অনেকে তাই ভাবছি ..ইতিহাস তাদের ছাড়ে না, —এ জীবনই বা তাদের ছাড়বে কেন ?

সত্যাই মাথা খারাপ না হয়ে গেলে হয় গৌরীর।—একটু ভাবিত মুখে বলে তপন।

তপন করুণ দৃষ্টিতে তাকাইল। তারপর কি ভাবিল ; নিজের মন হইতে কি চিন্তা যেন ঝাড়িয়া ফেলিল। টান হইয়া বসিয়া বলিল, 'মিছে সেই ভাবনা।'

দেখলাম ত 'দেশলক্ষ্মীর' অতগুলো মজুরের হরতাল ; তাদেরই কি ঘরে স্ত্রী-পুত্র নেই? রশিদেরও পাকিস্তানের বাড়িতে আছে তার গরিব মুসলমান ঘরের অসহায় জেনানা— একটি ছেলে হয়েছে, আবার ছেলে-মেয়ে হবে। আর পার্বতীরও ঘরে রয়েছে তার অচল স্বামী, আর অসহায় ছেলেমেয়ে। কিন্তু কোথায়, ভাবনায় তাদের কর্মশক্তি পরাস্ত হল না ত ?

অমিত বুঝাইয়া বলিল, তারা মজুর—হ্যাভ নাথিং টু লুজ বাট্ দি চেন্‌স্। আমরা মধ্যবিত্ত, মজদুর পার্টির হলেও মজুর নই—হ্যাভ এভ্‌রিথিং টু লুজ্ ইভ্‌ন্ দিস্ গিল্টেড্ চেন—মধ্যবিত্তের ফ্যামিলি লাইফ্ এণ্ড ফ্যামিলি লভ্! পুলিশের বাঁধনের থেকেও অনেক বেশি শক্ত এই মমতার বাঁধন! দ্যাখো না গৌরীর দশা। তাকে কি রশিদের কথা বলে বোঝাতে পারবে ? না, পার্বতীর কথাই সে শুনে বুঝবে ?

অমিত সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বলিল, না সে যুক্তিতে তুমি তপনই পারছ গৌরীর ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে ? বলছ 'মিছে সেই ভাবনা ?' কিন্তু জানছ কত মিছে তোমার সেই কথাটাও।...বুঝলেই কি নিষ্কৃতি পায় ? পায় ইন্দ্রাণী, পায় তা ?

তপন একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া স্বচ্ছন্দ স্বরে বলিল, সয়ে যাবে। প্রথম প্রথম খুব লাগবে ওদের। তারপর সয়ে যাবে। -না ?

একটা ভরসা চায় তপন, ভরসা চায় অমিতদা'র নিকটে।

সম্ভবত,- বলিল অমিত। আর মনে মনে বলিল, সত্যই যদি তাহা হয়, তাহাই যদি হয় ? কিন্তু তখনা যদি তুমি আবদ্ধ থাকো তপন, যদি তোমাকে জেলে বসিয়া বসিয়া দিন গুনিতে হয় মাসের পর মাস ? তখন—তখন সব চাইতে বেশি লাগিবে তোমার মনে এই স্বাভাবিক সত্যটাই 'গৌরীর সব সয়ে গিয়েছে'—সহিয়া উঠিয়াছে গৌরী তোমার অদর্শন ও তোমার বিরহ, সহিয়া উঠিয়াছে তোমার শিশুপুত্রও তোমার অনুপস্থিতি,—সহজ হইয়া গিয়াছে তোমার আপন জনের জীবন-যাত্রায় তোমার এই অনুপস্থিতি ও অনস্তিত্ব। তখন কি তোমার সমস্ত আগ্রহ, উদ্যম, উদ্যোগের মধ্যখানটা হঠাৎ ফাঁকা হইয়া যাইবে না,' তপন ?...

জীবনের উপেক্ষিতা তুমি গৌরী?...কিন্তু জানো কি তপনের অসম্পূর্ণ জীবনের বেদনা, তাহার অসহায়তা? সে যে নিষ্পিষ্ট, জীবনের বলি। আরও বেশি পৃথিবীতে সে অসংলগ্ন—এ্যালিনিয়েটেড্......

না, মধ্যবিত্তের এই জীবনযাত্রায় শুধু সুরোদের জীবন শীর্ণ শুষ্ক হয় নাই। গৌরীকেও শত বন্ধনে ঘিরিয়া ধরিয়া এই জীবনযাত্রা তপনদের জীবনকেও রাখিতেছে অসংলগ্ন অসম্পূর্ণ। জীবনের উপেক্ষিতা তোমরা? তপনেরা অসম্পূর্ণ। জীবনে যে অসম্পূর্ণতা সহিতে পারে না কাহারও। তোমরা এদেশের মেয়েরা জীবনে উপেক্ষিতা; আর তপনেরা, এদেশের পুরুষেরা অসম্পূর্ণ।......কিন্তু তাই কি হবে কমিউনিজমের পথ? স্ত্রীর ভালবাসা থেকে মানুষকে ছিনিয়ে নেওয়া। অথচ কমিউনিজমের অর্থ তো মানবতার পূর্ণতা। 'ভালবাসা'কে না মানলে মানবতার কী অর্থ হয়? হঠাৎ অমিত তপনকে বলিল, না তপন, তা আমি অন্তত সম্ভব মনে করি না—চাই-ও না। আর... আর ..আর...অমিত থামিল, বলিল, 'হ্যা, তপন এতো মানবতা নয়, কমিউনিজমও নয়—তুমি যদি গৌরীকে জোর করে ভুলতে চাও, তবে মানুষের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে সার্থক হবে কী করে। এও তো এস্‌কেপ্‌ইজম্'—অমিত থামিল। মনে মনে বলিল এস্‌কেপ্ ফ্রম লাইফ।...এস্‌কেপ্—এস্‌কেপ্ ফ্রম লাভ—অর্থাৎ ফ্রম লাইফ্।'—না, না, তা হয় না তপন, তোমার জীবনের সঙ্গে ফাঁকি চলবে না। অমিত কিছুক্ষণের মত নিজের মনে ডুবিয়া গেল..না, না, নো এস্‌কেপ্, নো এস্‌কেপ্ ফ্রম লাইফ্—ফ্রম সেল্‌ফ্—আমাকে মুছে ফেলে 'বড় আমি'র উদ্দেশ্যে 'আমি'ও থাকতে পারে না...'বড়'-ও ফুটতে পারে না। হঠাৎ অমিতের চমক ভাঙ্গিল—ছেলেমেয়েরা বলিতেছে—বেলা বারোটা বাজিয়াছে, পুলিশ কর্তাদের ত এখনো দেখা নাই।

চার

বেলা বারোটা বাজিয়াছে। খাবার ব্যবস্থা হয় নাই এখনো। হইবেও না—যদি চেঁচামেচি না করা যায়।

অমিত বলিল, যদি চেঁচামেচি না করো—পুলিশ কর্তারা কিছুই করিবে না। উদ্যোগী হও দিলীপ, যদি খেতে চাও। মঞ্জু, আধ ঘন্টার বেড়ানো ত শেষ হয়েছে। এখন যদি উপোস থাকতে না চাও তা হলে তোমরা একটু চেচাঁমেচি করো।

—স্লোগান দোব? তা হলে শুরু করো, দিলীপ-মঞ্জু স্লোগানের জন্য উদ্যোগী হইল—"খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই।"

তাস আনাইয়াছেন এক জোড়া সৈয়দ আলী সাহেব। সিগারেটও কয়েক প্যাকেট সঙ্গে আনিয়াছেন। জানেন জেলে ও-বস্তু দুর্লভ। প্রাণ ভরিয়া এখানেই তবে সেবন করা যাক্। জন আটেক লোক আসিয়া খেলার চারিদিকে একত্র হইয়াছে। বসিবার জায়গাও নাই। গোয়েন্দা আপিসের লোকেরা খোঁজ-খবরও কেহ বিশেষ করিতেছে না। সিপাহীরা পাহারায় দাঁড়াইয়া আছে। শ্রান্ত, ঝিমন্ত, বিরক্তি তাহাদের চোখে-মুখে।

কাল রাত্রি হইতেই তাহারাও অনেকে ডিউটিতে রহিয়াছে। এখনো বদলের সিপাহী দল আসিতেছে না কেন?

এইবার সৈয়দ আলী হাঁক-ডাক করিলেন দিলীপকে লইয়া। খেলা রাখিয়া উঠিয়া গেলেন বাহিরে—একজন কাহাকেও তাড়া দিতে হয়। স্নান নাই, আহার নাই, দুপুর হইয়াছে, বসিয়া বসিয়া বিরক্তি আসিয়া যাইতেছে। অমিতকেও টানিয়া সঙ্গে লইলেন সৈয়দ আলী। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাহারও দেখা পাওয়া গেল না। পুলিশের বড় কর্তারা সেক্রেটারিয়েটে। একজন মাঝারি গোছের কর্মচারী ব্যবস্থা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া কোনোরূপে সরিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পর একজন জানাইল—খাবার মিনিট দশেকের মধ্যে এসে যাবে।

অমিত ফিরিয়া আসিয়া নিজস্থানে বসিল। অন্যেরা ব্রিজে জমিয়া গিয়াছে। সৈয়দ আলী স্থানচ্যুত হইয়াছেন, তাঁহার স্থান দখল করিয়া বসিয়া গিয়াছে এখন জন দুই তিন। তাহাতে কি? এখনো সৈয়দ আলীর স্থান হইবে। তাঁহাকে না হইলে খেলা চলে নাকি? খেলা কেন, পার্টিও জমে না: আড্ডা না মিলে এদেশে পার্টি জমে? আর সৈয়দ আলী না হইলে আড্ডা জমে? খেলোয়াড়দের ঘিরিয়া অনেক বড় আরও এক দল খেলার উমেদার, দর্শক, পারিষদ। ইহাদের কলরব ও কলহে ঘর সরগরম। খেলোয়াড়দের অপেক্ষাও ইহারাই খেলায় বেশি মত্ত। কেহ কেহ চুপ করিয়া বসিয়া আছে অন্য দিকে। দুই-একজন স্বতন্ত্র বসিয়া গল্প করিতেছে, আলোচনাও করিতেছে—তাহা হইলে সত্যসত্যই পার্টি বে-আইনী হইয়াছে। সে কি শুধু ভারত সরকারের মতানুযায়ীই হইয়াছে? আসলে হইয়াছে ইংরেজ ও মার্কিন প্রভুদের ইঙ্গিতেই। কিন্তু ভাগ্য তবু ভালো, সত্য সত্যই নেতৃস্থানীয়রা অনেকেই ধরা পড়ে নাই। আশ্চর্য রকমে সাবধান হইতে পারিয়াছে কেহ কেহ। আর নিতান্তই ভাগ্যবশে দুই একজনকে সাবধান করাও যায় নাই। আবার, দুই একজন শেষ মুহূর্তেও পুলিস পার্টিকে ফাঁকি দিয়া তাহাদের চোখের উপর দিয়াই সরিয়া পড়িয়াছে। পুলিসও তাহার শোধ তুলিবার জন্য সদর আপিসে, এপাড়ার ওপাড়ার দপ্তরে, ছাপাখানায়, ট্রেড ইউনিয়নের আপিসে, কৃষক সভার ঘরে, যাহাকে পাইয়াছে তাহাকেই ধরিয়া লইয়া আসিয়াছে।

অনেকক্ষণ খেলাটা দেখিয়া-দেখিয়া তথাপি বুঝিতে না পারিয়া কানাই হাজরা আসিয়া বসিল লম্বা বেঞ্চটায়। না, একটু ঘুমাইবার চেষ্টাই করা যাক্।

মাস্টার সাহেবের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করিয়াছে কানাই হাজরা। তারপরে আবার ভুলুবাবুর সঙ্গেও গল্প করিয়াছে। শেষে দাঁড়াইয়াছিল খেলার নিকটে। ক্ষুধা পাইয়াছে। পেট জ্বলিতেছে। শোয়া যাক্ বরং কিছুক্ষণ।

অমিত বলিল : কি হল হাজরা দা'? ঘুমুবার জায়গা পাচ্ছেন না?

লজ্জিত হইল কানাই হাজরা। বলিল, আপনাদের বিলিতী খেলা, কিছু বুঝতে পারলাম না।

এবার তাহা হইলে অমি'দার সঙ্গেই গল্প করা যাক্। পুরানো একটা চেনা লোক অমিত কানাই হাজরার।

বছর চল্লিশ বয়স কানাই হাজরার দেখিতে বেশিই মনে হয়—রোদে পোড়া কাঠ। কানাই দক্ষিণের লোক। দরিদ্র কৃষকের ঘরে সে জন্মিয়াছে। নিজের জমি বলিতে তবু কম ছিল না তাহার বা তাহার বাপ মহিম হাজরার। খানিকটা বন্ধক পাইয়া জমিদারের গোমস্তা-মহাজন হাত করিয়া বসিয়াছিল। কবে তাহা পুনরুদ্ধার হইবে তাহার ঠিকানা নাই। কখনো নিজের জমিতে চাষ করিত মহিম, কখনো অন্যের জমিতে হইত সে ভাগ-চাষী। কখনো মথুরাপুরের দিকে স্টেশনে ট্রেনে চাপাইয়া দিত ব্যাপারী ব্যবসায়ী ফড়িয়াদের জন্য জমির শাক সব্জী, ক্ষেতের ফসল, গাছের ফল। দরিদ্র কৃষকের সেই জীবন। কিন্তু তাই বলিয়া ভূমিহীন নয় মহিম। হিসাব সে মুখে মুখে বলিয়া দিবে—কয় বিঘা খাসে আছে,—অবশ্য উহার পাঁচ বিঘায় চাষ করা চলে না। বর্ষায় ভাসিয়া যায়। গুয়াখালির নিচেকার খালটা গাঙের সহিত মিলাইয়া না দিলে এই জমির এই দশাই হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া জমিটা ত মহিম হাজরার হাতছাড়া হয় নাই; মহিমেরই রহিয়াছে। আরও পুরো সাত বিঘা জমি সিংহবাবুরা ভেড়ি কাটিয়া দেওয়ায় নোনা জলে ডুবিয়া যায়। উহাতে মাছের ইজারা লইয়াছে হাফিজ নিকারী। বহু টাকায় সিংহবাবুরা জমা দিয়াছে, আরও বহু টাকা হাফিজ লাভ করে। কলিকাতা যায় তাহার মাছের চালান। মহিম হাজরাই কতবার সেই মাছের চুপড়ি তুলিয়া দিয়াছে স্টেশনে—তাহারই জমির মাছ, কিন্তু জ'ল ত তাহার নয়, মাছও তাই তাহার নয়। ওখানকার পাঁচ-সাতশ বিঘা জমির এই অবস্থা। এই জমিটা তাই মহিম ছাড়িয়া দিতে চায়; মিথ্যা খাজনা গনিয়া আর লাভ কি? বাকি খাজনাতেই হয়ত উহা চলিয়া যাইত। কিন্তু সত্যই কি সিংহবাবুরা বরাবর ভেড়ি কাটিয়া দিবেন? মহিম আশা করে তাঁহারা একাজ করিবেন না। তাই এখনো সে জমি মহিমের আছে। খাজনাসত্র দিয়া মহিম সে জমিও রাখিয়াছে।—ভাগচাষী বা ক্ষেতের মজুর তাহাকে বলিলে সে তাই রাগ করিবে। বারো বিঘা জমির মালিক সে—মহিম হাজরা।

বাপের সহিত কাজ করিয়া করিয়া কানাইও বড় হইয়াছে। ভাগ্যক্রমে কাজ পাইল সে মণ্ডল বাড়িতে তখন নয়-দশ বৎসর বয়স। মণ্ডলেরা বড় গৃহস্থ। খাসে জমি অনেক। গোলায় ধান আছে, পুকুরেও মাছ আছে, কিছু, আর গোয়ালে গরু আছে অনেক। গরুর সেবা মেয়েরাই করে, মাঠে চরাইতে লইয়া যাইত কানাই। চাষের কাজেও কানাই ক্ষেত-মজুরদের জলপান আনিয়া দিত। নিজেও এক-আধটুকু চাষে সাহায্য করিত। কিন্তু মণ্ডল কর্তারা ভালোবাসিত ছোকরা কানাইকে। বাড়ির পাঠশালার ছোটখাটো কাজও তাই দিল কানাইকে। সেখানে তাহার দুই এক মাসে অক্ষরও শিক্ষা হইয়া গেল; নামতা, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া সহজেই মুখস্থ হইল। তাই বিদ্যালয়ে পরিদর্শক আসিলে কানাই কোনো কোনো

দিন ছাত্র সাজিয়াও বসিত; আবার তাহা ছাড়াও কোনো কোনো দিন হইত সর্দার পড়ুয়া। অক্ষর জ্ঞান, সংখ্যা জ্ঞান, কানাই'র সেখানেই হইল। তারপর মহিম হাজরা অসুখে পড়িল, কানাই তখন চলিয়া গেল ক্ষেত্রের কাজে। আজ ক্ষেতে কাজ করে, কাল বোঝা বহিয়া লইয়া যায় মণ্ডলদের বরোজের পান, কিংবা কলার দেয় চালান। ভালোই শিখিয়া উঠিল কানাই কলার চাষ, উহাতেই তাহার হাত খুলিয়া গেল। কানাই'রও কদর বাড়িয়া গেল। বুদ্ধি আছে, কাজেও কুড়েমি নাই।

জোয়ান ছেলে, বড় হইতেছে—মহিমের অসুখ, কানাইর মাও চায় ছেলের বিবাহ দিবে। কিন্তু টাকা পাইবে কোথায়? শতখানেক টাকা না হইলে মেয়েই মিলিবে না; তারপর খরচ-পত্রও আছে। সময় পাইলে অবশ্য বাপ-ব্যাটায় পরিশ্রম করিয়া টাকাটা তুলিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু মহিমের ব্যারাম বাড়িয়া যায়, সে কাজ করিতে পারে না, একা কানাই করিবেই বা কি? তবু বিবাহ ত করিতেই হইবে;—জোয়ান ছেলে বিবাহ করিবে না? সেই সাত বিঘা মহিম বন্ধক রাখিল বিহারী ঘোষের কাছে—খাই-খালাসী বন্ধক। সুদটা চড়া, কিন্তু টাকা বেশি নয়। আর ধান চালের বাজার এখন বেশ গরম; এরকম দর থাকিলে চাষীর তত ভয় কি? জমি থাকিলে আয় হইবে আর বন্ধকী জমি সুদে-আসলে খালাস করিতে কয় বৎসর দেরি? তিনসালে বন্ধক শেষ হইবার কথা, দুই সালেও হইতে পারিবে। ততদিন কানাই না হয় একটু বেশি খাটিবে মণ্ডলদের ক্ষেতেই, মজুরি পাইবে, খোরাকী পাইবে। কলার চাষে মুনাফা ভালো দাঁড়াইলে মণ্ডলেরাও কি কানাইকে বঞ্চিত করিবে? দরকার মত হিসাবপত্রও কানাই রাখিতে শিখিয়াছে তাহাদেরই কৃপায় পাঠশালায়। ব্যাপারীদের সঙ্গে কাজে কারবারে, বোঝা-পড়ায় মণ্ডলেরা কানাইকে পাঠাইবে। অতএব, ভাবনা কি?

বিবাহ হইল। শত দুই ছাড়াইয়া খরচাটা শত আড়াইতে উঠিয়া গেল। আসিল কানাই-এর নয় বৎসরের বউ গঙ্গা—নারাণীর মা। নারাণী জন্মিল অবশ্য অনেক পরে—ছ'সাত সাল পরে। কিন্তু তাহার আগে কত কাণ্ড ঘটিয়া গেল। সেই ছত্রিশ সাল গিয়া সাঁইত্রিশ সাল। দ্যাখ-না-দ্যাখ কি হইল ধান চালের বাজারের? দুই টাকা মণ দর নামিল ধানের; তারপর সাত-সিকা; তারপর দেড় টাকা; শেষ এক টাকায়ও ঠেকে না। তিন সালে সমস্ত ওলট-পালট। আসল ছাড়িয়া সুদও মিটানো যায় না বিহারী ঘোষের। আগেকার বন্ধকী জমি ত কানাইর হাতছাড়া হইয়াছেই, এই জমিও যায়-যায়। বাকি জমিও এবার বন্ধক দিতে হইল; মহিম যে তখন মরিতে বসিয়াছে—তাহার চিকিৎসা-পত্র দরকার। কিন্তু আগে মরিল তবু কানাই'র মা। আরও মাস দুই তিন পরে মরিল মহিম হাজরা। তখন খাসে জমি রহিবে কি করিয়া কানাইর? টাকা ধার করিতে হইল, সুদের হার এখন বেশিই হইবে। টাকা কি চাষী সহজে ধার পায় এইরূপ দুঃসময়ে? তবু এক বছর বাজারে সাচ্চা দাম পাইলে কানাই'র ভাবনা আবার কি? এই

ফসলটা দাম পাইল না, আগামী ফসলটার দাম নিশ্চয়ই পাইবে :—ভাবিল কানাই হাজরা।

পৃথিবীর কোথায় কোন চক্রান্তের ফলে কি ঘটিল কানাইর তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। সালটা বাঙলা সাঁইত্রিশ—বণিক-শাস্ত্র মতে হয়ত ১৯২৯-এর শেষদিক কিংবা ত্রিশেরই প্রারম্ভ। দুনিয়ার ডলার-পতিদের তখন চক্ষুস্থির। সত্য সত্যই কি তবে ধনিক-তন্ত্রের সপ্তডিঙা পড়িয়া গেল আর্থিক সংকটের ও বাজার-বিপর্যয়ের কালীয় দহে? এবং বাজার মন্দার এই ডুবোচরে আটকাইয়া পড়িবে বাড়তি মালের বোঝাই নৌকা? ডলারের দেশে লাগিল বিশ্বের আর্থিক সংকটের অনিবার্য আঘাত। ওয়াল স্ট্রীটের কোটিপতিদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিতেছে। এক-এক ফুঁয়ে সাত রাজার ঐশ্বর্য উড়িয়া গিয়াছে। জমি আর ফসলশুদ্ধ তখন ভরা-ডুবি হইতে লাগিল মার্কিন কৃষকের ভাগ্যও। মন্দা, মন্দা, মন্দা। বাজারে মাল আছে, ক্রেতা নাই; ফসল আছে, চাহিদা নাই। ক্রেতা নাই যখন, তখন ডুবাইয়া দেও, চাহিদা নাই ত পুড়াইয়া ফেল গম, তুলা, ক্ষেতের ফসল; আগুনে-জলে নষ্ট করিয়া দাও কফি; সমুদ্রে ডুবাইয়া দাও কমলালেবু। পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ কানাই'র মত; না পাইতেছে খাইতে, না পাইতেছে পরিতে। তাহারা হয়ত গম পাইলে বাঁচে, তুলা পাইলে পরিতে পায় কাপড়, কফি, কমলালেবু পাইলে হাতে পায় স্বর্গ। কিন্তু মালিকের মুনাফা জোগাইয়া উহারা এইসব জিনিস কিনিবে কি করিয়া? মুনাফা ছাড়া জিনিস ছাড়িলে যে মালিকের পক্ষে বাজারটাই মাটি হইবে। অতএব জিনিসই নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত; মুনাফার হার না হইলে এই মাত্রায় বজায় থাকিবে না। তারপরই, ক্রেতা যখন নাই তখন মাল উৎপাদন কমাও; উৎপন্ন মালও নষ্ট করিয়া বাজারের ভার কমাও; ফসল চাষ করো কম, আর যাহাও ফলে সেই উৎপন্ন ফসল পুড়াইয়া ফেলিয়া বাজার খালি করো। শেষে, দেশ বিদেশের মাল আমদানীও কমাও, কাঁচা মালের চাহিদাও কমাও। কমাও ব্যবসা-পত্রের সমস্ত লেনদেন, কাজ কারবার।...কোথা দিয়া তাই বাঙলাদেশের চটের চাহিদা কমিল, কোথা দিয়া কাঁচামালের রপ্তানি কমিল, কেন দেখিতে দেখিতে ধান-চাল গম তিসি সমস্ত কৃষিজাতের দাম বাজারে নামিয়া গেল; নামিল ত নামিল তাহা আর কেন চড়ে না;—দেবতার দয়ার অভাব নাই,—মাঠভরা ধান, ক্ষেতভরা ফসল সবই আছে।—কিন্তু বাঙলা দেশের চব্বিশ পরগনার কানাই হাজরা ইহা কেমন করিয়া জানিবে—তাহার ভাগ্য শত লক্ষ নর-নারীর ভাগ্যের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছে, হইয়া উঠিয়াছে জন কয় ধনপতি সওদাগরের ব্যবসায়ের সওদা; তাহাদের মুনাফাদারীর খেলার কাঁচা মাল,—আর সে—কানাই হাজরা—না চাহিলেও হইয়া উঠিয়াছে ইতিহাসের বঞ্চিত-বিদ্রোহের এক ভাগীদার!

কানাই'র মনে হইল এমন আকাল দেশে আর আসে নাই। এক কানাকড়ি তাহার হাতে আসে না, ধান চালের দাম আর বাড়ে না। দিন মজুরি করিবে,

নাকি কানাই? গরিব চাষীর ছেলে কানাই; ভাগচাষীর কাজ করিতেছে, মণ্ডলদের কলার চাষে মজুরি পাইয়াই খাটে; কিন্তু তাই বলিয়া জনমজুর হইবে নাকি শেষ পর্যন্ত? তাহার জমি আছে; খাইখালাসী বন্ধক মুক্ত হইয়া তাহা এই চার সালে তাহার হাতে আসিবারও কথা। কিন্তু বিহারী ঘোষ তাহা মানিবে না। হিসাব করিতে জানে বুঝি কানাই? খুব লায়েক হইয়াছে বুঝি—দুই দিন পাঠশালায় গিয়া! বেশ দেখুক কানাই কত ধান এই কয় বৎসরে উৎপন্ন হইয়াছে; কত হইয়াছে এই দুই বৎসরে কানাই'র কর্জের আসল, আর কত কানাই'র সুদ তস্য সুদ। ধানের এই দামে সুদ আর তস্য সুদই এখন শোধ হয় না; তাহাতে আবার মূল। বিহারী ঘোষ ঠিক করিয়াছে জমিটা আর কানাই'র নিকট ভাগচাষে দিবে না; সে নিজেই চাষবাস করিবে—মুনিষ খাটাইয়া চাষ করিলে ধানও বেশি উৎপন্ন হইবে। নিজের গোলায় ধান উঠিলে সে ধান লইয়া ব্যাপারীরাও যাহা খুশি করিতে পারিবে না। তখন উচিত দর দিতে হইবে; না দিলে গোলার ধান ছাড়িবে কেন বিহারী ঘোষ? অর্থাৎ কানাই'র পক্ষে জমিটা হাতছাড়া হইয়া যায়-যায়। একটা কিছু করা উচিত। খোশামুদি বৃথা হইল। কাঁদা-কাটা করিতে কানাই জানে না; করিলেও বিহারী ঘোষ গলিত না। মণ্ডল বাড়ির লোকেরাও কানাই'র হইয়া বিহারীবাবুকে বলিয়া কহিয়া দেখিয়াছে; ফল হয় নাই। মামলা করিবার জন্য কানাই দুই-একবার লাফ ঝাঁপ দিল, কিন্তু সে টাকাই বা কোথায়? আইনের জোরই বা কই? মণ্ডলবাবুদের কাণ্ডজ্ঞান আছে; কানাই'র বাড়াবাড়িতে বেশি উৎসাহ তাহারা দিতে চাহেন। তাহাদেরও দুই একঘর চাষীর সঙ্গে এইরূপ গোলমাল বাধিয়াছিল। তবে মণ্ডলেরা ভালো লোক, স্বচ্ছল গৃহস্থ, ধর্মভীরু; কাহাকেও প্রাণে মারিতে চাহে না। পরের জমি আত্মসাৎ করিতে তাহাদের ইচ্ছা নাই। ন্যায্য টাকা পাইলে মণ্ডলেরা কৃষকদের জমি ছাড়িয়া দেয়। এই মন্দার দিনে কি সে-দিনের ধার আর কেহ পুরাপুরি সুদে-আসলে শোধ দিতে পারে? না, বন্ধকী জমি আর সেইভাবে উদ্ধার করিবার আশা করিতে পারে? মণ্ডলেরা তাহা জানে। তাই দুই-একজন খাতককে উল্টা কিছু টাকাও তাহারা দিয়া দিয়াছে, খাতকেরাও জমি মণ্ডলবাবুদের নিকট বিক্রয় করিল বলিয়া লিখিয়া দিল। বিহারী ঘোষ অবশ্য মণ্ডলদের এই পরামর্শ কানে তুলিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া কানাই'র বাড়াবাড়িই কি ভালো? বলে 'মামলা করিব': না, মণ্ডলের কথাটা ভালো মনে করেন না।

এমনি সময়ে,—সে বোধ হয় বাঙলা বিয়াল্লিশ সালে,—বাধিয়া গেল কৃষক সমিতির আন্দোলন। বিহারী ঘোষের বিরুদ্ধে সে অঞ্চলে একটা জোট পাকিয়া উঠিল। সিংহবাবুরা ভেড়ি কাটিয়া জমি ডুবাইয়া দেয়, উহা লইয়াই প্রজাদের আপত্তি শুরু হয়। আর মণ্ডল বাড়িরই একটি ছেলে নতুন কলেজে পড়িত, সে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল—তাহাদের স্বজাতিরই অনেক গরিব চাষী সিংহবাবুদের এই লোভের দায়ে বছরের পর বছর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। জমি ইস্তফা দিয়া কেহ কেহ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে 'লাটে'। গণেশ মণ্ডল সামনে পাইল হেমন্তবাবুকে। হেমন্ত মাইতিও সেবার প্রবল

আন্দোলনে জেল হইতে ফিরিয়া ঠিক করিয়াছে—এখন গঠনমূলক কাজ করিবে। অর্থাৎ সে ল' কলেজে পড়িতে গেল; উকিল হইবে ঠিক করিল; এবং গ্রামের পাঠশালায় গরিব চাষা-ভুষাদের ডাকিয়া তালগাছ কাটিবার প্রয়োজনীয়তা, চরকা কাটিবার উপকারিতা ও অহিংসার মাহাত্ম্য বুঝাইতে লাগিল। আর সঙ্গে সঙ্গে এখন ঠিক করিল সিংহবাবুদের দৌরাত্ম্য হইতে প্রজাদের উদ্ধার করিবে—গণেশ মণ্ডলও আছে সঙ্গে। জেলে হেমন্ত সহকারী পাইয়াছিলেন মণ্ডলদের এই মধ্যম ছেলেকে। গণেশকে তিনিই লাগাইয়া দিলেন তাহার গ্রামের কাজে, আর তাহাকে রাজি করিয়াছিলেন কলেজে আবার আই-এ পড়িতে।

গণেশ মণ্ডল তাই কলেজে ভর্তি হইল। কাজে লাগিতে লাগিতে সে ঝুঁকিয়া পড়িল সিংহবাবুদের বিরুদ্ধে প্রজার কাজে। চাষীদের মজুরদের 'সংগঠন' করিতে না পারাতেই যে স্বরাজ সম্ভব হইতেছে না, জেলে বসিয়া গণেশ এই আলোচনা অনেকের নিকট শুনিয়াছে। চাষীরাই'ত দেশের শতকরা আশিজন। তাহাদের লইয়াই ত দেশ। কিন্তু এই সংগঠনটা কিভাবে করিবে গণেশ তাহা তবু বুঝিল না। জানিত, সকলকে কংগ্রেস সভ্য করিতে হইবে, আর বলিতে হইবে চরকা কাটিতে। কলেজে এখন শ্যামলের সঙ্গে নতুন পরিচয় হইল। তাহারা তর্ক করিল, বলিল কৃষক সমিতি গঠন করা। দুই একবার সিংহদের বিরুদ্ধে কথা বলিতেই মণ্ডলদের এই মধ্যমবাবুর জন্য কৃষকেরা নিজেরাই আসিয়া খোঁজ করিল। জেল-খাটা মানুষ, অনেকের জন্য অনেক কিছু করিবেন তাঁহারা,—এই গরিবদের জন্য কি করিলেন? হাঁ, 'সমিতি' করিতে হইবে? বেশ 'সমিতি' না হয় করিল কৃষকেরা। হাঁ; সভ্যও হইল কংগ্রেসের। চাঁদা দিতে হইবে? বেশ পঞ্চায়েতের ট্যাকস্ যখন তাহারা দিবে, তখন না হয় গণেশ মণ্ডল দুই পয়সা করিয়া প্রজাদের জন্য 'সমিতির' ট্যাকস্ বেশি গ্রহণ করিবে। কিন্তু কাজটা তাহাদের করিতে হইবে কি? গণেশও তাহা জানে না। কলিকাতার বন্ধুদের বলিল, 'চলো'।

মণ্ডল বাড়িতে সভা হইবে। কলিকাতার লোকদের মুখে নতুন কথা শুনিয়াও কৃষকেরা অবাক। এই কথাই বুঝি শুনিতে চাহিতেছিল, কিন্তু কেহ তবু শুনাইতে আসে নাই। তাহাদের আশা হইল, এবার একটা কিছু হইবে।

প্রশ্ন করিল, এখন করা যায় কি?

শ্যামল বলিয়া বসিল, কেন? ভেড়ি কাটতে দেবেন না।

আরও অবাক প্রজারা: সে কি করে হবে? দারোয়ান পাইক আছে না বাবুদের কাছারিতে!

তারা ক'জন? আপনারা পনেরটা গাঁয়ের চাষী—এরা দু'জন কি চারজন। আপনাদেরও ত হাত পা আছে।

মারামারি বাধবে যে!

বাধলে বাধবে।—সহজ কণ্ঠে বলেন সৈয়দ আলী।

ফৌজদারী হবে, থানা পুলিস হবে।

নইলে দেওয়ানী করে জমি পাবেন নাকি? না, কাঁদা-কাটা করে এখন তা পাচ্ছেন? —বুঝাইয়া বলিতে চাহেন মাস্টার সাহেব।

কথাগুলি নতুন শ্যামলদের পক্ষে—পুঁথিতে পড়া। অসম্ভব রকমের নতুন কৃষকদের পক্ষে। কিন্তু অনেক বৎসরের অভিজ্ঞতা, বৃথা কাঁদাকাটা, হাঁটাহাঁটি প্রভৃতির ফলে কথাটা সেই গরিব কৃষকদের মনে ইহার অনেকদিন আগেই ঠাঁই পাইতেছিল। তাই ইহার যাথার্থ্য ও যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ ছিল না। বরং নিজেদের মনের কথাটা তাহারা বুঝিতে পারিতেছিল না, এবার শুনিতে পাইয়া উহাকে নিজেদের কথারূপে চিনিয়া লইতে পারিল।

আর,—অমিত জেল হইতে ফিরিয়া দেখিল,—আগামী দিনের সত্য যেন বর্তমানের গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইতেছে।

অবশ্য তখনো সে সত্য অপরিচিত, দুর্বল, অনিশ্চিত-গতি। জন্ম যে লইতেছে তাহাই বা জানিবে কে? জানিবে তাহারা, যাহাদের মধ্যে সে সত্য জন্মিল, সিংহ-বাবুদের হতভাগ্য প্রজারা; তারপর জমিদারের গোমস্তা বিহারী ঘোষের খাতকেরা, শোষিত চাষীরা।

সেবার ভেড়ি-কাটা লইয়া দাঙ্গা বাধিতে-বাধিতে বাধিল না। কিন্তু প্রজারা একজোট হইয়া দাঁড়াইল। সিংহবাবুরা প্রথম ভাবেই নাই—প্রজাদের এত সাহস হইবে। যখন জানিল, তখন নায়েব গোমস্তা থানায় গেল। দারোগাকে সঙ্গে আনিল। সব স্থির করিয়া যখন সে প্রস্তুত, তখন গণেশ মণ্ডল হেমন্তবাবুকে গিয়া ধরিল—লইয়া আসিল ইনজাংশন। দেওয়ানীর জোরে সাময়িকভাবে ভেড়ি-কাটা বন্ধ রহিল। দাঙ্গা বাধিল না। কিন্তু প্রজাদের বুকের সাহস উহাতেই তিনগুণ হইয়া গেল। চারিদিককার গ্রামের চাষীরা ভিড় করিয়া আসিল। গণেশ মণ্ডলের বাড়িতে তাহাদের দরবার লাগিয়াই আছে।—কলিকাতার বাবুদের ডাকিয়া এইসব গাঁয়ের চাষীদেরও একটা ব্যবস্থা করুন 'মেঝ কর্তা'।

মণ্ডল বাড়ির সেই বৈঠকে প্রথম হইতেই কানাই উপস্থিত হইত, মেঝবাবুর হইয়া সে বাঁশ বাধিয়াছে, চেয়ার টানিয়াছে, সভা হইবে। কানাই'রও উদ্যোগ উৎসাহ বাড়িয়া গেল।...অমিতের কানাইকে সেই প্রথম দেখা।

বর্ষা কাটিয়া কার্তিক-অগ্রহায়ণে পৌঁছিতে-না-পৌঁছিতে কানাই হাজরা গণেশের পাকা সাকরেদ হইয়া উঠিল। কলিকাতার বাবুরা বলিয়াছেন—জমির ধান তাহাদের। বিহারী ঘোষের বিরুদ্ধেও জোট বাঁধিয়া দাঁড়াইল তাহারা—বঞ্চিত কৃষকেরা। কিন্তু বিহারী ঘোষ ত শহর-বাসী সিংহবাবু নয়, পাকা লোক। সে ভালো করিয়া ব্যবস্থা করিল, থানা আগেই হাত করিয়া আসিল। জন-মজুরও ঠিক করিল, দারোয়ান-পাইকের অভাবও হইল না। তাই ছোটখাটো দুই একটা গোলমাল বাধিতেই থানার দারোগা মারপিট করিয়া দাঙ্গা ফ্যাসাদ থামাইতে গেল। কানাইও তাহাতে ধরা পড়িল; একসঙ্গে জন সাতেক তাহারা মহকুমার হাজতে বন্ধ হইল।

ধান-কাটার ব্যাপারে প্রজারা শান্তি-ভঙ্গ করিতে যাইতেছে, অতএব শান্তি-ভঙ্গের

দায়ে কানাই'র বিরুদ্ধে মামলা হইবে। ঘরে তখন স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা; শ্বশুর-বাড়িতে তাহাকে লইয়া যাইবার কথা। কী যে হইল, জেল হাজতে বসিয়া কানাই বুঝিতে পারে না। জামিন পাইলে হয়। কিন্তু মহকুমার হাকিম তাহাদের তিন জনের জামিনের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। বাকি চারজনকে জামিন দিলেন। অনেক করিয়া কানাই মেঝবাবুকে বলিয়া পাঠাইল। গণেশও কম চেষ্টা করিল না। মোক্তার লইয়া জেলে সে দেখা করিল। কাগজপত্র স্বাক্ষর করাইয়া লইল, সদরে আপীল করিবে জামিনের জন্য। এবং সংবাদটা গণেশই দিয়া গেল —কানাই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, তাহার একটি মেয়ে জন্মিয়াছে, ভালো আছে কানাই'র স্ত্রী ও শিশুকন্যা। সে-ই কাতুর জন্ম।

আরও মাস খানেক পরে যখন জামিন পাইয়া কানাই ও তাহার বন্ধুরা জেল হাজত হইতে বাহির হইল তখন তাহাদের উল্লাসের সীমা নাই। জেলের যাতনা কষ্ট শেষ হইল ভাবিতেই যেন তাহারা উৎফুল্ল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা কথা তাহারা বুঝিল—বিহারী ঘোষ আর করিবে কি? 'কথায় কথায় থানা-পুলিসের ভয় দেখায় উহারা। কিন্তু দেখলাম ত তার সব খানিই। ঘরে অন্তঃসত্ত্বা বউ, একা-ফেলে তাকে আসত হল। এর বেশি আর কিই বা করবে জেলে?—দেখলাম ত তোমাদের জেল-খানা।' কষ্টের স্মৃতিটা দিনে দিনে ঝাপসা হইয়া গেল, ভয়-ভাবনাও সঙ্গে সঙ্গে উবিয়া গেল—জেলের ভয়ই বা অত কি?

ঘরে ফিরিয়া কানাই দেখিল মেয়েকে—অতটুকু একটা নতুন মানুষ তাহার সংসারে। কেমন সে আশ্চর্য হইল, তাহার মজা লাগিল। বউ বলিল,—'মেয়েটা অপয়া। জন্মিল যখন বাপ তখন জেলে,—ঘৃণা লজ্জার কথা।' কানাই বলিল—'অপয়া ত তুই-আমি। তুইও পারলি না আমাকে ধরে রাখতে, আমিও পারলাম না পুলিসকে ফাঁকি দিতে। কিন্তু, দ্যাখ, মেয়েটা জন্মাল—আর জেলের ফটক খুলে গেল। এই কংস-কারাগার থেকে আমাদের সকলকে মুক্ত করলে ত ও-ই। ওই ত কাত্যায়নী।'

কাতুকে কানাই ছাড়িতে চাহে না আর। মামলা মোকদ্দমার হাঁকাহাঁকি আছে। কাজকর্মের জন্যও এদিকে ডাকে মণ্ডলের বাড়ির লোকেরা। গণেশ অতটা সাহায্য করিল কানাইদের; অন্তত মণ্ডলদের কলার চাষটায় কানাই একটু নজর দিক,—হাত লাগাক জন-মজুরদের সঙ্গে। হাঁ, নিজের ক্ষেত তাহার আছে, চাষ-বাস আছে, কিন্তু তাহাতে কানাই'র বৎসরের খোরাক ত হইবেনা। আর ভাগচাষেও তাহাকে এখন বিহারী ঘোষ বা অন্য কেহ কোনো জমি দিবে না। বাঁচিতে হইলে তাহাকে মণ্ডলদের নিকটই অনুগ্রহ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা অগৌরবেরও নয়। মণ্ডলেরা স্বজাতি; বরাবরই তাহারা কানাই'র মুরুব্বি। কানাই'ত তাহাদেরই কৃপায় মানুষ। আর এখন গণেশ কি কম করিল তাহার জন্য? কী দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি! পয়সাই কি খরচ করে নাই? সে খরচপত্র দিতে হইবে বৈকি কানাইদের এবার, ক্রমশ।

কিন্তু কোথায় তাহাদের সে টাকা? কলিকাতার বাবুরা বলিতেছেন, সমিতি

দিবে। কৃষকদের সংঘ করো, তাহারাই চাঁদা তুলিবে, নিজেদের মামলা মোকদ্দমার খরচ দিবে।

গণেশ বলে, ওনারা বোঝেন না। সমিতি কই? পুলিসের এই জবর-দস্তির মুখে কেউ সভ্য হবে না। সব দূরে দূরে থাকে। অবশ্য গোপনে গোপনে সবাই আবার বৈঠকও করে।—জেলের ফেরত কানাইদের দেখিয়াই ভরসা তাহারা পাইয়াছে 'এই ত কানাইরা ফিরে এসেছে। জেলে কষ্ট দিয়েছে?'

কানাই বলে, 'কষ্ট আর বিশেষ কি? খাটুনি আছে; কিন্তু খেতে দিয়েছে-দু'বেলা ভাত, নেহাৎ কমও নয়, তবে আবার কি চাই চাষীর? এক কষ্ট আছে, বিড়ি তামাক কিছু নেই। যেমন তেমন তাড়িও এক ভাঁড় পাওয়া যায় না।'

কিন্তু আর সমিতি করিয়া সভ্য হইয়া কি হইবে?

উৎসাহ লইয়া কানাই গ্রামে বাড়ি ফিরিয়াছিল। কিন্তু মেয়েটার মায়াও তাহাকে কেমন পাইয়া বসিতে লাগিল। বউও এবার বারণ করে। একলা মেয়ে মানুষ সে; এভাবে সংসার আগলাইতে সে পারিবে কেন? তিন মাস কানাই ছিল না, তাহার মধ্যে দেখুক না কত কি ঘটিয়া গেল। এদিকে জামিন মুচলিকার হুকুম হইয়াছে; কানাইও তারপরে বেশি বাড়াবাড়ি করিবে কি করিয়া? গঙ্গাও আর তাহাকে ছাড়িতে চাহে না।

বাড়াবাড়ি থাকুক, কানাই'র কাজের ঝোঁকই কমিয়া গেল। ক্ষেতে যায়, জোগান দেয় কোনো কাজে; মণ্ডলদের পীড়াপীড়িতে কলার চাষেও হাত লাগাইতে হয়। কিন্তু ছুটিয়া আসিয়া সে ঘরে দেখে তাহার সেই ছোট্ট, কয়েক মাসের কাতুকে। ঘরের দাওয়ায় মাদুরে-কাঁথায় সেই এক রত্তি মেয়েটাকে দেখিতে বসিয়া কানাই আর উঠিতে চাহে না। কাজকর্মে কেমন মন লাগে না। জমিটা হাত ছাড়া হইয়া যাইতেছে, ফসল তাহার ভাগে কম পড়িবে।

এই ক'মাস মণ্ডলেরা ধান ধার দিয়াছিল; ফসল উঠিলে তাহা কাটিয়া লইবে সুদশুদ্ধ। এই সব কথা যেন ভাবিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু না ভাবিয়া পথ কোথায়? সংসার চলিবে কিরূপে? আগে দুইজন ছিল, তাহাতেই চলিত না। এখন আবার এই আশ্চর্য ছোট্ট মেয়েটা আসিয়াছে। অবশ্য উহার জন্য এখনো বিশেষ কিছু দরকার নাই, কিন্তু দরকার হইবে একদিন। কানাই উঠিয়া পড়ে দাওয়া হইতে, কই কি কাজ আছে মণ্ডলদের বাড়িতে? চৈতালি ফসলের দিন গিয়াছে, বৈশাখের দিন আসিয়াছে। কানাই ক্ষেতের কাজে লাগিল মহা উৎসাহে। কিছু দিন কাজ করিয়াই কানাই আবার কিন্তু ঢিলা দেয়। সিংহদের ভেড়ি লইয়া আবার গোলমাল পাকাইতেছে। গণেশ মণ্ডল তাহাকে ডাকিয়া পাঠায়। কানাইও বোঝে কাজটা জরুরী। কিন্তু তবু বৈঠকে বেশিক্ষণ বসিয়া থাকিতে উৎসাহ পায় না। আগে বাধা ছিল গঙ্গা, এখন মেয়েটাও। সেই ছোট্ট মেয়েটা করিতেছে কি? হয়ত ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া হাসিতেছে। অদ্ভুত সেই দেয়ালি! কানাই আর বসিতে পারে না। পালাইয়া আসে বৈঠক হইতে। গণেশ বিরক্ত হয়। মেজ কর্তার নিকট হইতেও কানাই পলাইয়া পলাইয়া ফিরে।

বৎসর ঘুরিয়া আসিল। আবার বিহারী ঘোষের সঙ্গে ফসল-কাটা লইয়া কৃষকদের গোল বাধিতেছে। এবার কানাই না গিয়া পারে না। বিহারী ঘোষ তাহার জমিটা গিলিয়া খাইয়া বসিয়া আছে, উহা উদ্ধার করা চাই। কিন্তু সকলের আগে গিয়া দাঁড়াইতে সে আর উৎসাহ পায় না। জামিন মুচলিকার মেয়াদ এখনো শেষ হয় নাই; ইহারই মধ্যে আবার ফৌজদারীতে জড়াইয়া পড়া কি ঠিক? তাহা ছাড়া আবার ছোট্ট মেয়েটার মুখ মনে পড়ে। হাঁটিতে শিখিয়াছে সে, কথা বলে আধ-আধ, বলে 'বাব্বা'। উহাকে ছাড়িয়া আবার জেলে যাইতে হইলে—পারিবে না তাহা কানাই।

আন্দোলন এবার জোর ধরিল না; তবু গোলমাল হইল। শেষ পর্যন্ত তাই হেমন্তবাবুকে মধ্যস্থ করিয়া একটা আপোস করিয়া ফেলিল চাষীরা। কি করিবে আর? গণেশ মণ্ডলদের যে খাতকেরা তাহাদের বন্ধকী জমি নিজেরা লিখিয়া পড়িয়া দিয়া এতদিন খুশি ছিল, এখন তাহারাও সেইসব জমি দাবি করিতেছে—মণ্ডলেরা তাহাদের জমির মালিক কি করিয়া হয়? এ বড় বেয়াড়া আব্দার—বে-আইনী কথা! হেমন্ত মাইতি বিরক্ত হন।

বিহারী ঘোষ ঝানু মানুষ, জমিদারের সে গোমস্তা, আবার সে-ই মহাজনও। সেই সুযোগেই সে অত্যাচার করে, কৃষকদের জমি সে আত্মসাৎ করে। সেও ত বলে—'আইনতই কাজ করি, বে-আইনী কাজ করি কোনটা?' মণ্ডলেরা নিজেরাও চাষী। হাল-বলদ, গোলা-পুকুরে তাহারা বিহারী ঘোষের অপেক্ষা বেশি ছাড়া কম ভাগ্যবান্ নয়। মহাজনীও তাহাদের যথেষ্ট, বন্ধকী জমি তাহারাও সেই সূত্রে কম আত্মসাৎ করে নাই। তাহারাও বলিতেছে, 'আইনতই কাজ করা উচিত। বে-আইনী কাজ করলে লক্ষ্মী সহ্য করবেন না।'

এতদিন লোকে তাহা শুনিয়াছে, তাহাতে বিশ্বাসও করিয়াছে।

কিন্তু অভাব বড় জ্বালা। সেই তাড়নাতেই প্রথম চাষীরা দাঁড়াইতে চাহিল বিহারী ঘোষের বিরুদ্ধে। দাঁড়াইতে চেষ্টা করিতেই কৃষকেরা দাঁড়াইতে গিয়া বুঝিল—'জমির মালিক যদি আমরা চাষীরাই, তবে আমার জমি মণ্ডলেরাই বা হাত করে কোন নিয়মে?' প্রশ্নটা উঠিল; ক্রমে তাহা মণ্ডলদের কানেও পৌঁছিল। দুই একটা চাষী ধারে ডুবিতেছে। জমির ফসল উঠিলে এতদিন তাহারা বরাবর সুদের কিছুটা শোধ করিতে আসিত। এবার আর তাহারা মণ্ডল বাড়ির দিকে মুখ ফিরায় না। খবর পাঠাইলে বাড়ির লোকে বলে—'বাড়ি নেই'। পথে দেখা হইলে বলে—বাড়ি আসিয়া দেখা করিবে। তারপর পীড়াপীড়ি করিলে বলে—'ফসলের দামটা কি এমন যে সুদ দিব? ভালো দিন পড়লে সুদ নিজে গিয়ে দিয়ে আসি। তা বলতে হয় না।' অর্থাৎ সময় মন্দ, এখন বলিলেও সুদ দিবে না।

মণ্ডলেরা বলে—তাহা হইলে জমিটা বেচিয়া ফেলুক না? মণ্ডলেরা মোকদ্দমা করিলে ত সুদে-আসলে সবই যাইবে।

চাষীরা উত্তর দেয়, বললেই হয়? নিজের জমি নিজে চাষ করি, অন্যে তার মালিক হবে কোন ধর্মে?

বিহারী ঘোষের মত আইনের হুমকি দিলেই বা কি? মণ্ডলেরা বুঝিতেছিল, এখন দেখিলও—বিহারী ঘোষকে ছাড়াইয়া কৃষকদের কথাবার্তা আগাইয়া আসিতেছে, মণ্ডলদেরও বিরুদ্ধে প্রজারা দাঁড়াইতেছে। গণেশের নির্বুদ্ধিতায় কি যে হইতেছে তাহা কর্তাদের আগেও বুঝিতে বাকি ছিল না। গণেশের উপর কর্তাদের কড়া হুকুম হইল—এসব উস্‌কানি আর নয়। সে কলেজে পড়িতে হয় পড়ুক—কলিকাতায় গিয়া থাকুক। এখানকার কৃষকদের লইয়া এইসব বিরোধ পাকাইলে বড় কর্তারা তাহা আর সহিবেন না।

গণেশ তাই হেমন্তবাবুর শরণ লইল। হেমন্তবাবু এখন উকিল; তিনি বুঝিলেন বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছে গণেশ। এসব কৃষক লইয়া আন্দোলন এভাবে করিতে গেলে দেশে অরাজকতা আসিবে; মহাজন জমিদারেরাই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একত্র হইবে। হেমন্ত মাইতি নিজেই তাই বিহারী ঘোষকে খবর পাঠাইলেন, সহজেই তিনি মধ্যস্থ হইয়া বসিলেন। তারপর দুই পক্ষের অনেক সওয়াল শুনিয়া রায় দিলা দিলেন—আইনজ্ঞ মানুষ, বে-আইনী কথা তিনিই বা বলিবেন কেন?—বন্ধকী জমি জোত যাহা আইনত যে পাইয়াছে সে পাইবেই। তবে চক্রবৃদ্ধি সুদটা মহাজনেরা বেশ কিছু মাফ করিবেন। আর জমি? পুরোনো চাষীকে আবার ভাগচাষে যেন তাঁহারা জমি বন্দোবস্ত দেন। অবশ্য তাহা আইনের কথা নয়, ধর্মের কথা। ধর্ম হইল অনেক বড় জিনিস। ধর্ম না মানিলে থাকিবে কি?

মণ্ডলেরা কথাটায় সায় দিল—অধর্ম তাহারা করিবে না। বিহারী ঘোষও কথাটা মানিয়া লইল।—বে-আইনী কাজ সেও করিবে না। কৃষকদের হইয়াও অনেকে সায় দিল—বাবুরা যখন বলিতেছেন। কেবল মুসলমান কৃষকেরা চুপ করিয়া রহিল। তাহাদের একজন বলিল, 'চাষীর ধর্ম হল চাষ। যতক্ষণ চাষ করি ততক্ষণ ত খোদার হুকুম মত ধর্মপালনই করি। অভাবে পড়ি, ধার নিই;—মহাজন ফসল নেয়, গরু নেয়, মালক্রোক আনে,—না নেয় কি? কিন্তু সাই নিক্ জমি নেয় কোন ধর্ম অনুযায়ী?'

এ ব্যাটাদের মাথায় এসব ঢুকাইয়াছে কে? সৈয়দ আলি বুঝি? আরও বিশদ করিয়া হেমন্তবাবুকে তাই ধর্মের ব্যাখ্যা করিতে হয়। কলিযুগে ধর্মের বড় দুরবস্থা। তাই ভালো ভালো লোক বুঝিতে পারে না ধর্ম কি, অধর্মই বা কিসে? স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকে পর্যন্ত বকরূপী ধর্ম বুঝাইতে পারেন নাই ধর্মের তত্ত্ব। বুদ্ধিমান্ লোকেদেরই একালে ভুল হয়, চাষীদের ত ভুল হইতেই পারে। ভুল যতটা সম্ভব হেমন্তবাবু তাহা দূর করিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মুসলমানেরা বুঝিল কিনা সন্দেহ। চুপ করিয়া রহিল, নিজ গৃহে চলিয়া গেল। হিন্দুদের শাস্ত্রের কথা হিন্দুরা মানিতে হয় মানুক।—'এ আমাদের শাস্ত্র নয়।'

কানাইও চুপ করিয়া শুনিয়াছিল, চুপ করিয়াই গৃহে ফিরিয়া আসিল। একটু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বরং বাঁচিল—এই বৎসর আর দাঙ্গা হাঙ্গামার ব্যাপার নাই। আবার জেলে যাইতে হইবে না কানাইকে,—মেয়েটাকে ফেলিয়া আবার এখন জেলে যাইতে

সে পারিত না। বাঁচা গেল; কিন্তু সে খাইবে কি? পরিবে কি? আর এত যে বরাবর বলিয়া আসিয়াছে—'আমাদের জমি আমাদের, কিছুতেই মহাজনের হবে না।' —তাহা কি তবে মিথ্যা? এইটাই কি ধর্মসঙ্গত কাজ হইল তাহাদের? কী ধর্ম? না, বাবুদের কথাই থাকুক। এক বৎসরও হয় নাই—কত চেষ্টা করিয়া গণেশবাবু জজ আদালতে তাহাদের জামিন আদায় করিলেন। অন্যায় কথা বলিবার মত মানুষ তাঁহারা নন। করুক গজ-গজ রহমৎ। কানাই এখন অতশত তর্ক করিতে চাহে না। বেশত, দেখাই যাউক—অন্তত আর একটা সাল আরও।

সেই সালে অভাব বাড়িয়া গেল। গোলমাল রহমতদের গাঁয়ে লাগিয়াছিল, অন্যান্য গাঁয়েও ছড়াইয়া পড়িল। সমস্ত থানায় একটা অসন্তোষ। চাষীরাই বা করিবে কি? অভাবের তাড়নায় প্রাণ যে তাহাদের আর টিঁকে না।

অভিযোগ শুনিয়া এবার গণেশ রাগ করিল। একটা আপোস-রফা হেমন্তবাবু করিয়া দিয়াছেন। এক সাল যাইতে না যাইতেই কৃষকেরা তাহা ভাঙিতে চায়? এমন অধর্ম কাজে সে নাই। রাগ করিয়া গণেশ চলিয়া গেল বৈঠক হইতে। কানাই'রও যাইতে ইচ্ছা করিল—গণেশ নাই, হেমন্ত নাই, কে তবে তাহাদের দেখিবে? কলিকাতার বন্ধুদের খোঁজ নাই। কিন্তু গণেশ গেলেও কানাই যাইবে কোথায়? খাইবে কি সে? কেবলি যে ধার করিতে হয়। মণ্ডলেরা তাহাকে যে ধার দেয়, যে হারে সুদে-আসলে তাহা আবার আদায় করে, তাহাতে কানাইর ঘরে কমই ফসল আসে। ওদিকে আপোস সত্ত্বেও বিহারী ঘোষ তাহাকে ভাগচাষী বলিয়াও আর জমিতে ঢুকিতে দিতে রাজী হয় নাই। বলিয়াছে, 'কানাই বড় বজ্জাত, জমিতে একবার ঢুকলেই আবার বলবে জমি তার।' তথাপি কানাই সহিয়া আছে—তাহার বিশ্বাস গণেশবাবুরা তাহাকে দেখিবেন; চক্রবৃদ্ধি সুদটা মাফ করিয়া দিবেন, আপোসের চুক্তি মত জমিটাও ভাগচাষে তাহাকে দেওয়াইবেন। যদি তাহা না হয়?—কানাই ভাবিয়া পায় না তাহা হইলে কি হইবে? কে তাহাকে দেখিবে? কে তাহাকে বাঁচাইবে? শুধু তাহাকে নয়—সেই ছোট কাতুও ত আছে। এখন সে চলিতে শিখিয়াছে, বেশ কথা বলিতে পারে—একটা খেলার ঝুমঝুমিও তাহার চাই। তাহা না পাইলে কাঁদে। পাইলে ভাঙিয়া ফেলে। নতুন একটার জন্য আবার কান্না জুড়িয়া দেয়।

অঘ্রানের প্রথম হিম পড়িতেই কিন্তু কেমন করিয়া কাতুর কাশি হইল, জ্বর হইল। জ্বরে বেহুঁস সেই মেয়ে। তিন দিনের জ্বরে সে মরিয়া গেল। ওদিকে তখন ঘন ঘন বৈঠক বসিতেছে, এখন আর মণ্ডল বাড়িতে নয়,—ভিন্ন গ্রামে, চাষীদের পাড়ায়। রুখিয়া দাঁড়াইবে এবার চাষীরা। কিছুতেই আর সুদের নামে ফসল আদায় নয়, কোনো কথা আর শোনা নয়, কোনো দেনা আর তাহারা দিবে না। কানাই বৈঠকের ডাক শুনিত, যাইত; কিন্তু একটু পরেই পলাইয়া আসিত। বাড়ি ফিরিয়া ভয়ে ভয়ে থাকিত, কাজটা ভালো করিতেছে না। দশজনের বৈঠক, সে তাহা ফাঁকি দিতেছে। কে জানে কি হইবে? কেমন অপরাধী মনে হইত নিজেকে। অথচ সাহসও পায় না যেন। যেই কাতু মরিতে বসিল সে যেন

বুঝিল সত্যই তাহার অধর্ম হইয়াছে। মেয়ে তাহাদের মুক্তি দিতে আসিয়াছিল, সে যখন জেলে ছিল; জেলকে কানাই যেই ভয় করিতে আরম্ভ করিল, সেই মেয়েও তাহাকে অমনি ছাড়িয়া গেল। যাইবে না? সে যে স্বয়ং দেবী ছিলেন—কাত্যায়নী। এতগুলি গ্রামের এতগুলি মানুষের কাজ হইতে পালাইয়া ফিরিতেছে কানাই, আর দেবী থাকিবেন তাহার ঘরে?

অমিত জানে, এবার বুদ্ধি সাফ হইয়া গেল কানাই হাজরার। আর শুধু কানাই হাজরার কেন? কাতুর মায়েরও। দশজনকে ফাঁকি দিলে ধর্ম সয়? সয় না। তাই ত কাতু তাহাদের ছাড়িয়া গেল। তাহার পরে অনেক কিছু ঘটিল—দু'বৎসর পরে নারাণী জন্মিল। কিন্তু তাহার পূর্বে কানাই তেতাল্লিশজন চাষীর সঙ্গে মাসের পর মাস মহকুমার হাজতে কাটাইয়া আসিয়াছে, জামিন মিলে নাই। পরের সালে বিনা জামিনে তাহার বউ ও আর দু'জন চাষীর বউ ও চাষীর মায়ের সঙ্গে দাঙ্গার দায়ে সেই জেলে এক মাস কাটাইয়া আসিল—তখনি নারাণী তাহার পেটে আসিয়াছে। জন্মিল সেই নারাণী। কিন্তু তাই বলিয়া কানাই হাজরার আর ভুল হইল না। আর নারাণীর মায়ের পক্ষে বেশি জেল-ফৌজদারীর ধক্কলে যাওয়া সম্ভব হয় নাই। কাজ করিয়াছে, ধান ভানিয়াছে, সিদ্ধ করিয়াছে, ব্যাপারীদের কাছেও চাষীর বউ নিজে বহিয়া লইয়া গিয়াছে দরকারের মত চিঁড়া, মুড়ি। তারপর যুদ্ধের দিনে বহু কষ্টে দিন কাটাইয়াছে। নারাণীকে মানুষ করিয়াছে। মোটামুটি অবস্থা দেখিয়া মধুর সঙ্গে বিবাহ স্থির করিয়াছিল—বিবাহের পূর্বেই সেবারকার জ্বরে নারাণীর মা মরিয়া গেল। নারাণীকে বিবাহ দিল কানাই। এখন মধুদের বাড়িতেই নারাণী আছে। জামাই-শ্বশুরে জমিদার-মহাজনের সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে এই কয় বৎসর ঝানু 'সমিতিওয়ালা' হইয়া উঠিয়াছে। কোন খালের জলে কোন ক্ষেত ভাসে, স্লুইস গেট হইলে কতটা জমি রক্ষা পায় কোন ইউনিয়নের, ভেড়ি কাটিয়া কোন জমিদার কতটা মাছের ব্যবসা ফলাইতেছে, তাহাদের গোমস্তা-মহাজনরা কেমন করিয়া কৃষকদের লুঠ করিয়া নিঃশেষ করিল, দুর্ভিক্ষে মন্বন্তরে কেমন জমি বিক্রী হইয়া গেল, কত ভাবে মরিল কতজনা, বাঁচিয়াই বা মরিয়া আছে কত; ফুড্ কমিটির ও প্রোকিউরিং-এর নামে গরিবের উপর লুঠ চলিয়াছে কিরূপ;—হেমন্ত মাইতি এম. এল. এ. কতটা চোরা-কারবারের মালিক, গণেশ মণ্ডল হয়ত বা কোন্‌দিন মন্ত্রীই হইয়া বসিবে;—তাহার ব্যবসা এখন চালে ডালে কাপড়ে কেরোসিনে কত বড়; গাঁয়ে গাঁয়ে জমিহারা কৃষকের সংখ্যা কত বাড়িয়াছে; ভাগ-চাষীদের 'আধি' নানা ওজুহাতে কাটা পড়িতে শেষ অবধি কত সিকেয় গিয়া দাঁড়ায়; জমিদারের গোলায় ধান তুলিলে আর সে ধানের কয় আঁটি যাইবে কৃষকদের ঘরে,—এক কথায় সমস্ত দক্ষিণ অঞ্চলের ছবিটা কানাই হাজরা আপনার নখাগ্রে বহিয়া বেড়ায়। কত বার অমিতও তাহা শুনিয়াছে।

হাঁ, সে 'কমরেড' হইয়াছে। সম্মেলন করিতে নেত্রকোণা গিয়াছে, হাজংদের দেখিয়াছে। দিনাজপুরে গিয়াছে, সেখানকার কমরেডদের সঙ্গে গল্প করিয়াছে। খুলনা, যশোর,—কোন কৃষক এলাকায় সে যায় নাই? তারপর আসিল 'তেভাগা'। গোটাতিনেক

দাঙ্গার দায়ে তেভাগার সময়ে কানাই মাস কয় জেল খাটিয়াছে। এখনো সে প্রায় আধা-ফেরারী। গ্রামে গ্রামে গোপনে ঘুরিয়া বেড়ায়। শহরে আসে প্রকাশ্যেই কৃষক সভার আপিসে। উকিল পাকড়ায়, মামলা মোকদ্দমায়। জামিনের ব্যবস্থা করে, ইশতেহার লেখায়, ছাপা কাগজ বহিয়া গ্রামে নেয়; নিজে পড়ে, দশজনকে পড়িয়া শোনায়; 'কম্যুনিস্ট' কাগজের পাতা খুলিয়া গলদ্ঘর্ম হইয়া তাহা পড়ে; না বুঝিলে সমিতির আপিসের কাহাকেও ধরিয়া গলদ্ঘর্ম করিয়া ছাড়ে। ময়লা রঙ-এর বেঁটে-খাটো এই মানুষটি এখন বোধ হয় চল্লিশের দিকে আসিয়াছে,—কৃষক সমিতির পরিচিত লোকদের সে 'হাজরা দা'। সভায় মিছিলে তাহার মোটা ভাঙা-গলা সকলে চিনে। তাহার খাঁদা নাক, ছোট চোখের তীব্র চাহনি সকলের পরিচিত। কতবার অমিত তাহাকে কতখানে দেখিয়াছে গত দশ বৎসরে। আর শুনিয়াছে তাহার কথা, তাহার মোটা গলার স্লোগান। কিন্তু কলিকাতা আসিয়াছিল কেন এই সময়ে হাজরা'দা? তাহা না হইলে নিশ্চয়ই ধরা পড়িত না। হয়ত গ্রামের কৃষক নেতারা কেহই এখনো গ্রেফতার হয় নাই।

অমিত বলিল, এখানে এসেছিলেন কোথায়, হাজরা'দা?

আমরা আবার কোথায় আসব? আমাদের আপিসে।

কৃষক সভায়?

হাঁ, জেলা কৃষক-সভার আপিসে। তিনবার খবর পাঠালে ফর্ম পাঠায় না সম্পাদক। ওদিকে মেম্বর করবার দিন যায়। ইউনিয়ন কৃষক-সভায় লোকেরা বলে, 'হাজরাদা থাক্ তোমাদের ফর্ম। আমরা এমনিই ত মেম্বর আছি। এখন বরং এসো কাজটা কি, তাই বলো।' কাজের কি অভাব রে বাবা, যে আমায় তা বলতে হবে? কিন্তু সভা করবে না, মেম্বর করবে না, তবে সমিতির কাজ চলবে কি করে? কাল এসে তাই সেক্রেটারিকে পাকড়ালাম। 'ওসব শুনব না—কাগজ পাই না, ছাপা হয় না। যেখান থেকে পার দাও মেম্বরশিপের ফর্ম।'

তারপর?

সেক্রেটারি বললে—আজ ফর্ম আসবে ছাপাখানা থেকে। ছাপা হলে পার্টির ইশ্তেহার নিয়ে যাব আজ। তাই রয়ে গেলাম একটা দিন। রাত্রিতে শুয়েছি, ভোর না হতেই ধাক্কাধাক্কি। ওঠ, ওঠ পুলিশ এসেছে। তারপরে ত এখানে বসে আছি। আপনারা ত বেশ গল্প জমিয়েছেন; কিন্তু আমরা চাষারা করি কি?

কেন? আসুন না, একটু ঝিমিয়ে নিই—খাবার যতক্ষণ না আসে।

খাবার দিবে—এ সম্ভবনায় কানাই হাজরা একটু আশান্বিত হইল। ক্ষুধা পাইয়াছে। কৃষক মানুষ না খাইয়া পারে? কিন্তু ধরিল কেন তাহাকে?

অমিত একটু ব্যাখ্যা করিল। আটক বন্দী হিসাবে জেলে ধরিয়া রাখিলে কি-কি আইনত সুযোগ পাওয়া যায়, তাহাও জানাইল। হাজরাদা' শুনিল, শুনিয়া মনে মনে বেশ প্রলুব্ধই হইল।

তাই ত, দিন তাহা হইলে মন্দ কাটিবে না। সে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কতদিন ধরে রাখবে?

ঠিক নেই। যতদিন সরকারের খুশি।

হাজরা চমকিত হইল।—তার অর্থ? তাহলে এই যে, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ লড়াই'র আয়োজন করছিলাম, তার কি হবে?

কি আর হবে, করবে ওরা যেমন করে পারে।

আমি যোগ দোব না তাতে?

কি করে দেবেন—ধরে রাখলে?

জামিনও পাব না?

জামিন এ আইনে হয় না, হাজরাদা'।

সত্য বলছেন, অমিতবাবু?

নইলে এই আইনের বিরুদ্ধে এত আমরা আন্দোলন করছিলাম কেন?

কানাই চিন্তাগ্রস্ত হইল। মুখে কথা নাই, কিছুক্ষণ পরে কহিল, তা হবে না, অমিতবাবু।

কি হবে না?

ও সময়ে জেলে বসে থাকা চলবে না। সবাই লড়বে, আর কানাই হাজরা বসে থাকবে জেলে? সে হবে না।

করবেন কি ধরে রাখলে?—অমিত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে।

সে আমি কি জানি? আপনারা তা ভেবে ঠিক করুন। কিন্তু জেলে বসে থাকব কি করে? কত কাজ পড়ে রয়েছে।

অমিত বলিল, কাজ আছে? তা জামাই দেখবে না?

হাজরা উত্তর দিল, সে ত দেখবে তার কাজ,—তা' বলছি না।

কি কাজের কথা আবার তাহা হইলে?—কি মুশকিল্ কানাই'র, অমিতবাবুকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে তাহাও? হাঁ, মধু ক্ষেত দেখিবে, অবশ্য নারায়ণীর ছেলে-মেয়ে হইবে। না, প্রথম পোয়াতী নয়। শাশুড়ী আছে শ্বশুরও আছে; বউকে তাহারাই দেখিবেও। তবু বাপকে নারায়ণী এখন ছাড়িয়া থাকিতে চায় না। মা নাই, তাই বাপের উপরই তাহার সকল মমতা। ভাবিতে মনটি কেমন হইয়া উঠে—নারাণী না জানি তাহার পিতার গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া কি করিবে? কোনো একটা বিপদ না ঘটিলেই হয়। এখনো দেরি আছে নারাণীর প্রসবের, সামলাইয়া উঠিবে নারাণী। আর না হইলেই বা কি? নারাণী ত তাহার মাতার মুখে, পিতার নিকট কতবার শুনিয়াছে—কেমন করিয়া তাহার বোন কাতু জন্মিয়াছিল যখন কানাই জেলে, আর কেমন করিয়া সে বোন কাতু চলিয়া গেল তাহাদের চোখের সামনে দিয়া। জেলে যায় নাই তখন কানাই, যাইতে চাহেও নাই; তবু রাখিতে পারিয়াছিল কি কাতুকে ধরিয়া? এমনিই ব্যাপার। চাষীর ঘরের মেয়ে নারাণী, চাষীর ঘরের বউ। হাঁ, মধুও জামাই ভালো; দরকার হইলে সব করিবে। শ্বশুরের জমি-জমা যাহা আছে সে দেখিবে। তাহা

ছাড়া, দরকার মত সমিতির কাজও মধু করিবে। সে ভাগচাষী নয়, তেভাগাতে'ও পড়ে না। নিজের জমি নিজে চাষ করে। ধানী জমি নয়, নানা শাক-সব্জীর, লাউ-কুমড়ো রবিশস্য নানা ফসলের। তারপরে এক-আধটুকু কলার চাষও আছে; জন-মুনিষ তাহারও লইতে হয়, মজুরী দেয়, মজুর খাটায়। তবে ক্ষেতের ফসল নিজেই মধু গোড়ের হাটে বহিয়া লইয়া যায়, বিক্রয় করে।—স্বচ্ছল চাষী, গরিব বা ভাগচাষী নয়। তবু 'তেভাগায়' সেবার মধু সকলের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে। এবারও করিবে।—অবশ্য নারাণী পারিবে না। না, সে পারিবে না এখন। তাহার মা থাকিলে দেখিত অমিতবাবুরা। সেবার দশ গ্রামের মেয়েদের সে-ই জড়ো করিল—নারাণীর মা। সেই দিনাজপুরের চাষী মেয়েদের মত—তাহারাও নামিত যুদ্ধে। এখনো লড়াই করিবে অন্যেরা। চাষীর বউ, চাষীর মেয়ে, তাহারা বসিয়া থাকিবে নাকি? ইহা ত জানা কথাই—লড়িলে মরিতে হইবে। দেখিবে অমিতবাবু, দেখিবে চাষীর বউদের, চাষীর মেয়েদের সাহস...

অমিত কৌতুক বোধ করিতেছিল। হাজরাদা'র মুখ খুলিয়াছে, এবার আর সহজে থামিবে না। যথা নিয়মে বলিবে—কেবল দিনাজপুরেই কি মেয়েরা 'তেভাগায়' সাহস দেখাইয়াছে? সাহস দেখায় নাই চব্বিশ পরগনার চাষী-মেয়েরা? বাঙলা সেই বিয়াল্লিশ হইতে কত জেলে গেল, ঝাঁটা লইয়া, ঠ্যাঙা লইয়া, ধান ভাঙিবার কাঠের ডাণ্ডা লইয়া কতবার তাহারা তখনি পুলিশকে, জমিদারের পাইককে তাড়া করিয়াছে। 'নারাণীর মা'—অমিত তাহার কথা জানে? জানে বৈকি—সহজ কথা ত নয়। শুনুক আবার।

আবার অমিত শুনিল—'নারাণীর মা' তের সাল আগে কেমন লড়াই করিয়াছিল :—ভেড়ির ওদিক থেকে আসছে ছোট দারোগা—পুলিশ তার সঙ্গে তিন জন। নারাণীর মা বলে—'তোরা আয়।' ধান ভানবার কাঠটা নিলে হাতে। মনুর মা, কাদুর পিসি বলে, 'তুই থাক্ বউ পিছনে, আমরা যাই সাম্নে;—আমাদের বয়স হয়েছে। তুই এখনো সোমত্ত বউ।' নারাণীর মা বলে, 'হ'। তুমরা গতরে পার না, চক্ষে দ্যাখো না; তুমরা যাবে, আর আমি বসে থাক্‌ব?'—তারপর 'হেঁই' বলে ছুটে বেরুল নারাণীর মা—হাতে সেই কাঠটা। ছোট দারোগা বলে—'ওমা! কে এল!' তিন তিনটা পুলিশ বলে—'আর যাব না।' নারাণীর মা বলে 'আয় নারে ডেকরারা'—

কানাই হাজরা থামিবে না। যাহা শতবার শতজনকে শুনাইয়াছে, তাহাই আবার শুনাইবে আরও শতবার আরও শতজনকে—নারাণীর মায়ের সেই বীরত্বকাহিনী।

অমিতও আবার শুনিতে লাগিল, শুনিল। আর শুনিতে শুনিতে তাহার মনে পড়িল—সেই কৃষক মা-বউদের কথা, অনেক মহিলা কংগ্রেসের কর্মীদের কথা, আর অনুর কথা, মঞ্জুর কথা। ভাবিতে লাগিল—সত্যই ত, লড়াই ত করিয়াছিল তাহারা,—করিয়াছে এই চাষীর ঘরের মেয়েরাও। ইস্কুলে কলেজে পড়া মেয়ে নয়; ভদ্র শিক্ষিতসমাজের মেয়ে নয়। গান্ধীজীর কংগ্রেসের ডাকেও আসে নাই। সাধারণ চাষীর ঘরের মেয়ে তাহারা, লড়াই করিয়াছে নিজেদের দুঃখের জ্বালায়,—পুরুষের সঙ্গে দাঁড়াইয়া। হাঁ,

মেয়ে তাহারা কেউ বা ভালো, কেউ বা মন্দ,—যেমন পার্বতী, বিলাসপুরীয়া, মংগলী; পৃথিবীতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক নেত্রী বা কর্মীরাই বা কে তাহা ছাড়া অন্যরূপ? কেহ বা ভালো, কেহ বা মন্দ। পৃথিবীর কোন্ দেশেই বা ইহা ছাড়া অন্য রকম মেয়েরা? কিংবা পুরুষরা? তবু সত্য যাহা তাহা এই :—পৃথিবীর এই বিপ্লবের আগুনে মেয়েরাও ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে রুশ দেশে, চীনে, স্পেনে, তাহা আমরা সকলে জানি। কিন্তু সকলে জানি কি—ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে বাঙলা দেশের চাষীর ঘরের মেয়েরাও?—এ সত্যটা কি আমরা বুঝিয়া দেখিতেছি? তাহারা শিক্ষিতা নয়, বিদুষী নয়, দেশের নামে বড় কথা বলিতে পারে না,—তাহারা তাই উল্লেখযোগ্যও নয়। হয়ত নিজেদের কথা নিজেরাও তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। জানে না—দুনিয়া-জোড়া বিপ্লবের মহামহীয়ান্ সাধনার মধ্যে বাঙলা দেশের অখ্যাত গ্রামের অবজ্ঞাত নির্যাতিত নারীজীবনের মধ্য হইতে এই যে দুঃসাহসের স্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল—কোথায় মথুরাপুরের কোন্ গাঁয়ের ভেড়ির কাছে, তারপর দিনাজপুরের কোন গ্রামে, না হাজংদের কোন পাড়ায়, আর কাকদ্বীপ-তমলুকের কোন্ কোন্ অজ্ঞাতনামা গ্রামে—কী ইহার অর্থ—কী ইহার ইঙ্গিত? কোন্ সমাগত-প্রায় ভূকম্পনের প্রথম অগ্নিগর্ভ, আভ্যন্তরীণ থর-থরি ইহা? আগামী দিনের কোন মুক্ত, আত্ম-মর্যাদাময় নারী-জীবনের প্রথম উদ্বোধন? ইহারা তাহা জানে না—জানি কি আমরাই?—কানাই হাজরার মুখে সেই 'নারাণীর মা'দের গল্প যাহারা শুনি সকৌতুকে—একটু অবজ্ঞার সহিত, একটু অবিশ্বাসের সহিত, হয়ত বা একটু ভদ্র-বর্গীয় কৃপা ও কৌতুকের সহিত? 'মহিলা' নয়, চাষা-ভুষার 'মাগ মেয়েও' পলিটিক্স করছে।

অমিত বলিল, কিন্তু নারায়ণী ত এখন পারবে না এসব কাজ, হাজরাদা'।

কানাই হাজরা থামিয়া গেল। বলিল, আহা, আজ না পারুক কাল করবে। তা বলে চুপ করে বসে থাকবে নাকি চিরকাল?—

কি মনে পড়িল কানাইর। একটু পরে আবার বলিল, না, এটা কি বসে থাকার সময় আমাদের চাষীদের? আপনারা শহরে থাকেন, কত লোকজন, কত কর্মী সেখানে? কিন্তু আমাদের ওখানে লোক কোথা? কে ইশতেহার বাঁটবে, কে মেম্বার করবে, কে বৈঠক ডাকবে? আর, এসব এখন না করলে লড়াই হবে কি করে বৈশাখে—সরকারী চাল ডালের ব্যবসাদার ও পুলিসের সঙ্গে? এসব এখন থেকে তৈরি না করলে এবারকার 'তে-ভাগার' লড়াই কি আর ঠিক মত আরম্ভ করা যাবে? সেবার বেঁচে গিয়েছে জমিদাররা জোতদাররা। শুনেছে, তেভাগা আইন হবে, আগে থাকতেই তাই ভাগ দিয়ে দিলে অনেকে। এ সাল আমরা দোমনা হলাম—আপনারাও পরিষ্কার করে কিছু বললেন না। বললেন, 'যে-গ্রামে তেভাগা চায়, সে গ্রামে তেভাগা হোক; যারা চায় না তারা তা করবে না।' কোন্ গ্রামে আবার কোন্ চাষী জোতদারকে সাধ করে ধান তুলে দেয়? তেভাগা চায় না তা হলে কে? কিন্তু সমিতির একটা নির্দেশ চাই। একবার যখন তেভাগার লড়াই শুরুই করেছি,—এক সাল তা আমারও

করেছি, তখন আবার অন্য কথা কেন? অমন লড়াই গিয়েছে সে সাল হাজংদের, দিনাজপুরের কৃষকদের; কিন্তু এ সালে আপনারা চুপ করে রইলেন। ভাবলেন, 'কংগ্রেস রাজা হয়েছে, দেখি কি করে।' তাই জমিদাররা এ সাল জোর পেয়েছে। পোয়া-বারো এবার জমিদার-জোতদারের। কংগ্রেসের মন্ত্রীরা ওদেরই লোক। এসব বুঝেই ত এখন থেকে আমাদেরও জোর প্রচার চালাতে হবে, জোর সংগঠন করতে হবে—এবারের শীতকালে যেন আর জমিদারের খোলানে চাষীরা একজনও ধান না তোলে।

কানাই হাজরার মুখ আবার খুলিয়া গিয়াছে—এবারের শীতের পূর্বেই কি কি করিয়া ফেলিতে হইবে, তাহা সে কল্পনা করিয়া বলিয়া যাইতেছে। বসিয়া থাকা চলিবে না জেলে। এখনি কাজে লাগিতে হইবে তাহাকে। অমিত তাহার কথা শুনিতে লাগিল। কানাইর কল্পনা আগামী দিনের লড়াইর নামে এখনি ছুটিয়া চলিতেছে—সেখানে বিলম্বের কারণ নাই, সংশয়ের অবকাশ নাই...চাষীর সংগ্রাম আজ আরম্ভ হইয়াছে, আরম্ভ যখন হইয়াছে তখন আবার দ্বিধা কোথায়, মীমাংসা কোথায়? সময় নাই, সময় নাই চাষীর।...

পাঁচ

কিন্তু সত্যই খাবার আসিয়াছে। আর কানাই হাজরার চোখ-মুখ এক নিমেষে আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চাষীর ক্ষুধা!

কিন্তু কী খাদ্য? প্রত্যেকের জন্য শুকনো খান চারেক ছোট ছোট পুরী ও কিছু তরকারী; 'ওয়ার-ইকোনমির' ছোট একটি রসগোল্লা। কানাই হাজরা যেন বিমূঢ় হইয়া গেল—এক থালা ভাত-নুন-লঙ্কাও নাই!

একটু একটু বাঁটিয়া খাইয়া জলের অভাবে পড়িতে হইল। জল নাই, গেলাসও নাই। জল যদি পান করিতে হয় তাহা হইলে পথের একটা টিউবওয়েলে চারজন-চারজন করিয়া গিয়া তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিতে পারিবে, অনুমতি হইয়াছে। তাহাতে পাহারাদারদের কাজ বাড়িবে অবশ্য, কিন্তু কি করা? এতগুলি ভদ্রসন্তান এবং 'লেডিজও'। কিন্তু আপিসের এমন ব্যবস্থা যে জলও তাঁহারা পাইতেছেন না—জানাইলেন দপ্তরের সেই অপ্রতিভ কর্মচারীটি। সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন: চা আসছে স্যার, একটু পরে।

টিউবওয়েলে জলপান করাটা যেন একটা উৎসব মঞ্জুর কাছে। পারিলে সে স্নানে বসিয়া যায়। বেলা আড়াইটা বাজিয়া গিয়াছে, স্নান নাই, হাতমুখ ধোয়া নাই, এই চৈত্রের গরমে একটা ঘরে এতগুলি লোক চার-পাঁচ ঘণ্টা যে কি ভাবে কাটাইল, এতক্ষণ তাহা যেন তবু মঞ্জুর মনেই হয় নাই। উড়িয়া গিয়াছে গল্পে, তর্কে, আলোচনায়—সকলকার সঙ্গে অবিশ্রান্ত কথায়। আহার আসিতে এবারে মঞ্জুর তাহা মনে পড়িল। তাই হউক রাস্তা, আর থাকুক পাহারা, মঞ্জুর স্বতোচ্ছ্বসিত প্রাণলীলা কোনো

পাহারা মানিয়া চলিতে চাহিল না ; জল ছুঁইতে পাইয়া তাহার আনন্দ, আঁজলা ভরিয়া পান করিতে আনন্দ, মুখ ধুইতে শাড়ী কাপড় ভিজাইয়া আনন্দ, আর সে আনন্দ ছাপাইয়া গেল বিজয়, দিলীপ, কান্তি ও তাহার বন্ধুদের জল ছিটাইয়া ভিজাইয়া দিতে দিতে। একটা খেলা জমিয়া যায় সেখানেই।

অমিত বুঝিল মঞ্জুর নিকট সব কিছুই এখনো একটা খেলা—জলও জেলও।...

অমিত ফিরিয়া আসিয়া বসিল একটা কেদারায়। এবার তাস লইয়া বসিল আর একদল। কেহ কেহ লম্বা বেঞ্চে এবার একটু ঘুমাইয়া লইবার সুবিধা খুঁজিতে লাগিল। অমিত কেদারায় বসিয়াই ঝিমাইতে পারিবে।

ই ঠিক নেহি হ্যায়।

অমিত দেখিল তাহার পার্শ্বে বুলকন। তাহাতেই কি বলিতেছে বুলকন ?

কি ঠিক নেহি হ্যায়, কমরেড্ বুলকন ?

বুলকন জানাইল—সকলে আবার তাস খেলিতেছে কেন ? খেলিতেছে ত কেবল ইংরাজী খেলা খেলিতেছে কেন ? ইহা ঠিক নয়। দেশী খেলা হইলে—বিন্তি টুয়ানটি-নাইন,—হাঁ সে খেলিত এক-আধটুকু। কিন্তু তাই বলিয়া সারাক্ষণ তাস খেলা ? 'ই ঠিক নেহি হ্যায়।'

গোরখপুব কিংবা আজমগড় জিলায় বুলকনের ঘর। কিন্তু 'বঙ্গালী' বলিয়া সে নিজের পরিচয় দিলে তাহাতে আপত্তি করে কেন লোকে ? বিশ সাল সে বঙ্গলা দেশে আছে—এই বঙ্গলা মুলুকে আপনার রুটি কামাই করিয়াছে। সে বাঙলায় কথা বলিতে পারে, জরুরৎ হইলে বঙ্গলায় ভাষণ ভি দিতে পারে।

বুলকন বলিত—'ঘর কাঁহা ?' যাঁহা মেরা কাম, উহা মেরা ধাম।—মজদুরের আবার অন্য 'ঘব' আছে নাকি ?

অমিত বুলকনকে দেখিয়াছে সেই যুদ্ধের প্রথম দিকটায় ; ট্রামের ইউনিয়ন তখন গড়িয়া তুলিতেছে ইহারা। ট্রাফিকের লোকেরা তখনো ইউনিয়নে আসিতে প্রায় চাহে না। ইউনিয়ন চলিত ওয়ার্কশপের মজুবদের লইয়া। তখনো ইউনিয়নের জীবনে জোয়ার লাগে নাই। বুলকনের মত ট্রাফিকের লোকেরা দুই-চারিদিন মাত্র তাহাতে যোগদান করিয়াছে ; অন্যদের প্রাণপণ করিয়া বুঝাইয়া পড়াইয়া ইউনিয়নে আনিতে চেষ্টা কবিতেছে। সে কি কঠিন প্রাণান্তকর প্রয়াস তাহাদের। বুলকন ত তখনো ভালো করিয়া বাঙলা বুঝিতেও পারে না, বলা ত দূরের কথা। হিন্দীতেই কি কিছু বলিতে পারিত বুলকন ? কোথায়, মনে পড়ে না অমিতের বুলকনকে তখন কিছু বলিতে শুনিয়াছে।...

সে দিনেব সেই ট্রাম ইউনিয়নের ছোট ঘরে ট্রাম মজুরদের ছোট্ট সভায় 'ডিউটি' শেষে আসিত তাহারা ছোট ছোট দলে। শ্রান্তমুখ, ঘর্মাক্ত কলেবর, খাকীর ইউনিফর্ম ও মাথার টুপি ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। তবু তাহারা আসিয়াছে ডিউটির শেষে বিশ্রাম না করিয়া। মেসে গিয়া স্নানও সারিয়া লয় নাই, সরাসরি ইউনিয়ন আপিসে আসিয়াছে। সাড়ে পাঁচটায় মিটিং, ছয়টায় অন্তত আরম্ভ করিতেই হইবে। ট্রাফিকের

কোন এক সেকসনের লোকদের আসিবার কথা। তাহাদের বুঝাইতে হইবে, ইউনিয়নে আনিতে হইবে; তাহারা যেন আসিয়া না দেখে বুলকনেরা নাই। কত করিয়া বুঝাইতে হইবে উহাদের। ভাঙা হিন্দীতে, ভাঙা বাঙলায় গলদঘর্ম হইত ইউনিয়নের ইংরেজী-পড়া বাঙালী কর্মীরা। তাহারা জেল খাটিয়াছে; কালাপানি গিয়াছে। কিন্তু হায়, হিন্দী কেন শিখিল না? ইহারই মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইত দুর্গা দত্ত, অবধপ্রসাদ বা ইয়াকুব। তাহারা ট্রাফিকের লেখাপড়া জানা শ্রমিক। কিন্তু বক্তৃতা করিতে শিখে নাই, শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসও জানে না। রাজনীতির কথাও অতি অল্পই শুনিয়াছে ইতিপূর্বে। গান্ধীজীর কথা জানে সবাই; শুনিয়াছে, দেখিয়াছে. মনে মনে প্রেরণাও অনুভব করিয়াছে কংগ্রেসের আন্দোলনে। সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়াছে—ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের শোষণেরই একটা অঙ্গ এই ইংরেজ ট্রাম মালিকদের শোষণ, এই অত্যাচার, এই অপমান। কথাটা মনে লাগিয়াছে বুলকনের। সাম্রাজ্যবাদ কি, কে জানে? সে দেখে এই ট্রাম মালিকদের রাজত্ব। ম্যানেজার ডুর্ন সাহেবের অত্যাচার, ফিরিঙ্গি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের জুলুম—তবে ইহাই সাম্রাজ্যবাদ? আর ইহারই মধ্যে কমরেড কালীর মুখে সে শুনিয়াছে 'শ্রমিকের এমন দেশ আছে যেখানে মালিকের শোষণ নাই, আছে শ্রমিক-কৃষকের স্বাধীনতা;—যেখানে বেকারী ও ছাঁটাই নাই, আছে কাজ পাইবার স্বাধীনতা, আছে তাই রুটির স্বাধীনতা, রুজির স্বাধীনতা, স্বাধীনতা মজুরদের রাষ্ট্র পরিচালনার।' কিন্তু যাহাই শুনুক, বুঝিয়াছে একটা সত্য—নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়া বুঝিয়াছে তাহারা কয়জনেই দুর্গা দত্ত, ইয়াকুব ও বুলকন—শ্রমিকের স্বার্থেই ট্রাম শ্রমিককে 'এককাট্টা' করিতে হইবে, মজবুত করিয়া ইউনিয়নকে বানাইতে হইবে। তাহা ছাড়া বাঁচিবার পথ নাই তাহাদের—বাঁচিবার পথ নাই ৭১৩ নং কন্ডাক্টার বাঙালী দুর্গা দত্তের, "১১৭৭ নং" ইট-পি'র ব্রাহ্মণ অবধপ্রসাদ পাণ্ডের, '৯৫৬ নং' ড্রাইভার শাহাবাদের মুসলমান মহম্মদ ইয়াকুবের, আর বাঁচিবার পথ নাই, '১৩০২ নং' কন্‌ডাক্টার আজমগড়ের বুলকন লোহারের। ট্রামের কোনো শ্রমিকেরই বাঁচিবার পথ নাই,—'ওয়ার্কশপের' শ্রমিকের নাই, 'ট্রাফিকের' শ্রমিকের নাই, 'মিনিয়ালের' শ্রমিকেরও নাই।

কথাটা বলিতে বলিতে ইয়াকুবের উর্দু জবান যেন ধারাল হইয়া উঠিল। অমিত কান পাতিয়া শুনিয়াছে পার্শ্বের ঘর হইতে, মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছে দুয়ারের বাহির হইতে সসংকোচে—হয়ত তাহাকে দেখিলে বাধা পাইবেন বক্তা, মনোযোগ ভাঙিয়া যাইবে অন্যদের। তবু এমন চমৎকার যে ভাষা তাহারই কানে ঠেকিতেছে, কী তাহার প্রভাব ঘরের উপস্থিত মজুরদের উপর?...কিন্তু তাহা বুঝিবার উপায় নাই। শ্রান্ত অবসন্ন দেহে কেহ শুধু চোখ মেলিয়া তাকাইয়া আছে। কেহ বা ঘুমে ঢুলিতেছে। কিন্তু তবুও কাহারও কাহারও চোখ চক্‌-চক্‌ করিয়া উঠিতেছে। একঘর পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত মানুষের সেই ভিড়-বহুল ঘরের মধ্যে সেই মুখগুলি—একটা বৈশিষ্ট্যহীন দৃশ্যই অমিতের চক্ষে বেশি জাগে। ইহার মধ্যে কখন দাঁড়াইত পাণ্ডে, সাচ্চা হিন্দীতে নিজের ভাষা তখন সে খুঁজিয়া লইতেছে। নিজের কানে অমিত শুনিত দূরের পদক্ষেপ।...আশ্চর্য, মানুষের এই আপন ভাষাকে আবিষ্কার।...

অমিতের জানিতে আগ্রহ জাগিত। বসিয়া বসিয়া অমিত কয়েকদিন যদি পাণ্ডের এই আত্মাবিষ্কারের প্রয়াসকে লক্ষ্য করিতে পারিত! ইহা ত পাণ্ডের পক্ষে শুধু ভাষা আবিষ্কার নয়, আসলে পাণ্ডের আপনাকেই আবিষ্কার; শ্রম-শিল্পের অভিজ্ঞতার মধ্যে তাহার বুদ্ধিসতেজ সাধারণ মানুষের সত্তার জাগরণ,—ভাষার মধ্য দিয়া আবার সেই জাগ্রত চেতনাকে তাহার মেলিয়া ধরা; দশজনের সামনে সেই ভাষা রাখিয়া নিজেকে আবার গড়িয়া লওয়া সচেতন শ্রমিকরূপে।

...এক-একটা মানুষের এই জ্ঞাত-অজ্ঞাত সাধনাও পৃথিবীতে কত বড় এক বিস্ময়, কত তাহার বৈচিত্র্য, আর কত তাহার অভিনবত্ব! ইহারও মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে কতখানি মহাকাব্যিক বীর চরিত্রের মহত্ত্ব, ইতিহাসের এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সিম্বেল্!...অমিত মাঝে মাঝে তাহাই দেখিয়া চমকিত হইত! দেখিত আবার দুর্গা দত্তের বিপন্ন অসহায় অবস্থা। কথা বলিতে হয়, বক্তৃতা করিতেও জানে। তবু সে জানে, সে বাঙলায় যাহা বলিল, তাহা বাঙলায় বলায় তাহার অধিকাংশ সহকর্মীরা উহার বিশেষ মর্ম গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহারা বাঙালী নয়। অথচ দুর্গা দত্ত বাঙলা ছাড়া কিসে বলিবে? ফরিদপুর-ঢাকার লোক তাহারা, হিন্দীর এক বর্ণও বলিতে পারে না তাহারা। অথচ বাঙলা দেশে বাঙলাভাষী মজুর কোথায়? অবশ্য, আসিতেছে তাহারাও রবারের কারখানায়, ইঞ্জিনের ঘরে; আসিতেছে কাপড়ের কলে, রেলওয়েতে; আসিতেছে আয়রন স্টিলে, আসিতেছে ট্রামে-ট্রান্সপোর্টে। ভিড় করিয়া আসিতেছে এখন পূর্ব বাঙলার মুসলমান, আসিতেছে পূর্ব বাঙলার হিন্দু। গ্রাম ছাড়িয়া শহরের দিকে না আসিয়া আর উপায় নাই গ্রামের কারিগর মিস্ত্রির, নিম্ন মধ্যবিত্ত দোকানী পসারীর, গরিব কৃষকের। কৃষিজীবীর সন্তানেরা তাই দলে দলে আসিতেছে। তবু এখনো গ্রামের মধ্যেই যেন বাঙালীর শিকড়; গৃহ সে ছাড়িতে চায় না। অবশ্য, অমিত জানে ভারতের প্রোলিটেরিয়ান যুগের আয়োজন বাঙলায়ও চলিয়াছে—আর এই সেই প্রোলিটেরিয়ান!

...এই কি প্রোলিটেরিয়াট্?...না। এখানে দশমাস কাজ করে ইহারা; গৃহের দিকে থাকে চোখ। ছুটিতে দেশে যায়—জমি কেনে, গরু কেনে, বলদ কেনে, ক্ষেতের কাজে ভাই-বন্ধুর সাহায্যে ব্যবস্থা করে; আবার ফিরিয়া আসে কলে,—মাসে মাসে পাঠায় গ্রামে টাকা। উপবাস করে, কষ্ট করে, দেশে বাড়ায় সম্পত্তি। জমিজমার অভাবে গাঁও ছাড়িয়া আসিয়াছিল—এখান হইতে টাকা কুড়াইয়া সেই জমিজমা বাড়ায়। তাই শেষে আবার সেই গ্রামে ফিরিয়া যায়, আবার 'ক্ষেতি' করে, আবার কৃষক হয়, হয়ত বা হয় 'কুলক', পশ্চিমের ক্ষুদে 'জমিদার', ক্ষুদে সাউকার,—বাঙলায় যাহারা ছোট জোতদার,—মজুর খাটাইয়া জমি চাষ করে। কলের রোজগারের অর্থে স্বচ্ছল হইয়া ক্ষেতে মজুর খাটায়, গ্রামে টাকা খাটায়। গ্রামের মজুর কিংবা ক্ষুদে খাতকের ইহারাই হয় আবার কঠিনতম শোষক। কি করে ইহাদের বলি প্রোলেটেরিয়াট্?...

কিন্তু সত্যই সম্ভব কি এমন করিয়া ট্রাম মজুরের পক্ষে এই সৌভাগ্যলাভ? সম্ভব এদেশেও আর? ..অমিত হিসাব করিয়া দেখিয়াছে এদেশে গ্রাম-জোড়া অগণিত

দরিদ্রের জীবনযাত্রা কত সামান্য। কলের যে-কোন মজুরের মজুরিই উহার তুলনায় একটা ঐশ্বর্য। কিন্তু এই দেশেও আর তবু মজুরের পক্ষে সম্ভব নয় খাটিয়া খাইয়া মজুরি বাঁচানো; হপ্তার মজুরি হইতে দেশে জমি কেনা। অসম্ভব তাহা ব্রিশের বাণিজ্য-সংকট ও মজুরি-কাটার পরে। তথাপি সম্ভব যদি হয় ত কয়জনের পক্ষে তাহা সম্ভব? হয়ত যত জনের সম্ভব মার্কিন মুলুকে মজুর হইতে ম্যানেজার-মালিকের স্তরে উন্নতিলাভের, যত জনের সম্ভব ইংলণ্ডে টমাস বা বেভিন্ হইবার,—মাত্র তত জনের। অর্থাৎ লক্ষে একজনের।—ইয়াকুব, পাণ্ডে বা বুলকন ইহারাই কি সেই ম্যাক্-ডোনাল্ড্-টমাসের ভারতীয় বংশধর? না, আগামী দিনের ভারতীয় বলশেভিকদের অগ্রদূত ইহারা?...

অমিত বুঝিয়া উঠিতে পারিত না কাহাদের সে দেখিতেছে সেই ট্রেড্ ইউনিয়নের অন্ধকার ঘরে। কিন্তু দেখিতেছে একটা নূতন দৃশ্য, একটা নূতন জাতি, একটা সম্ভাবনা...শুধুই সম্ভাবনা যাহা এখনো। হাঁ, সম্ভাবনাই। দুর্গা দত্ত বাঙলায় বক্তৃতা করিলে তাহা কেহই বুঝে না। এখনো দুর্গা দত্ত নিজেও বাঙলায় ভালো বলিতে শিখে নাই। বলিতে গিয়াও দুর্গা দত্তের নিজেরই মনে পড়ে, সে শরৎ গাঙ্গুলীর মত বাগ্মী নয়। সে মোতাহেরের মত ক্ষুরধার বাক্যে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিতে পারে না মালিকের যুক্তি। নিজের কাছেই দুর্গা দত্তের নিজের কথা মনে হয় যেন দুর্বল, এলোমেলো। মার্কস-লেনিনের কথা তুলিয়া কালীবাবুরা যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহাদের শ্রমিক রাজনীতির কথা বুঝাইতে থাকেন—তখন সে, দুর্গা দত্ত—ট্রামের শ্রমিকদের '৭১৪ নং'—কালী ঘোষ, মোতাহেরদের কাছে যে 'দুর্গাবাবু'—সেই জটিল তর্ক-যুক্তিতে যেন দিশেহারা হইয়া যায়। বড় অযোগ্য শিশু তাহারা তখনো। অবধপ্রসাদ ও ইয়াকুবও জানে এখনো তাহারা এক বর্ণও পড়িতে পারে না মার্কস বা লেনিনের বই। আর তাহা না পড়িলে কি বুঝিবে তাহারা শ্রমিক রাজনীতির? শিশু তাহারা—কি করিয়া চালনা করিবে নিজেদের সামান্য ইউনিয়ন? হিসাবপত্র রাখিবে, চিঠিপত্র লিখিবে, দাবিদাওয়া প্রণয়ন করিবে, প্রচার-পত্র তৈয়ারী করিবে, তারপর লড়াই ঘোষণা করিবে, লড়াই চালাইবে; আর মুখোমুখি হইবে মালিকের ও ম্যানেজারের—সাদা আর কালা বড় বড় সব 'বাঘা-বাঘা' মানুষের—ইহা কি তাহাদের দ্বারা সাধ্য কোনো কালে?

অমিতেরও এক-একবার সংশয় হইত। তবু সে দেখিত, সেই ঘর্মাক্ত, শ্রান্ত ট্রাম শ্রমিকের সাগ্রহ প্রয়াসের মধ্যেই একটা 'সম্ভাবনা'...দেখিত তাহা ইয়াকুবের মুখে, পাণ্ডে ও দুর্গা দত্তের মুখে, দেখিত বুলকনের মধ্যেও। কিন্তু বুলকন তখনো বক্তৃতা করিত না, করিবার কথাও ভাবিত না। সভার শেষে শুধু পুরুষালি সবল কণ্ঠে অন্যদের সঙ্গে তর্ক করিত—স্বল্প ভাষায় সহজ বুদ্ধিতে।

বছর পঁচিশের যুবক ছিল তখন সম্ভবত বুলকন। একটু বেশি দেখাইত বয়স। কারণ, অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা বুলকন ইতিমধ্যেই অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছে। তবু সে তুলনায় বয়স বেশি দেখাইত না। কারণ বুলকনের গায়ে আঁচড় পড়িলেও

তাহার দেহ সে ঝড়-ঝঞ্ঝায় কিছুমাত্র টলে নাই। লোহারের ঘরের ছেলে সে। হাতুড়ি পিটাইতে পিটাইতে হাত শক্ত হইতেছিল, কিন্তু দেহ আরও শক্ত হইয়া গেল কুস্তীর আখড়ায় লড়িতে লড়িতে। পুরুষানুক্রমে তাহারা লোহা পিটিয়াছে, আর কুস্তীও করিয়াছে আখড়ায়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে গ্রামে আর দিন গুজরানো যায় না। কালাইটিকেরি লোহারদের মধ্যে বুলকন-এর বাপই প্রথম গেল নিকটের শহরতলীতে এক বড় লোহার সর্দারের সাকরেদি করিতে। সকালের দিকে ঘর হইতে খাইয়া সে চলিয়া যাইত, সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিত। ইতিমধ্যে যখন বুলকন বড় হইয়া উঠিল তাহার দৌরাত্ম্যে তখন বাড়ির লোক অস্থির। ছত্রি ঠাকুরদের ছেলেকে পর্যন্ত সে উপহাস করিল। কুস্তীতে হারিয়া ঠাকুরের ছেলের অপমান বোধ হইয়াছিল। সেদিনে হইলে ঠাকুরেরা বুলকনের রক্ত চাহিত। এদিনে লোহারেরা মাপি মাগিয়াই রেহাই পাইল। আর তাই বদমায়েস ও বেতরিবৎ বুলকনের শাস্তি হইল—বাপের সঙ্গে শহরতলীর একটা ইস্কুলে গিয়া বসা; সারাদিন আবদ্ধ থাকা সেখানকার ক্লাশে। বেত খাইয়া, মারপিট সহিয়া, মারপিট করিয়া তবু সেখানে বুলকন সামান্য কিছু লিখিতে পড়িতে শিখিল। হাঁ, অংকও শিখিল, ইংরাজিতে নাম লিখিতে, নাম পড়িতেও পারিল। এক কথায় 'স্বাক্ষর' নয় শুধু, বুলকন 'ইংরেজি-জানাও' হইল। লোহারের ছেলে তখন বাপের সঙ্গে শহরতলীর লোহার দোকানের কাজে সাকরেদি করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহা বেশিদিন নয়। তখন পনের বছরের জোয়ান লেড়কা বুলকন। একদিন আবার ঠাকুরদের এক ছেলের সঙ্গেই লাগিল লড়াইতে। নতুন ইংরেজিশেখা ঠাকুরের ছেলে তাহাকে গাল দিয়াছিল 'রাসকেল' বলিয়া। ইংরেজি জ্ঞানে বুলকন তাহার অপেক্ষা হীন নহে। সেও পাল্টা গাল দিল 'রাসকেল' বলিয়া। তারপর যুদ্ধ। এবং যুদ্ধে ক্ষত্রিয় সন্তানের পরাজয় হইল। এবার বুলকনের রক্তই ঠাকুরেরা চাহিলেন—সে ইংরেজিতে গাল দিয়া বেইজ্জত করিয়াছে ছত্রির ছেলেকে। আর, এবার বুলকনের রক্তপাত করিবার ও তাহাকে নাকে-খত দেওয়াইবার প্রতিজ্ঞা করিল বাপ।

কিন্তু বুলকনকে পাওয়া গেল না।

বুলকন পলাইল। শহর নয়, বনারস, কানপুর নয়, একেবারে কলকাতা। 'ই হামরা মুলুক তব্‌সে'—বুলকন বলে।

বড়বাজারে কাজ করিয়াছে বুলকন—মাল তুলিয়াছে, মাল নামাইয়াছে, বেশিদিন তাহাতেও কাটে নাই। তারপর গিয়াছে লোহাপট্টিতে সেই কাজে। সেখান হইতে মল্লিক বাজারে। আর তাহার পর মোটরের কারখানায়। সেখান হইতে যায় সাহেবদের এক ছাপাখানায় কাজ লইয়া। শক্ত শরীর, ভারী মাল নামাইতে সে ভয় পায় না। যেমন কাজ, তেমন ছিল তাহাদের মজুরি ; কোথাও অনিয়ম ঘটে না। একদিন দেরী হইলে মজুরি কাটা যাইবে; তেমনি আবার তলব দিতেও একদিন দেরি হইবে না। বেশ কয়েক বৎসর এই চাকরি চলে।—ছাপা-কাগজ পড়িবার অভ্যাসও এখানেই বুলকনের পাকা হয়। ইংরেজি অক্ষর ছাড়িয়া ইংরেজি শব্দও

সে পড়িতে শিখে। তাই কাজে ফাঁক পড়িত। সে ফাঁকি চোখে পড়িল এক সাহেব ফোরম্যানের। আর তাই সে একদিন গাল পাড়িল। দ্বিতীয় দিন দিয়া বসিল বুলকনকে এক লাথি। তাহার পর যাহা হইবার তাহা হইল। বুলকন হয়ত খুনই করিয়া ফেলিত,—অবশ্য খুন করিবার মতলব ছিল না। কিন্তু তাহার কুস্তিগড়া দেহ, হাত, থাবা বক্সিং-করা সাহেববাচ্চাকে এমন করিয়া ঘায়েল করিল যে, ভূলুন্ঠিত সেই সাহেব পুঙ্গবের যে নাক ও মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছে, তাহা বুলকনের খেয়ালই হয় নাই। সময়টা তখন খারাপ। বাঙালী বাবুরা সাহেবদিগকে গুলি করিয়া মারে। তাই ছাপাখানার ফটকে তখন মোতায়েন থাকিত পাঠান পাহারা। নিশ্চয়ই সেদিন সে গুলি চালাইত, কেবল হুকুম পায় নাই। আর কাণ্ডটা নিজের সামনেই ঘটিতে সে দেখিয়াছিল; তাই সে মোটের উপর হৃষ্টচিত্তে সমস্ত ঘটনাটা দেখিল। অন্যেরা যখন বুলকনকে ছাড়াইয়া দিল তখন পাঠান দরওয়ান ফিরিয়া গিয়া ফটকে নিজের আসনে বসিল। বুলকন তখন ছাপাখানার বাহিরে চলিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই জানিতে পারিল—সাহেবরা তাহাকে ধরিবার হুকুম দিয়াছে, তাহার মত ভয়ংকর আততায়ীকে ধরিবার জন্য থানায়ও সংবাদ প্রেরণ করিয়াছে। এবার বুলকন গৃহে ফিরিল।

আজমগড়ের গাঁও। মাত্র সাত-আট মাস রহিল ঘরে। বিবাহও করিল ইতিমধ্যে। ঠিক হইল কাজ করিবে নিকটের শহরে। কী কাজ, সে না জানে? লোহারের, মুটের, মোটরের ক্লিনারের, ছাপাখানার ছোটখাটো কল চালাইবার কাজ, আরও কত কী সে এই পাঁচ বছরে না করিয়াছে! বহু, বহু। মোটর বাস তখন ইউ. পির পথে পথে শহরে গ্রামে ছুটিতে আরম্ভ করিযাছে। বুলকনেরও মোটরের কাজ মিলিল এক বাসওয়ালার বাসের আড্ডায়। কিন্তু সেখানে কাজে মন বসিল না; ওই শহরে তাহার মন টিকিল না। হাঁ, কাজই যদি করতে হয় তবে কলিকাতায়। বুলকন কলিকাতায় ফিরিল।

আজমগড়েরই আখড়ায় পরিচয় হইয়াছিল হরনন্দন সিংএর সঙ্গে; কলিকাতায় ট্রামে সে কাজ করে। হরনন্দনের সাহায্যে বুলকন প্রবেশ করিল ট্রামের কন্‌ডাক্টারের কাজে। বুলকন লেখাপড়া জানে, কিন্তু কিছু ঘুষ তবু তাকে দিতে হইয়াছিল। সেইসব হরনন্দন ব্যবস্থা করে; বুলকন পরে শোধ করিয়াছে। ফিরিঙ্গি সাহেব দেখিয়াছিল তাহার জোয়ান চেহারা, চওড়া সিনা, লম্বা দেহ, শক্ত হাত, সবল পেশী, মোটা মোটা হাড়;—চোয়ালের হাড়ে মুখের পেশীতে, সমস্ত মুখের গড়নে, একটা সুস্থ শক্তিমান মানুষ। হয়ত বুদ্ধি তত তীক্ষ্ণ নয়, কিন্তু স্বাস্থ্য-সুন্দর দেহে যে একটা তেজ ও মর্যাদাবোধের চিহ্ন আছে, তাহাতে ব্যক্তিত্বের একটা আভাস ফোটে নাই কি?... অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই অমিতও তাই যখন সে প্রথম দেখিয়াছিল বুলকনকে। সেদিনকার আরও কত পরিচিত মুখ স্মৃতির পট হইতে মুছিয়া গিয়াছে। তাহাদের কাহারও মুখে শান্ত শ্রী ছিল, কাহারও মুখে ছিল বুদ্ধির ঐশ্বর্য, কাহারও সাধারণ মানুষের সহজ সাধারণ মুখ—যাহার অন্তরালে থাকে কোনো না কোনো অসাধারণত্বের

প্রচ্ছন্ন স্বাক্ষর,—কোথায় তাহারা চলিয়া গেল? অমিতের মনে বুলকন স্থান করিয়া রহিল কিরূপে?...

ইউনিয়নের আন্দোলনের মধ্য দিয়া সে দিনের পর দিন শ্রমিক আন্দোলনের উৎসাহী উদ্যমশীল কর্মী হইয়া উঠিল, শুধু এই বলিয়া কি? অনেকাংশে তাহা সত্য; নিশ্চয়ই সত্য। না হইলে আরও কত কত মানুষের মত চোখের অদর্শনে বুলকনও মনের অচেনা হইয়া উঠিত, জীবনযাত্রার সাধারণ নিয়মে অমিতের স্মৃতির পরিধি ছাড়িয়া বিস্মৃতির দিগন্তজোড়া শূন্যে গিয়া পড়িত বুলকন। কিন্তু তাহা হয় নাই।

বুলকন পূর্বাপর আপনার কার্যবলে অমিতের মনের আশা-ঔৎসুক্যের ক্ষেত্রে ক্ষণে ক্ষণে আপনার অস্তিত্ব জানাইয়া দিয়া গিয়াছে। কত হরতালে, কত আন্দোলনে, কত মিছিলে, ট্রাম-ইউনিয়নের কত উদ্যম আয়োজনে বুলকন স্বাভাবিকভাবেই আগাইয়া আসিয়াছে। আর অমিতের কেন, এমন বহু দিকের বহু সুহৃদের নিকট পরিচিত-নামা, পরিচিত-কর্মা বন্ধু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তবু অমিতের মনে পড়ে বুলকনকে প্রথম যখন সে দেখে সেই বৎসর দশেক পূর্বে—তখনো স্বল্পভাষী বুলকন তাহার মনে একটা না একটা দাগ করিয়াছিল...ট্রামের উর্দি পরিধানে, দীর্ঘ ঋজু, দৃঢ় গঠিত দেহ; মুখে চোখে কপালে একটা স্বাস্থ্য-মার্জিত তেজ; আর চোয়ালে চিবুকে একটা শক্তি,—দৃঢ় প্রতিজ্ঞার আভাস। এ মানুষ বুদ্ধিমান্ না হউক চরিত্রবান্।..হাঁ, চরিত্রবান্।—কী সেই চরিত্র? না, তাহা জানি না। বুলকনস্ত্রী-মদ্য-মাংস-তৈল-অলাবু সম্পর্কে এদেশীয় বিধি-নিষেধ মানিয়া কতটা সচ্চরিত্রতার আদর্শ রক্ষা করে জানি না। কিন্তু স্ত্রী-মদ্য-মাংস-অলাবু প্রভৃতি ওই মহামূল্যবান্ উপাদানগুলি সব সমমূল্যের নয়। মানুষের চরিত্র-গঠনেও স্ত্রী-মদ্য-মাংসের সম্পর্ক বড় কথা নয়—নিশ্চয়ই প্রধান কথাও নয়। প্রধান কথা কি তবে অমিত? সুস্থ জীবন-বোধ আর সুস্থ জীবন-যাত্রা? অথবা, প্রথম সুস্থ জীবন-যাত্রা আর তারপর সুস্থ জীবনবোধ—এ দেশের সমস্ত জীবন-দর্শনে কার্যত যাহা স্বীকৃত হয় নি। যাই হোক, স্ত্রী-মদ্য-মাংস-অলাবুর ভোগ দিয়া নয়, ত্যাগ দিয়াও নয়, অন্তত ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কিছুতেই নয় সচ্চরিত্রতা।...

সেদিন অমিত এত কথা ভাবিবার হেতু দেখে নাই। দেখিয়াছে কত জনের মত বুলকনকে এক ধর ট্রাম শ্রমিকের মধ্যে একজন ট্রাম শ্রমিক। কিন্তু দেখিয়া মনে হইয়াছে, ইহার মধ্যে সম্ভাবনা আছে।...এমন কত জনকে দেখিয়াই অমিত ভুল করিয়াছে। কর্মক্ষেত্রের বিচারে তাহারা টিঁকে নাই—জীবন সকলকে ঝাড়াই-বাছাই করিয়া লয়—লইয়াছে যেমন ইন্দ্রাণীকে, অমিতকে। কিন্তু শ্রমিকের শ্রেণী-সংগ্রাম আরও কঠিন পরীক্ষা-ক্ষেত্র;—আরও কঠিন তাহার ঝাড়াই-বাছাই। কত জন কত দীর্ঘদিন টিঁকিয়াও আর শেষ পর্যন্ত টিঁকে নাই। কিংবা টিঁকিবে না। কারণ, চরিত্র যত দৃঢ় যত সুগঠিত হোক, তাহাও পরিবর্তনীয়। কী তাহার ফুটিবে, কী তাহার ঝরিবে, কী তাহার থাকিবে চিরকালের মত, কেহ তাহা বলিতে পারে কি?

কিছুটা হয়ত বুঝিতে পারা যায়,—কিন্তু সে আভাসও মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে জীবনের বিচারে,—অথবা নিজের আলস্যে, আর নিজের চাতুর্য-বিলাসে, আত্ম-প্রতারণায়। কিন্তু তবু বোঝা যায় না কি একেবারে কিছু? যায়; বোঝা যায় যাহা তাহা সেই 'সম্ভাবনা'।...কী 'সম্ভাবনা' তোমার আছে অমিত?...

অমিত সেই সম্ভাবনাই দেখিয়াছিল বুলকনের মধ্যে—উহার বেশি কিছু নয়। সে সম্ভাবনা ফুটিতেও পারিত, ঝরিয়া যাইতেও পারিত। কিন্তু ঝরিয়া গেল না। যুদ্ধের প্রথম পর্বেই ট্রাম শ্রমিকেরা হঠাৎ একটা ধর্মঘট নামিয়া পড়িল। জয় তাহাদের স্বীকৃত হইল—এই প্রথম জয় তাহাদের ইতিহাসে। তারপর, সপ্তাহ খানেক পরেই আসিল দ্বিতীয় ধর্মঘট।—dizzy with success. প্রথম জয়ের নেশায় মাথা উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল কি? নিশ্চয়ই হইয়াছিল কতকটা। ইউনিয়নকে ভাঙিবার সুযোগে সেদিন 'ফুট' খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল কত রকমের লোক, কত রকমের 'দালাল' নেতা।

বুলকন এই লড়াইতেও নামিয়াছিল উৎসাহে। হাঁ, ইয়াকুব কি অবধপ্রসাদের মত তাহার দ্বিধা ছিল না একটুও। না হয় না হইয়াছে বিজয়ের ফলসংগ্রহ, না হইয়াছে ইউনিয়নের শক্তি সংহত; তবু লড়াই করিতে ভয় কি? কিন্তু ভয়টা সে ক্রমে বুঝিল 'দালালদের', কাণ্ড দেখিয়া। ইউনিয়নকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা প্রত্যেকেই সাধারণ মজুরকে নিজ নিজ কাণ্ডজে ইউনিয়নের মধ্যে টানিয়া আনিতে চাহিতেছে, মালিকদের গোপনে-গোপনে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তাহারা ট্রাম ইউনিয়নকে এইভাবে বানচাল করিবে। মালিকেরাও অবশ্য তাই এই 'দালাল নেতাদিগকে' খানিকটা আপস করিবার মত সুবিধা করিয়া দিবে। তারপর মালিকেরই সপক্ষে; মালিকেরই বেনামীতে চলিবে দালালের গড়া সেই নূতন ইউনিয়ন। দেখিয়া শুনিয়া বুলকনের নিকট সাফ্ হইয়া গেল অনেক বড় বড় বাবুর বড় বড় বুলি ও মতলব। সাফ্ হইয়া গেল ধর্মঘটের পরীক্ষায় অনেক পলিটিকস্। বুলকন বুঝিল—পথ সিধা, রাহা এক। দ্বিতীয়বারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ট্রাম মজদুর তাই যখন যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে আবার দোদুল্যমান—তখন বুলকনের মনে আর কোন দ্বিধা নাই। হিট্‌লার তখন ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে মজদুর-কিসানের বিরুদ্ধে—অবধপ্রসাদ অনেক বিচার করিয়া মানিয়া লইয়াছে, হাঁ, এখন ধর্মঘট নয়, কংগ্রেস নেতারা বলিলেও নয়। কিন্তু মনে-মনে অবধপ্রসাদ গ্লানিবোধ করিয়াছে—স্বাধীনতার একটা সুযোগ হারাইতেছে দেশ—মজদুরদের এই যুদ্ধনীতিতে। হিন্দুস্থানের মজদুর হিন্দুস্থানের আজাদীর মওকা গ্রহণ করিল না। কিন্তু বুলকন তাহা মানে নাই। ধর্মঘটের সপক্ষে সে বরাবর, কিন্তু এখন এই ধর্মঘটের উস্কানি দিতেছে কে? সেই দালাল নেতারা। না, মজদুর-কিসান রাষ্ট্রে যখন ফ্যাশিস্ত দুষমন্ হানা দিয়াছে তামাম মজদুরের তখন লড়াই করিতে হইবে ফ্যাশিস্তদের বিরুদ্ধেই,—লড়াই চালাইতে হইবে সেই মজুর-কিসান রাষ্ট্রের স্বপক্ষে।—

সাফ্ এই বাত—সীধী বাত।

অমিত বুলকনকে দেখিল নূতন চক্ষে। কথা এখনো বলিতে শিখে নাই বুলকন, কিন্তু চলিতে শিখিয়াছে আরও মাথা উঁচু করিয়া, আর চলে স্থির পদে। ইউনিয়ন আপিসে যাহা-যাহা বলে, বলে আরও দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে। ঝাপসা নয় তাহার নিকট কোনো কথা—ধর্মঘট না হউক, লড়াই ত করিতেই হইবে ব্রিটিশ শাহান্‌শাহীর বিরুদ্ধে। "ছিন্" লইতে হইবে 'জাতীয় সরকার।'—কংগ্রেস না পারে, মজুরেরাই তাহা করিবে।

বোমা-বাজির ও আকালের দিন আসিল তারপর। একটার পর একটা প্রয়াসের মধ্য দিয়া সংগ্রামের চেতনা ও শ্রেণী-চেতনার ধার যেন কমিয়া আসিতেছিল ..কাজের মধ্যেও যেন তখন কাজ পায় নাই বুলকন। শ্রমিকেরা গানে, বৈঠকে জমে। না বুলকনের ইহা পছন্দ নয়। কারখানার বাহিরে খুনাখুনি হিন্দু-মুসলমানে—বিশ্রী এসব।

তারপর যুদ্ধ থামিল। সঙ্গে সঙ্গে বাধিয়া গেল বড় হরতাল। এক মুহূর্তে বুলকনের শুষ্কপ্রায় তেজ যেন জীইয়া উঠিল। তখন খোঁজ রাখে নাই অমিত তাহার, রাখা হয়ত সহজসাধ্যও হইত না। ঝড়ের মত তখন পাড়া হইতে পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায় বুলকনরা—অমিত দেখে ট্রাম-শূন্য পথ, এসপ্লানেডের ফাঁকা কেন্দ্র যেন খাঁ খাঁ করে। মরিচা পড়িতে শুরু করিল দেড় মাসে ট্রামের ঝকঝকে লাইনের উপর। তারপর বিজয়ী ট্রাম মজদুর বিজয় গৌরবে বাহির করে ট্রাম কলিকাতার পথে। যুদ্ধান্তের বিপ্লবী দিনের উদ্বোধন করিয়া দিল যেন ট্রামের মজদুর—বিপ্লবী আলোড়ন যখন পর্যন্ত আসিয়া লাগে নাই এদেশের আর-কোনো প্রতিষ্ঠানের চেতনায়। তারপর? ধর্মতলার হত্যা, রশিদ আলি দিনের বিদ্রোহী-অভিযান, উনত্রিশে জুলাই'র শ্রমিক মহোৎসব—'বাহাদুর ট্রামকা মজদুর।' কলিকাতায় কেন, সারা ভারতবর্ষে তাহারা আপনাদের এই প্রশংসাধ্বনি শুনিয়াছে—'বাহাদুর ট্রামকা মজদুর'। ছেচল্লিশের আগস্টের হিন্দু-মুসলমান হত্যায় আত্মহত্যা করিল না তাহারা, কলিকাতার মজদুর শ্রেণী; মরিল না তাহারা দেশ-বিভাগের ঝড়েও। মরিতে বসিয়াছিল বরং পরে নিজেদের দ্বিধায় সংকোচে,—'দালালদের' সেই প্রথম দিন হইতে নির্মমভাবে ধ্বংস না করিয়া। ইউনিয়নের 'গল্‌তি' হইয়াছে সেখানে—কংগ্রেস আর সোশ্যালিস্টদের দালাল ও গুণ্ডাদের প্রথমাবধিই কেন দূর করে নাই ট্রাম-এলেকা হইতে? তাহা করে নাই অবশ্য হেড আপিসের বাবু-মেম্বর আর ট্রাফিকের বিহারী-হিন্দুস্থানী-মেম্বরদের জন্য। উহারা বাবু জয়প্রকাশ বা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নাম জপিয়া উদ্ধার পাইতে চায়। কিন্তু এই 'বাবুদের' ভয়ে মজদুর ইউনিয়নও হাত গুটাইয়া থাকিল কেন? 'হিন্দুস্থানী-বাঙালী', ও-সওয়াল তুলিলেই হইল? লীগও তো তুলিত মজহবের সওয়াল? তেমনি এভি বিলকুল ঝুটা—এই 'প্রান্তিক সওয়াল'—'হিন্দুস্থানী-বাঙ্গালী'।

কাঁহে কি,—বুলকন আপনার ভাষায় বলিতে থাকিত,—মজদুর কী কোই মুলুক,—নেহি হ্যায়—বিনা এক মুলুক, হামারা সোভিয়েট-দেশ। 'আর যাঁহা মেরা

কাম বঁহা মেরা ধাম।' হাম বাঙ্গাল কা মজদুর হ্যাঁয়—ইউ-পি'কা কিসান, ইয়া লোহার নেহি হ্যাঁয়। হামি বাংগালী আছি।—মনে পড়িতেই আপনার বাঙ্গালীত্বের দাবি বুলকন নিজস্ব বাঙলায় তৎক্ষণাৎ পেশ করিতে লাগিল।—হামি বাঙ্গালী আছি —বাঙলা বুলি বলি, বাঙলায় কাজ করি—

হাসিয়া উঠিত কমরেডরা অমনি বুলকনের কথায়। বুলকনও হাসিত, বুঝিতে পারে অনেকখানি সদিচ্ছা রহিয়াছে অন্যদের হাসিতে। বলিষ্ঠ মুখের দৃঢ় পেশীতে তাই একটি স্নিগ্ধ আভা দেখা দিত—চোখে আসিত একটি শিশুর সলজ্জতা।

বাঙালীর বাবুরা বলিত, কমরেড বুলকন, কেয়া, ঘরমে বলোগে ই বাত?

বেসক্।—পরক্ষণেই বুলকন বাঙলায় জানায়,—বলেছি, হামি ঠিক বলেছি—হামি বঙ্গাল দেশে থাকি, বঙ্গাল ভাষা বলি, বঙ্গাল পার্টি'র মেম্বর,—হামি বঙ্গালী নহি তো কি?

এবার হাসিতে হাসিতে বন্ধুরা বলে, কিন্তু ঘরের লোকেরা কি জবাব দেয় বুলকন?—তোমার বাঙলা ভাষা শুনে।

লজ্জিত শিশুর হাসি পরিণত হয় যুবকের লজ্জায়, আর সকল দেহে জাগে কোমলতা। ঘরের লোকের কথা বলিতে এখনো লজ্জিত বোধ করে বুলকন। হাসিয়াই বলে, হামার ছোটভাই বলে: 'হামরা ভি আউধের আদমি, আবধি বলি, হিন্দুস্থানী পড়ি, হামরা তাই ইউ. পি'র হিন্দুস্থানী আছি।

হাসিয়া উঠে সকলে। কিন্তু উহারা হাসিলেও উপহাস মনে করে না বুলকন। বলে, সাচ্চী বাৎ।—ঠিক কথা। ওরা ক্ষেতি করে, গ্রামে থাকে, আজমগড়ের কৃষক লড়াইতে সামিল হয় ওরা; ওরা হিন্দুস্থানী ছাড়া কি হইবে?

যাহারা কিসান তাহাদের ঘর আছে, দেশ আছে; যাহারা মজদুর তাহাদের ঘর নাই, দেশ নাই—বুলকনের এই সহজ যুক্তি। অতএব বুলকন বাঙলার মানুষ; আর তাহার বাড়ির লোকেরা ইউ. পি'র হিন্দুস্থানী। বুলকন যদি দেশে ফিরিয়া যায়?—যাইবে কি? না, সে যাইবে না। সে এখানকার মজদুর আন্দোলনের মধ্যে আপনাকে চিনিয়াছে, সে ঘরে ফিরিয়া গিয়া কিসানী করিতে পারিবে না—তাহার ভাইয়ের মত; লোহারের কাজও করিতে পারিবে না—আত্মীয় কুটুম্বদের মত। তবু যদি কোনোদিন ফিরিতে হয় ইউ.পি'তে, ফিরিবে।—মজুরের দেশ নাই। সেখানকার মজদুর আন্দোলনে যোগদান করিবে, কানপুর মজদুর আন্দোলনে গিয়া জুটিবে—ইউসুফ যেখানে নেতা, মজদুর পার্টি'র কাজে লাগিবে, লড়াই চালাইবে, বস্, মজদুর আপনা লড়াই হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না।

অতি অল্প হইলেও অমিত শুনিয়াছে বুলকনের এইসব কথা। শুনিয়া হাসিয়াছে, আনন্দ জানাইয়াছে, আবার ভুলিয়াও গিয়াছে। ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত, বাংলা বিভক্ত —অমিতের সেই ব্যথা কি বুলকনরা বুঝিবে? একটা কথাই শুধু বুলকন জানে—মজদুর লড়াই না করিলে মজদুর থাকে না; মজদুর মজদুর ছাড়া আর কিছু নয়, আর কিছু পরিচয় তাহার নাই।

সেক্সনের সংগঠক হিসাবে বুলকন কাল রাত্রিতে ট্রাম-শ্রমিকের মেস্ হইতে খাইয়া আসিয়া ঘুমাইতেছিল পার্টির এই দক্ষিণ পাড়ার আপিসে—আপিস থাকে তাহার জিম্মায়। রাত্রি শেষ না হইতেই দুয়ারে ধাক্কা পড়িল। দুয়ার খুলিয়া বুলকন দেখে পুলিস। তখন বুঝিতেই পারে নাই কি ব্যাপার। এখানে আসিয়া ক্রমশ বুঝিল—বড় রকমেরই একটা হামলা চালাইতেছে মালিকী সরকার। দেখিয়া কিন্তু সে আশ্বস্ত হইয়াছে—ট্রাম-শ্রমিক আর কেহই গ্রেপ্তার হয় নাই। পূর্বেই কি করিয়া তাহারা বুঝিয়াছিল, রাত্রিতে একটা বড় রকমের পুলিস আক্রমণের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাই উল্লেখযোগ্য যাহারা সকলকেই তাহারা জানাইয়া দিয়াছে, তাহারা কেহ ধরা পড়ে নাই। শুনিয়া বুলকন উৎসাহিত হইয়াছে—'বাহাদুর ট্রামের মজদুর'। এবারও ঠকাইতে পারে নাই শত্রুরা তাহাদের।

তাহার পর বুলকনের মনে আপসোস জাগিতেছে—সে কেন পালাইতে পারিল না। এক সে, ট্রামের একটিমাত্র মজদুর, না জানিয়া ধরা পড়িয়া গেল। না হইলে ট্রামের মান আরও কত বাড়িয়া যাইত। মোতাহেরের নিকট বসিয়া বসিয়া নিজের লজ্জায় অনুশোচনা জানাইয়াছে প্রথম তাই বুলকন। শুধু একজন লোকের জন্য ট্রামের বাহাদুর শ্রমিকেরা বলিতে পারিল না তাহারা সকলেই শত্রুকে ফাঁকি দিয়াছে। মাস্টার সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছে—ট্রাম-শ্রমিকের মধ্যে কে-কে এখন ভালো কাজ করিতে পারিবে। মোতাহেরের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছে কি করিয়া তাহাদের ট্রাম ইউনিয়নকে জীয়াইয়া রাখা যায়—সব যখন বে-আইনী হইতেছে তখন কিছুই ত আর সহজভাবে চলিবে না। কিন্তু মোতাহের ট্রামের প্রসঙ্গ এখন ভাবিতে চাহে না। তাহার ভাবনা—কি হইল আয়রন স্টিলে? কি হইল চটকলের ইউনিয়নের? নানা লোকের সঙ্গে কথা বলিতেছিল মোতাহের। কাহাকেও বুঝাইতেছে—দেখাই যাক না, সত্যই সকলকে ধরিয়া রাখে কিনা। খাবার খাইবার পর ফাঁক পাইয়া সে এখন নিজেও জুটিয়া গিয়াছে এই তাস খেলায়। আর ইংরেজি না-জানা বুলকন তাই বাধ্য হইয়া এখন একা বসিয়া আছে, খেলায় মোতাহের বা সৈয়দ আলীর উৎসাহ দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে, নিজে নিজেই বলিতেছে, 'ই ঠিক নেহি হ্যায়।'

তবে কি করিবে ইহারা?—অমিত তাহার নিকটে আগাইয়া বসে, জিজ্ঞাসা করে। বুলকনও টান হইয়া বসে—কেন করিবার মত কি কাজ নাই? সবাই বলিতেছে পার্টি বে-আইনী করা হইয়াছে, আপিস তালাবন্ধ করিয়াছে; সংবাদপত্র ছাপাখানা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করিবে। দুশমন্ ত আক্রমণ পুরোপুরি আরম্ভ করিয়াছে, আর আমাদেরই করিবার কিছু নাই? স্রেফ্ তাস খেলিব?—

করবার নাই কে বলে? অমিত বলিল, বরং করবার কাজ দশগুণ ছেড়ে শতগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু এখানে বসে এখন আমরা কি করব?

পুছিয়ে,—বলিয়াই বুলকন আবার বাঙলায় শুরু করিল, সে বাঙালার মজদুর যে,—সবাইকে পুছুন।—কে কোথায় ধরা পড়িল, কি ভাবে ধরা পড়িল, কার সঙ্গে

ধরা পড়িল, কি কি ফেলিয়া আসিল বাড়ি। কোথায় কি কাগজপত্র ছিল; পুলিস কি কাগজপত্র পাইল,—মাস্টার সাহেব ছাড়া একজন কমরেডও বুলনককে এইসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে নাই। এইসব তথ্য সংগ্রহ করুক না অমিতরা। অমিত সবাইকে চিনে না। না, চিনে বটে, তবে এখন সে কর্মসূত্রে মজুরদের পরিচিত নয়। বই-এর দোকানের কাজে সে সাধারণত এই তিন বছর লেখকদের সঙ্গেই বেশি পরিচিত হইয়াছে। বেশ, অমিত সকলকে না জানুক, মোতাহের আছে। মোতাহের ট্রেড্ ইউনিয়নের পুরাতন কর্মী,—কাহাকে সে না চিনে? কিন্তু সে দিকে তাহাদের কোন লক্ষ্য নাই? কেহ সিগারেট পিতেছে, কেহ পান খাওয়াইতেছে। কিন্তু এইটা কি পান সিগারেট খাইবার জায়গা, না, এই তাহার সময়? সৈয়দ আলী সাহেব পুরাতন লোক, তিনি না হয় গল্প করিলেন। কিন্তু গল্প করিলে পুরানো দিনের গল্প করুন,—বাউরিয়া চট্‌কলের পুরানো ধর্মঘটের কথা, লিলুয়ার ছাব্বিশ সালের ধর্মঘটের কথা। বিনোদ দাদা আসিয়াছেন, মথুরা দাদা আসিয়াছেন,—পুরানা ক্রান্তিকারী আদমী তাহারা; কত জেল, কত কালাপানি পার হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে কি ভাবে জেলে থাকিতে হইবে, সেখানে লড়িতে হইবে, সেইসব কথাই বুঝিয়া লউক এবেলা সকলে। ইহার পরে কোন্‌খানে চালান দিবে—তখন কি আর কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার মত লোক পাইবে বুলকনরা?

অমিত বলিল, তা পাবেন, কমরেড্ বুলকন। আপাতত হয়ত সকলকে লালবাজারের হাজতে কিংবা আলিপুরের জেলে পাঠাবে।

ক্যায়সে জানতা হ্যাঁয়?

অনুমান করিয়া বলিতেছে অমিত। কর্মচারীরা বলিল—এখনো ঠিক হয় নাই কিছু। কর্তারা ক্যাবিনেট মিটিং করিয়া ভাবিতেছে। ভাবিবে আর কি? তাহাদের বে-আইনী করিবার সিদ্ধান্ত যখন করিয়াছে ও গ্রেফতারের তালিকা যখন প্রস্তুত হইয়াছে, তখনি নিশ্চয় এসব কথা আগেই ভাবিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তখন হয়ত ভাবিয়া রাখে নাই যে, তালিকার লোক অনেকেই যদি জাল হইতে ফস্‌কাইয়া যায় আর জালে ঠেকিয়া ওঠে চুনাপুঁটি, তোমার আমার মত অপ্রত্যাশিত শামুক-গুগ্‌লি, তাহা হইলে তাঁহাদের কি ব্যবস্থা করিবে। রুই-কাতলার জন্য যে ব্যবস্থা ছিল, চুনাপুঁটিকেও কি সেই ব্যবস্থার গৌরব দান করা উচিত? প্রশ্নটা জটিল ক্যাবিনেটে সপারিষদ হিজ একসেলেন্‌সি শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর পক্ষে দিন পনের লাগিবে বৈকি এই গভীর কথা ভাবিতে। ততদিন লালবাজার হাজতে, নয়, আলিপুর জেলে থাকুক সকলে। এই সহজ ব্যবস্থা ভাবিতেও সেক্রেটারিয়েটের ও ক্যাবিনেটের কম সময় লাগিবার কথা নয়। অন্তত, একটা পুরা 'লাঞ্চ' উদরস্থ না করিতে মাথা ঠাণ্ডা হইবে না ক্যাবিনেটের কর্তাদের ও পুলিস-রাজের।

আউর হামরা লিয়ে ইধার পানি ভি নেহি মিলেগা?—রুদ্ধকণ্ঠে কহিল বুলকন। আমাদের জন্য এক গ্লাস জলও হবে না।

অমিত জানিত, তাই বলিল, কাল হোলি গিয়েছে। ওদের আপিস আজও বন্ধ। তাই কিছু নেই, না হলে এখানে একটা 'টিফিন' ঘর আছে কর্মচারীদের সেখানে চা ও জল পাওয়া যেত।

ছুটি আছে ত সে হামার কি? গিরিফতার করবার সময় ত ছুটি থাকে না। কেবল হামার রুটি-পানির বেলা ছুটি থাকে।—রীতিমত এইবার চটিয়াছে বুলকন।

এই বুলকনকে অমিত দেখিয়াছে,—অবশ্য অল্পই দেখিয়াছে। ভোটের দিনে যখন কংগ্রেসের লাঠি ও ডাণ্ডার প্রহারে কমরেড্রা আহত হইয়া ফিরিতেছিল, বুলকন তখন অধৈর্য হইয়া উঠিতেছিল—গুণ্ডাশাহীর সঙ্গে ডাণ্ডা লইয়া মোকাবিলা না করিলে তাহারা শুনিবে কেন? কিন্তু 'মোকাবিলাব' অনুমোদন সে তবু পায় নাই। তখন আপিসের বারান্দায় বাহির হইয়া গিয়া সে ক্ষুব্ধ নিম্নস্বরে বার বার বলিয়াছে—'বাহা রে হুকুম। জিতনী অহিংসা উহী হামাবা হাসিল করনা;—আর জিতনী গুণ্ডাবাজি উ মালিককা জাহির কর না।' চোখে তাহার আগুনের ছটা; মাংসপেশী ক্রোধে ঘৃণায় কুঞ্চিত; রাগে গরগর করিতেছে। সে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, কিন্তু সংযম হারাইয়া ফেলিবার মত আত্মবিস্মৃতিও তাহার নাই। ঘরের এক কোণে বসিয়া তখনো অমিত হাসিতে চেষ্টা করিতেছিল—এই অসঙ্গতিই বুঝি জীবনের কৌতুক।

অমিত বুলকনকে খানিকটা ঠাণ্ডা করিবার জন্যই হাসিয়া একবার বলিতে গেল, তবু ত' রুটি-পানি এখন মিলিয়াছে, কমরেড্। সেদিনে ক্রান্তিবাদীদের এই এলিসিয়াম রোডে রুটি-পানি ত দূরের কথা, মিলিত অশ্রাব্য গালাগালি, ঘুসি, লাথি, ব্যাটারি শক্।—

বুলকন আরও ক্রুদ্ধ হইল, তা এখনো সইতে হবে? মজদুর শ্রেণীরও কি এই 'খেয়াল'? এই রায়?

অমিত বুঝিল আব হাসিয়া উড়াইবার পথ নাই। তাই যথাসম্ভব স্থিরভাবে অমিত বলিল, তা নয়, কমরেড্। বিশ সাল পরে আমরা এসেছি। জনতার শক্তি আজ অনেক বেশি। সাধ্য কি তা করে। তবে আপনারা শুনতে চাইছিলেন পুরানো দিনের অবস্থা, তাই একটা কথা বললাম।

বুলকন শান্ত হইল।—ঠিক বাৎ! কমরেড আমি'দাদা। আ'বাব ঐসা হোবে, কংগ্রেস রাজ ঐসাই কোরবে—যদি হামরা এখন থেকে বাধা না দিই, লড়াই না করি। দেখোনা, হল্লা করাতে খাবার আনলে। কিন্তু আমরা চুপ করলে চার চারটে পুরি আর ওই ঐসা রসগোল্লা দিয়ে পালিয়ে গেল। আর তারপর কিনা, হামরা বহিন ভী ওই রাস্তায় কল থেকে পানি পিয়ে আসবেন—ইজ্জত থাকবে এইসা চললে?

ঐ নাম করে মেয়েরা একটু ঘরের বাইরে বেরুতে চাইল—রাস্তা দেখল, ওদের ভালোই লাগল।

সে মানুছি হামি, কিন্তু গেলাস মিলবে না, পিয়ালা মিলবে না,—কাঁহে?

তালাবন্ধ রয়েছে যে ঘরে।

তবে তোড়ো তালা। বাহার করো কপাট ভেঙে গেলাস পেয়ালা—আবার সজোরে বলিল বুলকন।

অমিত একটু নীরব রহিল। পরিষ্কার বুলকন-এর সমাধান। তালা যদি বন্ধ থাকে ভাঙো তালা ; কিন্তু গেলাস চাই, জল খাইতে হইবে। মজদুরের স্পষ্ট, স্বচ্ছ, সরল সমাধান। অথচ এক মিনিট আগেও কথাটা অমিতের মনে আসে নাই। সে ভাবিতেও পারে নাই। এখনো সম্পূর্ণ ভাবিতে পারিতেছে না। ইহাই কি ঠিক সমাধান সেই সামান্য সমস্যাটার, না, ইহা হঠকারিতা?

অমিতের দ্বিধা বুলকন বুঝিল। মুখের হাসিতে তাহা গোপন করা যায় নাই, হয়ত সকৌতুক সম্মতিতেও তাহা গোপন করা চলিত না বুলকনের নিকট। কারণ কথা ও হাসির পিছনে মন ও মত দেখিবার মত দৃষ্টি বুলকন পাইয়াছে তাহার মজদুর জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে, এইসব রাজনৈতিক আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে। নিশ্চয়ই 'অমি' দাদার কাছে তাহার কথাটা ঠিক মনে হয় নাই—তিনি তাই হাল্‌কা করিতে চাহিবেন কথাটাকে।

বুলকন শান্ত স্বরে তাই জিজ্ঞাসা করিল : কেয়া, ভুল বাত হে'লো?

অমিত সামলাইয়া লইতেছিল নিজের বুদ্ধি। ভুল বাত নয়, কমরেড বুলকন। গেলাস, জল, সব চাই, চুপ করে থাকাও উচিত নয়। কিন্তু কথা হল কোথায় কতদূর যাব? এটা থানা,—থানারও বেশি, গোয়েন্দা আপিসের হেডকোয়ার্টার। এখানে আমরা ওদের কবলের মধ্যে। ওদের শক্তি বেশি, আমাদের শক্তি কম ;— একটু থামিল অমিত। বুলকনের দৃষ্টিতে প্রতিবাদের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে। অমিত বুঝিল, বলিল : কি? এ কি ঠিক কথা নয়?

ই ঠিক নেহি হ্যায়,—বলিল বুলকন বেশ দৃঢ়স্বরে। তারপরে বন্ধুর মত অমিতকে বুঝাইতে লাগিল,—কাঁহে কি—হাম ষাট, চৌষট আদমি আছি,—ঠিক। উলোক বেশি আছে ; পাহারা খাড়া হ্যায়,—উস লোগংকো হাত মে বন্দুক হ্যায়—ই বিলকুল ঠিক। তব ভি এক বাত খেয়াল রাখ্‌না। নিজের ভাষায় আরম্ভ করিল বুলকন—পহিলে, দুনিয়াভর আজ মজদুরকী শক্তি জ্যায়দা হ্যায়।—বাঙ্গালমে ভি হাম বঙ্গালকা মজদুর কমজোর নেহি। দোসরা, জিত্‌না জোশ সে হামরা লড়াই করব, উতনী জল্‌দি হামরাভি শক্তি বাড়বে। তিসরা,—জ্বলিয়া উঠিল বুলকনের চোখ ঘৃণায়, অবজ্ঞায়,—কুত্তা হ্যায় ই-লোক—ডাণ্ডা দেখলাও, তবে মানেগা।—আর আখিরী,—বুক চিতায় আপনারই অজ্ঞাতে বুলকন,—হাম কমিউনিস্ট হ্যায়, না? হো থানা, হো জেলখানা,—হো মিটিংকা ময়দান ইয়া হো মালিককা কারখানা,— হাম কমিউনিস্ট খেয়ালসে-হি চলেঙ্গে, ডাট রহেঙ্গে, আউর লড়াই করেঙ্গে।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে অমিত তাকাইয়া রহিল। যুক্তিতে কোথাও অস্পষ্টতা নাই। কিন্তু এই যুক্তি কি জানিত না অমিত? না মানিত না? জানে, মানে। কিন্তু তাই বলিয়া মানিতে পারে কি?—এইখানে এখনি একটা মারামারি শুরু করিয়া

দিতে হইবে? তাহা কি যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত? না, উম্মত্ততা? যা গোড়ার কাজ তাও কি আমরা করিয়া উঠিয়াছি?

কেয়া, ঠিক নেহি হ্যায়?—জিজ্ঞাসা করিল সহাস্যমুখে বুলকন।

অমিত বলিল, বিল্‌কুল ঠিক। কমিউনিস্ট্‌কা লিয়ে হর জায়গা লড়াইকা ময়দান। সহি হ্যায় ই বাৎ।

সহি হ্যায়?—উৎফুল্ল মুখে বলিল বুলকন, তারপর—তব?

তব—হরেক জায়গামে হরেক কিসম কায়দা হ্যায় লড়াইকা। ইভি খেয়াল কীজিয়ে। হজারও গাঁও আর ক্ষেতি ছোড় দিয়া লালফৌজ, পিছু হট্‌ গিয়া—কাঁহে, ক্যায়দাসে স্ট্যালিন-গ্রাদমে খতম করেগা দুশমনকো।

বুলকন এবার খুশি মনে বলিল: ঠিক। লিকিন সবসে পহলে কাম হ্যায়—লড়াইকা খেয়াল। আর ওই খেয়ালসে-হি ফিন্‌ কায়দাকা খেয়াল ঢুঁড়না। দেখিয়ে—দুশমনদের নেহি কিয়া।—আবার বাঙলায় আরম্ভ করিল বুলকন: হামার আগেই হামার উপর হামলা করছে সে। এখন বাগডোর হামার হাতমে নিতে হোবে—দের করা চলবে না। রুক্‌ষা নেহি, পাল্‌টা আক্রমণ চালাতে হবে।—

অমিতের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই, বুলকনের মতে আসল কথা লড়াই,...এই আসল কথাটা সে কোনো দিনই ভোলে নাই। আমরা ভুলিয়াছি, অন্যেরা ভুলিয়াছে। ভুলাইতে চাহিয়াছি বুলকনের মতো মজদুরদের; কিন্তু তাহারা ভুলিতে পারে নাই। ক্ষণে ক্ষণে আপত্তি করিয়াছে। আবার লড়াই-এর কায়দা সম্বন্ধে তাহাদের সুনিশ্চিত জ্ঞান নাই বলিয়া মানিয়া লইয়াছে যখনকার যে কার্যক্রম তাহা। কিন্তু অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে উহার সায় তাহারা পায় নাই। তাই কেহ কেহ মুশড়াইয়া গিয়াছে, কেহ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে, আর কেহ বুলকনের মত সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া এই সত্যেই আসিয়া পৌঁছাইয়াছে,—লড়াই-ই শ্রমিকশ্রেণীর সত্য। সংঘর্ষ, সংগ্রাম আজিকার বিপ্লবের দিনে এই হইল মূল কায়দা, আসল পোলিসি শ্রমিক জীবনের। তারপর স্ট্র্যাটেজি, যুদ্ধের ট্যাকটিক্‌স্‌। অর্থাৎ বিশেষ ক্ষেত্রে চাই বিশেষ কৌশল। কিন্তু আসল অবস্থাটা কি, সেই কথাটা বুলকন তত বুঝিতে চাহে না, সে শিক্ষাও আমরা তাহাদের দিই নাই—কোন্‌ শিক্ষা আমরা দিয়াছি ইহাদের? কোন্‌ শিক্ষা দিয়াছি তাহা হইলে?...

অমিত বলিল: ঠিক তাই কমরেড, কিন্তু প্রথম পরিস্থিতির কথা—হালৎ কি? তারপর জঙ্গ ও ট্যাক্‌টিক্‌সের কথা, অর্থাৎ, কোন জায়গায় আর কোন কৌশল তা ঠিক করা দরকার। ভাবুন—সংগঠনের কথা—এবং পাল্‌টা আক্রমণ কি ভাবে চালানো যাবে; ভেবেছেন?

এবার সন্তুষ্ট হইল বুলকন, শোচিয়ে। উ কমরেড আপনারা ঠিক করবেন। তাই তো হামি বলছি। তা না আপনারা তাস খেলছেন। কি এখন কোরতে হোবে বলুন। আব্‌ভি হরতাল হোনা চাই আজ;—ট্রামমে, রেলমে, পোর্ট ট্রাস্টমে, ডকমে, লোহাকলমে, চট্‌কলমে, হর কারখানামে, অফিসমে, কলেজ-ইস্কুলমে—হরতাল আব্‌ভি

হোনা চাহি। আর ইধর থানা ইয়া জেলখানামে হামরা ভি ঐসব সোর মচানা চাহি। কোথায় কোন কায়দা হবে হামাদের, বিনোদ দাদা, মথুরা দাদা জেলের বাত জানেন; আর মোতাহের ভাই, মাস্টার সাহেব, আপ সব কমরেড একসাথ বসুন।—ঠিক করুন। আচ্ছা, তাস খেলনে দীজিয়ে উন্ লোগ্‌কো। লিকেন ই-খেল কা টাইম নেহি, লড়াইকা টাইম। ই হ্যায় আসলি বাত—

...লা' দাস, লা'দাস তুঝুর্ লা'দাস—'হানো, হানো, হানো বরাবর,'—ফরাসী বিপ্লবের সেই আশ্চর্য মন্ত্র মনে থাকা দরকার, উহা ভুলিবার উপায় নাই, অমিত, তোমাদের। বিপ্লব তোমাদের বিপ্লব-পড়ুয়াদের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে না। সতেরশ' উন'নব্বুই না; আঠারশ' আটচল্লিশও না।—না; আঠারশ' একাত্তরও না—আজ উনিশ শ' আটচল্লিশ। দুনিয়া-ব্যাপী শ্রমিক-বিপ্লবের দিন। নয়া দিল্লীর বা লালদীঘির মালিক মস্তিষ্ক মিছিমিছি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে নাই। কলিকাতার ট্রামের মজদুর '১৩০২ নং'—নাম যাহাদের নম্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে,—সেও তাই ঘোষণা করে—'অডাসিটি, অডাসিটি, অলওয়েজ অডাসিটি।' তবু এখনো কোথায় সেই শ্রমিক-নেতৃত্ব, বিপ্লবী আয়োজন এদেশে? কোথায় বুলকন, কোথায় তোমরা? কয়জন তোমরা আজ সেই সংগ্রামে উদ্যোগী? আর কত লক্ষ লক্ষ তোমাদের দোসর অপেক্ষমাণ ক্ষেতে, দোকানে, স্কুলে। কে চলিবে পুরোভাগে; কে দিবে সকলকে নেতৃত্ব?...

চারিদিকের মুখগুলির দিকে তাকাইয়া অমিত এইবার জিজ্ঞাসা করিল নিজেকে—সে শ্রমিক নেতৃত্বের বনিয়াদ তোমরা রচনা করিতে পারিয়াছ কি, অমিত? বুঝিয়াছ আগামী দিনের আলোক আজিকার দিনের তীরে আসিয়া জানাইয়াছে তাহার উদয়ের বার্তা? সেদিনের সম্ভাবনা কি হইতে চলিয়াছে এদিনের 'সত্য'?...চিনিয়াছ সেই নবজাতককে? তাহা হইলে অভীঃ, অমিত, অভীঃ। তোমার ভাঙা-বাঙলায় জোড়া-দেউল উঠিবে; তোমার বিভক্ত ভারতে জন্মাইবে বহু জাতির মহাভারত। ভারতের শ্রমিক নেতৃত্ব তোমার সামনেই তাহার জন্ম ঘোষণা করিতেছে...ঘোষণা করিতেছে তাহার জীবনের মন্ত্র...লা'দাস লা'দাস তুঝুর্ লা'দাস।

অমিত বলিল: কিন্তু আজ হরতাল করতে পারবে কি এখন কলকাতার মজদুরেরা? জানুয়ারির হরতালেই দেখেছেন ট্রামে কত ভাঙন ধরিয়েছে সোস্যালিস্টরা।

বুলকনের আলোচনা অন্য খাতে চলিল: সেই ত হামি বলেছি। গলতি হয়েছে আমাদের দু'সাল ধরে; উ সাচ্চা 'দেশভক্ত', ই আচ্ছা সোস্যালিস্ট, এসব বলে বলে যত বদমায়েস আর বে-ইমানকে সুবিধা করে দিয়েছি। পহিলা থেকে উদেরকে মার দিয়ে ঠাণ্ডা করলে আজ উ-লোগ্ কি ট্রামে 'ফুট' ধরাতে পারত? হেড্ আফিসের 'বাবুরা' ইউনিয়ন থেকে ভাগ্‌ত। দু'চার মজদুরও ইধর-উধর ঘুরত। কিন্তু ট্রাম মজদুর আপনা দিমাক আর আপনা ইমান সাফ্ রাখতে পারত—লড়াই মে সব ভাই সামিল হোত। হোবে—এখনও হোবে। লিকেন লড়াই চাহি—উ কৌশিশ বরাবর

কোরতে হবে। ট্রামে হরতাল হোবে—আম হরতালের জন্য ভি আওয়াজ উঠাতে হোবে—এ আজাদী ঝুটা হ্যায়।

শ্রমিক নেতাদের এই অকারণ গ্রেপ্তারে কলিকাতার শ্রমিকশ্রেণী সত্যই বিচলিত হইবে কি?..গান্ধীজীর নামে শিশুরাষ্ট্র, শিশুরাষ্ট্র বলিয়া কংগ্রেসের নেতারা মিথ্যার বেসাতি খুলিবেন। পুলিস ও মিলিটারি পাহারা ও টহলদার সাঁজোয়া গাড়ি নিশ্চয়ই কলিকাতার পথঘাট, রাস্তার মোড়, শ্রমিক বস্তি ও কারখানার দুয়ারে লাঠি, টিয়ার গ্যাস ও গুলি লইয়া প্রস্তুত হইতেছে। শাহানশাহীর এই রূপ কি শ্রমিকশ্রেণী ধরিতে পারিবে না? সাধারণ মানুষই কি চিনিতে পারিয়াছে তাহাদের 'জাতীয়তাবাদের' মিথ্যা এই মুখোস? বৃথা আশা বুলকনের।

কাছাকাছি এইরূপ আরও আলোচনা চলিতেছে।...সব সত্য।—অমিত জানে,—সবই ইহা সত্য। কিন্তু আরও সত্য এই যে, ইহা জীবন্ত সত্য নয়, সত্যের কংকাল। সত্য যেমন ছিল না উনিশ শ' বিয়াল্লিশেও ব্রিটিশের গুলি আর বন্দুকের দাপট। সত্য নয় তাই অমিতের এই দ্বিখণ্ডিত বাঙলা, বিভক্ত ভারত। সত্য নয় কংগ্রেসও। হাঁ, সত্য নয় অবশ্য আমাদেরও পুঁথিপড়া মজদুরি ও শৌখিন কিসানী। আমাদের পক্ষে সত্য তবু এই যে আমরা রাত্রির শেষ যামে আসিয়া পৌঁছিতেছি, আর দিনের দূত আসিয়া পৌঁছিয়াছে পৃথিবীর দ্বারে। আসিয়াছে শ্রমিক-নেতৃত্বের অগ্রদূতেরা। বরং সত্য এই বুলকন . ও কানাই হাজরা, রশীদ ও পার্বতী। আর কাহারা? তপন ও শ্যামল, তনু ও মঞ্জু, বিজয় ও দিলীপ, বিত্তহীন এই নিম্নমধ্যবিত্ত আগামী দিনের সত্য।

এখনো সম্ভাবনা; সত্য হইয়া উঠিতে যাহা পারে...

কতক্ষণ তবু এই বাত্রি, কতক্ষণ ওই অন্ধকাব?

একজন গোয়েন্দা কর্মচারীকে দেখিতে পাইয়া মঞ্জু ও ছেলেরা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল—আধ ঘণ্টার কথা বলিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে আনা হইয়াছে, ব্যবহার্য জিনিসপত্র কাপড়-চোপড় সঙ্গে পর্যন্ত গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় নাই। এখন এ কি কাণ্ড? শীঘ্র ব্যবস্থা করুক কাপড়-চোপড় আনাইবার। বেশ ত ফোন করুক, বাড়ির কেহ দিয়া যাইবে।---গোয়েন্দা অফিসার ভয়ে ভদ্রতায় জানাইতেছে, আপনাদের কাগজপত্র তৈরি হচ্ছে। তবে ব্যবহার্য জিনিসের জন্য নাম ঠিকানা আপনারা লিখে দিন---আমি সাহেবকে দিচ্ছি। তিনি ব্যবস্থা করবেন, বলেছেন।

নাম ঠিকানা লেখা চলিতে লাগিল। অবশ্য তাহা বুঝিয়া-সুঝিয়া লেখা উচিত, গোয়েন্দা আপিস এই নাম ঠিকানা লইয়া কাহার কি করিবে কে জানে? আর সত্যই লিখিয়া কিছু লাভ আছে কি?

আপনার এখানে কি আছে, হাজরাদা'?

আপনার কি আছে, কমরেড বুলকন?

ছিল সব, কিন্তু তাহা আপিস ঘরে পুলিশ সীল করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

আপনার লোক কেউ নেই আর?

'আপনার লোক?' সে তো আপ্‌লোগ।

হাসিল অমিত। বলিল : বস্‌! শুধু আমরা? ঘরে কেউ নেই?

ঘর? সে ত পানশ' মিল দূর হ্যায়...

কোথায়? কোন্‌ জিলা? কোন্‌ গ্রাম?

আজমগড়ের গ্রাম কালাইটিকি, শহর হইতে বেশি দূর নয়। হাঁ, বেশি বড় গ্রাম নয়, একেবারে ছোটও নয়।...ইউ-পি'র একখানা অপরিচিত গ্রামের ছবি দেখতে থাকে অমিত।...তারপর জিজ্ঞাসা করে বাড়িতে কে কে আছে? কত টাকা পাঠাইতে হইত এইখান হইতে? এখন কি করিয়া চলিবে বুলকনের পরিবার—স্ত্রীর ও পুত্রকন্যার?

প্রথম একটু কুন্ঠা মিশ্রিত ছিল বুলকনের কথা। তারপরে আসিল একটু চিন্তার ছায়া। তারপর কথা চলিল : কষ্ট হোবে উঁহাদের। ছেলেটাকে পড়াইতেছে বুলকন শহরতলির ইস্কুলে। বরাবর পড়াইবে। মেয়েটি ছোট—তাহাকেও পড়াইবে। পড়াশুনার বয়স হইতেছে তাহারও, কিন্তু তাহাকে শহরে পড়াইতে পাঠানো এখন সম্ভব নয়। উহার মাও ছাড়িতে চাহে না, বুঝিবে না। আইমা আছেন, বুলকনের মা; তিনি আরও শুনিবেন না। পুরানা জমানার লোক তাঁহারা। এই রকমই তাঁহাদের খেয়াল। আজকার দুনিয়ার কিছু তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। বুলকনের ছোট ভাইই বুঝিতে পারে না। একজন লোহারের কাজ করে, আর একজন কিসানী। কিন্তু বুলকন মজদুর। সে জানে জমানা বুঝা চাই, দুনিয়া দেখা চাই। কিন্তু কিছু লেখাপড়া না শিখিলে দুনিয়া আজ সমঝিয়া ওঠা সহজ নয়। বুলকনই তাহা পারে না। হিন্দীতে বাঙলাতে লেনিনের কথার অনুবাদ না হইলে সে-ও কিছুই জানিতে পারে না। তবু ত সে পার্টির মেম্বর, আন্দোলনের মধ্যে আছে, দশজন কমরেডের সঙ্গে সে কথা বলে, তাহাদের কথা শোনে—কত সুবিধা তাহার। কিন্তু কি করিবে তাহার ছেলে? নয় বৎসর তাহার বয়স। কিংবা বুলকনের মেয়ে—পাঁচ বৎসর তাহার বয়স; তাহারা করিবে কি? বুলকন তাহাদের ইস্কুলে পড়াইবে। যতটা পারে তাহারা ততটা শিখিবে। হাঁ, কাজ তাহারাও করিবে; মজুরের ছেলে, মজুরের মেয়ে মজুরের আন্দোলনের কাজ করিবে—ইস্কুলে পড়িলেই বা কি? কিন্তু এখনো তাহারা ইস্কুলে পড়িতেছে না। ছেলেমেয়েকে আনিয়া এখানকার ইস্কুলে পড়িতে না দিলে তাহা সম্ভব হইবে না। এইখানেই বুলকন সেরূপ ব্যবস্থা করিবে, ঠিক করিয়াছিল। স্থির করিয়াছিল দুইমাস পরে ঘরে যাইবে, ঘরের লোকদের কলিকাতায় আনিবে। চেত্‌লা, কি টালিগঞ্জে কমরেডদের বলিতেছে একটা ঘর ঠিক করিতে। ঘর ভাড়া এখন কোথাও পাওয়া যায় না। তবু বুলকনের তাহা পাইতে হইবে। কারণ, ছেলেমেয়েদের পড়াইতে হইবে। বাঙলার মজুরের ছেলেমেয়ে বাঙলায় পড়িবে না, তবে কি ইউ-পি'র গাঁওতে কিসানী করিবে? কিন্তু এখন কি করিবে তাহারা? ছেলে-মেয়ের খরচপত্র কি করিয়া চালাইবে? ঘরে বোয়েল আছে, দুধ দেয়।

ক্ষেতির কাজও করিতে পারিত তাহার স্ত্রী। না করিলে এখন চলিবে না। কিন্তু কাজ সে করিবে কি করিয়া? অসুখেই সে পড়িয়া থাকে। অসুখের চিকিৎসা ঠিক মত করা হয় নাই—গ্রামে বৈদ্য-ওঝায় মিলিয়া গোলমাল পাকাইতেছে। পাথুরি হইতে পারে। কিন্তু বুলকন শহরে আনিয়া চিকিৎসা না করাইতে কিছু স্থির বুঝিতে পারিতেছে না। এখন আর তাহা কবে হইবে কে জানে?...উহার কষ্ট হইবে, খুব ভুগিতেছে গত দুই-তিন মাস যাবৎ।...বোধহয় আর ভালো হইবে না—দেরি হইয়া গেল। হাঁ, এবার মরিয়াও যাইতে পারে...কে জানে কি হইবে?...

মুখের চিন্তার ছায়ার সঙ্গে মমতা-ভরা দরদের সুর লাগিয়াছে গলায়।—দৃঢ় দেহ, সবল তেজীয়ান্ সেই মজদুর সৈনিকের আড়াল হইতে কথা বলিতেছে এই কে? সেই চিরদিনের মানুষ—মমতায় দুর্বল, স্নেহে জীবন্ত, আর জীবন-বৈচিত্র্যে পরমাশ্চর্য সত্য। মানুষ!

অমিত ভাবিতে থাকে—এই মানুষই কি সবার উপরে সত্য? সর্বাপেক্ষা জীবন্ত সত্য? না সকল মানুষের এই পরম বিকাশকেই সম্ভব করিবার জন্য জানাইতেছে এই মজদুর-মানুষ—উগ্র, লড়াকু মজদুর,—'বাহাদুর মজদুর'—তাহার আহ্বান—

লা'দাস! লা'দাস! তুঝুর্ লা'দাস!

—এ শুধু মজুরের কথা নয়—মানুষেরই দাবি—মানুষ সত্য হতে চায়। 'সম্ভাবনা' 'সত্য' হয়ে ওঠে—কিন্তু বিশেষ মুহূর্তের 'সম্ভাবনা', বিপ্লবের মুহূর্তে সম্ভাবনা... সে 'মুহূর্তে' যে অনেক আয়োজনের ফলশ্রুতি...লগ্নের-মহামুহূর্ত—তা কি আসিতেছে? আসিয়াছে সে 'লগ্ন' এ দেশের জীবনে?

ছয়

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন সবিতা দেবী'।

সবিতা দেবী! অমিত কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না। এখানে কি করিয়া আসিবে সবিতা? গোয়েন্দা কর্মচারী ভাবিল অমিত কথাটা বুঝিতে পারে নাই তাই ব্যাখ্যা করিয়া বলিল, বিজয়বাবুর মাসীমা, আপনাদেরও আত্মীয়া। ফোন পেয়ে বিজয়বাবুর জিনিসপত্র পৌঁছে দিতে এসেছিলেন। আপনার সঙ্গেও সাক্ষাতের অনুমতি পেয়েছেন।

খানিকক্ষণ পূর্বে বিজয়ের ডাক পড়িয়াছিল—বাড়ি হইতে তাহার জিনিসপত্র পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছেন তাহার মা। বিজয়ের বন্ধুদের সে বলিয়াছে, মা নয়, মাসী হয়ত। বিজয়ের মা জীবিত নেই। বন্ধুরা বলিয়াছে, খাবার নিয়ে এসেছেন নিশ্চয়। আমাদের জন্য নিয়ে আসিস্। আর আমাদের বাড়িতে খবর দিতে বলিস— জামা-কাপড় চাই।

মঞ্জু বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুয়ার পর্যন্ত চলিল, বলিল, মাসীকে বোলো বাড়ি থেকে আমাদের শাড়ি-ব্লাউজ দিয়ে যেতে।

কে বলিয়াছিল, শুধু শাড়ি-ব্লাউজ মঞ্জু? পাউডার, স্নো, ভ্যানিটি কেস্?

নিশ্চয়ই। আরও দু-চার ঘণ্টা থাকতে হলে ওসব চাই বৈ কি। তোমাদের ছেলেদের না হয় 'গেজাতে' পারলেই হল—স্নান সাবান কিছুই চাই না;—বলিয়া মঞ্জু আবার আসিয়া তাহার পূর্বেকার জায়গাটিতে বসিয়াছে।

বিজয় চলিয়া গিয়াছে। কলরব থামিয়া গিয়াছে। তাহাদের যুবকদের ছোট সেই দলটি আবার নিজেদের কথা লইয়া জমিয়া উঠিয়াছে। কথা অপেক্ষা তাহাতে মঞ্জুর প্রতিবাদ ও দিলীপের তর্কই বেশি। কানাই হাজরার সহিত কথা বলিতে বলিতে অমিত তাহার কথাতেই জমিয়া গিয়াছিল—তাহার অনেকদিনের পরিচিত এই চব্বিশ-পরগনা, উহার মাঠঘাট, গ্রামজলা আর লাট। তখন কয়জন সেখানে কর্মী ছিল? আর আজ সেখানে কানাই হাজরার মত মানুষেরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাহারাও অমিতকে ছাড়িতে চাহে না এখনো---অবশ্য কলকাতায় লেখাপড়া আর প্রকাশনের কাজ অমিতের এখন প্রধান কার্যক্ষেত্র। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে কানাই হাজরারা ছাড়িবে কেন? 'আপনারা হলেন আমাদের গুরু। গুরুমন্ত্র কানে গেল, তবে না উদ্ধারের পথ মিল্‌ল?'

অমিত হাসিতে থাকে।---এখনো 'গুরু', 'গুরুমন্ত্র', ওসব কথা ছাড়লেন না, হাজরা দা'?

ও আমরা চাষীরা বলব। আপনারা বলেন কমরেড লেনিন, কমরেড স্তালিন। আমরাও নিজেদের বলি 'কমরেড'---কিন্তু ওঁরা হলেন মহাগুরু। আমরা ত' ওনাদের মন্ত্র আপনাদের মুখেই পেলাম। আপনারাই কি আমাদের ছাড়তে পারেন---গুরুই কি ছাড়তে পারে শিষ্যদের?

না। সত্যই ছাড়িতে পারে না। অমিত কি সেই হাজরাদের ছাড়িতে পারে?—অনেক দূরে আজ তাহার কর্মক্ষেত্র। পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে এই প্রচার-প্রকাশনের কাজ গ্রহণ করিয়াছে। হয়ত এখনো যোগ দেয় কলিকাতার কোনো মজুর ইউনিয়নের কাজে। কিন্তু আজ অনেক দিন সে হাজরাদা'দের দেশে পদার্পণও করে নাই। এইখানে তাহার পার্শ্বে বসিয়া বসিয়া তথাপি অমিত আজ বুঝিতেছে তাহার জীবনের নানাদিকগামী শিকড় সেই জলা আর বাদা, ভেড়ি আর চাষা-বাদের মধ্যেকার এই মানুষদের জীবনের মধ্য হইতেও অমিতের জন্য প্রাণরস আহরণ করিয়া আনিয়াছে—অমিতের সত্তার মধ্যে আনিয়া দিয়াছে মাটি-জল কাদামাখা বাঙলা দেশের মানুষের প্রাণস্পর্শ, মানুষের কথা। সেই শ্রমজীবিক চেতনা, সে জীবনের অশ্রান্ত শ্রমপরায়ণতা, আর সর্বস্বান্ত, সর্ব-পীড়ন-অত্যাচার জর্জরিত কৃষক-প্রাণের আত্মপরিত্রাণের নবজাত প্রতিজ্ঞা। গুরু কি পারে শিষ্যদের ছাড়িতে—তাহারা যে গুরুরই জীবনের সার্থকতা। অমিতই কি পারে হাজরাদের ভুলিতে? তাহাদেরই মধ্যে যে অমিত আপনাকে সার্থক করিতে চায়। আর

তাহাদের জীবনে জীবন মিশাইয়া—আপনার সীমাবদ্ধ-সত্তার জটিল ঘূর্ণিস্রোত হইতে আপনাকে টানিয়া তুলিয়া—জন-সমুদ্রের জোয়ারে আবার আপনাকে মিলাইয়া দিতে পারিলে বুঝি অনেক জটিলতা ঘুচিয়া যায়।

সীমাবদ্ধ সত্তার মধ্যে তুমি আপন সীমাবদ্ধ স্মৃতি-চেতনা-আবেগে আলোড়িত অমিত;—বুলকনরা, রশীদরা, কানাই হাজরারা তোমাকে বাহির হইবার পথের সংকেত দিতেছে—গণ্ডী ছাড়াইয়া ওঠো...অর্থাৎ পালাও? 'এস্‌কেপ ফ্রম সেলফ্‌'—ছোট আমি হইতে বড় আমিতে।

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন সবিতা দেবী,'—প্রবহমান স্রোতের মধ্য হইতে হঠাৎ যেন অমিতের চেতনা একটা পুরাতন ঘাট আবার ছুঁইল।

অমিত উঠিয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিল 'আপনাদের আত্মীয়া'—সবিতা। কে হয় তাহার সবিতা? 'আত্মীয়া'—এই কথা জানিত কি অমিত? কিন্তু বিজয়ের যে মাসী সবিতা, এই কথাও অমিত জানিত না। অবশ্য জানিবার কথাও নয়। বিজয় কলিকাতা-বাসী নয়। এলাহাবাদ না কোথায় বাহিরে পড়িত। অমিতের সহিত তাহার পরিচয়ও ঘনিষ্ঠ নাই। অমিত শুনিয়াছিল রশীদ আলী দিবসের অভ্যুত্থানের সময়ে ফটো তুলিয়া বেড়াইতেছিল বিজয়। পুলিশের গুলি লাগে তখন বিজয়ের হাতে-পায়ে—কলেজের পড়া তখন শেষ করিয়া সে নাকি বিলাত যাইবার অপেক্ষায় ছিল। তারপর ভাঙিল হাত, পা একখানা গেল, শুধু মানুষটা অটুট স্বাস্থ্যের জোরে টিকিয়া রহিল। সেও ফটো তোলা ছাড়িয়া কবিতা লিখিতে শুরু করিল—তখন সে হাসপাতালে। ছাত্ররাজ্যে তাহার খেলার প্রতিভা ছিল স্বীকৃত। অমিত তাহাকে তাই অল্প দেখিয়াছে—সংবাদপত্রের আপিসে, কোনো শিল্পিসভায় কিংবা সাহিত্যবৈঠকে। লাজুক প্রকৃতির, আত্মপ্রকাশ-কুণ্ঠিত, তবে আত্ম-সচেতন যুবক :—আপনার দৈহিক বিড়ম্বনা যেন উহাকে সচেতন ও সংকুচিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে; অপরিচিত-গোষ্ঠীতে সে থাকে অপ্রকাশিত।

কিন্তু বিজয়ের মাসী নাকি সবিতা? অমিতের সঙ্গেও সে দেখা করিবে? কিন্তু দেখা করিবার মত এখানে ব্যবস্থা করিতে পারিল কিরূপে? ঔৎসুক্য আগ্রহ চিন্তা এক সঙ্গে অমিতের মনে দোলা দিতেছিল। গোয়েন্দা আপিসের সাক্ষাতের একটা ছোট ঘরে পৌঁছিতেই অমিতের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—হ্যাঁ, সবিতা—তাহার পার্শ্বে বসিয়া বিজয়। টেবলের অন্যদিকে আর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক উপবিষ্ট—নিঃসন্দেহ পাহারা-নিযুক্ত গোয়েন্দা কর্মচারী।

সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইল—অমি'দা'কে অভ্যাস মত মর্যাদা দেখাইতে? কিন্তু একি, কাঁদিতেছিল নাকি সবিতা? অন্তত চোখের পাতা এখনো যে কেমন ভারী হইয়া আছে—অমিতের জন্য? পাগল নাকি তুমি, অমিত?...

...যৌবনের প্রান্তে আসিয়া গিয়াছে কি সবিতা?

সুমুখী, সুন্দরী, আদরপালিতা সেই সবিতা যেন ঝরিয়া পড়িয়া যাইতেছে। যাইতেছে কেন, গিয়াছেই বলো না, অমিত! মায়া হয় বলিতে? হয়; না হওয়াই

আশ্চর্য। কাহাকে দেখিতে না মায়া হয় যখন যৌবনের বরমাল্য গলায় শুকাইয়া আসে? দেহের তটে-তটে নামে ভাঁটার টান? আর এতো সবিতা।—সুগৌর দেহেও বুঝি আর ঔজ্জ্বল্য থাকে না। চোখের স্থির জ্যোতির উপর পড়-পড় বেদনার ছায়া। চুলের শ্যাম-গুচ্ছ আসিয়াছে ক্রমে হাল্‌কা হইয়া; আর অধরের কোণে, কপোলের তটে, ললাটের প্রশস্ত ক্ষেত্রে একটি একটি করিয়া কালো রেখা পড়িতেছে। অর্থাৎ চল্লিশ।—চল্লিশ হইবে কি, সবিতা? প্রায় হইবে। না হইলেও তাহার উপকূলে। সেই সুডৌল বাহু, সেই সুন্দর নিখুঁত চিবুক—মিলাইয়া যাইতেছে, না, মিলাইয়া গিয়াছে। কিংবা মিলাইয়া দিয়াছে বলাই ঠিক। সত্যই মিলাইয়া দিয়াছে সবিতা তাহা নিজে।...প্রথম যৌবনের বৈধব্যেই আপনার রূপকে অস্বীকারের নেশা জাগে সবিতার প্রাণে। তখনো আমরা জেলে, তাহা দেখি নাই—কিন্তু বুঝিতে পারি তাহা পরে তাহাকে প্রথম দেখিয়াই। তারপর আপনার সেই আত্ম-সংযমের গভীর সংকল্পকে সবিতা সুদৃঢ় করিয়া তোলে। আহারে-বিহারে, বেশ-ভূষায়—এমনকি, গতিতে, কথায়, রুচিতে,—সকল রকমে হিন্দু বিধবা, শান্তশীলা শুদ্ধসত্ত্বা মেয়ে। ভারতীয় প্রাচীন-সভ্যতার পরিশীলনে সে আরও দৃঢ়চিত্ত, নিয়ম-নিষ্ঠ, আদর্শবাদী মানুষ হইতে চাহিল। না, না, মানুষ হইতে পারিল কই সবিতা? আপনার আদর্শের তাড়নায়, এদেশের হিন্দু ঐতিহ্যের তাগিদে সবিতা মানুষ হইতে পারে নাই,—মানুষ হইতে সে চাহেও নাই।...একেবারেই কি চাহে নাই তাহা?—হাঁ, চাহিয়াছে। চাহিয়াছে। মনুকে ভালোবাসে,—কিন্তু আপনার অগোচরে আর আপনার অনিচ্ছায়...। কিন্তু জানোই ত, সবিতা, 'জীবনেরে কে রোধিতে পারে'?

রোধ করা যখন যায় না, অমিত তখন দেখিয়াছে—সবিতার বহুকুন্ঠিত জীবন যে-কল্পনার মধ্যে দিয়া তখন প্রকাশের পথ করিয়া লইল, তাহাতে সবিতার জীবন আরও জটিল গ্রন্থিতে জড়াইয়া পড়িল। আপনার অগোচরে যে সরল মীমাংসায় আসিয়া সবিতা ঠেকিয়াছিল, তাহাও সবিতা জানিতে চাহিল না। শেষে জানিল যখন, তখন কিছুতেই তাহা মানিতে চাহিল না। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ। একদিন অমিতের সঙ্গে তাহার বিবাহের কথা হইয়াছিল। আরও অনেকখানেই সেইরূপ কথা হইয়াছিল নিশ্চয়। কিন্তু অমিতের কথাটা তথাপি মনে রহিল, যেহেতু অমিত ছিল তাহার পিতা ব্রজেন্দ্র রায়ের স্নেহভাজন বন্ধুপুত্র। আর যেহেতু অমিত ছিল দীর্ঘ কয় বৎসর জেলে বন্দী। তারপর সবিতার অকালবৈধব্যের নিরাশ্রয় দিনে সবিতার কল্পনা ব্রজেন্দ্র রায়ের শুভাকাঙ্ক্ষার সূত্র আশ্রয় করিল,—যেমন করিয়াছিল—কারারুদ্ধ অমিতের কল্পনাও! সবিতার জীবন কিন্তু ততক্ষণে আসলে স্থির সুস্থ সহজ হইতে পারিয়াছে অমিতের ভাই মনুকে আশ্রয় করিয়া, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস জোগাইয়াছে সূত্র। মনু তাহার সতীর্থ বন্ধু তখন। জীবনের ছলনা সবিতার তখন চোখে পড়ে নাই, মনুরও চোখে পড়ে নাই! অমিতের তাহা চোখে পড়িয়া গেল গৃহে ফিরিতে না ফিরিতে এক মুহূর্তেই। আর তারপর সে সত্য

যখন উহাদের সম্মুখে অমিত তুলিয়া ধরিল— এতবড় বিড়ম্বনা বুঝি মানুষের জীবনে আর ঘটে না। সবিতা মরিয়া যায় আপনার মনেই। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ! তাহার মন জুড়িয়া বসিয়াছে অমি'দাও নয়— মনু...মনু...তাহার অপেক্ষাও বয়সে যে মনু দুই-এক বৎসরের ছোট!...অকুন্ঠিত চিত্তে যাহাকে সবিতা আপনার সুহৃদ করিয়া লইয়াছে—আর সেই সূত্রে নাকি আপনার করিয়া ফেলিয়াছে।... না, না, না।

জীবন যত বলিল, 'সবিতা স্বীকার করো, স্বীকার করো',—সবিতা ততই জোরে অস্বীকার করিল। 'না, না, না'।

মনু দূরে চলিয়া গেল। অমিতের বাড়ি হইতে সবিতা আপনাকে দূরে সরাইয়া লইল। কিন্তু ব্রজেন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পরে আবার তাহাদের দেখা হইল। আবার সবিতা বুঝিল—দূর কখনো দুস্তর হইতে পারে না। এই মাস বৎসর কাহাকেও দূর করিতে পারে নাই—মনুকেও না, সবিতাকেও না। সবিতা অমিতের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, আত্মসংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত সে, তবু সে অপরাজিতা। অমি'দা'—পিতার স্নেহভাজন বন্ধু সে,—সে-ই বুঝিবে সবিতার কথা। জীবনে শুধু একটা পথেই মানুষকে সার্থক হইতে হইবে—গৃহ-সংসার লইয়া, একি জবরদস্তি মানুষের? মেয়ে বলিয়া? জীবনের সহস্র পথ। আর কত বিরাট মানুষের জীবন, কত মহৎ সাধনা মানুষের। অমিতই ত এই মর্মের কথা ব্রজেন্দ্র রায়ের কাছে বলিত। সেই মহতের সাধনা সবিতা গ্রহণ করিবে—তাহাই ত ভারতবর্ষের সাধনা; তাহার পিতার চিরদিনকার বিশ্বাস, আর সবিতার আপন নিয়তির ইঙ্গিত।

অমিত বলিয়াছিল, মহতের সাধনা কোথায়? তুমি যা চাও, তাকে বরং মহাত্মাজীর আরাধনা বলো, সবিতা।

সবিতা বলিল, হাঁ, তা'ই। মহতের সাধক বলেই ত তিনি মহাত্মাজী।

অমিত বুঝিল সবিতা সত্যকে গ্রহণ করিতে চাহে না; কল্পনাই তাহার প্রয়োজন। একটা কল্পনা যদি ভাঙিয়া গিয়া থাকে সে বরং গ্রহণ করিবে অন্য একটা কল্পনা। —তবু গ্রহণ করিতে পারিবে না বাস্তব সত্যকে, জীবনকে। তথাপি অমিত বুঝাইতে চাহিল সবিতাকে, কিন্তু সবিতা বুঝিতে চাহিল না। বুঝিল না।

বুঝিবে না। হয়ত মনোবিজ্ঞান মিথ্যা বলে না—সবিতা বুঝিবে না। তাহার আপনারই ভিতরে না-বুঝিবার সপক্ষে অনেক-অনেক বাধা জমা হইয়া আছে। তাই সে ছলনা ও কল্পনাকে চাহিবে, জীবনের বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করিবে। চাহিবে ফ্যান্টাসি—চাহিবে না রিয়ালিটি। কিন্তু কী সেই বাধা সবিতার? এদেশের বৈধব্যের সাধারণ সংস্কার। কোথায় কবে মরিয়াছে সেই প্রায় অপরিচিত এক যুবক— বিবাহান্তেই যে ডাক্তারি পড়িতে বিলাত গিয়াছিল, কিন্তু সেই মন্ত্রপড়া সম্পর্কই সবিতার জীবনকে সত্যের সম্মুখীন হইবার সমস্ত শক্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া দিয়াছে।...শুধু সেই কল্পনা নয়, অবশ্য সে যুবকটিও নয়। আছে সেই সঙ্গে

জীবন-বঞ্চনার ঐতিহ্য, স্বাভাবিক প্রাণধর্মের বিরুদ্ধে ভারতের সমস্ত শাস্ত্রকারের ও সংহিতাকারের নির্বোধ ধিক্কার ; আত্মসংযমের নামে কুৎসিত আত্মনিগ্রহ। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহেই যাঁহারা দেখিয়াছেন পরম পুরুষার্থ...যাঁহারা পরস্ত্রীমাত্রকেই 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতে শেখান, আর দশ হাজার বৎসর তপস্যার পরে তপোবনের সুদূর প্রান্তে কোনো রমণীর পদার্পণমাত্র 'মদন-জ্বালায়' আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়েন—এ দেশের জীবন হইতে তাহাদের এই অভিশাপ কবে ঘুচিবে? কবে আবার তাহার মেয়েরা, পুরুষেরা, সুস্থ সবল স্বাভাবিক জীবনের অধিকারী হইবে?...মধ্যযুগের অচল জীবন-যাত্রার উপরে চাপিয়া পড়িয়াছে আবার কলোনির পঙ্কিল পল্বল। অবশ্য কোথায়ই বা জীবন আজ সুস্থ, সবল স্বাভাবিক—বিকারগ্রস্ত এই পৃথিবীতে? ফিউডাল সমাজের বিকৃত পাপবোধ আর বুর্জোয়া-সমাজের বিকৃত যৌনবোধ—কোথায় সুস্থ-সবল স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার অবকাশ আছে মানুষের জীবনে? মানুষ আজ কিরূপে হইতে পারে আজ মানুষ? 'ম্যান ইজ নট্ ম্যান অ্যাজ ইএট্।'

সবিতাকে অমিত আর বিশেষ বুঝাইতে চেষ্টা করে নাই। সুস্থ সবল প্রাণময় জীবনযাত্রা—এই দেশেও আসিবে; পৃথিবীতে আসিবে। আসিবে কেন? আসিয়াছে, জানে তাহা অমিত। ততক্ষণ—পৃথিবীতে না হোক—এদেশে সবিতারা আত্মছলনায় যদি শান্তি পায়, পা'ক। আত্মনিগ্রহে যদি আধ্যাত্মিকতার স্বাদ পায়, পা'ক। কী তাহাদের রক্ষা করিতে পারে এই আত্মঘাত হইতে?—মানুষের মূল্যবোধ, মানব-মহাযান।

অতএব মেয়ে-কলেজের চাকরি ছাড়িয়া বিনা-বেতনে বিধবাশ্রমের ইস্কুল পরিচালনা, হরিজন সেবা, অনাথাশ্রম পর্যবেক্ষণ, চরকা প্রচার, 'গ্রামোদ্যোগ', কংগ্রেসী মহিলাসংঘ, বুনিয়াদি শিক্ষা এবং শেষে কস্তুরবা সমিতির স্বেচ্ছা-শিক্ষার্থিনী, শরণার্থী শিবিরের অবৈতনিক পরিচালিকারূপে সবিতা ক্রমে আপন রূপযৌবনকে প্রায় ক্ষয় করিয়া আনিয়াছে। 'বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় চ' তাহার জীবন ; ইহাই ভারতের মহাযান।

অমিত দিন কয়েক আগেও সবিতাকে দেখিয়াছে একটা ত্বরিতগামী বাসে। কিন্তু ভালো করিয়া তখন তাহাকে দেখিবার সুযোগও হয় নাই। আজ সকালে তাহার কথাই তথাপি মনে পড়িয়াছে। এখানে সবিতাকে দেখিয়া অমিতের এখন মনে হইল—হঠাৎ তাহাকে বড় ক্লান্ত, বড় অবসন্ন, বড় শ্রান্ত-বিমলিন দেখাইতেছে। আপনার রূপযৌবনকে প্রায় ক্ষয় করিয়া আনিয়াছে সবিতা। কিংবা হয়ত চৈত্রের দ্বিপ্রহরের পথে বাহির হইয়াছিল—আদর-পালিতা ভদ্রকন্যা—সে ত অনু নয়, না, মঞ্জুও নয়—তাই বুঝি এতটা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

তুমি বিজয়ের মাসী, সবিতা?—অমিত জিজ্ঞাসা করিল আসনে বসিতে বসিতে।—দ্যাখো ত, জানতামই না আমি। জানি বিজয় ভবানীপুরের দিকে থাকে; কিন্তু কি করে জানব—সে তোমার বোনপো।

জানবার কথা নয়, দিদিও মারা গিয়াছেন। বিজুও কলকাতায় থাকত না।—স্বাভাবিক নম্রতার সঙ্গে সবিতা বলিল।

সে ত বুঝলাম। কিন্তু আমরা ত থাকতাম, তোমরাও থাকো। আর অনুর সঙ্গেও তোমার দেখা হয়—অন্তত মাঝে মাঝে দেখা হত। তোমাদের কংগ্রেসী মহিলাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা ত ছিল অদের নিত্যকর্ম। কিন্তু কই, তুমিও তাকে বিজয়ের কথা বলোনি, আর বিজয়ও আমাকে তোমার কথা বলেনি।

বিজয় লজ্জিতভাবে বলিল, আমি জানতাম, বলিনি।

বিজয় থামিল, কেমন কুণ্ঠিত বোধ করিল। তারপর আবার বলিল, ভাবলাম আপনারা ত জানেনই। তবু যখন কিছু বলছেন না, তখন না বললেই বা কি?

অমিত, মনু ও সবিতাকে জড়াইয়া জটিল সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতেই কি বিজয়ের এই কুণ্ঠা? না তাহার কুণ্ঠা আপনার জন্য?

অমিত হাসিয়া বলিল, কি আর? না বললে বলা হয় না; জানাও হয়ত হয় না। থাক, কিন্তু তুমি এখানে এলে কি করে, সবিতা? সাক্ষাতের অনুমতি পেলে কার সাহায্যে?

দীর্ঘ কাহিনী। সবিতা তাহা সম্পূর্ণ বলিল না। বলিবে না, জানিত অমিত। কিন্তু সবিতা যাহা বলে না, তাহা অনুমান করিবার মত, বুঝিবার মত চেতনাও অমিত এতদিনে কি লাভ করিয়াছে? এতটুকু চিনে সে সবিতাকে, চিনে তাহার বাঙলা দেশকে, সবিতা না বলিলেও অমিত বুঝিল সবিতার কাজ ও কথা।

ভোর না হইতেই বিজয়কে আজ পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে আসে সবিতাদের বাড়িতে। বিজয় যে এখনো গুরুতর কিছু করে, তাহা তাহার মামা জানিতেন না। কবিতা লেখে, গল্প লেখে, শিক্ষানবিশ সাংবাদিক হিসাবে কমিউনিস্টদের কাগজে লেখে, কাজ করে, 'সোভিয়েত সুহৃদ' রূপে এখানে-ওখানে ঘোরে। কিন্তু কি যে পুলিশের রিপোর্ট তাহা কে বুঝিবে? সকাল না হইতে পুলিশ সেই বাড়িতে হানা দিল। বলিল, একটু থানায় যাইতে হইবে বিজয়কে।

একবার আধ ঘণ্টার জন্য? না?—হাসিয়া যোগ করিল অমিত।

বিজয় হাসিয়া বলিল, না আমাকে বলেছিল 'ঘণ্টাখানেকের জন্য।'

অমিত হাসিয়া বলিল, লোকটা গাল খাবে। আধঘণ্টা বলাই হল রুল্। কি বলেন, তাই না?—জিজ্ঞাসা করিল অমিত উপস্থিত গোয়েন্দা ইন্‌স্পেক্টরটির উদ্দেশে। লোকটা কেমন ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। এ লোকটার অস্তিত্ব সবিতা বা বিজয় যেন বিস্মৃত না হয়, আসলে সেই উদ্দেশ্যেই অমিত তাহার দিকে তাকাইয়া এই প্রশ্নটা করিল।

অপ্রতিভ হইল ভদ্রলোক। বলিল : আমি জানি না। আমি দপ্তরের কাজে; ছুটির দিনেও চার্জে রয়েছি। আপনাদের কথাবার্তার সময় থাকতে বলেছেন কর্তৃপক্ষ, তাই বসে আছি।

শুধু লজ্জা নয়, তাহার কথায় কোথা দিয়া একটা ক্ষোভ ও নিরুপায়তা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

অমিত সবিতাকে বলিল, তোমরাও বোধহয় বুঝতে পারনি, ঘণ্টাখানেকের অর্থ কি?

কি করিয়া বুঝিবে? এক ঘণ্টার পরিবর্তে দুই ঘণ্টা গেল। ন'টা বাজে। তবু বিজয় আসে না। তখন তাহারা বাড়িতে বসিয়া থাকিতে পারিল না।

অমিত জানে 'তাহারা' মানে সবিতাই, তাহার দাদা নয়। তিনি ভারতের স্বাধীনতা-লাভে চাকরি-জগতে বেশ উন্নতি করিতে পারিয়াছেন। বিলিতী কোম্পানির টনক নড়িয়াছে—ভারতীয় চাকরদের পদমর্যাদা দিতে হয়। শোষণ-স্বার্থ যখন সুরক্ষিত তখন ভারতীয়দেরও দিতে হবে মুষ্টিভিক্ষা। তাই 'কভিনেন্টেড চাকরি'তে এখন মিস্টার রায় সুস্থিব। পুলিশের গোলমালে তিনি মাথা দিতে পারেন না। তাহা ছাড়া, ন'টা বাজে যে, আপিসেরই টাইম হইয়া যাইতেছে মিস্টার রায়েব। ড্রাইভার এখনো গাড়ি বাহির করে নাই কেন? তিনি কাবণ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। ড্রাইভার-দেরও যেন এখন স্বাধীনতা—আসুক না আসুক, কিছুই বলিবার জো নাই।

বাড়ির অন্যান্য সকলেরই এইরূপ নানারকম বাধা আছে। কোন পরিবারে কাহার থাকে উদ্বৃত্ত সময়, কাহার পক্ষে সম্ভব এরূপ কাজের দায়িত্ব বহন? অতএব—

সবিতা ভবানীপুর থানায় গেল। হাঁ, একাই গেল, নিকটেই ত বাড়ির। অমিত ইহাও জানে—ইস্কুলে কলেজে পড়া ভাইপোদের সঙ্গে গ্রহণ করিতে চাহিলে সবিতা কাহাকেও পাইত না। নিজেও তাহাদের কাহাকেও গ্রহণ করা উচিত মনে করে নাই—কি জানি, পাছে তাহাদের ক্ষতি হয়।

থানার লোক কিন্তু প্রথমে সবিতাকে কিছু বলে নাই। পরে বলিল, সেখানে বিজয় নাই, তাহাকে সেখানে আনা হয় নাই। শেষে তাহাবাই গোপনে পরামর্শ দিল—সবিতা লর্ড সিংহ রোডে খোঁজ করুক। বাড়ি ফিরিল সবিতা—ফোন করিবে লর্ড সিংহ রোডে। 'দেখি, সাধু বসে আছে দুয়ারে'...আর বলিল না সবিতা। চক্ষুতে তাহার অর্থসূচক দৃষ্টি। অর্থাৎ, সবিতা জানিয়াছে অমিতের কথা, জানিয়াছে তাহার গৃহের খবর, অনুর ও শ্যামলের বিপদের কথা।

দৃষ্টির বিনিময় হইল, অমিতের দৃষ্টি বলিতে ত্রুটি করিল না—সবিতা, অমিত তোমাকে চিনিতে ভুল করে নাই। আবার সেই দৃষ্টি স্বীকারও করিল,—সবিতা, অমিতের প্রত্যাশাব অপেক্ষাও বেশি তুমি তৎপর, সচেতন, কৌশলী। এতটা অমিতও আশা করে নাই।

সবিতার দাদা আপিসে বাহির হইয়া গেলেন। ফোনে কিছু জবাব পাওয়া গেল না। শুধু কে বলিল, 'অফিসাররা এলে আবার ফোন করবেন বারোটায়।'—'দাদা চলিয়া গেলেন,—কিন্তু দুশ্চিন্তা লইয়া গেলেন—বিজয়ের কি হইল কে জানে।' তখন দশটা, সাধু বিশ্রাম করিবে। সবিতা অন্য কাজেও ব্যস্ত হইয়া রহিল... অর্থাৎ অনুর ও শ্যামলের সংবাদ পৌঁছাইবার জন্য ছুটিল তাহাদের বন্ধুদের বাড়ি, 'নানা গোলমাল সবখানে—যেমন করেই হোক্ তবু নাগাল পাব ছোট'র।' অতি সহজে অথচ অতি সাবধান সংকেতে বলিয়া যায় সবিতা অনুর নাম। অমিত সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে।

হয়ত গোয়েন্দা কর্মচারী অনভ্যস্ত, সব শুনিতে বা বুঝিতে চায় না। হয়ত

অত্যধিক চতুর লোক,—শুনিয়া যাইতেছে। কিন্তু কিছুই ভাব ভঙ্গিতে ব্যক্ত হইবে না। কিন্তু, অমিত, তুমি ইতিপূর্বে বুঝিতে কি এতটা চাতুর্য, এতটা কুণ্ঠাহীনতা সবিতার সাধ্য?...অমিতের চক্ষুতে কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল...সেই সদা-সংকুচিতা সবিতা কেমন করিয়া প্রয়োজনের দায়ে আপন অভ্যাস ও ধারণাকে কাটাইয়া উঠিতেছে, আশ্চর্য!

তোমার সম্মুখেও সে আজ আর সদা-ভীতা, অস্বচ্ছন্দ মানুষটি নাই, অমিত। আর পুলিসের সম্মুখে নির্দোষ ছলনা গ্রহণেও কুন্ঠিতা নয় সবিতা। কোনো কারণে, কাহাকেও ছলনা করা যে মনে করিত অন্যায়,—আর নিজেকে ছলনা করাই ছিল যাহার নিয়ম, প্রয়োজন। সে কি সত্যই তবে বুঝিতেছে—কোথায় ছলনা অন্যায়, ছলনা কোথায় প্রয়োজন?...সে কি তবে মানিবে আত্মছলনায়ও কোনো কল্যাণ নাই?...

আপিসে ফোন করিয়াও সবিতার পক্ষে কোনো লাভ হইল না। কে একজন অফিসার বলিলেন, কেহ কেহ লর্ড সিংহ রোডে আসিয়াছে বটে, কিন্তু কে কে তাহা বলা এখনো সম্ভব নয়। গ্রেপ্তার করা লোকদের নামের তালিকা তৈয়ারি হইতেছে; সবিতা বরং পরে আবার তাহা জানিতে চেষ্টা করিতে পারেন।

সবিতা হতাশ হইল, প্রায় নিরুপায় হইল। একটা সংবাদও পাইবে না বিজয়ের?...সামান্য চা খাইয়াও যায় নাই যে বিজয়। একজন কংগ্রেস এম-এল-এ'র নিকটে যাইতে পারিত সবিতা। গান্ধীবাদী কুমুদ সরকার;—দাদাও তাহাকে ধরিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু সবিতা গম্ভীর হইল। মুখে বলিল, না। কারণ কংগ্রেসে কুমুদবাবুরা পরাজিতের দলে—গান্ধীবাদীরা কি করিবে? তিনি মন্ত্রীদের কাহাকেও হয়ত ফোন করিতেন, কিন্তু লাভ হইত না। তাহারা কুমুদ সরকারের সঙ্গে দেখাও করিত না। কুমুদ সরকার যে সত্যই কিছু করিতে পারিবে না, তাহা সবিতা জানে। মারোয়াড়ী ধনকুবেররা এখন আর খাদীপন্থীদের উপর ভরসা রাখে না।—খোদ মন্ত্রীবাদীদের সঙ্গেই তাহাদের কারবার। তাই মন্ত্রীদের নিকট কুমুদ সরকারদের কোনো প্রয়োজন প্রতিষ্ঠা এখন নাই। বিড়লাজীর ম্যানেজাররা বলিয়াছেন—গান্ধীপন্থী এই খাদিদল গঠন-মূলক কাজ করুক না? দরকার মত কস্তুরবা ফণ্ড হইতে তাঁহারা টাকা পাইবে। পলিটিক্‌সে কেন কথা বলে।

তাহা ছাড়াও কুমুদ সরকারের সঙ্গে সবিতা আর যাইতে চাহে না। তিনি বিজয়দের নাম শুনিতে পারেন না। মিসেস সেনরায়ের কাছেই বরং গেলাম—আর ভুজঙ্গ সেনের কাছে,—বলিল সবিতা।

মিসেস সেনরায়!—অমিতের কণ্ঠ হইতে সবিস্মিত উক্তি বাহির হইল।

হাঁ, মিসেস সেনরায়। জানেন তাঁকে? এনগেজমেন্টও ছিল। দিল্লী থেকে শরণার্থী-অধ্যক্ষতার ভার পেয়েছেন। তাই একটা রিফিউজী ক্যাম্প চালনা নিয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ প্রয়োজন। কালই মিসেস সেনরায় এসেছেন দিল্লী থেকে।

অমিতও তাহা জানে।

...না জানিয়া কাহার উপায় আছে? বাঙলা দেশে বাঁচিবে, সংবাদপত্র পড়িবে, অথচ জানিবে না মিসেস সেন-রায় দিল্লী হইতে শরণার্থী-সেবার বিশেষ ভার লাভ করিয়া কলিকাতা ফিরিতেছেন? অবশ্যই ফিরিতেছেন তিনি দিল্লী হইতে এয়ারলাইনে। কারণ, তাঁহার সময় নাই, সময় নাই তাঁহার।—তাঁহার বিবৃতিতে কালই কত অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন পূর্ব বাঙলার লোকদের ও দেশ-ত্যাগী পূর্ববঙ্গবাসীদের। সাধ্য কি, সংবাদপত্র পড়িবে, অথচ জানিবে না মিসেস সেন-রায় পণ্ডিত নেহরু ও কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য আবার যাইতেছেন সিমলা? হাঁ, এয়ারলাইনেই যাইতেছেন, তাহার একটুও সময় নাই। কুইনী বা রানী সেনরায়ের সময় নাই, সময়,...'দিল্লী দূরন্ অশত'...কোথায় এ্যাসেম্বলির সদস্যপদ, প্রদেশে মন্ত্রিত্বের পদ, বিলাতে ভারতীয় কোন একটা দৌত্যাবাসের কর্তৃত্ব, ইউ-এন-ও বা জেনেভায় কোনো একটা ডেলিগেশ্যনের নেতৃত্ব...কোনোটাই এখনো মিসেস সেনরায় আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অথচ, কুইনী, সময় নাই, সময় নাই।...অতএব যেমন করিয়া পার ওঠো... যাহাকে পার আশ্রয় করো, যাহা চাই আঁকড়াইয়া ধরো—গান্ধীজীর প্রার্থনাসভায় জোটো; নোয়াখালী উদ্ধারে ছোটো; 'আগস্টের স্বাধীনতায়' পতাকা তোলো; সেপ্টেম্বরে, পাঞ্জাবহত্যার ব্যাপারে দিল্লী যাও; অক্টোবরে, বাঙলায় ফেরো; নবেম্বরে, দিল্লী ছোটো; ফেব্রুয়ারিতে, রাজঘাটে লোটাও। ওঠো, ছোটো, হানা দাও, ধরনা দাও, কাঁদো, নাচো...কিন্তু যাহাই করো সংবাদপত্রে এসব কথা সর্বাগ্রে ছাপাও। সংবাদদাতাদের সঙ্গে তাই খাতির রাখো; খাতির জমাও সংবাদপত্রের মালিকদের সঙ্গে; খাতির ফলাও সংবাদ এজেন্সির মুনিবদের সঙ্গে; চা-এ ডাকিয়া খুশি করো সংবাদপত্রের সম্পাদকদের, আর ফোনে ডাকিয়া কৃতার্থ করো নিউজ এডিটারদের, রিপোর্টারদের...তারপর সাধ্য কি, ভূ-ভারতে কেহ তোমার নাম না জানিয়া পারে? সাধ্য কি কেহ দেখিবে না তোমার ছবি—নোয়াখালির গাঁয়ে, কিংবা বিড়লাভবনের ছায়ে; বেলেঘাটায় গান্ধীজীর বৈঠকে তাঁহার সামনে, কিংবা শরণার্থী শিবিরের মধ্যখানে?...

অমিতেরও সাধ্য কি তাই না দেখিয়া পারে?...কিন্তু সময় নাই, সময় নাই, কুইনী সেনরায়। তুমি মাদ্রাজী নায়ার নও, গুজরাতী বেনে নও, পাঞ্জাবী বৈশ্য নও, হিন্দুস্থানী কায়স্থও নও,—তুমি বাঙালী ব্যারিস্টারের মেয়ে মাত্র। অনেক অসুবিধা তোমার। গুজরাতে তোমার বাড়ি নয়, বোম্বাই-এ নাই ব্যবসা, ইন-ফ্লুয়েন্স নাই দিল্লী সিমলায়।—বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছ সেনরায়কে,—একটা জড়ভরত। আই-সি-এস। হাঁ একদিন তারাই ছিল রাজা—আমলারাজার দিনে; কিন্তু আজ ত তারা চাকর—যে-কোনো কংগ্রেসম্যানের, যে-কোনো মালিকের দাপটে ওরা অতিষ্ঠ। মিস্টার সেনরায় অমিতদের অনুজ, ইউনিভার্সিটির একটা ভালো ছাত্র। কো-অপারেটিভ লইয়াই তাই সে সন্তুষ্ট—কলিকাতার সেক্রেটারিয়েটেই থাকে আবদ্ধ;—নয়া দিল্লীতে যাইতেও সে চাহে না, সাহসও পায় না। বোম্বে

না তাহার স্ত্রী কুইনীর ভবিষ্যৎ, বোঝে না তাই নিজের ভবিষ্যৎ।...তোমাকে পিছনে ফেলিয়া যাইতেছে, কুইনী, তাই ভাটিয়া মিলমালিকের কন্যারা আর পত্নীরা, যত মাদ্রাজী পাঞ্জাবী এড্‌ভান্‌চারেস্‌রা, তোমার মত যাহাদের না আছে বিদ্যা, না আছে বুদ্ধি, না আছে রূপ—ও যৌবন...বিউটি এণ্ড ইনটেলেকট।...সব থাকিতেও সব তোমার অনায়ত্ত, কিছুই তুমি পাইয়াও পাও না।—অথচ সময় নাই, সময় নাই, সময় নাই তোমার।—কুইনী সেনরায়ের নিকট এই সাবধান-বাণী বহন করিয়া আসে প্রতিটি দিনরাত্র। তিনি জানেন সময় নাই; আর তাই সংবাদপত্র পাঠক মাত্রকেই জানিতে হয় তিনি শরণার্থী সমস্যায় কি করিতেছেন—এয়ারলাইনে ছুটিয়া :—ভারতীয় কনস্টিটিউশ্যান ব্যাপারে কি বলিতেছেন—সংবাদপত্রে লিখিয়া :—ভারতীয় নারীর অধিকার রক্ষায় কি করিতেছেন—সার্কুলার দিয়া; গান্ধীজীর বিয়োগে কতখানি কাঁদিয়াছেন—সভায় বসিয়া ; আর এখন গান্ধীজীর শেষ নির্দেশ মত কি করিতেছেন বাঙলা দেশের শরণার্থীদের স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া। তাঁহার এগ্রো-ইকোনমিক সল্যুশনের কি নোট, তাঁহার ম্যাস এজুকেশ্যানাল স্কীম, তাঁহার সোশ্যাল রিগ্রুপিং-এর প্ল্যান, আর গান্ধীয়ান ইকনোমিকস এণ্ড ডায়েলেটিকাল ডিফারেনসিয়াল-এর গ্রাফ ;—এইসব না জানিয়া উপায় আছে কাহারও? উপায় আছে অমিতদেরও? হায়, তবু মিসেস রানী সেনরায় পাইলেন কি না হতভাগা বাংলাদেশে এই গড-ড্যামড্‌ শরণার্থীদের কাজ। এজন্যই কি ক্যামব্রিজে পড়িয়াছিলেন তিনি?...কন্টিনেন্টে ঘুরিয়াছিলেন? জীবন দেশের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন?

অমিত জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় দেখা পেলে মিসেস সেনরায়ের---এয়্যারোড্রোমে?

এয়্যারোড্রোমে? সেখানে কেন?—জিজ্ঞাসা করিল সবিতা।

ওঁর সময় নেই বলে---হয়ত দিল্লী যাচ্ছেন, কিংবা দিল্লী থেকে ফিরছেন।

দুইটি ঘণ্টা ইন্দ্রাণীকে কাল সন্ধ্যায় বসাইয়া রাখিয়া তাহাই গতকাল জানাইয়াছিলেন মিসেস রানী সেনরায়। বাঙলার শরণার্থী মেয়েদের তিনি একটা নার্সিং শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, তাই তিনি ডাকিয়াছেন সিস্টার ইন্দ্রাণীকে। কিন্তু কাল আর তাঁহার সময় হয় নাই—নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন মেলের মার্কিন সংবাদদাতার সঙ্গে ছিল 'তাঁর টী'। ন্যাচারলি তার পরে এখানকার 'পত্রিকা' আর 'স্টেটসম্যানেও' একটা স্পেশ্যাল ইন্টারভিউ দিতে হইল। কাজেই সিস্টার ইন্দ্রাণী, রিয়েলি, কুইনী সেনরায়, হ্যাজ নো টাইম—এ্যাবসোলুইটলি নো টাইম। কালই যেতে হবে এয়ারে সিমলা—'দিল্লী চলুন, কথা হবে।'—আর ততক্ষণ অমিত একা বসিয়া ইন্দ্রাণীর বাড়িতে।

অমিতের কথায় সবিতা হাসিল। না, সে প্রোগ্রাম ক্যানসেল করেছেন। ওঁকে বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন শ্রীভুজঙ্গ সেন আর আমাদের মন্ত্রী জগন্নাথ চৌধুরী, —মিসেস সেনরায় অন্তত দু'দিন এখানে যেন থাকেন।

অমিত শুনিল; সবিতাকেও আজ দুপুরে মিসেস সেনরায় ডাকিয়াছিলেন

শরণার্থী শিক্ষাসদন গড়িবার স্কিম লইয়া। তখন কিন্তু বেলা একটা, মিসেস সেনরায় বাড়ি ছিলেন না,—সবিতাকেও অপেক্ষা করিতে হইল—লাঞ্চে গিয়াছিলেন ফার্পোতে। মারোয়াড়ী এক ব্যবসায়ী 'হোলি-লাঞ্চ' দিয়াছিলেন—কংগ্রেসের গবর্নমেন্টের মন্ত্রীদের নিমন্ত্রণ ছিল। সবিতা ভাবিল—এই উপলক্ষে মিসেস সেনরায়কে বলিয়া বিজয়ের একটা ব্যবস্থা হয়ত করা যাইবে।

মিসেস সেনরায় সবিতার কথা শুনিয়া প্রথম কিছু করিতে রাজি হইলেন না। কমিউনিস্টদের গবর্নমেন্টের দমন করিতেই হইবে, তিনি করিবেন কি? লাঞ্চেও কথাটা উঠিয়াছিল। পুলিশের একজন বড় কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন, মাড়োয়ারীদের এই কথা বলিতেছিলেন। সেখানেই মিসেস সেনরায় শুনিয়াছেন কমিউনিস্টদের আজ ধরা হইয়াছে, তবে অনেককে নাকি পাওয়া যায় নাই এখনো। দুই-এক দিনের মধ্যেই পাওয়া যাইবে—পলাইবে কোথায় তাহারা? রাশিয়া এখন রক্ষা করুক না ইহাদের? মিসেস সেনরায়েরও কোন দরদ নাই ইহাদের জন্য। একবার তর্ক হইয়াছিল মিসেস সেনরায়ের সঙ্গে উহাদের এক চাঁই-এর—মিসেস নাইডুর সম্মুখে। মিসেস নাইডুর নিকট তখন খুব আস্কারা পাইয়াছিল উহারা। মিসেস সেনরায় সহ্য করিতে পারিলেন না উহাদের রাশিয়ান ইকোনোমিক্সের পক্ষে ওকালতি। উহা আবার ইকোনোমিক্স্? ক্যাম্ব্রিজের ইকোনমিক্স্-পড়া ছাত্রী তিনি, কেইনসের নূতনতম লেখা পড়িয়াছেন। কি জানে এই ফ্যানাটিক্‌রা ইকোনোমিক্সের? কিন্তু মিসেস নাইডু থামাইয়া দিলেন, না হইলে মিসেস সেনরায় দেখিতেন মূর্খগুলির স্পর্ধা কত দূর যাইত।

সবিতা অনেক কষ্টে একবার বলিবার সময় করিয়াছিল, বিজয় তত বড় কেহ নয়। ইকোনমিক্স্ সে জানে না। বিজয় খেলে, কবিতা লেখে।

কবিতা লেখে? মিসেস্ সেনরায়ের চোখে বিদ্রূপের হাসি ফুটিল। মিসেস সেনরায় কবিতা পড়েন না। মিসেস সেনরায় 'স্টেটস্ম্যান' পড়েন, 'লাইফ' পড়েন, 'ইলাস্ট্রেটেড্ লণ্ডন নিউজ' পড়েন, এখন 'হিন্দুস্থান টাইম্স্'ও 'ইলাস্ট্রেটেড্ উইক্‌লি অব ইণ্ডিয়া'ও পড়েন—আর পড়েন 'ক্রাইম্স'।

সবিতা বুঝি সেইসব পড়ে নাই?—

সবিতার ভাগ্যক্রমে এ সময়ে আসিয়া পড়িলেন শ্রীভুজঙ্গ সেন—এ্যাসেম্‌বলির এক কংগ্রেস হুইপ্, আর ব্রজনন্দন পালিত—ফিনান্স্ মিনিস্টারের প্রাইভেট্ দালাল।

কয়টা পারমিটের হোল্‌ডার ভুজঙ্গ সেন?—জিজ্ঞাসা করিল অমিত।

সবিতা উত্তর দিল না। অমিত জানে—কয়মাস পূর্বেও সবিতার অপরিসীম ভক্তি ছিল ভুজঙ্গ সেনদের উপর। না থাকিবার কারণ নাই। দেশের জন্য ইঁহারা জীবন দিতে গিয়াছিলেন, বাংলা দেশে ইঁহাদের নাম দেবতার মন্ত্রের মত। এরূপ এক-একটা নামের সঙ্গেই যেন জাতির এক-একটা জীবনের শিকড় জড়াইয়া আছে। কি করিয়া বুঝিবে সবিতা আসলে জাতির শিকড় ইঁহাদের সহিত জড়াইয়া নাই, জড়াইয়া আছে দেশের জনতার সহিত; তাহারাই উহার প্রাণরস জোগায়।

ভুজঙ্গ সেনকেও রস জোগাইয়াছে একদিন এদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম। কিন্তু আজ যে একটা শূন্যচারী পরগাছা সেই ভুজঙ্গ সেন, কি করিয়া বুঝিবে তাহা সবিতা?

ভুজঙ্গ সেনের আসিবার কথা ছিল—কাল রাত্রিতেই কথা হইয়াছে। আগমনের প্রকাশ্য কারণ পূর্ববাংলার শরণার্থী। কিন্তু নয়া দিল্লীতেই কথা হইয়াছিল ভুজঙ্গ সেনের সঙ্গে মিস্টার অনিল দত্তের বাড়িতে মিসেস সেনরায়ের।—মিস্টার অনিল দত্ত—যাঁহার ওয়াইফ্ ও ব্রাদার ব্রিটিশ আমলের অত্যাচারে প্রাণ দেয়—অমিত জানে তাহা।...সুনীল আর ললিতা,—কে জানে যে, অনিলের জীবনে তোমাদেরও মূল্য ছিল? এখন 'সাফারিং'-এর জন্য ক্ষতিপূরণ পাইয়াছেন মিস্টার দত্ত, কমার্সের এক অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি তিনি। মিসেস সেনরায় ও ভুজঙ্গ সেন উভয়কে মৃদু পরিহাসে দোষারোপ করিলেন। ভুজঙ্গ সেন দিল্লীতে একটু চাপও দিতে পারেন না কি বাঙালীদের প্রতি সুবিচারের জন্য? এই ত, এত 'ফরেন সার্ভিসে' লোক যায়—একজন বাঙালীও কি যাইতে পারেন না রাজদূত হইয়া? কত মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী মেয়ে দিল্লীতে কর্ত্রীত্ব ফলাইতেছে, একজন বাঙালী মেয়েও কি নাই? ইউনেসকোর সংস্কৃতি পরিষদে মিসেস সেনরায় হিউম্যান রাইটসের উপর ও উওম্যান'স রাইট্সের উপর বলিতে পারিতেন—দেখিয়াছেন কি সেই নোট ভুজঙ্গ সেন?

ভুজঙ্গ সেন বলিতেছিলেন—বাংলার কংগ্রেসে শরণার্থীদের স্থান করিয়া দিতে না পারিলে কি করিয়া কংগ্রেস বাঁচে? কিংবা কোনো 'কাজ' করিতে পারেন তাহারা? তাই মিনিস্টার শ্রীজগন্নাথ চৌধুরীও তাঁহাকে এখানে থাকিতে বলেন। উভয়েই উভয়ের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন—ভুজঙ্গ সেন জানেন মিসেস সেনরায় একটা ঘুঁটি; পাকিলে অস্ত্রও হইতে পারে। সেনরায় বুঝিতেছেন জগন্নাথ চৌধুরী একটা সূত্র—ছাড়া ঠিক নয়।

সবিতার হয়ত উঠা উচিত—কোনো একটা কথা বা চুক্তি সম্ভবত ইঁহাদের নিজেদের এখন ছিল। কিন্তু সবিতা উঠিবে কি করিয়া? তাড়াতাড়ি উঠিতে চায় বলিয়াই সে একবার বলিল মিসেস সেনরায়কে,—একবার বিজয়ের সঙ্গে তিনি সবিতার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন না? বিজয়ের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জামা-কাপড়ও যে সে সঙ্গে লইতে পারে নাই। সবিতাকে বিদায় দিবার প্রয়োজন মিসেস সেনরায় ও ভুজঙ্গ সেন উভয়েরই সম্ভবত ছিল। তাঁহাদের একটা গোপন পরামর্শ আছে। একটু পরেই সময় হইলে আরও দুই-একজন আসিবেন—সম্ভবত অনারেবল দি মিনিস্টার ফর জাস্টিস্, জগন্নাথ চৌধুরীও।

ওদের সময় ছিল না,—বলিল সবিতা।

না, সময় যে তাঁহাদের নাই তাহা অতি পরিষ্কার বোঝে অমিত। বোঝে—মিসেস সেনরায় কেন এইসব ব্যাপারে হাত দিতে চাহেন না! না হইলে এখনি তিনি ফোন করিতে পারিতেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মণ্ডলকে। আর বিগলিত হইতেন শ্রীযুক্ত মণ্ডল; 'মিসেস সেনরায়—আপনি! ওঃ! ওঃ! তা দেখছি—দেখছি, এখনি বলে দিচ্ছি আমি...হাঁ, হাঁ, করব...।' হয়ত বা আধ ঘন্টার মধ্যে সেক্রেটারিয়েট

হইতে পালাইয়া স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইতেন শ্রীযুক্ত মণ্ডল। 'কাজটা হয়ে গিয়েছে মিসেস সেনরায়?...হাঁ, হাঁ, আপনাকে তাই জানাতে এলাম।'...জানাইতে আসিবেন, এবং তাই শ্রীযুক্ত মণ্ডল বসিবেন। মিসেস সেনরায়কেও সহিতে হইবে সেই উজবুকের সঙ্গে বাক্যালাপের যাতনা। তবু যদি, কোনো লাভ হইত তাহাতে? কি করিতে পারে এই 'শেডুল্ কাস্ট' মন্ত্রী? নয়াদিল্লীতে ঘুঘু-বাঙালী মন্ত্রীরাই পাত্তা পায় না—জগন্নাথ চৌধুরীই পারিবেন কি না, ঠিক নাই। কিন্তু কমিউনিস্টদের জন্য কেন কুইনী সেই আপনার চ্যান্‌স নষ্ট করিবেন? না, মিসেস সেনরায় অত সস্তা মানুষ নহেন। না, তিনি এসব কাজে হাত দিবেন না। বরং ভুজঙ্গ সেনকেই বলা যাউক কিছু একটা ব্যবস্থা করিতে।

মিসেস সেনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করা যায় ভুজঙ্গবাবু? পারেন না কি কিছু করতে?

তিনি ভুজঙ্গ সেন—নয়াদিল্লীর এ্যাসেম্‌বলির ফোর্থ হুইপ। কি না পারেন তিনি? ...তবে—এই কমিউনিস্টগুলিকে গুলি করা দরকার...

কিন্তু বলছেন যখন আপনি মিসেস সেনরায়, আর তুমিও এসেছ সবিতা—

ভুজঙ্গ সেন মাপিয়া দেখিলেন সবিতার না হয় খাদি আর গ্রামোদ্যোগে নীরেট মাথা। বিমান-বিহারিণী মিসেস সেনরায় নয়াদিল্লীতে উচ্চমহলে একেবারে তুচ্ছ নন। সেখানে মিসেস সেনরায়কে ভুজঙ্গ-সেনের নিজ দলটা ভারী করিবার কাজে লাগানো যাইতে পারে। ফোর্থ হুইপ হইতে ফার্স্ট হুইপ, কিংবা একটা ক্ষুদে মন্ত্রিত্ব প্রথম ধাপেই,—এইসব কাজে একটা অ্যাসেট হইতে পারেন মিসেস সেনরায়—এই ধারণা কি ভুজঙ্গ সেনেরই নাই? না থাকিলে তিনি মিসেস সেনরায়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতেছেন কেন? ওইসব শরণার্থীদের জন্য?

ভুজঙ্গ সেনের কিন্তু অভিমানও আছে। সবিতা কি তাঁহাকে জানিত না? কোথায়, সে নিজে ভুজঙ্গ সেনকে বলিল না কেন?...ভুজঙ্গ সেন রাগ করেন নাই, কিন্তু মনে ক্ষোভ পোষণ করেন। সবিতা কি তাঁহাকে এত পর বলিয়া মনে করে? তাঁহাদেরই পাড়ায় ছিল তাহার ইস্কুল।

সবিতাকে অনুযোগ দিলেন ভুজঙ্গ সেন। কুমুদসরকারদের পাল্লায় সবিতা মিথ্যা মিথ্যা ঘুরিয়া মরিতেছে। এই খাদিগুলি অকর্মণ্য। অবশ্য ঠিকই ভাবিয়াছে সবিতা—বিজয়ের জন্য ভুজঙ্গ সেন কিছু করিতে পারিবেন না। পারিবেন কি করিয়া? কাহার সহিত কথা বলিবেন ভুজঙ্গবাবু? তাঁহাদের চিনিবে কি এখন পুলিশের কর্তারা? চিনিত অবশ্য একদিন। কিন্তু তিনি এখন কংগ্রেসম্যান। 'মন্ত্রী নই, একটা সেক্রেটারিও নই—সেদিনের ভোঁতা টেরোরিস্ট।'

সবিতা লজ্জা পাইল। বলিল, তাইত ভাবছিলাম এসব কাজে কি আপনারা যাবেন?

দেখা যাক্। সন্ধ্যা বেলায় বিলেল্লা প্যালেস হোলির পার্টি আছে, দেখা হবে মন্ত্রীদের সঙ্গে। মিসেস সেনরায়ও থাকবেন তখন। তখনই বিজয়ের বিষয়ে কথা হবে পুলিশ মিনিস্টার দে-সরকারের সঙ্গে।

ইতিমধ্যে ভুজঙ্গ সেন বলিয়া দিলেন কি-কি জিনিস বিজয়ের দরকার হইবে—জামা-কাপড়, সাবান, তেল, টুথ পেস্ট, ব্রাশ। বিজয়ের জন্য ভুজঙ্গ সেনের বরাবরই মায়া ছিল। দুঃখ করিলেন—ছেলেটা কমিউনিস্টদের দলে পড়িয়া গোঁয়ার হইয়াছে। রাগ করিলেন,—ছেলেগুলিকে কেন ধরেছে গবর্নমেন্ট? ধাড়ীগুলিকে ধরা দরকার। তা ধরবার নামগন্ধ নেই। কেবল দুই একটা পুরাতন বোকা ধরা পড়েছে—অমিত, সৈয়দ আলী, মাস্টার সাহেব,—পুরাতন বদমায়েস, কিন্তু গোবরে-ভরা নীরেট মাথা।

ভুজঙ্গ সেনকে আমার কথা না বললেই পারতে।—অমিত হাসিয়া বলিল সবিতাকে।

সবিতা বলিল, আমি বলিনি কিছু।

তা হলে এখানে দেখার অনুমতি পেলে কি করে?

ওঁরা কেউ কিছু করলেন না। তখন সরাসরি এখানেই এসেছি। এখানে এসে সরাসরি পুলিশকর্তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। ভুজঙ্গ সেনের কাছে যাব কেন? তার চেয়ে এঁরাই বরং ভালো। শ্বশুরালয়ের পরিচয় জামাতা—

এতটা স্পষ্টতা, কর্মোদ্যম যে সবিতার মধ্যে ছিল, ইহা অমিতের অজানা। আশ্চর্য, কি করিয়া সে আপন সংকোচ ও কুণ্ঠা কাটাইয়া উঠিল? সরাসরি একা এই গোয়েন্দা-দপ্তরে আসিয়া পড়িল—সেই সবিতা 'সাত-চড়ে কথা সরে না মুখে' সেই পার্বতীর মতই। কিন্তু পার্বতী জীবিকার গরজে উদ্যোগিনী, শ্রমিকের দৈনন্দিন অভাবের তাড়নায় গরজ তাহার। সবিতার তাড়না কি? হয়ত বিজয়ের মায়া, হয়ত আপন প্রকৃতির দাবি। এবার কি আর সে আপনাকে খর্বিত করিবে?

সবিতা জানাইল, বিজুকে দেখবেন আপনি জানি—ওর খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম আছে। জানেন না বোধহয় সেবারে গুলি বিঁধে অবধি ওর অন্ত্রের ক্ষত শুকোয় নি।

সবিতা জানাইল স্বল্প কথায় ও সহজ সাধারণ কণ্ঠে—তাহার কথায়, কণ্ঠস্বরে কোনোখান দিয়া যেন বেদনা ও বিক্ষোভের কোনো আঁচ না লাগে,—আর না জাগে তাহার কোনো আবেগস্পর্শে বিজয়ের মনের সেই বেদনাকাতর ক্ষতস্থলটির ব্যথা।...অমিত অবশ্য জানিত...পার্টির লোকদের কাছে শুনিয়াছে। একবার হাসপাতালে দেখিতেও গিয়াছিল।...

...সেদিনও সকালেই বিজয় বাহির হইয়াছিল। রশিদ আলী দিবসের অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় দিবস। সকালেই পাড়ায় ট্রামও পুড়িতে আরম্ভ করে। বিজয় ক্যামেরা লইয়া চলিয়াছিল তাহার এক বন্ধু সুরেশের সঙ্গে। যে নামটা ভোলা সম্ভব নয়।

ফটো লইতেছে তাহারা, পোড়া ট্রামের, পথের ব্যারিকেডের, মিলিটারি ট্রাকের, উদ্দীপ্ত জনতার, উৎসাহী বালকদলের। হরিশ মুখার্জি রোডে বুঝি দেখিয়াছিল তাহাকে গোয়েন্দার একটা চর। হয়ত চিনিতও সে বিজয়কে, অথবা তাহার সঙ্গী সেই বাস ইউনিয়নের সুরেশকে। গলির মোড়ে খপ্ করিয়া হঠাৎ তাহাদের ধরিয়া ফেলিল এক ফিরিঙ্গী সার্জেন্ট। প্রথমেই কাড়িয়া লইল ক্যামেরাটা। বিজয় আপত্তি করিতেই বলি: আই'ল্ শুট্ ইউ: গুলি করব।

গুলি করবে কি? ঠাট্টা নাকি?—বিজয় অমিতকে বুঝাইয়া বলিল; সত্যই আমরা ভেবেছিলাম বুঝি তামাসা করছে। পরে মনে হল—ভয় দেখাচ্ছে।

সবিতা বলিল, ওরা তখনো বলে ক্যামেরা দাও সাহেব। খানিকদূরে রাইফেলধারী ছয়জন গুর্খা। সাহেবও রিভলভার লইতেছে। তথাপি বিজয়েরা বুঝিতে পারে নাই কিছু। বরং সুরেশ দমিয়া না গিয়া সাহস দেখাইয়া বলিল, ওসব রাখো সাহেব, ক্যামেরা দাও।

এই দিচ্ছি,—গুলি উঁচাইয়া তুলিতেই সুরেশ দুইলাফে পিছনে সরিয়া গেল। দৈবক্রমেই লাগিল না সেই গুলি। দুইজনে পিছন ফিরিয়া প্রাণপণে তখন ছুটিল গলির মধ্যে। পার্শ্ব ঘেঁসিয়া কি লাগিল একটা বিজয়ের বাম কব্জিতে। পড়িয়া গেল তাহার পরে সুরেশ; তথাপি উঠিল আবার। বিজয়ও পড়িয়া গেল, এবার ডান উরুতে বিঁধিয়াছে কিছু। কিন্তু উঠিল। একটা ফটক-ওয়ালা বাড়ির হাতায় ঢুকিয়া পড়িল। আর পারে না, বসিয়া পড়িল পোর্টিকোতে। এবার শুইয়া পড়িল সুরেশ কর,—তখনো সে জানে না গুলি তাহার পার্শ্বভেদ করিয়া কিড্‌নিতে গিয়া লাগিয়াছে কিন্তু আর পারে না বুঝি সে। বিজয়ও আর পারে না—পা নিশ্চল, বাম হাতটা বুঝি চূর্ণ হইয়াছে, পেটেও লাগিয়াছে নাকি?

—স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে কি অমিত? কিন্তু ইহাও ত সুপরিচিত কাহিনী।

শুধু দুইজন তাহারা দুইজনের দিকে তাকাইল। মনে হইল বিজয়ই বেশি আহত—রক্ত ঝরিতেছে তাহারই বেশি। পিপাসার জন্য জল চাহিতেছে, কেহ তাহা দেয় না। চারিদিকের বাড়ি হইতে লোকে জানালা দিয়া দেখিতেছে।

বিজয় বলিল,—এইবার তাহার হাসি ম্লান,—সুরেশ আমাকে বলে, 'আমরা বোধ হয় আর বাঁচব না।' আমরা!—তখনো ও ভরসা দিতে চায় আমাকে, মরলেও আমি একা মরব না। একজন সঙ্গী থাক্‌বে।

—হাঁ, জীবনের অপেক্ষাও বেশি করিয়া চাই আমরা মরণের সম্মুখে কাহাকেও আপনার দোসর রূপে। জীবন আপনিই একটা মহারাজ্য। অফুরন্ত তাহার আত্মীয়তা। মৃত্যু শূন্যময়, মৃত্যু অনাত্মীয়, সেইখানে সকল পরিচয়ের শেষ-সীমা। তাই মৃত্যু এত বিভীষিকা। তাই ত জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আমরা বাহু মেলিয়া দিই—কাহাকেও কি আঁকড়াইয়া ধরিতে পাইব না? কোনো একটি সুপরিচিত হাত; কোনো দুইটি সবল সন্তান-বাহু; কোনো একটি ব্যথায়-বিস্ময়ে-ভয়ে কাতর নবীন দেহের উষ্ণস্পর্শ। তাহাও যেখানে নাই, চাই সেইখানে অন্তত একটি পরিচিত হৃদয়ের আশ্বাস—'আমি রহিলাম তোমার অন্তিম অংশভাগ, তোমার চরম আশ্বাস, তোমার জীবনান্তের সঙ্গী।'

দুই ঘণ্টা পরে পাড়ার লোকেরা ফোন করিয়া অ্যাম্বুলেন্স আনায়—তাহাদের হাসপাতালে পাঠায়।

সেই রাত্রেই সুরেশ মারা গেল। বিজয়কে বাঁচানো গেল অনেক কষ্টে। হাতটা গিয়াছে। পাটাও যাইতে বসিয়াছিল হাসপাতালের ডাক্তারদের দোষে। তাহারা

যেন দেখিয়াও দেখে না—সেপটিক হইল, বার দুই কাটিল, পেটের ঘা'ই মারাত্মক হইতেছিল। বাড়ি হইতে পেনিসুলিন প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া তাহাকে রক্ষা করা গেল। অথচ পেটে ক্ষত হইয়াছিল সামান্য,—পার্শ্ব দিয়া গুলিটা ছিটকাইয়া গিয়া হাতে বিঁধে। সবখানেই কিছু ছাপ রাখিয়া যায়।

ইচ্ছা করিয়াই সবিতা সব কথা গোপন করিল। সে জানে, এইসব কথা বিজয়কে অনেক বেশি আলোড়িত করে; সে কুন্ঠিত হয় ইহার আলোচনায়। অমিতও বুঝিতে পারে—জীবনে সমস্ত সৌভাগ্য ছিল বিজয়ের—সে ভালো হকি খেলিত, আজ সে কি মানুষের শুধু কৃপার পাত্র হইবে? না, কিছুতেই না। সে এইজন্য তাহার পুরাতন সহপাঠিনীদের সঙ্গও বর্জন করিয়াছে—এক সময়ে তাহারা বিজয় বলিতে অজ্ঞান হইত। কিন্তু সে বিজয় আর নাই। বিজয়ও নাই আর সেই সমাজে।

কিন্তু এদিকে বিজয়ের পেটে একটি ব্যথা প্রায় লাগিয়াই আছে। খাওয়া-দাওয়া অত্যন্ত নিয়ম মত করিতে হয়। ডাক্তার বলেন, হয়ত সেই গুলিরই ফল। যাহাই হউক, বিজয়কে যদি উহারা ধরিয়া রাখে, এই দিকে একটু সাবধান হইতে হইবে অমিতের।

অমিত সহজভাবে শুধু জানায়—তাহা দেখিতেই হইবে। যদি সত্যই ধরিয়া রাখে।

সবিতা এবার চুপ করিয়া রহিল; পরে স্থির দৃষ্টিতে বলিল, মনুকে সব কথা লিখে একটা চিঠি দিয়ে দিলাম।—

মনুকে?

অমিত জানে সবিতার পক্ষে মনুকে পত্র লেখার অর্থ কী। তাহা যে তাহাদের দুইজনার পক্ষেই প্রায় দুইজনাকে স্বীকৃতি। তাই অমিতের কন্ঠ হইতে আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠিল বিস্ময়োক্তি: 'মনুকে।'

সে ছাড়া আর কে আছে? অনু ও শ্যামল ত' নেই—এখন আসবেও না। তার সাহায্য না পেলে চলবে কেন?

অর্থসূচক দৃষ্টি সবিতার চক্ষে। তাহার বক্তব্য অমিতের বুঝিতে বাকী রহিল না। তবে কি সত্যই জীবনে আর একটি নূতন পৈঁঠায় এবার অবতীর্ণ হইবে!—আত্মসংকোচনের মোহে, অধ্যাত্মবাদের ছলনায় আর কি সে আপনাকে ছলনা করিতে চাহে না? জীবনকে সে কি স্বীকার করিবে, মনুর সঙ্গে একযোগে তাহার জীবনকে নূতন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে স্বীকার করিবে কি?—ইহাই তো জীবনের দাবি—অমিত তুমি তাহা মানো?

কিন্তু অমিত সাবধানে বলিল, ওদের ব্যবস্থাও হয়ত মনু সময় পেলেই করবে।—

সবিতা একটু তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, আমরাও ত আছি।

অমিত বুঝিল। বলিল, তোমার যে অনেক কাজ। কষ্ট হবে।

সবিতার দুই চক্ষুর মধ্যে অমিত পাঠ করিল যেন এক নিবেদন।

তাই সে নিজেই আবার বলিল, কিন্তু কাজকে ভয় কি, সবিতা? অভীঃ।

গোয়েন্দা আপিসের ফাইল আর দপ্তর, পার্শ্বে একজন গোয়েন্দা উপবিষ্ট। প্রত্যেকের কথা চলে সতর্ক; অমিতও কথাটা বলিল ঈষৎ লঘু স্বরে। কিন্তু সেই কথায়, দুইটি চোখের তারায় একটা নূতন কৃতজ্ঞতা ও নূতন সংকল্প যে ঘনায়িত হইয়া উঠিল, তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না। অভীঃ, অভীঃ, অভীঃ। আর কোনো কথার প্রয়োজন আছে কি, অমিত? কোনো কথার আর সার্থকতা থাকিতে পারে সবিতার জীবনে?

সাক্ষাতের সময় শেষ হইতেছে। বিজয়ের সহিত উঠিতে উঠিতে অমিত বলিল: তুমিই দেখবে তবে এবার থেকে মনুকেও। দেখবে?—

দাঁড়াইল সবিতা: নিশ্চয়ই। সে আমার পুরানো বন্ধু। এক সঙ্গে দু'জনা পড়েছি। আমি তাকে দেখব।

অমিত দাঁড়াইয়াছিল; সবিতাও থামিল। সে চক্ষে কি আর একটা ক্লান্ত বিনীত স্বীকৃতিও দেখিল অমিত? তাহা হয় না, তাহা হয় না। সবিতা তাহার জীবনকে, তাহার ভাঙা-চোরা জীবনকে—জোড়াতালি দিয়া বাঁধিতে চাহে না। যাহা হারাইয়াছে তাহাকে সে পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে না। যাহা হারাইয়াছে—তাহা হারাইয়াছে বলিয়াই সে স্বীকার করিবে; হারানোকে স্বীকার করিতে সে ভয় পায় না। সে ভয় পায় না, সে জয় চায় না—এই ত তাহার অনাসক্তি যোগ। তাহাই সে গ্রহণ করিবে। গ্রহণ করিবে তাই মনুর ভার, আর অনুর কাজও;—আর গ্রহণ করিবে জীবনকে—সহজ জীবন নয়, মহৎ জীবনকে। সবিতা-মনুর মিলিত সংসার? না, সবিতা-মনুর জীবন ও শ্যামল-অনুর জীবন?—যে জীবনে আছে জীবনের বিস্তার—গৃহধর্ম নয়, কর্মযোগ—'বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় চ'।

গোয়েন্দা অফিসার সহকর্মীকে বলিল, ওঁর সঙ্গে যাও, ফটক খুলে দিতে বলো।

সবিতা শেষবারের মত বিজয়ের মাথায় হাত রাখিল। বলিল, অমিদা'কে বলেছ তোমার কথা? বলো নি? তা হলে এতক্ষণ বললে না কেন আমাকে? ওঁকে জিজ্ঞাসা করতাম।—

বিজয় বাধা দিয়া বলিল, ঠিক হোক, তখন বলবই।

সবিতা কি ভাবিল, শেষে বলিল, যা'ই হোক বিজু, আমি ভয় পাই না।

বিজয় তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফটক পর্যন্ত চলিল।

'আমি ভয় পাই না',...ভয় পাইবে না কিসে? জীবন স্বীকৃতিতে? সহজ জীবন স্বীকৃতিতে, না মহৎ জীবন স্বীকৃতিতে—না দুইয়েতেই? মনুর সহিতও কি সবিতা মিলিত হইবে?...

আমাকে চিনতে পারলেন না বোধহয়, অমিতবাবু?

কে?—অমিত পিছনে ফিরিয়া দেখিল সেই গোয়েন্দা অফিসার ভদ্রলোক, তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজেই সে বলিল আবার, আমি চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী...

অমিতের মনে পড়িতেছে না তথাপি। চন্দ্রকান্ত জানাইলেন, আপনাকে একবার এ আপিস থেকে আমি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলাম—সে দশ বৎসর হবে প্রায়...

ওঃ। অমিতের মনে পড়িল, সেই গোয়েন্দা যুবক—স্পোর্ট্‌স্‌ম্যান বলিয়া যে চাকরি পাইয়াছিল, খেলার কথায় ছিল তখনো উৎসাহ...সেদিনের কথা অমিতের মনে ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছিল।

অমিত বলিল, দেখুন, ভাবিই নি আপনি আছেন এখানে! তা এখন আপনি কী পদে?

ইন্‌স্পেক্টরের কাজে প্রমোশন পেয়েছি গত আগস্টে। দপ্তরে ফাইলে ঝাড়ি। অনেকে এ বিভাগ ছেড়ে দিলেন, তাতেই একটু সুবিধা হল। ডি. সি. বললেন—'ইন্টারভিউ নাও'। সবিতা দেবী যখন বললেন আপনার সঙ্গে দেখা করবেন উনি, কিছু ফলটল নিয়ে এসেছেন, তাতে মিছা বাধা দেবার আমার কি?

চন্দ্রকান্ত অমিতের পরিচয়কে মনে করিয়া রাখিয়াছে, আর তাই অমিতের সঙ্গেও সবিতার সাক্ষাৎ হইয়া গেল।...কোন্ দশ বৎসর পূর্বেকার আধঘন্টার বা পনের মিনিটের একটি মানবীয় পরিচয়ও এই গোয়েন্দা দপ্তরের ধরা-বাঁধা নিয়ম ও দুর্মতিকে ছাড়াইয়া উঠে—এই নয়া স্বাধীনতার এত পরিবর্তনের এপারে আসিয়াও পৌঁছে, যখন ভুজঙ্গ সেন পাইলে তোমাদের গুলি করে, আর মিসেস সেনরায় হন স্বাধীনতার বড় কংগ্রেস-কর্ত্রী—তখন চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী—আই. বি. ইন্‌স্পেনার অব পুলিশ, কলিকাতা স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের,—সে আবার তোমার পরিচয়কেও মনে করে একটা স্মরণীয় জিনিস, গর্বের কথা।...

অমিত সহাস্যে বলে, খেলা-টেলা আছে ত এখনো, চন্দ্রকান্তবাবু?

খেলা? সে কবে শেষ হয়ে গিয়েছে, অমিতবাবু। আপনিই দেখি তবু মনে রাখেন—আমি একদিন ছিলাম স্পোর্টস্‌ম্যান।

অমিত বলিল, খেলা যে আশ্চর্য জিনিস। মস্কো 'ডাইনেমোর' কথা ত' শুনেছেন। 'স্পোর্ট্‌স্‌ প্যারেড' দেখেছেন? দেখে আস্‌বেন—সিনেমায় মস্কোর 'স্পোর্ট্‌স্‌ প্যারেড্‌'। মনে হবে—হয় আপনার জন্মানো উচিত ছিল অ্যাথেন্‌সে, নয় এ যুগের এই নতুন অ্যাথেন্‌স মস্কোতে—তা হলেই স্পোর্ট্‌স্‌ম্যানের জীবন সার্থক।

কেমন একটা সস্মিত কৃতজ্ঞতা গোয়েন্দা ইন্‌স্পেক্টার চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর মুখে। আর সে খেলোয়াড় নাই, শরীর ভারী হইয়াছে, মাংসল হইয়াছে, সুডৌল হইয়াছে, একটা নিশ্চলতার ছাপ পড়িতেছে তাহার শক্ত মজবুত দেহে। তবু এই অমিতবাবু,—এত বৎসর পরেও মনে করিয়া রাখিয়াছেন একদিন সে চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীও ছিল স্পোর্ট্‌স্‌ম্যান। সে খেলিত...একদিন সে ভালো খেলিত—সে পরিচয়টা চন্দ্রকান্তের মনেও আজ জীয়াইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু বিজয় আসিয়া গিয়াছে। হাঁ, চন্দ্রকান্তও বিদায় লইবে। অমিত বলিল, একটি ছেলে হয়েছিল না আপনার তখন?—সেদিন যেন কি কাজ ছিল তার? কেমন আছে সে? আর ছেলেপিলে কি আপনার?

চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী সপুলক আনন্দে বলিলেন, আপনার তাও মনে আছে? হয়ত তার ভাত সেদিন। এখন সে ইস্কুলে পড়ছে। আরও দুটি মেয়ে, একটি ছেলে হয়েছে।

হাঁ ভালো আছে সব। সবাই এখানে। আর কি, দেশ ত পাকিস্তান হয়ে গেল। যা বলেন, আপনারা লীডাররা আমাদের তুলে দিলেন লীগের হাতে; সর্বনাশ হল বাঙলা দেশেরই।...দেখুন এখন। আচ্ছা, নমস্কার। ফলমূল জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি ভেতরে।

চন্দ্রকান্ত বিদায় লইল। দশ বৎসর আগেকার পনের মিনিটের পরিচয় একটা নূতন আলোকে ভাঙিয়া চুরিয়া আবার নূতন হইয়া উঠিতেছে...মিথ্যাও নয় তবে সেই পনের মিনিট—সেই পরিচয়—সেই মানুষ...

বন্দিগৃহের দিকে ফিরিতেছিল তাহারা দুইজনে। বিজয় ধীরে ধীরে বলিল, মাসী এবার এগিয়ে এলেন, অমি'দা'।

" তোমারও তাই মনে হল, না?—আসতেই হবে, বিজয়। জীবন সম্বন্ধে যাঁরা সীরিয়াস্ সাধ্য কি তাঁরা অস্বীকার করবেন এই শতাব্দীর জীবন-পথ?

জীবন সম্বন্ধে যাহারা সীরিয়াস্...

পঁয়ষট্টিজনের সেই গৃহে পৌঁছিয়া গিয়াছে অমিত। প্রশ্ন আসিতেছে---বিজয়কে ঘিরিয়া ধরিয়াছে দিলীপ, মঞ্জু, বিজয়ের বন্ধুরা। হর্ষোৎসবও পড়িয়া গিয়াছে—খাবার জিনিসপত্র দিয়া গিয়াছে নাকি বিজয়ের মাসী। সেই সবিতা রায়? হাঁ, হাঁ, সেই খাদি গ্রুপের সবিতা রায়? সুজাতার বিস্ময় আর কৌতুক একই সঙ্গে ফুটিয়া উঠে।

গান্ধীপন্থী সবিতা রায়—কিন্তু জীবন সম্বন্ধে সে 'সীরিয়াস্'। জীবনে যে সীরিয়াস্ সে কি করিয়া নিজেকে বঞ্চিত করে? জীবন সম্বন্ধে যে সীরিয়াস্ সে কেন আত্মপ্রকাশে এতটা থাকে সংকুচিত? হ্যাঁ, সংকুচিত সে, তথাপি জীবনে মহৎ প্রকাশের অভিযানে সে চলিল আজ আগাইয়া। না, ইহাও তাহার আপনার হইতে আপনাকে গোপনেরই একটা পন্থা? 'এস্‌কেপ্ ফ্রম লাইফ্'। প্রকাশের পন্থায় মিশাইয়া যায় সবিতার পলায়নেরও পন্থা। 'আমি' আমি হইতে পারে না—তাই 'বড় আমি'ও হয় না।

অন্ধকার হইতেছে। ঘরের এক কোণে এবার চুপ কবিয়া বসিল অমিত। এমনি সময়ে কাল ইন্দ্রাণীর জন্য সে অপেক্ষা করিতেছিল তাহার গৃহে। আর আজ এই মুহূর্তে ইন্দ্রাণীকে তাহার মন হইতে দূরে সরাইয়া রাখাও সম্ভব হয় না। এই শতাব্দীর জীবন-পথ আত্মনিগ্রহে নয়, বুঝিয়াছিল ইন্দ্রাণী। বিদ্রোহেও নয়,—বুঝিয়াছে তাহা সবিতা—বোঝে নাই যাহা ইন্দ্রাণী?—আর কি বুঝিবার সময় পাইবে, অমিত? পাইতে হইবে, পাইতে হইবে।

গ্রামোদ্যোগ আর বুনিয়াদি শিক্ষা লইয়া মনে মনে সবিতা পূর্বেই সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিতেছিল—তাহাতে ভুল নাই। ইহা ত মানুষকে আফিম্ খাওয়ানো। বুঝিবার যেটুকু বাকি ছিল তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে এই কয় মাসের স্বাধীনতার ফলে—গ্রামোদ্যোগীদের বাণিজ্যোদ্যোগ দেখিয়া আর হোমরা-চোমরাদের কংগ্রেসাগ্রহ দেখিয়া।

মোড় ঘুরিতেছে তাহার কাজের, মোড় ঘুরিল তাহার পথের। সে পথটা সে জানিত 'বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় চ'। কিন্তু জানিত না বহুজনের সেই পথ

চলে আমাদের সংগ্রাম-ক্ষেত্রের দিকেই; অথচ সবিতা চলিতে চায় সংগ্রাম হইতে দূরে দূরে নিভৃতে নিরালায়, ছায়ায় ছায়ায়। আজ সেইপথ তবু সবিতাকে শত সহস্রের কোলাহলমুখর যুগান্তরের এই পথের উপর আনিয়া ফেলিল। চিরদিনের ভয় কাটাইয়া, সংকোচ কাটাইয়া, সবিতা—আত্মগোপন যাহার ধর্ম, আত্মবিলোপ যাহার নিয়ম—একা আসিয়া দাঁড়াইল এই গোয়েন্দা আপিসে তোমাদের সাক্ষাৎপ্রার্থিনী—শুধু কি বিজয়ের মায়ায়? শ্বশুরের পরিচয়ে দেখা করিয়া গেল সে অমিতেরও সহিত, শুধু কি অমিত-মনুর প্রীতি প্রেমে? দেহের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন স্বচ্ছন্দ নির্ভর সবিতা বুঝি আর কোনো দিন ছিল না। তথাপি নিজের ভাগ্য লইয়া বোঝাপড়া করিতেও চায় না হয়ত সবিতা—জিনিয়া লইবার লোভ নাই আর কিছু। অনেক আগাইয়াছে সে, আরও আগাইবে—আরও।

তথাপি সবিতা বিশ্বাস করিত অহিংসায়, সত্যাগ্রহে। তাহা যে ভারতবর্ষের চিরকালের কথা। শুধু তাই বলিয়াও নয়—উহা যে সবিতার জীবনের সম্মুখে তাহার নিয়তির নির্দেশ। না হইলে বিধাতা তাহাকে যৌবনের প্রারম্ভেই এমন রিক্ত করিলেন কেন? তাই সবিতা মানিয়া লইয়াছিল এই আত্ম-সংকোচনেই তাহার সার্থকতা। মনুকে সে ভালোবাসিয়াছে—নিজের অগোচরে ভালোবাসিয়াছে; আর মনুও তাহাকে ভালোবাসিয়াছে—নিজের অজ্ঞাতে। সেই ভালোবাসাকে সে স্বীকার করিল আজ; কিন্তু স্বীকার করিবে এই পৃথিবীর কর্মোদ্যোগের মাঝখানে। স্বীকার করিবে তাহা মহৎ জীবনের পাথেয় রূপে, সহজ জীবনের উপকরণ রূপে নয় কেন?...

অনেক সংগ্রামে সবিতা জয়ী; কিন্তু বিজয়িনীর বৈভব সে চাহে না। জয়ের উন্মাদনা নাই তাহার; পৃথিবীর বিরুদ্ধে তাহার নালিশ নাই, ভাগ্যের বিরুদ্ধেও সে চাহে না নূতন অভিযান। ..

অনেক আগাইয়াছে—কিন্তু সে চাহে না আত্মোন্মোচন। তার মান আছে, লজ্জা আছে, ভয় আছে,—হয়ত তাহাও খসিয়া যাইবে একটু একটু করিয়া। তবু সবিতার মনে থাকিবে ভারতীয় ঐতিহ্যের সূক্ষ্ম-স্থূল, বাস্তব-কাল্পনিক, বহু বহু মানসিক-আধ্যাত্মিক বন্ধন।

সে ইন্দ্রাণী নয়---বিজয়িনীর অভিযান চাহে না।...সে ইন্দ্রাণী নয়—বিদ্রোহের মিথ্যায় তাই সে দিগ্‌ভ্রান্ত হইবে না। বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় চ তাহার জীবন—

আর তাহাই ত এই জনতার মহাপথ, না অমিত?

সাত

জ্যোতির্ময় সেন অমিতের কাছে আগেই আসিয়া বসিয়াছিল। কী যেন বলিতে চাহে, এতক্ষণ বলে নাই, এবার বলিল, শুনলাম কাউকে ছাড়ছে না—

দুজনে একসঙ্গে জেলে ছিল অতীতে, একসঙ্গে চলিয়াছে এই পথে। জ্যোতির্ময় অভিজ্ঞ কর্মী, অমিতের স্নেহভাজন।

অমিত বলিল, অন্তত আপাতত।

জ্যোতির্ময় বলিল, আপনার কি মনে হয়—এইভাবে কতদিন রাখবে?

এবার? এবার কি 'শেষ যুদ্ধ শুরু আজ, কমরেড্'। তা হলে হয় আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করব, নয় আমরা রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে নগণ্য হয়ে যাব।

সে ত দুই চরম অবস্থার কথা বললেন। শেষ যুদ্ধের পূর্বেও যুদ্ধ থাকে—আবার, তা থামে যেমন ওরা বুঝবে—এভাবে, আমরা নিঃশেষ হব না। আমরা ত বুঝছিই—আমাদের সংগঠন দুর্বল। ডিসাইসিভ্ অ্যাক্‌শান-এর অনেক দেরি। প্রস্তুতির সময় চাই—ততক্ষণ একটু চুপচাপ কাজ করি না কেন আমরা।

অমিত বলিল, সম্ভবত আর তা সহজে পাব না—এ স্পেক্‌টার ইজ্ হন্টিং দি ওয়ার্লড্। ডিসাইসিভ্ অ্যাক্‌শানও ধাপে ধাপে আসে। তবে সর্বত্র নয়, সমস্ত ফ্রন্টে সমান জোরে তা বাধে নি এখনো; শেষ হতে দু-এক শতাব্দীও লাগতে পারে।

জ্যোতির্ময় সেন একটু চুপ করিয়া রহিল। বলিল, আপনার কি মনে হয়—জেলে বসে থাকাটা ঠিক হবে? বাইরে আমাদের কাজ তত এগিয়ে গিয়েছে কি?

অমিত হাসিল।—পাগল! কাজের এখনো কি?

ওঁরা বলছিলেন—আমরা যারা পাকিস্তানে ছিলাম তাদের দরখাস্ত করে, মামলা করে বেরিয়ে যাওয়া দরকার—'আমরা পাকিস্তানের লোক, ইণ্ডিয়ান ডোমিনিয়ন আমাদের ধরে রাখবে কেন?' কাজটা কি ঠিক হবে?

অমিত বুঝিতে পারে না :—আপত্তি কি?

কেমন 'আবেদন-নিবেদনের' ভাব আছে না কথাটায়?

থাকলই বা?—

কিন্তু জ্যোতির্ময় শুনিয়া খুশি হইল না, চুপ করিয়া রহিল। তারপর আবার বলিল—অনেকটা নিজের কাছেই বলিতেছে হয়ত,—ঠিক কথা। কিন্তু পাকিস্তানের হাতে ওরা আমাদের দিলে ত আরও বিপদ। তারা ছাড়বেই না!...তা ছাড়া, ছাড়লেই বা আমি পাকিস্তানে যাই কি করে? থাকি কোথায়?...করব কি? মিনতি এখানে, তার নিজেরও অসুখ। শেষ পর্যন্ত তা টি. বি.-ও সাব্যস্ত হতে পারে। কোথায় রাখব ওকে জানি না। মেয়ে দুটোও তো আছে। টাকাই বা কোথা?...এতদিন শ্যালা ছিলেন, শাশুড়ী ছিলেন।—শহরে ছিল শ্যালার সাইকেল ও ইলেক্‌ট্রিক গুড্‌সের দোকান। একসময়ে রাজনৈতিক কাজকর্ম করতেন মিনতির দাদাও, কাজেই বোনের ভারও বহন করতেন, আপত্তি করেন নি, আমারও এতদিন ভাবতে হয় নি। মিনতি আমাদের বাড়িতে থাকত না, থাকত ওর দাদার কাছে; সেখানেই পার্টির কাজকর্ম করত। আমাদের দেশের বাড়িতে ত আর যাবার উপায় নেই। দাঙ্গার পরে পাড়া-প্রতিবেশী সবাই তা ছেড়ে এসেছে। সেখানে মিনতি থাকবে কি করে একা মেয়ে দুটি নিয়ে? ঢাকায় ওদের ব্যবসাও আর চলে না—ভদ্রলোকরা চলে এল, শহরের খরিদ্দাররা কমে গেল, মুসলমানরা নূতন আসছে

সেই পাড়ায়, এখান থেকেও মালপত্র যায় না ; কাজেই ব্যবসাপত্র বিক্রি করে মিনতির দাদা চলে এসেছেন। তাঁদের বাড়িও অমনি নিয়েছে পাকিস্তানীরা, গোড়ের ওদিকে একটা কাঁচা বাড়িতে আপাতত দুটো ঘর নিয়ে তিনি আছেন। কি করবেন ঠিক নেই...টাকাকড়ি শেষ হয়ে আসছে—দু'চার মাস আর চলবে হয়ত...

শত-সহস্র পরিচিত কাহিনী আর বহু পরিচিত দৃশ্যের মতই একটি কাহিনী। ভদ্রলোকের রাজনীতি মূঢ়ের মত দেশবিভাগের জন্য মাতিয়া উঠিয়াছিল, আর পরমুহূর্তে পূর্ববাঙলায় মেরুদণ্ড ভাঙিয়া ধ্বসিয়া গিয়াছে। জনতা হইতে বিচ্ছিন্ন রাজনীতি শুধু বিদেশী-বিরোধের উপর আপনাকে পুষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু আজ পূর্ববাঙলার বাস্তুহারা বিহারী-পাঞ্জাবী শোষক সেখানকার জনতার চক্ষে স্বজাতীয়, কারণ সব মুসলমান। হিন্দু ভদ্র-সন্তানের স্বাধীনতার রাজনীতি এখন একেবারে ফাঁকা...অথচ তাহাদের সাহসের অভাব ছিল না, ত্যাগের অভাব ছিল না ; সত্যই বীর্যময় মহৎ প্রকাশের আশ্চর্য প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে সেই পূর্ববাঙলার জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরা—সূর্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। আর আজ দেশ ছাড়িয়া পলাতক, পথে পথে অন্নহীন বস্ত্রহীন অসহায় মেরুদণ্ড-ভাঙা পূর্ববাঙলার সেই নর-নারী। জ্যোতির্ময় সেন-মিনতি সেন আর আজন্মের কর্মক্ষেত্রে দাঁড়াইবার মত ঠাঁই পায় না। জ্যোতির্ময়ের মেরুদণ্ডও বুঝি তাই খাড়া থাকিতে পারে না।

অমিত শুনিতেছিল : মিনতির মা কিছুতেই যাবেন না পাকিস্তানে। মিনতি যেত,...আমাকেও যেতে দিতে আপত্তি করত না,—নিজের শরীরের এ অবস্থায় গিয়েই বা সে কি করবে?...সংসারে যে অবস্থায় পড়েছি, আমিই বা গিয়ে করব কি পাকিস্তানে?—রোজগার করতে হলে কলকাতাতেই থাকতে হয়...হাঁ, পাকিস্তানে কাজ করতাম ঠিক। ও'রা বলছেন, সেখানেই থাকো। কিন্তু ওরা বুঝছেন না সেখানে আমি যাই কি করে এখন?...মেয়ে দুটো আছে। আপনাকেই বলছি রোজগার না করলে আর চলে না। মিনতিকেই কি বুঝোতে পারি আবার ফিরে যাবার কথা? আসলে ওর টি.বি. নাও হতে পারে। ওর কেমন বিশ্বাস শক্ত কিছু একটা অসুখ ওর হয়েছে। কিন্তু ডাক্তার দেখাতে চায় না। আর আমি কাছে না থাকলেই গোলমাল বাধায় ; কারো কোনো কথা শুনবে না। করি কি এখন?—এ অবস্থায় ওকে ফেলে পাকিস্তানে যাই কি করে?—মাস্টার সাহেব এসব বুঝতে চান না—বললেন, 'যাদের সঙ্গে কাজ করেছেন তারা এখনো সেখানে—পূর্ববাঙলার কৃষক। আর আপনি থাকবেন এখানে?'

অমিত বুঝিতে পারে। হয়ত সমস্যা অন্য দিক হইতেও আসিয়া দেখা দিয়াছে জ্যোতির্ময়ের জীবনে। সেই তপনের সমস্যা। তবে তপন দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—দাঁড়াইয়া না গেলেও ক্রমে দাঁড়াইয়া যাইতে পারে। দেশলক্ষ্মীর মজুরের ভাগ্যের সঙ্গে তাঁহার জীবন মিশিয়া যাইতেছে—অবশ্য কে বলিবে তাহা কত দিনের জন্য? ...জ্যোতির্ময় সেনের জীবনও ত মিশিয়া গিয়াছিল পূর্ববাঙলার মানুষের সঙ্গে। জেল খাটিয়াছে সেদিনে জ্যোতির্ময়, কাজে লাগিয়াছে আবার। দশ বৎসর এমন

আন্দোলন নাই যাহাতে জ্যোতির্ময় তাহার জেলায় অগ্রণী হয় নাই। মিনতিও ছিল তাহার সঙ্গী।...তবু এই ত আজ ভাঙিয়া পড়িতেছে মিনতি, মেরুদণ্ডে ঘা খাইয়াছে জ্যোতির্ময়।...আর পারে না যেন সে।' শক্ত আমরা কতটুকু? ততখানিই আমরা শক্ত যতখানি শক্ত জনতার আন্দোলন। দেশবিভাগে বাঙালী জাতির মেরুদণ্ডই সেইজন্য ভাঙিয়া যাইবার কথা। তথাপি সে মেরুদণ্ড খাড়া হইবে। কারণ, সাধারণ মানুষের মৃত্যু নাই...'ওরা কাজ করে',...তবু বাঙলা দুইখণ্ড, দুই বাঙালী জনগণের জীবন আপাতত খণ্ডিত। দুই বাঙলার জনতা ক্ষেম বিমূঢ়, খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে জ্যোতির্ময়, তাহার যে এখন সেখানকার জনতার আন্দোলনের মধ্যেও আশ্রয় নাই। করিবে কি সে আজ? আবার ঘরে মিনতিও তাহাকে আজ খণ্ডিত করিয়া ফেলিতেছে। ক্লান্ত, ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত। জ্যোতির্ময়ের চোখ-মুখে যেন এই ক্লান্তি-কাতরতা দেখিতেছে অমিত। কি উত্তর দেবে জ্যোতির্ময়কে? ফিরিয়া যাক—রাজনীতির নির্দেশ। কিন্তু মানুষের একটা প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত জীবনও ত আছে—স্ত্রী-পুত্র-কন্যা—ভরণ পোষণ—তাহার দাবি কে মিটাইবে? রাজনীতি কি তাহা অস্বীকার করিতে পারে—এইসব সমস্যা?

অনেকগুলি কণ্ঠে কি হর্ষোচ্ছল এত কথাবার্তা? বন্ধ হয়ে গিয়েছে—'হাঁ, দু'সেক্‌সান---সাউথ্ ও নর্থ।' 'ইন্‌কেলাব জিন্দাবাদ'।

'ট্রামে হরতাল হয়েছে।'...

এই ত একটা উত্তর সমুত্থিত হইল। 'বাহাদুর ট্রাম কা মজদুর' জ্যোতির্ময়ের প্রশ্নের উত্তর যোগাইতেছে বুকের উপর। কিন্তু উত্তর পড়িতে পারিতেছে কি জ্যোতির্ময়?

'দুনিয়া কি মজদুর এক হো!'

ঠিক বুলকন, ঠিক। ভারতের মজদুর, পাকিস্তানের মজদুর এক হইবেই।... কিন্তু ততক্ষণ জ্যোতির্ময় মিনতির কি হইবে?...

বিজয় বলিল, সবিতা মাসী বলেছিলেন---'ট্রাম ত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাসেই যাব।' তখন বুঝিনি তাঁর কথার অর্থ।

সবিতার মনেও তাহা হইলে ঢুকিয়াছে এই উত্তরের প্রতিধ্বনি। শোনো, জ্যোতির্ময়-মিনতি, শোনো তোমরাও...এই কথাটা।

তথাপি বৃহৎ কিছু এখনি হইবে না,—অমিত মনে করে এখন-এখনি বৃহৎ কিছু হইবে না। জনতার জাগরণ চাই। তাহারা প্রস্তুত নয়,—মালিকেরা প্রস্তুত। মাউন্টব্যাটনী স্বাধীনতার মোহে দেশ এখনো প্রভাবিত। ভরসা—পৃথিবীর বিপ্লবী চেতনা—তা বাড়িতেছে। কিন্তু সময় লাগিবে---সময় লাগিবে, বিজয়। তবে 'শেষ যুদ্ধ শুরু আজ' এশিয়ায়ও, যদিও জয় অনেক দূরে।

বিজয় বলিল, কিন্তু এই সময়টা কি আমাদের জেলেই কাটাতে হবে বসে বসে?

বসে বসে কাটাতে হবে কেন? যুদ্ধ সেখানেও আছে। বরং জেলে যুদ্ধ লেগেই থাকবে। সময়ই পাবে না। আর সময় যদি পাও—তাহলে লিখবে,

পড়বে। কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতাকে—বিচারে চিন্তায় আপনার করে নেবার অবকাশ পাবে লিখে, যাচাই করে। এই ত সময় পেলে। আর তোমার ত কথাই নেই—একটু হাসিয়া বলিল অমিত,—কাগজ আছে, কলম আছে, লিখবে কবিতা, সাহিত্য; গ্রো মোর সাহিত্যিক ফুড, ইঞ্জিনীয়ার্স অব হিউম্যান্ সোল্।

আসলে পরিহাস করে নাই অমিত। বিজয়ও পরিহাস মনে করে না। লিখিতে হইবে, না হইলে বসিয়া থাকিয়া ব্যর্থ হইবে বিজয়। লিখিবে বলিয়াই ত সে খেলা, ফোটো তোলা ছাড়িয়া এই কর্মস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা না হইলে লিখিবে কি? কী জানে সে? ভদ্র অবস্থাপন্ন বাঙালী পাড়ার ভদ্রলোকের জীবনযাত্রা, কলেজে-ইউনিভার্সিটির কোলাহল-মুখর ছাত্র-ছাত্রী, তাহাদের বামপন্থী তর্ক কিংবা সাধারণ নিরপরাধ প্রেম-গুঞ্জন,—ইহাই ত বিজয়ের অভিজ্ঞতার জগৎ। অবশ্য তাহার দৈহিক দুর্বিপাকের পরে তাহার সেই বন্ধুরা একটু দূরে দূরে থাকে। কিন্তু এই শিক্ষিত বাঙালী যুবকের জগৎ কতটুকু? আর কতখানি ইহার মূল্য? অবশ্য দূরে মানব-সমুদ্রের গর্জন বিজয় শুনিতে পায় ইহার মধ্য হইতেও। আজ কলেজে ধর্মঘট, কাল গুলির সামনে দাঁড়াইয়া ভাগ্যের মোকাবিলা করা, পরশু উনত্রিশে জুলাইর জন-প্লাবনে অনুভব করা জীবনের জোয়ার,—আবার হিন্দু-মুসলমানের রক্তারক্তি, দেশবিভাগ, মিথ্যার আস্ফালন: বিজয় লিখিতে গিয়া লিখিতে পারে না—কবিতাও যেন ইশ্‌তেহার হইয়া উঠিতেছে। এই বিরাট মন্থনের সত্যকে সে কি তবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই? না। বুঝি সে প্রত্যক্ষও করিতে পারে না। উহাকে আপনার করিয়া লইতে হইলে আপনাকে উহার মধ্যে মিলাইতে হইবে। বিজয় সেই আত্ম-নিবেদনের পথেই অগ্রসর হইতেছিল দৃঢ় মৌন আগ্রহে—কিন্তু জানিয়াছে কি সেই সত্যকে? এখনো যে এই অভিজ্ঞতা ছাপাইয়া তাহার অন্তরের তলে জাগে সুন্দরের স্বপ্ন, আনন্দের আমন্ত্রণ, আর প্রেমের স্পর্শ।...প্রেম আসিয়া প্রাণে হানা দেয়, মন প্রেমের কবিতা লিখিতে চাহে।

বিজয় তাই হাসিয়া বলিল, কি দেখেছি, কি জেনেছি যে লিখব? ইনিয়ে বিনিয়ে মধ্যবিত্তের প্রেমের কবিতা লিখব? তা লেখা চলে আর?

অমিত হাসিয়া বলিল, প্রেম কিন্তু বড়লোকেরও নয়, মধ্যবিত্তেরও নয়,—মানুষের। প্রেমের কবিতাও সর্বকালেই লেখা চলবে। কারণ প্রেম সর্বকালেই থাকবে। তবে প্রেমেরও রূপ বদলায়, প্রেমের কবিতার রূপও বদলাবে। একালে মানুষের প্রেম যে রূপ নিচ্ছে সেটা হয়ত কবি দেবেন্দ্রনাথেরও ধারণা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য দিয়েও তাকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারি না। তবু তা প্রেম, হয়ত গতিমান্ মানুষের প্রেম গতিধর্মে বারবার পাওয়া ও হারানো—

বিজয় বলিল: তবু যুগটা মোটামুটি প্রেমের কবিতার নয়, তা ত ঠিক?

অমিত তাহা মানে না। হয়ত যুগটা একান্তভাবে ব্যক্তি-মানসের উদ্বোধনের যুগ নয় বলিয়াই বিজয়ের এইরূপ মনে হয়। কিন্তু কোনো বড় কবিতাই ত আসলে ব্যক্তির কথা নয়। সত্যকার কবিতা সামূহিক অনুভূতির প্রকাশ, যুগের

সৃষ্টি-চেতনার উপলব্ধি কাব্যরূপের মধ্য দিয়া। এ যুগটা মানুষের কবিতার, নিশ্চয়ই প্রেমের কবিতারও। এ যুগটা জীবনের নবঅভ্যুদয়ের, অর্থাৎ সৃষ্টির; তাই সাহিত্য-সৃষ্টিরও। হয়ত আর একান্তভাবে তেমন লিরিক কবিতার যুগ থাকিবে না। আসিতেছে মহাকাব্যিক উপন্যাসের দিন। নিটোল-গল্পে সমাপ্ত নবেলের দিনও আর থাকিবে না। দুই-একজন নায়ক-নায়িকার কথা লইয়াও উপন্যাস আর সীমাবদ্ধ থাকিবে না। তাহা সামগ্রিক জীবন-ছিত্র, জগৎপ্রবাহের প্রতিকল্প হইয়া উঠিতেছে---দুইজন বা দুই'শ জনকে আশ্রয় করিয়া। তার রসটা মানব-রস। কিন্তু আসিতেছে সন্দেহ নাই---গাব্রিয়েল পেরির সেই 'সিংগিং টু-মরোজ'। বিজয়ও কবিতা লিখিবে, সাহিত্য লিখিবে। তাই কবিতার প্রাণবস্তু ও সাহিত্যের প্রাণবস্তু তাহাকে খুঁজিতে হইবে, জীবনকে বুঝিতে হইবে। দেখিলেই শুধু হইবে না, মর্মকোষে পৌঁছিতে হইবে। না বাইরের বাস্তব নয়, জীবন। জীবনকে কতটুকু দেখিয়াছে বিজয়? যুগজীবনের আশা-আনন্দের সঙ্গে আপনাকে কতখানি মিলাইতে পারিয়াছে?---তাহা না পারিলে যে তাহার কথা এ যুগের সৃষ্টির স্বাক্ষর বহন করিবে না। "জীবনে জীবন যোগ করা---না হলে,...ব্যর্থ হয় গানের পশরা..."

দুইজনায় কথা হইতেছিল। এদিকে কে একজন বলিল: সকলকেই নাকি জেলে পাঠাচ্ছে, থানা হাজতে কাউকে পাঠাবে না। অমিত শুনিল, বলিল, বাঁচা গেল। থানার হাজতগুলি নরককুণ্ড---অসম্ভব নোংরা।

কিন্তু আমাদের জিনিসপত্র এল না যে?---মেয়েদের কে একজন বলিল। বোধ হয় মঞ্জু। একটা শাড়ি ব্লাউজও সঙ্গে আনি নি,---বলিয়া বিজয়ের কাছে আসিয়া বসিল মঞ্জু।

বিজয় সরিয়া বসিল, হাসিয়া বলিল, চাও ত আমার একখানি ধুতি দিতে পারি, আর একটা হাফশার্ট।

ফাজলামো পেয়েছ? মাসীকে দেখে সাহস বেড়ে গিয়েছে।---কলহে প্রবৃত্ত হইল মঞ্জু।

বেইমান!---শোনা গেল ওদিকে বুলকনের গলা। হামলোগোঁসে ঠিকানা নিলে, লেকিন এক বহিন্‌কো, ভাইকো শাড়ি কাপড়া আনালে না। বেইমান্ ই লোগ্---মালিককা কুত্তা! আপ্‌লোগসে ভালো ভালো বাত্ বোলে, আপলোগ বোলেন---'ভদ্দরলোক'। বেইমান্ আউর দাগাবাজ, কুত্তা মালিককা।

তাহারা বুলকনের শ্রেণীশত্রু। বুলকন তাহাদের মুখের কথায় ভুলিবে না, তাহার কাছে ভদ্র-আচরণ প্রত্যাশাও করিবে না। রাজাই প্রত্যাশা করে রাজার কাছে রাজার ন্যায় আচরণলাভ---পরাজিত পুরুও তাহা প্রত্যাশা করে। দিক্-বিজয়ী সিকান্দরের নিকট, তাহা পায়ও। ভদ্রলোক আমরা, আমরাও প্রত্যাশা করি ভদ্র-আচরণ গোয়েন্দা অফিসারের থেকে, দিইও চা, পাইও। কিন্তু মজদুর বুলকন! সে ভদ্রতা চাহে না,---পায় না, গ্রহণও করে না।

কে কাছে আসিয়া বসিল—কখন বিজয় মঞ্জু তর্ক করিতে করিতে উঠিয়া গিয়াছে। অমিতের নিকট আসিয়া বসিয়াছে সুজাতা সেন—শ্যামলের আত্মীয় সুজাতা। বয়সে অবশ্য সে অনেক বড়, বিধবা নিঃসন্তানা বাঙলা দেশের প্রৌঢ়া না হতেই প্রায়-প্রৌঢ়া মেয়ে।

অমিতই প্রথম কথা বলিল, কি হবে এবার আপনাদের নার্সদের ধর্মঘটের?

মাসখানেক যাবৎ ছোট একটা ধর্মঘট চলিতেছে 'সেবিকা সংঘে'র নার্সদের। সুজাতার উপর তাহা পরিচালনার দায়িত্ব। সুজাতা বলিল, কি হবে, তাই বুঝছি না। অনেক দিন হয়ে গেল। আজ সাতাশ দিন—

অমিত বলিল না সে জানে। কাল রাত্রিতে ইন্দ্রাণী কী বলিয়াছে।

আপনিও ত জেলে চললেন—প্রথম যাচ্ছেন বুঝি?

হাঁ, প্রথম। কিন্তু সত্যই কি জেলে নেবে? ক্ষতি ত আর কিছু নয়—ঠিক এ সময়টা আপনি বাইরে থাকলেও হত, অমি'দা?

আমি? আমি কি করতাম, বলুন? আমি ত বাতিল মানুষ। অম্লশূল, স্বাধীনতা, দেশ-বিভাগ আর রক্তারক্তি'র টাল সামলাতেই বেসামাল।

না, আপনি বাইরে থাকলে কাজ হত অন্তত আমাদের।

কেমনতর?—উৎসুক হইল অমিত।

দিন তিনেক হল ইন্দ্রাণীদি' এসেছেন কলকাতা। আমার সঙ্গে তিনি দেখাও করবেন না। কিন্তু বোধ হয় ইন্দ্রাণীদি' চান—আপনি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। আপনি ধর্মঘটের একটা মীমাংসার কথা বললে নিশ্চয় তিনি তা রাখবেন। হয়ত তাই তিনি নিজেও চান—

অমিত হাসিল, আপনার এরূপ বিশ্বাস এখনো? 'সেবিকা সংঘ' থেকে ওঁর এখন এত লাভ—মাসে দেড়-দু হাজার টাকা নিশ্চয়ই মুনাফা তুলছেন।

তা তুলুন। কিন্তু আপনার কথা ইন্দ্রাণীদি' ফেলবেন না।

সুজাতা নীরব রহিল একটু। পরে বলিল, তাছাড়া, লোকে যাই বলুক —ইন্দ্রাণীদি'র আসলে টাকার প্রতি লোভ নেই। তবে ক্ষমতাপ্রিয় তিনি—ক্ষ্যাপা-মেজাজের, খামখেয়ালী। কিন্তু আমি অন্তত বলতে পারব না ইন্দ্রাণীদি' মন্দ মানুষ—লোকে যাই বলুক। ব্রজানন্দ পালিত একটা অন্যায় কাজও করাতে পারে নি ওঁকে দিয়ে। বরং অনেক মেয়েকে ইন্দ্রাণীদি' দুর্ভাগ্যের থেকে বাঁচিয়েছেন। ক্ষমতাপ্রিয় ইন্দ্রাণীদি', সকলেই ওঁর কর্তৃত্ব মেনে চলবে—এই হল ওঁর আসল কথা। ব্রজানন্দই হোক, আর যে-ই হোক। নইলে টাকার লোভী নন।—আর ভালোও বাসতেন আমাদের;—অন্তত আমাকে। তাই আপনি চেষ্টা করলেই এ ধর্মঘটের মীমাংসা হয়ে যায়। কাল পার্টি আপিসে এই কারণে আপনার জন্য আমি বসেছিলাম।

অদৃষ্টের লেখা—অমিত হাসিয়া বলিল। কাল সে আপিসে যাই-ই নি......

আরও পরিহাস অদৃষ্টের। এমনি সময়ে এমনি সন্ধ্যায় কাল অমিত ইন্দ্রাণীর

জন্যই অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল ইন্দ্রাণীর গৃহেই। আর আজ এই সময়ে সেই ইন্দ্রাণী হয়ত হাওড়ায়, চলিয়াছে দিল্লী। হয়ত মানব আসিয়াছে তাহার মাকে গাড়িতে তুলিয়া দিতে।...

দিলীপ দত্ত বলিত : মানব ছাত্র-আন্দোলনের মধ্য দিয়াই আসিয়াছিল সাম্যবাদের ও সাম্যবাদী দলের নিকটে। কিন্তু ইন্দ্রাণী অস্বীকার করিবে এই কথা : মানব তাহার মায়ের জীবনেই সাম্যবাদের দীক্ষা পাইয়াছে; বরং কমিউনিস্ট পার্টি তাহাকে সেই সুমহৎ উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে; তাই ইন্দ্রাণীকেও বঞ্চিত করিয়াছে তাঁহার জীবনের পরম সার্থকতা হইতে। মানব বিদ্রোহের শিক্ষা হারাইয়াছে—ঐ পার্টির কবলে পড়িয়া। কেহ না বলিলেও ইন্দ্রাণী জানে—সে পার্টির কবলে মানব পড়িল অমিতেরই জন্য—ইন্দ্রাণীরই আগ্রহে। তবে অপরাজেয়া ইন্দ্রাণী তাই বলিয়া পরাজয় মানিবে না কোনো পার্টির নিকট।

......মহাযুদ্ধের সূচনা সেদিন। একদিনের জন্য অমিত পৃথিবীর সমস্ত পরিচয়কেন্দ্র ত্যাগ করিয়া আশ্রয় করিয়াছিল ইন্দ্রাণীকে। পৃথিবীতে ইন্দ্রাণী ছাড়া এত সাহস কাহার আছে এই সময়ে তাহাকে আশ্রয় দেয়? আর, কাহাকে ইন্দ্রাণী আশ্রয় দিবে না—অমিতকে? ইন্দ্রাণী কোনো দলে বিশ্বাস করুক না করুক, বিশ্বাস করে বিপ্লবে। বিপ্লবের সেই জ্বলন্ত শিখাতেই সে নিজেকে পরিশুদ্ধ করিয়াছে। স্বামী ছাড়িয়াছে, গৃহ ছাড়িয়াছে, আরাম ছাড়িয়াছে, আলস্য ছাড়িয়াছে। ইন্দ্রাণী এই নার্সের জীবিকা লইয়াছে ; চাহিয়াছে জীবিকার্জনের স্বাধীনতা ; ইন্দ্রাণীর জীবনাদর্শে নারী-জীবনের আত্মবিকাশের প্রথম সোপান ইহাই। সেই সঙ্গে ইন্দ্রাণী আপন সন্তানকে মানুষ করিবার সাধনা লইয়াছে,—ইন্দ্রাণীর কাছে নারীজীবনের আত্মাধিকারের চরম পরীক্ষা তাহাতেই। আর ইন্দ্রাণী তাই লয় নাই—লইতে পারে নাই—রাজনৈতিক আন্দোলনের কোনো কর্মভার ; লয় নাই—লইতে পারে নাই—অমিতের সঙ্গে বিপ্লবের সহকর্মী হইবার দৈনন্দিন দায়িত্ব; লয় নাই—লইতে পারে নাই—পথে পথে অমিতের সহকারিণী হইবার স্বচ্ছন্দ অধিকার—একান্ত যে অধিকার ইন্দ্রাণীরই, আর কাহারও নয়—জানে ইন্দ্রাণী। সে অমিতের সহযাত্রিণী : তাহার সহকর্মী নয়, সহধর্মিণী। পৃথিবীকে বক্র কটাক্ষ করিয়াই সে ঘোষণা করিতে পারে এই সত্য। আপনার গৃহে তাই অমিতের সহযোগিনীদের সে আশ্রয় দিয়াছে, ভাবী কর্মিনীদের সাদরে গ্রহণ করিয়াছে, হাসপাতালে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে তাহাদের নানারূপ জীবিকাশিক্ষার সুযোগ, তারপর নিজ গৃহেই স্থাপন করিয়াছে আবার সেই নূতন শিক্ষিতা নার্সদের বাস-কেন্দ্র। এবং সেই সূত্রেই যুদ্ধমুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহার 'সেবিকা-সংঘ' ও এই 'সংঘারাম'—'নার্সেস্ হোম্' ও 'নার্সিং হোম্'।

সেদিন মহাযুদ্ধের প্রথম রাত্রি। 'স্টেট্‌স্ম্যানের' বিশেষ সংখ্যার বৃহদাকার 'দি ওয়ার' শব্দ দুইটি হাঁকিয়া হাঁকিয়া তখন চৌরঙ্গীর ফেরিওয়ালারা শ্রান্ত হইয়া নিজেদের বস্তির ঘরে শুইয়া পড়িয়াছে। রাত্রি বারোটায় অমিত ইন্দ্রাণীর ফ্লাটের দুয়ারে আসিয়া মৃদু করাঘাত করিল। কেহ বুঝি দেখিয়া ফেলিবে একটু জোরে

শব্দ করিলে। উত্তেজিত অমিত জানে---পৃথিবীর মহামুহূর্ত আসিতেছে। স্বগৃহে ফিরিলে হয়ত রাত্রিশেষে পুলিসেরই কবলে তাহাকে পড়িতে হইবে; আর জীবনের সুমহৎ পরীক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। কাহার নিকট অমিত আজ এইরাত্রে বিশ্রামের সুযোগ চাহিতে পারে? আর কাহার নিকট আজ বিশ্রাম গ্রহণ না করিলে অমিতের জীবনের নিগূঢ় লগ্নটি অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে?

ইন্দ্রাণী কিন্তু বিস্মিত হইল না। সে যেন প্রতীক্ষা করিয়াই ছিল। মানুর চোখের নিদ্রাও তখনি প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেল। কেহ আর ঘুমাইল না—অমিত নয়, ইন্দ্রাণী নয়, মানবও নয়। সারারাত্রি বসিয়া কিশোর মানব মায়ের আর 'অমিত কাকার' তর্ক শুনিল। ইন্দ্রাণী বোঝে না---কেন অমিতেরা কংগ্রেস নেতাদের পিছনে পিছনে চলিতেছে? উহারা ত বিপ্লবী নয়, বিপ্লবের শত্রু— মানুষের শত্রু। মানুষকে ইহারা মানুষের অধিকার দিতে চাহে না, শিখায় শুধু বশ্যতা। মন্ত্র পড়ে, টিকি নাড়ে, ধর্মের নাম করিয়া মানুষকে আরও অমানুষ করিয়া রাখিতে চাহে। ইহাদের সঙ্গে কোনো সম্মিলিত ফ্রন্ট্ গঠন করিয়া সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করা যায়, তাহা ইন্দ্রাণী মানিবে না।

সে বলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অপেক্ষা এ দেশের মানুষের বড় শত্রু বরং এই গান্ধীবাদ। কারণ, ইংরেজ শত্রুবেশেই এসেছে, গান্ধীজী এসেছেন গুরুবেশে। ইংরেজ চেপে বসেছে ঘাড়ের উপরে, গান্ধীজী আসন বিছিয়েছেন মনের উপরে।

অমিত তর্ক করিয়াছে,—ভুল তর্কও করিয়াছে। কিন্তু বুঝিয়াছে—কর্মক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া ইন্দ্রাণী আপনার তেজ ও সাহসের তীব্রতায় আপনি অধীর হইয়া উঠিতেছে। মতাদর্শকে কার্যে রূপান্তরিত করিবার মত অবকাশ না থাকিলে মতাদর্শই শুধু কাঁচা থাকে না, মানুষটিও হয়ত কাঁচিয়া যায়। সে মানুষ ইন্দ্রাণীর মত তেজস্বিনী ও মনস্বিনী হইলেও অধীরতায় বিভ্রান্ত হয়। না, অমিত শুধরাইতে পারিবে না তাহার ভুল; কিন্তু সে জানে ইন্দ্রাণী কাঁচিয়া যাইবে না—শত হইলেও সে ইন্দ্রাণীই থাকিবে।

কিন্তু মানু কী বুঝিল, বলিল, অমি'কা ঠিক বলেছেন।

ইন্দ্রাণী হাসিয়াছে। অমিতের বাহু স্পর্শ করিয়া সপরিহাসে বলিয়াছে, তবে আর কি, তোমারই জিত—তোমার দলে যখন আমার ছেলে। একি তার পরাজয়? পরাজয় মানিবে না ইন্দ্রাণী, সে শুধু মানুর মা নয়, সে ইন্দ্রাণীও। আর অমিত —মানবও তাহাকে স্বীকার করিয়া লইতেছে না কি? তবে—ইন্দ্রাণী হাত ছাড়িল না। শক্ত করিয়া ধরিল। একি তোমার পরাজয় ইন্দ্রাণী, না, জয়? মানবেরই বুঝি জয় আমাদের সকলের উপরে। অমিতেরও মনের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দেয়। অমিত-ইন্দ্রাণীর বন্ধন সে-ই পাকা করিতে চায়। অমিত হাত ছাড়িল না।

অপরাজিতা ইন্দ্রাণী তারপর যখন পার্শ্বের ঘরে আপনার বাক্স-পেটরা টুকি-টাকির মধ্যে মেজেয় শুইয়া পড়িল তখন তাহার দুই চোখ বাহিয়া জল—সে ইন্দ্রাণী, সে ইন্দ্রাণী। ওঘরে শয্যায় পাশাপাশি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে অমিত ও মানু!

অমিত ঘুমাইয়াছে কি? সম্মুখে যুদ্ধের পরীক্ষা—মিলনের রাত্রি তাহাদের মুখ চাহিয়া আছে—অমিত কি তাহা জানিত না?...ঘুম নাই চোখে। পূর্বের আকাশে মহাযুদ্ধের নূতন রক্তপ্রভাত আগাইয়া আসিতেছে—মানুষের শুধু নয়, অমিতেরও তাহা প্রতীক্ষিত বিপ্লবের মহালগ্ন। পুষণ! প্রণাম, প্রণাম...

ঊষার আলোকে হাতে-হাত রাখিয়া দুজনায় অর্ধস্ফুটস্বরে বলিল পুষণ! প্রণাম, প্রণাম। তারপর চক্ষে চক্ষু রাখিয়া অমিত বলিল, চলি। কোথায় কে থাকব তা'র ঠিক নেই—তবে 'তুমি আছ আমি আছি'—

ইন্দ্রাণী অস্ফুট স্বরে বলিল—আর থাকবে ইন্দ্রাণীর ভালোবাসা।

সেই রাত্রি হইতে মানব ছিল অমিতের দূত। গোপন সঞ্চরণের দিন তখন সমাগত, অমিতের গুপ্ত আশ্রয় হইতে গোপন সংবাদ সে বহন করিত মায়ের কাছে, অমিতের সহযোগীদের কাছে। ইন্দ্রাণী সগর্বে ভাবিত—মানব তার নিয়তির বাহন।

তারপর মহাযুদ্ধ মোড় ঘুরিল। ফাটল দেখা দিল অমিত-ইন্দ্রাণীর জীবনে। দুইজনে এবার যখন দেখা হইল তখন ভারতের বায়ুতে বায়ুতে কানাকানি : রেল্ লাইন উপড়াইয়া দিয়াছে, টেলিগ্রামের তা'র কাটিয়া ফেলিয়াছে, আগুন জ্বলিতেছে। ইন্দ্রাণীর চক্ষেও তখন একই সঙ্গে আগুন আ'র আবেগ : নেতারা জেলে রুটি-মাখন ধ্বংস করুক, কিন্তু জনতা নিয়েছে বিপ্লবের ভার। দেশকে আর কেউ এবার বাধা দেবার নেই--গান্ধীজী না, কংগ্রেস না। এসো, অমিত, এসো—অবিশ্বাস করো না অন্তত তুমি এই বিপ্লবকে এখন।

অমিত ভাবনায় বিধ্বস্ত কিন্তু কর্মক্রমে অটল : বিপ্লবের পথ সরলরেখায় নয়, ইন্দ্রাণী।

ইন্দ্রাণীর আবেগ, দৃপ্ত আত্মাভিমানে পরিণত হইল : বিপ্লবের পথ ইন্দ্রাণীর অত অপরিচিত নয়, অমিত।---একবারের মত তাহার কন্ঠ তীব্র হইল, তারপর আবার তাহা আপনার সরল স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকাশিত হইল। মুখে হাসি ফুটিল, চোখে ফুটিল ব্যক্তিত্বের জ্যোতিঃ। সেই সচেতন ব্যক্তিত্ব আপনাকে সচেতনভাবেই বিজয়-অভিযানে নিয়োজিত করিল; ব্যক্তিত্বময়ী ইন্দ্রাণী যেন আপনার ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে---অমিতের সম্মুখে নয়---কোন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির বিরুদ্ধে। সভ্যতাকে যে পুরুষ-স্বভাব সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া আপনার পুরুষ-হস্তে গঠিত করিয়াছে, আ'র বিমর্দিত করিয়াছে চিরক্রন্দ্যমান নারী হৃদয়কে,---তাহার সমস্ত সুকুমার বৃত্তি, মায়া মমতা স্নেহপ্রেমকে সম্মান করিতে ভুলিয়া গিয়াছে,---ইন্দ্রাণী কঠিন জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়া আপন সত্তায় সেই পুরুষ-কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জাগ্রত হইয়াছে। কিন্তু জাগিলেও শুধু আপন সত্তায় সে স্থির হইতে পারে কই? চির-প্রতিদ্বন্দ্বী সেই পুরুষকে টানিয়া আপনার কুক্ষিগত করিয়া না ফেলিতে পারিলে কোথায় ইন্দ্রাণীর নারীসত্তার স্বস্তি?---ভালোবাসায়ও ইন্দ্রাণী আত্মবিস্মৃতা নয়; ভালোবাসিয়াও ইন্দ্রাণী তাই আত্মাভিমানিনী।

ইন্দ্রাণীর দেহের উদ্ভাসে, মুখের উল্লাসে, চোখের দীপ্তিতে যেন এই কথাই ফুটিতেছে: তুমি, অমিত, তুমি,—ইন্দ্রাণী যাহার হাতে হাত মিলাইয়াছে,—অর্থাৎ ইন্দ্রাণীই যাহার কাছ হইতে আপন শক্তিতে আদায় করিয়াছে নিজের স্বীকৃতি—সেই তুমি, এই তেজোময়ী দীপ্তিময়ী নারীসত্তার সঙ্গে আপন সত্তাকে মিলাইয়া দিয়া কি সার্থক না হইয়া পারিবে আজ?—আজ, বিয়াল্লিশের বিদ্রোহাগ্নির সম্মুখে, ইন্দ্রাণী আপনার বাঁধা জীবন ও বাঁধা-সংসার পর্যন্ত বিপন্ন করিয়া তোমাকে ডাক দিতেছে সেই মহোৎসবে। তাহার সঙ্গে তুমি সেই অগ্নিদীক্ষা নিবে না? পারিবে এই অগ্নিময়ী নারীসত্তার সম্মুখে আনত না হইয়া?

ইন্দ্রাণীর চোখের এই দৃষ্টি অমিতের অচেনা নয়। এই তেজ, এই অগ্নিশুদ্ধ দীপ্তি, অমিতের চিরদিনের পরিচিত—সর্বক্ষণ স্বাগত। এই অপরাজেয় নারী-সত্তাকে স্বাগত করিয়াও সে গর্বিত। তবু অমিতের অগ্রাহ্য এই দৃষ্টি—এই মুহূর্তে। অগ্রাহ্য এই মুহূর্তে সেই আত্মসচেতনার সবল আহ্বান; অগ্রাহ্য এখন ইন্দ্রাণীর অহঙ্কারোদ্ধত সত্তার এই সমুদ্রোচ্ছ্বাস—অমিতের চির উদ্‌গ্রীব-সত্তার তটে।

নিয়তির মতই অনিবার্য নিয়মে বহিয়া গেল সে রাত্রির মিনিট, প্রহর। হাতে হাত, কিন্তু মন ও মত দূর হইতে দূরে তাহাদের রাখিয়া দিল। অহঙ্কার অভিমানে পরিণত হইয়াছিল, তারপর পরিণত হইয়াছিল অনুনয়ে: অমিত, তুমি দেশকে ভালোবাসো, ভালোবাসো দেশের স্বাধীনতা। আজ যখন তোমার দেশের জনতা বিপ্লবের মুখে তখন তুমি রহিবে কোন্ 'মস্কোর' চিন্তায় মগ্ন?

এ যেন অমিতের মনেরও একাংশের দাবি। অংশ, সামান্য না হতে পারে, কিন্তু ব্যর্থ সেই নিবেদন।

জটিল এ জীবন, ইন্দ্রাণী। জটিল কর্তব্য-সংকটে তবু পথ হারাইবে না অমিত। সে স্বদেশাত্মাকে দেখিয়াছে, দেখিয়াছে সে বিশ্বাত্মাকেও। আর সে জানিয়াছে—মানুষের ইতিহাসের বক্র-তির্যক পথে আজিকার মত এ দেশে করতালি পাইবে না অমিতরা। ইহাই তাহাদের বৈপ্লবিক বিধিলিপি এই মুহূর্তে, 'কলোনির' জীবনের এই বিয়াল্লিশের বিদ্রোহ-বিভ্রমে সে ইতিহাসের পক্ষে—যে ইতিহাস সময়ের সঙ্গে তাহার দেশকেও আগাইয়া দিবে।

অমিত বুঝাইতে চাহিল: এ দেশের জনতারও পথ, ইন্দ্রাণী, উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে জনযুদ্ধের পথে।

জ্বলিয়া উঠিল অনুনয় এবার বিদ্যুৎ-বজ্রে!—তুমি স্ট্যালিনিস্ট, অমিত? মস্কোর ক্রীতদাস।

আমি স্তালিন-পন্থী যতক্ষণ স্তালিন ইতিহাসের পক্ষে—আর আমি ইতিহাসের ছাত্র, ইতিহাসের দাবি মানতে বাধ্য।

ইন্দ্রাণীর ঠোঁট কাঁপিতেছিল, কথা ফুটিল না। কিন্তু কি যেন একটা বুকের মধ্যে ছিঁড়িয়া যাইতেছে। সে চোখ বুজিয়া রহিল, নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিল।

তারপর অনেকক্ষণ পরে চোখ খুলিয়া হাসিল—যেন কিছুই ঘটে নাই। বলিল, অমিত, ইন্দ্রাণী চিরদিনই ইন্দ্রাণী—বিদ্রোহিণী। হোক আজকের এই বিদ্রোহ নির্বোধ স্বদেশীয়ানার, তবু যেই পথে বিদ্রোহ সেই পথে আমি। এ কথা মনে রেখো যদি মনে পড়বার মত হয় তা কোনোদিন।

সেই দিন সত্যই একটা ছেদ পড়িয়া গেল ভাবে, কর্মে—আর জীবনেও কি?

বালক মানবও সেদিন ছাত্র-বন্ধুদের সহিত অগ্রসর হইতে চাহিল। আকৃষ্ট হইল ক্রমে সে দিলীপের দিকে;—ইন্দ্রাণীর তাহা অগোচর।

সে বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে নাই—বিদ্রোহিণী ইন্দ্রাণী তখন স্বগহে স্বাগত করিয়াছে আগস্টের যত গোপন বিদ্রোহীদের। মানব তাহাদের শ্রদ্ধা করিতে পারিল না। কেহবা তাহারা কংগ্রেসম্যান, কেহবা সোশ্যালিস্ট নানা গোষ্ঠীর। সুজাতা তখন তাহার 'সেবিকা সংঘে' সদ্য পাঠোত্তীর্ণা সহকর্মিনী। অমিতাদেরই পরিচয়ে ইন্দ্রাণী তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে, আর তারপর তাহাকে আপনার সহযোগিনীর দায়িত্ব দিয়াছে। আর মিনাও থাকে দিদির সঙ্গে—দিদির ঘরেই 'সংঘারামে'। কিন্তু মিনা যে তখনি ছিল দিলীপদের ছাত্রী-সংঘের মেয়ে—জনযুদ্ধ-বাদিনী ছাত্রী, মানবের সহকারী—ইন্দ্রাণীর তাহা জানিবার অবসরও ছিল না।

অলীক আশা ইন্দ্রাণীও বেশিক্ষণ পোষণ করে নাই আগস্ট বিদ্রোহীদের নিকটে। মানবকে তাই দোষ দেয় নাই। কিন্তু বিদ্রোহের যে এত অলীক রূপ দেখিতে হইবে তাহা ইন্দ্রাণী জানিত না। গোপনে গোপনে কঠিন দায়িত্ব তাহাকে লইতে হইয়াছে। নানা গুপ্ত কর্মীচক্রের সে গোপন আশ্রয় হইয়াছে। তাই ইন্দ্রাণীকে কথায়-আচরণে আত্ম-গোপন করিতে হইয়াছে—অথচ আত্ম-গোপন তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু দায়িত্ব তাহাকে পালন করিতেই হইবে;—সাহস, শক্তি, চতুরতা দিয়া ইন্দ্রাণী ঘিরিয়া রাখিয়াছে আশ্রয়কামী গোপন কর্মীদের। পুলিসের অত্যাচার সহনে ছিল তার স্পর্ধা। কিন্তু দৃপ্ত মস্তকে তাহা সহিতে গেলে আর এই 'সংঘারামের' গোপন-আশ্রয় কেন্দ্রটি অক্ষুণ্ণ থাকিত না। তখন কোথায় যাইত তাহাদের ট্রান্সমিটার, কোথায় যাইত তাহাদের গোপন মুদ্রনশালা, গোপনে মুদ্রিত ইশ্‌তেহারের পাহাড়?—পুলিসের চোখে ধূলি দিবার জন্যই ইন্দ্রাণী তাই প্রথম দিকে যোগাইয়াছে—ডেস্টিটিউট্ হোমের হাসপাতালে সেবিকা, আর গ্রহণ করিয়াছে ডেস্টিটিউট্ হোমের হতভাগিনীদের অপ্রার্থিত মাতৃত্বের দায়। তাহার ক্রোধ আর বিদ্রোহ তখন আকন্ঠ ছাপাইয়া উঠিয়াছে নানা হোম-পরিচালক সমাজনেতাদের ঘৃণিত বৃত্তিতে। ব্রজানন্দ পালিত ডেস্টিটিউট্ হোমের ডিরেকটার, চারটা 'ফ্রি কিচেনের মালিক'। ক্ষমতা ও মুনাফা তাহার চার-চারটা বড় ব্যবসায়ের ডিরেকটারের অপেক্ষা কম নয়। কারণ, সে কংগ্রেসম্যান; সে বিপ্লবী, স্বদেশীর প্রচারক; কর্পোরেশনের বে-সরকারী মুরুব্বি—এবং আগস্ট বিপ্লবের গোপন অর্থ-সংগ্রাহক। তাই মানব বিদ্রোহ করিত, ইন্দ্রাণী জানে তাহার সে বিদ্রোহ সঙ্গত। কিন্তু ইন্দ্রাণীর কর্মভার যে আরও অপরিহার্য।

জেল হইতে ভুজঙ্গ সেন জানাইয়াছেন ইন্দ্রাণীকে ব্রজানন্দের এই মন্বন্তরী ব্যবসাদারীটা বিদ্রোহেরই আবরণ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। ইন্দ্রাণী তাহা অস্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু নীরব রহিয়াছে। নির্মম নিয়তি। ইহাও এই পর্বের বিদ্রোহের,—তেতাল্লিশে আর পঁয়তাল্লিশের দান। এ ছলনা অসহ্য। ইন্দ্রাণী সেদিন বিদ্রোহ না করিয়া নীরব রহিয়াছে,—দপিতা, খড়্গার মত উদ্যত ইন্দ্রাণী। না, ব্রজানন্দের মেয়ে-ব্যবসার তুলনায় তেমন কিছু নয়—বিশু চাটুজ্জের প্রণয়-প্রলাপ ইন্দ্রাণীর নিকটে, আর রাওজীভাইর অজস্র প্রণয়-পত্র ইন্দ্রাণীর উদ্দেশ্যে। মানব বুঝি তাহাও বুঝিত।

ইন্দ্রাণী আর ঘৃণায় কত জ্বলিবে? নারীর একটা রূপই উহারা চিনিয়াছে। সে রূপ নারীর মিথ্যা নয়; স্বীকার করিবে তাহা ইন্দ্রাণী। স্বীকার করিত নিজেরও এই বিশিষ্ট রূপ—সে পুরুষ-হৃদয় বিজয়িনী। স্বীকার করিত—এখনো সে পুরুষ-হৃদয়-রঞ্জিনী। কিন্তু ইন্দ্রাণী জানে আরও বড় তাহার সত্য—সে শুধু নারী নয়, সে মানুষ। সে শুধু নারী-মাংসের একটি মোহন মধুর স্তূপ নয়,—সে এক মানব-সত্তা,—সে এক সন্তানেরও মাতা। আর শুধু তাহাও নয়,—স্বতন্ত্র এক সত্তা সে, সে ইন্দ্রাণী। ভালোবাসা কাহাকে বলে সে জানে, তা তাহার সত্তার আশ্রয়।

তাহার পৃথিবীর চরম সত্য ইহাই—সে ইন্দ্রাণী, পুরুষের সহকারিকা মাত্র সে নয়, সহকার-আশ্রিতা লতা সে নয়, সে স্বয়ং সম্পূর্ণা। ইহারা কি মানুষ—এই বিশু চাটুজ্জে আর রাওজীভাই—যে ইন্দ্রাণী ইহাদের দিকে ফিরিয়া তাকাইবে? আর এই নিরন্ন নারীর দেহ-ব্যবসায়ী ব্রজানন্দ—সেও মানুষ? হয়তো পুরুষ মানুষ—না, মানুষ নয়।. .

সমস্ত পুরুষ জাতির উপর এইবার ঘৃণা ধরিয়া গেল ইন্দ্রাণীর। ইন্দ্রাণীর মন সেই ঘৃণায় আকণ্ঠ ভরিয়া উঠিল। অথচ এই ব্রজানন্দ-রাওজীভাই প্রভৃতিদের সহায়তায় ইন্দ্রাণী এখন যুদ্ধের দিনে দেশীয় ধনিক-গোষ্ঠীর রোগ-সেবার ভার লইতেছে তাহার 'সংঘারামে'। বিস্তৃত হইয়া উঠিতেছে অন্য দিকে তাহার 'সেবিকা-সংঘ' কলিকাতায়। ফ্লাট ছাড়িয়া সমস্ত বাড়িটা ইন্দ্রাণী আয়ত্ত করিল, তাহার শাখা বিস্তার করিল মধ্য কলিকাতায়; আর সুজাতাকে দিল উহার ভার। দেশে নার্স নাই,— ফিরিঙ্গী নার্সরা যুদ্ধে গিয়াছে,—'সংঘারাম'-ই দেশের বণিকদের ভরসা—পীড়িত ও স্বচ্ছল এই ব্যবসায়ী শ্রেণীর। অন্যদিকে পুরুষ-কবলিত গলিত সভ্যতার দিকে তাকাইয়া-তাকাইয়া ইন্দ্রাণী আরও বুঝিল—'মানুষ জন্মিয়াছিল মুক্ত স্বাধীন, মানুষ সর্বত্র আজ শৃঙ্খলিত।' সর্বত্র, সর্বত্র, সর্বত্র। কি এ দেশে কি বিদেশে, কি আমেরিকায় কি সোভিয়েত দেশে,—সর্বত্র শৃঙ্খলিত মানুষ। এবং কোনো শৃঙ্খল মানে না ইন্দ্রাণী—সমাজের না, রাষ্ট্রের না,—না, প্রেমেরও না।

না, কাহাকেও শৃঙ্খল পরাইতে চাহে না ইন্দ্রাণী। অমিতের সঙ্গে সাক্ষাৎও নাই। মানবের মুখে কখনো শুনিত তাহার কাজ—হয়তো সৎ মানুষের কাজ। জনসমাজে সাহস ও মৈত্রী জোগাইবার, আশা জীয়াইবার প্রচার, প্রয়াস। কিন্তু অমন 'সৎকর্মে' ইন্দ্রাণীর হাসি পায়। কিন্তু অমিত—না, দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে না ইন্দ্রাণী নিজের জন্য।

যুদ্ধ শেষ হইল। বি-এস্-সি ক্লাসের দুয়ার হইতে মানব বলিল, সে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়িবে, বোর্ডিং-এ থাকিবে। ইন্দ্রাণী নিমূঢ় হতবাক্ হইল। কিন্তু বাধা দিল না—বাধা সে দিবে কেন তাহার পুত্রকে? স্বাধীন সত্তায় স্বতন্ত্র হইতে চাহে বুঝি মানব। স্বতন্ত্র হইবে সে, এবার আপন জীবন রচনা করিবে। কিন্তু ইন্দ্রাণীর কি স্থান নাই সেই জীবনে? আর ইন্দ্রাণীর জীবন হইতে কি এইবার বিদায় লইবে তাহার মানু? এই কি ইন্দ্রাণীর মাতৃ-তপস্যার সার্থকতা?—এত শূন্যময় কি সেই সার্থকতা, এত নিশ্চল অন্তহীন একটা গহ্বরের মত, এমন ছেদহীন একটা অন্ধকারের মত! শূন্যগৃহ তখন ইন্দ্রাণীর হৃদয়ের শূন্যতাকে এইভাবে অতলস্পর্শী ও অন্তহীন করিয়া তুলিল। কেহ তাহার আপনার নাই যে তাহাকে বলিবে। অমিত! না, সে তাহার জীবন-পথ হইতে দূরে, বহুদূরে।...

পাঞ্জাবী শরণার্থীদের সেবার ভার গ্রহণ করিতে তাহাকে ডাকিয়াছে তাহার যুদ্ধকালীন কংগ্রেসী-বন্ধুরা। ইন্দ্রাণী তাই তখন দিল্লী চলিল। সেখানে বসিয়াই সে প্রথম জানিল মিনাকে কেন্দ্র করিতেছে মানুর জীবন—যে মিনা সুজাতার বোন, অতি সামান্য একটা আঠার-উনিশ বৎসরের মেয়ে---রূপে সামান্য, বিদ্যায় সামান্য, ব্যক্তিত্বে সামান্য। অথচ স্পর্ধা তাহার সে ইন্দ্রাণীর বিরুদ্ধেও দাঁড়াইতে চাহে। মোহগ্রস্ত করিবে মানুকে---অসামান্যা ইন্দ্রাণীর অসামান্য পুত্র যে!

ইন্দ্রাণী শুনিল অনেক কথা। কিন্তু জানিল না তাহার মানু বহুদিন হইতে আপনাকে কিরূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে। কিছুতেই মানু মানিতে পারে নাই, তাঁহার মাতা কোনো নারীবই নারীত্বের অপমান নীরবে সহিতে পারে। কিছুতেই ভুলিতেও পারে নাই তবু 'ছাত্রী-সংঘের' সমস্ত মেয়েদের কানাকানি—স্বাধীন, অবাধগতি ইন্দ্রাণী, ভাটিয়া মারোয়াড়ীদের নার্স জোগাইবার ব্যবসায়ে ধনিক-লালসা ও ব্রজানন্দের ডেস্টিটিউট্ হোমে হতভাগিনীদের আশ্রয় দিবার নামে ডেস্টিটিউট্ হোমের ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিয়াই আপনার 'সেবিকা-সংঘ'কে প্রসারিত করিয়াছে! ইহা সত্য নয়—মিনার দিদিও জানেন। কিন্তু মা কেন ঐ ব্রজানন্দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন না।

কোথা দিয়া কি ঘটিতেছে অমিতও জানে নাই। তাহাদের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িয়াছিল কলিকাতার ভ্রাতৃমেধে, তারপর দেশ-বিভাগের আয়োজনে। শুধু মন্ত্র পাঠের মত বলিয়া লাভ কি সবই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত?—এ যে বহু বহু শতাব্দীর প্রতিশোধ—'এ আমার এ তোমার পাপ'। ইন্দ্রাণী দিল্লীতে গিয়াছে—উচ্চকোটির কর্তৃমহলে তাহার পরিচয় কম নয়। শরণার্থী সেবায় সে যখন ভার লইল অমিত তখন বরং খুশিই হইয়াছে। সত্যই অমিত সংবাদ পায় নাই দিল্লীতে কোন্ মার্কিন বৃত্তিও ইন্দ্রাণী মানবের জন্য সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছে তাহার "কংগ্রেসী বিদ্রোহীদের" সহায়তায়। মানব তাহা বর্জন করিয়াছে বিনা প্রশ্নে। অজস্র মিথ্যায় অতিরঞ্জিত হইয়া ইন্দ্রাণীর কলঙ্ক অবশেষে ইন্দ্রাণীর 'সেবিকা-সংঘের' মধ্যে ধর্মঘটের আকারে দেখা দিয়াছে। অমিত শুনিল—সুজাতারা সেই ধর্মঘটের নেতৃত্ব লইয়াছে। আর সেই

ভূমিকম্পে ইন্দ্রাণীর 'সংঘারাম' ভাঙিয়া চূর্ণ চূর্ণ হইতে বসিয়াছে। অনেকদিন পরে কাল হঠাৎ আবার সেই সুপরিচিত অক্ষরের নীল একখানা খাম আসিয়া পড়িল অমিতের হাতে। তাহার ক্ষুদ্র অবয়বে সেই পুরাতন ইন্দ্রাণীর স্বাক্ষর : 'অমিত, ইন্দ্রাণীকে মনে পড়ে?—সে কিন্তু তোমাকে মনে করে বসে থাক্‌বে এই দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যাটিতে...আসবে?'

হোলির আকাশে রুপালি থালার মত চাঁদ উঠিতেছে তখন,—ইন্দ্রাণী মিসেস সেনরায়ের বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিল।

'দেরি করিয়ে দিলেন মিসেস সেনরায়। যেন ওঁরই কেবল সময় নেই আর সময় আছে আমাদের সকলেরই'। ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল ইন্দ্রাণী।

তোমার সময়ের অভাব নাকি ইন্দ্রাণী? তা হলে কি উঠব?—পরিহাস করিল অমিত পুরাতন স্বরে।

সময়ের অভাব নিশ্চয়ই; কিন্তু সকলের সম্পর্কে নয়। অন্তত অভাব নেই অমিতের সম্পর্কে ইন্দ্রাণীর সময়ের।

অনেক কাল পরে অনেকদিন আগেকার মত সেই পরিহাস। তেমনি কণ্ঠ, তেমনি দৃষ্টি; আয়ত চক্ষে তেমনি ঔজ্জ্বল্য আর প্রীতিভরা মাধুর্য। কিন্তু কেমন যেন অমিতের সংশয় হইল—বুঝি সবই ইহা বিশেষ উদ্দেশ্যে পূর্ব-পরিকল্পিত—এই কণ্ঠস্বর, এই চাহনি, এই উত্তোলিত হাতের শ্লথ সুন্দর স্পর্শটি স্কন্ধে।

অমিত স্মিতহাস্যে বলিল, অমিতের সময়ের মেয়াদ কিন্তু ফুরিয়ে এসেছে। তাকে যেতে হবে এবার পার্টির চাকরিতে।

সত্য কথাই। কিন্তু সেই সত্য অমিত আজ রক্ষা করিবে না, ইহাও সত্য। তথাপি ইহাই সে বলিল। আর ইন্দ্রাণীরও তাহাতে আঘাত লাগিল। একবার তাকাইয়া থাকিয়া সে বলিল, খেয়ে যাবে না, অমিত? আমি যে তোমাকে খাওয়াতে-খাওয়াতে গল্প করব আজ।

অমিতের সাধ্য হইল না বলিবে, 'না'। বরং বলিল, তবে বহুদিনের মত তোমার হাতের রান্নাই আবার অমিতের কাজের তাড়নার উপর জয়ী হোক।

ইন্দ্রাণী হাসিল; কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করিল না। পরিহাস ত নয়; অমিত উপহাস করিতেছে কি ইন্দ্রাণীকে?

একটু পরেই কথাটা উঠিল : মিনা সেনকে চেনো তুমি, অমিত?

না।—সত্যই অমিত চিনিত না।

সুজাতা সেনের বোন—তোমাদের পার্টির সুজাতা সেন। যাকে আমি মানুষ করেছিলাম তোমার কথায়। আর যাকে আমি করেছিলাম—আমার দক্ষিণ হস্ত।

অমিতও তৎক্ষণাৎ সরাসরি বলিল, আর আজ যে এখন নার্সদের ধর্মঘটে নেতৃত্ব নিয়ে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

দাঁড়াক!—সংক্ষেপে তীব্র কণ্ঠে বলিল ইন্দ্রাণী।—শক্তি থাকে দাঁড়াক। শক্তি ছিল বলে আমি গড়েছি আপন রক্ত দিয়ে এই 'সবিকা সংঘ'—সে কাহিনী তুমি

জানো, অমিত। ইন্দ্রাণী প্যারাসাইট নয়, আপন শক্তিতে আপন ভাগ্যকে সে জয় করেছে; আপন হাতে সে এই 'সেবিকা সংঘ' গড়েছে। ভাঙুক তা যদি পারে ওরা ধর্মঘট করে—যাদের নিজ হস্তে আমি দিয়েছি বাসস্থান, অন্নজল এই গৃহে।—কিন্তু এই চোরাগোপ্তা আঘাত কেন? এই গুপ্তহত্যা?

অমিত বুঝিল না। বলিল, গুপ্তহত্যা?

ইন্দ্রাণী বলিল: মিনা সেনকে চেনো? চেনো না? তোমাদেরই পার্টির মেয়ে সেও। এইখানে—এই ছাদের তলায় বসে তাকে দিয়ে ফাঁদ পেতেছিল মানুর জন্য তোমাদের সুজাতা সেন।

অমিত এবার কথাটা বুঝিল, বলিল বেশ। তারপর?

তাদেরই পরামর্শে মানু চলে গেল বোর্ডিং-এ। মানুর মা তাতে আপত্তি করে নি। মানু চায় মিনাকে—তাতেও বাধা দিত না মানুর মা। ব্যক্তিগত মতামতকে আমি শ্রদ্ধা করতে জানি; আর পারব না শ্রদ্ধা করতে মানুর ব্যক্তিত্বকে? কিন্তু সে চাপটা এমন স্থূল হাতে দিতে গেল কেন সুজাতা সেন? একটা ধর্মঘট বাধিয়ে দিলেই ইন্দ্রাণী চৌধুরী জব্দ হবে—আর মিনা ও মানুর বিবাহ বন্ধনে সে দেবে সম্মতি,—এমনি মানুষ নাকি ইন্দ্রাণী?

অমিত বলিল, কিন্তু সম্মতির জন্য এরূপ চাপের প্রয়োজন ছিল কি? তুমি ত সম্মতই ছিলে ওদের বিবাহে।

বিবাহে? আমার সম্মত হবার প্রশ্নই ওঠে না। যার খুশি বিবাহ করুক যাকে। আমি কোনো কালে তাতে বাধা দোব না। কিন্তু আমি কোনো কালে সম্মতি দোব না কারও কোনো 'অনুষ্ঠানে'। ওতো অনুষ্ঠান নয়, প্রতিষ্ঠান-বিবাহ। আমি অবিশ্বাস করি ওরূপ অনুষ্ঠান, বিশেষ করে তোমাদের "পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে"। সাত পাকে ঘোরা, না সতের পাঁকের তলে ডোবা।

সুরোর সেই অভিজ্ঞতা! কিন্তু ইন্দ্রাণী সুরো নয়—সে বিক্ষুব্ধা, বিদ্রোহিণী। বিক্ষোভে বিদ্রোহে সে এবার বুঝি বিভ্রান্তও।

অমিত হাসিয়া উঠিল।

ইন্দ্রাণী ক্ষুব্ধ হইল—হাসলে যে, অমিত? এ কথা কি জানতে না তুমি?

জানতাম। কিন্তু তবু শুনে হাসি পায়, যত রাগ বিবাহ অনুষ্ঠানের উপর।

হাসি পেতে পারে তোমার। ঘটকালিই যখন তোমাদের দলের প্রোগ্রাম।

অমিত আবার হাসিল।—সেই ভরসাতেই ত এ দলটা আঁকড়ে আছি। কিন্তু অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুখায়ে যায়।...জানোই ত, তুমি অমিতের নিয়তি।

নিয়তি!—দশ বৎসরের পার হইতে অবিস্মরণীয় একটা কথা আবার ইন্দ্রাণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এই কলিকাতা শহরের এমনি এক সন্ধ্যায় ফুটপাতের উপরে পথ-প্রদীপের আলোতে সেদিন ইন্দ্রাণী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল; আর অনেক অনেক অবিস্মৃত দিনের স্মৃতি মন্থন করিয়া অপ্রত্যাশিত একটি কন্ঠস্বর বাজিয়া উঠিয়াছিল সদ্য-কারামুক্ত অমিতের কর্ণে—'অমিত'।' তারপর মূর্তি ধরিয়া ওঠে

সেই জন্ম-জন্মান্তরের পারের ডাকের মত ওই ডাক একটি মানবীতে—'ইন্দ্রাণী।' অমিত জানিল সেই মুহূর্তে কী তাহার নিয়তি। আজ দশ বৎসর পরে সেই কথা অমিতের মুখে! কিন্তু মুখে সেই চিন্তা-সংহত আবেগ-আগ্রহ ইন্দ্রাণী দেখিতেছে না। অমিতের মুখে সে দেখে আজ একটা পরিহাস-তরল হাস্য!

অমিত হাসিয়া বলিল, নিয়তি বই কি—এবার নিয়তির অভিশাপ!

অভিশাপ, অমিত? ক্ষোভে বেদনায় এবার ইন্দ্রাণীর বুক মথিত হইল। আবার তাহার চোখ জ্বলিয়া উঠিল।—তোমার জীবনে ইন্দ্রাণী অভিশাপ বহন করে এনেছে!

অমিত বলিল, ইন্দ্রাণী নয়; নিয়তি। ইন্দ্রাণী যা এনেছে, ইন্দ্রাণী তা জানে। কিন্তু ইন্দ্রাণী যা দান বা গ্রহণ করতে পারে নি, তা জানে না ইন্দ্রাণী।

কী দান গ্রহণ করতে পারে নি, ইন্দ্রাণী।

গ্রহণ করতে পারে নি মানুষকে। দান করতে পারে নি সে নিজেকে আপন সত্তার সহিত। আর তাই গ্রহণ করতে পারে নি সে অমিতকেও আপন সত্তার মধ্যে।

ইন্দ্রাণী স্তব্ধ, বিমূঢ়। সে অমিতের চোখের দিকে তাকাইয়া রহিল। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ। তারপর স্থির, গর্বিত কণ্ঠে হাসিল, এবং বলিল,

শোনো, অমিত,—ইন্দ্রাণী দানের বস্তু নয়। সে আপনার সত্তায় আপনি সম্পূর্ণ। আর, মানুষকেও সে চায় নিজ নিজ সত্তায় তেমনি সম্পূর্ণ দেখতে—নইলে মানুষ মানুষই নয়। আমি জানি—মানুষ জন্মে স্বাধীন,—রাষ্ট্র, পার্টি তার পায়ে পরায় শৃংখল।

অমিত বলিল, মানুষ নিজ-নিজ সত্তায় সত্য হলেই সম্পূর্ণ, ইন্দ্রাণী। সত্তার সম্পূর্ণতা আত্মদানে আর সমগ্রকে গ্রহণে। ছোট 'আমি' থেকে বড় 'আমি'কে পাওয়ায়। 'তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে।' ওনলি ইন কলেক্‌টিভ লিভিং ড় উই রিচ প্লেনিটিউড্।

ইন্দ্রাণী ব্যঙ্গভরে হাসিল, বলিল, জানি, অমিত, জানি তোমার মতবাদ। 'কলেক্‌টিভ্ লিভিং', ওই তোমাদের মন্ত্র। কিন্তু এই মন্ত্রে ইন্দ্রাণী ভুলবে না। এ মন্ত্রে তোমরা মানুষকে কামান-বন্দুক করেছ, গড়েছ তোমাদের টোটেলিটেরিয়ানিজম্।

অমিতও এবার বিদ্রূপের সহিত হাসিল: মন্ত্রে না হোক্, মার্কিনী বুলিতে ত ভুলেছ। চাই কি, পেতেও পার তোমার 'সেবিকা-সংঘের' জন্য একটা মার্কিনী 'এড'। এ দেশে ধর্মঘটের বিরুদ্ধে অভিযানে সহায়তার বরাদ্দ ইণ্ডিয়ান মার্শাল প্ল্যানেও থাকবে, নিশ্চয়।

কথাটার খোঁচা স্পষ্ট। ইন্দ্রাণী জ্বলিয়া উঠিল, ধর্মঘট! কেন, অমিত, এই ধর্মঘট? সুজাতার ব্যক্তিগত আক্রোশ বলে ত।

না হয় মানলাম তা'ই। যদিও জানি মিনা আর মানবের প্রেম-পরিণয়ের সঙ্গে এর সম্পর্ক সম্পূর্ণ তোমার মস্তিষ্কের কল্পনা, হয়ত বা ওদের প্রেমটাও কল্পনা। অথবা মায়ের জেলাসি। না, থাক্, প্রমাণ তুমি না দিলে; আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু

সুজাতা সেনের ব্যক্তিগত স্বার্থে 'সেবিকা-সংঘের' এতগুলি মেয়ে ধর্মঘট করেছে কেন? তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থটা তাতে কী?

কাজ করতে চায় না বলে, কাজ না শিখলে আমি কাউকে ক্ষমা করি না বলে, বিনা কাজে দক্ষিণা চায় বলে।

সত্যে, ইন্দ্রাণী? তুমি তাদের প্রত্যেকের কাজের বাবদে রোগীদের থেকে আদায় করো দিনে ষোল টাকা, আর রাত্রিতে বিশ টাকা। আর তারা পায় কি প্রত্যেকে? —দিনের কাজে আট টাকা, রাত্রের কাজে দশ টাকা—

মিথ্যা কথা। তারা পায় আমার ওখানে বাসস্থান, পায় এদিনেও পুষ্টিকর আহার্য, পায় কার্যকালেও আমার ব্যবস্থা-করা চা, টিফিন্। সবচেয়ে বড় কথা, পায় সপ্তাহে সপ্তাহে স্থির কাজ;—জানে না বেকারের দুর্দশা কাকে বলে?

আর তুমি পাও কি—এ কাজ করে? কিংবা দিল্লীতে বসে কাজ না করে?

আমার শ্রম-মূল্য,—যেমন ওরা পায় ওদের শ্রম-মূল্য। আমার শ্রম-মূল্য—যে শ্রমের বলে আমি একাকী গড়েছি এই প্রতিষ্ঠান, বোঝো কি, তার অর্থ কী? তার অর্থ—ইন্দ্রাণীর সমস্ত জীবন-যৌবন, তেজ, শক্তি, দীপ্তি।—তাব মূল্য কত জানো, অমিত?

অমূল্য—আমাব কাছে। কিন্তু পৃথিবীতে তুমি আদায় করো কি দাম?—ইন্দ্রাণীব শক্তি, দীপ্তি, তেজ—এ সবের দাম হল গুটি পঞ্চাশটি মেয়ের সপরিবারে অর্ধাহার,—তাদের পুত্র আর ভ্রাতাদের তেজোহীনতা, দীপ্তিহীনতা, শক্তিহীনতা।

ইন্দ্রাণী এই যুক্তিতর্কের জন্য প্রস্তুত ছিল। তাই সে পরাজয় মানিল না। বলিল, শোনো, অমিত, এ বাঁধিবুলি না আউড়ে খোঁজ নাও ওরা সত্যই কতটা কাজ করে, কতটা কাজ শিখেছে, আর কতটা শিখেছে কুড়েমি, কাজ ফাঁকি দিতে। শিখেছে কি শ্রমের মর্যাদা, না শিখেছে শুধু তোমাদের বাঁধিবুলি?

অমিত হাসিল। বলিল, ইন্দ্রাণী, এও ত বাঁধিবুলি—তবে শোষিতের নয়, শোষণের বাঁধিবুলি।

ইন্দ্রাণী ইহা মানিবে না। 'অনেক বাঁধিবুলিই পাকা সত্য' অমিত যেন তাহাও জানিত, তবু সে অপেক্ষা করিতে লাগিল। ইন্দ্রাণী যেন কী একটা ভাবিতেছে।

ইন্দ্রাণী কিছুক্ষণ পরে বলিল, টাকার লোভ ইন্দ্রাণীর? বেশ, এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ভার আমি এক্ষুনি লিখে দিচ্ছি তোমাকে—তোমার ব্যক্তিগত দায়িত্বে নাও—কোনো দলের বা কমিটির জন্য নয়। আর তুমি তোমার ব্যক্তিগত কর্তব্যবোধ নিয়ে পরিচালনা করো এই মেয়েদের, এদের কর্তব্যে—নার্সের দায়িত্ব-পালনে।

অমিত হাসিল, আমার ব্যক্তিত্বে তোমার যত আস্থা, ওদেরও দায়িত্বে তত আস্থা রেখে দেখো না কেন?

না।

যারা খেটে চালাচ্ছে তাদেরই দাও তাদের অধিকার। মালিকানা ছাড়িয়ে সমবায়ের পদ্ধতি না হয় গ্রহণ করো।

ইন্দ্রাণী বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে।—চমৎকার পূর্ণিমা রাত্রির চাঁদ আর আকাশ। কি দেখিতে-দেখিতে হাসি ফুটিল ইন্দ্রাণীর ঠোঁটে একটু-একটু করিয়া। কিন্তু পূর্ণিমা রাত্রির প্লাবন নয়। ইন্দ্রাণী বলিল, এ মেয়েগুলোকে তোমরা কাজ ফাঁকি দিতে শিখিয়ে সমাজকে শোষণ করতে শেখাচ্ছ। ওদেরকে তোমরাই মানুষ হতে দিলে না।

অমিত বলিল, নিজেদের দাবি সম্পর্কে সবচেয়ে সচেতন যে, সবচেয়ে সচেতন ব্যক্তিত্বেরও সেই অধিকারী।

'সচেতন মানুষ'।—জ্বলিয়া উঠিল আবার ইন্দ্রাণীর চোখ।—স্বাধীন নয় যে মানুষ, সে মানুষ সচেতন?—পার্টির নামে বলি দিতে শেখাচ্ছ যে মানুষকে তার নিজ বুদ্ধি, চেতনা, মানুষের অধিকার, তার ব্যক্তিত্বের আর তোমরা কী রাখছ?

দ্যাখো না কেন, তোমার বিচ্ছিন্ন একক সত্তায় সম্পূর্ণ হবার স্বপ্নও এই এতগুলি কর্মী মেয়ের স্বাধীন ব্যক্তিত্বকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে চলেছে।—আর নিজেকে বলো 'এনার্কিস্ট'—রাষ্ট্রহীন সমাজ চাই—মানুষ কোন পার্টির যন্ত্র হবে না।

জ্বলিয়া উঠিল এবার ইন্দ্রাণীর চোখ।—

মানুষকে মানুষ হিসাবে তোমরা কমিউনিস্টরা চাও না। চাও মানুষকে ছেঁটে-কেটে, দলে-মুচড়ে দলের মেম্বর করে নিতে, নেতৃত্বের হাতিয়ার করতে। এ চেষ্টা সবচেয়ে দুর্বার-নীতিতে, আসুরিক পদ্ধতিতে করতে জানে তোমাদের কমিউনিস্ট পার্টি—আমার প্রধান শত্রু।

কিন্তু সকল দেশের নিপীড়িত মানুষের প্রধান ভরসা—

আর কি সর্বনাশের কথা তা। মানুষের স্বাধীনতা আর মানুষের মর্যাদা, মহিমা তোমাদের কমিউনিস্ট পার্টি মানে?

তা না হলে আমি কমিউনিস্ট হলাম কি করে...

ইন্দ্রাণী তাহাও জানে, কিন্তু মানিতে সে রাজী নয়, অমিত ব্যক্তির স্বাধীনতা, বা নিজ দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে।

অমিত বলে, স্বাধীনতার অর্থ কী ইন্দ্রাণী?

ইন্দ্রাণী অবশ্য জানে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, না, বিশৃঙ্খলাও নয়। ইন্দ্রাণী বলিল, তুমিই বলো না—

অমিত বলিল, স্বাধীনতা সৃষ্টির সাধনা। স্বাধীনতা নেতি-বাচক নয়। সত্য বটে বন্ধন-মোচনে তার রূপ প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু বন্ধন-মোচন আসলে তার বাহ্য-রূপ। তার সম্পূর্ণ সত্য প্রয়োজনের স্বীকৃতি—সৃষ্টির আয়োজন। ইতিহাসের পর্বে পর্বে সৃষ্টির দাবি বাধা পড়ে অভ্যাসের ও নিয়মের গ্রন্থিতে। সেই গ্রন্থি

ছেদ করতে হয়—মুক্ত করতে হয় নূতন সৃষ্টির প্রয়োজনকে প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে ;—এইটা বন্ধন-মোচনের দিক—যা তুমিও চাও। প্রয়োজনকে স্বীকার করে নিতে হবে বলেই গ্রন্থিচ্ছেদ। আসলে কিন্তু সৃষ্টির সাধনাই পূর্ণ স্বাধীনতা। যা তুমি আজ ভুলে বসে আছ এনার্কিজমের নামে।

মুহূর্তেকের সন্দেহ জাগিল কি ইন্দ্রাণীর চোখে?

অমিত আবার বলে :

বিদ্রোহের পথে ঘুরে ঘুরে মানষ প্রতিক্রিয়ার পথেই গিয়ে না হলে পৌঁছে। কারণ, বিদ্রোহ আর বিপ্লব এক কথা নয়। বিদ্রোহ শুধু অস্বীকৃতি, বিপ্লব কিন্তু অঙ্গীকার—প্রতিযুগের সৃষ্টির দাবির অঙ্গীকার।...তুমি স্বাধীন নও, তুমি বিচ্ছিন্ন মাত্র। আপনাকেই তুমি বিচ্ছিন্ন করেছ, ইন্দ্রাণী, আপনাকে সহকারী করতে পার নি সৃষ্টির প্রয়োজনে, একালের সৃষ্টিশক্তির আয়োজনের সঙ্গে, জন-জীবনের সঙ্গে। ছোট 'আমি'র বড় 'আমি'তে উত্তরণে...ওনলি ইন কলেক্টিব লিভিং ডু উই রিচ প্লেনিটিউড্।

কলেকটিব্! ইন্দ্রাণী বক্র হাসি হাসিল। তাহার দৃষ্টি উদাস হইল। অনেক অনেক দূরে মরুভূমির পার হইতে ইন্দ্রাণী দেখিতেছে যেন অনেক অনেক দিনের পুরাতন বন্ধুকে—নিষ্পলক সেই দৃষ্টি আত্মীয়তাহীন। ..

অমিতও বুঝিল। জীবনের যে দুই পথ একদিন একপথ হইয়া গিয়াছিল,—বিয়াল্লিশেই তাহা ভিন্ন হইয়া চলিতেছে, অমিত জানিত;—বারে বারে তখনো পরস্পরকে তবু ছুঁইয়া গিয়াছে সেই দুই পথ আম-বাগানের আড়াল হইতে, চষা-মাঠের মধ্য দিয়া, হাট-বাজারের অহ্বানে। দেখিল যে দুইপথকে অমিত কাম তখন—কোথায় পরস্পরকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে তাহারা, পাশাপাশি নয় আর; ভিন্ন-মুখী—ইন্দ্রাণী আর অমিত।...

দুই ভিন্নমুখী পথের বাঁক হইতে হইল এই সম্ভাষণ আর সংবর্ধনা—সন্ধ্যার চা ও খাবারে, রাত্রির লুচিতে আর মাংসে মিষ্টান্নে। শেষে ইন্দ্রাণী জানাইল, কাল দিল্লী মেলে যাচ্ছি আমি। অমিত সচকিত হইল—তাহারও দিল্লী যাওয়ার কথা ছিল তাড়—সে শুনিল—ইন্দ্রাণী বলিতেছে কবে দেখা হবে আবার তোমার সঙ্গে, জানি না। হাঁ, অমিত, বাংলায়ও কাজ আছে। ফিরতেই হবে। কিন্তু একবারের মত আমি দূরে থাকতে চাই—বুঝতে চাই। তোমাকে স্বীকার করেছি আমি বরাবর; স্বীকার করব তোমার জীবনকে, কিন্তু স্বীকার করবে না ইন্দ্রাণী তোমার মতবাদকে, তোমার সত্তার এই আত্মঘাতকে।...তারপর স্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে সুদৃঢ় কঠিন বিজ্ঞপ্তি, বিদায়, অমিত—। সত্য জেনো ইন্দ্রাণীর ভালোবাসা।

অমিত উত্তর দিয়াছে, আমার 'মতবাদ', ইন্দ্রাণী, আমার জীবন ছাড়া নয়। আর জেনো—ভালোবাসাই তোমাকে তোমার পথ দেখাবে, আমাকেও আমার।

ইন্দ্রাণী নীরব, উন্মনা।

অমিত যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

তুমি মানুষ, অমিত। মতবাদের থেকে মানুষ বড়। তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু মতবাদের মানুষকে আমি যন্ত্র ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারি না।

হাঁ, আমার মন আছে, মত আছে। আমি মনুষ্যবাদী—'ম্যান! হোয়াট্ এ নোব্‌ল্ ওয়ার্ক!' আর এযুগের মনুষ্যবাদই কমিউনিজম—সৃষ্টির কর্মযোগশাস্ত্র।

বিদায় অমিতকে? তবু 'তুমি আছ আমি আছি—দূরে বা নিকটে।'

বিদ্রোহিণী ইন্দ্রাণী কাঁদে নাই...বিজয়িনী ইন্দ্রাণী দুঃখও করে নাই;—ইহাই ত তাহার বিদ্রোহের ট্র্যাজিডি; তাহার মিথ্যাবিজয়ের সর্বনাশিতা।

এ কী পরিণতি—বিচ্ছিন্নতার এ কী-রূপ!—বাড়ি ফিরিবার পথে অশ্রুহীন চোখে অমিত কাঁদিয়াছে। ইন্দ্রাণীর এই শোকাবহ পরাজয়ের কথা সে বুঝি বিয়াল্লিশেই বুঝিয়াছিল। অথবা আরও পূর্বে,—হয়ত বা প্রথম সেই ইন্দ্রাণী-অমিতের জীবন-সংঘর্ষেই...জানিতাম নাকি বিশ বৎসর পূর্বে, পঁচিশ বৎসর পূর্বেও? তখনো ইন্দ্রাণী তাহার জীবন-গতির আত্মহারা আনন্দে আমার মনের আত্মীয়া হইয়া উঠিতেছে: —অতি অবুঝভাবে জানিতাম ইহা তখনো। তবু কালই প্রত্যক্ষ করিলাম, কাল, ইন্দ্রাণী আত্মঘাতিনী আপনার স্বাতন্ত্র্যে। তাহাকে রোধ করা যায় না, কালই তাহা জানিলাম, কালই ইন্দ্রাণীর এই পরিণতি প্রত্যক্ষ করিলাম। কিন্তু এই পরিণতি ইন্দ্রাণীর অনিবার্য হইয়াছে তাহার স্বভাব বা নিয়তির জন্য নয়, দেহ-মনের নিজস্ব তেজোময় ঐশ্বর্যের জন্যও নয়, তাহার প্রাণময় আচরণ আতিশয্যেরও জন্য নয়। অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে তাহার বিচিত্র নিষ্ঠুর পরিবার-পরিবেশের জন্য, একান্ত আত্মনির্ভরতার গর্বে আত্ম-কেন্দ্রিকতার জন্য, আত্ম মর্যাদাসম্পন্না এ-দেশের মেয়ের এ দেশের নিষ্ঠুর কদর্য শাসন-বিচারের বিরুদ্ধে একাকিনী বিদ্রোহের জন্য। একালের গণসংগ্রামের বিপুল সৃষ্টিশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য। শুধু এই? অমিত তুমি তাকে নিজের পাশে নিয়ে চললে কি ভা হত? অমিত, তুমি কি অপরাধী নও? তুমি কি তাকে নিঃসঙ্গতার দিকে, বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দাও নি?......

অমিত সুজাতা সেনকে বলিল: আপনার কি মনে হয় ধর্মঘট আর বেশি দিন টিঁক্‌বে না?

কত টিঁক্‌বে আর? সাতাশ দিন ত হল। নার্সরাও বলছিল, 'আর পারি না দিদি। একটা মীমাংসা করো।' আর ওরা তেমন প্রস্তুত নয়, ঘরে আত্মীয় পরিজন অনাহারে রয়েছে।

অমিত তাহা বুঝিল। ইহা শেষ ধর্মঘট নয়, ইহাও সত্য। মীমাংসা একটা চাই। সে বলিল, আপনারও ত বোন আছে একটি। মিনা। কলেজে পড়ে বুঝি? কি পড়ে সে?

পড়ে মেডিকেল স্কুলে। ইন্দ্রাণীদি'ই ভর্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এখন অবশ্য তিনি চটে গিয়েছেন মিনার উপরও।

কেন?

মানুর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব। ওর বিশ্বাস মিনা-ই মানুকে বাগিয়ে পার্টিতে টানছে।

ওরা বিয়ে করবে নাকি?

বিয়ে করবে কি? ওদের বয়স এখনো উনিশ-কুড়ি। তা ছাড়া, মানুরও জেদ তার মায়ের মত। আমেরিকা ত গেলই না; এখন মায়ের থেকে টাকা নিয়েও আর-পড়বে না। প্রোডাকটিভ্ কাজকর্মে নিজের জীবিকা অর্জন না করলে সে আবার মানুষ কি? মিনা-ই কি কম? বিয়ের কথা বললে সে বলে—পাশ করবে, ডাক্তার হবে, উপার্জনক্ষম হবে, তারপর যদি করতে হয় করবে নিজের জোরে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে।

তা হলে ত মিনা-ই সিস্টার ইন্দ্রাণীর উপযুক্ত পুত্রবধূ হতে পারে। তবে ইন্দ্রাণীর আপত্তি কেন?

আপত্তিও ওই—তেজী মানুষ ত তিনি। তিনি চান সকলে তাঁকেই মানবে, তাঁকেই স্বীকার করবে, বড় বলবে। কিন্তু মিনাও কম জেদী নয়। তাই ছেলেবেলায় মিনাকে তাঁর পসন্দও ছিল বেশি; আর বড় হতেই মিনাকে তিনি একটুও সহ্য করতে পারেন না। মনে করেন মিনা বুঝি ওঁরই প্রতিদ্বন্দ্বিনী।

হাওড়া স্টেশন বুঝি এতক্ষণে আজ পিছনে পড়িয়া গেল। মানবের মুখ প্ল্যাটফর্মের শত শত মুখ ও মাথার মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে। একটা কথাও হয় নাই—এই আধ ঘন্টা মাতাপুত্রে। সুস্থির এবার ইন্দ্রাণী, আপন আসনে আসিয়া বসিয়া পড়িল। হার মানিবে না চক্ষু মুদ্রিত, মাথা পিছনের গদীতে এলানো।...মানু তাহার মায়ের সহায়তাও ত্যাগ করিতেছে। মানু ত্যাগ করিল মাকে...ইন্দ্রাণী কোথায় চলিল? কোথায়? কোথায়? কোথায়?

দিল্লী? কি কাজ তাহার বাঙলা ছাড়ার? কিছু না, কিছু না। কোথায় যাইবে সে? ইন্দ্রাণী তাহার নিজের ঠিকানাও আর জানে না।...একটা পাট চুকাইয়া দিয়াছে—তুলিয়া দিয়াছে তার সেবিকাদেরই হাতে সেবিকা প্রতিষ্ঠান। তার লেখা শেষ চিঠি অমিত আজ পাইবে,—দেখিবে—ছোট নয় ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণীর দর্প—'ছোট আমি'র দর্প নয়।

হাত পড়িল পার্শ্বস্থ কাগজখানার উপরে। অপরাহ্ণের বিশেষাঙ্ক সংবাদপত্র। খুলিয়া দেখিবার সময় হয় নাই এতক্ষণ, নিজের অশ্রু গোপন করিবার জন্যই এইবার তাহা খুলিয়া বসিল ইন্দ্রাণী। টান হইয়া চোখ মুছিয়া সদর্পে বসিয়াছে ইন্দ্রাণী,—"কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী"—এক মুহূর্ত মধ্যে ইন্দ্রাণীর চোখ বড় হইয়া উঠিল; মাথা কাগজের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িল, দৃষ্টি সতেজ হইল, সুতীক্ষ্ণ হইল...আগ্রহ আশঙ্কায় তাহা দ্রুত ঠেলিয়া চলিয়াছে শব্দ, পংক্তি, প্যারা, স্তম্ভ... ধৃতদের নাম, নাম, নাম...তারপর আর চলে না। চলে না, চলে না ইন্দ্রাণীর দৃষ্টি। কিছুই দেখে না চোখ;—অশ্রুতে ঢাকা। অমিত তাহার পত্র পাইবেও না।

মাথা এলাইয়া, চোখ বুজিয়া বসিয়া ইন্দ্রাণী। কাল অমিতকে সে বিদায় দিয়াছে—তারপর দানপত্র পাঠাইয়াছে অমিতের নিকট...কিন্তু অমিতের হাতে তাহা তো পৌঁছাইবে না—তাহার আগেই সে গেল জেলে। সেই অমিত, তাহার অমিত, তাহার বিদায় দেওয়া অমিত। যাহাকে সে জানাইয়াছে—ইন্দ্রাণী ছোট নয়, মিথ্যা নয়।

···ইন্দ্রাণীর ভবিষ্যৎ হইতে মানু চলিয়া যাইতেছে ; ইন্দ্রাণীর বর্তমান হইতে অমিত চলিয়া যাইতেছে...বর্তমান নাই, ভবিষ্যৎ নাই—কি আছে তোমার, ইন্দ্রাণী? কি আছে তোমার এইবার? কি তোমার ঠিকানা, কী তোমার পরিচয়?

ইন্দ্রাণী এতক্ষণ জানিত—সে কাহারও নয় একা এবং এক, এই তার পরিচয়। এক ও একা। এখন হঠাৎ ভাঙিয়া পড়িতে তাহার দেহ মন—বলিল, কেন ইন্দ্রাণী একা?...এ জীবনে তুমি আত্মদান করিতে পার নাই? এ জীবনে তুমি কাহাকেও আপনার মধ্যে গ্রহণ করিতে পার নাই—মানুকে নয়, অমিতকে নয় ; পুত্রকে নয়, প্রিয়কে নয়। সত্য কি এ কথা? আপনারই জন্য শুধু তাহাদের চাহিয়াছ, পুত্রের জন্য পুত্রকে চাও নাই, প্রিয়র জন্য চাও নাই প্রিয়কে। আর তাই পুত্র আর পুত্র নাই, প্রিয় নাই প্রিয়—আর তাই তুমিও বুঝি নাই তোমার আপনার।—তোমার বর্তমান অর্থহীন হইয়া গেল, তোমার ভবিষ্যৎ শূন্য হইয়া গেল...তোমার তুমি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে, নিরর্থক, শূন্যময়—শূন্যতার মধ্যে নির্বাণোন্মুখ উল্কা।

ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রাণী, ভাঙিয়া পড়িবে নাকি তুমি?...

না, ইন্দ্রাণী টান হইয়া বসিল। অর্থহীন হোক, হোক শূন্য ভবিষ্যৎ—ইন্দ্রাণীর বর্তমান আছে, আর ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রাণী,—বিদ্রোহিনী সে, অপরাজিতা সে। কাহার সাধ্য ইন্দ্রাণীকে অস্বীকার করিবে? অমিত? মানব?

ইন্দ্রাণী আপনার সত্তায় আপনার দীপ্তিতে অনির্বাণ সত্য। আর তাই তোমার সত্তায় মানব, তোমার জীবনে অমিত,—ইন্দ্রাণী চির-স্বীকৃত রহিবে। না থাকুক ইন্দ্রাণীর অতীত, থাকিবে ভবিষ্যৎ,—ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রাণী। সে মহাশূন্যের কক্ষশূন্য ঠিকানাহীন ধাবমান উল্কা, তবু অন্ধকারে সে নিঃসঙ্গ হইবে না। সে মানুষের সহ-যাত্রিনী—অমিতের পাশে, মানবের সঙ্গেই বা নয় কেন? কেন তাহাদের সঙ্গে নয়? জীবন কেন তবে?

বাহিরে তাকাইল ইন্দ্রাণী—অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে দিল্লী মেল।

'তুমি আছ আমি আছি'—চোখের জল আর বাধা মানিল না। সত্য, সত্য। চোখ বাহিয়া জল গালে পড়িল।

কাল রাত্রিতে অমিত যখন গৃহে ফিরিয়াছে তখন রাত্রি অনেক—আকাশ পূর্ণিমালোকে উদ্ভাসিত। উৎসবের কোলাহলে পৃথিবী মুখরিত। আর অমিতের মনে হইয়াছে এই আলোর মধ্যে, সে যেন কি হারাইয়াছে। সে বুঝি নিষ্প্রয়োজন—পূর্ণিমা রাত্রির এই ল্যাম্পপোস্টের মতই নিষ্প্রয়োজন। তাহার দিন গিয়াছে—আর ইন্দ্রাণীর? কোথায় সে ইন্দ্রাণী? সে বুঝি কোন্ কক্ষচ্যুত মৃত নক্ষত্র।

কখন নিবিয়াছে তাহাও সে জানে না। এখন শুধু সে টুকরা-টুকরা হইয়া যাইবে? খসিয়া যাইতেছে তাহার সংঘ, তাহার দান, তাহার প্রাণ, তাহার প্রেম, তাহার সৃষ্টি—অমিত-মানবও...

but, oh,

The difference to me.

অমিতের চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন। তবু 'তুমি আছ আমি আছি'।

কাল রাত্রিতে পূর্ণিমার আকাশের তলায় অমিত মনে করিয়াছিল বুঝি সে নিরর্থক—পূর্ণিমা রাত্রির পথ-প্রদীপের মতই অনাবশ্যক।—আজ প্রভাতে রাত্রি পোহাইতে না-পোহাইতে কিন্তু সেই অমিত নিমন্ত্রণ পাইল—মহাশূন্যের এপারে এই সূর্যের সভায় জনতার শেষ যুদ্ধে। আছি, আছি, সকলের মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে আমি আছি। আর ইন্দ্রাণী? দূরে হোক, কাছে হোক, তাকেও থাকতে হবে আমার সঙ্গে।

ইন্দ্রাণী, ছেঁড়া-পাল, ভাঙা-হাল অমিতের জীবন-তরণী আজও ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে—এই কক্ষে বসিয়া—মহামানবের সমুদ্র-তরঙ্গের মধ্যে। ছেঁড়া পাল, ভাঙা-হাল এই অমিত; তবু মানুষের তীর্থযাত্রায় আজও সে সঙ্গী ঝড় আর বিদ্যুতের, সঙ্গী মানুষের ও ইতিহাসের। আর তোমারও—সে মানে 'তুমি আছ আমি আছি'—এ জীবনে এই সত্যকেও সত্য করলেই তাহার সম্পূর্ণতা—মানুষের ইতিহাসের শেষ বাণী তো এই 'ভালোবাসি'।

আট

মাস্টার সাহেবকে এতক্ষণে একলা পাওয়া গেল। সমস্তটা সময় এক জন না-একজন তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল। শান্ত মানুষটি, ধীরে ধীরে তাহাদের কথা শুনিয়াছেন। তাঁহাকে না বলিলে কাহাকে বলিবে কানাই হাজরা নিজের বাড়ির কথা? বুলকনই বা স্ত্রীর পীড়া ও পুত্রকন্যার শিক্ষার পরামর্শ কাহার সহিত করিবে? মঞ্জু, বিজয়, দিলীপ কাহার নিকট শুনিবে রেগুলেশন থ্রির যুগের কাহিনী, কানপুর-মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলার কথা?

উত্তেজনা নাই কোনো কথায়। শান্ত চোখ, শান্ত মুখ। বর্ষীয়ান মানুষের স্নেহ-শ্রীময় রূপ। কোথাও আতিশয্য নাই; বরং অকিঞ্চিৎকর, সাধারণ তাঁহার রূপ ও বেশবাস। সর্ব বিষয়ে তবু পরিচ্ছন্নতা আছে, আর শান্ত অমায়িকতা। মৃদু স্থির তাঁহার কণ্ঠস্বর, দৃঢ় স্থির তাঁহার মত। ব্যক্তিত্ব তাঁহার সরল বা অসামান্য—এমন কথা কেহ বলিবে না। ঔজ্জ্বল্য বা কোমলতা, তীক্ষ্ণতা বা গাম্ভীর্য, জটিলতা বা সরলতা—ব্যক্তিত্বের এইরূপ কোনো একটা সুপরিচিত সংজ্ঞার মধ্যে পুরিয়া এই মানুষকে লইয়া নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই।...ব্যক্তিত্ব আপনাতে আপনি প্রকাশ—কে বলিল? ব্যক্তিত্ব আপনাতে আপনি যেমন সম্পূর্ণ নয়,

ইন্দ্রাণী, তেমনি প্রতি মানুষের ব্যক্তিত্ব দিন-রজনীর জ্ঞাত-অজ্ঞাত শত শত ঘটনা ও মানুষের মধ্য হইতে আপনার প্রাণরস সংগ্রহ করিয়াই হয় বিচিত্র ও বিশিষ্ট, অপূর্ব ও বিকাশশীল---এই আজও যেমন তাহা লইতেছে অমিত,---লইয়াছেন মাস্টার সাহেব সারাক্ষণ প্রত্যেকটি মানুষের কথা ও সমস্যাকে স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ করিয়া,---প্রত্যেককে বিনা প্রয়াসে তাঁহার আপনার করিয়া, আর তেমনি আবার সহজ অমায়িকতায় প্রত্যেককে আপনার অভিজ্ঞতার ফল দুই হাতে সমর্পণ করিয়া,---'তুমি আছ, আমি আছি'---সেই নব-নব ব্যক্তিত্বের, বিকাশের মধ্যে আপনার সেই ব্যক্তিত্বকেও এইভাবে মিলাইয়া মিশাইয়া, কাল হইতে কালান্তরে হারাইয়া যাইতে যাইতে। অথচ তাহার চেতনা ইহাদের সকলকার জীবনকে ঘিরিয়া আগাইয়া গিয়াছে উহার বাহিরে—যেখানে আজ শত শত কর্মী অকস্মাৎ ব্যাধ-বিতাড়িত শিকারের মত আপনাদের রক্ষায় ছুটিয়াছে;---তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন, তাহাদের কর্মী-জীবন, সকল কিছু সমবেদনায় জানিতে জানিতে, বুঝিতে বুঝিতে সেই চেতনা গণনা করিয়া চলিয়াছে সাবধানী বৈজ্ঞানিকের মত—এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফলাফল।

মাস্টার সাহেবের সঙ্গে সারা দিনের শেষে এই মুহূর্তে সেই হিসাবটাই অমিত একবার মেলিয়া দেখিতে, বুঝিয়া লইতে চাহিতেছিল—'আমরা জনতার মুক্তি চাই, কিন্তু জনতা আমাদের চায় না।' মাস্টার সাহেব,—আমরা চাইলেই তো হ'বে না—জনতাই চাইবে জনতার মুক্তি...কিন্তু তাহারা আমাদের চায় না—আমাদের পার্টি আজও জনতার পার্টি নয়।...মাস্টার সাহেব তা মানেন।—সন্দেহ নাই, বড় অপ্রস্তুত তাহারা। কিন্তু আরও সন্দেহ নাই—প্রস্তুত আজ পৃথিবী, প্রস্তুত আজ ইতিহাস। এশিয়ায়ও তাহার পদপাত শোনা যায়; চীনে তাহা সুনিশ্চিত; এদেশেও তাহার পথ প্রস্তুত হইবে। এই ত কত দিক দিয়া, কত রূপে সেই ইতিহাস কত বিভিন্ন চরিত্রের মানুষকে আজ সবলে টানিয়া আনিয়া পাশা-পাশি দাঁড় করাইয়া দিতেছে: বুলকন ও সৈয়দ আলী; কানাই হাজরা ও তপন; মঞ্জু ও সবিতা! কোনো সত্যকার সুস্থ-স্বভাব গভীর-চেতনার মানুষ আজ ইহার তাৎপর্য না বুঝিয়া পারে না---যুগের প্রয়োজন কেমন করিয়া এমন বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষকে একত্র করিয়া তুলিতেছে।---এমনি করিয়া মানুষের মুক্তির পথ রচিত হইতেছে, অমিত।

'গাড়ি এসেছে, এবার আপনারা চলুন। দু'বারে নিয়ে যাবে।'---একখণ্ড কাগজ হাতে করিয়া একজন গোয়েন্দা কর্মচারী আসিয়া দাঁড়াইল।

কোথায় নেবে?

জেল কাস্টোডিতে।

কি ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে আমাদের জামা-কাপড়ের? ওবেলা আমরা নাই নি, খাই নি—

সব ব্যবস্থা আছে সেখানে।

বাজে কথা। জেলে খাওয়া-দাওয়া শেষ হয় বিকাল পাঁচটায়। আর এখন রাত্রি আটটা।---মোতাহের বলিল,---কিছু পাওয়া যাবে না।

গোয়েন্দা কর্মচারী বলিল, আমরা জেলে ফোন করে রেখেছি, সব আয়োজন তাঁরা করবেন,---

অমিত বিশ্বাস করে না। 'বেইমানের কথা', বুলকন তখনি জানায়। অন্যরাও তাহাই মনে করে। কিন্তু এই আপিসের ছোট বড় 'সাহেবরা' এখন একজনও কেহ নাই, এতগুলি লোকের কোনো ব্যবস্থা না করিয়াই তাহারা পালাইয়াছে। গোয়েন্দা কর্মচারীও নিরুপায়। আর, এই ঘরে এতক্ষণ আবদ্ধ থাকিয়া অমিতেরাও সকলেই শ্রান্ত। থানার হাজত আরও জঘন্য। জেলে, খানিকটা হাওয়া মিলিবে। খাবার মিলিবে না, বিছানাপত্র, কাপড়-চোপড়ও এ রাত্রিতে মিলিবে না। স্নানের জল? না, এই রাত্রিতে তাহাও মিলিবে না। তবুও এই ঘর ছাড়িতে পারিলেই এখন বাঁচা যায়। একাদিক্রমে বারো-তেরো ঘন্টা এতগুলি লোক একটা ঘরে, খাবার জলের বন্দোবস্ত পর্যন্ত যেখানে নাই, আছে শুধু পাহারার বন্দোবস্ত।

মাস্টার সাহেবের সঙ্গে কথাটা আর শেষ হইল না। জেলেই হইবে আলোচনা; পাওয়া যাইবে মোতাহের ও সৈয়দ আলীকেও।

প্রথম গাড়িতে যাহারা যাইবে তাহাদের নাম পড়া হইতেছে। হাস্য কৌতুকে সংবর্ধনা হয় প্রত্যেকটা নামের। শুনিতেছে অমিত। এক-একটা নাম শোনে আর তাহার মনে পড়ে এক-একটা জীবনের ছবি।

'সুরথ ভট্টাচার্য' : চব্বিশ পরগনার কৃষক সভার...বছর পঁচিশের যুবক,—ফর্সা রং রৌদ্রেও ময়লা হয় নাই : সাত বৎসর ধরিয়া নিশ্বাস ফেলেন নাই---যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী---তারপর তেভাগা। গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে গ্রামে হাজার কাজ লইয়া ছুটিয়াছেন সুরথ। দুই একটা মামলায় গোড়ার দিকে এক আধবার ওয়ারেন্ট্ হইয়াছিল, জেলও একেবারে অচেনা নয়। কোর্টে সর্বত্র তাহাকে লোকে জানে---হাজার ব্যাপার লইয়া বুদ্ধিমান্ সুরথ ভটাচার্য লাগিয়াই থাকেন। কাজ করিতে জানেন, সর্বক্ষণ হাসিয়া কথা বলিতে জানেন, সব চেয়ে বেশি জানেন এই কথা, সহজে কাজ করা যায় না, ধৈর্য চাই। তাই হাসি তাঁহার মুখ হইতে মিলাইয়া যায় না।

কিন্তু মিলাইয়া যায় মুহূর্তের মধ্যে চলচ্চিত্রের এ চিত্র, নূতন নাম কানে পৌঁছায়।

'মহেশ দাস' : বছর ত্রিশের যুবক, কাহার পাল্লায় পড়িয়া ঝুঁকিয়াছিলেন স্বদেশীতে। তারপর দেখিয়াছি তাঁহাকে সেবার---এ জেলেই। দেখিয়াছি কতবার চব্বিশ পরগনার গাঁয়ের কৃষক দলে, গ্রামের নানাকাজে। গাঁয়ের স্কুলটাকে হাইস্কুল করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দেখা করিতে কাল শহরে আসিয়াছিলেন বুঝি? বেশ, আপাতত চলুন জেলে।

ফুটিতে না ফুটিতে চিত্রটা মিলাইয়া গেল আর একটি নামের ঘোষণায়।

'সৈয়দ আলী' : একটা হর্ষধ্বনি পড়িয়া গেল। অমিতও যোগ না দিয়া পারিল

না : 'তাস নিয়েছেন ত? সিগারেট, পান জর্দা?' না, পান জর্দা যথেষ্ট না লইয়া সৈয়দ আলী জেলেও যাইবেন না। 'তিনি না এলে আমরা পান পাব কোথায়? সৈয়দ আলীকে না পেলে আমরা গল্প করব কার সঙ্গে? জেলটা চিনিয়ে দেবে কে? কয়েদিরা মানবে কেন আমাদের?' এতদিনকার জেলের অভিজ্ঞতা সৈয়দ সাহেবের—সেই ১৯২২ থেকে? ১৯৩০-এও; হাঁ, পালাটা একটু দীর্ঘ হইয়াছিল সেবার, সাত বৎসর। ১৯৪০-এও আবার; কয়দিন মাত্র। এখন ১৯৪৮-এও এবার—স্বাধীন ভারতে।

পাকিস্তানে গেলেই পারতেন?

সে কি আমার দেশ? সে ত আপনাদের 'বাঙালদের' দেশ! আমরা চব্বিশ পরগনার মানুষ—সৈয়দ আলী ভয়ানক ক্ষুব্ধ। স্বাধীনতার জন্য তাহারা পুরুষানুক্রমে সংগ্রাম করিয়াছেন, তিতু মিঞার সঙ্গে ছিল তাঁহাদের আত্মীয়তা, যোগাযোগ। সরকার কেন, কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহারা হাত পাতিতে জানেন না। আত্মভোলা, আয়েসি, লেখাপড়া জানা, আরবী উর্দুতে সুশিক্ষিত, ইংরাজী বাংলায় দোরস্ত, সৈয়দ সাহেব না চাহিলেন লীগের ছায়া মাড়াইতে, না চাহিলেন "কংগ্রেসী মুসলমান" হইতে। হইলেই হইতে পারিতেন ঢাকায় বা করাচীতে লীগের মন্ত্রী, হইতে পারিতেন কংগ্রেসী মুসলিম—দিল্লীর উজীর ওমরাহদের খাশমুন্‌সি। বাধা কিছুই ছিল না। বিদ্যাবুদ্ধি, পারিবারিক প্রভাব-প্রতিপত্তি সবই ছিল। কিন্তু বাধা হইয়াছে নিজের প্রকৃতি—'আঃ, এ কি হয় নাকি? একটা আন্দোলন করছি, সংগ্রাম চালাতে হবে।' হয় না। সংগ্রাম চালাইতে হইবে, তিতু মিঞার দিন হইতে তাহাই তাঁহারা জানিয়াছেন। তাই হইল না অন্য কিছুই করা : আরামপ্রিয়, আলাপপ্রিয়, আড্ডাবাজ, অমায়িক, সৈয়দ আলীর রাজনৈতিক আন্দোলনে জেলে ছাড়া বাহিরেও বেশি দিন থাকা হয় না। শরীরটা তাই আর সুস্থ নাই; পঞ্চাশে পৌঁছিয়াছেন বই কি। কিন্তু দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ সুপুরুষকে দেখিয়া সকলকে তব আপনা হইতেই সম্ভ্রম করিতে হয়; কথা বলিতেও ইচ্ছা হয়, আর তারপর তিনি মুখ খুলিলেই জমিয়া যায় আত্মীয়তা।

আসুন তা হলে অমিতবাবু;—হাস্যভরা কণ্ঠে ডাকিলেন সৈয়দ আলী,—কাঠের চেয়ারে বসে বসে পিঠ ধরে গেল। গিয়ে জেলের লোহার খাটটায় অন্তত টান হতে পারা যাবে।

একটু আগেই যান,—আমরা নয় রাত্রিতে নিজের ঘরেই ফিরে যাব।

আপনার আবার ঘর কি, মশায়? ঘর আমাদের।—ছেলে আছে, মেয়ে আছে। হাঁ, বড় মেয়ের ছেলে হয়েছে...বড় ছেলের বিয়ের কথা পাকা হয়েছে...একটা রেসপেক্‌টেব্‌ল সিটিজেন অব্‌ দি ইণ্ডিয়ান ডোমিনিয়ন।

বটে? না ফিফ্‌থ কলাম অব্‌ পাকিস্তান? আমাদের শিশুরাষ্ট্রকে নুন খাইয়ে মারবার ষড়্‌যন্ত্র করেছেন এখানে।

কথার কাটাকাটি ফুরায় না, হাসি মিলায় না। কয়েকটা নাম ইতিমধ্যে এক-একটা

ক্ষীণ বিদ্যুদাভাসের মত চমকিয়া গিয়াছে—'কৈলাস দত্ত'...প্রাদেশিক কৃষক সভার।... 'শত্রুঘ্ন চক্রবর্তী', না, আমি নই, আমি শত্রুজিৎ...' 'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক করছি শত্রুজিৎ'...বেলেঘাটার ট্রেড ইউনিয়নের কর্মী বুঝি,—সৈয়দ আমীর সঙ্গে পরিহাসে কানে যায় না, নাম চলিয়া যায়।

'বিনোদ ভট্টাচার্য' : আর প্রয়োজন নাই শুনিবার। ইতিহাসের পাতায় ইঁহারা পদার্পণ করিয়াছেন। সেদিনে ভুজঙ্গ সেনদের বন্ধু ছিলেন, সহকর্মী ছিলেন একালের মন্ত্রিবর্গের—জেল, সংগ্রাম, সংগঠন আবার জেল, আবার সংগঠন, মৃত্যুর যজ্ঞ। চট্টগ্রাম, শেষ যুগ স্বদেশীর, কালাপানি, আর কালাগরাদ—ইঁহাদের এই রক্ত-অভিষিক্ত পথ বাহিয়াই স্বদেশীর রথ লালদীঘিতে আর কালোবাজারে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু আবার জেলে ফিরিতেছেন বিনোদ ভট্টাচার্য—নূতন ইতিহাসের নূতন পাতা খুলিতেছে ওদিকে। এদিকে তাঁহার পূর্ববন্ধুরা খুলিতেছে জাতীয়তার নূতন হিসাব—কালো-বাজারের পাকা খাতায়।

'মথুরা বাক্‌চি' : ইতিহাসের যাত্রাপথের প্রায় চল্লিশ বৎসরের সাক্ষী, কাহারো চোখে পড়িবেন না, সামান্য মানুষ কেহ এড়াইবে না তাঁহার অসামান্য দৃষ্টি। কৈশোর্ আগে সেই স্বদেশীর প্রথম পর্বে প্রথম কৈশোরে তাঁহার যাত্রা শুরু হয়; তারপর আলোতে অন্ধকারে, গোপনে গোপনে পথ-চলা; পদে পদে দুঃখের কন্টক-জ্বালা, পদে পদে অবিশ্বাসীর সর্পদংশন, পদে পদে সংগঠনের নূতন আয়োজন। জেল হইতে জেলে তাঁহার পথ চলা, দেশ হইতে বিদেশে,—কালাপানির পারে, মরুভূমির ছায়ায়। সেখানে চোখে পড়িল ইতিহাসের নূতন বাঁক, নূতন মোড়। স্বদেশীর পথ মিশিল আসিয়া ইতিহাসের নূতন পথে। আবার যাত্রা। নিঃশব্দ নিরলস নিরভিমান আশ্চর্য মানুষের আশ্চর্য সংকল্প ফুরায় না। চলে, চলে, চলে। ক্ষীণহাসি বাক্যকুণ্ঠ মানুষ যেন সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াই এখনো উঠিতে চাহিলেন জেলের গাড়িতে।

'জ্যোতির্ময় সেন' : জ্যোতির্ময়—জেল আর আন্দোলনের মধ্য দিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি তাহার নিঃশেষিত। মণীশের বন্ধু সে, সুধীনের আত্মীয়। মিনতিকে লইয়া ঘর বাঁধিতে গিয়াও যে পাকা করিয়া ঘর বাঁধে নাই। ছুটিয়াছে পথে পথে, কৃষকদের গ্রামে গ্রামে। বারে বারে পার্টি গড়িতে গিয়াছে পূর্ববাঙলার মুসলমান চাষীদের লইয়া, বারে বারে ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছে তাহা লীগ। তবু একদিন ব্যর্থ প্রয়াসেও ব্যর্থতা বোধ করে নাই জ্যোতির্ময়; আর আজ বাঙালী জাতির ঘর ভাঙিয়া যাইতে সে আকুল ঘরের চিন্তায়। মিনতি আর পাকিস্তানে যাইবে না। কেমন করিয়া পাকিস্তানে ফিরিবে তবে জ্যোতির্ময় সেন? মিনতির আপত্তি যে। মিনতি ফিরিতে দিবে না। কি হইবে তবে মিনতির? কি করিবে জ্যোতির্ময় সেনই বা?

'বেণু ঘোষ', 'সূর্যনাথ', 'শংকর দয়াল', পর পর কয়েকটা নাম যেন কানে গেল না অমিতের।—কি করিবে জ্যোতির্ময় সেন? কি করিবে মিনতিই বা এখন? কি করিবে? কি করিবে নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবনের টানে ছিটকাইয়া পড়া এমন কতজনে, কে কোথায়?

'কান্তিলাল চতুর্বেদী' : 'ইয়েস প্লিজ'। প্রিয়দর্শন যুবক বুঝি অধ্যাপকের নাম ডাকায় সাড়া দিতেছে। সকলে হাসিয়া উঠিল।

প্রাণবান্ যুবক-প্রকৃতি আপনার বিদ্যা ও বুদ্ধি লইয়া যেন তৃপ্ত হইতে পারে না। কাগজ পড়ে, তর্ক করে, ছাত্রদের রাজনীতির সভায় চমক দিয়া যায় বিদ্যুতের মত। তারপর আলোকের মত ছড়াইয়া পড়ে; নাচিয়া বেড়ায় শ্রমিক আন্দোলনের বারি-কেডারে। হাতে কাগজ, মুখে কথা, চটকলে-রেলওয়েতে তাকে কোথায় সে নাই? এখানে, ওখানে, সেখানে কোথায় নাই কান্তি? আর সর্বত্র দাবি 'কান্তি কো চাহি'। —বলিতে হইলে চাই, লিখিতে হইলে চাই, অন্য ইউনিয়নকে বুঝাইতে হইলে চাই, অমুকস্থানে প্রতিনিধি পাঠাইতে হইলে চাই। কান্তিকে চাই হাসিতে হইলে, কান্তিকে চাই নাচিতে হইলে, কান্তিকে চাই গল্প করিতে হইলে। কান্তিকে চাই চা বানাইতে—গেলাস ভাঙিতে, কান্তিকে চাই দাবা খেলিতে খেলায় তর্ক করিতে, কান্তিকে চাই পড়িতে, পড়ার থেকে বেশি কথা বলিতে। মোটকথা কান্তিকে সকলের চাই। আর কান্তিরও তাই সময় হয় না আম্বালায় তাঁহার মাকে দেখিবার, আহমদাবাদে তাহার ভাইকে দেখিবার, নৈনিতালে তাঁহার নূতন বৌদিকে দেখিবার। সময় পাইল কই দু বৎসরের মধ্যে কান্তি? কিন্তু এবার তাঁহারা আসিতে পারিবেন ইচ্ছা করিলে এখানে; কান্তি জেলেই আছে, আর যাইবে কোথায়? দেখা হইবে।

এমন দল চলিয়া গেল প্রায় ত্রিশজন?

ঘরটা একবারের মত স্তব্ধ হইল, লোক কমিয়া গিয়াছে বুঝা যায়। বুঝা যায় মালা শুরু হইয়াছে। এতক্ষণ যে হাস্য-মুখরতায় শ্রান্তি আসিয়াছিল তাহার ফলেই হয়ত একটু বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। কেহ তবু নীরব থাকিবে না। থাকিতে পারে না।

সাড়ে আটটা বাজিতেছে যে।

'আপনাদের ট্যাক্সি এসেছে' —মেয়েদের বলিল এক কর্মচারী।

ট্যাক্সি?

হাঁ, আপনাদের ট্যাক্সিতে নেবারই নির্দেশ হয়েছে।

হবেই ত। আমরা ত আর তোমাদের মত বাজে প্রিজনার নই—হাসিয়া মঞ্জু বিজয়কে বলিল।

যাবে আর কোথায়? শুনলাম ত, দেখবে জেলখানার একেবারে জেনানায় ঢোকাবে।

সত্যি, অমি' মামা?

সত্য কথা,—অমিত বুঝাইল।

আপনাদের সঙ্গেও দেখা হবে না জেলে?

সম্ভাবনা নেই। জেলে তোমাদের পক্ষে আমরা সকলেই পুরুষ—সুপারিনটেণ্ডেন্ট, আর গোয়েন্দা কর্মচারীরা বাদে।

কিছুতেই তা হবে না। একটা উপায় করতেই হবে। আপনি আমার মামা এ বললেও দেখা হবে না?

মামা ছেড়ে দাদা হলেও হবে না—দিলীপ পরিহাস করিল।

তা হলে? কিন্তু আমি ওভাবে থাকতে পারব না।

এক কাজ করতে পার—ক্লেম্ করে বসো একজনকে হ্যাজ্‌বেণ্ড বলে, অবশ্য এমন বেকুফ যদি কেউ থাকে স্বীকার হবে তোমার দাবিতে।

মঞ্জু বলিল: মন্দ কি? দেখি তোমাদের মধ্যে কে হাসি ও গল্পসল্প করতে পারে।

তার চেয়ে দেখো না কে ঝগড়া করতে পারে। নইলে তোমার জুড়ী হবে কে?

ওঃ, তোমার দরখাস্ত পেশ করছ বুঝি? রিজেক্টেড, এখনি বলে দিচ্ছি।

তা হলে কে ডেফ্ এণ্ড ডাম্ব, তোমার কথা যার কানে যাবে না দেখ, অথচ তুমি অজস্র বকতে পারবে।

দরখাস্ত করো ত আগে।

এ্যাপ্লিকেশনস্ আর ইনভাইটেড্ ফর্ এ ডেফ-ডাম্ব টু এ্যাকট্ এজ হাজব্যাণ্ড অন প্রোবেশন টু এ চ্যাটারবক্স?—দিলীপ বলিল।

কিন্তু ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া।

অমিতদেরও গাড়ি দাঁড়াইয়া।

একের পর এক আবার নাম পড়িয়া যাইতে লাগিল কর্মচারী---কেহই বাদ যাইবে না, জানা কথা।

কিন্তু শুধু নাম নয়,---চিত্র, একটা নূতন অধ্যায়ের ইঙ্গিতও সঙ্গে সঙ্গে।

'মোতাহের': অমিতের বহু বহু দিনের বন্ধু, শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসের অজ্ঞাত পর্ব হইতে আজ যে এই প্রবল বিপ্লবমুখী পর্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

'বুলকন': 'ট্রামকা বাহাদুর মজদুর'...

'মাস্টার সাহেব'...

একবারের মত থামিয়া গেল সেই কর্মচারী; সকলের কণ্ঠ নীরব। তারপর 'দিলীপ দত্ত': ছাত্র আন্দোলনের অক্লান্ত নায়ক। করতালি দিয়া উঠিল মঞ্জু।

'তপন ভট্টাচার্য': ফিজিক্সের লেবরেটরি হইতে দেশলক্ষ্মী ইউনিয়নে যাহার পথ চলিয়া আসিয়াছে, আবার গৌরীর স্বামী—

'বিজয় চ্যাটুজ্জে': খেলা আর ফটো তোলা হইতে কবিতায় যাত্রা করিয়া, হাত খোয়াইয়া পা প্রায় হারাইয়া অকারণ গুলিতে, আসিয়াছে আজকের গণ-আন্দোলনের দিকে জনতার মর্মাবেগে যে কবিতার মধু সংগ্রহ করিবে—

'অমিত': ছেঁড়াপাল, ভাঙা-হাল অমিত, তবে সত্যই তোমারও আর একদিনের যাত্রা হইল শুরু জোয়ারের মুখে—

গান ধরিয়াছে সবাই—গান ধরিয়াছে—গাড়ি তৈয়ারি।

অমি' মামার সঙ্গে একটা কথা আছে—মঞ্জু অমিতের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

অমি' মামা, সকাল থেকে আপনাকে একটা কথা বলব ভাবছি?—একটু স্থির হাসি মঞ্জুর মুখে এবার।

আর এখন বলছ তা? না বললেই পারতে। কি এমন কথা, মঞ্জু?

এই মাত্র ঠিক করেছি, অবশ্য আর কাউকে জানাই নি, জানাব এর পরে ; আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

অমিত একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। বিস্মিত হইল। পরে বলিল : হঠাৎ, এখানে ঠিক হল তোমার বিয়ে ?

এই জন্যই ত এখানে এসেছিলাম, বর খুঁজতে,—বলেছি আপনাকে সকালে। পরিহাস মঞ্জুর। দুষ্টু ইয়ার্কির হাসি।

সকাল বেলা এখানে পৌছিয়াই মঞ্জু দেখিল বিজয়। এবার আর বিজয়ের এড়াইবার উপায় নাই। মঞ্জু বলিল, 'এখন কথা দাও। আর 'না' বললেও শুনব না, তা ত জানোই।' কথাটা নূতন নয়। কিন্তু বিজয় আপনার সংকল্প প্রায় সুস্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। আর যাহাই হউক, সে স্ত্রীলোকের প্রেম-প্রত্যাশা করিবে না। যাহার একটি হস্ত দুর্বল, একটি পদ প্রায় খঞ্জ, তাহাকে কেহ স্বেচ্ছায় আত্মদান করিতে আসিবে না। বরং বিরাগ থাকিবার কথা একটা বিকলাঙ্গ মানুষের প্রতি। আর যদি জানে ইহার উপরে বিজয়ের আহার কত সামান্য, ভবিষ্যৎ আর্থিকজীবন অনিশ্চিত, তাহা হইলে উপেক্ষা ছাড়া কিছুই বিজয় লাভ করিতে পারে না কোনো তরুণীর নিকট।

কাজের পথে মঞ্জুর সঙ্গে পূর্বেই তাহার পরিচয় ছিল। তখনো মঞ্জু ছিল হাস্যময়ী বন্ধু। কিন্তু দৈহিক দুর্বিপাকের পরে মঞ্জু তাহার নিকটতর হইয়া উঠিতে লাগিল। আসিয়া গেল অন্তরের তটে। কিন্তু বিজয় আপনার সীমানায় আরও আপনাকে সুদৃঢ় করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল। মঞ্জু কিছুতেই তাহার অন্তর্লোকে প্রবেশ-পথ পায় না। বিপ্লবের মুখে আজ পৃথিবী, বিপ্লবের পথে সাথী তাহারা :—ইহার বেশি কোনো পরিচয়কে সত্য বলিয়া মানিতে স্বীকৃত নয় বিজয়। সত্য,—আর মানে—কবিতা।

তারপরে আজ এই কয় ঘন্টার যুক্তিতর্ক, চিন্তা : আর শেষে হয়ত কবিতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরে উভয়ের উভয়কে স্বীকৃতি।

মঞ্জু জানাইল, বিজয় বলে কি না ওর এক হাত অকেজো, একখানা পাও প্রায় অচল। আমি বলি, বেশ ত, গিয়েছে যা মাত্র একটা করে, পাবে তা দ্বিগুণ করে। নাও আমার দুটো হাত, আমার এই দুটো পা। আর জানো ত আমার হাত পায়ের মূল্য ? উম্যানস্ 'ভলি বলে' আমি সেন্টার। আমার সঙ্গে দৌড়-ঝাঁপে পারবে তোমাদের ক'টা ছেলে ? বাঃ ; খেলাই বা ছাড়ব কেন ? জর্জিয়ার মেয়ে যদি চাল ছুঁড়তে পারেন, ত্বিলিশের রাষ্ট্র সোভিয়েতের সদস্য হতে পারেন, জনসাধারণের হাজার কাজ করতে পারেন, আবার পালন করতে পারেন তিনটে' ছেলেমেয়ে, তা হলে মঞ্জুও পারবে অন্তত বিজয়কে নিয়েও ওসব করতে—মিটিং করতে, মিছিল করতে, তাকে খাওয়াতে-দাওয়াতে, তার কবিতা শুনতে আর 'ভলি বল' খেলতে।

অর্থাৎ ঠিক হইয়াছে মঞ্জু পথে চলিবে বিজয়কে বহিয়া লইয়া, আর বিজয়

আকাশে চলিবে মঞ্জুকে বহিয়া লইয়া—অবশ্য যদি ইহার পরে, জেলের ফাঁকে ফাঁকে মিলে তাহাদের অবকাশ—পথ ও আকাশ।

গাড়িতে উঠিতে হইবে এখনি অমিতের। তাড়াতাড়ি আপনার সুটকেস খুলিয়া কি সে খুঁজিল। তারপর বাহির করিল সেই পুরাতন বহুদিনের সহচর শেক্‌সপীয়ার। খুলিয়া মঞ্জুর হাতে দিয়া বলিল, আর এই আমার আশীর্বাদ। মঞ্জু, তোমাকে বিজয়কে।

কিন্তু আপনি তা হলে পড়বেন কি জেলে, অমি' মামা?

জেলে পড়ার জিনিসের অভাব কি, মঞ্জু? দেখবে এমন মহানাটক যা দেখেও শেষ করা যায় না।...সৃষ্টির বিস্ময় সে, তার নাম মানুষ।

...মানুষ—ম্যান! হোয়াট্ এ নোব্‌ল ওয়ার্ড! সেই ত মহাকাব্য, বিচিত্রতম মহাকাব্য সে সৃষ্টির; আর আরও বিচিত্রতর মহানাটক সে সৃষ্টি করিতেছে। এই মানব-সিন্ধুর তীরে দাঁড়াইয়া শেক্‌সপীয়ার বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন—হোয়াট এ পিস্ অব ওয়ার্ক ইজ ম্যান: তখনো বোঝেন নাই হোয়াট এ মেকার ইজ ম্যান। সেই মানব-রস-সমুদ্রের গভীর অতলকে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে অমিত মাঠে-ঘাটে-ক্ষেতে-পথে সহস্রের মধ্যে। স্পর্শ করিয়াছিল সেবার জেলেই; জানিয়াছিল, সবার উপরে মানুষ সত্য। তাহাই স্পর্শ করিবে আবার এখন জেলে। কিন্তু শুধু সেখানে কেন, অমিত, এখানেও সর্বখানে সর্ব দিকেই তুমি পাইয়াছ সেই ভাবী মানুষের অঙ্গীকার—ম্যান দি মেকার।

অমিত মঞ্জুকে বলিল: আর বিজয় বোধ হয় প্রেমের কবিতাও লিখবে জেলে এবার। না হয় পড়তে পারবে তোমার স্তুতি—বলিয়া সে মঞ্জুর শির চুম্বন করিল।

মঞ্জু অমিতকে প্রণাম করিল—চপলা সেই মঞ্জু হঠাৎ সুরো হইয়া গেল যেন পলকের জন্য।

কেমন একটা আনন্দ ও বেদনায় দুলিয়া উঠিল অমিতের মন:—এ দেশের মানুষও জীবনকে আজ স্বীকার করিতে জানে। এদেশের মেয়েও—সবিতার মত ঐতিহ্য-বিমুগ্ধ ভীত সংকুচিতা মেয়েও তোমাদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায়। সুরোর মেয়েও সুরোর মত আর আপনার মধ্যে আপনাকে নীরবে নিঃশেষ করে না। ইন্দ্রাণীই বিদ্রোহের পথে বিক্ষিপ্ত থাকিবে? সে হয় না।—অমিত তাহা সহ্য করিবে না।

গৌরী আপন বিক্ষোভে আপনি বিপর্যস্ত হইবে? না, তপন না, তাহা হয় না। মিনতি আঁকড়াইয়া ধরিবে কি স্বামীকে? ভাগ্যবিড়ম্বনায় সহিবে কি পরাজয় নিজের ও স্বামীর?...অভিনন্দন করি তোমাকে, মঞ্জু! ভেবেছি 'মস্তিষ্ক-বিহীনা-চপলা বালিকা' তুমি, তুমি 'সীরিয়াস' নও সবিতার মত। হয়ত তাই পৃথিবীতে তোমরা হালকা চরণে চলিতে শিখিয়াছ, আর হয়ত হালকা হাতে গ্রহণ করিতে শিখিয়াছ জীবনের পরম দান জন্ম, মৃত্যু, প্রেম। সত্য, ইতিহাসের চরম দায়িত্ব

বিপ্লব। তাই বলিয়া গম্ভীর না হইলেই কি মানুষ গভীর হয় না? জীবন এমন কি দুর্বহ, বিপ্লব এমন কি দুঃসহ, প্রেম এমন কি দুর্ভার? তোমরা হাল্কা হাসিতে তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে। 'মস্তিষ্ক-বিহীনা', চপলা তুমি, পিতার বিরুদ্ধের কথা বলিতেও যে সংকুচিত হয় না এ দেশে; ভীতা হয় না যে পিতার ক্রোধে গ্রাসাচ্ছাদনের স্বাচ্ছন্দ্য বঞ্চিত হইয়াও, হাসিয়া যে নিজের জীবনকে নিজে গঠন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে, মধু কণ্ঠে জানায় মাতার বেদনাময় জীবনের মর্মকথাও সে বোঝে, আর মধু হাস্যে যে ফাটিয়া পড়ে বন্ধুদের সঙ্গে পথ চলিতে, চৌরঙ্গী ধর্মতলার মোড়ে বন্ধুদের পার্শ্বে, দাঁড়াইয়া রাইফেলের গুলিকে স্বচ্ছন্দে তুড়ি দেয়, গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি করিতে ভয় পায় না, শালীনতা-শোভনতার বালাই লইয়াও মাথা ঘামায় না; আর উৎফুল্লচিত্তে স্বীকার করে দিলীপের স্বচ্ছন্দ বন্ধুত্ব নিজের দায়িত্বে; আহবান করে বিমলের প্রেম আপনার দায়িত্বে। মস্তিষ্ক-বিহীনা, দায়িত্ব-বিহীনা, চপলা, মঞ্জু; তুমিও বুঝি নূতন নারী এ দেশের, পার্বতীর মত, নারাণীর মায়ের মত, সুজাতার মত, আর হয়ত বা দায়িত্বময়ী, কর্তব্যময়ী অনুর মতও।

...হয়ত অনুর সঙ্গে আর অমিতের দেখা হইবে না।...ইন্দ্রাণীর সঙ্গেও কথা হইবে না...কঠোর গোপনতায় অনুর দিন যাইবে—তাহার যাত্রা গভীরতর বাধা-বিঘ্নের পথে শুরু হইল, তাহার ও শ্যামলের। সংগ্রামের বিষম পরীক্ষায় প্রতিটি মুহূর্তে যাচাই হইবে তাহারা। কিন্তু সে অনু; সে আত্মসচেতন, দৃঢ়চিত্তা; মঞ্জুর মত হাস্যময়ী সে নয়, সে মমতাময়ী কিন্তু কর্তব্যময়ী। মাতৃহীন গৃহে সে গুরু দায়িত্ব লইয়াছে সহজ চিত্তে, মনুকে দিয়াছে স্নেহ, বার্ধক্যগ্রস্ত পিতাকে সেবা করিয়াছে তৃপ্ত অন্তরে; আপন শান্তিতে ইন্দ্রাণীর মতই সে আপনাকে গঠন করিয়াছে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়া আপনার পথ নির্বাচন করিয়াছে; আপন দায়িত্বে গ্রহণ করিয়াছে জীবনের সঙ্গীকে, দুইজনে স্থির পদে আগাইয়া চলিয়াছে এই কঠিন পথে। বাহুল্য নাই, চাপল্যও নাই; স্বভাবে তাহার সংকোচও নাই, কিন্তু আছে সহজ সম্ভ্রমবোধ, আছে মর্যাদাবোধ, সাধারণ মানুষের মর্যাদায় বিশ্বাস। হয়ত পিতৃ-স্বভাব পাইয়াছে অনু, সেই ব্যক্তিত্ব পাইয়াছে। কত বড় রূপান্তর তবু ভাবো, অমিত, কত বড় রূপান্তর সুরো থেকে মঞ্জু; সেই সবিতা থেকে এই সবিতা, তোমার পিতা থেকে মনু, অনু আর তুমি! সেদিনের উদার মানবতা-বোধ আজ উদ্বুদ্ধ সৃষ্টিময় মানবতাবাদে—কোথায় এখন তোমার 'সপ্তম হইতে নবম শতাব্দীর বাঙলার ইতিহাস', কোথায় তোমার উনবিংশ শতকের বাঙালী জাগরণের বিশ্লেষণ, অতীত ভারতের ইতিহাসে শ্রেণী-সংগ্রামের অনুসন্ধান, অধ্যয়ন?

'কোথায় তোমার পরিচয়' অমিত?—জিজ্ঞাসা করেছিলেন ব্রজেন্দ্র রায়। সে পরিচয় আর লেখায় ফুটিল না, কথায় ফুটিল না, ফুটিল না প্রেম-মণ্ডিত গৃহ-রচনায়; ধ্যান-সুন্দর, প্রীতি-সুন্দর গোষ্ঠী-রচনায়; একান্তে বসিয়া আত্ম-রচনায়। জ্ঞানে চিন্তায় ভাবনায়, কাব্যে-কলায়, শিল্পে কোথাও আর কোনো পরিচয় নাই তোমার। পৃথিবীর চক্ষে তবে

কি তুমি ব্যর্থ, বিক্ষিপ্ত? অথবা মানুষের এই মহদভিযানের মধ্যে মিলাইয়া গিয়াই সার্থক তুমি। জীবনের এই জোয়ারের মধ্যে ডুবিয়া ভাসিয়া পাইয়াছ জীবন-রসের পরম আস্বাদন। মানুষের এই মহাস্রোতে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াই পাইয়াছ কৌতুকে আনন্দে মানব-মহারসের অপরূপ উপলব্ধি। না, ছোট আমিতে সুখ নাই ইন্দ্রাণী। তোমাতে আমাতে জানিতে হইবে—ওনলি ইন ইন্‌টেন্স লিভিং ডু উই টাচ্‌ ইট্যারনিটি।

আশ্চর্য সুন্দর চন্দ্রালোকিত এই পৃথিবী। বাহিরে যে কৃষ্ণ-প্রতিপদের আকাশ এতক্ষণ এত জ্যোৎস্না ঢালিতেছিল কে জানিত? দেবদারুর পত্রান্তরাল হইতে আকাশের আলোক ছক্ কাটিয়া দিয়াছে গোয়েন্দা আপিসের প্রাঙ্গণের পথে, ঘাসে। চৈত্রের হাওয়া মাতলামি করিতেছে নবপত্রে, রোমাঞ্চিত বৃক্ষরাজির ডালে ডালে। আর ইহারই মধ্যে বসন্তের কোকিলও ডাকিতেছে এই গোয়েন্দা আপিসের ছায়াঘন গাছের শাখায়। কে না বলিবে পৃথিবী পরমা সুন্দরী? কে না বলিবে দি পোয়েট্রি অব অ্যার্থ ইজ নেভার ডেড্?

ব্ল্যাক মেরিয়া আহ্বান করিতেছে? আহ্বান, না স্বীকৃতি, অমিত?

দি ওয়ার্ল্ডস্ গ্রেট এজ বিগিন্‌স্ অ্যানিউ,

দি গোল্ডেন ইয়্যার্‌স্ রিট্যার্ন্‌...'ঐ মহামানব আসে!'

চলিয়ে! জেল তোড় দিয়ে ফিরব আমরা,—বুলকন সোৎসাহে বলিল, 'ইন্‌কেলাব জিন্দাবাদ!' লাফাইয়া গাড়িতে উঠিল বুলকন্।

ইন্‌কেলাব জিন্দাবাদ!

জেলের যাত্রী, না, আগামীকালের অগ্রযাত্রী?—অমিত আপনা-আপনি ভাবিতে লাগিল।

ট্যাক্‌সিতে উঠিয়া পড়িতেছে সুজাতা, টুলু; মঞ্জু করিতেছে কি? উঠিবে না কি?

'আপনাদের গাড়ি না ছাড়তে আমরা যাব না—তারপরে আপনাদের গাড়ি ছাড়িয়ে আগে যাব।' অমিতকে বলিল মঞ্জু।

'যাবেন আর কোথায়? একখানেই ত': হাসিয়া ব্ল্যাক মেরিয়ার ভিতরে মাস্টার সাহেব উঠিয়া গেলেন। কতবারের চেনা তাঁহার এই ব্ল্যাক মেরিয়া। সেই একই ব্ল্যাক মেরিয়া উনিশ শ একুশেও ছিল, উনিশ শ আটচল্লিশেও আছে—আই গো অন্ ফরএভার, আই গো অন্ ফরএভার, ব্ল্যাক মেরিয়া ও ব্ল্যাক অ্যাক্ট, পুলিশ রাজ ও শোষণ-তন্ত্র আর অন্যদিকেও একই মানুষ—মানুষের দরদে যাহার প্রাণ স্বস্তি পাইল না সেই প্রথম জীবনের প্রারম্ভ হইতে। গতিমান মানুষ।...'টু হুম দি মিজারিজ অব্ দি ওয়ার্লড্ আর মিজারিজ, অ্যাণ্ড উইল নট লেট দেম রেস্ট।'

তপন ভট্টাচার্য উঠিয়া বসিল; 'বড় অন্ধকার ভিতরটা'। এই প্রথম যাত্রা তপনের এইপথে, এ গাড়িতে—ফিজিক্‌সের লেবরেটারি আর ফিলজফির ক্লাশ-রুম পার হইয়া চটকল ও সুতাকলের সংগ্রাম ক্ষেত্রের মধ্য হইতে এই সে পা বাড়াইল ইন্ কোয়েস্ট অব রিয়্যালিটি। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ অধ্যাপক বংশের সন্তান সে—থামিবে না, থামিবে না হে সত্য, আবীরাবীর্ম এধি! আবীরাবীর্ম এধি!

কানাই হাজরা আস্তে আস্তে উঠিল। কতবার পুলিশে ধরিয়াছে, গাড়িতে চড়িয়া থানায় যাইতে পায় নাই, হাঁটিয়া যাইতে হইয়াছে। দুই একবার হাতকড়িও দিয়াছে। এখানে শহরে না হইলে এবারও দিত, আর কানাইর সঙ্গে তাহা লইয়া ঝগড়া হইত, মারামারিও হইত, না হইলে কেহ তাহার হাতে হাতকড়ি পরাইতে পারিত? চাষীর ছেলে সে কানাই হাজরা লেনিনের পার্টির মেম্বর। পাদানীতে পা-রাখিয়া ধীরভাবে কানাই উঠিল। কৃষকের সংগ্রামের পথ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, অগ্রসর হইয়াছে কানাই হাজরা শ্রমিক সংগ্রামের সহযাত্রীরূপে শ্রমিকপার্টির অভ্যন্তরে।

কি বিজয়, উঠ্‌ছ না?—পরিহাস স্বচ্ছ হাস্যে মঞ্জু তাড়না দিতেছে—কবিতা মনে পড়ে নাকি এই চাঁদ দেখে—

বিজয় তাহার দিকে তাকাইয়া হাসিল। বলিল, পড়ত, কিন্তু তোমাকে দেখে সাধ্য কি আর কিছু মনে করি রামনাম ছাড়া?

রামধুন গায়ক-গায়কীদের দলে যোগ দাও গে, মাসীমা আছেন—

বিজয় খোঁড়া পায়ে ত্বরিত-পদে গাড়িতে চড়িতে গেল।

কিন্তু এখানে আছ তুমি, পালাই ত আগে।—অদৃশ্য হইয়া গেল বিজয় গাড়ির ভিতরে।

একটা শাদা হাফ্‌শার্ট ও ধুতি, আর একজোড়া চক্ষু যাহার চশমা অন্ধকারেও ঝক্‌-ঝক্ করিতেছে, আর তাহার পিছনে আছে একজোড়া চোখের দৃষ্টিও—নিশ্চয়ই মঞ্জুর উপর তাহা নিবদ্ধ। মঞ্জুর চঞ্চল চক্ষুও কি তাহাকে খুঁজিতেছে না? না, সে জানে না তাহার এই ইতিহাস? প্রেমের কবিতা লিখিবে নাকি বিজয়? 'জন-সমুদ্রে লেগেছে জোয়ার' আর সে জোয়ারে ভাসাইয়াছে বিজয় তাহার জীবন—কবিতার অভিসারে। জীবনের পথ রসলোকের পথ; তারপরে? তারপরে 'হব ইতিহাস।'

উঠিয়া পড়ো অমিত, চলো চলো এখনকার মত এই তোমার ইতিহাসের পথ, জীবনের পথ, মানব-তীর্থের পথ—জ্ঞানে-কর্মে প্রেমে।...

স্থির চরণে অমিত উঠিয়া গেল, গাড়ির অভ্যন্তরে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করিল। আপনাকে সে স্থির করিয়া লইয়াছে—ইন্দ্রাণীকে সে হারাইবে না—মানুষের সেই মহামিলনের যাত্রায় তাহাকে সে পাইবে—'তুমি আছ, আমি আছি'।

উঠিয়া আসিতেছে সকলে। গান ধরিয়াছে বন্ধুরা। ইঞ্জিন স্টার্ট লইতেছে। সমবেত কণ্ঠে সবল ধ্বনির মধ্যে তাহা শোনা যায় না—'ইন্টারন্যাশনাল মিলাবে মানব-জাত'—সকল মানুষ, সকল মানুষের সঙ্গে মিলিবে।

সারা দিনের মানুষের মুখচ্ছবি অমিতের মনের পটে চমকিয়া উঠিতেছে। অনু-মনু-সবিতা-ইন্দ্রাণী......আর কত বিচিত্র এই গাড়ির সহযাত্রী দল! শ্রমিকের পথ, বুদ্ধিজীবীর পথ, কর্মজীবীর পথ; কবিতার পথ, বিজ্ঞানের পথ, স্বাধীনতার পথ, মানবতার পথ, জীবনের পথ, সৃষ্টির পথ; সকল যাত্রীর সকল পথ কোথায় মিলিতে চলিয়াছে আজ? ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রাণী, তুমি দেখিতে পাইতেছ না—মহামানব আসিতেছে

দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের মধ্য দিয়া মানব মুক্তির দিকে, ভালবাসার রাজ্যে---অগণিত মানুষের সম্মিলিত তীর্থযাত্রা—বড় আমির তপস্যা---অল রোড্স লীড্ টু কমিউজিম্—টু হিউম্যানিজম্--

হেড লাইট্ জ্বালিয়া, হর্ন দিয়া ব্লাক মেরিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে গোয়েন্দা আপিস ছাড়িয়া। অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহার বাতির বিদ্যুৎ-বহ্নি রেখা সম্মুখের পথ দেখাইতেছে—কোথায়? জেলের দিকে?—ফু, অমিত মনে মনে বিদ্রুপের হাসি হাসিল—জেলে—আলোকের রেখা! কত কত জেল পার হইয়া ছুটিয়াছে---কত বিরোধ-বিদ্রোহের মধ্য দিয়া মানব-মুক্তির তীর্থসঙ্গমে---কত 'ছোট আমি' চূর্ণ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে কত 'বড় আমি'র দাবি---কত সত্তার খণ্ডতাকে মিলাইয়া দিতে সত্তার সম্পূর্ণতার দীপান্বিতায়।...মহামানবের আগামী দিনের আগমনকে স্বাগত করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে কত প্রাণের দীপ---আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া কত জীবন-সত্তার সম্পূর্ণতার আশ্বাসে---'ছোট আমি' হইতে 'বড় আমি'র জাগরণের শপথে--শুধু কর্মের, মিলন উৎসবের নয় শুধু, দেহ-মন-প্রাণের ক্ষুদ্র সাধও যেখানে সত্তায়-সত্তায় সম্পূর্ণতার মধ্যে জাগিয়া বলিয়া উঠিবে,—'তুমি আছ, আমি আছি'—আমরা আছি পরস্পরকে সম্পূর্ণ করিয়া মানব-মুক্তির পরিপূর্ণতার অর্ঘ্য--সকল মানুষের বিকাশের পরিপূর্ণতায় মহামানবের আত্মপ্রকাশ।...ইন্দ্রাণী, তোমার-আমার-সকলের বুকে--সকলের চোখে-মুখে, বুকে-বুকে সেই মানব-সম্পূর্ণতার দীপশিখা—সেই ঘোষণা—সেই...

বিদ্যুতদ্দীপ্তিসমুজ্জ্বল পথ অমিতের সম্মুখে।

এই মুহূর্তে বিচিত্র বিপুল জগতের স্পন্দন অমিতের রক্তে: জীবন্ত সেই বড় আমির স্পন্দন। গতিময়, জ্যোতির্ময়, সৃষ্টিময় এই মানবসত্তা---ম্যান: হোয়াট এ নোব্ল ওয়ার্ড! আর সেই মানুষ তোমরা, তুমিও অমিত, ইন্দ্রাণীও।

এক-একটি মানুষের মধ্যে--প্রতিটি সাধারণ এই মানুষের মুখেও এখন সেই বিচিত্র বিরাট ভাবী মানুষের মুখচ্ছবি, সম্পূর্ণতার প্রতিশ্রুতি, সৃষ্টির সুমহৎ স্বাক্ষর 'ঐ মহামানব আসে'...

এক-একটি দিনের মধ্যে---প্রতিটি এই সাধারণ দিনের মধ্যেও---ইতিহাসের সেই ভাবী দিন রূপায়িত, বিঘোষিত তাহার মহদাশ্বাস: "অয়মহং ভো!"

পরিশিষ্ট

'অথ 'একদা'-র সূচনা''—গোপাল হালদার

Shrivastu Road—6
Rajendranagar, PATNA—16
Phone—52854

প্রীতিভাজনেষু

অমিয়বাবু, আপনার অরুণাকে লেখা প্রায় ১ মাস আগেকার (৪-৭- তাং) দীর্ঘ পত্রখানা তখনি পেয়েছি, পড়ে বিশেষ আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ বোধ করেছি। চিঠিতে একটু ইঙ্গিত ছিল, অরুণাও তাই বললেন, আমার কিছু কিছু কথা অন্তত আপনাকে জানিয়ে উত্তর দেওয়া উচিত। কথাটা স্বীকার করলেও বুঝছিলাম, তা কত দুঃসাধ্য। নিজের কথা নিজের বলা যথেষ্ট সাবধান ও অকৃত্রিম না হলে শুধু ব্যর্থ হয় না, নিজেকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভুল পথে চালিত করে, অন্যকেও ভুল পথের নির্দেশ দেয়। অনেক বড় এবং সচেতন লেখকের-ও মাঝে মাঝে এই বিভ্রান্তি ঘটে। বিশেষতঃ উপন্যাসের যদিবা ভাব ও বস্তুর কাঠামো সাধারণত সুস্পষ্ট, কবিতায় বিশেষতঃ মধ্য-উনিশ শতকের (1850—) এর থেকে lyric কবিতায়, সেরূপ কিছু না থাকাতে প্রায়ই লেখক লেখার তৎকালীন 'মুড্‌কে' যথারীতি স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারেন না। কাজেই কবিতাটির জন্মকাল ও তৎসম্পর্কিত চিঠির সময়, এই অন্তর্বর্তী কালটা, জানা-অজানায় মিলে, চিঠির সময়কার 'মুড্‌টি'কে এমনভাবে উদ্‌ঘাত ও উন্মেষিত করে যা অনেক সময়েই একেবারে অভিনব। 'সোনার তরী'র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এক এক সময়ে কবিতাটির এক এক তাৎপর্য নির্দেশ করেছেন—মিথ্যা নয় কোনোটাই, তবে নিশ্চয়ই কোনো কোনোটা গৌণ। এসব কথা বলছি আরও এজন্য যে বেঁচে আছি এত দীর্ঘদিন যে, মনে হয় বৎসরগুলি, মানি বা না মানি; আমাকে নিশ্চয়ই স্থির থাকতে দেয় নি। হয়তো লক্ষ্যও করিনি—করিনা এখনো—যে, রূপনারাণের কূলে আমিও প্রবাহ-বাহিত (শুধু প্রবাহের দর্শক নয়) হয়ে কত যে রূপান্তরিত হয়ে হয়ে এসেছি যে, অণু-পরমাণুর সংগঠন যে এই দেহ সেও যে নিয়ত ঘূর্ণ্যমান সে কথাটা জানা সত্ত্বেও ভুলে থাকা যায়।—এই তো এ দেহ। বরাবর অন্ততঃ ষাট বৎসরের রেমেটিক allergy-র (সর্দির) সুস্থির আশ্রয় (কোনো একটা যন্ত্র অচল না হতে) সে আপন অস্তিত্বে স্বচ্ছন্দ, জানতেও চায় না যে দেহ আছে কি নেই। আবার এই তো সামান্য কোমরের কষ্টে, ঘাড়ের কষ্টে, পায়ের কষ্টে তীব্রভাবে আপনার সম্বন্ধে সাময়িক অস্বচ্ছন্দতা সচেতন, এবং তা সত্ত্বেও আপনার সমগ্রিক দৈহিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে সুস্থির (অর্থাৎ অজ্ঞ এবং অচেতন)

সেই মুহূর্তে। অত্যন্ত প্রত্যক্ষ বাস্তব দেহটারই অন্তরালে যখন এত ঘূর্ণির খেলা, তখন বুঝাতেই পারো—অদৃশ্য, অনেক—অনেক—অনেক.. কোটি-কোটি অণু-পরমাণুর ঝড় ও ঝড়ে ধাবমান ভাবাবেগের 'depot' মন বা সত্তা জেনে-না জেনে চেতনা রাজ্যের কোন্ সীমা ছাড়িয়ে কোন্ সীমায় ছুটছে। অথবা, সীমাহীনতায় রাজ্যে ছুটতে-ছুটতে ভাবছে—'কে বলে এসব? আমার অস্তিত্বের কেন্দ্রে আমি চিরপ্রতিষ্ঠিত সত্তা এবং বৎসরের পর বৎসর সেখানে স্বতই প্রস্ফুটিত।' ঝেড়ে ফেলেছি যা সে প্রস্ফুরণের পক্ষে বাধা, শুকনো পোকায় কাটা পল্লব; নতুন গ্রহণ করেছি যতটা সম্ভব আমার শেষ স্ফুরণ পর্যন্ত প্রয়োজন (সেই মনের বা সত্তার বা অন্তর্জীবনের)। আসলে পরিবর্তনের স্রোতে ভাসছি সদাই, যেনেও যে আমরা মানি না।

সহজ কথায়, যা এক সময়ে (যেমন 'একদা'-র সময়ে) ভেবেছি বলে লক্ষি তা হয়ত সম্পূর্ণতঃ সে সময়ের ভাবনা নয়—তখনকার (নিজের পরিবার পরিজন (সামান্যতঃ) জাতীয় পরিবেশের চাঞ্চল্য (অনেকটা), এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অস্পষ্ট আভাস বা compulsion (আংশিকভাবে)। ভাবনা সেই ত্রিশের-একত্রিশের পর্বের চল্লিশ থেকে অন্তত সত্তর পর্যন্ত একাধিক জটিলতর পর্বের ভাবনা—একত্রে পেচিয়ে-পেচিয়ে একটা এই মুহূর্তের ভাবনায় এসে মিশে আমাকে চালিয়ে (এবং দুলিয়ে) নিয়ে যায়। এই মূল জীবন (চেতনা) রহস্য মনে রেখে তাঁরা আমার এখনকার কথাকে বিচার-বিশ্লেষণ করবেন—যদি নির্বিকার রসবেত্তা পাঠক। 'একদা' সম্বন্ধে—'অন্যদিন', 'আর একদিন' ব্যাপারে কিন্তু আমারও ভাবনায় আরও ভিন্ন ঢেউ, ভিন্ন প্রশ্ন (রীতি সম্বন্ধে বিশেষ করে) লেগেছিল, তা পৃথক বলতে হবে—এ প্রসঙ্গে নয়।

ভূমিকা এত বড় হল যে (নিজের অহমিকা, তাছাড়া কি?) নিজের এখন লজ্জাও পাচ্ছে, হাসিও পাচ্ছে। 'ছোট আমি' কখনো ছাড়ে না 'বড় আমি'তে তলিয়ে গেলেও। আমার মনে হচ্ছে বোধহয় কালানুযায়ী 'একদা'-র আইডিয়াটার ইতিহাস দিলে (তাতে সন তারিখের ভুল থাকতে পারে) এক রকমে কথাটা বোঝানো সহজ হতে পারে। সে চেষ্টাই করছি—সংক্ষেপে। আপনার অভিজ্ঞতায় ও অনুভূতিতে তাতে বাধা হবে না, বিশ্বাস।

অথ 'একদা'-র সূচনা:

॥ ১ ॥ (১৯৩২? না '৩৩) বর্ষাকালে বক্সা বন্দিনিবাসে আমি ছিলাম গুরুতর পীড়িত---heart-এর পীড়ায়। চিকিৎসার জন্য কলকাতার আলিপুর জেলে প্রেরিত হই বহু চেষ্টায় (বোধহয় সেপ্টেম্বর মাসে)। শয্যাশায়ী আমার চোখের সামনে জনাভিষিক্ত হিমালয় নিস্তব্ধ, কেবলে তার বর্ষণ-স্ফীত ঝর্ণার অবিরাম গর্জন, আর মনে মনে ডাক্তার ও বন্ধুদের শঙ্কিত দৃষ্টিতে স্পষ্ট, হয়ত শেষের দিন সন্নিকট। মনে ভাবছিলাম---কী করলাম এ জীবন নিয়ে---কিছুই কি তবু বলা উচিত না, যা দেখেছি; যা দেখতে চেয়েছি, যার জন্য এত ছটফটানি দিন-মাস-বছর ধরে। তা এত বিরাট, এত বিচিত্র, এত অসম্ভব অনুভূতিতে আর ঘটনায় মাখা—তার সহস্রাংশের এক অংশও বলা সম্ভব হত না—যদি বলতে পারতাম। কিন্তু কিছু একটু তার আভাসও কি রেখে যাওয়া যায় না?—সামান্যতম একটু ইঙ্গিত?—এই ভাবনা থেকে নিজেকে অনেক সংকোচ ও আলস্যের হাত হতে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে কলম নিয়ে বসি—যা বিচিত্র, অশেষ, অপরিমেয় বিস্ময় ও বেদনা তার অন্তত: **একটা দিনের স্কেচ** (পূর্ণ চিত্র তো অসম্ভব) কি লেখা যায় না? লিখতেই হবে---বেশি নয়---**একটি দিনের কথা**—গুটি ২০।২৫ পৃষ্ঠায়। কারণ, তার চেয়ে বেশি কিছু লেখা আমার দেহের পক্ষে অসাধ্য—এবং সংকোচ ছিল—লেখন-শক্তিরও অসাধ্য।

যাই লিখি তা একদিনের কথা মাত্র—সামান্য আকারে—এই হ'ল আমার প্রথম আইডিয়া। (কোনো নিটোল গল্প বা উপন্যাস নয়,) মাত্র একদিনের সত্যের গভীর রহস্য। একদিনের কথা—'একদা' এই ধারণা ও নামটার এই মূল। অবশ্য তৎপূর্বে আমি জয়েসের 'ইউলিসিস'র নাম শুনেছিলাম---সজনীর মুখে (1931?)—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, নিষিদ্ধ,—তবে কলকাতায় এসেছে, সজনী তা পড়তে পাবে আশা করে। এর বেশি আমার জয়েস সম্বন্ধে জানা ছিল না। তবে এ থেকে এ ভাবনা আমার এসেছিল একদিনের কথা নিয়ে একটা বড় উপন্যাসও রচনা হতে পারে। এক একদিনের মধ্যে—অন্ততঃ আমার অভিজ্ঞতায় যে গভীর রহস্য পুঞ্জীভূত—ত্রিশের দশকের আমাদের সেই অশান্ত দিনের মধ্যে—উপন্যাস না হোক, সামান্যতম কয়েকটি পাতায়ও কি তার সার্থক আভাস রাখা যায়---এক একটি দিনই যে মহাকালের এক স্বাক্ষর, আদিঅন্তেরও ইঙ্গিত।

এই হ'ল 'একদা'-র নাম রহস্য এবং (বীজাকারে) ভাব-রহস্য।

॥ ২ ॥ মোটেই বড় ambition মাথায় নিয়ে সূচনা হয় নি। চেষ্টা শুধু (আশঙ্কিত) মৃত্যুর পূর্বে জীবনের একটু চিহ্ন রাখা—যে জীবন এত সামান্য হলেও অদ্ভুত,—মহাকালেরই নিয়মে **যে সামান্যের মধ্যে অসামান্যের তাড়না ও**

প্রেরণা বহন করে—শত তুচ্ছতার মধ্যেও (ছোট আমি থেকে বড় আমিতে উত্তরণের নিগূঢ় নির্দেশ?) উদ্বেলিত মহাজীবনের আহ্বানের মধ্যে নিজেকে ঢেলে না দিয়ে স্থির হতে পারে না?—ভাবছিলাম---অস্পষ্ট ছিল ভাবনা---জীবনের এ রহস্য লেখায় বোঝানো যায় না? তবু লিখি যা পারি ছোট করে নিজের (নিশ্চয়ই "কল্পনায় রূপান্তরিত") অভিজ্ঞতার (বাইরের) কথা---যা ফোটে তাতে ফুটুক অন্তর ও বাইরের অভিজ্ঞতার রূপ। আসল কথা intense living---তা সত্য হ'লে তার ছাপ চিন্তাধারায় পড়বে।

॥ ৩ ॥ লিখতে আরম্ভ করে দেখলাম যত অল্প কথাতেই বলতে চাই অভিজ্ঞতা আমাকে ঠেলে নিয়ে চলে---চা খেলাম---ভাইবোনের মধ্যে তা বলতে গিয়ে দেখলাম 'সত্য' করে বলতে হলে তা 'চা খাওয়াকে' ছাড়িয়ে যায়---স্নেহ-মমতা-শঙ্কাময় বাড়ির ছাপটা মনের মধ্যে ছাপ ফেলে, আর তা স্বীকার না করলে কি কলম নিষ্কৃতি দেয়। এমনি কেবলি চলল---পথ---পথের পাশের গাছ---তার রোপণের স্মৃতি---আর সঙ্গে সঙ্গে স্কট্-এর জগৎ থেকে ডিকেন্স্-থ্যাকারের জগতে প্রবেশ ক্ষণকালের মধ্যে---এমনি এগিয়ে চলল। খুব দ্রুত চল্‌ছে কলম---তার চেয়ে অনেক দ্রুত ভাবনাকে স্বীকৃতির (অর্থাৎ রূপায়ণের) গতি। এরই মধ্যে বক্সায় আরম্ভ করলেও আমি নীত হয়েছিলাম কলকাতায় চিকিৎসার্থে। আর তখন দিন সাতেক এসে গেলাম দিনের একটা যতিতে। শান্ত হ'লাম বোধহয় সে বছরের সেপ্টেম্বরে (১৯৩৩?)---প্রায় ৫ বৎসর ঘরে ছিল—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হতে মনে হ'ল---আবার তো জেলে যাবার দিন এল। একটা বই অন্ততঃ প্রকাশ করে যাই। সজনীকে দিলাম---সজনী বোধহয় মাস তিন-চারের মধ্যে প্রকাশ করেছিল।

এই সময়ের মধ্যে বাঙলায় অনেক লেখা বেরিয়েছে, কিছু আমি পড়েছিও। একটির কথা বলা দরকার। 'পরিচয়' আমরা জেলে পেতাম—কিন্তু নানা হাত ঘুরে পেতে দেরি হোত। তবু পেতাম। শেষে ১৯৩৫-এর (?) সময়ে আমি নিজেও গ্রাহক হই। অনিয়মিত ত্রৈমাসিক যখনি আসুক আমি নিয়মিত পড়তাম। ধূর্জটিবাবুর 'আবর্তের' সঙ্গে তাতে চাক্ষুষ পরিচয়। আমি বিশেষ আকৃষ্ট হই---যেন একটা সাযুজ্য পেলাম একজন কৃতী পুরুষের কৃতি-ধারার সঙ্গে। (একদা কিন্তু ১৯৩৩-এই শেষ হয় প্রেঃ জেলে)

॥ ৪ ॥ জেলের পূর্বেই ২ জন লেখকের লেখার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল। প্রুস্ত—Swann's way (এক ভলুম) পেয়েছিলাম,—নীরদ চৌধুরীর। মনে হ'ল অদ্ভুত শিল্পকৃতিত্ব—কিন্তু আমি ওর 'ধর্মী' নই। দ্বিতীয়—Virginia woolf-এর একাধিক বই—চমৎকার, বিশেষ করে, তাঁর style কবিতাকেও হার মানায়। কিন্তু মনে হ'ল তিনি মানুষকে যে ভাবে দেখেন আমি তা দেখি না—আর সেসব মানুষের সঙ্গে আমার কোনো পরিচয়ও নেই—আত্মীয়তাও

নেই। আমার মানুষ যে একটা প্রকাণ্ড আন্দোলনের মধ্যে ভাসতে ভাসতে ডুবতে-ডুবতে জীবন লীলার অংশীদার।

এ তিনজন লেখকের লেখা ছাড়া আরও কত লেখকের লেখা অজ্ঞাতে আমার উপর প্রভাব ফেলে থাকবে তার কি ঠিক আছে। আমি ইংরেজির ছাত্র—Tristram Shandy প্রায় Fielding, Richardson-এর মতই পড়েছিলাম—১৯৩০-এর পূর্বেই।

॥ ৫ ॥ ইচ্ছা ক'রে আমি Stream of consciousness-এর রীতিতে নিজের লেখাকে চালনা করি নি, খুবই আশ্চর্য কথা—অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে লিখতে লিখতে আমি সচেতন হয়ে উঠলাম আমার **লেখার রীতি স্বাভাবিকভাবেই (প্রায় আমার অগোচরে) চেতনা-প্রবাহের পথে চলছে।** ক্রমে নিজে বুঝলাম ওটাই তার **নিজস্ব গতি**—এ পথে চলতে সে চায়। এখনো বলি আমার ভাবনার মূলধারা stream of consciousness-এর পথেই চালিত হয়। এইটা আমার '**ধন**' বলতে পারেন, 'রোগ' বলতে পারেন। কিন্তু তাস্ব ভাবগত—।

॥ ৬ ॥ যেখানে আমি এই Stream of consciousness-এর পথ ছেড়ে বা তাতে সম্পূর্ণ না চলে,—লিখেছি—যেমন 'অনাদিন', 'আর একদিন' তা স্বভাবকে শাসন করে (যথাসাধ্য) লিখেছি। অনেকের—বিশেষতঃ শ্রদ্ধেয়বন্ধু নীরেন রায়ের তাড়নায় তা করতে হয়েছে। তাঁর বিচারে আমার শ্রদ্ধা ছিল—সব না মানলেও—তা প্রায়ই মানতে ইচ্ছা হ'ত। দিনের পর দিন তিনি আমাকে বোঝাতে চেয়েছেন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের (বালজাক থেকে টলস্টয়) style objective truth-এর অনুগামী হয়; **—মনের ভাবের অনুষঙ্গে হওয়া অর্থাৎ stream of consciousness,** একটা reactionary trend in art। বিশেষ করে Soviet Socialist Realism-এর ব্যাখ্যা ও Tolstoy-এর দৃষ্টান্ত ছিল তাঁর প্রধান যুক্তি। তা মানলেও আমি নিজের মনের কাছে তাঁর এ সব কথায় আমার রীতি ছাড়ার স্বীকৃতি পাই নি। তবু 'অন্য দিনে' stream of consciousness ছেড়ে অনেকাংশে internal speech-এর, Flash back পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি। আর, 'আর এক দিনে' যে কেন আবার style ও ঘটনার আরেক বিচিত্র বিন্যাস, তা বোধহয় আপনাকে বলেছি—আপনিও বুঝেছেন।—ছোট self ছাড়িয়ে বড় self-এ যাওয়ার তা একটা symbolic indication—Individual self থেকে Humanist self-এ যাবার প্রয়াস। তা পেরেছি কিনা খুবই সন্দেহজনক। বিশেষ করে 'আর এক দিনে'—এ ইচ্ছাকে ঠিক সমঞ্জসময় ও সমন্বিত করবার চেষ্টা যেন 'কসরৎ' রয়ে গেছে—এ সন্দেহ আমার তখনও ছিল, এখনও আছে। যাই হোক সাহিত্যরসিক পাঠকের চোখে তা ধরা পড়লে আমি আপত্তি করতে পারি না।

আজও হাসছি—। সংক্ষেপে লিখতে গিয়ে নানা বিক্ষেপে নিজেই এখন হাসছি।

পারছি না—হাত বড় বাধা দিচ্ছে, কোনোরকমে আর দু-একটা ছুটোছাঁটা কথার জবাব দিয়ে থামতে চাই—আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার অধিকাংশ ধারণাই মনে হয় সঙ্গত, তবে সে সম্বন্ধে আমার মতামত ধর্তব্য নয়।

ছুটোছাঁটা কথার যা মনে পড়ছে উত্তর দিই ঃ

(ক) 'সমসাময়িকে'র লেখা আমার (১৯৩৮) মুক্তিপাবার পর নীরদবাবুর অনুরোধে লেখা। সনেট দুটি গ্রামে অবরুদ্ধ অবস্থায় লেখা।

Internment-এ একটি প্রৌঢ় ভদ্রস্থ প্রতিবেশী কথায় কথায় আমাকে বলেছিলেন 'আপনার জীবনটা ব্যর্থ গেল।' আমি মনে মনে হেসেছি (তাই নাকি?) কিন্তু মুখে বলেছি—'তাই'। একটি সনেট-এ দিতে চেয়েছি তার উত্তর। অন্যটিও প্রায় তাই। কথাটা গোপন—এক-আধ সময়ে কবিতায় হাত চালানোর দুর্বুদ্ধি আসে। তথ্য, তর্ক ও ত্যাগ—বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বাদ দিলে আমার ভাবনা আর গদ্য লেখাতে চাই বা না চাই কাব্য রসের ছোঁয়াচ লাগতে চায়—অবশ্য 'গদ্য ছন্দে'। সত্য বলছি আমি বুঝবারই সুযোগ পেলাম না রচনা শক্তি আমার আদৌ-ই আছে কি না। পরীক্ষা করাও হয়নি।

(খ) সত্যই আমার সাহিত্য-শক্তি (কোন্ দিকে) থাকলেও আমাকে তৃপ্তি দেয় না,—কোন্ দিকে আছে তা ও জানি না। এ রচনাশক্তি সম্বন্ধে সংশয় মজ্জাগত। কোনো লেখাই, তাই লিখতে আমার ভয়ানক সংকোচ, আরও বেশি ভয় লেখা দেখাতে ও প্রকাশ করতে। সে কারণেই আমার বই আমি খ্যাতনামাদের Present করি নি, এবং খ্যাত-নামা হোন্ অখ্যাত-নামা হোন্ 'কেমন লাগল?'—আমার লেখা সম্বন্ধে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কখনো করি না। একটা কারণ—বাঙালী ভদ্রলোক মুখে সাধারণত ভদ্রতা করেও বলেন 'ভালো'। দ্বিতীয় কারণ গভীরতর—লেখাটা যেন আমার গোপন প্রেম মুখ ফুটে বলার নয়। যদি বা পাঠক জেনেছেন, আমি তা আলোচিত হতে শুনলে লজ্জায়, কুণ্ঠায় (অন্ততঃ মনে-মনে) অস্থিরতা বোধ করি। পালাতে চাই।

(গ) 'একদা' আমি রবীন্দ্রনাথকেও পাঠাই নি। 'মন্দিরা' রাজবন্দিনী মেয়েদের সদ্য প্রকাশিত কাগজ। তাতেই 'একদা'র প্রথম সমালোচনা বেরোয়। (লেখেন বোধহয় অধ্যাপক সুবোধ চৌধুরী। সুলিখিত সমালোচনা।) রবীন্দ্রনাথ 'মন্দিরা'-র সেই সমালোচনা পড়েন। তখন দেখা করতে বলেন কবি সজনীকে। কবি সজনীকে বলেন,—"এ বই তুমি দেখেছ?" সজনী বলেন, "দেখব কি? আমি-ই তো প্রকাশক।"—"আমাকে দেও নি তো।"—কবি এ ভাবে 'একদা' পান। পাঠান্তে সজনীকে নিজ থেকেই বলেছিলেন—'দ্যাখো, ওদের (লেখকের) একটা কথা আছে বলবার—আর সে কথা তুচ্ছ নয়।' কবির এ মন্তব্য সজনীর থেকেই শোনা। এবং আমার মন তাতে আশ্বস্ত বোধ করেছিল।

(ঘ) Behar Herald-এর আর খোঁজ করবেন না—তা পাওয়া যাবে না। 'সমসাময়িকে'র রাজনৈতিক প্রবন্ধের বক্তব্য মনে নেই। তবে তখন আমার দৃষ্টিভঙ্গি স্থির।

এবার থামি। এ বয়সে যেমন থাকা যায় তেমনি আছি—লেখায় শ্রান্তি আসে, মুখে (উপযুক্ত লোক পেলে) তা হই না। বাড়িতে আমি ছিন্ন। সকলেই অসুস্থ।

৬ ৯/৮৪ সকাল ৭টা

ভবদীয়

গোপাল হালদার

গ্রন্থ-পরিচয়

একদা

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৪৬ (ইংরেজি ১৯৩৯)।

প্রকাশক : রঞ্জন পাবলিশিং হাউসের পক্ষে শ্রীসজনীকান্ত দাস। ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেসে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ নাথ কর্তৃক মুদ্রিত। মূল্য—দুই টাকা।

উৎসর্গ : প্রাণের উন্মাদনা যাহাদের
কর্মের উন্মত্ততায় নিঃশেষ হইয়াছে—
পৃথিবীর ক্ষুদ্রতা যাহাদের
জীবনকে নিষ্প্রভ করে নাই—

প্রথম সংস্করণে লেখকের নিবেদন

বইখানা সম্বন্ধে গুটি তিন কথা বলিবার রহিয়াছে। গ্রন্থখানা লেখা হইয়াছিল রোগশয্যায় প্রেসিডেন্সি জেলে, ১৯৩০ সনের ১৬ই সেপ্টেম্বর হইতে ২০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে।

সমগ্র গ্রন্থখানি তিন স্তবকে সমাপ্ত— কিন্তু প্রত্যেকটি স্তবক স্বসম্পূর্ণ।

গ্রন্থখানির ঘটনাবলী সত্য—উপন্যাসের ঘটনামাত্রই যে অর্থে সত্য।

যুদ্ধের বাজার, কাগজের দুর্মূল্যতা, গ্রন্থকারের প্রুফ দেখার কৃতিত্ব প্রভৃতির জন্য যে-সব ত্রুটি রহিল, তাহা মার্জনীয়।

১৭ই আশ্বিন, ১৩৪৬ লেখক

দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০ আষাঢ়, ১৩৫৯। প্রকাশক— রঞ্জন পাবলিশিং হাউসের পক্ষে শ্রীসজনীকান্ত দাস।

দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের নিবেদন

বাংলা বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ হইলে লেখক মাত্রেই খুশি হন। কারণ, আমরা ইংরেজি বই কিনিয়া পড়ি, বাংলা বই কিনিয়া পড়ি না।

খুশি হইলেও লেখক কৃতার্থ হইতে পারেন কিনা সন্দেহ। কারণ, বাংলা বই অর্থকরী জিনিস নয়। এইটি এইবার প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা, বাংলা বই আমরা কিনি না, কিন্তু আমরা পড়ি। 'একদা'-র

ব্যাপারেও তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। কিন্তু বই লেখেন লেখক, উহার অর্থ করেন পাঠক। লেখক তাহার মন ছুঁইতে পারিলেই যথেষ্ট। মনটি পাঠকের আর অর্থও করে অনেকাংশে পাঠকেরই মন। তাই বইয়ের উক্তি-বিশেষ লেখকেরও বিশেষ বক্তব্য বলিয়া পাঠক ধরিয়া লন। কাজটা কতটা যথার্থ হয়, 'একদা'-র পূর্ব ভূমিকায় তৃতীয় বক্তব্যে তাহা বলিয়াছিলাম।

কৃতার্থ না হইলেও লেখক কৃতজ্ঞ, অনেকে বই কিনিয়াছেন, অনেকে পড়িয়াছেন। এই সংস্করণের জন্য তাঁহারাই দায়ী, আর দায়ী—যে বন্ধুদ্বয় এবার মুদ্রণ-ব্যাপারে লেখককে পদচ্যুত করিয়া নিজেরাই স্বহস্তে উহা গ্রহণ করিলেন—সজনীকান্ত দাস ও সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতি

২০ আষাঢ়, ১৩৪৯ লেখক

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

'একদা'-র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। মাস ছয়-সাত পূর্বেই দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। যুদ্ধের জন্য কাগজ ও ছাপা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। এই বিষয়ে বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন।

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে যাহা বলিবার ছিল তাহার বেশি আমার এখন আর বলিবার নাই। কেবল দুই সংস্করণেই মুদ্রণকালে আমার অনবধানতায় একটি ত্রুটি থাকে—এই গ্রন্থের রচনাকাল "১৯৩০" লেখা হয়। আসলে "১৯৩৩" হইবে। এবারের মুদ্রণে সে সংশোধন করা গেল।

আর একটি কথা, এই গ্রন্থ কাহাদের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়, তাহাও নাকি পাঠকবর্গ কেহ কেহ বুঝিতে পারেন নাই। ইহাও কি বাঙালী পাঠককে বলিতে হইবে, বাংলার ইতিহাসে কাহাদের প্রয়াস ব্যর্থ হইলেও কাহাদের প্রেরণা সত্য ও স্মরণীয় হইয়া আছে?

২৭ আষাঢ়, ১৩৫২ লেখক

চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন

চতুর্থ সংস্করণে 'একদা'-র কিছুই পরিবর্তন করা হইল না। কিন্তু কালের পরিবর্তন হইয়াছে। সেদিনের কাহারও কাহারও ভাগ্য আজ ফিরিয়াছে, অনেকের দুই-এক মুষ্টি দাক্ষিণ্য লাভও হইয়াছে; সেদিনের সত্য কাহারও নিকট ব্যবসায় বস্তু, কাহারও নিকট অতীত কাহিনী। এই পরিবর্তিত কালে 'একদা'র কতটা মূল্য আছে তাহাও যাচাই হইতেছে। নূতন সংস্করণ প্রয়োজন হইল দেখিয়া লেখক হিসাবে তথাপি নিজেকে ভাগ্যবান্ না ভাবিয়া পারি না।

হয়ত এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে—আরও দুই-একবার কারাবাসের সৌভাগ্য-

লাভে এই গ্রন্থের পরিকল্পিত অন্য দুই খণ্ডও লিখিত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য গ্রন্থাকারে কবে প্রকাশিত হইবে সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া এখনো অসম্ভব। ইতি—

আষাঢ়, ১৩৫৬ লেখক

'একদা'র চতুর্থ সংস্করণটি ২২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, 'পংথিঘর' এর পক্ষে সতীশ রায় প্রকাশ করেন। প্রচ্ছদচিত্র ও বর্ণলিপি—সুমুখ নাথ মিত্র। মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।

পঞ্চম সংস্করণের তথা বর্তমান সংস্করণের নিবেদন

'একদা'-র ইহা পঞ্চম সংস্করণ। ইতিমধ্যে 'একদা'র পরিকল্পিত অন্যান্য পর্ব—'অন্যদিন' ও 'আর একদিন'ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণে এ গ্রন্থের পরিবর্তন কিছুই করা হয় নাই। তবে পুনরায় পড়িতে গিয়া শব্দগত সংশোধন কিছু কিছু করিয়াছি। অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও যেই পাঠক-সাধারণ এ গ্রন্থকে সস্নেহে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকট লেখক কৃতজ্ঞ।

তিন পর্বের শেষে এখন আর বলা বোধহয় অনাবশ্যক 'একদা' গ্রন্থের লেখক জয়েস-প্রুস্ত-ভার্জিনিয়া উলফ-ধর্মী কেহ নহেন। প্রায় বিশ বৎসরের দুর্বার গতিময় ইতিহাস একটি প্রাণবান্ মানুষের কর্ম ও চেতনার মধ্য দিয়া তিনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পর্বে উদ্‌ঘাটিত করাই ছিল তাহার প্রয়াস। বৎসর আট-দশ পরে পরে সেই ব্যক্তি-জীবনের এক-একটি দিনই আমি গ্রহণ করিয়াছি; এক এক পর্বের সেই এক-একটি দিনের দিনলিপি ইতিহাসের এই পর্ব থেকে পর্বান্তরের এবং পৃথিবীর রূপান্তরেরও আভাস। এই আঙ্গিকে ত্রুটি অনিবার্য; ইহা যেন অনেকখানি ছেদের পরে চলন্ত রেলগাড়ী হইতে দুই জোড়া চক্ষু দিয়ে এই পৃথিবীকে এক-একবার দেখা। পরিবর্তমান পৃথিবী বিকাশমান মানুষের রূপ এই তিন পর্বের জীবন-চিত্রে তথাপি কিছুটা আভাসিত হইয়াছে জানিলে, নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। ইতি—

১লা মে, ১৯৫৪ লেখক

পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণের প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২ থেকে প্রকাশিত। মুদ্রাকর বঙ্কিমবিহারী রায়, অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৭/১ বলাই সিংহ লেন, কলকাতা-৯। প্রচ্ছদ শিল্পী—সুমুখনাথ মিত্র। মূল্য—চার টাকা।

১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত 'একদা' উপান্যাসের ৬টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তারপর আর কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। ১৯৭৮ সালে, 'একদা' উপন্যাসটি লেখকের পরিকল্পনা মত ত্রয়ী (Trilogy) উপন্যাস 'ত্রিদিবা'র অন্তর্গত প্রথম পর্ব হিসাবে মুদ্রিত হয়। বর্তমান "গোপাল হালদার রচনা সমগ্র"—১ম খণ্ডের মধ্যেও 'একদা'র অবস্থান ত্রয়ী (Trilogy) উপন্যাস 'ত্রিদিবা'র প্রথম পর্ব হিসাবেই।

'একদা' (one day) উপন্যাসটি ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। প্রকাশক—পিপ্‌ল্‌স্ পাব্‌লিশিং হাউস্, নিউ দিল্লী।

অন্যদিন

স্বসম্পূর্ণ গ্রন্থ হিসাবে 'অন্যদিন' উপন্যাসটির তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ (১৯৫০); দ্বিতীয় সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৫৯ এবং তৃতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৬৪। তিনটি সংস্করণেরই প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। প্রচ্ছদপট শিল্পী—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৭৮ সালে, 'অন্যদিন' উপন্যাসটি লেখকের পরিকল্পনা মত ত্রয়ী (Trilogy) উপন্যাস 'ত্রিদিবা'র অন্তর্গত মধ্যপর্ব হিসাবে মুদ্রিত হয়। বর্তমান 'রচনা-সমগ্রে'-ও 'অন্যদিন'-এর অবস্থান 'ত্রিদিবা'র মধ্যপর্ব হিসাবেই।

উৎসর্গ

স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

ও

স্বর্গীয় সাতকড়ি বন্দোপাধ্যায়ের

উদ্দেশে

নিবেদন *

এই গ্রন্থের ঘটনাকাল ১৯৩৭-১৯৩৮। লেখার পরিকল্পনা তখন হইতেই আরম্ভ ছিল, কিন্তু লেখা হইয়া উঠিল ১৯৪৮-এর মে-জুনে, প্রেসিডেন্সি জেলে।

যাঁহারা 'একদা' পড়িয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই বুঝিবেন—এই গ্রন্থ তাহারই পরার্ধ। ইহাও বুঝিবেন—সেই অর্ধের মতই এই অর্ধও আবার স্বতন্ত্র, স্বয়ং সম্পূর্ণ।

বলা নিষ্প্রয়োজন—গ্রন্থের কোনো চরিত্রই যেমন মিথ্যা নয়, তেমনি পরিচিত বা অপরিচিত কোনো ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গেই তাহার সম্পর্ক নাই।

৫ই মে, ১৯৫০

ইতি—

লেখক

তৃতীয় সংস্করণের কথা

তৃতীয় সংস্করণে 'অন্যদিন' পরিবর্তিত হয় নাই, কিন্তু অনেক স্থলে পরিশোধিত হইয়াছে। আর-একটি কথা বলা প্রয়োজন: 'অন্যদিন' আসলে স্বতন্ত্র ও স্বয়ং সম্পূর্ণ

---

* প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের একই নিবেদন মুদ্রিত হয়।

গ্রন্থ। কিন্তু তাহা 'একদা'র 'পরার্ধ' নয়; 'একদা' ও 'আর একদিনের' ত্রিপার্বিক কাহিনীর মধ্য পর্ব। ইতি—

৭ই আগস্ট, ১৯৫৭ লেখক

আর একদিন

প্রথম মুদ্রণ—আশ্বিন, ১৩৫৮। দ্বিতীয় সংস্করণ আশ্বিন, ১৩৬৩। প্রকাশক শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড—১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৫৭ সালে 'আর-একদিন' উপন্যাসটি লেখকের পরিকল্পনা মত ত্রয়ী উপন্যাস 'ত্রিদিবা'র অন্তর্গত অন্ত্য পর্ব হিসাবে মুদ্রিত হয়। বর্তমান 'রচনা সমগ্রে'ও 'আর একদিন'-এর অবস্থান 'ত্রিদিবা'র অন্ত্যপর্ব হিসাবেই।

উৎসর্গ

কবি কিশোর

সুকান্ত ভট্টাচার্যের

উদ্দেশে

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১ লেখক

লেখকের কথা: প্রথম সংস্করণ

'একদা' ও 'অন্য দিনের' মত এ গ্রন্থও লেখা আরম্ভ হইয়াছিল আলিপুরের প্রেসিডেন্সি জেলে। তখন ১৯৪৯-এর মে মাস। কিন্তু লেখা শেষ হইয়াছিল ১৯৪৯-এর আগস্ট মাসে, পাটনায়।

যাহারা 'একদা' ও 'অন্যদিন' পড়িয়াছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিবেন 'আর একদিন' সে কাহিনীরই শেষ স্তবক; এবং অন্য গ্রন্থ দুইখানির মতই ইহাও স্বয়ং সম্পূর্ণ।

একটি বিশেষ দিনকে অবলম্বন করিয়া এই কাহিনীও উদ্‌ঘাটিত। সেই দিনটি কাল্পনিক না হইলেও যাঁহারা সেই দিনের সাক্ষী তাঁহারা জানেন, এই গ্রন্থের চরিত্র ও ঘটনা সবই অন্যরূপ; তাহাদের কাহারও সহিত, সে দিনের কিছুর সহিত, ইহার সম্পর্ক নাই। এই অর্থে ছাড়া, মানুষ ও ঘটনা সবই সত্য—যতটা সত্য তাহা গল্পে-উপন্যাসে।

মুদ্রণের ভুল-ত্রুটির জন্য লেখকও দায়ী, শুধু মুদ্রালয় নয়। পাঠক তাহা মার্জনা করিবেন। ইতি—

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১ লেখক

দ্বিতীয় সংস্করণ

ইচ্ছা ছিল 'আর একদিনের' দ্বিতীয় সংস্করণে আমূল পরিবর্তন করি। কিন্তু মনে হইল—সংস্করণে সংস্করণে আমূল পরিবর্তন করা অপেক্ষা নূতন করিয়া বরং আবার একখানা বই লেখাই যুক্তিসঙ্গত। তাহাতে পাঠকের প্রতি সুবিচার করা হয়, নিজের প্রতিও সুবিচার করার চেষ্টা হইতে পারে। অতএব আমূল পরিবর্তন করিলাম না, যথেষ্ট সংশোধন করিলাম। ইতি—

২৯শে নভেম্বর, ১৯৫৫ লেখক

ত্রিদিবা

'ত্রিদিবা'র প্রথম প্রকাশ ১২ই ফাল্গুন, ১৩৮৫ (২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯)। 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন'—তিনটি পর্বের একত্রিত নাম 'ত্রিদিবা'। 'একদা'-র ভূমিকায় গোপাল হালদার লিখেছিলেন, "সমগ্র গ্রন্থখানি তিন স্তবকে সমাপ্য—কিন্তু প্রত্যেকটি স্তবকই স্বসম্পূর্ণ।" 'একদা' স্বসম্পূর্ণ গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। অন্য দুটি পর্ব, 'অন্যদিন' (১৯৫০) এবং 'আর একদিন'-ও (১৯৫১) স্বসম্পূর্ণ গ্রন্থ হিসাবে আলাদা আলাদা ভাবে প্রকাশিত হয়। লেখকের পরিকল্পনা মত তিনটি পর্ব একত্রিত ভাবে ত্রয়ী (Trilogy) উপন্যাস 'ত্রিদিবা' নামে প্রকাশিত হয় বহুবছর পরে ১৯৭৮ সালে। প্রকাশক—দীন মহম্মদ, সাক্ষরতা প্রকাশন, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, বিদ্যাসাগর সাক্ষরতা ভবন, ৫০ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা—পূর্ণেন্দু পত্রী। মূল্য—১৫ টাকা।

ত্রিদিবার ভূমিকা

'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন' এই তিনখানা তিনদিনের কাহিনী নিয়ে 'ত্রিদিবা'। কাহিনী তিনটি অসংলগ্ন নয়—যদিও প্রত্যেকটি অনেকাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ, গতিমান্।

সেই তিন দিন কি অতীত? তিন দিনের মধ্য দিয়ে শেষ অবধি এখনো কি শুনতে পাই না—'অয়মহং ভো'? পাই, লেখকের তাই বিশ্বাস। তাই একসঙ্গে তিনখানা বই গ্রথিত হল, পাঠকেরও তাতে সুবিধা হবার সম্ভাবনা।

ফুরিয়ে গেলেও পাঠকের দাবি পূরণ করে অনেকদিন বইগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। সে অপরাধ শুধু লেখকের নয়। তবু এ জন্য পাঠকদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। ইতি —

২৮শে জানুয়ারি, ১৯৫৭ বিনীত

রোড-৬, পাটনা-১৬ গোপাল হালদার

রচনাসমগ্রের অন্তর্ভুক্ত 'ত্রিদিবা'

'রচনা সমগ্রের' প্রথম খণ্ডের নিবেদনে লেখক 'ত্রিদিবা'র বর্তমান পাঠকেই "অভিপ্রেত ও প্রামাণিক" বলে উল্লেখ করেছেন। 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন'-এর পূর্ববর্তী সংস্করণের সঙ্গে বা 'ত্রিদিবা'র সাক্ষরতা সংস্করণের সঙ্গে 'রচনা সমগ্রের' অন্তর্ভুক্ত 'ত্রিদিবা'র পাঠভেদ অনুসন্ধিৎসু পাঠকের নজরে পড়তে বাধ্য। "দু-চারটি শব্দ বা কথাগুচ্ছ বদলে বা দু-চার পঙ্‌ক্তি কেটে বা যোগ করে" লেখকই 'ত্রিদিবা'-কে পরিমার্জিত করেছেন। 'রচনা-সমগ্র' সম্পাদনা কালে লেখকের অভিপ্রায়মত 'ত্রিদিবা'-র পাঠ যথাসাধ্য মার্জনা করা হয়েছে, তবে লেখকের অনুমোদন ছাড়া কোনো কিছুই পরিবর্তন, পরিবর্জন বা সংযোজন করা হয় নি।

প্রথম খণ্ডের সম্পাদনা সম্পর্কে লেখকের মতামত সম্বলিত দু'খানি পত্র এই সঙ্গে মুদ্রিত হল।

গোপাল হালদার
Road-6, Rajendranagar
Patna—16

শ্রীঅমিয় দাশগুপ্ত করকমলেষু—

সুহৃদ্বরেষু,

আপনার দীর্ঘ ও সুবিবেচনা-প্রসূত ও কল্যাণকামিতা প্রসূত পত্র ২ দিন পূর্বে পেয়েছি—আজ সংবাদ পত্রে পেলাম স্নেহাংশুর চিরবিদায়ের খবর। এককালে এক সঙ্গে অনেক আশায় ও কর্মকাণ্ডে সহযোগী ছিলাম—বড় নামধারীদেরও তা ছিলাম—সেকথা থাক, কিন্তু স্নেহাংশুর অকৃত্রিম আনন্দময় আমুদে সকৌতুক সাহচর্য যত স্বল্পক্ষণ হয়ে হোক—কে বিস্মৃত হবে ?

শুধু কাজের কথা বলি—কলম ধরতে পারি না, জানেন। এবার চক্ষুও ক্ষমতা হারাচ্ছে। স্মৃতির সঙ্গে বুদ্ধি ও ভাবনা-শক্তি দ্রুত স্তিমিত হচ্ছে নির্বাপিত হবার পূর্বে পারলে আপনার কল্যাণেচ্ছাকে এখনো যতটা পারি, সহায়তা জোগাই। তার চেষ্টা করছি—এ চিঠি থেকে বিবেচনা মত যোজনার জন্য।

প্রথম কথা 'ত্রিদিবা'র তৃতীয় খণ্ডের (নিরক্ষরতা সংস্করণ) প্রেসে যাওয়া ও প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত আমি ছিলাম রোগশয্যায়—ও খণ্ডের এক অক্ষরও আমার বা আমার বন্ধুস্থানীয়দের দেখবার সুযোগ হয় নি। প্রকাশের পরে যখন দেখলাম তখন পড়তে-পড়তে বুঝলাম কোথাও পাণ্ডুলিপির একাধিক পৃষ্ঠা (হয় তো দুই স্থলে এক-একও হতে পারে) সম্পূর্ণ বাদ যাওয়াতে আমার বইটির অন্তরস্থিত একটি মূল বক্তব্য (যা হয়তো লেখায় ইঙ্গিতে বলা ছিল) তা একেবারেই

বাদ গিয়েছে ; ইঙ্গিতও আর লক্ষণীয় নেই, অবশ্য ইঙ্গিতেই থাকা উচিত—কিন্তু তা একেবারে বাদ গেলে আমার কথা খণ্ডিত হয় মনে হচ্ছে। সেই মূল কথাটা এই—অমিত ও ইন্দ্রাণীকে আমি সমাজসিদ্ধ ভাবে মিলিত করতে চাই না—কিন্তু একেবারে বিচ্ছিন্নতায় দূরান্তরিত রাখতেও চাই না। 'ছোট আমি' থেকে 'বড় আমি'তে যেতে হলে প্রথাসিদ্ধ মিলন বড় ঘটে না ; কিন্তু 'বড় আমি'তে পৌঁছুতে পৌঁছুতে এই 'অনুভূতি'টাও নিঃসন্দেহে দৃঢ়রূপে 'উপলব্ধি'তে পৌঁছানো চাই যে, বাস্তব সাধ্য বা অসাধ্য থাকলেও অন্তর-চেতনায় তা স্পষ্ট না হলেই নয়। 'এ কথা প্রেয়সী জানি—"তুমি আছ আমি আছি।" জীবনের নিগূঢ়তর পূর্ণতা এই যে বোধ, এই বোধের দ্বারাই সিদ্ধ হয়—না হলে জীবন অপূর্ণ থেকে যায়। অমিত-ইন্দ্রাণীকেও আমি সে ভাবে অপূর্ণ রাখতে চাই নি,—শেষ মুহূর্তে দুজনার মধ্যেই এই বোধকে অন্তত ততটা স্পষ্ট করতে চাই—দুজনাকে নিয়ে দুজনায় আছে ও থাকবে—যতটুকু স্পষ্ট করলে সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দুজনারই 'বৃহত্তর আমিতে' ('বড় আমি'-তে) জাগরণের ও প্রতিষ্ঠার আভাস পাঠকের মনে সঞ্জাত হতে পারে—মনে হবে দুজনায় শুধু বিচ্ছিন্নতায় দুজনকে খণ্ডিত ক'রে তারা কেউ শেষ হচ্ছে না, বা হবে না। এরূপ ইঙ্গিতেই তৃতীয় খণ্ড শেষ করতে চেয়েছি। আর, আমার মনে হয় তা ছাপায় বাদ গিয়েছে, বা ধরা পড়েনি। এখন তা হলে কি করা? প্রথমত এ অংশের 'ভূমিকায়' একটু ক্ষুদ্র নিবেদন জানানো—"মুদ্রণকালে আমার অনুপস্থিতিতে এমন কিছু অংশ বাদ পড়েছে যা লেখকের অভিপ্রেত সমাপ্তি আর ইঙ্গিতেও ধরা পড়ে না। এই সংস্করণে যথা সম্ভব অল্পকথার সংযোগে সে ইঙ্গিত (ইঙ্গিত রূপেই) যোগ করা হল।" দ্বিতীয়ত বইতে কী যোগ করতে চাই? ও কোথায়?

॥ ১ ॥ যেখানে দিল্লী-গামী ইন্দ্রাণীর (অমিতদের আবার গ্রেফ্‌তারের খবর পড়ল) নানা আকুল স্ববিরোধী আত্মচিন্তার মধ্যেই এই মর্মে তার (সিদ্ধান্তটি) আভাসিত হবে, যথা : "না, না, ইন্দ্রাণী, অপরাজিতা। ইন্দ্রাণী কারও কাছে পরাজয় স্বীকার করিবে না...মানবের কাছে না,...অমিতের কাছে না...কারও কাছে না,—কারও কাছে না.. না,...নিজের অহঙ্কারের কাছেও না। না, ইন্দ্রাণী, দর্পিতা ইন্দ্রাণী, জীবন তো দর্পের বস্তু নয়—জীবন তোমার সমাজের সঙ্গে সংগ্রামে জিতবার অহঙ্কার দর্পে নয়। আপনাকে ক্ষয় করবার জিনিসও নয়।—জীবন, জীবন—দেহমনে সত্তার পরিপূর্ণতার পথ—ক্ষমতার দর্প নয় মানবের সঙ্গে, ব্যক্তিত্বের অহঙ্কার নয় অমিতের সঙ্গেও—চাই সম্পূর্ণতা, মিলনের সম্পূর্ণতা মানবের সঙ্গে. মিলনের স্বীকৃতি অমিতের সঙ্গেও—'তুমি আছ, আমি আছি'—ব্যক্তিত্বের অহঙ্কারে দিল্লীর দিকে কোথায় চলিয়াছ ইন্দ্রাণী?—ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রাণী, তোমার অহঙ্কারের কাছে তুমি কি জীবনের পরাজয় ঘটাবে? পূর্ণতার আলোকে তোমাকে ফিরিতে হইবে. সম্পূর্ণ হইবে মানবের কাছে. সম্পূর্ণ হইবে সে-ও তোমার সঙ্গে-সঙ্গে সাহসে স্বীকৃতিতে।...অমিত, অমিত চিরদিনের পথের সাথী

ইন্দ্রাণীর। পথই অমিতের গৃহ, পথই ইন্দ্রাণীর গৃহ—সেই গৃহে, সেই পথের গৃহে ইন্দ্রাণী সম্পূর্ণ হইতে চায়—সম্পূর্ণ করিতে চায় তোমাকেও অমিত...। জেল তোমাকে-আমাকে দূরে রাখিতে পারিবে না। ইন্দ্রাণীর অপরাজেয় অহঙ্কারে নয়, আপন সত্তার দাবিতে জীবনকে সম্পূর্ণ করিতে হইবে ইন্দ্রাণীর।—জীবনকে সম্পূর্ণ করিতে হইবে অমিত, সম্পূর্ণ হইতে হইবে তোমাকে—আমাকে—ইন্দ্রাণী চলো চলো, সম্পূর্ণ হইতে হইবে তোমাকে—সম্পূর্ণ হইতে হইবে—সম্পূর্ণ হইতে হইবে—সম্পূর্ণ হইতে হইবে---ট্রেনের উদ্দাম চলন্ত চক্র-ঘর্ষণে ইন্দ্রাণী আর কিছুই শুনিতে পায় না...সম্পূর্ণ হইতে হইবে, সম্পূর্ণ হইতে হইবে, সম্পূর্ণ হইতে হইবে"......"

উপরের Correspondingly কিন্তু 'ব্ল্যাক মেরিয়ার' জেল পথে (বই-এর শেষ পৃষ্ঠায়) অমিতেরও মানস-চিন্তায় থাকবে নিম্নমর্মের সংযোগ: "অন্ধকার ভেদ করিয়া 'ব্ল্যাক মেরিয়া'র রাতির বিদ্যুৎ-বহ্নি রেখা সম্মুখের পথ দেখাইতেছে—কোথায়? জেলের দিকে?—ফুঃ, অমিত মনে মনে বিদ্রূপের হাসি হাসিল—জেলে—আলোকের রেখা! কত কত জেল পার হইয়া ছুটিয়াছে—কত বিরোধ-বিদ্রোহের মধ্য দিয়া মানবমুক্তির তীর্থ সঙ্গমে—কত 'ছোট আমি' চূর্ণ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে কত 'বড় আমি'র দাবি—কত সত্তার খণ্ডতাকে মিলাইয়া দিতে সত্তার সম্পূর্ণতার দীপান্বিতায়---মহামানবের আগামী দিনের আগমনকে স্বাগত করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে কত প্রাণের দীপ---আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া কত জীবন-সত্তার সম্পূর্ণতার আশ্বাসে---'ছোট আমি' হইতে 'বড় আমি'র জাগরণের শপথে---শুধু কর্মের, মিলন উৎসবের নয় শুধু, দেহ-মন-প্রাণের ক্ষুদ্র সাধও যেখানে সত্তায়-সত্তায় সম্পূর্ণতার মধ্যে জাগিয়া বলিয়া উঠিবে 'বড় আমির' প্রশান্ত পরিপূর্ণতায়---'তুমি আছ, আমি আছি'—আমরা আছি পরস্পরকে সম্পূর্ণ করিয়া মানবমুক্তির পরিপূর্ণতার অর্ঘ্য। সকল মানুষের বিকাশের পরিপূর্ণতায় মহামানবের আত্মপ্রকাশ। ইন্দ্রাণী,---তোমার, আমার, সকলের বুকে—সকলের চোখে-মুখে, বুকে-বুকে সেই মানব-সম্পূর্ণতার দীপ শিখা---সেই ঘোষণা—সেই—"

এখন আপনার পত্রের অন্যকথা---

... ...

যদি বইগুলির (১) প্রথম প্রকাশ কাল, (২) প্রকাশকালীন নিবেদন, (৩) উৎসর্গপত্র উল্লেখ করতে পারেন, তাহাই মোটামুটি যথেষ্ট। বেশি ঘাঁটিবেন না, শুদ্ধকরণের প্রয়োজনে সঙ্গতি রেখে যা উচিত মনে হয়, করবেন।

... ...

ইতি—

শুভার্থী

গোপাল হালদার

[* ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে চিঠিটি সংক্ষিপ্ত আকারে ছাপা হলো।

* পত্রে উদ্ধৃত 'একথা প্রেয়সী জানি---তুমি আছ, আমি আছি' অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের 'নির্ভয়' কবিতার চরণ। চরণটির শুদ্ধ পাঠ হবে---"এ বাণী প্রেয়সী, হোক মহীয়সী---তুমি আছ, আমি আছি॥"]

Gopal Haldar
Road-6, Rajendranagar,
Patna-16.
বুধবার, 24-9-86

সুহৃদ্বরেষু,

'ত্রিদিবা'র শুদ্ধি ও সম্পাদনার নানা প্রশ্ন শুদ্ধ আপনার দীর্ঘ-পত্র পেয়েছিলাম। উত্তরও দিয়েছি---এখান থেকে, আমার পক্ষে, যতটা আপনাকে সাহায্য করা সম্ভব তার চেষ্টা করেই ৪ পৃষ্ঠা লেখা সেই খামের পত্র। **সে পত্র পেয়েছেন কি না, তাই প্রধান জিজ্ঞাস্য.** এবং জানাবেন।

ইতিমধ্যে এ. মুখার্জীরাও পত্র দিয়েছেন (আপনার শুদ্ধি-সম্পাদনার অসুবিধার প্রসঙ্গ জানিয়ে)। তাদেরও উত্তর দিয়েছি। পূজার ছুটি কবে, বাইরে (নিশ্চয়ই যাবেন) কতদিন কাটাবেন: এবং ফিরে কাজকর্ম শুরু করতে কবেতক পারবেন; অনুগ্রহ করে জানাবেন। 'ত্রিদিবা' সম্পর্কে (যদি চিঠি পেয়ে থাকেন) দেখেছেন---আমার মুখ্য বিষয়টা (গত নিরক্ষরতা সংস্করণের অবহেলায় যা ঘটেছে তা)--Conclusion-টা (শেষ খণ্ডের শেষ দিকে) 'তুমি আছ, আমি আছি' কথাটার ইঙ্গিতকে Positive করা,---'ইঙ্গিত'কে **ইঙ্গিত রেখেই** অর্থ আদি উজ্জ্বল করা। তাছাড়া, আপনাদের প্রশ্ন খুবই ঠিক---বিচার বিবেচনা মত তা স্থির করবেন। আর আমার বিবেচনায় (১) উপন্যাসের পূর্বতন সংস্করণগুলির সঙ্গে Comparative editing নিষ্প্রয়োজন। **এই সংস্করণই 'প্রামাণ্য' হবে শেষ সংস্করণ-রূপে।** (২) দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের Comparatively গৌণ episode, তর্ক প্রভৃতি কমানো যায়---যদিও তখনকার দিনে তার relevancy ছিলো---এ কথাটাও বিবেচনা করবেন।

শরীর একরকম যাচ্ছে। সব ঠিক মত চললে নবেম্বরে পারলে কলকাতা ফিরব। তারিখ এখনো ঠিক নেই। আশা করি আপনারা সকলে কুশলে আছেন। ইতি----

শুভার্থী
গোপাল হালদার

কয়েকজন বিশিষ্ট সমালোচকের অভিমত

১. ড. শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

"বৈপ্লবিক আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবন ছাড়া সাহিত্যেও যে প্রেরণা দিয়াছিল, তাহার প্রচুর নিদর্শন আছে। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' ও শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' প্রমাণ করে যে, বঙ্গসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকেরাও বৈপ্লবিক উন্মাদনার মধ্যে স্থায়ী সাহিত্যের উপাদান ও অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন।...

এই শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে গোপাল হালদারের 'একদা' (১৯৩৯) শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে। এই উপন্যাসে রাজনৈতিক বন্দীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উচ্চাঙ্গের মনন-শক্তি ও প্রখর জ্বালাময় অনুভূতির চমৎকার সমন্বয় হইয়াছে। ইহার ছত্রে ছত্রে বৈপ্লবিকতার প্রলয়ংকর দাহ ও দীপ্তি, ইহার উন্মত্ত, আত্মঘাতী বিক্ষোভ অনুভব করা যায়। যে সুদূর, অনায়ত্ত আদর্শের মোহে বিপ্লবী জীবনের সুলভ-আংশিক সফলতা প্রত্যাখ্যান করে তাহা ইহাতে মর্মভেদী আন্তরিকতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে।......

তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী আত্মজিজ্ঞাসা ও গভীর আবেগের সহিত মনীষাদীপ্ত জীবন-বিশ্লেষণ এই উপন্যাসের গৌরবময় বৈশিষ্ট্য। জীবন ও জীবনাদর্শ কি, এই সম্বন্ধে ব্যাকুল অনুসন্ধিৎসা গ্রন্থের প্রতি পাতায় অনুরণন তুলিয়াছে।......

বিপ্লববাদের দার্শনিক আশ্রয় ইহা অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে আলোচিত হইতে পারে না। কিন্তু উপন্যাসটির দার্শনিক মননশীলতাই ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ নহে। ইহার সহিত মানব-হৃদয়ের চঞ্চল ঘাত-প্রতিঘাত যুক্ত হইয়া ইহাকে উপন্যাসোচিত গুণে সমৃদ্ধ করিয়াছে।......

......দুই একটি ক্ষুদ্র অসংগতি সত্ত্বেও উপন্যাসটির শ্রেষ্ঠত্ব, ইহার আবেদনের তীক্ষ্ণতা অনস্বীকার্য। বৈপ্লবিক মনোভাবের বিশ্লেষণে ও ইহার অসহনীয় অন্তর্জ্বালা ফুটাইয়া তোলার অসাধারণ ক্ষমতায় ইহা এই জাতীয় উপন্যাসের শীর্ষস্থানীয়।"

—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (৬৫৮-৬৬২ পৃষ্ঠা)

৪র্থ সংস্করণ, ১৯৬২ শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২. ড. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী

" 'একদা'-র রচনাকাল ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ। আর কাহিনীতে যে কাল-পরিবেশ চিত্রিত হয়েছে, তা হ'ল ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে তিরিশের দশকের একটি বুদ্ধিজীবী অন্তর্মুখী তরুণ-মনের উপর সম-

কালীন প্রবল জীবনাবর্তের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষিত হয়েছে উপন্যাসে। সমকালীন জীবনাবর্ত বলতে মুখ্যত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও আন্দোলনকেই বোঝাতে চাইছি। মনে রাখতে হবে, উপন্যাসের নায়ক অমিত একদিকে যেমন সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি ও ইতিহাস-পুরাতত্ত্বের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট, অন্যদিকে তেমনি প্রত্যক্ষ জীবনের নানা পর্বে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী সশস্ত্র আন্দোলন এবং সাম্যবাদ-মূলক বিপ্লব-প্রয়াস প্রভৃতি সমকালীন সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা ও প্রত্যয়ের সঙ্গে জড়িত হয়েছে। তার ফলে সব ক'টি চেতনা ও প্রত্যয়ই তার মননশীল সত্তায় সাড়া জাগিয়েছে, এবং সেজন্য তার মনে জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সব মিলিয়ে তার রাজনীতি-সচেতন সত্তা পরিণতি ও পুষ্টিলাভ করেছে সন্দেহ নেই। শেষ পর্যন্ত সে হয়ত সাম্যবাদী চিন্তাধারাতেই বিশ্বাস স্থাপন করেছে সবচেয়ে বেশী, সেই মন্ত্রেই সে রাজনৈতিক দীক্ষা গ্রহণ করেছে, কিন্তু উপন্যাসের পক্ষে সেটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। উপন্যাসের মধ্যে কোথাও কোথাও দীনু-মোতাহের ও মিঃ দাশের সঙ্গে আলোচনায় কিংবা ব্রজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে কথোপকথনের সময় হয়ত বিশেষ রাজনৈতিক চিন্তাধারা বা বিশ্বাসের প্রতি নায়কের বিশেষ প্রবণতা একটু বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু সমগ্র উপন্যাসটির তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য বিচারের ক্ষেত্রে ওই প্রসঙ্গগুলিকে গৌণ বলে ধরলেও ক্ষতি নেই। বস্তুত এক রাজনীতি-সচেতন আদর্শবাদী মনের প্রবল জীবনজিজ্ঞাসাই উপন্যাসটির মুখ্য আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। বিশেষ এক দেশ-কালের পরিবেশে অমিতের মনে যে গভীর জীবন-বোধ ও আত্মজিজ্ঞাসা জাগ্রত হয়ে উঠে তার সত্তাকে আন্দোলিত বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে, সেই 'নচিকেত' জিজ্ঞাসা-জনিত সুতীব্র মানবীয় যন্ত্রণা ও অন্তর্দাহের চিত্রই উপন্যাসটিকে এক অভিনব তাৎপর্য দান করেছে।

বাংলা সাহিত্যে রাজনীতি বা রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত উপন্যাসের ঐতিহ্য নূতন নয়। উনিশ শতকে রচিত 'আনন্দমঠ', থেকে শুরু করে বিশ শতকের উপন্যাস 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়' কিংবা 'পথের দাবী' ইত্যাদি রাজনীতি-আশ্রয়ী উপন্যাস যে স্মরণীয় ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে, 'একদা' সেই প্রবাহে আরেকটি উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্য-সমুজ্জ্বল তরঙ্গ সন্দেহ নেই।

আগেই বলেছি, রাজনীতি বা রাজনৈতিক আন্দোলনই কেবল অমিতের জীবনের একমাত্র সত্যবস্তু নয়। বস্তুত এটি তার পক্ষে উপায় বা means বিশেষ, End বা চরম লক্ষ্য হ'ল জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য ও সার্থকতার সন্ধান। বস্তুত তার মনন-ঋদ্ধ আদর্শবাদী মন বিশ্বের চলমান জীবনের পটে স্বীয় জীবনের স্বার্থকতার পথ সন্ধান করতে চেয়েছে গভীর ঐকান্তিকতায়। 'সে চাহে বিকাশ—আপনাকে মেলিয়া দিতে, উদ্‌ঘাটিত করিতে। বিকাশ দিনরাত্রির সংখ্যায় নয়, বিকাশ আপনার পরিপূর্ণতায়, চেতনার তীব্রতায়, অনুভূতির গভীরতায়, কর্মের ঔজ্জ্বল্যে। There is only one Eternity—in intense living।'

এই পরিপূর্ণ 'আত্মবিকাশ' ও 'intense living'-এর সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা অমিতের চিন্তা, কর্ম ও চেতনাকে উদ্দীপ্ত ও উদ্বুদ্ধ করেছে। বস্তুত প্রথম থেকেই অমিতের মনকে এই ঐকান্তিক জিজ্ঞাসা উৎকণ্ঠিত করে তুলেছে। আর এই ব্যক্তিগত জীবনপ্রশ্ন থেকেই তার মনে ক্রমশ সাম্যবাদ ও সমষ্টিগত সমাজবোধ ও বিপুল রাষ্ট্রনৈতিক কর্মযজ্ঞের প্রেরণা অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে।...

'একদা' উপন্যাস কাহিনী-রসপ্রধান নয়, চিন্তা-মনন ও জীবনজিজ্ঞাসার তীব্র চেতনা যে এই গ্রন্থের মূল আশ্রয়, একথা আগেই প্রকারান্তরে ব্যক্ত করেছি। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে যেটুকু কাহিনী-সূত্র আছে, জীবনের যে সব খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা, যে সব নরনারীর সংসর্গ নায়কের জীবনবোধকে উদ্দীপ্ত করেছে—সে সব ঘটনা ও চরিত্র-চিত্র উপন্যাসটিতে কাল-পারম্পর্য ও সংগঠন-পারম্পর্য বজায় রেখে একটানা সুসংবদ্ধ একটি কাহিনীরূপে বিবৃত হয়নি। উপন্যাসের প্রথাসিদ্ধ আঙ্গিক-রীতি এখানে পরিত্যক্ত হয়েছে।...

আঙ্গিকের একটি দিকে কিন্তু 'একদা' বিশেষ অভিনবত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থের কাহিনী নায়কের একটিমাত্র দিনের অভিজ্ঞতার আধারে বিন্যস্ত হয়েছে। ১৩৩৭ সানের আটাশে অগ্রহায়ণ—কলকাতা শহরে সকাল থেকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত এই উপন্যাসের স্থান ও কালসীমা। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে একদিনের পরিধির মধ্যেই ও কেবল কলকাতা শহরেই উপন্যাসের সব ঘটনা সীমাবদ্ধ থাকেনি। পূর্বস্মৃতি রোমন্থন বা আলোচনার দ্বারা অতীতের বহু বৎসর পূর্বেকার ঘটনা, তা' কখনও বাংলার গ্রামে গ্রামে, কখনও দার্জিলিঙের পার্বত্য পটে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। উপন্যাসের একটি সংহত কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে 'Flash Back' রীতির সাহায্যে দেশকালের এই সম্প্রসারণ এবং ইচ্ছামত আবার সমস্ত বিকীর্ণ ঘটনারশ্মিকে বর্তমানের বিন্দুতে সংহত করে আনার রীতি বাঙলা উপন্যাসে অভিনব। এর আগে বিশ শতকের বিভিন্ন পাশ্চাত্য উপন্যাসে, বিশেষভাবে জেমস জয়েস-এর Ulysses-এ, ভার্জিনিয়া উল্‌ফের Mr. Dalloway, The Waves—ইত্যাদি উপন্যাসে কিংবা মার্সেল প্রুস্তের Remembrance of Things Past নামক ফরাসী উপন্যাসে এই ধরনের অভিনব কাল-চেতনার পরিচয় মেলে।"

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথা সাহিত্য
(৪৬৯—৪৭২ পৃঃ)—১৯৫৭/গোপিকানাথ রায়চৌধুরী।

৩. শ্রীরণেশ দাশগুপ্ত

॥ ১ ॥

'একদা', 'অন্যদিন' ও 'আর একদিন'—গোপাল হালদারের এই তিনটি উপন্যাসের একত্রিত নাম 'ত্রিদিবা'। 'একদা'-র প্রথম প্রকাশ তিরিশের দশকের শেষের দিকে। অন্যদিন' ও 'আর একদিন' প্রকাশিত হয়েছে পঞ্চাশের দশকে। 'ত্রিদিবা'র প্রকাশকাল ১৯৭৮ সাল।

'ত্রিদিবা'র এই প্রকাশ গোপাল হালদারের উপন্যাসের শিল্পরূপকে একটি নতুন আয়তন দিয়েছে।

বাংলা উপন্যাসের ধারায় 'একদা' তার প্রথম প্রকাশের সময় যে জন্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করছিল, 'ত্রিদিবা'র প্রথম খণ্ড হিসাবে তার সেই বৈশিষ্ট্য আর থাকছে না। 'একদা' আলাদাভাবে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের দাবিদার ছিল বিশেষ করে শৈলীর দিক দিয়ে। স্মৃতি ও চেতনার জঙ্গম পটে অতীত ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর বহুলতাকে গোপাল হালদার তাঁর 'একদা' উপন্যাসে একটি মাত্র দিনের কাঠামোর মধ্যে ধরেছিলেন বহুমাত্রিক চলচ্ছবির পদ্ধতি প্রয়োগ করে। 'অন্যদিন' ও 'আর একদিন' উপন্যাসেও নামকরণের মাধ্যমে 'একদা'-র শিল্পী একই ধারাকে বজায় রাখতে চেয়েছিলেন নিশ্চয়। কিন্তু 'ত্রিদিবা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারা গিয়েছে, আধুনিকতার ধারা ধ্রুপদীতে মিশ্রিত হয়েছে। 'একদা'তেও এর অবকাশ ছিল। 'একদা' বাংলা উপন্যাসে সময় এবং অবস্থিতিকে একটি মাত্র ঘটনায় কেন্দ্রীভূত করেছিল। ত্রিদিবা বড় করে তুলেছে পরিব্যাপ্তিকে। এতে সমস্ত ঘটনাকে প্রবাহিত হতে দেখা যাচ্ছে বিশ্ববিপ্লবী সুদূর প্রসারী লক্ষ্যে।......

বস্তুতপক্ষে 'অন্যদিন' ও 'আর একদিন' উপন্যাসদ্বয়ের আধুনিকতার কাঠামোর মধ্যে লেখক তাঁর নায়ক অমিতের মার্কসীয় বক্তব্যকে প্রসারিত করতে গিয়ে যে ধ্রুপদী চরিত্রাবলী ও ঘটনা ও বাস্তবের পরিব্যাপ্তি নিয়ে আসেন, তাতেই তিনি অতি আধুনিক শৈলীর মধ্যে ধ্রুপদী উপন্যাসের সমস্ত মাল-মশলা জড়ো করেছিলেন। 'ত্রিদিবা'র সামগ্রিকতা এই ঘটনাকে প্রকট করে দেখিয়েছে। তবু, 'ত্রিদিবা' ঠিক ধ্রুপদী উপন্যাস নয়। একে বরং বলব, একটি অনন্য ধারা। প্রথমত, একদা'র লেখক তাঁর মন্তাজ বা সংযোজনের পদ্ধতিকে 'অন্যদিন' এবং 'আর একদিন' উপন্যাসেও বারংবার ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয়ত, মনঃস্রোত বা চিন্তাস্রোতের মধ্য দিয়েই ঘটনা ও চরিত্রাবলীকে উদ্ভাসিত করার ধারার প্রাবল্য বজায় রয়েছে সমগ্র 'ত্রিদিবা'তে।

এইভাবে গোপাল হালদারকে 'ত্রিদিবা' এক ধরনের জটিলতাপন্থী শিল্পী হিসাবেও উপস্থাপিত করেছে। শিল্পী হিসেবে তিনি এখানে খুব বেশি কর্মিষ্ঠ, খুব বেশি সজাগ। 'রূপনারানের কূলে' কিংবা পূর্বোক্ত অপর দুটি উপন্যাস-মালার সহজ সরল গাল্পিক লেখক 'ত্রিদিবা'তে প্রাধান্য দিয়েছেন মনস্তাত্ত্বিক আধুনিকতম উপন্যাসের শিল্প রূপকেও। 'ত্রিদিবা' পড়ে একটা প্রশ্ন জাগে। এই তিন খণ্ডের উপন্যাসটির লেখক একটা তৃতীয় ধারা তৈরি করতে চেয়েছেন কি?

॥ ২ ॥

বিষয়বস্তুতে 'ত্রিদিবা'-র আধুনিকতা ও ধ্রুপদী পদ্ধতির মিশ্রণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এই উপন্যাসটি আগাগোড়া রাজনৈতিক আখ্যান। তিরিশ ও চল্লিশের দশকের বাংলার অগ্নিযুগ থেকে শ্রমজীবী-বিপ্লবের যুগে উত্তরণের কুশীলবদের চরিত-কথাকেই 'ত্রিদিবা'র পর পর তিনটি উপন্যাসে প্রাধান্য ও

বিস্তার দেওয়া হয়েছে। পরাধীনতার শিকলভাঙার এবং সেই সঙ্গে আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার বস্তুসত্তা নির্ণয় করার জন্যে তিরিশ ও চল্লিশ দশকে উৎসর্গিত অসংখ্য নরনারীর জীবন সাধনা হচ্ছে 'ত্রিদিবা'। যুবা-নায়ক অধ্যাপক অমিতকে এইজন্যেই লেখক এমন ভাবে বেছে নিয়েছেন যে, মুক্তিসংগ্রামে উৎসর্গিত এই যুবা অজস্র ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলতে চলতে নিজেকে যতটা প্রকাশ করেছে, তার চেয়ে বেশি দেখাতে পেরেছে সংগ্রামী সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের।

এই কারণে, 'ত্রিদিবা' বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে যত বেশি সংখ্যক নরনারীর চরিত কথাকে স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছে, তেমনটি এর আগে অনেক সার্থক ঔপন্যাসিকের লেখাতেও হয়নি। নায়ক সব সময় চলমান। তার সান্নিধ্যে যারাই এসেছে বিপ্লবের দ্বন্দ্বাত্মক বহুসংখ্যক স্রোতধারার টানে, তারা কখনও গৌণ হয়ে যায়নি। ইন্দ্রাণী, সুধীরা, সবিতা ও সুরো অমিতের হৃদয়রাজ্যের নারী চরিত্র। বিশেষ করে 'ত্রিদিবা'-র লেখক এই চারটি নারী-চরিত্রের চেতনা ও অবচেতনা এবং আকর্ষণ-বিকর্ষণকে আধুনিক মনস্তত্ত্বের নিরিখে এঁকেছেন বলে এরা অত্যন্ত সজীব। অগ্নিযুগের বিপ্লবী যুবা সুনীল কিংবা চটকল শ্রমিকদের সাম্যবাদী নেতা মোতাহেরকে ঔপন্যাসিক দিতে পেরেছেন পরিপূর্ণ মর্যাদা। 'অন্যদিন' হচ্ছে একদিক দিয়ে তিরিশের দশকের কারাগারে যে বিপ্লবীরা যন্ত্রণার্ত হয়েছে এবং অগ্নিপরীক্ষা পেরিয়ে মার্কসবাদকে স্বাধীনতা ও সাম্যের দর্শন হিসাবে গ্রহণ করেছে, তাদের মনের বহুকৌণিক চলচ্ছবি। 'আর একদিন' উপন্যাসে এসেছে শ্রমিক কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনের বুদ্ধিজীবী ও মেহনতী কুশীলবেরা। ট্রামের মজুর এবং খেত-খামারের শ্রমজীবী মানুষের অন্তরঙ্গ চরিত্র-চিত্র সামনে এসে গিয়েছে। এরা সকলেই মুখ্য। এরা কেউ অপ্রধান নয়। অবশ্য, গোপাল হালদার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকেও নরনারীদের নিয়ে এসেছেন স্বাধীনতা ও সাম্যের অবিশ্রান্তভাবে পরিব্যাপ্ত হতে থাকা বিক্ষোভ ও সংগঠনের আওতায়।

এই জন্যেই নায়ক অমিতের সান্নিধ্যে অথবা চৌম্বকচক্রকে 'ত্রিদিবা'তে যত বড় করা হয়েছে, অমিতকে তত বড় করা হয়নি। অমিত অত্যন্ত সাধারণ মুখচ্ছবির অধিকারী। তাঁকে কোন দিক দিয়েই বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী করা হয়নি। বিপ্লব বা সাম্য ও স্বাধীনতার সংগ্রামের এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলার ক্ষমতা ও মুক্ত-মন অমিতকে দিয়েছে সেই পরিধি, যার মধ্যে উল্কার মতো নারী ইন্দ্রাণী কিংবা কোমলা সুরো স্বচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে।......

'ত্রিদিবা'র বৈশিষ্ট্য এই যে, এত অসংখ্য নানামুখী সুস্পষ্ট চরিত্র অনেকাংশে নায়ক অমিতের চিন্তাস্রোতের বহুমাত্রিক আয়নায় প্রতিফলিত। রাজনৈতিক উপন্যাসে এটা নিশ্চয় কিছুটা অপ্রত্যাশিত।

(শ্রীরণেশ দাশগুপ্ত লিখিত 'অনন্য ত্রিদিবা'—
প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশ। 'পরিচয়'—গোপাল
হালদার সম্মান সংখ্যা- ১৯৫৭)

৪. ড. কার্তিক লাহিড়ী

'ত্রিদিবা'-র বিষয়বস্তু যে আধুনিক—এ বিষয়ে দ্বিমত হওয়া প্রায় অসম্ভব, যেহেতু সামাজিক রাষ্ট্রিক চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে সাম্যবাদ এখনও পর্যন্ত সর্বাধুনিক ধারণা হিসেবে চিহ্নিত, এবং একজন মানষের সেই সাম্যবাদে উপনীত হওয়ার কাহিনী তাই নিঃসন্দেহে আধুনিক হিসেবে বিবেচ্য। আর এই আধুনিক ও নতুন বিষয়কে প্রকাশের জন্য দরকার হয়ে পড়ে অনুরূপ রীতি ও করণ-কৌশল, তাই 'ত্রিদিবা'-র কাহিনী অবিচ্ছিন্ন কথকতার ও প্রথাসিদ্ধ ধরণে সরলরেখায় ঔপন্যাসিক ভাষ্যে উপস্থাপিত হয় নি, এবং তার অবলম্বিত রীতিকে কোনোক্রমে প্রাচীন বা তার পুনরাবৃত্তি বলা চলে না।

সংবিৎ-প্রবাহ, আন্তর মনোকথন (interior monologue), স্মৃতি, অর্বাচীন সংলাপ বা মনের কোনও স্মরণীয় ভাবনা গুচ্ছে অকস্মাৎ আত্মিক উজ্জ্বল্য (জয়েসের ভাষায় যা এপিফ্যানি Epiphany রূপে চিহ্নিত) বা উজ্জ্বল আকস্মিকের উন্মেষ প্রভৃতি করণ-কৌশল হুবহু অনুসৃত না হলেও অমিতের কাহিনী চলে এই সব রীতি আশ্রয় করে। আবার আধুনিক মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের (যার সূত্রপাত প্রুস্তের 'রিমেমব্রেন্স্ অব থিংকস্ পাস্ট', জয়েস এর 'এ পোর্ট্রেট অব দি আর্টিস্ট এজ এ ইয়ং ম্যান' প্রভৃতি উপন্যাসের প্রকাশ থেকে ধরা হয়) কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 'ত্রিদিবা'য় অনায়াসে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। আধুনিক মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস আত্মজীবনীমূলক এবং এই সব উপন্যাসে কাব্যভাষা ব্যবহৃত হয় অকুণ্ঠে আর যাত্রা যেন এমন উপন্যাসের একটি বিশেষত্ব হয়ে দাঁড়ায়। যাত্রা কিন্তু তা মানসযাত্রা, যে যাত্রা ঘটে চেতনা-প্রবাহের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ ঔপন্যাসিক আন্তর অভিজ্ঞতা কিংবা অভিজ্ঞতার অন্তর্মুখিনতা উপজীব্য করেন উপন্যাসে, কিন্তু এই অন্তর্মুখিনতা ঔপন্যাসিকের মাধ্যমে বিবৃত হয় না, ঔপন্যাসিক চরিত্রের অন্তর অভিজ্ঞতা সরাসরি চরিত্রের সাহায্যেই প্রকাশিত করেন, এবং নিজেকে ও নিজস্ব উপস্থিতি যথাসম্ভব বিলুপ্ত করতে সচেষ্ট হন।

স্বতন্ত্র তিনটি দিন, কিন্তু সাধারণ দিন নয়—বিশেষ তিনটি দিন, যেমন 'একদা'য় অমিতের দিনের কাজ শুরু হয় সুনীলকে টাকা পৌঁছে দেওয়ার তাড়ায়, যে সুনীল রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং যাকে বিশেষ কারণে কেবল ঠাঁই বদল করতে হয়। অমিতের এই কাজ থেকে স্পষ্ট হয় যে সে নিরাপদ জীবনযাত্রা বেছে নেয় নি—সরকারি চাকরি ভালো মাইনে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের মোহ তাকে তৃপ্তি দেয় না, সে গ্রহণ করে রাজনৈতিক জীবনের অনিশ্চয়তা, যদিও তখন সে লক্ষ্য সম্পর্কে যথেষ্ট নিশ্চিত নয়। 'একদা'-য় অমিত ক্রমে ক্রমে এক একটি সংকীর্ণ-গণ্ডি অতিক্রমে প্রয়াসী, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সফলও হয়েছে হয়তো, তবু এই পর্বে সে যত আবেগে উত্তপ্ত ঠিক তত পরিমাণে কর্মে উদ্দীপ্ত নয়, অর্থাৎ মানসিকভাবে অনেক এগিয়ে থাকলেও কর্মজীবনে সেই অনুপাতে অগ্রবর্তী হয় নি, এবং তা

এক্ষেত্রে খুব অ-স্বাভাবিকও নয়, এটা যেন তার রাজনৈতিক জীবনের প্রত্যুষ অধ্যায় —আলো স্পষ্ট না ফুটলেও অন্ধকার কাটার আবেগ আছে, কতকটা হৃদয়-অরণ্য থেকে নিষ্ক্রমণের চেষ্টা।

চিন্তা ও কর্মের মধ্যে আমরা একটা বিরোধের আভাস পাই সাধারণভাবে, অমিতও মনে করে "চিন্তা প্রাণের ধর্মই নয়, বরং প্রাণবেগের বিরোধী। প্রাণ চায় স্ফূর্ত হতে অর্থাৎ মূর্ত হতে। প্রাণ মূর্ত হয় একমাত্র কর্মে। যখন কর্মে তা ফুটতে পায় না, তখন কখনও কখনও সে নিজের পুঁজির খোঁজ নেয়, বুঝে দেখতে চায়, কেন ফুটতে পাচ্ছে না। তারই নাম চিন্তা"—(পৃ ১০৮)। কিন্তু চিন্তাকে অবদমিত কর্ম মনে করলে চিন্তা-কর্মের মধ্যে স্থিত প্রাচীরকে অগ্রাহ্য করা চলে, তবু যে কর্মের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চায়, সেই অমিত 'একদা'-য় চিন্তা করেছে অনেক বেশি, সে অনুপাতে তার কর্মক্ষেত্র নিতান্ত সংকুচিত, সে কেবল একের পর একজনের সঙ্গে দেখা করে চলেছে এবং তার সঙ্গে দেখাও হয়েছে অনেকের, কারুর সঙ্গে হয়তো অপ্রত্যাশিত-ভাবে। এই দেখার সঙ্গে সঙ্গে চলে তার চিন্তা-ভাবনার স্রোত, কিন্তু ঔপন্যাসিক গোপাল হালদার চিন্তার হুবহু প্রতিলিপি তুলে ধরেন না উপন্যাসে যা চেতনা-প্রবাহ-মূলক উপন্যাসে সচরাচর করা হয়ে থাকে। 'একদা'-য় কখনো স্মৃতির সাহায্য নেওয়া হয়, তবু ঐ স্মৃতির অনুষঙ্গে অমিতের আত্মচিত্রণ সর্বদা মুখ্য হয়ে ওঠে না। বাসে শৈলেনকে দেখে শৈলেনের পূর্বজীবন অমিতের স্মৃতিপটে ভাসে অনেকটা চলচ্চিত্রের ফ্ল্যাশ-ব্যাক ধরনে যা অনেক উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু 'ত্রিদিবা'র ঐ ফ্ল্যাশ-ব্যাক নতুন মাত্রা পায় অমিতের আন্তর-মনোকথন মধ্যে মধ্যে ঐ রীতির মধ্যে জড়িয়ে দেওয়ার জন্য, আবার অন্যদিকে সুনীলের কথা ভাবতে ভাবতে "অমিতের চোখে সুনীলদের বাড়ির ছবিটা ফুটিয়া উঠিল..." (পৃঃ ৬৯) কতকটা সিনেমার মন্টাজ-ধরনে,......।..... স্মৃতির অনুষঙ্গে মনে পড়ে এক-একজনের কথা হয়তো মলিনার কথা এবং তার জের টেনে এসে যায় সুনীল-মণীশের আখ্যান, যে আখ্যানে মন্টাজ ও প্রাণিতকরণ (animation)-এর রীতি উঁকি ঝুঁকি দিয়ে পাঠককে ভুলিয়েই দেয় যে অমিত এই আখ্যানে ক্যামেরা হাতে নিয়ে দর্শকের ভূমিকায় অবস্থিত এবং তার পক্ষে সুনীল-মণীশ উপাখ্যান বিবৃত করা সম্ভব নয়, কারণ সে সর্বজ্ঞ ও সর্বত্রগামী ঔপন্যাসিক নয়; কিন্তু উপাখ্যানের ফাঁকে ফাঁকে অমিতের মন্তব্যসহ উপস্থিতি ঘটিয়ে ঔপন্যাসিক সেই ত্রুটি মোচনে সচেষ্ট হয়েছেন......কখনো বা প্রাণিতকরণ ও মনটাজ রীতির আভাস অমিতের সুনীল-মণীশ আখ্যানে অনুপস্থিতির ফাঁক ভরাটই কেবল করে না, করণ-কৌশলের ('টেকনিক') মাত্রাও বাড়িয়ে দেয়, এবং এই মাত্রা বাড়িয়ে ঔপন্যাসিক অমিতের নিজস্ব গণ্ডিবদ্ধ জগৎকে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে যুক্ত করতে কিংবা কাছাকাছি আনতে সক্ষম হন।

অমিত জীবনকে বীরের মতো না হলেও পুরুষের মতো স্বীকার করতে চায়, তাই তার কাছে "পৃথিবীকে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখিবার মতো বুদ্ধি ও সাহসই বড়কথা।"[৮] এবং এভাবে সে সব কিছু দেখতে চেষ্টা করে, কিন্তু দর্শক হিসাবে সে যতখানি

সক্রিয়, কর্মক্ষেত্রে সে অনুপাতে উদ্যোগী না হওয়ায় কিংবা সঠিক কর্মক্ষেত্র নির্বাচিত হয় না বলে তার চিন্তা-ভাবনায় হ্যামলেটীয় সংশয়ের দোলা লাগে। সংশয় ও সংশয়-উত্তীর্ণ হওয়ার আকুতি মনে মনে—এমন চরিত্র চিত্রণের জন্য গোপাল হালদার যথার্থ রীতি গ্রহণ করেন, আর সে রীতি যে-কোনো মানদণ্ডে আধুনিক রীতি তা বলা বাহুল্য।

অন্যদিকে আত্মসনাক্তকরণ ও আত্মানুসন্ধানের বিষয়টি আধুনিকতায় অন্তর্গত হয়ে যায় আধুনিকতার নিজস্ব স্বাভাবিকতার নিয়মে. 'ত্রিদিবা'-র বিষয়বস্তু ঐ বিষয়ী (Subjective) মানেও আধুনিক মাত্রা পায়; কেননা আজকের আত্মজীবনী কেবল আর জীবনের প্রাজ্ঞতা বা পরিপক্ক অভিজ্ঞতা দেখানোর ক্ষেত্র না হয়ে আত্মপরিচয় আবিষ্কারের সত্তা নির্ধারণের মাধ্যম ও কৌশল হয়ে ওঠে, অমিতের কাহিনী তেমনই এক মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের কাহিনী, যেমন আফ্রিকার উন্মেষশীল দেশের কিংবা আমেরিকান নিগ্রো লেখকদের আত্মজীবনীমূলক লেখায় ঘটে আজকাল. অমিতের সংকট তার সত্তার সংকট, এই সংকটের মধ্যে নিজের অবস্থান ঠিক কোথায় তার সন্ধানে ঘোরে ফেরে অমিত—তার জীবন যে শৈলেন. সাতকড়ির জীবন নয়, তা সে বুঝে ফেলেছে, তবু সঠিক পথ খুঁজে পেতে তাকে বহু পথ পরিক্রমা করতে হয়. যদিও 'ত্রিদিবা'র শেষে সে পেয়ে যায় পথ, তবু 'একদা' পর্বে তার চিহ্নটি মাত্র খুব স্পষ্ট ধরতে পারে না বলে দ্বিধা সংশয় তাকে আত্মজিজ্ঞাসা ও প্রশ্নের সম্মুখীন করে ফলে তার আত্মানুসন্ধানে আমরা প্রচণ্ড উত্তাপ অনুভব করি।...... ... ...

... ...'একদা'-য় ছিল অমিতের স্ব-গণ্ডি অতিক্রমের চেষ্টা, না-ঘরের না-ঘাটের ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তর দ্বিধা সংশয় ও সংকটের মধ্যে হ্যামলেটীয় দ্বিধার পরিচয় মেলে, তেমন এক মনোভঙ্গি সম্বন্ধে অবশ্য অমিত সচেতন, এবং সে তা অতিক্রম করতে নিরন্তর যুধ্যমান, কিন্তু ঐ উৎক্রমণে তবু হ্যামলেটীয় মনোভাবের অবশেষ থেকে যায়—"...দু একটা জেনারেশনকে আপনারা বলি দিন,—Time is out of joint" (পৃঃ ১২৯), ফলে ঐ পর্বে সংবিৎ প্রবাহ, স্মৃতি, আন্তর-মনোকথন প্রভৃতির আংশিক বা মিশ্র প্রয়োগ ঔপন্যাসিকের দক্ষতারই পরিচায়ক, কারণ এই কলম-কৌশল আন্তর-বিদারণ চিত্র চেতন-অবচেতন উদ্ভাসনে দারুণ সহায়ক হয়। কিন্তু অমিত যে লক্ষ্যে পৌঁছুতে চায় বা পৌঁছয় তাতে উপনীত হতে গেলে নিছক বাস্তবের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠার কথা, কেবল মানসপটে ঐ অভিঘাতের চিত্রলিপি এঁকে গেলে সে চিত্রের অনেকটাই অনুহ্য থেকে যায়, আর ঐ ঘাটতি পূরণের জন্য তখন ঔপন্যাসিককে অন্য কৌশলের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু উপরিউক্ত রীতিগুলির সবদিকের যথোচিত সদ্ব্যবহার না করলে অন্যরীতি অনুসরণ সব সময় ঔপন্যাসিককে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে না। আবার বিষয়কে উপযুক্তভাবে ধরে রাখার শক্তি থাকা চাই নির্বাচিত রীতির, নাহলে বলার কথার চাপে আধার বিদীর্ণ হতে পারে, নয়তো কথার ন্যূনতায় আধার যথোপযুক্ত ব্যবহৃত হয় না, তাই যে তীব্র তীক্ষ্ণতায় অমোঘভাবে বলা লেখকের উদ্দেশ্য তা সেই অনুপাতে

উদ্দেশ্যের মর্ম বিদ্ধ করতে পারে না। 'অন্য দিন', 'আর একদিন'-এর কাহিনী মনে হয় 'একদা'র মতো উপযুক্ত রীতিকে আত্মস্থ করে নি, এজন্য ঐ কাহিনী যত তীক্ষ্ণ হওয়া উচিত ছিল তা হয়ে ওঠে না।

... ...

...কিন্তু এসব ত্রুটির উল্লেখ হয়তো সমালোচকের ব্যাসকূট মাত্র। একজন উচ্চ শিক্ষিত বাঙালি কি ভাবে তার স্বরচিত ও স্বয়ং সম্পূর্ণ-বৃত্তি অতিক্রম করে "নানা মানুষের বড় 'আমি-'র তপস্যা"-য় ''এক-একটি মানুষের মধ্যে প্রতিটি সাধারণ এই মানুষের মুখেও এখন সেই বিচিত্র ভাবী মানুষের মুখচ্ছবি, সৃষ্টির সুমহৎ স্বাক্ষর'' —এর সন্ধান পায় 'ত্রিদিবা' সেই ক্রমপরিণতির ইতিহাস, অমিতের কাহিনী একজন বাঙালি তরুণের সাম্যবাদে উপনীত হওয়ার মানস-দলিল হয়ে ওঠে। সাম্যবাদে উপনীত হওয়ার কাহিনী বাংলা উপন্যাসে এই প্রথম সচেতনভাবে উপজীব্য করা হয়, সে হিসাবে 'ত্রিদিবা' নতুন রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত হয়। তাই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও 'ত্রিদিবা'-র তাৎপর্য এখানে নিহিত, অন্তত 'একদা' বাংলা উপন্যাসের গতানুগতিকতার ক্রম ভঙ্গ করেছে—একথা বোধ হয় অস্বীকার করা চলে না আর।

ড. কার্তিক লাহিড়ী রচিত ''ত্রিদিবা'-র আধুনিকতা'' প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশ। 'পরিচয়'—গোপাল হালদার সম্মান সংখ্যা— ১৯৫৭।

৫. কবি শঙ্খ ঘোষ

অল্প কয়েক বছর আগে, সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রসঙ্গে লিখেছিলেন গোপাল হালদার : "তাঁর commitment ছিল...। তবে তা ছোট commitment নয়, বড় commitment, মানুষের কাছে, জীবনের কাছে এবং শিল্পের কাছে সতীনাথের সেই commitment। অথবা সেই commitment বরাবর সত্তার কাছে, ছোট আমি ছাড়িয়ে বড় আমির কাছে।"

এই শেষ কথাটিতে পৌঁছে সকলেরই মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের নাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও আমাদের মনে পড়বে যে গোপাল হালদার তাঁর নিজেরও বিখ্যাত 'ত্রয়ী' উপন্যাসে বারে বারে ঘুরিয়ে আনেন এই কথা, তাঁর নায়ক অমিত কমিউনিজমের দীক্ষায় এসে পৌঁছতে পারে কেবল এই জন্যে যে সে-পথ মানব-মুক্তির দিকে, ভালোবাসার রাজ্যে, সে হলো তাঁর ভাষায় 'নানা মানুষের বড়ো আমির তপস্যা।'

তপস্যার মতো কোনো কোনো শব্দ এখনকার পাঠকদের কাছে ভারি লাগতে পারে হয়তো, আর সেই কারণে একে মনে হতে পারে কিছুবা সাজানো কথা। কিন্তু যখনই কোনো কাজের দায়ে এসে পৌঁছই আমরা, তখনই বুঝতে পারি যে, নিজেকে নিজের থেকে ছাড়িয়ে নেওয়াই হলো আমাদের প্রধান এক সমস্যা, কেন না সকলের সঙ্গে মিলবার পথে আমাদের অহং-ই হয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে বড়ো বাধা।

আত্ম-সচেতন মানুষ বুঝতে চায় সেই বাধার পরিমাণ, অতিক্রম করতে চায় তাকে, তার আত্মপরিচয় ক্রমে বিস্তারিত হয়ে দেখা দিতে থাকে তার দেশের পরিচয়ের মধ্যে, তার কালের পরিচয়ের মধ্যে। নিজের খোলস ভেঙে মানুষের এই আত্মসচেতন বিস্তারের ইচ্ছে, বিশ্বের সঙ্গে আমির এই সংযোগ, আধুনিকতার এই হলো এক বড়ো দাবি।

তাই আজ যখন আবার নতুন করে পড়ি কারাবাসের মধ্যে বিপ্লবী অমিতের এই বর্ণনা : "অমিতের আত্মপরিহাস ক্রমে আত্মজিজ্ঞাসায় পরিণত হয়েছে. কাহাকে অমিত ফাঁকি দিয়াছ তুমি? নিজেকে, শুধু নিজেকেই দিয়াছ। আর তাহাতেই জানো—নিজেকে মানুষ ফাঁকি দিতে পারে না। সেই জিজ্ঞাসার সঙ্গে এইবার মুখোমুখি হইতে হইবে তোমাকে, অমিত।... জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি করিতে পারিবে কি আজ?" তখন জীবনের সঙ্গে আমির সংযোগ বুঝতে পারি।

নিজের সঙ্গে মুখোমুখি আর জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি যখন একই রেখায় এসে দাঁড়ায়, যখন অমিত ভাবে যে আজ সে "আত্মস্থ অর্থাৎ একাত্ম, আর তাই বিশ্বাত্ম" তখন তার মধ্যে দিয়ে আমরা কেবল এদেশের বিপ্লবী ইতিহাসের বা কমিউনিজমের ইতিহাসের টুকরো একটি পর্বকেই মাত্র দেখি না, তার মধ্যে আমাদের এই চলতি সময়ও জেগে ওঠে যেন। যে লাইনটি বারে বারে উচ্চারণ করে অমিত, তার কিছুটা স্বাদ আমরা খুঁজতে থাকি আমাদের বর্তমান মুহূর্তের মধ্যে; Only in intense living do we touch infinity!

তিনটি দিনের উপর ভর-করা তাঁর এই তিন খণ্ড উপন্যাসের সাম্প্রতিক এক সংস্করণে প্রশ্ন করেছেন লেখক "সেই তিন দিন কি অতীত? তিন-দিনের মধ্য দিয়ে শেষ অবধি এখনো কি শুনতে পাই না 'অয়মহং ভো'?"

আমাদের মনে পড়বে এই উচ্চারণেই শেষ হয়েছিল ত্রয়ীর শেষ খণ্ডটি স্বাধীন দেশের জেল-গাড়িতে উঠবার সময়ে যেকথা ভাবছিল অমিত : 'এক একটি দিনের মধ্যে, প্রতিটি এই সাধারণ দিনের মধ্যেও—ইতিহাসের সেই আর একদিন রূপায়িত, বিঘোষিত তাহার মহদাশ্বাস : 'অয়মহং ভো'।" তখন বুঝতে পারি, একটি দিনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কোনো উপন্যাসকে গড়ে তুলবার এই পদ্ধতি নিছক কোনো প্রকরণ বৈশিষ্ট্য হয়েই আসে না গোপাল হালদারের রচনায়, তা আসে আরো বড়ো এক তাৎপর্য নিয়ে।

বক্‌সার কারাবাসের দিনগুলিতে আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ে যা কিছু ভাবছিলেন এই লেখক, তা'তে বুঝতে পারি প্রুস্ত বা জয়েসের মতো লেখকদের প্রতি তাঁর অনুরাগ তত প্রবল নয়, আধুনিকদের একাংশকে আক্রমণ করেই বলেছিলেন তিনি "এই যে আপনারা এখন পেয়েছেন প্রুস্ত ও জয়েসের অদ্ভুত প্রতিভার সংবাদ, অল্‌ডাস্ হাক্‌সলির চমক লাগানো বিদ্যাবুদ্ধি বৈদগ্ধ্যের সাক্ষাৎকার।" কিন্তু প্রশ্ন করতে পারেন কেউ—তাঁরও উপন্যাসের রীতিতে কি তিনি আনেননি জয়েস-প্রুস্তের প্রবর্তিত ধরন?

"এই কি শুধু জীবন?"—অমিতের এই প্রশ্নটি শুনে মনে পড়তে পারে ভার্জিনিয়া উল্‌ফের অনুরূপ প্রশ্ন Is this life? অথবা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এক-একটি দিনের আয়তনে যেভাবে আমরা অমিতের গোটা উপন্যাসটিকে পেয়ে যাই, তাতে নিশ্চয়ই মনে পড়বে জয়েসের "ইউলিসিস্", সেই একই সকাল থেকে রাতের আবর্তন। অল্প সময়খণ্ডের মধ্যে বহু সময়কে ছুঁয়ে নেওয়া, ভাবনার প্রবাহের মধ্যে দিয়ে অভিজ্ঞতার স্তরের পর স্তর উন্মোচন করে আনা : এসব নিশ্চয় জয়েস থেকেই তাঁর পাওয়া। তাহলে কি মিথ্যেই ছিল তাঁর এই সতর্কীকরণ যে এসব ধরন 'শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠতে পারে ব্যক্তিগত—একার জিনিস—যেমন জয়েসের শেষ দিককার লেখা, স্টাইনের ধ্বনিপ্রাণ কবিতা। তাতে আঙ্গিক বড় হয়ে ওঠে; ... সাহিত্যর কৌশলও তেমনি কৌশল থাকে, যথার্থ সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে না।"

তাই যদি, তবে কেন তাঁকেও ব্যবহার করতে হলো ওই কৌশল? ১৯৩০ সনের একটি দিনরাতের শেষে পুলিশের 'সবুট পদধ্বনি' এসে থামছে অমিতের দুয়োরে, ১৯৩৭-এর অন্যদিনে মুক্তি ঘটছে তার, স্বাধীন ভারতের আর একদিনে নতুন করে আবার জেলে পৌঁছয় সে। কেন মাত্র এই তিনটি দিনের ছকে তিনি ধরতে চাইছেন গোটা একটি দেশের উন্মেষের কথা? একজনের ভাবনার মধ্য দিয়ে এই দেখার, এক-একটা দিনের মধ্য দিয়ে এই দেখার কোনো সীমাবদ্ধতা কি নেই?

কিন্তু এইখানে আমাদের বুঝতে হয়, উল্‌ফের প্রশ্ন আর অমিতের প্রশ্নে উচ্চারণগত সমতা থাকলেও মূলত তা ভিন্ন; জয়েসের রীতিতে আর গোপাল হালদারের রীতিসদৃশতাও আপাত সাদৃশ্যমাত্র। এঁদের থেকে দূরে সরবার ধরনেই গোপাল হালদার এড়িয়ে যেতে চান এই রীতির সীমাবদ্ধতা। ১৯০৪ সালের ১৬ই জুন, সেই একদিনের মধ্য দিয়ে একটি শহরের গোটা জীবনকে তুলে আনছিল জয়েসের নায়ক, কিন্তু সেখানে সময়ের চলা ছিল উল্টো মুখো।

স্টিফেন ডেডলাস ভাবছিল সেখানে : Hold to the now, and here through which all future plunges to the past! গোপাল হালদারের উপন্যাসেও অবলম্বন এই 'এখন' আর 'এখানে' কিন্তু তাঁর রচনায় ভবিষ্যৎ অতীতের দিকে গড়িয়ে যায় না, অতীত ঝাঁপ দিয়ে চলতে চায় ভবিষ্যতের দিকে। বর্তমান সেইজন্যই তাঁর কাছে এত বড়ো। প্রুস্ত চেয়েছিলেন তাঁর উপন্যাসে সময়ের এক শুদ্ধ সত্তাকে খুঁজে নিতে, সেই শুদ্ধ সময়ের এক টুকরোকে আর স্থির রূপকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চেয়েছিলেন তিনি তাঁর চেতনার প্রবাহে। কিন্তু অমিত বা অমিতের লেখকের সামনে এই প্রবাহ এনে দেয় : "দিনের পর দিন, দিনের পর দিন—জীবনের পর জীবন—কালের হাতের অক্ষমালা সরিয়া সরিয়া পর্যান্তে ঘুরিয়া আসে। বিপ্লবের পরে আবার বোধন, আবার নূতন কালের নূতন বিরোধ, নূতন সমন্বয়। দিনের পর দিন—যুগের পর যুগ।"

এই ভাবনার ফলেই অমিতের সেই একদিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় আমাদের

সকলের দিন, সত্যতম দিন। তখন, কেবল নিজের কাছে নয়, এদিনের পাঠকদেরও সবার কাছে গিয়ে পৌঁছয় অমিতের এই পরামর্শ: ''চলো চলো, এই তো তোমারও পথ, ইতিহাসের পথ, মানবতীর্থের পথ,।''

গোপাল হালদারের তিনদিনের উপন্যাস, তাঁর 'ত্রিদিবা' আজও আমাদের কাছে আত্ম আবিষ্কারের এই পথেরই এক উদ্দীপক ইতিহাস।

একদা—অন্যদিন—আর একদিন, শঙ্খ ঘোষ,
'[illegible]তর জগৎ', ৭ মে, ১৯৫৭

৬. ড. অশ্রুকুমার সিকদার

''গোপাল হালদারের 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন' মিলিয়ে যে 'ত্রিদিবা' উপন্যাস তার মধ্যে নায়ক অমিতের জীবনের তিনদিনের কথা আছে, আর তিনটি দিনের করতলে ধরা হয়েছে প্রায় দুই দশক সময়—১৯৩০ থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যবর্তী অস্থির সময়ের রাজনৈতিক বিবর্তনের অভিজ্ঞতাকে। 'একদা'-র কাহিনী ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরের একদিন, 'অন্যদিন'-এর কাহিনীর বিষয় ১৯৩৭-৩৮ সালের একদিন, 'আর একদিন'-এর কাহিনী রচিত হয়েছে ১৯৪৮ সালের বিশেষ একদিনের ঘটনা নিয়ে। এইভাবে তিরিশের দশকের অগ্নিযুগ থেকে, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন থেকে, শ্রমজীবী বিপ্লবের প্রস্তুতির যুগে উত্তরণের রাজনৈতিক বাস্তবতা এই উপন্যাসত্রয়ীতে বিধৃত। 'ত্রিদিবা'র তৃতীয় পর্বের শেষে তপন ভট্টাচার্যের কথা আছে। প্রাচীন বৈষ্ণব অধ্যাপক বংশের সন্তান সে, ফিজিকসের লেবরেটরি ক্লাসরুমের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে চটকল সুতা-কল শ্রমিকের সংগ্রামে নিজেকে লিপ্ত করেছে—লেখকের ভাষায় 'ইন কোয়েস্ট অব রিয়ালিটি'। শুধু তপন ভট্টাচার্যের নয়, নায়ক অমিতেরও নয়, লেখক গোপাল হালদারের 'কোয়েস্ট অব রিয়ালিটি'-ই এই উপন্যাসের বিষয়। আর তাই অমিত নিজেই শুধু ক্রমে বাস্তবতার নিকটবর্তী হয় না, 'একদা' থেকে 'আর একদিন'-এ পৌঁছতে গিয়ে উপন্যাসটিও পেয়ে যায় অনেক বেশি বাস্তবের ঘনত্ব।

'একদা'-য় বাস্তবতাগুণ তুলনায় কম, আর নায়ক মধ্যবিত্ত যুবক অমিত যেন অনেকটা নির্লিপ্ত, বাস্তবজীবন থেকে রাজনৈতিক জীবন থেকে খানিকটা দূরে যেন তার অবস্থান। দু'টো কবিতা পড়ে, কিংবা ইতিহাসের দু'টো অধ্যায়, কিংবা আর্ট একজিবিশনে গিয়ে শিল্পানুশীলনে মনকে হিল্লোলিত ক'রে সে অবশ্য তৃপ্ত হয় না। সহপাঠী শৈলেন বা সাতকড়ির চাকরি ও পেশাসর্বস্ব জীবন তার মনে বিতৃষ্ণা জাগায়। বাঙালির ইতিহাসের অনুসন্ধানে তার মনের অন্তঃপুরে প্রেমিকের প্রেমাকাঙ্ক্ষার মতো এক সুগভীর পবিত্র নিষ্ঠা জেগে ওঠে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পেশাদার পণ্ডিত হওয়ার শখ তার নেই—বরং 'যশ-কাঙাল পণ্ডিতসমাজের হ্যাংলাপনা' তাকে পীড়িত করে। প্রিয়জন অনুযোগ করে কেন সে পি. আর. এস.

হল না। সাহিত্য অমিতের অস্তিত্বের অঙ্গ, সাহিত্যের রশ্মিপাতে সে জীবনকে ব্যাখ্যা করে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার শেষে সে স্কটের জগৎ থেকে ডিকেন্সথ্যাকারের জগতে প্রবেশ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ও শেকসপীয়র তার কণ্ঠাগ্রে। জীবনের প্রতিকল্প ও ভাষ্য সে খুঁজে পায় তাঁদের রচনায়। ইন্দ্রাণী-সবিতা-ললিতার আলগোছ সান্নিধ্য তার নিঃসঙ্গ জীবনে মাধুর্য সঞ্চার করে। সৎ বাঙালি ছেলের মতো বাবা-মা'র প্রতি, বিদ্যোৎসাহী পিতৃবন্ধু ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রতি সে গভীরভাবে শ্রদ্ধা-পরায়ণ, যদিও সে জানে তাদের স্থিতিশীল জীবনাদর্শ বর্তমান অস্থির সময়ের পক্ষে আর উপযোগী নয়। ভাইবোনের প্রতিও তার গভীর স্নেহ। প্রথম পর্বের দিনটি অমিতের যায় সন্ত্রাসবাদী সুনীলের জন্য টাকা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করায়। সন্ত্রাসবাদী সুনীল-মণীশকে সে সাহায্য করে, যদিও জানে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে পৃথিবীর ভিত্তি বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না। এই আন্দোলনের রোমান্টিক আবেদন মধ্যবিত্তদের পেয়ে বসেছে, কিন্তু 'জনগণের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন এমন প্রয়াসে অমিত বিশ্বাস হারাইয়াছে অনেক দিন।' অথচ গণ-আন্দোলনে যোগ দিতেও সে পারে না। সে নিজেই স্বীকার করে, 'মোতাহেরের মতো সে ডগমার কাছে নিজেকে সঁপিয়া দিতে পারে না, দাশের মতো আধা-শৌখিন আধা-ইনটেলেকচুয়াল ইডিয়লজি ও টেকনিক লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না; মজুর-কর্মীর উপযোগী স্থিরতা ও ধৈর্যও তাহার নাই। তাহার মনের গঠন স্বতন্ত্র...।' তার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মানসকে রাজনৈতিক উত্তাপ স্পর্শ করে, কিন্তু সমস্ত দ্বিধা জয় ক'রে সে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যোগ দিতে পারে না। বাসে যেতে-যেতে শোভাযাত্রার উপর সে পুলিসের লাঠি চালনা দেখে নিজেকে 'কাওয়ার্ড অ্যাণ্ড চীট' বলে ধিক্কার দেয়, কিন্তু শোভাযাত্রায় যোগ দেয় না। বাস থেকে শেয়ালদার মোড়ে ডেলি-প্যাসেনজারের ভিড় দেখে অমিত ভাবে : 'সংসার সকলকেই ডেলিপ্যাসেনজার করে ছাড়ে---কাহাকেও আর পিলগ্রিম থাকিতে দেয় না।' অমিত এখনো নিঃসঙ্গ তীর্থযাত্রী, এই তীর্থযাত্রী এখনো তার তীর্থে পৌঁছোয় নি, বাস্তবতার তীর্থে। 'একদা'-য় সে এখনো দ্বিধান্বিত, যদিও চলমান। সে জানে বর্তমান যুগ কর্মের যুগ, কিন্তু সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে সে আজো সমগ্র সত্তার সায় পায় না।......

.....দ্বিতীয় পর্ব 'অন্যদিন'-এ তাকে পাই ১৯৩৭-৩৮ সালের একদিনে, যেদিন অমিত জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছে। বিদায় মুহূর্তে সে অনুভব করে জেলখানা তার কাছে ছিল যেন এক বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে শেষ হচ্ছে বাস্তবের সঙ্গে মুখোমুখি হবার জন্য তার প্রস্তুতিপর্ব।......জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গৃহাঙ্গনে ফিরে দেখে মা নেই, বাবার 'ক্ল্যাসিক্‌স-পরিপুষ্ট মনও শ্লথ হইয়াছে,' বোন অনু রাজনৈতিক আন্দোলনে আছে আবার সংসারও করছে---জীবন পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলেছে।......জীবন, চতুষ্পার্শ্বের বাস্তব দ্রুত রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। অগ্নিযুগ ছিল মন্ত্রগুপ্তির যুগ---'মৌনতাই ছিল সেদিন সংকল্পের, দৃঢ়

চিন্তার পরিচায়ক।' এখন ছাত্রনেতা শ্যামল, ডকমজুর নেতা মোতাহের খোলা-খুলি মিছিল-সংগঠন-গণ আন্দোলনের কথা বলে। মোতাহের জানায়, বসে নেই মজুর, নতুনদিন আনার পথে সে পা বাড়িয়েছে। মজুর যেই আত্মপরিচয় পাবে, মোতাহের বিশ্বাস করে, অমনি সে নিজের পার্টিকে চিনতে পারবে। 'কোটালের বান ডাকিতেছে আজ ইতিহাসে।' অমিত বুদ্ধি দিয়ে বোঝে 'In the beginning there was did'; সে জানে 'ইতিহাস ক্ষমাহীন, কারণ ইতিহাস সৃষ্টিশীল। আমি অমিত ইতিহাসের ছাত্র, ইতিহাসের অস্ত্রও।' সে আরো জানে, 'Only in action do we know reality',—রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণেই বাস্তবকে, জীবন-সত্যইকে স্পর্শ করা যায়। বুদ্ধি দিয়ে বোঝে, কিন্তু কার্যত এখনো তার পক্ষে সক্রিয়ভাবে পার্টিতে যোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। কোথায়ও একটা দ্বিধা থেকে যায়। মোতাহের জানতে চায়, অমিত পার্টির সদস্যপদ এখনো অঙ্গীকার করে নি কেন? মধ্যবিত্ত রোমান্টিক যুবকেরা শ্রেণীস্বার্থ ত্যাগ করতে পারে না বলেই কি? কারণ যাই হোক, সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণেই আমরা বাস্তবকে পাই, এ কথা বোঝা সত্ত্বেও সে এখনো সক্রিয় অংশ নিতে প্রস্তুত হয় নি। তবু বাস্তবতার অন্বেষণে সে যে নিত্য জঙ্গম তার প্রচ্ছন্ন প্রমাণ রয়ে গেছে অমিতের শেকসপীয়রের চরণ উদ্ধৃত করার মধ্যে। প্রথম পর্বে অমিত খালি ভেবেছিল 'to be or not to be!' এখন সে বলে 'What a piece of work is man!' শুধু মানুষের মহিমায় সে বিস্মিত হয় না। অমিত আরো দেখে মানুষ কীভাবে তার আত্মপরিচয় রচনা করে—Ah! how man makes himself! সে বোঝে 'নিজেকে মানুষ হারায়।' এই দেওয়ার মধ্য দিয়েই মানুষ আপনার আত্মপরিচয় রচনা করে।

তৃতীয় পর্বে 'আর একদিন'-এ এই তীর্থযাত্রী সমস্ত সংশয় জয় ক'রে তার বাঞ্ছিত তীর্থে পৌঁছে যায়। ১৯৪৮ সালের এক ভোর রাত্রে, সদ্য-স্বাধীন ভারতবর্ষে, অমিত গ্রেপ্তার হয়ে আনীত হয় লর্ড সিনহা রোডের গোয়েন্দা দপ্তরে। এখন সে আর বাইরের লোক নয়, সে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য আজ। ১৯৪৮-এর এই দিনে বসে অমিতের মনে পড়ে একশো বছর আগের ইয়োরোপের উত্তাল বিপ্লবী দিনগুলির কথা, যে দিন বসে ১৮৪৮ সালে মার্কস্-এঙ্গেলস কম্যুনিস্ট ইস্তাহারে লিখেছিলেন, 'A spectre is haunting the world!' আজ একশো বছর পরে সেই স্পেক্টার, সেই প্রেতচ্ছায়া ভারতবর্ষে সঞ্চরণ ক'রে বেড়াচ্ছে, নব্য শাসক-কুলকে ক'রে তুলছে শংকিত। বারে-বারে কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর এই বাক্যটি অন্তিম পর্বে পুনরাবৃত্ত হয়। আজ যেহেতু সিদ্ধান্তে নিশ্চিত এবং ক্ষুরধার অমিত, সেই কারণে হ্যামলেট চরিত্রের তাৎপর্যও তার কাছে রূপান্তরিত হয়ে যায়। 'আজ অমিত জানে, সেদিন সে হ্যামলেটের চিন্তা-উদ্বুদ্ধ কর্মী চরিত্রকে চিনিতে পারে নাই। ভুল করিয়াছে, ভুল দেখিয়াছে

কোলরিজের মতো কর্মশংকিত চোখে দেখিয়া হ্যামলেটকে। বুঝে নাই হ্যামলেট কর্মবীর ও চিন্তাবীর।'

রাজনৈতিক বাস্তবতার সত্যস্বরূপকে 'একদা'-য় অমিত যেহেতু অঙ্গীকার ক'রে উঠতে পারে নি, সেই বাস্তবতার সঙ্গে সে যেহেতু লগ্ন হতে পারে নি, সেই কারণে, 'একদা' যেন পাতলা হাওয়ার বই, বাস্তবের ঘনত্ব সেখানে অনুভব করা যায় না। তুলনায় 'অন্যদিন'-এ বাস্তবতা ঘনীভূত, অমিত নিজেও সেখানে পরিমাণে অনেক বেশি বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হয়েছে। 'আর একদিন'-এ অমিত যখন পরিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে একজন পার্টি সদস্য, তখন লক্ষ্য করি উপন্যাসের চূড়ান্ত এই তৃতীয় পর্বটি অন্য দুই পর্বের তুলনায় বাস্তবতাগুণে হয়ে উঠেছে নিটোল ও পরিপূর্ণ। নাও হতে পারত, যদি বিশেষভাবে মনে রাখি উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে লেখকের আত্মজীবনকে আশ্রয় ক'রে। লেখকের পার্টি-সদস্যরূপে যোগদানের সঙ্গে-সঙ্গে নতুন পার্টি-সদস্য অমিতের দৃষ্টি হয়ে যেতে পারত একদেশদর্শী; যে বহুমুখী চৈতন্য রিয়ালিটি-অর্জনের উপায় তা হয়ে যেতে পারত অনুপস্থিত, পার্টি-ইডিয়লজির নিঃসংশয় আনুগত্যে লেখা অসংখ্য সোস্যালিস্ট রিয়ালিজমধর্মী উপন্যাসে যেমনটি বারে-বারে ঘটেছে। ইডিয়লজি আচ্ছন্ন ক'রে দিতে পারত অভ্রান্ত রিয়ালিটি-দৃষ্টি। কিন্তু আর্টের সততা তথা বাস্তবের সততা গোপাল হালদার বজায় রাখতে পেরেছেন, আর এখানেই উপন্যাসত্রয়ীর জয়, লেখকের কৃতিত্ব।''

(ড. অশ্রুকুমার সিকদার রচিত 'রাজনৈতিক বাস্তবতা ও ত্রিদিবা' প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশ। 'এক্ষণ'—১৫ শ বর্ষ, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা· ১৯৫৭।

৭. শ্রী গোপাল হালদার

'মননশীল ধারার ও শিল্পশৈলীর চেতনাপ্রবাহ কিংবা মৌন-স্বাগতোক্তি প্রভৃতি ধারার আরও দু'একখানা সমসাময়িক উপন্যাসের নাম করা যায়—'একদা', 'জাগরী' (পরে আলোচিত)।

বিপ্লবী এক শিক্ষিত বাঙালী যুবকের একদিনের কথা 'একদা'—যেমন একদিনের কথা জয়েসের 'ইউলিসিস'। কিন্তু বিষয় ও প্রকৃতিতে 'একদা' 'ইউলিসিস'-এর থেকে স্বতন্ত্র; 'ইউলিসিস' লেখকের পঠিত নয় তা বোঝা যায়। 'একদা'র পরে লেখক যোগ করেছেন ঐ বর্গের অন্তর্গত আরও দুখানা উপন্যাস—'অন্যদিন' ও 'আর একদিন'। তিন খণ্ডে মিলে বাঙলার প্রধানত রাজনৈতিক শিক্ষিত জীবনের উনিশ শ তিরিশ থেকে উনিশ শ আটচল্লিশ পর্যন্ত কালের ট্রিলজি—ত্রিপাদ কাহিনী—প্রায় দশ বৎসর পরে পরে এক একদিনের কথা।

* * * * *

একদা উনিশ শ তিরিশের বিপ্লব-অনুরাগী আত্মমুখীন যুবকের গ্রেপ্তারের পূর্বদিনের কথা; 'অন্যদিন' উনিশ শ সাঁইত্রিশ-আটত্রিশে সেই যুবকের বন্দিদশা হতে মুক্তি ও সেখানকার বহু সহ-বন্দীর চিন্তা ভাবনার সৌহার্দ্যের মনে মনে বিচার-আলোচনা—অন্তর্মুখীনতা একান্ত নয়, বহুর যোগাযোগে চলিষ্ণু। এবং 'আর একদিন' (তৃতীয় খণ্ড) সেই নায়কের ভোরে গ্রেপ্তার হওয়া থেকে আরম্ভ করে গোয়ান্দা হাজতে সেরূপ একত্রিত কমিউনিস্ট সতীর্থদের সঙ্গে তাঁদের জীবন, বিশিষ্ট জীবন সমস্যা ও প্রশ্নের সঙ্গে আপনাকে মিশিয়ে দেখা; আপনার নাতিপ্রচ্ছন্ন প্রতি-ভালবাসা ও আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মবিচার—যার পরিণতি শেষাংশে আমাদের অনেকটা অনুমেয়। আত্মমুখিতা থেকে বহুর সাহচর্যে আত্ম-উদ্বোধন—শেষ দুই খণ্ডে তাই মনে হয় আভাসিত; তাতে চেতনাপ্রবাহ প্রভৃতি শিল্পশৈলীর আধিপত্য সে খণ্ডদ্বয়ে ক্রমশঃ কমে আসে। অবশ্য বলা নিষ্প্রয়োজন, 'একদা' যতটা আদর ও অভিনন্দন প্রাপ্ত করেছে, যে কারণেই হোক, পরেকার দুই খণ্ড তেমন সমাদৃত হয় নি। উপন্যাসের ত্রিপাদীয় সমগ্র রূপটি প্রত্যক্ষ না হওয়াতে পাঠকের মনে জটিলতার সৃষ্টি হয়। তা হলে তা লেখকের ত্রুটি। অবশ্য লেখক 'একদা'তেই জানিয়েছেন ছোট আমি থেকে বড় আমি'তে তার যাত্রা—'বড় আমি' সম্ভবত তাঁর বিবেচনায় কমিউনিজমের পথ বা সর্ব-মানব সৌহার্দ্যের চেতনা। দ্বিতীয় একটি কথাও আছে। লেখক 'একদা'তেই বলেছিলেন, 'There is only one Eternity—in intense living'—এ ধারণা হয়ত তাঁর অভিপ্রেত হয়েও দ্বিতীয়-তৃতীয় খণ্ডে যদি দানা বেঁধে উঠত তা হলে পাঠক সাধারণের কাছে তা অভিনন্দনযোগ্য না হোক আকর্ষণীয় হত।" *[শ্রদ্ধেয় শ্রী গোপাল হালদার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে (৪ ও ৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৪) 'কল্যাণী স্মৃতি বক্তৃতা' দেন। বিষয় ছিল, 'আধুনিক বাঙলা উপন্যাস'। এই বক্তৃতাটি 'সংস্কৃতি ও সমাজ' পত্রিকায় (২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুন-১৯৮৫) 'আধুনিক বাঙলা উপন্যাস' নামেই প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধের সামান্য একটু অংশ উপরে উদ্ধৃত হলো। তথাগত একটি ভুল ও মুদ্রণ প্রমাদ সংশোধন করা হয়েছে।]

'একদা'—সমকালীন বিচার

'অগ্রণী'--নভেম্বর ১৯'৩৯

শ্রীসুবোধ চৌধুরী

"কথাটা স্পষ্ট করে বলাই ভালো ঃ বাঙলা দেশে সন্ত্রাসন আন্দোলনের সময় সাহিত্যিকেরা যেভাবে react করেছিলেন, তাতে অনেকেরই সত্যি রূপ ধরা পড়ে। বেশীর ভাগ লেখকই নিজেদের ভিতরে গুটিয়ে থাকলেন। রবীন্দ্রনাথ শম্বুক-বৃত্তি পরিত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর কথা পরে বলছি। অন্যদের মধ্যে যাঁরা দু'একজন কিছু বলেছেন, তাঁদের মধ্যে একটা তিক্ত অস্বস্তিবোধ লক্ষ্য করার জিনিস।

... ...

"রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলছিলাম, তাঁর চার অধ্যায়ের কথা। অনেক বন্ধুকে দেখেছি বইটি সম্বন্ধে অত্যন্ত ছুৎমার্গীর মত চিন্তা করেন। আমাদের বলবার কথা একটু স্বতন্ত্র। চার অধ্যায়ে সত্যি কথা আছে...স্বদেশী দলের ছেলে-মেয়ের প্রেমে পড়া এমন অসম্ভব কিছু নয়; বটুর betrayal-এও ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ নেই। কিন্তু, এইটুকুই এর সবটুকু নয়। সমগ্র আন্দোলনের সঙ্গে যোগ না রেখে চরিত্র-চিত্রণ করে, রবীন্দ্রনাথ সত্যের অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারেন নি ঃ আর একথা সবাই জানে, খণ্ডিত সত্যের দুষ্ট প্রভাব সাঙ্ঘাতিক।...

. ...

বাঙলা সাহিত্যের এ রকম অবস্থায়—Lord Sinha Road-এর report, ছাড়াও—যখন কারো কারো সৃষ্টিতে জাতির কলঙ্ক-গৌরবের ইতিহাস দেখি, তখন বড়ো আশা হয়। গোপাল বাবুর এই ১৯৩১ সনে লেখা ১৯৩১ সনেই ছাপা হলে, অনেক সাহিত্যিকের পক্ষেই হয়ত এ রকম নিদারুণ ভ্রান্তি সম্ভবপর হতো না : নিজেদের আলোচনার তুচ্ছতা থেকে হয়ত তাঁরা মুক্তি পেতেন।

সন্ত্রাসবাদ কোন রাজনৈতিক আদর্শ হতে পারে না। এ কথা সবাই বলেন। গোপাল বাবুও স্বীকার করেন। কিন্তু যা সত্য, ঐতিহাসিক সত্য, তাঁকে এড়িয়ে চলার মত স্পর্শভীরুতা লেখকের নেই। মধ্যবিত্ত রক্তে এ আন্দোলনের স্বাভাবিকতাকে স্বীকার করেই তিনি তার ব্যর্থতার চিত্র এঁকেছেন। ধূর্জটি প্রসাদের মত উন্নাসিক অসহিষ্ণুতা নিয়ে তিনি এর বিচার করেননি। Sociology'র চেয়ার থেকে Society-কেই কলা দেখিয়ে, 'সোনার চাঁদ ছেলেদের পিস্তল ছোঁড়া'র ফ্রয়েডী ব্যাখ্যা দিতে যাঁরা স্পর্ধা করেছেন—এ গ্রন্থে তাঁদের উপর কশাঘাত আছে। ছোট বয়সে কতকগুলি স্বাভাবিক বৃত্তি নিরোধের জন্য Point counter point-এর যে বৈজ্ঞানিকটি খুন করেছিল, এমন কি সোসিয়ালিস্ট পর্য্যন্ত হয়ে উঠেছিল—তার উদাহরণ দিয়ে ধূর্জটি বাবু সে যুগে Culturist মহলে বাহবা লুটেছিলেন (আমরা ও তাঁহারা ঃ ধূর্জটি

প্রসাদ)। আমরা দেখে খুসী হয়েছি, গোপালবাবু তাঁর উপন্যাসে ধূর্জটি প্রসাদের আলুডুসি শিঙ ভোঁতা করে দিয়েছেন।

উপন্যাসটি পড়তে পড়তে লেখকের ভাষার শক্তি আর পরিচ্ছন্নতা দেখে মুগ্ধ হতে হয়। পদের প্রত্যেকটি শব্দ, পদান্তে প্রত্যেকটি যতি পর্যন্ত স্বাভাবিক, সুসংবদ্ধ। মক্ষিকাবৃত্তির আশ্রয় নিয়েও দেখেছি, সহজে ব্রণের সন্ধান পাওয়া যায় না। কয়েকটা পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে দেখাতে পারলে খুসী হতাম, কিন্তু সে সুযোগ নেই।

গোপালবাবুর বলবার ভঙ্গিটিও নতুন। গ্রন্থের মুখ্য চরিত্র অমিতের introspection, বা বলা যেতে পারে free thought-এর মধ্য দিয়ে তিনি অতীত দিনের বিরাট পট উন্মোচিত করেছেন। সেইখানে কাহিনীর মূল : তারপর একটি দিন, যে একটি মাত্র দিন নিয়েই উপন্যাসের সমগ্র বিস্তৃতি : তাতে কয়েকটি ছোট ছোট ঘটনা : এ ঘটনাগুলির সূত্রে সংসারের নানা নরনারীর সঙ্গে পাঠকের পরিচয়। সমাজের এবং এসব সামাজিক জীবের সংস্পর্শে অমিতের অন্তর্দ্বন্দ্বের ইতিহাসই গোপাল বাবুর উপন্যাসের বিষয়বস্তু। তবে দ্বন্দ্বেই এর শেষ নয় : দ্বন্দ্বের মধ্যে সমন্বয়ের, অন্য কথায়, সামাজিক অজস্র অসুস্থ বিশৃঙ্খলতার মাঝে অমিতের একটি সুস্থ পরিপূর্ণ জীবনবোধের চিহ্নও এ গ্রন্থে আছে।

এ জীবন বোধ অবশ্য ১৯৩১ সনের মধ্যবিত্ত যুবকের। তাতে vanity'র ছাপ থাকলে আশ্চর্য হব না—এমন কি, তাই real. অমিত বড়লোক লীডারের বক্তৃতা লিখে দেয়, কিন্তু text-book writer কে 'মানুষ—a masculine person, a biped of the human species' বলে অশ্রদ্ধা করে। এ মানসিক বৃত্তি তাঁর জীবনবোধের পক্ষে আত্মঘাতী।

অমিতকে দেখেছি, সে শেষের কবিতার অমিতের মত ফানুস নয় : ইতিহাসের মধ্যে তার ফিলজফির শেকড় লুকানো আছে। তবুও vanity'র খোলসটুকু না ছাড়লে ধূর্জটিপ্রসাদের hollow personality'র শূন্যতায় তার মৃত্যু হবে। কথাটা বুঝিয়ে বলি; ধূর্জটিবাবু 'personality'র এক কিম্ভুত ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন 'Persona' থেকে 'Personality' এসেছে; 'Persona'র অর্থ মুখোস; অতএব, 'Personality'টাও মুখোসের মত।

*   *   *   *

যাই হোক, অমিতকে সাবধান করে দেবার জন্যেই আমাদের এত কথা বলা। তবে, গ্রন্থের দু'টি স্তবক এখনো অপ্রকাশিত। উপন্যাসের শেষে যেন একটু আভাস পাওয়া গেল—অমিত জেলে যাচ্ছে। এটা অমিতের জীবনবোধের পক্ষে ভালই, তার আত্মচেতনার সহায়ক। যেখানে, যে সংরুদ্ধতার মধ্যে মানুষের অতি সাধারণ সম্মান-বোধও পীড়িত হয়, তার পারিপার্শ্বিকতায় অমিতের বিক্ষুব্ধ, প্রাণবন্ত আত্মা জীবনবোধকে আরও প্রখর করে তুলবে—তার ফিলজফির সমস্ত তুচ্ছ দ্বৈততাকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলবে।

দ্বৈততার কথা উঠতে বলতে হলো : অমিত নরনারীর সামাজিক দায়িত্বকে দ্বৈতভাবে দেখেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সমাজ বিবর্তনকে বর্তমান কাল পর্যন্ত অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেও, অমিত এ artificial duality থেকে মুক্ত হতে পারল না কেন বুঝতে পারলাম না।

For you, you too, to battle go,
Not with marching drums and cheers,
But in the watch of solitude,
And through the boundless night of fears,
Your infinite passion is outpoured—

এ সব কথা ভাবতে ভাবতে অমিতের তন্দ্রা আসে। জাগর স্বপ্নের ললিতা, সবিতা, সুধীরা তার নিদ্রালু চেতনাকে স্নিগ্ধ করে দেয়। বুলুও আসে,—তার সঙ্গে পরিচয় বড়ো কম। ইন্দ্রাণীও আসে,—কিন্তু তার কি এই পরিচয়?

অমিতের মধ্যে আরও একটা নৈরাশ্য লক্ষ্য করেছি। 'দুটো জেনারেশন বলি চাই।' এ যুগে শিল্পের, সাহিত্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অমিত সন্দিহান, cynical, এ cynicism-এর মাঝে মধ্যবিত্ত যুবকের স্বপ্নভঙ্গের ব্যথা আছে। অন্যদিক দিয়ে, বর্তমান art-এর escapism'ও এ নিরাশার কারণ। কিন্তু যে art আপন সামাজিক দায়িত্বকে মাথা পেতে নিয়েছে, তাতে escapism নেই।

অমিতের দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐতিহাসিকতা আছে। সুতরাং তার কাছে স্পেন যুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া হাস্যকর। কিন্তু একটি কথা স্মরণ করিয়ে দি'—

ARTISTS IN ARMS!"

['একদা' উপন্যাসের এই সমালোচনাটি লেখেন "স, চ",—অর্থাৎ সুবোধ চৌধুরী। লেখাটি প্রকাশিত হয় 'অগ্রণী'-পত্রিকার প্রথম বর্ষ, নভেম্বর ১৯৩৯, ১১শ সংখ্যার পুস্তক পরিচয় বিভাগে। কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়ে লেখাটি ছাপা হলো।

'একদা' প্রকাশিত হয় ১৭ আশ্বিন, ১৩৪৬ অর্থাৎ ইং ১৯৩৯; আর 'অগ্রণী'তে সমালোচনা বের হয় নভেম্বর, ১৯৩৯। যতদূর জানা গেছে, তাতে এটি-ই 'একদা'র প্রথম আলোচনা।

শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার ১৯৮৩ সালে লেখা একটা চিঠিতে জানিয়েছেন—"মন্দিরা রাজবন্দিনী মেয়েদের সদ্য প্রকাশিত কাগজ। তাতেই 'একদা'র প্রথম সমালোচনা বেরোয়। (সমালোচকও বোধ হয় অধ্যাপক সুবোধ চৌধুরী। সুলিখিত সমালোচনা. রবীন্দ্রনাথ 'মন্দিরা'র সেই সমালোচনা পড়েন। তখন দেখা করতে বলেন কবি সজনীকে। সজনীকে বলেন, এ বই তুমি দেখেছ? সজনী বলেন, 'দেখব কি? আমিই তো প্রকাশক!'—'আমাকে দেওনি তো'—কবি এ ভাবে 'একদা' পান।"

এই প্রসঙ্গে একটি কথা, 'মন্দিরায়' প্রকাশিত 'একদা'র সমালোচনাটির লেখক

'বোধ হয় অধ্যাপক সুবোধ চৌধুরী' বলে শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার সংশয় প্রকাশ করেছেন। ৪৩/৪৪ বছর আগের ঘটনা গোপাল হালদার মহাশয়ের মনে না থাকাই স্বাভাবিক। ১৯৪১ সালের আগের 'মন্দিরা'র কোনো সংখ্যা হাতে পাই নি, তাই মন্দিরার লেখাটি কে লিখেছিলেন, তা জানা সম্ভব হয় নি। তবে, সুবোধবাবুর (তিনি তখন ছাত্র) সমালোচনাটি যে, 'অগ্রণী'তেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে। সুবোধবাবুর লেখাটি 'ছাত্র-অভিযান' (অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬) পত্রিকায়ও মুদ্রিত হয়। রাজবন্দিনী মহিলাদের কাগজ 'মন্দিরা'তে লেখাটির পুনর্মুদ্রণ অসম্ভব নয়। ১৯৩৯-৪১—এই সময়কালের 'মন্দিরা'র সংখ্যাগুলি হাতে পেলেই একমাত্র নিশ্চিত কথা বলা যাবে।]

'একদা'—সমকালীন বিচার

'সমসাময়িক'—আশ্বিন, ১৩৪৭

শ্রী করালীকান্ত বিশ্বাস

"...'একদা' তিরিশ সালের স্মরণীয় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর একটি দিনের কাহিনী। 'দিনে দিনে মিলাইলে তাহাই রূপ পরিগ্রহ করিয়া ইতিহাসের মধ্যে বাণীমূর্তি লাভ করে।' অতএব 'একদা' কালের ইতিহাস প্রবাহের একতম কাহিনী। ইহার ভিত্তি তিরিশ সালের সন্ত্রাসবাদ ও অন্যান্য বিপ্লব-আয়োজন। তাহা ছাড়া সাময়িক সমাজের অঙ্গন পরিক্রমণ করিয়া সমাজের রূপ ও গতি বিশ্লেষণ করিবার ইহাতে চেষ্টা হইয়াছে এবং ভবিষ্য সমাজের রূপের ইঙ্গিত দিবার প্রয়াস ইহাতে আছে। সেই আগত দিনের প্রবেশ পথ নির্মাণের উপায় ও আয়োজনের আভাস দিতে লেখক চেষ্টা করিয়াছেন। লেখকের সহানুভূতি কোন দিকে তাহা গোপন রাখেন নাই বলিয়া উপন্যাসখানি অতি মাত্রায় 'পার্সন্যাল' মনে হয়।......

... ...

আজকাল প্রায়ই অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায় আধুনিক বাংলাদেশ সর্বদিক দিয়া নিম্নগ হইয়া পড়িয়াছে। সত্যই তাহা হইয়াছে কি না উত্তরকালে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কিন্তু একথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে আমাদের সমাজে একটি লক্ষ্যহীন অস্থিরতা দেখা দিয়াছে। জাতীয় জীবনে কর্মের অপ্রাচুর্য সম্বন্ধে সকলে হয়ত সচেতন নহে, কিন্তু জীবিকার্জনের উপায়ের অভাব অত্যন্ত প্রকট। জীবিকার অভাবে সমাজে অনেক অংশে ভাঙ্গন দেখা দিয়াছে; লক্ষ্য স্থির না থাকাতে সেই সঙ্গে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। অন্যান্য স্বাধীন দেশে কর্মের বিস্তৃত ক্ষেত্রে যুবশক্তি বিকাশের পথ পায়; কর্মই সেখানে আহার যোগাইতে সাহায্য করে। আমাদের দেশের অবস্থা অন্যরূপ। কর্ম আমাদের দেশে নাই, কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিবার শক্তিও অনুভূত হইতেছে না। গোপাল হালদার তাঁহার উপন্যাসে, সমাজের এই দিকে আলোক সম্পাত করিয়াছেন। সোস্যালিজম্-এ বিশ্বাসী গোপাল হালদারের দৃষ্টিতে দেখিলে উপন্যাসে 'অমিত'-কথিত উপায় ছাড়া এই সমস্যার অন্য কোনও সমাধান কল্পনা করা যায় না। গোপালবাবু রাষ্ট্র ও সমাজের নানা দিক অবলম্বনে বহু চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রায়ই লিখিয়া থাকেন; ঐ সব প্রবন্ধে এবং বর্তমান উপন্যাসে তাঁহার চিন্তাশীলতার পরিচয় মিলিবে। তাঁহার আন্তরিকতা মনকে স্পর্শ না করিয়া পারে না। কিন্তু আলোচ্য বইখানির অন্তঃস্থিত যে সুর অস্পষ্ট ধ্বনিত হইতেছে তাহাতে মনে হয় তাঁহার চিন্তালব্ধ সমাধান আমাদিগকে প্রস্তুত হইয়া জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হইতে সাহায্য করিবে না। ইহার জন্য তাঁহার রচনারীতিই দায়ী। তাঁহার উপন্যাসের নায়ক অমিত অলস নহে, কিন্তু তাহার জীবন যাত্রার যে ইতিহাস আমরা পাই তাহাতে কর্ম-প্রেরণা আসে না। অমিত যদিও ব্রজেনবাবুকে বলিয়াছে 'It is an age of

action—আপনি কর্মের মধ্যে দিয়েই এই যুগের নৈতিক আধ্যাত্মিক রূপের সন্ধান করুন।' কর্ম অর্থে অমিত—(এবং গোপালবাবুও) বোঝেন রাষ্ট্র-প্রচেষ্টা। 'মানব সভ্যতার নবজন্মের আয়োজন—মানব সমাজে সাম্যের প্রতিষ্ঠা—সমাজের সেই নবজন্মের চেষ্টা কর্মের সেই আনন্দলোকে অমিত চায় নবজন্ম।' 'এই জেন্যারেশনের ভাগ্যলিপি কাজের মধ্যে পূর্ণ হওয়া।' এই ধরণের অনেক কথা আছে। কিন্তু অধিক রাত্রে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যখন সে শয্যাশ্রয় করিল তখন এই প্রশ্নই মনে ওঠে যে এইরূপ বিক্ষিপ্ততায় যাহার দিন কাটিতেছে চিন্তায় সত্যের সন্ধান পাইলেও কর্মে তাহা রূপ পরিগ্রহ করিবে কেমন করিয়া? চিন্তা ও কর্মের সমন্বয় কী করিয়া ঘটিবে?

গোপাল হালদার পাশ্চাত্য জ্ঞানলোকের সন্ধান রাখেন। এই উপন্যাসখানিতেও তাহার বহু প্রমাণ আছে। উপন্যাস বর্ণিত ব্রজেনবাবু ও অমিত জ্ঞানী ব্যক্তি। কিন্তু দেশের বর্তমান শিক্ষাদীক্ষার রূপ ও প্রেরণা বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত এই জ্ঞান ব্রজেনবাবু স্পেঙ্গলার পড়িয়া আহরণ করিয়াছেন শুনিলে হাসি পায়। স্পেঙ্গলার না পড়িয়াও যদি ব্রজেনবাবুর উক্ত স্পৃহা জাগিত তাহা হইলে তাঁহাকে কেহ নিন্দা করিত না; গোপালবাবুকে ত নহেই। উপন্যাসখানির আরও দুই এক স্থানে অনাবশ্যক বিদেশী লেখক ও পুস্তকের নাম উল্লেখ করিবার দুর্বলতা গোপালবাবু প্রকাশ করিয়াছেন।

'একদা' গোপাল হালদার মহাশয়ের প্রথম উপন্যাস। উপন্যাস হিসাবে 'একদা' সফল হয় নাই। উদ্দেশ্য লইয়া উপন্যাস রচনা সমর্থন করা যাইতে পারে যদি ঘটনার সমাবেশে এবং বিশ্লেষণের নিপুণতায় চরিত্রগুলি ফুটিয়া ওঠে। বর্তমান উপন্যাসখানির চরিত্রগুলি হয় অস্পষ্ট, না হয় টাইপ। বিপ্লবীরা সকলে—সতীশ, সুনীল, যুগল, দীনু, মোতাহের, কমরেড দাস কেহই আপন টাইপের সীমা রেখার ভিতরে নিজস্ব বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে নাই। অন্যান্য চরিত্রগুলির আংশিক ঔজ্জ্বল্য আছে; কিন্তু তাহাদের অতি সামান্য পরিচয় আমরা পাই। স্ত্রী চরিত্রগুলির কাহারও কোন বর্ণই নাই। ইন্দ্রাণী বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতা ঢাকিতে আত্মবিলোপের আয়োজন করিয়াছে; কিন্তু তাহাকে প্রাণহীন মনে হয় বলিয়াই তাহার জীবনের ব্যর্থতা করুণার উদ্রেক করে না।

বর্তমানযুগে রচনারীতিতে অবচেতন মনের অসংলগ্ন প্রকাশের যে হুজুক দেখা দিয়াছে, লেখক সে প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহেন। তথাপি তাঁহার রচনা কষ্টপাঠ্য নহে, ভাষা সহজ ও অনাড়ম্বর।"

[শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরী সম্পাদিত 'সমসাময়িক'
পত্রিকার ১ম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা—আশ্বিন
১৩৪৭, পুস্তক সমালোচনা বিভাগে
শ্রী করালীকান্ত বিশ্বাসের আলোচনার
অংশবিশেষ মুদ্রিত হলো।]

গোপাল হালদার : জীবন ও শিল্পে একাত্ম, প্রাজ্ঞ জীবন রসিক

আমাদের দেশে রেনেসাঁ যুগে যুক্তিবাদী জীবন-জিজ্ঞাসা, মানবধর্মী বিদ্যাচর্চা আর সমাজমনস্ক কর্মসাধনার যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল তার ইতিবাচক দান আত্মস্থ করে, যে সব মনীষী সাম্যবাদের মানবতন্ত্রী-বিশ্ববাণীর সুর বাঙালীর সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি ভাবনায় সঞ্চারিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম গোপাল হালদার স্বয়ং একটি প্রতিষ্ঠান।

জন্ম ও বংশ পরিচয় : আমাদের এই শতাব্দীর প্রায় সমান বয়সী, বিচিত্র-কর্মা-প্রজ্ঞাবান্ এই মানুষটির জন্ম, ১৯০২ সালের ১১ই, ফেব্রুয়ারি (১৩০৮, ২৮শে মাঘ), ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার বিদগাঁও গ্রামে—পৈত্রিক ভদ্রাসনে। হালদারেরা ভরদ্বাজ গোত্রের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। পিতা সীতাকান্ত হালদার নোয়াখালি শহরে আইনজীবী ছিলেন। মা বিধুমুখী দেবী। ১৯৪৯ সালে গোপাল হালদার বিবাহ করেন আড়িয়াদহ নিবাসী ইন্দুভূষণ সিংহের বিদুষী কন্যা অরুণাদেবীকে।

শিক্ষা : স্কুলের শিক্ষা নোয়াখালিতে, উচ্চ শিক্ষা কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে। ১৯২৪, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. এবং বি. এল. পাস করেন।

পেশা ও নেশা : ১৯২৫-২৬, নোয়াখালি শহরে ওকালতি; ১৯২৬, প্রবাসী-প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ওয়েলফেয়ারে' সহসম্পাদকের চাকরী; ১৯২৬-২৮, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে ভাষাতত্ত্বের গবেষণা; ১৯২৯-৩০, ফেনী কলেজে অধ্যাপনা; ১৯৩০-৩২, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব বিভাগের রিসার্চ-এ্যাসিস্ট্যান্ট; ১৯৩৮-৪০, 'প্রবাসী', 'মডার্ণরিভিউ' পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে কর্মগ্রহণ; ১৯৪০-৪২, 'হিন্দুস্থান-স্ট্যাণ্ডার্ড'-ইংরেজী দৈনিকের সহ-সম্পাদক। নানা বিষয়ে ঝোঁক, বিচিত্র তাঁর কর্মক্ষেত্র। তবে, আবাল্য স্বপ্ন দেশের স্বাধীনতা, আর প্রাণের টান সাহিত্যে এবং দু-দিক ছুঁয়ে চলবার মত জীবিকা পথ হিসাবে গ্রহণ করেছেন সাংবাদিকতা।

রাজনৈতিক জীবন ও কারাবাস : স্কুল-জীবনেই বিপ্লবী 'যুগান্তর' দলের কর্মী। কলেজ-জীবনে অ-সহযোগ আন্দোলনের পথে গণ-জাগরণের রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত কংগ্রেসকর্মী—তবে গান্ধীজীর 'অহিংসা ও চরকায়' ধর্মীয় পবিত্রতা আরোপের তত্ত্বে বিশ্বাসী নন। বরং 'আত্মশক্তি'তে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'স্বদেশী সমাজ' গঠনের রাবীন্দ্রিক পরিকল্পনায় আস্থাবান্। ১৯২১—৪০, কংগ্রেস সদস্য। ১৯২৬, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্মপরিষদের সদস্য। ১৯৩৯-৪০, সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন বি. পি. সি. সি-র অন্যতম সহ-সম্পাদক। ১৯৩২-৩৮, প্রেসিডেন্সি জেলে, বক্সায় রাজবন্দী এবং কিছুদিন গৃহে অন্তরীণ। বন্দীজীবনে অধ্যয়ন, গবেষণা, সাহিত্যসৃষ্টি এবং মার্কসীয় মতাদর্শের চর্চায় মন-প্রাণ সঁপে দেন। ১৯৩৩, অসুস্থ অবস্থায় প্রেসিডেন্সি জেলে রচনা করেন

বিখ্যাত রাজনৈতিক উপন্যাস 'একদা' (মুদ্রিত হয় ১৯৩৯)। বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের সাগা 'ভদ্রাসন'-এর অধিকাংশ গুপ্ত এবং 'বাজে লেখা'র স্বগতনিবন্ধগুলো ১৯৩৪-৩৬-এর মধ্যে বন্দীজীবনে রচনা করেন। গুরু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের স্নেহানুকূল্যে গবেষণা নিবন্ধ 'ইস্টবেঙ্গল ডায়লেক্ট্‌স্'-এর কাজও শেষ করেন প্রেসিডেন্সি জেলে।

কারামুক্তির পর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সহকারী হিসাবে সম্পাদনা করেন ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ফরোয়ার্ডব্লক'। ১৯৩৮ থেকে সারাভারত কৃষক সভার অন্যতম সংগঠক। ১৯৪১, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৪১-৪২, কলকাতা কর্পোরেশন ওয়ার্কাস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক। কৃষকসভা ও কর্মচারী আন্দোলনে নেতৃত্বদানের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসী বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে, সোভিয়েত সুহৃদ সমিতিতে বুদ্ধিজীবী হিসাবে তাঁর দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৪১-এ প্রকাশিত হয় 'সংস্কৃতির রূপান্তর'—তাঁর মার্কসীয় প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠ ফসল। 'পরিচয়' পত্রিকা সম্পাদনায় (১৯৪৪-৪৮, ১৯৫২-৫৭), 'স্বাধীনতা'র সাংবাদিকতায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটে (১৯৫২-৫৮), পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে (১৯৫৭-৬৮) এবং নানা অনুষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে তিনি সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন হয়েছেন। ১৯৪৯ (মার্চ-জুন), কিছুদিনের জন্য রাজবন্দী; ১৯৬৯, আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবরণ।

বিদেশভ্রমণ, সম্মান ও স্বীকৃতি : একজন অগ্রগণ্য বাঙালী বুদ্ধিজীবী হিসাবে গোপাল হালদার দেশ-বিদেশের বহু অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিয়েছেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, পূর্ব জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশে করেছেন ভ্রমণ; কলকাতা, বোম্বাই, এলাহাবাদ, গৌহাটি, রাজশাহী, যাদবপুর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে দিয়েছেন ভাষণ। 'রুশ সাহিত্যের রূপরেখা' গ্রন্থের জন্য ১৯৬৮-এ পেয়েছেন সোভিয়েত ল্যাণ্ড পুরস্কার। ঐ বছরই শ্রেষ্ঠ গবেষকের স্বীকৃতি হিসাবে লাভ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সরোজিনী স্মৃতি' স্বর্ণপদক। ১৯৭৭-এ 'শরৎস্মৃতি পুরস্কার' আর ১৯৮০-তে 'রূপনারানের কূলে' ২য় খণ্ডের জন্য পান 'রবীন্দ্র পুরস্কার'। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সামগ্রিক দানের জন্য ১৯৮৫-তে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'সাম্মানিক ডক্টরেট' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৮৬-তে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে 'সাম্মানিক ডক্টরেট' উপাধি প্রদান করেন। এছাড়াও গোপাল হালদার 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রদান ও 'অ্যাকাদেমি পুরস্কার' প্রদানের নির্বাচক মণ্ডলীর মনোনীত সদস্য ছিলেন বহুদিন। ১৯৭৬—৮০ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের অন্তর্গত সাহিত্য ও কলা শাখার ফেলো নির্বাচিত হন। একটানা ছয় বছর এশিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিলের সদস্যপদে ও তিন বছর ঐ প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি পদে আসীন ছিলেন।—(তথ্যের জন্য মাননীয়া ডঃ অরুণা হালদারের কাছে ঋণী)।

জীবন-সাধনা : মানুষের সামগ্রিক আত্মবিকাশের স্বার্থেই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকে গোপাল হালদার প্রাথমিক গুরুত্ব দিয়েছেন, আর আত্মপ্রকাশের অন্যতম পথ হিসাবে আ-কৈশোর গ্রহণ করেছেন সাহিত্যকে। রাজনীতি, গবেষণা, জ্ঞানার্জন, সাহিত্য সাধনা সর্বক্ষেত্রেই স্বদেশের স্বাধীনতা ও 'জাতীয় চেতনার আত্মবিকাশের' গুরুত্বকে মেনে নিয়েও সর্বজাতির স্বার্থ ও মানুষের সামগ্রিক আত্মবিকাশের সাধনার কথাই তুলে ধরেছেন। তিনি মনেপ্রাণেই বিশ্বাস করেন, 'I am a man, nothing human is alien to me.'—'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এই মানুষ স্বদেশে-স্বকালে পরিচ্ছিন্ন বাঙালী হলেও মনুষ্যত্বের সাধনায় বিশ্বজনীন সামগ্রিক সত্যের জগতে প্রতিষ্ঠিত। এই বোধ, এই বিশ্বাসই গোপাল হালদারের রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার—তাঁর সামগ্রিক জীবন-বাসনার মৌল প্রেরণা।

গোপাল হালদার মানবতাবাদী, মুক্তবুদ্ধি, বিচিত্রকর্মা পুরুষ। "কমিউনিজম্ এযুগের মানবতার নাম" এবং "সাম্যবাদ মানবতার উচ্চতর সাধনা" (সংস্কৃতির বিশ্বরূপ/পৃ. ২ ও ১৭)—এই অর্থেই কমিউনিজম্ তাঁর কাছে গ্রাহ্য—তিনি মার্কস্‌বাদী। তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'ত্রিদিবা'র নায়ক অমিতের কণ্ঠেও তাই শুনি, "আমার 'মতবাদ'...আমার জীবন ছাড়া নয়। ...আমি মনুষ্যবাদী... আর এ যুগের মনুষ্যবাদই কমিউনিজম্—সৃষ্টির কর্মযোগ শাস্ত্র (রচনাসমগ্র/পৃ. ৫১২)।" গোপাল হালদারের কাছে মার্কস্‌বাদ কখনোই নিছক মতবাদ (Dogma) নয়, সমাজরূপান্তরের "কর্মযোগশাস্ত্র"—"মানবতার পলিটিক্‌স।" আত্মচ্যুত (alienated from himself), খণ্ডিত (disintegrated), মানবসত্তারহিত (dehumanised), আত্মসর্বস্ব ব্যক্তিকে স্ব-মহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠার ("real appropriation of the human essence by and for man."—Marx) —অর্থাৎ সামাজিক চেতনার অধিকারী ("the complete return of man to himself as a social—i.e., human being"—Marx) স্বাধীন-প্রবুদ্ধ ব্যক্তি-মানুষ হয়ে ওঠার ক্রমাগত সাধনার, তার সৃষ্টিশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের—এক কথায় "বড় আমির তপস্যার" দিগ্‌দর্শনই মার্কস্‌বাদ।

জীবন কি? জীবনের সার্থকতা কি সে?—একটি কৌতুকস্নিগ্ধ নমনীয় জিজ্ঞাসু মন নিয়েই তিনি জীবনের এই সব মূলগত প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন। 'আত্মদীপ' হয়ে জীবনাদর্শের অনুসন্ধান করেছেন, আর অস্তিত্বের বিপন্নতার মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথকে ধ্রুবতারা করেই এগিয়ে যেতে চেয়েছেন এবং পেয়েছেন মানবমুক্তির তীর্থসঙ্গমের দিকে কমিউনিজমের যাত্রাপথ। এই যাত্রাপথে 'সংস্কৃতির রূপান্তরে'র সাধনায় সুস্থির থেকে 'মহামানবের সাগর তীরে' সংস্কৃতির বিশ্বরূপের বাসনায় আজও তিনি সমুৎসুক। গোপাল হালদারের এই বিশেষ জীবনদৃষ্টিই তাঁর শিল্প-সৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে গোপাল হালদার যা বলেছেন তা তাঁর নিজের সাহিত্য সাধনা সম্পর্কেও প্রযোজ্য—"তাঁর সাধনা মানবসত্তার আত্মান্বেষণ; শিল্প তাঁর আত্মান্বেষণের বাণী রূপ। তাঁর সাহিত্য

তাঁর কালের তাঁর দেশের বিশেষ মানব-আধারে সকল কালের সকল দেশের জীবন-সত্যের ও মানব-সত্যের স্বরূপ-সন্ধান।" (সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা পৃ. ১১)।

সাহিত্য-সাধনা : শৈশব থেকেই গোপাল হালদার সাহিত্যচর্চা শুরু করেন, তবে তখনকার কোনো রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়নি। কলেজের সহপাঠী বন্ধু সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে লিখেছেন, "বন্ধুবর গোপাল হালদার প্রভৃতির চেষ্টায় হাতের লেখা অগিলভি হস্টেল ম্যাগাজিনের একটি সংখ্যা প্রকাশের আয়োজন চলিয়াছিল" —(আত্মস্মৃতি, পৃ, ৭০)। এই পত্রিকায় গোপাল হালদারের তখনকার ইংরেজী রচনার নমুনা পাওয়া যায়। ১৯২১ সালে, 'সবুজ পত্রে' 'অমৃতকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়' ছদ্মনামে লিখিত 'বাঙালী যুবক ও নন্-কো-অপারেশন' পত্রটি সম্ভবত গোপাল হালদারের প্রথম মুদ্রিত রচনা। ১৯২৫ সালের মধ্যেই বেশ কিছু গল্প-প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষ', 'সবুজপত্র' ও 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩২৮, চৈত্র) 'দুদিনের সহযাত্রী' সম্ভবত প্রথম মুদ্রিত গল্প। সাহিত্য বিষয়ক প্রথম মুদ্রিত রচনা 'আধুনিক সাহিত্যে সমস্যা' (ভারতবর্ষ, ১৩২৭, ফাল্গুন)।

গোপাল হালদার কিছু কবিতাও রচনা করেন। তাঁর লেখা আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, ১৯২৮ সালে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সময় 'তাম্বুল করঙ্কবাহিনী' নামে যে খণ্ডকাব্যটি লেখেন তা পুলিশের খানাতল্লাসীতে খোয়া যায়। 'খোপা' নামে দীর্ঘ ব্যঙ্গ কবিতা 'শনিবারের চিঠিতে' প্রকাশিত হয়। 'অরণি' (ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, 'নীপারের বাঁধ'। 'সমসাময়িক' (আশ্বিন, ১৩৪৭) পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'দুটি সনেট'। লেখকের সেই সময়কার মানসিক অবস্থা অনুধাবনের পক্ষে সনেট দুটি সহায়ক। দ্বিতীয়টি এখানে উদ্ধৃত হলো—

২

যখন স্মরিণু মনে আমারো জীবনে একদিন
এসেছিল সুন্দর প্রভাত, বিধাতার আশীর্বাদ
হাতে লয়ে ; আমারেও ডেকেছিল বিস্ময়ে প্রাচীন
তারা আর জলধারা, গিরিশৃঙ্গ, আকাশ অবাধ ;
ধরণীর প্রাণলীলা আমারে মাগিয়াছিল ক্রোড়ে ;
মোর দ্বারে দূত হয়ে এসেছিল নবীন যৌবন,
এসেছিল রূপ, প্রেম ; সাগ্রহে ডাকিয়াছিল মোরে
কবিতা কল্পনাগীতি, ডেকেছিল উদার জীবন—

বিস্ময়ে শুধাই, কোথা আশা, কোথা রূপ, কোথা স্নেহ—
প্রেম-প্রীতি? সে দিনের ভবিষ্যৎ কোথায় মিলালো
এদিনের নিঃস্বতার তলে? আমারে চাহেনা কেহ;
কেঁদে গান ফিরে যায়; নিষ্প্রভ যে আকাশের আলো।
মৃত্যুরে উত্তরি যায় গান, মান, আত্মজন, গৃহ;
চাহি নাই সে অমৃত—জীবনেরে বেসেছি যে ভালো।

শুধুমাত্র সাহিত্যিক হবেন, সাহিত্যসৃষ্টি করবেন এমন লক্ষ্য স্থির করে গোপাল হালদার জীবন আরম্ভ করেন নি এবং সাহিত্য সাধনায় সময়ও বেশি দিতে পারেন নি। রাজনীতি, গবেষণা, সাংবাদিকতা, পত্রিকা সম্পাদনা ইত্যাদি নানামুখী কাজে ব্যস্ত থেকেছেন। সাংবাদিকতা ও পত্রিকা সম্পাদনার সূত্রে তাঁকে লিখতে হয়েছে প্রচুর। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ইংরেজি-বাংলা রচনার পরিমাণ বা তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। গোপাল হালদার বাংলা ভাষায় ৩১টি গ্রন্থের রচয়িতা (তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ, ছাত্রদের জন্য রচিত গ্রন্থ ও অপ্রকাশিত গ্রন্থাদি বাদ দিয়ে)। বিষয় ও প্রকাশরীতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাঁর রচিত বাংলা গ্রন্থকে আমরা মোটামুটি ৫টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করতে পারি। প্রথম প্রকাশের কালানুক্রম রক্ষা করে, শ্রেণী বিন্যস্ত গ্রন্থ-তালিকাটি (১৯৮৬ পর্যন্ত) নীচে দেওয়া হলো :

উপন্যাস ও ছোটগল্প : একদা (১৯৩৯), পঞ্চাশের পথ (১৯৪৪), তেরশ পঞ্চাশ (১৯৪৫), ঊনপঞ্চাশী (১৯৪৬), ভাঙন (১৯৪৭), উজানগঙ্গা (১৯৫০), অন্যদিন (১৯৫০), স্রোতের দীপ (১৯৫০), আর একদিন (১৯৫১), ভূমিকা (১৯৫২), নবগঙ্গা (১৯৫৩), জোয়ারের বেলা (১৯৫৪) এবং 'ভাঙন'-এর রূপান্তরিত সংস্করণ 'ভাঙনীকূল' (১৯৫৬)। 'একদা—অন্যদিন- আর একদিন' স্বসম্পূর্ণ তিনটি পর্বের একত্রিত নাম 'ত্রিদিবা' (১৯৭৮)। এছাড়া রয়েছে 'ধূলিকণা' (১৯৪২) নামে একখানি গল্পগ্রন্থ। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় স্বনামে ও ছদ্মনামে (প্রফুল্ল হালদার) প্রকাশিত বেশ কিছু গল্প এখনো গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়নি।

রসনিবন্ধ ঃ বাজে লেখা (১৯৪২) বা স্বপ্ন ও সত্য (১৯৫১), আড্ডা (১৯৫৬), বনচাঁড়ালের কড়চা (১৯৬০)। 'বাজেলেখা' রসনিবন্ধ সংকলনের 'বাজেলেখা' নামাঙ্কিত রচনাটি বর্জিত হয়ে এবং 'সোনারকাঠি', 'সাধনা ও সৌখিনতা' নামে দুটি রচনা সংযোজিত হয়ে নামান্তরিত নতুন সংস্করণ 'স্বপ্ন ও সত্য'।

প্রবন্ধ : সংস্কৃতির রূপান্তর (১৯৪১), বাঙালী সংস্কৃতির রূপ (১৯৪৭), একালের যুদ্ধ (১৯৪৭), বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ (১৯৫৬), বাঙলা সাহিত্য ও মানব-স্বীকৃতি (১৯৫৬), ভারতের ভাষা (১৯৬৭), বাঙালীর আশা বাঙালীর ভাষা (১৯৭২), সতীনাথ ভাদুড়ী ঃ সাহিত্য ও সাধনা (১৯৭৮), শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ (১৯৮৫ / লেখকের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত রচনার সংকলন), সংস্কৃতির বিশ্বরূপ (১৯৮৬ সংস্কৃতির

রূপান্তর, বাঙালী সংস্কৃতির রূপ ও বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ গ্রন্থ তিনখানির পরিমার্জিত একত্রিত সংস্করণ), বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ (১৯৮৬)।

সাহিত্যের ইতিহাসঃ বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা—১ম খণ্ড (১৯৫৪), বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা—২য় খণ্ড (১৯৫৮), ইংরেজী সাহিত্যের রূপরেখা (১৯৬১), রুশ সাহিত্যের রূপরেখা (১৯৬৬)।

আত্মজীবনীঃ রূপনারানের কূলে—১ম খণ্ড (১৯৬৯), রূপনারানের কূলে—২য় খণ্ড (১৯৭৮)।

উপরের তালিকার প্রত্যেকটি গ্রন্থের পরিচয় দান বা সে সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই; তাই গোপাল হালদারের জীবনদৃষ্টি ও সৃষ্টিশক্তির পরিচয় বহন করে এমন কিছু প্রতিনিধিস্থানীয় রচনার উল্লেখমাত্র করে, লেখক হিসাবে তাঁর বিশিষ্টতা কোথায় তা নির্দেশ করতে চেষ্টা করব।

বাঙালীর ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বস্তুবাদী বিশ্লেষক-পণ্ডিত হিসাবেই গোপাল হালদারের খ্যাতি। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে প্রসারিত "বাঙালী সংস্কৃতির রূপ" ও তার রূপান্তরের প্রসঙ্গটি লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় অনায়াসে বিশ্লেষণ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর অধিকার সর্বজন-স্বীকৃত। ১৯৪১ সালে "সভ্যতার সংকটে" বিচলিত রবীন্দ্রনাথ মানুষের প্রতি বিশ্বাসে অবিচলিত থেকে, যে নতুন সংস্কৃতির প্রতি পুনর্বার বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন—গোপাল হালদারের **"সংস্কৃতির রূপান্তর"** (১৯৪১),—সেই নতুন সংস্কৃতির-ই জয়গান। মহাকবি তাঁর ভূমাচারী সংস্কৃতি জিজ্ঞাসায় ভূমিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি দিয়ে সোভিয়েত সমাজব্যবস্থাকে কালান্তরের নতুন সংস্কৃতির প্রতিনিধি হিসাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন, আর "একটু বেশি রাবীন্দ্রিক"—গোপাল হালদার ভূমিকেই প্রাথমিক গুরুত্ব দিয়ে বাঙালীর সংস্কৃতি জিজ্ঞাসায় সাম্যবাদের মানবতন্ত্রী-বিশ্ববাণীকে পরম শ্রদ্ধায় বরণ করে নিয়েছেন।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্দেশ করে লিখেছেন, "মানুষের জীবন-সংগ্রামের বা প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তারের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি"—(সংস্কৃতির রূপান্তর / পৃঃ ৩৩) এবং সংস্কৃতি স্থানুবৎ কিছু নয়, সংস্কারের পুনরাবর্তন-ও নয়, "সংস্কারের ঐতিহাসিক বিবর্তন। সমস্ত বিবর্তনের মধ্য দিয়া মানুষ ক্রমেই বেশি করিয়া মানুষ হইতেছে, প্রাচীন সংস্কৃতি-ও হইতেছে এক ব্যাপকতর বিশ্ব-সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত।"—(ঐ / পৃঃ ৩৫৩)। সংস্কৃতি সম্পর্কিত এই চিন্তা-ভাবনাই গোপাল হালদার সুবিন্যস্ত যুক্তি-শৃঙ্খলায়, পাণ্ডিত্যের ভারহীন প্রাঞ্জলতায় তুলে ধরেছেন "সংস্কৃতির রূপান্তর" গ্রন্থে। সুগ্রথিত প্রবন্ধ সংকলন—**"বাঙালী সংস্কৃতির রূপ"** (১৯৪৭) ও **"বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ"** (১৯৫৬) গ্রন্থদ্বয়েও লেখক অতীতের, স্বকালের বাঙালীজাতির আত্মবিকাশের সাধনার স্বরূপ, তার রূপ ও রূপান্তর, তার সীমাবদ্ধতা, বিকৃতি ও

সৃষ্টিশক্তির চলতি হিসাব দাখিল করে লিখেছেন, "বাঙালীর আধুনিক কালচারের মূল সঙ্কটটা হচ্ছে 'ভদ্র-সংস্কৃতি' ও 'লোক-সংস্কৃতির' বিচ্ছেদ ও দ্বন্দ্ব।"—(বাঙালী সংস্কৃতির রূপ)। এই দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেই লেখক তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন নি, তা থেকে উত্তরণের পথ-ও নির্দেশ করেছেন, "বাঙালী সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে চাইলে তাকে করতে হবে সম্পূর্ণ, সমগ্র বাঙালীর সংস্কৃতি। তার জন্য দরকার হবে—রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক ক্ষেত্রে বাঙলার গণতান্ত্রিক বনিয়াদ"...... সেই বনিয়াদের উপরই সার্বজনীন শিক্ষার বেদি স্থাপন করে গড়তে হবে বাঙালীর সার্বজনীন সংস্কৃতি, বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ সংস্কৃতি।"—(বাঙালী সংস্কৃতির রূপ)। শুধু মনের মুক্তি নয়, প্রয়োজন বাঙালীর সৃষ্টিশক্তির সার্বজনীন-সর্বাঙ্গীণ উদ্বোধন।

গোপাল হালদারের সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থে পাণ্ডিত্যপূর্ণ অ্যাকাদেমিক আলোচনার গুরুভার নেই, প্রকৃতজ্ঞানীর নিরভিমান চিত্তের সহৃদয় উপস্থিতি সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। লেখক নিছক একজন তাত্ত্বিক নন, তিনি সংস্কৃতির বাস্তব-বনিয়াদের নির্মাতা, "সভ্যতার পিলসুজ"-সৃষ্টিশীল জনগণের জীবনসংগ্রামের সহৃদয় সহযাত্রী। "শুধু জানলে আর বুঝলেই মানুষের জীবন-ধর্ম শেষ হয়ে যায় না। তাকে কিছু করতে হয়, কিছু গড়তে হয়, কিছু সৃষ্টি করতে হয়। জগৎকে interpret করলেই যথেষ্ট হবে না, জগৎকে change করতে হয়। এই হল সংস্কৃতির দাবি—আর তাতেই মনেরও মুক্তি।"—(বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ)। গোপাল হালদারের সংস্কৃতি আলোচনার এখানেই বিশিষ্টতা।

বাঙালীর ভাষা সমস্যা বিশ্লেষণে বা তার সাহিত্যের রূপরেখা রচনার ক্ষেত্রেও গোপাল হালদার বাঙলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পটভূমিকে গুরুত্ব দিয়েছেন সর্বাধিক। তাঁর মতে, "বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-ও বাঙলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি অঙ্গ এবং বাঙালীর ইতিহাসেরই একটি শাখা।" এখানেও তথ্য ঠাসা গবেষণা গ্রন্থ রচনার চেষ্টা নেই, সে দাবিও নেই, বরং মানুষের জীবন-সংগ্রামের মোট প্রচেষ্টা বা জাতীয় চেতনার আত্মবিকাশের ধারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যক্তিমানসের মধ্য দিয়ে বাঙলা সাহিত্যে কিভাবে, কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে তা অনুধাবনের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় **"বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা"** গ্রন্থদ্বয়ে। **"ইংরেজী সাহিত্যের রূপরেখা"** ও **"রুশ-সাহিত্যের রূপরেখা"**—রচনার ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করেছেন। অধিকন্তু, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের পথ বেয়েই একদিন ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ভাবসম্পদ বাঙালীর চিত্তে নব-চেতনা সঞ্চারিত করেছিল এবং সেই নব-চেতনার শ্রেষ্ঠ দান-ই আধুনিক বাংলা সাহিত্য। তাই, তাঁর মতে "আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের সম্যক্ উপভোগ ও অনুধাবনের জন্য ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় থাকা প্রয়োজন।"

ছাত্রজীবনেই (১৯২০-২২) গোপাল হালদার তুর্গেনিভ-টলস্টয়-গোর্কি প্রমুখ রুশ-সাহিত্যের মহান বাস্তববাদী শিল্পীদের রচনার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করেন, "রাশিয়ার জমিদার ও রায়তের সম্পর্ক, আমলাতন্ত্রের সঙ্গিত

জন-সাধারণের বিরোধ আংশিক রূপে আমাদের মতই ছিল।......আমাদের সাহিত্য রাশিয়ান সাহিত্যের সহিত ছন্দ বজায় রাখিয়া শুধু এইটুকুই অগ্রসর হইয়াছে, তাহা নয়, তাহারা আরো একটি ক্ষেত্রে পৌঁছিয়াছে। স্বাজাত্য-বোধ ও বিশ্বপ্রেমের মিলনের জন্য দুই সাহিত্যই চেষ্টা করিয়াছে।"—(আধুনিক সাহিত্যে সমস্যা / ভারতবর্ষ, ফাল্গুন-১৩২৭ এবং 'শিল্পী'-টলস্টয় প্রসঙ্গে / ভারতবর্ষ, বৈশাখ-১৩২৯ দ্রষ্টব্য)। তাই রুশসাহিত্যের সঙ্গে শিক্ষিত-বাঙালীর পরিচয় সাধনের জন্য রচনা করেন—"**রুশ সাহিত্যের রূপরেখা।**" আর একটা তাগিদ-ও ছিল—জারশাসিত পশ্চাদ্‌পদ রাশিয়া আত্মবিকাশের সাধনার পথে এগিয়ে কিভাবে আধুনিক সমাজ-তান্ত্রিক রাশিয়ায় রূপান্তরিত হলো তার বাস্তব প্রতিফলন তার সাহিত্যে কিভাবে কতটুকু ঘটেছে তা-ও শিক্ষিত-বাঙালীকে জানানো। ভূমিকায় লেখক বলেছেন—"রুশ সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ে আমরা রুশ জাতির জীবন-মনের সত্যকার পরিচয় লাভ করতে পারি।"

গোপাল হালদারের **'বাজেলেখা'** (বা 'স্বপ্ন ও সত্য'), **'আড্ডা'** এবং **'বনচাঁড়ালের কড়চা'** সাহিত্যধর্মী রচনা (Literature of Power) বা "রস-নিবন্ধ"। বাংলা সাহিত্যে "কমলাকান্তের দপ্তর", "পঞ্চভূত"-জাতীয় গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম;—'বাজেলেখা', 'আড্ডা', 'বনচাঁড়ালের কড়চা' সেই অভাব কিছুটা পূরণ করেছে বলেই মনে হয়। নিছক বৈঠকী আলাপের লঘু মেজাজে পারিপার্শ্বিক জীবনের সমস্যা ও অসঙ্গতি তুলে ধরার মজা নয়; বরং বুদ্ধিদীপ্ত শালীন-কৌতুকপ্রিয়তার সরসভঙ্গীতে, সমাজ-সাহিত্য-রাজনীতি—যাবতীয় বিষয়ের গভীরে প্রবেশের চেষ্টাই লক্ষ্য করা যায় তাঁর রস নিবন্ধে। কিন্তু তত্ত্ব ও তথ্যের ভারমুক্ত (একেবারে দায়মুক্ত নয়), পাণ্ডিত্যের গাম্ভীর্যমুক্ত সরসচিত্তের সচ্ছন্দ বিহার; আলোচনার মধ্য দিয়ে পাঠকের সঙ্গে আলাপ ও অন্তরঙ্গতা গড়ে তোলার প্রয়াস, যা স্বগতনিবন্ধ বা রসনিবন্ধ (Personal Essays) জাতীয় রচনার রস ও রহস্য, তা-ও বেশ স্পষ্ট তাঁর রচনায়।

'আড্ডা'য়—আড্ডাপ্রিয় (আড্ডারসিক বলে গোপাল হালদারের খ্যাতি আছে) বাঙালীর ভোজনরস-রসিকতা ও বুদ্ধিদীপ্ত শালীন-কৌতুকপ্রিয়তার উজ্জ্বল পরিচয় তুলে ধরে, যেভাবে লেখক বাঙালীর চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য ও তার মিশ্র-সংস্কৃতির স্বরূপটি চিনিয়ে দিয়েছেন, তার জন্য বাংলা সাহিত্যের পাঠক কৃতজ্ঞ থাকবে।

'বাজেলেখা' (বা 'স্বপ্ন ও সত্য') গোপাল হালদারের কাব্যজিজ্ঞাসার অনন্য শিল্পরূপ। এ লেখা, কাব্য জিজ্ঞাসার যুক্তি-বিচার বিশ্লেষণের নৈর্ব্যক্তিক রীতির মীমাংসা নয়। কারণ, লেখকের "কলম অনুসরণ করেছে মনের ধারা" চেতন-প্রবাহের পদ্ধতিতে। মনটি পরিশীলিত এক রসিক জিজ্ঞাসুর। নিজের সঙ্গে নিজের আলাপ, প্রশ্ন করে নিজেকেই তার উত্তর শোনানো—অর্থাৎ স্বগতোক্তির রীতিতে কাব্য জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাই করে করে এগিয়ে যাওয়া, ফলে একটি ব্যক্তিমানুষের আবেগ-কল্পনা-অনুভূতির রঙে-রাঙিয়ে

নান্দনিক-জিজ্ঞাসা, জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে অন্বিত হয়ে একটা উত্তর-ও শেষপর্যন্ত পেয়ে যায়—"জীবনের হাতেই লেখার-ও জীয়ন-কাঠি।" জীবনকে গ্রহণ করলে পর, সৃষ্টির স্বপন, সত্য হয়ে রূপ লাভ করে—তখনই শিল্পের সার্থকতা।

'বাজেলেখার' রচনাগুলো একটি রসিকচিত্তের মানস-যাত্রার আলেখ্য হলে-ও রচনার গুণে, অন্বেষণের আন্তরিকতায় সহৃদয় পাঠকের মনে-ও জিজ্ঞাসার উত্তাপ সঞ্চারিত করে, ফলে বিষয়ের মধ্যে ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্যের তাৎপর্যও পাঠক লাভ করতে পারে। এই কারণেই 'স্বগতনিবন্ধ' হিসাবে 'বাজেলেখা' বাংলা সাহিত্যে অনন্য সৃষ্টি। 'বনচাঁড়ালের কড়চা'-য় লেখক ততটা সিদ্ধি অর্জন করতে পারেন নি। বুদ্ধিদীপ্ত শালীন-কৌতুকপ্রিয়তার সরসভঙ্গী বজায় থাকলেও আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে—আলাপের অন্তরঙ্গতা সবক্ষেত্রে বজায় রাখতে পারেন নি। এ ত্রুটি থেকে 'আড্ডা', এমনকি 'স্বপন ও সত্য'—একেবারে মুক্ত নয়, অধিকন্তু কোন কোন রচনায় অতিকথনের ঝোঁক রস-নিষ্পত্তিতে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটায়।

উপন্যাস : গোপাল হালদার মূলত-ই একজন মননশীল লেখক—এই মনন-শীলতা তাঁর কথাসাহিত্যেও লক্ষ্য করা যায়। তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা ১২। সংখ্যায় ১২ হলেও, আসলে তিনি পর্বে-পর্বে বিভক্ত তিনখানা উপন্যাস লিখেছেন। "একদা-অন্যদিন-আর একদিন"—একসঙ্গে **"ত্রিদিবা"**। "ভূমিক—নবগঙ্গা-জোয়ারের বেলী-ভাঙন (বা ভাঙনীকূল)-স্রোতের দীপ-উজান গঙ্গা"—ছয়খণ্ডে বিন্যস্ত **"ভদ্রাসন"**। আর, পঞ্চাশের মন্বন্তরের ট্রিলজি—**"পঞ্চাশের পথ-উনপঞ্চাশী-তেরশ পঞ্চাশ"**।

'ত্রিদিবা'-র প্রথম পর্ব—**'একদা'**—গোপাল হালদারের প্রথম উপন্যাস, ১৯৩৩ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে রাজবন্দী থাকাকালে সাতদিনে লিখে শেষ করেন, প্রকাশিত হয় কয়েক বছর পর ১৯৩৯ সালে। 'একদা'-র কাহিনী ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসের একটি দিন; দ্বিতীয় পর্ব—**'অন্যদিন'**, ১৯৪৯ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে বসে লেখা, প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। উপন্যাসের ঘটনা কাল ১৯৩৭-৩৮ সালের বিশেষ একটি দিন। তৃতীয় পর্ব **'আর একদিন'**—১৯৪৯ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে লেখার শুরু, শেষ করেন জেল থেকে বেরিয়ে পাটনায়,—গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়—১৯৫১ সালে। এ উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৯৪৮ সালের আর একটা দিন।

চৈতন্যস্রোতের আধুনিক রীতিকে আশ্রয় করে গোপাল হালদার তাঁর 'একদা' উপন্যাসে বৈপ্লবিক-জীবন জিজ্ঞাসার যে সংশয়ক্ষুব্ধ মানবিক শ্রী ফুটিয়ে তুলেছেন, তা বাংলা কথাসাহিত্যে এক দুঃসাহসী পদক্ষেপ। রসিক সমালোচকেরও সুচিন্তিত অভিমত, "একদা (১৯৩৯) শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে।...উপন্যাসটির দার্শনিক মননশীলতাই ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ নহে। ইহার সহিত মানব-হৃদয়ের চঞ্চলঘাত-প্রতিঘাত যুক্ত হইয়া ইহাকে উপন্যাসোচিত গুণে সমৃদ্ধ করিয়াছে।...বৈপ্লবিক মনোভাবের বিশ্লেষণে ও ইহার অসহনীয় অন্তর্জ্বালা ফুটাইয়া তোলার অসাধারণ ক্ষমতায় ইহা এই জাতীয় উপন্যাসের শীর্ষস্থানীয়।"—(বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের

ধারা—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; পৃঃ ৬৫৯-৬১ দ্রষ্টব্য)। ১৯৩০-এর ডিসেম্বরের এক সকালে 'একদা'-র নায়ক অমিত, পলাতক বিপ্লবী সুনীলের গোপন আস্তানায় কিছু টাকা পৌঁছে দেবার জন্য বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে। সুনীলদের গোপন সন্ত্রাসবাদের পথে স্বাধীনতা অর্জনের উন্মাদ প্রচেষ্টায় অমিতের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। তাদের দেশ প্রেম, তাদের আত্মদানের অধীরতাকে সে অশ্রদ্ধা করে না, তাদের জন্য দরদও বোধ করে; কিন্তু তাঁদের নিষ্ফল মাথা কোটা, জীবনের স্বাভাবিক ধর্মকে অস্বীকার করে কৃচ্ছ্র-সাধনা, চক্রে আর চক্রান্তের পথে তাঁদের হিংসা-প্রতিহিংসার রুদ্রপন্থা—এর মধ্যে অমিত কোন মহত্ত্ব খুঁজে পায় না। অমিত জীবনকে ভালবাসে, "জীবনরসের পিপাসা তাহার প্রাণে অশেষ, অনির্বাণ, অতল-স্পর্শী" (রচনা সমগ্র-১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮১) এবং গভীর তার জীবন জিজ্ঞাসাও।

অমিত জীবনকে ভালবাসে, কিন্তু সহপাঠী বন্ধু শৈলেন বা সাতকড়িদের "শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের" গ্লানিময় জীবনের স্থূলতাও তার অসহ্য—সে জীবনের দান গ্রহণ করেই মহত্ত্বকে স্পর্শ করতে চায়। কিন্তু কোন্ পথে জীবনের সেই পরম সত্যকে সে পাবে? অমিত জানে "জীবনের মানে আরও বেশি—সে শুধু দিন গাঁথিয়াই শেষ হয় না...। সে চাহে বিকাশ......বিকাশ আপনার পরিপূর্ণতায়, চেতনার তীব্রতায়, অনুভূতির গভীরতায়, কর্মের ঔজ্জ্বল্যে। দেয়ার ইজ ওনলি ওয়ান্ ইট্যারনিটি—ইন ইন্টেন্স্ লিভিং"—(রচনাসমগ্র—১/পৃঃ ১২২)। অধ্যাপনা, শিল্প-জিজ্ঞাসা, ইতিহাসচর্চা, নারীর ভালবাসা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কোন কিছুই তার কাছে মিথ্যা নয়—মানুষের আত্মবিকাশের সাধনার ক্ষেত্রে কোনো একটিকেই সে পরম সত্য বলেও মেনে নিতে পারে না। জীবনের পরম সত্য কি, মানুষের পরিচয় কি সে? আত্মজিজ্ঞাসায় অস্থির অমিত ভাবে জীবনের পথে সে সত্যান্বেষী তীর্থযাত্রী—এই তার পরিচয়। "জীবনকে পুরুষের মতো স্বীকার করাই বড় কাজ" এবং বাস্তব পৃথিবীর "রূপান্তরের দাবিকে জীবনে গ্রহণ করিতে পারাই বড় সার্থকতা। অমিত তাহাই করিতে চায়"—(ঐ, পৃঃ ১২৩)। সংশয়ক্ষুব্ধ, আত্ম-জিজ্ঞাসায় অস্থির অমিত মাঝরাতে বাড়ি ফেরে এবং রাত না পোহাতেই দরজায় পুলিশের সবুটপদধ্বনি; সে কারাগারে বন্দী হয়। 'ইন্টেন্স্ লিভিং'-এর জন্য ব্যাকুল, 'বড় আমি'র জগতে তীর্থযাত্রায় প্রয়াসী, আত্মজিজ্ঞাসায় অস্থির অমিতের সংশয় ক্ষুব্ধ মানসযাত্রার প্রথমপর্ব 'একদা'র এখানেই সমাপ্তি।

কর্মচঞ্চল জীবন থেকে বন্দীজীবনের বিচ্ছিন্নতায় আত্মবিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে অমিত তত্ত্বগতভাবে জীবনসত্যকে পেয়ে যায়—"মানুষের সৃষ্টি-শক্তি আজ পৃথিবীকে নতুন করিয়া রচনা করিতে শিখিতেছে, মানুষ আজ শিখিতেছে নিজেকেই রচনা করিবার বিদ্যা। ইহাই এযুগের দৃষ্টি, ইহাই এ যুগের সৃষ্টি। আর এই মানুষের পরিচয়-রচনাতেই তোমাদের পরিচয়..."—(রচনা সমগ্র—১/পৃঃ ১৫১)। "আজ অন্যদিন—সেদিন আর নাই—নাই বিচারহীন সেই অধীর আত্মদানের দিনও।"—(ঐ/পৃঃ [illegible])। এই জীবন, এই মানুষকে ভালবেসে, সত্যরূপে জেনে, কর্মের মধ্যদিয়ে [illegible]

সার্থকতা আবিষ্কারের দিন। "জীবনের সঙ্গে এইবার মুখামুখি করিতে হইবে... মূল্য দিয়া অর্জন করিতে হইবে—জীবন-সত্য।"— (ঐ/পৃঃ ১৮৮)। আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে পাওয়া জীবন-দৃষ্টিকে কর্মক্ষেত্রে পরীক্ষা করে জীবন-সত্যরূপে গ্রহণের আগ্রহ নিয়ে অমিত 'অন্যদিনে' পৌছে যায়। 'ইতিহাসের ছাত্র' অমিত 'ইতিহাসের সৃষ্টিশক্তিকে' স্বাগত জানিয়ে এগিয়ে যায়। 'লাইফ মার্চেস্'—মানব-মহাতীর্থের দিকে অপরাজেয় মানুষের মহাঅভিযানের সে এখন সচেতন-সক্রিয়-সহযাত্রী। 'ত্রিদিবা'র দ্বিতীয় পর্ব 'অন্যাদিন'-এর সমাপ্তিও এখানে।

শুরু তৃতীয় পর্ব 'আর একদিন'-এর কাহিনী। 'হ্যাম্লেটীয়' দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে, জ্ঞান ও অনুভূতি লব্ধ জীবনদৃষ্টিকে আশ্রয় করে অমিত কর্মের পথে তার আকাঙ্ক্ষিত তীর্থে পৌঁছনোর জন্য কমিউনিস্ট পার্টিতে সহযাত্রী বন্ধুদের পাশে এসে দাঁড়ায়। শুরু হয় অমিতের জীবনে 'আর একদিন'—কমিউনিস্ট জীবন—'সর্বজন সুখায়, সর্বজন হিতায়' জগৎকে, জীবনকে রূপান্তরিত করার জন্য দুঃখবরণের, আত্মদানের মহৎ জীবন-বাসনা—'বড় আমির তপস্যা।' ১৯৪৮ সালের এক সকালে লর্ড সিনহা রোডের গোয়েন্দা দপ্তরে অমিতকে আনা হলো। অমিতের জীবনে "যাত্রা সুরু হইল আর এক দিনের। ...যখন এ স্পেক্টর ইজ হন্টিং দি ওয়ার্ল্ড.."।— (ঐ/পৃঃ ৩৬৯)। এ দেশের মানব অভিযানের পুরোভাগে দাঁড়াতে পেরে অমিত নিজেকে ধন্য মনে করে। 'মানবমুক্তির দিকে, ভালবাসার রাজ্যে' তীর্থযাত্রী শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-বুদ্ধিজীবী—নানা মানুষের সাহচর্যে "অমিতের মনে হয় সে একা নয়—আমিও তার অঙ্গ—মহামানবের।" —(ঐ/পৃঃ ৩৬৯)। সে রক্তের অনু-পরমাণুতে অনুভব করে 'জীবন্ত সেই বড় আমির স্পন্দন', প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের মুখে খুঁজে পায় 'বিরাট ভাবী মানুষের মুখচ্ছবি, সৃষ্টির সুমহৎ অক্ষর'। 'স্থির চরণে অমিত' তীর্থযাত্রী বন্ধুদের সহযাত্রী হয়ে পুলিশের গাড়িতে উঠে যায়—"টু হুম্ দি মিজারিজ্ অব দি ওয়ার্ল্ড আর মিজারিজ্, অ্যাণ্ড উইল নট লেট দেম রেস্ট্।"—(ঐ পৃঃ ৫২২)।

"কালের হাতের অক্ষমালা সরিয়া সরিয়া পর্বান্তে ঘুরিয়া আসে"—বিশ্রাম নেই, বিরাম নেই—"বিপ্লবের পরে আবার বোধন, আবার নূতন কালের নূতন বিরোধ"—জিজ্ঞাসায় অস্থির, যন্ত্রণায় কাতর মানবাত্মাকে নতুন সমন্বয়ের পথে যাত্রা করতেই হবে। এই তো দেশ-কাল-সমাজের আবহমান দ্বান্দ্বিকসত্য—অমিতের কালে, আমাদের কালে এবং আগামী কালেও। এখানেই উপন্যাস হিসাবে 'ত্রিদিবা'র শ্রেষ্ঠত্ব, তার প্রকরণগত ত্রুটি-বিচ্যুতি, মননশীলতার প্রাধান্য সত্ত্বেও।

'ত্রিদিবা' চেতনা-প্রবাহের পদ্ধতিতে লেখা আত্মজীবনীমূলক আধুনিক উপন্যাস। যাঁরা লেখকের আত্মজীবনী 'রূপনারানের কূলে' বা তাঁর 'স্বপ্ন ও সত্যে'র স্বগত নিবন্ধগুলি পড়েছেন, তাঁরা 'ত্রিদিবা'র সংশয়ী, জিজ্ঞাসু, বিশ্লেষণ পরায়ণ-বুদ্ধিজীবী নায়ক অমিতকে চিনে নিতে ভুল করবেন না। 'ত্রিদিবা'য় অমিতের কাহিনী প্রথাসিদ্ধ উপন্যাসের প্লটের মধ্যে বিধৃত একক-ব্যক্তির প্রেমোপাখ্যান নয় বা

দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে স্থাপিত ব্যক্তি চরিত্রের চিরাচরিত বিশ্লেষণও নয়। অমিত কোন অর্থেই প্রথাসিদ্ধ নায়ক চরিত্র নয় বা তার কাহিনী নিটোল গল্পে সমাপ্ত কোন নভেলও নয়।

"চিরকালের প্রাণলীলার, সমকালের আবর্ত প্রবাহের আলোড়িত বুদ্বুদ এক-একটি দিন"—(রচনা সমগ্র-১/পৃঃ ১)। —অমিতের জীবনের এমনি তিনটি স্বতন্ত্র দিনের কথা—'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন'। অমিতের জীবনের এই বিশেষ তিনটি দিন আসলে ১৯৩০-থেকে ৪৮ পর্যন্ত ব্যাপ্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতে আলোড়িত, জটিলতায় বিকাশমান দেশ ও কালের দুই দশকের ইতিহাস। বিপ্লবঅনুরাগী, আত্মমুখীন তরুণ বুদ্ধিজীবী অমিতের আত্মান্বেষণ এবং জীবন-সত্য ও মানব-সত্যের স্বরূপ সন্ধানের কাহিনী ইতিহাসের এই বৃহৎ প্রেক্ষাপটেই স্থাপিত। এই প্রেক্ষাপট সুস্থ ও সুস্থির নয়; অসামঞ্জস্যের ঘুণে ধরা, সংকটদীর্ণ ও পরিবর্তমান—দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্যে জায়মান। অমিত তারই মধ্যে সংশয়ে আন্দোলিত হয়েছে, জিজ্ঞাসায় অস্থির হয়েছে, অস্তিত্বের বিপন্নতায় ও একাকীত্বের বেদনায় কাতর হয়েছে, জীবন পিপাসায় ব্যাকুল হয়েছে, আত্মবিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে জীবন সত্যকে তত্ত্বরূপে জেনেছে এবং শেষে কর্মের মধ্যে বহুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে কমিউনিজমের যাত্রাপথে আত্মপরিচয় খুঁজে পেয়েছে- -'বড় আমি'তে তার সত্তার উত্তরণ ঘটেছে। অমিতের সত্তার আত্মপরিচয় আবিষ্কারের এই কাহিনী চেতনা-প্রবাহ পদ্ধতির মৌন-স্বগতোক্তি (interior monologue), স্মৃতি-রোমন্থন, মন্‌টাজ্ (montage), ফ্ল্যাশ-ব্যাকের প্রয়োগকৌশল-আশ্রয়ে অগ্রসর হয়েছে। অমিতের চিন্তা-ভাবনার বহুমাত্রিক দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে বহু নর-নারীর টুক্‌রো টুক্‌রো জীবন-চিত্র ও চরিত্র। ফলে 'ত্রিদিবা' একক-ব্যক্তির সাব্‌জেক্‌টিভ্ উপাখ্যান হয়ে যায়নি; "দুইজন বা দুইশো জনকে আশ্রয়" করে হয়ে উঠেছে "সামগ্রিক জীবনচিত্র, জগৎ প্রবাহের প্রতিকল্প" (রচনা সমগ্র / পৃঃ ৪৯৪)—আধুনিক উপন্যাসের এক বিশিষ্ট শিল্পরূপ।

গোপাল হালদারের **দ্বিতীয় উপন্যাস**—'ভূমিকা-নবগঙ্গা-জোয়ারের বেলা-ভাঙন-স্রোতের দীপ-উজানগঙ্গা'—ছয়পর্বে বিভক্ত **'ভদ্রাসন'**। বাঙালী মধ্যবিত্তের প্রকাশ ও পরিণতির তত্ত্ব লেখক বন্দী নিবাসে ১৯৩৪-৩৬ সালের মধ্যে উপন্যাস আকারে চিত্রিত করেন। 'নবগঙ্গা', 'জোয়ারের বেলা', 'ভাঙন', 'স্রোতের দীপ', 'উজানগঙ্গা' —এই পাঁচটি পর্বে লেখক তাঁর 'তত্ত্ব'কে কথারূপ দান করেছেন এবং 'ভূমিকা' পর্বটি আসলে বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশের ঐতিহাসিক পটভূমিকা।

'ভূমিকা'র আখ্যান কাল বিরাট—"প্রায় ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত"—আড়াইশো বছরের দীর্ঘ ইতিহাস। বাঙালী মধ্য-বিত্তের বিকাশ ও পরিণতির তত্ত্বকথা মূলত যে চরিত্রকে আশ্রয় করে লেখক প্রকাশ করেছেন, সেই জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরীর পূর্বপুরুষ শঙ্কর চৌধুরীর জমিদারী পত্তনের মধ্য দিয়ে 'ভূমিকা' উপন্যাসের

সূচনা। পরবর্তী বংশধর ডাকাত জমিদার সুরথ চৌধুরী, পলাশীযুদ্ধের পর কোম্পানীর অনুগত চিত্রিসারের জমিদার পদ্মনাভ চৌধুরী। একের পর এক বহু ঐতিহাসিক তথ্যের সমাবেশে উপন্যাসটি ভারাক্রান্ত। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র পদ্মনাভ চৌধুরীর পুত্র সনাতন চৌধুরী। দ্বৈতশাসনের নৈরাজ্যের কাল থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূচনা পর্যন্ত সমাজ-ইতিহাসের জটিল-কুটিল দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অস্থির পরিবেশে বর্ধিত এক জটিল মানুষ তিনি। সনাতন বিষয় সম্পর্কে উদাসীন, বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ, অন্যায়ের প্রতিবাদী, পৌরুষের লাবণ্যে স্নিগ্ধ অনুভূতি প্রবণ কবি মানুষ।

পিতার প্রজাপীড়ন আর বানিয়া ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সফর আলীর নেতৃত্বে প্রজারা যখন বিদ্রোহ করে সনাতনের সহানুভূতি ও সমর্থন প্রজাদের দিকে থাকে। বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ সনাতন চৌধুরীর আত্মিক সংকট ও তার পরিণতির বিশ্বাসযোগ্য চিত্র এঁকেছেন লেখক 'ভূমিকা' উপন্যাসে। 'ভূমিকা' উপন্যাসের শেষে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের কারণ নির্দেশ করে লেখক বলেছেন, "চৌধুরীরা সকলেই বুঝিয়াছে ইংরেজের সাম্রাজ্য বন্ধনে সমস্ত দেশ আবদ্ধ; ইংরেজের বাণিজ্যবন্ধন পল্লী পর্যন্ত প্রসারিত; ভৌমিকের ভূমিকাও শেষ হইতেছে—এখন চাই উদ্যোগ, উদ্যম, পৌরুষ।"

উদ্যোগ, উদ্যম, পৌরুষ সম্বল করেই বাঙালী মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশের কালপর্ব শুরু হলো, শুরু হলো গোপাল হালদারের পরবর্তী উপন্যাস **'নবগঙ্গা'** ও **'জোয়ারের বেলা'র** শিবপ্রসাদ, দেবপ্রসাদ, রাজীব, বিভূতিশঙ্কর চৌধুরীদের কালের কথা—ইংরেজী শিক্ষার অভ্যুদয়, ব্রাহ্মধর্ম, জাতীয় মহাবিদ্রোহ, মহারাণীর শাসন, কলোনীয় বাঙালী মধ্যবিত্তের ইংরেজ রাজের অনুগত প্রজা হয়ে চাকুরির স্বর্গরাজ্যে আরোহণের প্রয়াস, ইংরেজ রাজত্বের আইনের শাসনের প্রতি আস্থা, 'বড়ো-ইংরেজে'র ভিক্টোরীয় ঔদার্যের প্রতি শ্রদ্ধা—ঔপনিবেশিক বন্ধনে কুণ্ঠিত হলেও ভাবজগতের **'নবগঙ্গা'**য় অবগাহন করে জাতীয় জাগরণের বিকাশশীলতার কালপর্ব। বাঙালী মধ্যবিত্ত—আরো নির্দিষ্ট করে বললে দাঁড়ায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর বানিয়া ইংরেজদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত জমিদার-দালাল শ্রেণী, বৃটিশরাজের অনুগত আমলা কর্মচারী, ভিক্টোরীয় ঔদার্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ইংরেজী সাহিত্য পাঠের পথ বেয়ে ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত, আর বুর্জোয়া লিবারালিজমের ভক্ত উকিল-মোক্তার-ডাক্তার-অধ্যাপক-পত্রিকাসম্পাদক-সাহিত্যিক-বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর জাগরণের **'নবগঙ্গা'**-য় **'জোয়ারের বেলা'**। আত্ম-আবিষ্কারের পথ বেয়ে জাতীয় চেতনার উন্মেষ, 'আনন্দমঠে'র বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ। কলোনীয় কাঠামোর মধ্যেই 'আত্মশক্তি'তে ভর করে 'স্বদেশী সমাজ' গড়ার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ—আবেদন-নিবেদনের পালা সাঙ্গ করে, বঙ্গভঙ্গ-স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মাতৃমুক্তির রক্তাক্ত শপথ পাঠ। কার্জেনি ষড়যন্ত্র, স্বদেশী আন্দোলন, প্রথম মহাযুদ্ধ, জালিয়ানাবাগের রক্তাক্ত অধ্যায়ে পেঁছে ইংরেজ-চরিত্র সম্পর্কে

মোহভঙ্গ আর চাকুরির স্বর্গরাজ্য থেকে বিদায়ের কালে মধ্যবিত্ত জীবনে "ভাঙন"-এর শুরু। কীর্তিনাশা পদ্মার স্রোতে অবলুপ্তির পথে চৌধুরীদের ভৌমিক চেতনা ও ঐতিহ্যের 'ভদ্রাসন',—উদ্বিগ্ন জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী, তাঁর মধুখালির ভদ্রলোকের জীবন-যাত্রার 'নববাসস্থানে'র দিকেও ক্রমাগত এগিয়ে আসছে মেঘনার 'ভাঙন'—স্রোতের গ্রাসে ভাঙনধরা কূলে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষার সংগ্রামে অবিচল জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী ;—বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের ভাঙনের কালপর্বের ট্র্যাজিক নায়ক। জ্ঞানশঙ্কর 'স্বস্তিতে ভদ্র জীবন-যাত্রায় বিশ্বাসী'; ধর্ম, সমাজ, আচার, অনুষ্ঠানে কোন 'উৎকটতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অশুচিতা' তিনি সহ্য করেন না। তাঁর একান্ত কামনা, তাঁর সন্তান-সন্ততি লেখাপড়া শিখুক, ভদ্র-জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত হোক, তাঁর অবর্তমানে যোগ্য হাতে চৌধুরীবংশের হাল ধরুক।

'কালের স্রোতে যে জীবনাদর্শের দীপ তাঁরা জ্বালিয়েছিলেন, সামনে এগিয়ে চলার যে পথরেখা তাঁরা নির্দেশ করেছেন--যুগসন্ধির এই অন্ধকারে সেই "স্রোতের দীপ" অনুসরণ করে সুরেশ্বর, অমর, অতুল, অশোক—তাঁর বংশের সন্তানেরা ভৌমিক ঐতিহ্যের ভদ্রাসন রক্ষা করুক আর 'উদ্যম, উদ্যোগ, পৌরুষ' অবলম্বন করে সুস্থ ও ভদ্র জীবন-যাত্রার নববাসস্থানকেও আরো প্রসারিত করুক—এই মানবীয় আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হয়েছে জ্ঞানশঙ্করের কর্মসাধনা ও জীবনাচরণে। কিন্তু সুরেশ্বর, অমর, অতুল, অশোক কেউ-ই "সুস্থ ও ভদ্র জীবন"-যাত্রায় বিশ্বাসী হলো না। জ্ঞানশঙ্করের আত্মজ অশোক পিতার আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে, মধ্যবিত্ত জীবনের সংকীর্ণ স্বার্থের নোঙর ছিঁড়ে "উজান গঙ্গা"য় মুক্তি সন্ধানী অভিযাত্রী। এই হচ্ছে বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের বিকাশ ও পরিণতির তত্ত্বকথা। এই তত্ত্বকথাই 'নবগঙ্গা', জোয়ারের বেলা', 'ভাঙন', 'স্রোতের দীপ', 'উজান গঙ্গা'য় কথারূপ লাভ করেছে। প্রত্যেকটি উপন্যাসই তথ্যবহুল। মননশীল লেখক তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধিলব্ধ তত্ত্বটিকে তথ্যসহ যুক্তি পরম্পরায় সজ্জিত করে, ঘটনা-চরিত্র-প্লটের প্রচলিত আঙ্গিকেই উপন্যাসে উপস্থিত করেছেন। তবে অতিরিক্ত তথ্যভারে উপন্যাসের গল্পরসের সহজ স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকেনি এবং চরিত্রের অন্তর্জগতের জটিলতা ও রহস্যের আবরণ উন্মোচনের শিল্পকুশলতাও বহুক্ষেত্রেই ব্যাহত হয়েছে। এর কারণ, ব্যক্তিজীবনের রূপাবয়বে সমাজবিকাশের অন্তর্দ্বন্দ্বের সারসত্য (real-essence) তুলে ধরার গুরুদায়িত্ব বহন করতে গিয়েই গোপাল হালদারের উপন্যাসের নায়কেরা সবক্ষেত্রে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেনি। তবে লেখক তাঁর স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা প্রত্যেকটি চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতির স্বাভাবিক চিত্র অঙ্কন করেছেন। লেখকের কোনো উপন্যাসের কোনো চরিত্রই খেয়ালখুশির যুক্তিহীন আকস্মিকতায় পরিচালিত হয়নি। সবশেষে যে কথাটা বলা দরকার 'ভূমিকা' থেকে 'উজানগঙ্গা' বাঙালী মধ্যবিত্তজীবনের প্রকাশ ও পরিণতির তত্ত্বকথা চৌধুরী বংশের Saga-র মধ্যে 'কথারূপ' দান করার যে দুঃসাহস দেখিয়েছেন গোপাল হালদার, তাকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। কারণ, কোম্পানির আমল থেকে লবণ-সত্যাগ্রহ পর্যন্ত বিস্তৃত ইতিহাসের পরিদৃশ্যমান

ঘটনাবলীর বর্ণনা বা বিশেষ কোন ব্যক্তি বা পরিবারের বৃত্তান্ত বা চিত্র নয় এ গ্রন্থ ; দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও জটিলতায় বিকাশমান ইতিহাসের সারসত্যকে তুলে ধরার বৈজ্ঞানিক-নিষ্ঠার বিরল দৃষ্টান্ত 'ভদ্রাসন'। মহৎ সৃষ্টি না হলেও, বিশিষ্ট শিল্পকর্ম হিসাবে বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

গোপাল হালদার রচিত **'পঞ্চাশের পথ', 'ঊনপঞ্চাশী,' 'তেরশ পঞ্চাশ'**—মন্বন্তরের ট্রিলজি। মহাযুদ্ধ-মন্বন্তর-জনযুদ্ধ-আগষ্ট আন্দোলনের কালপর্বে সমাজ-রাজনীতির প্রামাণিক ভাষাচিত্র (documentation)। ট্রিলজির প্রথমপর্ব—'পঞ্চাশের পথ'—এর ঘটনা কাল ১৯৪২-এর এপ্রিল থেকে আগষ্ট পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্ব—'ঊনপঞ্চাশীর' ঘটনাকাল ১৯৪২-এর আগষ্ট থেকে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত। তৃতীয় পর্ব—'তেরশ পঞ্চাশ'-এর ঘটনা কাল ১৯৪৩-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৪৪-এর এপ্রিলের মধ্যভাগ পর্যন্ত। মন্বন্তরের উপাখ্যান "লেখা সম্পূর্ণ হয়েছিল ১৯৪৫-এর জুনের পূর্বভাগে; তিন খণ্ডের মুদ্রণও তখনি শুরু হয়।" 'পঞ্চাশের পথ'—প্রকাশিত হয় অক্টোবর, ১৯৪৪ ; 'ঊনপঞ্চাশী'—জানুয়ারি, ১৯৪৬ এবং 'তেরশ পঞ্চাশ'—জানুয়ারি, ১৯৪৫। উপন্যাসের ঘটনাকাল, রচনাকাল ও প্রকাশ কাল খুবই কাছাকাছি। নিজের চোখে দেখা "ঘটনা ও মানুষকে" যথাসাধ্য অবিকৃতরূপেই লেখক উপস্থিত করেছেন উপন্যাসের পাতায়। সমকালীন ইতিহাসই এখানে মহানায়ক—"এ হচ্ছে এক ধরনের 'দলিল' বা 'ডক্যুমেন্টারি' উপন্যাস"—(ভূমিকাপত্র দ্রষ্টব্য)। সাধারণ উপন্যাস থেকে এর পার্থক্য নির্দেশ করে লেখক ভূমিকাপত্রে বলেছেন, "ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্ব কেমন করে উদ্‌ঘাটিত হয় নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন টাইপের মানুষ সেই ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কি বিশেষ রূপ গ্রহণ করতে থাকে, এবং বিভিন্ন মানুষের মত ও মন এই ঘটনাবর্তে কেমন করে আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়ে চলে এই আমার রচনার লক্ষ্য।" এই লক্ষ্য সাধনের জন্য লেখক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে ব্যক্তি মানুষকে স্থাপন করেছেন এবং "চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঘটনা যেন সত্য হয়ে উঠতে পারে" সে দিকেই মনোযোগ দিয়েছেন বেশি। ঘটনা সম্পর্কেই উপন্যাসের মধ্যে বহু চরিত্র হাজির হয়েছে ; কিন্তু ব্যক্তি-চরিত্রের অন্তর্জগতের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বা নর-নারীর জীবনের অন্তরালশায়ী রূপ ও রহস্যের জটিলতার ছন্দ ও শ্রী ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে লেখক বিশেষ মনোযোগ দেন নি। ফলে বহু ক্ষেত্রেই উপন্যাসের চরিত্রগুলো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেনি। ১৯৪২-এর এপ্রিল থেকে ১৯৪৪-এর এপ্রিল পর্যন্ত মহাযুদ্ধ-আগষ্ট আন্দোলন-জনযুদ্ধ ও মন্বন্তরের অভিঘাতে আলোড়িত-বিবর্তিত দেশ ও কালের সংকটদীর্ণ-অস্থির ইতিহাস-ই মন্বন্তরের ট্রিলজির প্রেক্ষাপট। এই প্রেক্ষাপটে প্রধান-অপ্রধান মিলিয়ে পঞ্চাশটির উপর চরিত্র-পাত্র হাজির হয়েছে। ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, সাংবাদিক-সম্পাদক, কারখানা মালিক, ব্যবসায়ী, মিলিটারী কন্ট্রাক্টর, চোরাকারবারী, ভেজালদার, উচ্চপদস্থ আমলা-কর্মচারী, নিম্নবিত্ত মানুষ, গ্রামের কৃষক, কংগ্রেস-কমিউনিষ্ট-লীগপন্থী-হিন্দুসভাপন্থী ইত্যাদি নানা মত ও পথের রাজনৈতিককর্মী—অর্থাৎ গ্রাম ও শহরের সমাজের

নানাস্তরের, নানা বৃত্তির ও নানা মতামতের মানুষের এক বিরাট চরিত্র-চিত্র-শালা এই উপন্যাস।

উপন্যাসের নায়ক বিনয় মজুমদার—ব্রহ্মদেশ থেকে শরণার্থী হয়ে আসা একজন বাঙালী ডাক্তার। নায়িকা সুধা গুপ্তা—স্কুলের শিক্ষিকা এবং কমিউনিস্ট কর্মী। 'ত্রিদিবা' উপন্যাসের নায়ক অমিতও এখানে একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক চরিত্র। "বিনয় সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের জীবন সে চায়—চায় গৃহ, চায় আত্মীয়-পরিজন, চায় কর্ম, আর চায় সে সাধারণ মানুষের মত তার দেশের স্বাধীনতা।"—(পঞ্চাশের পথ / পৃ. ২৮৭)। বিনয় রাজনীতি বোঝে না, বরং রাজনীতির স্পর্শ বাঁচিয়েই চলতে সে চায়। তবে বিনয় আত্মকেন্দ্রিক নয়, নিঃস্বার্থভাবে সে মানুষের সেবা করতে চায়;—"দেখতে চায় তার স্বদেশ, চিনতে চায় তার দেশের লোককে"—(ঐ / পৃ. ১৫)। আর দেশের জন্য কাজের সূত্রেই সে অমিত-সুধাদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। বিনয় রাজনীতিতে নেই, আর সুধা রাজনীতি বাদ দিয়ে কোন কিছুতে নেই। কাজের ক্ষেত্রে যোগাযোগের মধ্যদিয়ে বিনয় সুধার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং 'অমিতদা'র অনুজ-প্রতিম বন্ধু হয়ে যায়।

অমিত-সুধাদের জনযুদ্ধের রাজনীতি বিনয়ের চোখে ভারতীয় জনগণের স্বার্থবিরোধী বলেই মনে হয় এবং সে গান্ধীজীর 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ধ্বনির মধ্যে ভারতের সকল মানুষের প্রাণের ঘোষণাই শুনতে পায়। এসব নিয়ে সুধার সঙ্গে, অমিতের সঙ্গে বিনয়ের তর্ক বাধে। সুধা তাকে বোঝায়, "এ্যাসেম্‌ব্লির বক্তৃতা, বিবৃতি, আর পার্কে-পার্কে দেশোদ্ধার" পলিটিক্‌স্ নয়; "দশজনের সঙ্গে চলারই নাম পলিটিক্‌স্।"—(পঞ্চাশের পথ / ২৯১)। তারা "বুঝে" সেই পলিটিক্‌স্ করছে, আর বিনয় "না বুঝে" তাতেই জড়িয়ে আছে। অমিতও তাকে বলে, "দুনিয়ায় কিছু থেমে নেই, কেউ দাঁড়িয়ে নেই, ডাক্তার। তুমি হয় এগিয়ে যাচ্ছ, নয় তুমি অন্যদের পিছনে টেনে রাখছ আর তারই নাম দিচ্ছ 'আমার পলিটিক্‌স্ নেই।" অমিত-সুধারা "যুক্তির জাহাজ", বিনয় তাদের যুক্তি খণ্ডন করতে পারে না; কিন্তু তাদের জনযুদ্ধের তত্ত্বও সে মেনে নিতে পারে না। বিনয় দশজনের সঙ্গে চলতে চায়, ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখতে চায়। এ তো সাধারণ মানুষেরই কথা—এর মধ্যে কোন পলিটিক্‌স্ থাকতে পারে তা সে বিশ্বাসই করে না।

গান্ধীজীর 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ঘোষণায় বিনয়ের প্রাণ সাড়া দেয়। গান্ধীজীসহ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেফ্‌তারে দেশের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে; বিনয় বুঝতে পারে, "ইতিহাস মোড় ঘুরছে আজ।" বিপুল আবেগে আলোড়িত তার মন, সে ভাবে, "কিছু করতেই হবে—যতটা সে পারে।" দেশের কাজের সূত্রেই গান্ধীভক্ত বণিক হরসুখরায়জী, বাঙালী ব্যবসায়ীদের নেতা প্রাক্তন বিপ্লবী মুরারী সেন, সোশ্যালিস্ট-পন্থী পত্রিকাসম্পাদক শৌরীন, তত্ত্ববাগীশ অধ্যাপক খাঁ, মল্লিক প্রভৃতির সঙ্গে বিনয়ের যোগাযোগ হয়। বিনয় হতাশ হয়ে দেখল এরা "কি করা

যায়, তারই আলোচনায়" বৈঠকে পর বৈঠক করল ; কিন্তু সংগ্রামের পথে এক পা-ও বাড়াল না ; বরং যুদ্ধের বাজারে বাণিজ্যবৃদ্ধি আর স্বার্থসিদ্ধির কাজেই কৌশলী তৎপরতা দেখাল। বিনয় আরো বুঝল, জনযুদ্ধের নীতি ভ্রান্ত হলেও কমিউনিস্টরা সংগ্রামের নামে অন্তত কপটতা করে না। "কাজের দিন এল দেশের" বিনয় শহরে "রাজনীতির এই গোলক-ধাঁধায়" নিজেকে আটকে রাখল না, চলে গেল গ্রামে—সোনাপুরে। বিনয় দেখে অমিত-সুধা বা সোনাপুরের প্রমথ-মজিদ-শিবুদা প্রমুখ কমিউনিস্ট কর্মীদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধত্রস্ত, দুর্ভিক্ষগ্রস্ত, বন্যাপীড়িত মানুষের সেবার কাজে অংশ গ্রহণে তার কোন অসুবিধা হয় না, বরং কর্মক্ষেত্রে তারাই তার নির্ভরযোগ্য সাহায্যকারী। সে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারে, যুদ্ধের বাজারে, দুর্ভিক্ষের সুযোগে "দেশ জোড়া এক মুনাফার মৃগয়া চলেছে......সেই মুনাফার মৃগয়া হয়ে পড়েছে মানুষের মৃগয়া আজ এ দেশে।" কংগ্রেসী-আগস্টবিপ্লবী-লীগপন্থী-হিন্দুসভাপন্থীরা সকলেই মন্বন্তর নিয়ে রাজনীতি করছে, রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বিরোধিতা করছে, কিন্তু মুনাফা শিকারের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলছে না ; বরং মৃত্যুর কারবারীদের "ব্যবসায়ের স্বাধীনতা বজায় থাকবে"—এ কথাই বলছে। এইসব রাজনীতি সম্পর্কে বিনয়ের মোহমুক্তি ঘটে। অমিত-সুধা তাকে জানায় দশজনের কাজ করতে গিয়ে, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বিনয় জেনে গিয়েছে "কমিউনিস্টদের মূল কথা—এই সভ্যতা আজ শুধু একটা মুনাফার মৃগয়া।"—(তেরশ' পঞ্চাশ / পৃঃ ৪৫৪)। বিনয় এ সত্য আর অস্বীকার করতে পারে না,—সে "তার সমস্ত সংশয়ের উজ্জ্বল উত্তর" পেয়ে যায়। সে বুঝতে পারে অমিত-সুধারা আন্তর্জাতিকতাবাদী হলেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতাও চায়, সেই সঙ্গে চায় "মুনাফার মৃগয়ার" অবসান। একজন সাধারণ দেশপ্রেমিক মধ্যবিত্ত-বাঙালীর রাজনৈতিক চেতনায় উত্তরণের এই হচ্ছে মোটামুটি কাহিনী।

বিনয় রাজনীতির স্পর্শ বাঁচিয়ে দূরে থাকতে চেয়েছিল, জনযুদ্ধনীতির ঘোর বিরোধী ছিল ; কিন্তু দুর্গত মানুষের সেবা করতে গিয়ে, নানা অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে সে রাজনৈতিক চেতনার অধিকারী হয়ে উঠল। লেখক তাঁর স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা বিনয়ের চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতির স্বাভাবিক চিত্র এঁকেছেন। পরার্থপরতা-দৃঢ়তা-দুর্বলতা, কামনা-বাসনা-ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব-সংশয়-ক্ষোভ সবকিছু নিয়েই বিনয় উপন্যাসের মধ্যে রক্তে-মাংসে জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু নায়িকা সুধা গুপ্তা "বড়, সুন্দর আর উজ্জ্বল" একজোড়া চোখের অধিকারিণী হলেও উপন্যাসের চরিত্র হিসাবে সার্থক নয়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 'অপরাজেয় কর্মতৎপরতা' নিয়ে 'সে একটা বড় পার্টির সুদৃঢ় কর্মী'ই থেকে গেছে। বিনয় 'পলিটিক্সে নেই,' আর সুধা 'পলিটিক্স্ ছাড়া অন্য কিছুতেই নেই।' তবু-ও বিনয় সুধাকে ভালবেসেছে,—"ব্যঙ্গময়ী, বিদ্রূপভরা মেয়ে" সুধা গুপ্তা-ও সে ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করেনি। কিন্তু তার জীবনে পার্টি-ই "সবচেয়ে বড় কথা" হওয়ায়, সুধা

গুপ্তা প্রেম-বিরহ-সুখ-দুঃখ-সংশয়-সংকটে আন্দোলিত রক্ত-মাংসে জীবন্ত নারী চরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি। দ্বন্দ্ব-সংশয়হীন একরঙা নিরুত্তাপ তার আচরণ—কোন মানসিক টেন্‌সন বা গূঢ় পরিবর্তন তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না।

তবে এ কথা মানতেই হবে, এ উপন্যাস ঠিক নায়ক-নায়িকার নিটোল প্রেমের কাহিনী নয় বা চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের 'সাব্‌জেক্‌টিভ্‌ নভেল'-ও নয়। সাংবাদিকের 'চোখ ও মন' নিয়ে লেখা চল্লিশের দশকের বাঙালীর সামগ্রিক সমাজ-জীবনের ডক্যুমেন্টারি ভাষা-চিত্র। বিশাল পটভূমি, বহুবিচিত্র ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ—সব মিলিয়ে মন্বন্তরের এপিকধর্মী ঐতিহাসিক কথা সাহিত্য ; বাংলা-সাহিত্যে অদ্বিতীয়, কিন্তু শিল্পকর্ম হিসাবে রসোত্তীর্ণ নয়।

গোপাল হালদার মূলতই ইতিহাসনিষ্ঠ-বক্তব্যসচেতন-মননশীল কথাসাহিত্যিক ; যুক্তি-তর্ক-বিশ্লেষণের প্রতি তাঁর পক্ষপাত, ফলে তাঁর রচনা কিছুটা নীরস বলে মনে হয়। তাঁর রচনায় অলংকৃত ভাষার রহস্যময় সৌন্দর্যের লাবণ্য নেই, তবে মননের দীপ্তি ও ঋজুতা, জীবন-জিজ্ঞাসার তীক্ষ্ণতা, আবেগের অনুচ্চারিত স্পন্দন পরিশীলিত পাঠকের কাছে ধরা পড়তে বাধ্য।

গোপাল হালদারের জীবনদৃষ্টি ও সৃষ্টিশক্তি অনুধাবনের পক্ষে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, তাঁর আত্মজীবনী **'রূপনারানের কূলে।'**। বঙ্গ-ভঙ্গ-স্বদেশী আন্দোলনের পর বাঙালীর জাতীয় চেতনা, জাতীয় মুক্তির বিক্রমে ব্যক্ত হলো। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম অহিংস গণঅসহযোগ আর সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের জটিল-কুটিল পথ বেয়ে এগিয়ে চলল ;—তিরিশের দশকে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সচেতন বিপ্লবী ধারাও তাতে যুক্ত হলো—দেশ ও কালের অস্থির-জটিল পটভূমিতে গোপাল হালদারের কৈশোর থেকে যৌবনের পরিণতি পর্যন্ত দেশপ্রেম, জ্ঞানার্জন, সাহিত্য সাধনা, গবেষণা, সাংবাদিকতা, জীবন ও সংস্কৃতি জিজ্ঞাসার অসামান্য দলিল 'রূপনারানের কূলে'—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। অসামান্য আর একটি কারণেও আত্মচরিতে বা স্মৃতিচারণায় আত্মমহিমা প্রচারের যে ব্যগ্রতা সাধারণত দেখা যায়, তা থেকে গ্রন্থ দুখানি মুক্ত। রূপনারানের স্রোতে নানা ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে আত্মজিজ্ঞাসায় অস্থির হয়ে, সাধারণের মধ্যে সাধারণ হয়ে বেঁচে থাকার আকুতি নিয়ে ভেসে চলা জীবনকে কূলে দাঁড়িয়ে অবলোকন করেছেন লেখক। নিজের কথা নির্লিপ্ত-নির্মোহ দৃষ্টিতে বলা সত্যই কঠিন। "সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম—সে কখনো করে না বঞ্চনা"—এ সত্য মেনেই গোপাল হালদার রচনা করেছেন 'রূপনারানের কূলে'—এখানেও তিনি ইতিহাসনিষ্ঠ, বিশ্লেষণ পরায়ণ, জীবন ও শিল্পে একাত্ম,—প্রাজ্ঞজীবনরসিক।

—অমিয় ধর